বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড।

১২৮১ শাল।

কাঁটালপাড়া:

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩॥০ টাকা

ডাকমাশুল সমেত ৪ টাকা।

বঙ্গদর্শন

(মাসিক পত্র ও সমালোচন।)

৩য় খণ্ড।] বৈশাখ ১২৮১। [১ সংখ্যা।

ভাষা সমালোচন।

২

বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডে, "ভাষার উৎপত্তি" ইত্যভিধেয় প্রবন্ধে, ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কয়েকটি মত প্রচারিত আছে, তাহা সমালোচিত হইয়াছে। অনুকৃতিবাদই এক্ষণকার পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেই অনুকৃতি বাদ কি, তাহা এখন আর একবার বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয় নিতান্ত পুনরুক্তি হইবে না। কোন পদার্থ হইতে যে শব্দ নিঃসৃত হইয়া থাকে, অথবা জন্তুগণ যে রব করিয়া থাকে, কিম্বা কোন পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর হইলে, আপনা আপনি মনুষ্য মুখ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ বা রবের অনুকরণেই ভাষার উৎপত্তি। অনুকরণ শক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্যই বালকে বংশীকে, 'ভোঁপো,' কুকুরকে, (ভেউভেউ) এবং আততায়ীকে 'উঃ উঃ' বলিয়া থাকে; কিন্তু আদিতে সকল শব্দই কি অনুকরণ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে? এবিষয়ে নানা সন্দেহ হইতে পারে। সকল ভাষাতেই

কতকগুলি শব্দ যে, অনুকরণসৃষ্ট তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অন্যগুলির সম্বন্ধে কেবল অনুমান করিতে হইবে মাত্র। কিন্তু কোন একটি বিশেষ শব্দ লইয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না, যে, এটি কোন শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট হইল? কেন না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে যুগধর্ম্মে অধিকাংশ শব্দই বিলক্ষণ রূপান্তরিত হইয়াছে। এমন কি, যে আদিম শব্দ হইতে বর্ত্তমান শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হয়ত আমরা আজিও সেইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, অথচ সেটি যে, বর্ত্তমান শব্দটির পূর্ব্বপুরুষ তাহা জানিবার এখন কোন উপায় নাই বলিলেই হয়।

বিশেষতঃ সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা; ইহাতে ব্যাকরণের জটিলতা বিস্তর; আপিশলি* হইতে তারানাথ পর্য্যন্ত সকলেই ইহার উপর যথাসাধ্য দৌরাত্ম্য করিয়াছেন; সুতরাং সংস্কৃত অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়াছে; বর্ত্তমান শব্দ সকলের কুলচি স্থির করিয়া মূল গোত্র নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন; কঠিন কেন? এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত 'নিষ্ঠীবন' শব্দের মধ্যে যে ইহার পূর্ব্বপুরুষের নাম লুক্কায়িত আছে তাহা আপাততঃ কোন মতেই বোধগম্য হয় না। কিন্তু একটু বিতর্ক করিয়া দেখিলে, তাহা শীঘ্রই অনুভূত হইবে। নি+ষ্ঠীপ্×অন (ট)=নিষ্ঠীবন। এই ষ্ঠীপ্ শব্দই বলুন আর ধাতুই বলুন, যে শুদ্ধ অনুকরণাত্মক তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। নিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ হইতে যে শব্দ বহির্গত হইয়া থাকে তাহারই অনুকরণে এই সংস্কৃত ষ্ঠীপ্, গ্রাম্য বাঙ্গালা ছিপ বা ছেপ, এবং পিক বা পিচ্ ইংরাজি স্পিট্ (Spit) ইত্যাদি। চলিত বাঙ্গালা 'থুথু' শব্দ যে অনুকরণমূলক তাহাও সহজে উপলব্ধি হয়। নিষ্ঠীবন শব্দের মূল সেরূপ সহজে বুঝা যায় না। কেন না ইহা বিশেষ রূপান্তরিত হইয়াছে।

কোন্ শব্দের অনুকরণে কোন্ শব্দ হইল, তাহা এখন প্রায়ই বলা যায় না; এবং এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সদুত্তর না পাইলেই, সকল শব্দই যে অনুকরণমূলক, এ কথা অস্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

কিন্তু এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলি অনেক ভাষাতেই প্রায় সমান। ইংরেজি, সংস্কৃত এবং লাটিন অথবা গ্রীক ভাষায়, যে কতকগুলি শব্দ একরূপ আছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবের প্রথম খণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গদর্শনে আশ্বিন মাসে, দেখাইয়াছি।

এরূপ যে শব্দগুলি, অনেক ভাষায় সমান, সেগুলি সম্বন্ধে সহজেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে তাহার কোন্‌টি কোন্ শব্দের অনুকরণে উৎপন্ন হইয়াছে।

* বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ২৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

সেগুলি অনেককাল যে বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই, তাহা প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে। যদি অনেক দিন রূপান্তরিত না হইল, তাহা হইলে, আদিম অনুকৃত শব্দের মূর্ত্তি হয়ত তাহারা এখনও ধারণ করিয়া আছে।

"ন, অন্, অ," প্রভৃতি নিষেধ জ্ঞাপক শব্দের সাদৃশ্য অনেক ভাষাতেই আছে। ন, না নি (ne L.), নেহি, নো (E. no) প্রভৃতি শব্দ কোন শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট হইল? এই প্রশ্নে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ কোন আপত্তি করিতে পারেন না। শব্দগুলি অনেক ভাষাতেই প্রায় একাক্ষরী; যে কিছু রূপান্তর হইয়াছে তাহা স্বর বৈলক্ষণ্যে মাত্র; কিন্তু দন্ত্য ন্ যে নিষেধ বুঝাইতেছে তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। কোন শব্দ বা রবের অনুকরণে এই দন্ত্য 'নর' নিষেধ জ্ঞাপকত্ব সৃষ্টি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে, কোন কোন ভাষাবিৎ* বলেন, যে সকল শব্দই যে অনুকরণমূলক এমন না হইতেও পারে। এমন হইতে পারে যে কেহ কাহারও অনুকরণ না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়াও কেবল দন্ত্য ন দ্বারা নিষেধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বালকে এবিষয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়। এরূপ সকল দেশে সকল কালেই ঘটে, যে, বালকের ইচ্ছা না থাকিলেও, তদীয় পিতা মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। অপোগণ্ড শিশু স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহার আর পানস্পৃহা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু স্নেহময়ী জননীর পোষণেচ্ছা এখনও নিবৃত্তি পায় নাই। তিনি নিরুপায় শিশুকে মৃদুবলে ক্রোড়ে পাতিত করিয়া, হয়ত হেমময় কোষপাত্রে ঘন দুগ্ধ পরিপূর্ণ করিয়া, নতুবা শুক্তির কোষার্দ্ধে ছাগদুগ্ধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন; অনুপায় শিশু তখন কি করিবে? মস্তক সঞ্চালন করিবে। মাতা বামকরে মস্তক ধারণ করিলেন; বালক তখন মুখ বদ্ধ করিয়া, দন্তে দন্ত বদ্ধ করিয়া—কি বলিবে? নি-নি-নি-নুঁ-উঁ-উঁ প্রায়, ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে। এইরূপে প্রথমে 'ন' উচ্চারণ করিয়া বালক নিষেধ জ্ঞাপন করিতে শিক্ষা করে।

এই শিক্ষা হইতে ক্রমে অভ্যাস। যাহা বালক শিখিয়াছিল, যুবার তাহা অভ্যস্ত বোধ হয়, অসভ্য আদিম নরে যাহা শিখিয়াছিল, এখনকার সভ্য নরের তাহা অভ্যস্ত। এরূপ তর্ক হইতে পারে যে এরূপ স্থলে শিক্ষা হইতে যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহাও অনুকরণমূলক। প্রথম একবার ন বাণী বলিয়া পরে দ্বিতীয়বার সেই বালক সেরূপ অবস্থায় পতিত না হইয়া যখন ন বাণী বলে, তখন সে আত্মানুকরণ করে মাত্র। এরূপ কথা অপ্রামাণিক অনুমান মাত্র; এবং কখনই সত্য হইতে পারে না। ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। অনুকরণ ইচ্ছা প্রযুক্ত অপো-

* যেমন Farrar.

গণ্ড বালকের ইচ্ছাশক্তি নাই। তাহার এরূপ কার্য্য কেবল শারীরিক-অনুস্মৃতি মূলক মাত্র।

শারীরিক অনুস্মৃতি কাহাকে বলে? কেহ চক্ষুতে আঘাত করিতে আসিলে চক্ষুর পাতা পড়িয়া যায় কেন? শারীরিক অনুস্মৃতি বলে। কোন শিরা, ধমনী বা কোন শোণিত প্রবাহ বারম্বার এক পথে সঞ্চালিত হইলে, বা শরীরের কোন অঙ্গ বারম্বার একরূপ সঞ্চালিত হইলে, পরে কোন সদৃশ কারণের উৎপত্তি হইলেই সেইশোণিত প্রবাহ সেই পথে আবার ধাবিত হইবে, সেই অঙ্গ আবার সেইরূপ সঞ্চালিত হইবে।

ইহাকেই শারীরিক অনুস্মৃতি বলিতেছি। শারীরিক অনুস্মৃতি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই, হাস্য* বা ক্রন্দন সম্বরণ করা নিতান্ত কষ্টকর।

নিষেধ জ্ঞাপক 'ন' শব্দের অভ্যাস বালক বা অসভ্য আদিমাবস্থার লোকের পক্ষে শারীরিক অনুস্মৃতিমূলক।

বিশুদ্ধ অনুকৃতিবাদী ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে পারেন, যে,সেই ন আদিম বালকের পক্ষে অনুস্মৃতিমূলক হইতে পারে, কিন্তু এখনকার কালে সেই ন যে কেবল অনুকৃতি মূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাষার উৎপত্তি কখন সময়ে, বর্ত্তমান ভাষা সকল কিরূপে পাইলাম, সে বিষয়ের বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেন না, তাহাহইলে, অপৌরুষেয়ত্ববাদ, সম্মতিবাদ, এবং অনুকৃতিবাদ এ তিনটিই যুক্তিসঙ্গত হইয়া উঠে।

(১) ভাষা অপৌরুষেয়া বা ঈশ্বর প্রদত্তা; কেন না সকলই ঈশ্বর দত্ত। এমন হইতে পারে বটে যে, ঈশ্বর বালককে বা আদিম লোককে, কুক্কুর দেখিয়া এবং তাহার রব আকর্ণন করিয়া, তাহাকে 'ভেউ ভেউ' নাম প্রদান করিতে কাণে কাণে পরামর্শ দেন নাই, কিন্তু বালককে তিনি অবশ্যই এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যে, সে তদ্দ্বারা কুক্কুর দেখিলেই তাহার 'ভেউ ভেউ' নামকরণ করিবে। সুতরাং ভাষা ঈশ্বর প্রদত্তা বা অপৌরুষেয়া।

(২) ভাষা সম্মতিমূলিকাও বটে; কেন না কোন এক বিশেষ শব্দে কোন একটী বিশেষ পদার্থ বুঝাইবে একথায় এখন যদি সকলে সম্মত না হন, তাহা হইলে এখনই ঘরে ঘরে বাবেল মন্দির হইয়া উঠিবে।

এই সকল কথায় অনুকরণবাদীকে উত্তর দিতে হইবে, যে, ঈশ্বর সকল শক্তির বিধাতা একথার প্রতিবাদ করা ভাষা সমালোচকের উদ্দেশ্য নহে। এবং সম্মতি হইতে যে ভাষার স্থিতি তাহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভাষার স্থিতি সম্মতিসাপেক্ষ বলিয়া ভাষার

* Vide H. Spencer's Philosophy of Laughter.

উৎপত্তিকালে সম্মতির প্রয়োজন একথা যুক্তিযুক্ত নহে।

তাহাতেই বিশুদ্ধ অনুকরণবাদীকে আমরা বলিতেছি, যে এখন কালে, নিষেধ জ্ঞাপক 'ন' শব্দ প্রয়োগ কালে, একে অন্যের অনুকরণ করিয়া থাকে বলিয়া, নিষেধ জ্ঞাপক 'ন' অনুকৃতি মূলক বলা যাইতে পারে না। ইহা একরূপ স্বভাবজ এবং পরে অনুস্মৃতি মূলক।

সুতরাং অনুকৃতিবাদ দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহার বিভেদ 'ভাষার উৎপত্তি' প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছিল। পরিস্ফুট করা হয় নাই। সেই জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা।

ভাষা কতকদূর অনুকৃতা। যেমন পশ্বাদির এবং তাহাদিগের রবের নামকরণ সময়ে। এবং কতকদূর স্বভাবজা। যেমন পিতা মাতার নামকরণে, নিষেধ জ্ঞাপনে, এবং হঠাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তনশীল কোন বস্তুর নামকরণ কালে।

ভাষার উৎপত্তি বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা মূলতঃ অনুকৃতা এবং স্বভাবজা। সেই মূলের মূল বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অবশ্যই হইবেন; কেননা ঈশ্বরের লক্ষণই এই যে, তিনি সকল মূলের মূল।

ভাষার স্থিতি বিবেচনা করিলে, ইহা কিয়ৎপরিমাণে অনুস্মৃতি মূলক এবং কিয়ৎ পরিমাণে সম্মতি মূলক। দেহী মাত্রেরই পৌনঃপুনিক কার্য্যে অনুস্মৃতি আছে। ভাষাতেও আছে। সমাজ মাত্রেরই সামাজিক কার্য্যে সকলের সম্মতি আছে—ভাষাতেও আছে। আর ঈশ্বর সকল স্থিতিরই মূল, সুতরাং ভাষা স্থিতিরও মূল।

ভাষার সৃষ্টিস্থিতি এইরূপ; ভাষার লয় হয় কি? হয় না। যে কারণে নৈয়ায়িক বৃক্ষ লতাকে নিত্য বলেন, সেই কারণেই আমরা ভাষা নিত্যা বলিতেছি। একটি বৃক্ষের লয় হয়, একটি শব্দের লয় হয়; বৃক্ষজাতির লয় হয় না, সেইরূপ ভাষার লয় হয় না। তবে মহাপ্রলয়ে যখন সকল পদার্থই ব্রহ্মে লীন হইবে, তখন অবশ্য ভাষারও লয় হইবে। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

ভাষার সৃষ্টিস্থিতি আছে লয় নাই। কিন্তু বৈবর্ত্তন আছে। ভাষার অতি বিস্ময়কর বৈবর্ত্তন হইয়া থাকে। জগতে সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে। সকল বৈবর্ত্তনের নিয়ম আছে; ভাষায় যে বৈবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা অতি বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তাহারও অতি সুন্দর নিয়ম আছে।

এই বৈবর্ত্তনের দুইটি মূল নিয়ম এই প্রস্তাবে বলা যাইতেছে।

(১) দেশ ভেদে, অবস্থা ভেদে উচ্চারণের তারতম্য হইয়া থাকে।

বেদে পঞ্জাব প্রদেশকে 'সপ্তসিন্ধু' বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাচীন ইরাণীয়েরা দন্ত্য সর স্থানে হ উচ্চারণ করিত। এবং এই 'সপ্তসিন্ধুকে' তাহারা 'হপ্তহিন্দু'

বলিয়াছে। সিন্ধু নদীকে হিন্দু বলিত। এইরূপে 'হিন্দু' এবং হিন্দিয়া' শব্দের উৎপত্তি। এখনও যেমন লণ্ডনের ইতর লোকেরা হকার আদি কথায় হকারের লোপ করিয়া থাকে, মধ্যকালের ইউরোপীয়েরা সেইরূপ হিন্দিয়া শব্দের হ লোপ করিয়া 'ইণ্ডিয়া' নাম রাখিল। এইরূপে সিন্ধু হইতে 'ইণ্ডিয়া' নামের সৃষ্টি। এইরূপ নানা উদাহরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়ম স্থাপন জন্য নানা উদাহরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে, ইংরাজে বিশেষ চেষ্টায় ত উচ্চারণ করিতে প্রায়ই পারেন না; এবং সেইরূপ স্কটলণ্ডবাসী সাহেবেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া ট উচ্চারণ করিতে পারেন না। আমরা গত আশ্বিন মাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে যে সকল শব্দ সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় তাহার এক একটী কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়ে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম আছে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত গ্রিম্ সে নিয়মগুলি ধারাবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া, সে গুলিকে গ্রিমের নিয়ম বলিয়া থাকে। সে গুলি অতি সুন্দর বটে; কিন্তু ব্যাকরণ সূত্রের মত নিতান্ত বিধিবাক্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই আমরা এস্থলে সে গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না।

(২) দেশ ভেদে যেরূপ শব্দের বৈবর্ত্তন হয়, এক দেশেই তাড়াতাড়িতে সেইরূপ শব্দ রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিবেন, যে নগরের ভাষা একরূপ, আর পল্লীগ্রামের ভাষা অন্যরূপ। পল্লীগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরলগ্রন্থ এবং দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট এবং নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সংশ্লিষ্ট, স্বল্পায়ববিশিষ্ট। নগরের লোকজনতা অধিক এবং লোকে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা নিবন্ধন দীর্ঘ সূত্রিতায় ঘৃণা করে বলিয়া এরূপ হইয়া থাকে।

এইরূপে 'করিলা হামি'—করিলা হাম—করিলাম—কর্লাম—কর্ল্ুম—কল্লু, হইয়া যায়। এইরূপে মধ্যম দাদা মহাশয়, ক্রমে মেজ্দা হইয়া উঠেন; এবং ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণী; ক্রমে ঠাউমা হন।

ভাষা বৈবর্ত্তনের সকল নিয়ম দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল দুইটি প্রধান নিয়ম প্রদান করিলাম মাত্র। এই দুইটি নিয়মের মধ্যেই অনেকগুলি সূক্ষ্মতত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে। সূত্র হইল দেশ ভেদে উচ্চারণ ভেদ হইয়া থাকে —যথা সংস্কৃত দন্ত্য স, জেন্দ গ্রন্থে 'হ' হইয়াছে। দন্ত্য স, 'হ' হইল কেন, মূর্দ্ধণ্য ষর মত উচ্চারিত না হইল কেন? এটি বড় কূট প্রশ্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের যতক্ষণ উচ্চারণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার সূত্রকে বিজ্ঞান সূত্র বলিব না। মক্ষমূলর এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের এরূপ ভরসাও আছে যে তিনি কালে কৃতকার্য্য হইবেন।

চেষ্টা করিলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন; যখন দেখিতেছি, যে স্কটলণ্ডবাসীরা, ট উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, ইংলণ্ডবাসীরা ত উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না, তখন আমি স্বচ্ছন্দে এরূপ অনুমান করিতে পারি, যে এই দুই জাতির জিহ্বায় অবশ্য কোনরূপ আড় থাকিবে। এই আড় হয় তাহাদিগের দেশের জলবায়ু হইতে, নয় তাহাদিগের খাদ্য হইতে, না হয় এতদুভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন দেখ কোন বর্ণ কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যে স্থানে জিহ্বার আঘাত করিলে ত বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থাকে, শিখাইয়া দিলেও ইংরাজ শিশু, সেখানে জিহ্বার আঘাত করিতে পারে না। তাহার অভ্যাস নাই বলিয়া বলিতে পার না; কেননা স্কট্ শিশুরও ত অভ্যাস নাই, ত সে পারিল কেমন করিয়া? তবে পূর্ব্বে যাহা বলা যাইতেছিল তাহাই ঠিক; শীতবাতাতপখাদ্য নিবন্ধনই এরূপ হয়। শীতে জিহ্বা এড়াইয়া পড়ে, মদ খাইলে এড়াইয়া পড়ে, কিসে, কি খাইলে জিহ্বা তকারের উৎপত্তি স্থানে আঘাত করিতে পারে না? বিজ্ঞান এখন ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অপারগ। আমাদিগের এরূপ ভরসা আছে, উপযুক্ত লোকে এবিষয়ের সমালোচনা করিলে অচিরাৎ সদুত্তর প্রাপ্ত হইব।

আমাদের দেশে এতকাল লোকের ব্যাকরণ সূত্রে এরূপ আস্থা ছিল, যে মহা মহা ভাষাবিদের এরূপ প্রশ্ন কখন মনে উদিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। জায়া শব্দ, পতি শব্দ দ্বন্দ্বসমাসে একত্র হইলে, দম্পতি হইবে, কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত বৈয়াকরণিক দিতে অসমর্থ। কিন্তু ব্যাকরণ সূত্র ব্যতীত এরূপ ঘটনার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। বররুচি বলিলেন, সংস্কৃত 'দ্য' র স্থানে, প্রাকৃত 'জ্জ' হইবে। কেন? ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে প্রাকৃতভাষীরা 'দ্য' উচ্চারণ করিতে পারিত না, চেষ্টা করিয়া 'জ্জ' বলিয়া ফেলিত। তবে বোধ হয় তাহারা বিদেশীয় হইবে, নহিলে এরূপ উচ্চারণের বৈষম্য হয় কেন?

এইরূপে ভাষা সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক অন্ধতমসাবৃত পুরাবৃত্ত পরিষ্কৃত হইবে এবং প্রাচীন আচার ব্যবহার আমরা অনেক বুঝিতে পারিব।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের আদিম অবস্থা।

উপক্রমণিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাসন প্রণালী।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট স্থানগুলি অধিকার করিয়া প্রথম অবস্থায় কিছুকাল রাজ্য বিস্তার চেষ্টায় বিমুখ রহিলেন। অধিকৃত রাজ্যস্থ প্রজাবর্গের সুশাসন সম্পাদনই সে বিরতির কারণ। ইঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজ্য মধ্যে সুনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রভুতা থাকে না। প্রভুসমর্থিত তেজ যাবৎ রাজ্য মধ্যে বিস্তৃত না হয় তাবৎ প্রজার অন্তঃকরণে পাপে ভয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। যথাশাস্ত্র যুক্তি যুক্ত রাজার দণ্ডনীতি প্রজাবর্গের মনোমধ্যে দেদীপ্যমান না থাকিলে তাহাদিগের হৃদয়ে পাপরূপ পিশাচের একাধিপত্য হয়। পাপের বৃদ্ধিতেই সংসারে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটে। প্রজার পাপে রাজা নষ্ট, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসার ক্রমশঃ দুঃখের স্থান হইতে পারে—অতএব এই বেলা সুনিয়ম করা যাউক। সুনিয়ম থাকিলে ভারত সংসার পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। (১)

ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পুণ্যাশ্রম করাই আর্য্যগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই যাবদীয় সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের সংশ্রব রাখিয়া ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত একপাও চলিবার কাহারও সামর্থ্য থাকিত না।

পূর্ব্বকালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে যাহার পরম্পরা সম্বন্ধে সংশ্রব ছিল উত্তর কালে সেই স্থলগুলি কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্রের দুর্ভেদ্য

---

(১) দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং ॥২৮

অতোদুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরং।
অন্তরীক্ষ গতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥২৯

সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ ॥৩০০

মনু—৭

তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ইতোন্যো ভোগ ভূময়ঃ ॥১১

অত্রজন্ম সহস্রাণাম্ সহস্রৈরপিসত্তমম্।
কদাচিল্লোভ তেজন্তু মনুষ্যং পুণ্য সঞ্চয়ম্ ॥১২

গায়ন্তি দেবাঃকিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারত ভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গস্তচহেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়াঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥১৩

বিষ্ণুপুরাণ—২ পং ৩অং

সুদৃঢ় গ্রন্থ গ্রন্থি দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কট হইয়া উঠিল। তদবধি আর্য্য সন্তানগণের মানসিক প্রতিভা, ও স্বাধীন প্রবৃত্তি ঐসকল সঙ্কট স্থলে ক্রমশঃ প্রতিহত হইতে থাকিল। বারংবার প্রতিঘাত দ্বারা আর্য্য সন্তানগণের হৃদয় পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া গেল। অধস্তন সন্ততিবর্গ যদি পূর্ব্বাচরিত প্রণালী অনুসারে চলিতেন, নূতন নিয়মের একান্ত অনুরক্ত না হইতেন, পরিবর্ত্তসহ স্থলে স্থলে সুনিয়ম ক্রমে বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতেন ও একেবারে মূলোচ্ছেদের চেষ্টা না পাইতেন, তাহা হইলে ভারতসংসার চিরকাল সর্ব্বজাতির নিকট পুণ্যাশ্রম বলিয়া যে পরিচিত থাকিত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির শাসনভার রাজার হস্তে সমর্পিত ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক আর্য্যগণ কাহাকে রাজা শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইবে যে অধিকৃত রাজ্যে যাঁহার স্বামিত্ব আছে, যিনি মন্ত্রিগণ পরিবৃত হইয়া প্রজাপালন করেন, যাঁহার সহিত অন্য ভূপতিবর্গ সন্ধি নিবন্ধন হেতু সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন, যাঁহার ধনাগার নানাবিধ মণি মাণিক্যাদিতে পরিপূর্ণ, যাঁহার অধিকার মধ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী আছেন, যিনি আপন অধিকার মধ্যে প্রজার ধনপ্রাণ ও মান রক্ষা জন্য সৈন্য সামন্তাদি পরিপূর্ণ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি কাম ক্রোধাদি রিপু পরতন্ত্র না হন এবং সর্ব্বদা প্রজারঞ্জন নিমিত্ত রত থাকেন, দুষ্টের দণ্ড বিধান ও শিষ্টের পালন করেন, তিনিই রাজা—তেমন লোক ব্যতীত কাহাকেও রাজা উপাধি দেওয়া যায় না। দণ্ডই সাক্ষাত রাজা।

নৃপতির প্রকৃতি এইপ্রকার। এক্ষণে তদীয় ব্যবহার, অমাত্য বর্গের কার্য্য, সুহৃৎ লক্ষণ, কোষাগারে অর্থ সঞ্চয়াদি, স্বরাজ্য পর রাজ্যের বার্ত্তা গ্রহণ এবং দুর্গ রক্ষণাদির বিষয় স্থলও প্রক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনাক্রমে যথাবথ স্থানে ক্রমে লিখিত হইবে।(২)

আর্য্যগণ মনে করিলেন মুনি দিগেরও মতি বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। বিষয়াশক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি ভ্রংশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজ্য পালন ভার কেবল রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে নানা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহাকে এককালে নিরঙ্কুশ না করিয়া অন্যদীয় সাহায্য সাপেক্ষে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করা মন্দ নয়। প্রজাবর্গ মধ্য হইতে এমন মনুষ্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক, যাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বলোকের ও রাজার

(২) সাম্যমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্রদুর্গ বলানিচ।

দণ্ডঃশাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ডএবাভিরক্ষতি॥
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥১৮
স রাজা পুরুষোদণ্ডঃ স নেতা শাসিতাচ স।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃস্মৃতঃ॥১৭
সমীক্ষ্য সধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥১৯

মনু—অ ৭

ভক্তি জন্মে; তাঁহাকেই রাজার সহায়স্বরূপ করিয়া দেওয়া উচিত। যেহেতুক ভক্তির পাত্র ব্যতীত কেহই সন্দেহ নিরাস জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে না।

এক্ষণে দেখা যাউক কাহার প্রতি সকলের ভক্তি জন্মে। প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা একপ্রকার উপলব্ধি হইবে যে, যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সদ্বংশপ্রসূত, বয়োবৃদ্ধ, ধার্ম্মিক নিস্পৃহ নির্লোভী, জিতেন্দ্রিয়, যিনি মন্ত্রণা গোপন রাখিতে সক্ষম, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, যিনি সমগ্রবেদত্রয় অভ্যাস করিয়াছেন, যিনি গুণের উৎসাহ দাতা, যিনি ক্ষমাশীল, সুচতুর, লোকব্যবহার ও বার্ত্তাশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি দোষের উচ্ছেদকর্ত্তা এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে একান্ত উৎসাহী তাঁহারই প্রতি সমস্ত লোকের ও রাজার আন্তরিক ভক্তি জন্মে। ভক্তিভাজন ব্যক্তিই নৃপতির মন্ত্রীর যোগ্য। এবং বিধ ব্যক্তির প্রতি মন্ত্রিত্ব ভার সমর্পণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। এমন ব্যক্তি সচরাচর কোন জাতির মধ্যে অধিক দেখা যায়? বিচার দ্বারা দেখা গেল ব্রাহ্মণ ব্যতীত একাধারে এত গুণ কোন জাতির নাই। সুতরাং বিপ্রজাতিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে সংস্থাপিত করা উচিত। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর অধিকাংশ আছে বটে, কিন্তু নিস্পৃহতা ও ক্ষমাগুণ না থাকাতে সে জাতীয় অমাত্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইত। বৈশ্য জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও ক্রমশঃ গুণের ভাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ তাহারা অর্থনিস্পৃহ নহে, প্রত্যুত কুসীদ ব্যবহার দ্বারা পাপসঞ্চয় করে; অতএব বৈশ্য মন্ত্রীকে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা বিধেয়। শাস্ত্রে অনধিকার প্রযুক্ত শূদ্রগণের মন নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়, তদ্ধেতু পাপাচরণে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই হেতুবশতঃ ক্ষমতাসত্ত্বেও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলেও তাহাদিগের প্রতি মন্ত্রণা অথবা বিচারের ভার কদাচ অর্পিত হইত না।(৩) শূদ্র জাতির প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা প্রদর্শনই আর্য্য

(৩) শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুংশক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥
৩১—অ ৭ মনু

সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেবচ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্র বিদর্হতি ॥১০০—অ ১২ মনু

শ্রুতাধ্যায়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রেচ যে সমাঃ ॥

ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

অমাত্যং মুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতং।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃকার্য্যেক্ষণে-নৃণাং ।।১৪১—অ ৮ মনু

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্ ।।৯২—অ ৬ মনু।

ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাম্ ক্ষমাবলং।২৭
মহাভারত আদিপর্ব্ব বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদ।

জাতির পতনের একতর কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়।

বিচারাসন ও মন্ত্রণার ভার সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বর্ত্তিল। বিপ্রজাতির অভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রতি, তদভাবে বৈশ্যজাতি অবধি নিয়ম বিধি হইল। কালক্রমে সগুণত্ব বিষয় লোপ পাইয়া জাতিবিষয় হইয়া গেল। তখন শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে নির্গুণ ব্রাহ্মণও জাতি মর্য্যাদায় পূজ্য থাকিলেন। তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। জাতি মর্য্যাদা বা বংশগৌরবে মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির নিয়ম কেবল যে ভারতবর্ষেই ছিল এমত নহে। কিয়ৎ পরিমাণে এ রীতি সর্ব্বদেশে ছিল, এবং সর্ব্বদেশে আছে। ইংলণ্ডের হৌস্ অব লর্ড্স্ ইহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। তবে নিয়মটি সগুণত্বের পরিবর্ত্তে জাতিমাত্র অবলম্বন করাতেই, দোষের কারণ হইল। ইংলণ্ডে সর্ব্বদা গুণবান্ ব্যক্তিগণ কমন্স শ্রেণি হইতে নীত হইয়া লর্ডস্ শ্রেণিভুক্ত হন, অর্থাৎ সে দেশে গুণশালী শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে। এরূপ নিয়মের অভাবে আসিয়ায় ভারতবর্ষ, ইউরোপে স্পার্টা রাজ্য অধঃপতিত হইল।

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। রাজা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন, তদীয় মন্ত্রণা অবহেলা করিয়া কদাচ স্বেচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন না। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।(৪) মন্ত্রীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার আধুনিক ইংলণ্ডের রাজ্য শাসনের নিয়ম। মন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না। অনেক যুদ্ধ, প্রাণিসংহার, রাজবিপ্লব, সমাজবিপ্লবের পর ইংলণ্ডীয়েরা এই তত্ত্বটি স্থির করিয়াছেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ, কেবল স্বীয় মানসিক শক্তির গুণে তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ বিধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন ও প্রজাপালন জন্য সাত অথবা আটটি মন্ত্রী রাখিবেন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিপুণ ও তত্ত্বজ্ঞ তদ্বিষয়ে অগ্রে তদীয় পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কর্ত্তব্য বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা সমুদায় অমাত্যকে একত্র সমবেত করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আত্মবুদ্ধি অনুসারে, যুক্তি অনুসারে ও শাস্ত্রানুসারে তদীয় মতের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয় মত সংস্থাপন করি-

---

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৬
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥৯৭—অ ১ মনু।

(৪) সর্ব্বেষান্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতাঃ।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্গুণ্য সংযুতং ॥৫৮ অ ৭ মনু

বেন।(৫) ইহাই ইংলণ্ডের কাবিনেটের দ্বারা রাজ্য শাসন প্রণালী। আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতির কোন কথা প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অবগত ছিলেন না?

কেহই যুক্তি বিহীন শাস্ত্রের নিয়মানুসারে শাসন কার্য্যে সমর্থ ছিলেন না। যুক্তিহীন বিষয়ে যে পাপ জন্মে উহা আর্য্যজাতির অন্তরে প্রথমেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে যে উত্তরকালে যুক্তির ধ্বংস হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নির্ণয় করা সামান্য ব্যাপার নহে। যে দিন হইতে আর্য্যজাতি যুক্তিমার্গ পরিভ্রষ্ট হইলেন সেইদিন অবধি ইহাদিগের পতনের সূত্রপাত ধরা যায়।

মন্ত্রিগণের কার্য্য বিভাগ।

দ্বিজাতি শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্রয় বিচারাসনের ভার গ্রহণ করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। রাজা যখন বিনীতবেশে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতে বসিতেন তৎকালে তাঁহারা সহায়তা করিতেন। তদনুসারে উক্ত দিবসে ঐ সকল অমাত্যকে সভ্যশব্দে নির্দ্দেশ করা রীতি ছিল। পাঠক, ইংলণ্ডীয় "প্রিবি কৌন্সলের" সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। রাজা যে দিন যে স্থলে স্বয়ং বিচার কার্য্য নিষ্পাদনে সমর্থ না হইতেন সেদিন তথায় প্রতিনিধি দিতেন। বিচারাসনে রাজার প্রতিনিধিকে প্রাড্‌বিবাক্ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। উপরি কথিত মন্ত্রিত্রয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আসনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রী। প্রাড্‌বিবাক্ আবার অন্য তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে একত্র সমাসীন হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বিচারকালে অন্যান্য সভ্যও উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালে কুল শীল সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ লোকবৃত্ত তত্ত্বজ্ঞ এবং বার্ত্তা শাস্ত্রদর্শী বণিক্ সভায় উপস্থিত থাকিতেন।[৬]

---

[৫] মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌবা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥৫৪—অ ৭ ঐ
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায় মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিত মাত্মনঃ॥ ৫৭—অ ৭
কেবলং ধর্ম্মমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥ বৃহস্পতি সংহিতা।
যুক্তিঃ ন্যায়ঃ সচ লোকব্যবহার ইতি ব্যবহার মাতৃকা।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধেতু যুক্তিযুক্তো বিধিঃস্মৃতঃ।
ব্যবহারোহি বলবান্ ধর্ম্মস্তেনাবহীয়তে॥ নারদ সংহিতা।
অবহীয়তে অবগম্যতে।

(৬) ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
মন্ত্রজ্ঞৈ র্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাং।১—অ ৮
যদা স্বয়ং নকুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্য দর্শনং।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে।৯—ঐ
সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।

বিচার কালে সভায় সমাসীন সভ্যবর্গের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন জন্য কুট প্রশ্নের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। সভ্যেরা অকুতোভয়ে যথাশাস্ত্র ও ন্যায্য কথা কহিতেন। রাজা ও বিচারক তদনুসারে কার্য্য করুন বা না করুন সভ্যেরা তদ্বিষয়ে দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম যুক্তি ও সত্য পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই পরামর্শ দিতেন। বিচারক ব্যতীত বিচারাসনের অন্য সহায়দিগকেও সভ্য শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। ইহাঁরাই এক্ষণকার জুরী Jury (৭)

সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য বিচারাসনে বসিতেন। কেহই একাকী বিচার করিতে অনুমত ছিলেন না। ইহারা প্রায়ই বিচারাসনে বসিতেন না। সভার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্যান্য অমাত্য ও সভ্য পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য করিতেন। সভ্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবলানুসারে বিচারাসনে বিচার ও নৃপতিকে বিচার মার্গে আনয়ন করিতেন তাঁহাদিগকেই ব্যবহারাজীব (উকীল) শব্দে নির্দ্দেশকরা যাইতে পারে।(৮)

দূতও মন্ত্রিপদ বাচ্য। তদীয় নিয়োগ গুণানুসারে হইত। সদ্বংশ সম্ভূত, সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রাহী, আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্যের হৃদ্গত ভাব ও কার্য্যের ফল অনুমানে সক্ষম, অন্তঃ শুদ্ধিঃ ও বহিশুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, বিনীত, কার্য্য কুশল, নানাভাষা ও কলার অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। দূতের অভিপ্রায় অনুসারে পররাজ্যের ভূপতির সঙ্গে সন্ধি বন্ধন, বিজেতব্য রাজাদির প্রতি পরাক্রমের উদ্যম ও যুদ্ধ যাত্রা হইত। তাহাতেই আত্মরাজ্যরক্ষা ও শত্রুগণের উপদ্রব নাশ হইয়া আসিত।

সেনাপতিও মন্ত্রিমধ্যে গণ্য। দণ্ডনীতি ও সৈন্য সামন্ত সমস্ত তাহারই আয়ত্ত। দণ্ডনীতি যাবৎ পৃথিবীমণ্ডলে বিরাজিত থাকিবে তাবৎকাল প্রজাগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিনয়াদি সদ্‌গুণ শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবে। দণ্ডনীতি অসৎপুরুষে রাখা বিগর্হিত। তদনুসারে

সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃস্থিত এব
বা ॥১০—ঐ

কুল শীল বয়োবৃত্ত বিত্তবদ্ভিরধিষ্ঠিতং।
বণিগ্‌ভিঃস্যাৎকতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং ॥
ব্যবহার তত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

(৭) সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থ
সহিতং বচঃ।
শৃণোতি যদিনো রাজা স্যাত্তসভ্যস্তদানৃণঃ ॥
ব্যবহারতত্ত্বধৃত কাত্যায়ন বচন।

(৮) যদাকার্য্যবশা দ্রাজানপশ্যেৎ
কার্য্যনির্ণয়ং।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগং ॥
যদি বিপ্রো নবিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ংতত্রযোজয়েৎ।
বৈশ্যম্বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥
কাত্যায়ন সংহিতা।

দণ্ডনীতির ভার সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়।(৯)

ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা ইহার অনুকরণ করিয়া দণ্ডনীতি ফৌজদারের হাতে রাখিয়াছিলেন। ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশকে "বিধিচ্যুত"—(Non regulation) বলা যায়, তাহাতে এ নিয়মের একটু ছায়া আছে।

ত্রিবেদবিৎ কুলপুরোহিতও নৃপতির সভায় অমাত্য মধ্যে গণ্য। বিচার দর্শন স্থলে তাঁহারও মত প্রবল বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি রাজার নিজকর্ত্তব্য বেদবিহিত যাবদীয় গৃহ্য কর্ম্ম সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন। গৃহ্য সূত্রানুসারী ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্ত উক্ত কুল পুরোহিতকে রাজা একবার মাত্র বরণ করিতেন। তাহাই তাঁহার পক্ষে চিরস্থায়ী বরণ স্বরূপ ধরা যাইত। (১০)

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য বিষয়ে যে ব্যক্তির পারগতা আছে তাঁহাকে তদ্বিষয়ের ভারাক্রান্ত ব্যক্তি বর্গের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তত্ত্বাবধারক দিগকে ও তত্তৎকার্য্যের অধ্যক্ষ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইত। যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের পারদর্শী ও পশুতত্ত্বজ্ঞ তিনি ভিষক্ বর্গের উপরি অধ্যক্ষতা করিতেন। তাঁহার পরামর্শ ক্রমে হস্তী, অশ্ব ও গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেনার চিকিৎসা হইত।

যিনি খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে সমর্থ ও আকরিক বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে পটু তদীয় পরামর্শ অনুসারে আকরিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। আকরিক কার্য্যে প্রেষ্যবর্গের প্রতি তাঁহারই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত। (১১) অন্তঃপুর রক্ষার ভারও মন্ত্রীর প্রতি অর্পিত হইত।

ইত্যাদি প্রকারে আধুনিক সভ্যতাভিমানী জাতি দিগের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যক্ষ বিনিয়োগ পুরঃসর

(৯) দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদং।
ইঙ্গিতাকার চেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতং॥ ৬৩—অ৭ মনু
অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষ রাষ্ট্রেচ দূতে সন্ধি বিপর্য্যয়ৌ॥ ৬৫ —অ৭ মনু

(১০) পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণুয়া দেবচর্ত্বিজং।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈতালিকানিচ॥ শ্লো—৭৮ অ—৭ মনু
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাত্তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যানি কুর্ব্বতাং॥ শ্লো ৮১—অ—৭—মনু—

(১১) মণি মুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্যচ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলং॥ ৩২৯—অ ৯ মনু
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ বস্থিতান্।
সম্যগর্থ সমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্॥ ৬০
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে
৬২—মনু—অ৭—

রাজা ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। প্রজাপালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম, তদনুসারে তিনি নিশার শেষ প্রহরে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন। শৌচ ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পরিশুদ্ধবেশে পরিশুদ্ধ স্থলে উপবিষ্ট হইয়া পর ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতেন। উক্ত কার্য্য করিতে করিতেই সূর্য্যোদয় হইত। দিনমনিরআগমনের প্রথমক্ষণেই আহ্নিকাদি সন্ধ্যা বন্দন ও গৃহোক্ত যাবদীয় দৈনিক ধর্ম্ম কার্য্যের পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক ত্রিবেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও উপদেশ গ্রহণ জন্য রাজ প্রাসাদ হইতে নির্গত হইতেন।

তাঁহাদিগের সকাশে ঋক্‌যজুঃ ও সাম এই বেদ ত্রয়ের শিক্ষনীয় বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ হইত। (১২)

তৎপরে দণ্ডনীতি ঘটিত কার্য্য কলাপের জটিলবিষয়ের সন্দেহ নিরাস নিমিত্ত বার্ত্তাশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞ মহাজন দিগের সমীপে উপস্থিত হইতেন। তথায় ক্ষণ কাল বিশ্রামানন্তর আন্বিক্ষিকী বিদ্যার অভ্যাসার্থ তদ্বিষয়ের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গগ্রহণ করিতেন। তদীয় সাহায্যে তর্ক বিদ্যা, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্ম তত্ত্ব নিরূপণ হইত। তদবসরে লোকবিত্ত পর্য্যালোচনায় ব্যাসক্ত হইয়া লোকাচার দর্শী বিপশ্চিত্তের সহিত সাক্ষাত করিতেন। তদনন্তর কৃষি, বাণিজ্য, পশু পালনাদি সাধারণ বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তত্তৎ বিষয়ে কৃষক বণিক্, ও পশু রক্ষকের মত পরিজ্ঞাত হইয়া বিনীত বেশে সভারোহণ করিতেন।

রাজসভায় ও বিচারগৃহে যেরূপে কার্য্য নির্ণয় হইত উহা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, রাজা স্বয়ং অথবা তদীয় প্রতিনিধি প্রাড্‌বিবাক ধর্ম্মাসনে বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক, অগ্রে বাদীর প্রার্থনা শ্রবণ করিতেন। অভিযোগ উত্থাপনের প্রাক্‌কালে বাদীকে সত্য শ্রাবণ করাণ হইত। মিথ্যাবাদ উত্থাপনে দণ্ড থাকা হেতু প্রায় কেহই মিথ্যাভিযোগ করিত না। বাদীর বাদ লিখন পূর্ব্বক প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে অগ্রে সত্য শ্রাবণ করিয়া বাদীর সম্মুখে সমস্ত অভিযোগের কারণ গুলি তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। ইহাতে যদি তত্ত্বনির্ণয় হইত তবে সাক্ষী গ্রহণ হইত না। অভিযোক্তা অথবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন সন্দেহের কারণ ঘটিত তবে সাক্ষ্য গ্রহণ হইত। সাক্ষীকেও সত্য

(১২) ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেত্তেষাঞ্চ-
শাসনে। ৩৭
ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ
শাশ্বতীং।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ-
লোকতঃ॥ ৪৩
উত্থায়পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃসমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎস শুভাং
সভাং॥ ১৪৫ মনু—৭ অ

শ্রাবণ হইত। সাক্ষীর বিষয় পৃথক্ স্থলে লিখিত হইবে; এখানে প্রক্রান্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা উচিত। বাদীর সাক্ষী কোন বিষয় অপলাপ করিলে প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ করা রীতি ছিল। উভয় পক্ষের সাক্ষীতে যদি সন্দেহের কোন কারণ থাকিত তবে সাক্ষিগণকে অগ্রে দণ্ড বিধান পূর্ব্বক অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবল বিবেচনা অনুসারে শাস্ত্র ও যুক্তি এবং উভয় পক্ষের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ পুরঃসর প্রামাণিক রূপে জয় পরাজয় নিরূপিত হইত। যিনি বিচার করিতেন তাঁহাকে প্রাড্‌বিবাক কহা যাইত। নিতান্ত পক্ষে, এক বিষয়ে এই কার্য্য বিধির আইন আধুনিক কার্য্যবিধির আইনের অপেক্ষা ভাল। অগ্রে মিথ্যা-বাদী সাক্ষির দণ্ড বিধান হইত। (১৩)

যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে ব্যক্তি জয় পত্র পাইত। জয়পত্রে বিচার ঘটিত সমস্ত বিষয়ই লিপিবদ্ধ হইত, কোন বিষয় পরিত্যক্ত হইত না।

ইহাতে অভিযোগের কথা, তাহার কারণ, বাদী প্রতি বাদীর নামাদি, উহাদিগের বাদ প্রতিবাদ, সাক্ষীর ও প্রতি সাক্ষীর নামগোত্রাদি, এবং তদীয় বচন প্রতি বচন, রাজা অথবা প্রাড়্‌বিবাকের প্রশ্ন ও বিচার, সভ্যগণের পরিপৃচ্ছা ও পরামর্শ, অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে কোন পক্ষে জয়, কি হেতু অন্যপক্ষে পরাজয়, কতিপয় মন্ত্রিসমবেত সভায় ও কাহার দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক বিচার কার্য্য সমাধা হইল কোন সময়ে অভিযোগের কারণ ঘটে, কোন সময়ে অভিযোগ উপস্থিত হয় এবং কোন সময়ে বিচার নিষ্পত্তি হইল ইত্যাদি তাবদ্বিষয় ঐ জয়পত্রে লিখিয়া দেওয়া বিচারাসনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। (১৪) তবে,

(১৩) ব্যবহারতত্ত্বধৃত বচন।
বৃহস্পতিঃ।
রাজা কার্য্যাণি সংপশ্যেৎ প্রাড্‌বিবাকো-
ঽথবা দ্বিজঃ।
প্রাড্‌বিবাকলক্ষণ মাহ।
বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপন্নং তথৈবচ।
প্রিয় পূর্ব্বং প্রাগ্‌বদতি প্রাড্‌বিবাকস্ততঃ-
স্মৃতঃ॥
তথা কাত্যায়নঃ।
ব্যবহারাশ্রিতং প্রশ্নং পৃচ্ছতি প্রাড়িতি
স্থিতিঃ।
বিবেচয়তি যস্তস্মিন প্রাড্‌বিবাকস্ততঃ
স্মৃতঃ।
সপ্রাড্‌বিবাকঃ সামাত্যঃ স ব্রাহ্মণ
পুরোহিতঃ।
স্বয়ং স রাজা চিন্তয়াত্তেষাং জয় পরাজয়ৌ॥

কুলশীলবয়োবৃত্ত বিত্তবদ্ভিরধিষ্ঠিতং।
বণিগ্‌ভিঃস্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈ
রধিষ্ঠিতং।

(১৪)
নির্ণয় ফলমাহ বৃহস্পতিঃ।
প্রতিজ্ঞা ভাবয়েদ্বাদী প্রাড়্‌বিবাকাদি
পূজনাৎ।
জয়পত্রস্যচাদানাৎ জয়ীলোকেনিগদ্যতে॥
জয়পত্রস্য লিখনপ্রকারমাহ সএব।
যদ্বৃত্তং ব্যবহারেষু পূর্ব্বপক্ষোত্তরাদিকং।
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রোঽখিলং
লিখেৎ॥

ইংরেজের, বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে এত বড়াই কিসের জন্য, তাহা বুঝিতে পারিনা। প্রাচীন ফয়শালা, আধুনিক ফয়শালা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াযুক্তং নির্ণয়ান্তং যদানৃপঃ।
প্রদদ্যাজ্জয়িনে পত্রং জয়পত্রং তদুচ্যতে ॥
তথা কাত্যায়নঃ।
অর্থি প্রত্যার্থি বাক্যানি প্রতিসাক্ষি বচস্তথা।
নির্ণয়স্তু তথাতস্তু যথাচার ধৃতং স্বয়ং।
এতদ্বথাক্ষরং লেখ্যং যথা পূর্ব্বম্ নিবেশয়েৎ ॥
সভাসদশ্চ যে তত্র ধর্ম্মশাস্ত্রবিদস্তথা ॥

শ্রীহর্ষ।

সংস্কৃত চিত্রশালিকার দুইখানি মহামূল্য চিত্র শ্রীহর্ষ নামাঙ্কিত, রত্নাবলী ও নৈষধ। রত্নাবলী অবলা, সরলা, কোমলাঙ্গী অঙ্গনা; অলঙ্কার বাহুল্য বিনাও দেখিতে সুন্দরী। নৈষধ তেজস্বী, চিন্তাশীল, দৃঢ়কায় বীর পুরুষ; দেবোপম স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সত্বেও বিবিধ অলৌকিক সজ্জায় সজ্জিত। দেখিলে কোন ক্রমেই দুইটী এক হস্তের চিত্রিত বলিয়া বোধ হয় না। লোকেরও বিশ্বাস এই প্রকার যে দুখানি দুজন চিত্রকরের রচিত। তাঁহারা কে, এবং কোন্ সময়ে কোথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু সমাজে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন একবার বঙ্গদর্শনে এতৎপ্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা; এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর আইসে, তাহাতে বোধ হয় যে এই দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে, এবং কোনটির পক্ষেই কোন প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। এজন্য যাহা কিছু আমার বক্তব্য আছে, সত্যানুরোধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হয় ত আমারও ভুল হইবে; কিন্তু বারম্বার কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, সত্যের পথ যে পরিষ্কার হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে আমাদিগের পদস্খলন হইবে, বিচিত্র নহে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। অন্ধকারে অনুমানরূপ লোষ্ট্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক পদার্থ পরিচয় করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। ইতিহাস ও জীবনচরিত পাওয়া

যায় না বলিলেই চলে। বোধ হয় যেন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে ভাল বাসিতেন না। হয়ত প্রকৃতি পুস্তক পাঠে এবং ঐশ্বরিক চিন্তায় তাঁহারা এমন নিমগ্নচিত্ত ছিলেন, যে নশ্বর মানব-জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তাঁহাদিগের প্রায়ই প্রবৃত্তি হইত না। যেখানে বৌদ্ধ-দেবের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া মনুষ্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই পর্ব্বত-পরিবৃত কাশ্মীর ও সাগর বেষ্টিত সিংহলের ইতিহাস আছে; তৎ-সাহায্যে, এবং প্রাচীন মুদ্রা, অনুশাসন পত্র, ক্ষোদিত প্রস্তর, বা সাহিত্য দর্শনাদি গ্রন্থান্তর্গত উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা, এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ উইলসন্ সাহেব উদ্ভাবন করেন। রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষনামক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে; কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার, একথার বিন্দু-বিসর্গও নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে, যে "তিনি অশেষ দেশভাষাজ্ঞ, সর্ব্বভাষায় সৎকবি, সর্ব্ব বিদ্যানিধি বলিয়া দেশান্তরেও খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

"সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু
সৎকবিঃ।
কৃৎস্ন বিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরে-
ষপি॥"

৬১১ শ্লোক। ৭ম তরঙ্গ। রাজতরঙ্গিণী।

কেবল এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবকে রত্নাবলী রচয়িতা বলা কতদূর সঙ্গত, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার নহেন, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক গ্রন্থ মালবাধিরাজ ভোজদেবের কৃত। উক্ত গ্রন্থে রত্নাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী দৃষ্টে বোধ হয় যে ভোজরাজ হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সপ্তম তরঙ্গের ১৯০ শ্লোকে অনন্তদেবের ইতিবৃত্ত বর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে, যে

"মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈঃ রত্ন-
সঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ড যোজনং কটকে-
শ্বরে॥"

যে গ্রন্থ পিতামহের সমকালীন লোকে উদ্ধৃত করিয়াছে, সে গ্রন্থ পৌত্রের লিখিত হওয়া অতীব অসম্ভব।*

আবার দেখা যাইতেছে যে ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় দশরূপ নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় মুঞ্জরাজের সভাসদ্ ছিলেন।

"বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্বন্মনোরাগ নিবন্ধ হেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশ গোষ্ঠী
বৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপ মেতৎ॥"

* See the preface to Kavya Prakasa by Pandit Mahes Chandra Nyayaratna.

মুঞ্জ ভোজ দেবের পূর্ব্বে মালবাধিপতি ছিলেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের গণনানুসারে ভোজদেব খ্রীষ্টীয় ১০৪২ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।* একখানি অনুশাসন পত্রের লিখনানুসারে নির্ণীত হয় যে ভোজরাজের পৌত্র এবং উদয়াদিত্যের পুত্র লক্ষ্মীধর ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে ছিলেন।† সুতরাং ভোজের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব বোধ হয় এ কথা নির্ব্বিবাদে বলা যায় যে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রত্নাবলী রচিত হইয়াছিল।

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায় উইলসন্ সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যশাসন করেন।" হর্ষদেব যদি ভোজরাজের পৌত্রদিগের সমকালীন লোক হন, তাঁহার রাজত্বকাল ঐরূপ সময়ে হইবারই সম্ভাবনা, এবং তিনি কোন ক্রমেই রত্নাবলীরচয়িতা হইতে পারেন না।

এক্ষণে দেখা যাউক অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্নাবলী আরোপ করা যায় কি না। রত্নাবলী ও "নাগানন্দ" এই দুই খানি সংস্কৃত নাটক রাজা শ্রীহর্ষদেবের রচিত বলিয়া উভয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধরের উক্তি উভয় গ্রন্থের প্রায় একই প্রকার। নান্দীতে দেখা যায় যে রত্নাবলীতে হরপার্ব্বতীকে, এবং নাগানন্দে বৌদ্ধদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যে রাজার নামে গ্রন্থদ্বয় পরিচিত, তিনি এক সময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষদেব বা হর্ষবর্দ্ধন, যিনি একটী অব্দ সংস্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা একপ্রকার বলা যাইতে পারে। যখন কাদম্বরীকার বাণভট্ট "হর্ষচরিত" নামে তদীয় জীবন চরিত রচনা করেন, তখন বোধ হয় তিনি হিন্দু ছিলেন; নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাঁহাকে বাড়াইতে যাইবে কেন?† যখন চীনদেশীয় পর্য্যটক্ হয়েন্থ সাঙ্ এতদ্দেশ ভ্রমণে আগমন করিয়া তাঁহাকে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।‡ আমাদিগের অনুমান যদি সমূলক হয়,

* See Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol. II. p. 462-3

† I bid p. 303

† হর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে হর্ষদেব যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের আদিপুরুষ পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। শ্রীহর্ষের পিতা প্রতাপ শীল বা প্রভাকর বর্দ্ধন সৌর মতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীহর্ষ ও তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন ভণ্ডী নামক এক ব্যক্তির নিকটে শিক্ষিত হয়েন। রাজ্যশ্রী নাম্নী ভগিনীর উদ্দেশে বিন্ধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া হর্ষদেব দিবাকর মিত্র নামক এক জন বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দিবাকর মিত্র প্রথমে হিন্দু ছিলেন।

‡ খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দ।

তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে কেন "হর্ষচরিতের" পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তর্গত একটি শ্লোকের সহিত রত্নাবলীর সূত্রধর মুখবিনির্গত একটী শ্লোকের কথায় কথায় মিল আছে।* মধুসূদন "ভাববোধিনী" নাম্নী ময়ূরাষ্টকের টীকায় লিখিয়াছেন যে বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা। মধুসূদনের গ্রন্থ সংবৎ ১৭১১ অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, লিখিত। সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থন চেষ্টা পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে এতদ্দেশের পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য ছিল, এরূপ বোধ হয়।

শ্রীহর্ষ একজন দিগ্‌বিজয়ী রাজা। তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজ্য বিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখকদিগকে প্রচুর অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কাব্য প্রকাশকার লিখিয়াছেন,

"শ্রীহর্ষাদে র্ধাবকাদীনামিব ধনম্।"

শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবক প্রভৃতির ধন প্রাপ্তি হইয়াছিল।

প্রকাশাদর্শে মহেশ্বর বলেন,

"শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহু ধনং লব্ধং।"

কাব্যপ্রকাশের টীকায় বৈদ্যনাথ লিখিয়াছেন,

"শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞোনাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্য কবি র্বহুধনং লভেদিতি প্রসিদ্ধং।"

অন্যান্য সংস্কৃত লেখকও এইরূপ কথা কহিয়াছেন। ঈদৃশ চিরাগত প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে,

"প্রথিত যশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি পুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।"

প্রথিতযশা ধাবক সৌমিল্ল কবিপুত্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের কৃত গ্রন্থের কেন বহুমান করিতেছ।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ধাবক একজন প্রসিদ্ধ নাটকলেখক। কিন্তু তাঁহার কৃত কোন নাটক পাওয়া যায় না; কেবল এইমাত্র প্রবাদ আছে যে তিনি রত্নাবলীরচক। বোধ হয় মালবিকাগ্নিমিত্রকার এই প্রবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপরি উদ্ধৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে ধাবক যখন কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, তখন তিনি কি প্রকারে

* শ্লোকটী এই, দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধে র্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমত মভিমুখীভূতঃ॥
হয়ত সভাপণ্ডিত বাণভট্ট রত্নাবলীর এই শ্লোকটী রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষের সমকালীন হইবেন? কালিদাস হয়ত খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, নতুবা তিনি মাতৃগুপ্ত হইলেও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কিন্তু চীনপর্য্যটক বর্ণিত শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রাজা। ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"ভোজ প্রবন্ধ" পাঠে জানা যায় যে ভোজরাজের সভায় একজন কবি কালিদাস ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই "মালবিকাগ্নিমিত্র" লেখক। রচনা প্রণালী ও কবিত্বের বিচার করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় না যে, যে রসময়ী লেখনী হইতে শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মেঘদূত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব বিনির্গত হইয়াছে. সেই লেখনীই আবার মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রসূতি। ভাষাও কল্পনা সম্বন্ধে যেমন, তেমনই আন্তরিক মহত্ত্ব সম্বন্ধেও মালবিকাগ্নি মিত্রকার রঘুবংশকার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। মালবিকাগ্নি মিত্রকার অহঙ্কারের অবতার, রঘুবংশকার মূর্ত্তিমান্ বিনয়। যে কালিদাস মহাকাব্য শিরোভূষণ রঘুবংশ লিখিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণের গুণে মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন,

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্বচাল্প বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিববামনঃ॥
অথবা কৃত বাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"*

সেই কালিদাস কি ধাবক সৌমিল্ল প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় সামান্য গ্রন্থ লিখিতে গিয়া বলিতে পারেন,

"পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়াপরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"†

যদি মালবিকাগ্নিমিত্রকার কালিদাস ভোজরাজের সভাসদ্ হন, তাহা হইলে তিনি যে রত্নবলীকার ধাবককে প্রাচীন কবি বলিয়া উল্লেখ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে

* কোথায় বা সূর্য্য প্রভব বংশ, ও অল্প বিষয়মতি আমিই বা কোথায়। আমি মোহ বশতঃ ভেলায় চড়িয়া দুস্তর সাগর পার হইতে যাইতেছি। উন্নতকায় ব্যক্তি সুলভ ফল বাসনায় বামনের ন্যায় মূঢ়তাবশতঃ কবিযশঃ প্রার্থী হইয়া আমি উপহাসাস্পদ হইব। অথবা বজ্রকৃত ছিদ্রপথে মণিমধ্যে যেমন সূত্র প্রবেশ করে, তদ্রূপ পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কৃত বাক্যদ্বার দিয়া আমি এই বংশে প্রবেশ করিব।

† পুরাতন সকলই ভাল নয়, নূতন কাব্য সকলই নিন্দনীয় নয়; সাধুগণ পরীক্ষা করিয়াই দুইটীর মধ্যে একটীর প্রতি ভক্তি দেখান; মূঢ়েরাই পরের বুদ্ধি দ্বারা নীত হয়।

ভোজরাজ স্বয়ং "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে" রত্নাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। হর্ষদেব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন্থসাঙ্ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় ৬০৮ হইতে ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। ধাবক শ্রীহর্ষের সময়ে, সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রকারের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, বিদ্যমান ছিলেন।

রত্নাবলীকার শ্রীহর্ষের বিষয়ে যাহা যাহা আমার বক্তব্য ছিল, একপ্রকার বলা হইল। এক্ষণে নৈষধকার শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

নৈষধচরিতে শ্রীহর্ষ আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর, মাতার নাম মামল্ল দেবী; তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে তাম্বুলদ্বয় ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;* এবং তিনি "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন।† এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি "অর্ণববর্ণনকাব্য," "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য," "নবসাহসাঙ্ক চরিত" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।‡ সুতরাং এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে তিনি কান্যকুব্জ নগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গৌড় দেশে আসিয়াছিলেন ও মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়াছিলেন; নতুবা কান্যকুব্জে বসিয়া গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত বা সমুদ্র বর্ণনা লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে একজনের নাম শ্রীহর্ষ ছিল। কুলাচার্য্যেরা বলেন,

ভট্টনারায়নোদক্ষোবেদগর্ভোহথ চান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃকবিঃ।
দক্ষোহথ কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোহথ
ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোহথসাবর্ণো যথাবেদ ইতি স্মৃতঃ॥
বিদ্যাসাগরোদ্ধৃত কুলাচার্য্য বচন।

* "তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। ২২শ সর্গ

† শ্রীহর্ষং কবিরাজ রাজিমুকুটালঙ্কার হীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয় চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি ভণিতি ভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গোহগমৎ সপ্তমঃ॥

‡ সংদৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরং সীন্মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৯ম।
দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূকৃতো হয়ং মহা
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ২২শ।
ষষ্ঠঃ খণ্ডন খণ্ডতোহপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমে তন্মহা
কাব্যেহয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৬।

বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথমপুস্তক। ১৬ পৃষ্ঠা।

সুতরাং শ্রীহর্ষ কাশ্যপ গোত্রজ চট্টোপাধ্যায় কুলের পূর্ব্ব পুরুষ নহেন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় দিগের পূর্ব্ব পুরুষ।† যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আদিশূর এদেশে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত; এবং তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক বীররসপ্রধান নাটকের রচয়িতা। হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ ও যে নৈষধকার হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। তিনি একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া কান্যকুব্জে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন! তিনি তদনন্তর গৌড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব। সুতরাং নৈষধ লেখকের কয়েকটী পরিচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয় ভরদ্বাজ কুলপিতা শ্রীহর্ষে আছে।

শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, এরূপ প্রবাদ অনেক কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার আদি কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় যে পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ লিখেন,* তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত আছে,

"গৌড়দেশে শ্রীহর্ষ নামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নলচরিত্র নামে কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কারযুক্ত এইপ্রকার যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয়। তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্ত হয়। অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে। যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে

† আমরা জানি এ ভুল রামদাস বাবুর দোষে ঘটে নাই। তিনি কোন বন্ধুবাক্যে নির্ভর করিয়া এ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।—বং সম্পাদক।

* বাসবদত্তার প্রস্তাবনায় ডাক্তার হল সাহেব বিদ্যাপতি ঠাকুর কৃত পুরুষপরীক্ষান্তর্গত দানবীর বড়াহের উপাখ্যান হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"বিপ্রৈঃ সন্তুষ্টচিত্তৈঃ প্রমুদিত হৃদয়ৈর্বন্দিভির্লব্ধ কামৈ
র্ভৃত্যৈঃ সিদ্ধাভিলাষৈ র্দিগবনিপতিভির্বশ্যতা মাশ্রয়দ্ভিঃ।
বিদ্বৎ সার্থৈঃ প্রহৃষ্টৈ র্দিশিদিশি সুভটৈঃ কাঞ্চনাভার্চ্চামানৈ
র্নিত্যং সংস্তূয়মান সজয়তি নৃপতির্দান বীরো বড়াহঃ॥"

বাঙ্গালা পুরুষ পরীক্ষায় এই শ্লোকের পশ্চাদুদ্ধৃত অনুবাদ দৃষ্ট হয়:—"সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ সমূহ এবং প্রফুল্লচিত্ত বন্দিগণ আর অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত দাসবর্গও স্ববশীভূত চতুর্দ্দিগস্থ মহীপাল সকল এবং ধনপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তম ভট্টগণ এই সকল মনুষ্য কর্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াহ তিনি জয়যুক্ত হউন,

বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা শ্রী হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষগণের নিয়োগানুসারে প্রণীত হইয়া ১৮১৫ শালে প্রচারিত হয় (Vide p 189 Vol. XIII. Calcutta Review.

কবির কি ফল? পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারানসী গেলেন। সেখানে গিয়া কক্কোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। মেধাবী কথা, পুরুষপরীক্ষা।

চৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানা যায় যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িতে চৈতন্যদেব ভাল বাসিতেন। সুতরাং বিদ্যাপতি চৈতন্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। অতএব শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, একথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক যে শ্রীহর্ষকে আদিশূরের সমকালীন লেখক বলিলে কোন প্রকার অসঙ্গতি দোষ ঘটে কি না। বাখরগঞ্জে একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে মাধব সেন ও কেশব সেন লক্ষণ সেনের পুত্র, লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন, বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন, এবং সেন রাজবংশের আদিপুরুষ বীর সেন। মালদহের নিকটস্থ দেপাড়ায় প্রাপ্ত এক খণ্ড ক্ষোদিত প্রস্তর ফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পিতা সামন্ত সেন, এবং সামন্ত সেনের পিতা বীর সেন। বঙ্গ বিজয়ের অত্যল্পকাল পরে মিনহাজুদ্দিন নামক মুসলমান ইতিহাস লেখক লিখেন যে বঙ্গের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্য্যন্তই রাজা এবং আশিবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয় ১২০৩ খৃঃঅব্দে ঘটে। সুতরাং লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যারম্ভ ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। লাক্ষ্মণেয় যদি লক্ষণ সেনের পৌত্র হন, এবং বীর সেনের অপর নাম বংশের আদি বলিয়া যদি আদিবীর বা আদিশূর হয়, তাহা হইলে লাক্ষ্মণেয়ের পূর্ব্বে সেন বংশীয় ৮ জন রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের রাজত্ব কাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ভূয়োদর্শনানুরূপ গণনানুসারে গড়ে ১৬ বৎসর করিয়া ধরিলে, আদিশূরের রাজ্যারম্ভ ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং নৈষধ চরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ, আদিশূরের সমকালীন লোক হইলে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, বলা যাইতে পারে।*

ভোজরাজকৃত সরস্বতী কণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজের সময় ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তৎপূর্ব্বে নৈষধ চরিত রচিত হইয়াছে, জানা যাইতেছে। ইহাতে শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে আমাদিগের মতেরই সমর্থন হইতেছে।

* নৈষধকার শ্রীহর্ষ যে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মতের উদ্ভাবন করেন। See Babu Rajendra Lala's paper on Mahendra Pala in the Journal of the Asiatic Society of Bengal.

পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে শ্রীহর্ষের লিখিত একখানি গ্রন্থের নাম "নবসাহসাঙ্ক চরিত," অর্থাৎ নূতন সাহসাঙ্ক রাজার জীবন চরিত। চীনপর্য্যটক হুয়েন্থসঙের লেখায় এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায়; তিনি সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বোধ হয় সেই প্রাচীন সাহসাঙ্ক হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের নাম নবসাহসাঙ্ক চরিত করিয়াছিলেন। মহেশ্বর কৃত "বিশ্বপ্রকাশ" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে সাহসাঙ্ক নামক একজন রাজা গাধিপুরে অর্থাৎ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বপ্রকাশ ১০৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার আপনার পরিচয় সূত্রে লিখিয়াছেন যে গাধিপুরস্থ সাহসাঙ্ক রাজার সভাবৈদ্য হইতে তিনি ছয় পুরুষ অন্তর।* যদি সাহসাঙ্ক দশম শতাব্দীর কান্যকুব্জের রাজা হন, তদীয় চরিত বঙ্গীয় শ্রীহর্ষ লিখিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে শ্রীহর্ষ "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি," "নব সাহসাঙ্ক চরিত" প্রভৃতি যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কোনটীই পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, সর্ব্ব সাধারণে এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ আদর করিত না। যে রাজ বংশের গুণ বর্ণনা এই সকল গ্রন্থে থাকিত, সেই রাজারাই আগ্রহ করিয়া গ্রন্থ গুলি রাখিতেন। পরে যখন মুসল্‌মানেরা আসিয়া রাজ্য গুলি ধ্বংস করিয়াছে, তখন উক্ত পুস্তক গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুমান হয় যে যাহা কিছু ইতিহাস গ্রন্থ আমাদিগের ছিল, এইরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি অনেক লোকের ঐতিহাসিক রচনার প্রতি অনুরাগ থাকিত, বা যদি কেহ মিথ্যাকল্পনাশূন্য সর্ব্বলোকহৃদয়রঞ্জন ইতিহাস লিখিতে পারিত, তাহা হইলে ঈদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু দেশীয় লোকের অননুরাগ বা উপেক্ষায় এবং বিদেশীয় বিজেতৃগণের বিদ্বেষে আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

চাঁদ কবি নৈষধকার শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। চারিজন প্রাচীন কবির নাম করিয়া পরে লিখিয়াছেন,

নর রূপং পচম্ম শ্রীহর্ষসারং
নলৈরায়কণ্ঠ দিলৈ হৃদ্যাহারং।

পঞ্চম, নরের প্রধান, সার কবি শ্রীহর্ষ, যিনি নলরাজার কণ্ঠে হৃদ্যহার দিয়াছেন।

চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ

* "A prince named Sahasanka must have occupied the throne [of Kanouj] about the middle of the 10th century as Maheswara the author of Viswaprakasa in the year 1111, makes himself sixth in descent from the physician of that monarch" p. 463, Vol. XV. Asiatic Researches.

ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং চাঁদ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। তিনি যে শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিবেন, আশ্চর্য্য নহে।

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন,

"সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজ শেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবন্ধকোষ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীর পুত্র শ্রীহর্ষদেব বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দ চন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্ত চন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র, পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইহার বংশ এককালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব কহেন, এই জয়ন্তচন্দ্র কাষ্ঠ কূট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেননা, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।"

আমাদিগের বিবেচনায় রামদাস বাবু এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নৈষধ "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং উহা ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। রাজা জয়চন্দ্র ঐ সময়ের শতাধিক বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। তিন চারিশত বৎসর পরে যদি কেহ কল্পনা অবলম্বন করিয়া কোন গ্রন্থকারের জীবন চরিত লিখিতে যায়, সে গ্রন্থোক্ত পরিচয়গুলি ঠিক রাখিলেই প্রামাণিক বিবরণ লিখিয়াছে, বলা যাইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে অন্য রূপ প্রমাণ চাই। বিশেষতঃ রামদাস বাবু যখন শ্রীহর্ষকে আদিশূরের আহূত পঞ্চব্রাহ্মণের এক জন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তখন তাহাকে জয়চন্দ্রের সমকালবর্ত্তী কি প্রকারে বলিতে পারেন? জয়চন্দ্রের সময় ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। মুসলমান দিগের কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ৩৫ বৎসরের মধ্যে কি সমুদায় সেন বংশের রাজত্ব শেষ হইল? প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসকারদিগের মতে তখন ত বঙ্গে লাক্ষণেয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নৈষধকার শ্রীহর্ষ "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি নৈয়ায়িকমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাতে বৃহস্পতি কৃত লোকায়ত সূত্র, বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মত, এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত বাদরায়ণীয় সূত্রের ভাষ্যের, উল্লেখ আছে; যথা,

"সোঽয়ং অপূর্ব্বঃ প্রমাণাদি সত্বানভ্যুপগমাত্মা বাক্‌স্তম্ভন মন্ত্রো ভবতাভ্যু-

হিতো নূনং যস্য প্রভাবাৎ ভগবতা সুরগুরুণা লোকায়ত সূত্রাণি ন প্রণীতানি তথাগতেন বা মধ্যমাগমা নোপদিষ্টা ভগবৎপাদেনচ বাদরায়ণীয়েষু সূত্রেষু ভাষ্যং ন ভাষে।”

কোন্ সময়ে লোকায়ত সূত্র লিখিত বা মাধ্যমিকমত প্রচারিত হয়, বলা যায় না। বাণকৃত হর্ষচরিতে লোকায়তিক সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়। বাণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির লোক। কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ও মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে লোকায়তবাদ লক্ষিত হয়। সুতরাং লোকায়ত মতের উল্লেখ দেখিয়া খণ্ডন লেখকের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন রূপ অনুমানই করা যায় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান এতদ্দেশে ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মতের উৎপত্তি কোন সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতএব ইহা হইতে ও শ্রীহর্ষের কাল নিরূপণ চেষ্টা বিফল হইতেছে।

সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বা শেষে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন।* সুতরাং যে খণ্ডনকার তৎকৃত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তী দশম শতাব্দীর শেষভাগের বা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। যাহাহউক, তিনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক নহেন, ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

খণ্ডন খণ্ডখাদ্যের অন্য এক স্থল লইয়া শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলা যাইতে পারে।

“ তস্মাদস্মাভিরপ্যস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পটা।
ত্বদ্গাথৈবান্যথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি॥”

অর্থাৎ “ এ নিমিত্ত কয়েকটি অক্ষরের অন্যথা করিয়া এই অর্থে তোমারই গাথা অবলম্বন করা আমার অসাধ্য নহে” এই বলিয়া খণ্ডনকার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি লিখিয়াছেন,

“ ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাং।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কাতর্কশঙ্কাবধিঃ কুতঃ॥”

উদয়নাচার্য্য কৃত কুসুমাঞ্জলীকারিকায় ইহার প্রতিরূপ একটি শ্লোক দেখা যায়, যথা

“ শঙ্কাচেৎ অনুমাস্ত্যেব নচেৎ শঙ্কা ততস্তরাং।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কাতর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ॥”

এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক শ্লোক লিপি বদ্ধ না হইয়া বহুকাল মুখে মুখে চলিয়া আইসে। সুতরাং একথা

* See Colebrooke's E says, Vol. I p.332, Also Colebrooke's Preface to his translation of the Dayabhaga, উইলসন্ সাহেবের ও এই মত। See Wilson's Preface to his Sanscrit Dictionary, p. XVII, and his Essays on the Religion of the Hindoos Vol. 1, p. 201.

বলা যাইতে পারে না যে কুসুমাঞ্জলী-কারিকার এই শ্লোকটি উদয়নের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, যদি ইহা সম্পূর্ণরূপেই উদয়নাচার্য্যের রচিত হয়, তাহা হইলে এইমাত্র জানা যাইতেছে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পরবর্ত্তী। কিন্তু উদয়ন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা কঠিন।

মহোদয় কাওয়েল সাহেব স্বকৃত কুসুমাঞ্জলী প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্কর ভাষ্যের "ভামতি" নাম্নী টীকা লিখেন, উদয়ন বাচস্পতি মিশ্র কৃত "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকার"* পরিশুদ্ধি জন্য "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" রচনা করেন, এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বারম্বার উদয়নের কুসুমাঞ্জলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক, মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের। সুতরাং কাওয়েল সাহেব বলেন, আমরা অনেক ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া স্থির করিতে পারি যে বাচস্পতি মিশ্র খৃঃ দশম শতাব্দীতে, এবং উদয়নাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখি নাই যে "কুসুমাঞ্জলী" যে উদয়নের লিখিত, "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" ও সেই উদয়নের রচিত। দ্বিতীয়তঃ যদি "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি" কুসুমাঞ্জলীকার কর্ত্তৃক বাচস্পতি মিশ্র কৃত "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকার" পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে উভয়ে শঙ্করাচার্য্যের পরে নবম ও দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতি মিশ্রকৃত "খণ্ডনোদ্ধার" নামক একখানি পুস্তক দেখিয়াছি। ইহাতে শ্রীহর্ষের খণ্ডন খণ্ডখাদ্যের আপত্তি মীমাংসা চেষ্টা আছে। যদি এই বাচস্পতি মিশ্র "ভামতি" কার হন, তিনি উদয়নের পরবর্ত্তী হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি "ভামতি" কার কি না, তাহার প্রমাণ নাই। চতুর্থতঃ মাধবাচার্য্য স্বকৃত "শঙ্কর দিগ্বিজয়" নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষকে সমসাময়িক লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ ও তৎপরাজয়াসমর্থ উদয়ন শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাভূত হন।* গ্রন্থের অপর স্থলে সুরেশ্বরাচার্য্যকে শঙ্কর বলিতেছেন,

"বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াং
ভাব্য বিধাস্যসিতমাং মমভাষ্য টীকাং।"†

* "ভামতি" ও "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা" উভয়ই যে বাচস্পতি মিশ্রের লিখিত, ইহা তৎকৃত স্বরচিত গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্টে জানা যায়; See Dr. Hall's Catalogue P. 87

* ১৫ শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়" ১৫৭। শ্লো

† ১৩ শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়" ৭৩। শ্লো

অর্থাৎ

"বাচস্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বসুন্ধরায় জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং আমার ভাষ্যের টীকা বিধান করিবে।"

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষকে শঙ্করের ন্যায় প্রাচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচস্পতি মিশ্রকে তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন। পঞ্চমতঃ, যখন সরস্বতী কণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন জানা যাইতেছে যে ভোজরাজের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং যদি কুসুমাঞ্জলীকার শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হন, তাহা হইলে এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নতুবা কল্পনা অবলম্বন করিয়া, উদয়নকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া, শ্রীহর্ষকে তৎপরবর্ত্তী সাময়িক বলা বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হয় না। ষষ্ঠতঃ, যদি এমন কোন অকাট্য প্রমাণই পাওয়া যায় যে উদয়নাচার্য্য বাস্তবিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা হইলে সরস্বতী কণ্ঠাভরণের বলে বলিতে হইবে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কুসুমাঞ্জলী কারিকার যে শ্লোকের সহিত খণ্ডন খণ্ডখাদ্যোদ্ধৃত শ্লোকের সাদৃশ্য আছে, সে শ্লোক কারিকা লিখনের পূর্ব্বে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

শ্রী রাজ।

চন্দ্রশেখর।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপ কি করিলেন।

প্রতাপ জমীদার, এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র; এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া বোধ হয় কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না, কেন না অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশ মর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশ মর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মান্ বা

স্কন্দেনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তর গোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুইএক বাঙ্গালি জমীদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশ মর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য, বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না, এমন কি দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্র প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া, চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই! শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গা সন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন, যে ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য, কেননা ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গের ফিরিয়া গেলেন। প্রথম চন্দ্রশেখরের সন্ধান করিলেন, তাঁহার সন্ধানার্থ রমানন্দস্বামীর আশ্রমে গেলেন। শুনিলেন, চন্দ্রশেখর শৈবলনী পুনঃ প্রাপ্তির পরদিন সেখানে গিয়াছিলেন, আর যান নাই। আরও শুনিলেন যে রমানন্দ স্বামীও সেই দিন আশ্রমত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন কেহ জানেনা।

প্রতাপ, মুঙ্গেরে রমানন্দ বা চন্দ্রশেখর কাহারও উদ্দেশ পাইলেন না; দুর্গ মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তার পর মনে ভাবিলেন, যাহার যে মন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য, এ কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠ বিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তার পর মনে ভবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তার পর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেই খানে রশদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেই খানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত্দূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, "আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ এইরূপ অনিষ্ট আর২ লোকেরও করিয়াছে ও করিতেপারে; পঞ্চম নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই এক খানা বড় বড় পরগনা পাইতে পারিব।

অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোষামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে

আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইল, কিন্তু বলিল, যে "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন মুখে না বলিব।"

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর, পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট হইল যে মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবদীয় দস্যুও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতছে।

শুনিয়া গুরগণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন। জগৎ শেঠের সঙ্গে প্রতাপসম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত করিয়াছি।

জগৎ শেঠ স্বীকৃত হইলেন, যে প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহারা দিবেন। প্রতাপকে অর্থের প্রলোভন দেখানই গুরগণ খাঁর কর্ত্তব্য বোধ হইল। তিনি সাক্ষাতের মানস জানাইয়া প্রতাপের নিকট বিশ্বাসী দূত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ পুনর্ব্বার, অশ্বপৃষ্ঠে মুঙ্গের চলিলেন।

গুরগণ খাঁর সহিত প্রতাপের সাক্ষাতে কি ফল ফলিল, তাহা পশ্চাৎ বলিব। শৈবলিনী ও দলনীকে বিষম সঙ্কটে রাখিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদিগের কি ঘটিল, তাহা এক্ষণে বলিব।

এয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

শৈবলিনী কি করিল।

মহান্ধকারময় পর্ব্বত গুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া—শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহা মধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনি অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্র পথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহা তলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব মনুষ্য কি পশু কেজানে?—সেই গুহা মধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেননা জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল,

যে আশা হৃদয় মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে, লালিত করিয়াছিল, সেই দিন, বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণ শ্রান্তি; বাত্যা বৃষ্টি জনিত পীড়া ভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানব চিত্তবৃত্তি আর কত ক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অৰ্দ্ধ নিদ্রাভিভূত, অৰ্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহা তলস্থ উপলখণ্ড সকলে, পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্ত বিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুকূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নর দেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃত জীব সকল—চর্ম্ম মাংসাদি বর্জ্জিত—কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় বিশিষ্ট, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল, যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্ব্বতহইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে, রৌদ্র নাই, জোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহ সূচী সকল অগ্রভাগ উৰ্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেই খানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিল। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিল, সাঁতারদিয়া পার হ; তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল, যে সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহ নির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল: রুধিরস্রোতঃ বদন মধ্যে প্রবেশ

করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিল—ডুবিল না। মধ্যে ২ পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া, চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল, যে শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়া ও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ, শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য,বিকট হুঙ্কার,—পর্ব্বত বিদারণ, অশনি পতন, শিলা ঘর্ষণ, জল কল্লোল, অগ্নি গর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালীন শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণেক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীত শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্নকরিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল "প্রাণ যায়! প্রাণ যায়! রক্ষা কর! তখন অসহ্য পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?",

মহাকায় পুরুষ বলিলেন "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত,চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তি বশে জাগ্রতেও, ডাকিয়া বলিল,

"আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্যহইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে? শৈবলিনী, বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর?"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল,

"কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—"আমি শিখাইব।"

শৈ। তুমি কে?

উত্তর—"ব্রত গ্রহণ কর।"

শৈ। কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীরবাস ত্যাগ

করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।”

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আর কি করিব?”

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূল পত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর?

উত্তর—জটাধারণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর। একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। এই পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন—আমার স্বামী কোথায়?”

উত্তর—কেন?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—“যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরি-

তোষজনক ভোজন করিওনা—যেন ক্ষুধা নিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না,—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।"

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

দলনী কি করিল।

মহাকায় পুরুষ, নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল।

দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল। নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুক ওনিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল, যে ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন, সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন, মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন, যে বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি, সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোক পরম্পরা তখন শুনা যাইতেছিল, যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারা মুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মস্‌নদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীরকাসেম জয়ী হয়েম, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া, তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যা কথা পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন, যে বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি, তাঁহাকে আনিয়া যথা সম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হুজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে বেগম আমিয়টের উপপত্নী স্বরূপ নৌ-

কায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও তবে আত্মহত্যা করিব।" এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মুরসিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী, দূত দলনী বিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে হউক, অমঙ্গল সূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিল,

"তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল,

"জানি, তুমি এই বিজনস্থানে দুরাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল। আগন্তুক কহিল,

"এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে?"

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভীতি বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী কাঁদিল। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন। দলনী বলিল,

"যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর। কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, বলিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্তত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরসিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা

শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

দলনী চিন্তিতা হইল। বলিল, "ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরসিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরসিদাবাদে চলিল। দলনী পতঙ্গ, বহ্নিমুখ বিবিক্ষু হইল।

প্রাচীনা এবং নবীনা।

১

আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা, নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর," ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ; মেকলে হইতে আটকিন্সন্ পর্য্যন্ত বহুকাল ইহার যত্ন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আজি কাল হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকা নাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহারণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পাল। আবার দিন কত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রী শিক্ষা দাও, বিধবার বিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহু বিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও এক দিন ওক্ বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সে

গুলি চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ-জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য, অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালী যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সে গুলি ভাল না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখক দিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ, ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্ব ও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, যে আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী: স্ত্রীবয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব, পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্য সাপেক্ষ। ফরাসিস্ স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট—

—Gospel light first dawned
from Bullen's eyes:—

এ সংসার জলে বাস করিতে গেলে, রমণী কুম্ভীরের সহিত বাদ করা পোষায় না। তাঁহাদের অমতে কোন কাজ করা যায় না। তাঁহারা যে দিগে চলেন, আমরা সেই দিগে চলি; সংসার রনক্ষেত্রের রথীগণের তাঁহারাই সারথি; এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ ছ্যাক্‌ড়ার তাঁহারই কোচমান; এ ভাঙ্গা ডিঙ্গীতে তাঁহারাই বাঙ্গাল মাঝি। আমরা কার্য্য করি; তাঁহারাই কার্য্য করান। আমরা অস্ত্র, তাঁহারা হাত; আমরা লাঠি, তাঁহারা লাঠিয়াল; আমরা খাদ্য, তাঁহারা বক্তৃ; আমরা বুদ্ধি, তাঁহারা ইচ্ছা। আমরা চক্র, তাঁহার কুম্ভকার, আমাদিগকে ঘুরাইতেছেন; আমরা মেঘ তাঁহারা বায়ু, রাত্রিদিন আমাদিগকে ফুঁয়ে উড়াইতেছেন; আমরা কাষ্ঠ, তাঁহারা অগ্নি, রাত্রিদিন আমাদিগকে হাড়েহাড়ে পোড়াইতেছেন। আমাদিগের উপার্জ্জনও পরিশ্রমের অধিকাংশ তাঁহাদিগেরই জন্য। সংসার ক্ষেত্রে পুরুষ চাসাগণ কর্ম্ম রূপ ঘাস কাটিয়া মাথায় করিয়া ঘরে লইয়া

যায়, রমণী রূপিনী গাবীগণ তাহা বসিয়া বসিয়া খায়।

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদিগের গৃহিনীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব কীর্ত্তন কালে, এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে এজন্য আমরা ও একথা বলিলাম; কিন্তু একথা গুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের অন্তরিক ভাব এই যে পুরুষই মনুষ্য জাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভাশুভ বিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই, যে স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য, বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভ বিধায়িনী হউন, বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজ সংস্করনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতি সহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতি বিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃ বর্গ সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশে, এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান কবেন যে স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে, পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে, বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজ বিধাতা দিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই জাতীয় দোষ, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতি শাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায়না, যদ্বারা স্ত্রীকৃতব্যভিচার পুরুষ কৃত পরদার গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান। একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, এক স্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরি মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্য হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব

আবশ্যক; স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্য চ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যত দূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহিনা; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি, কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহু কাল প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যভারতে ও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতন ভোগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিলনা। আজি কালি, পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয়া যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব কালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দুর কৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কঙ্কণ, এবং শংখ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার শংখ)—মুষ্টি মধ্যে দৃঢ়ধৃত সম্মার্জ্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে, "কলা বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরী শিখর। আমরা স্বীকার করি যে সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে করিয়া, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন

অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন; পরস্পারের পৃষ্টত্বগের সঙ্গে তাহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধান সম্মত ছিল, এমত বলিতে পারিনা, কেননা তাঁহারা "পোড়ার মুখো" "ডেক্‌রা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন; এবং "আবাগী" "শতেক্ খুয়ারী" প্রভৃতি শব্দ আধুনিক "সখি" "ভগিনি" স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গ ভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দুর, মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গমিল্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতাবেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্ত্তে, স্চ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধের আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের সুবর্ণ, পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া, অলঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। ধূলিকর্দ্দমরঙ্গিণীগণ, সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠ ধ্বনি, পাপীয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্‌রা সর্ব্বনেশে নহে; তত্তৎস্থানে সম্বোধন পদ সকল দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রী জাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বে আদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্ক রটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা, অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহ কর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা, ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছদর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;— প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায়, যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের

আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীদিগের শরীর স্বাস্থ্য জনিত এক অপূর্ব্ব লাবণ্য বিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী লোকেরমধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্নশয্যাশায়িনী হইলে, গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্য ক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতী প্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে, যে তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্য পরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্য রক্ষক শারীরিক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ, এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এসকল কাল মহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না। ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে, জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল

কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে জীবন নির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তানপ্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী জন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভার বহন যন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্দ্ধেক দাস দাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটেনা। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না,—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত সেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি, বঙ্গ মহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ় গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোক নিন্দা ভয়ে, তত ধর্ম্ম ভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোভিনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদিগের পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি কামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে, দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে; এজন্য দানে তাদৃশী অনুরক্তি আর নাই। তত দান করিলে, আর কুলায় না। টাকায় যে সকল

সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে; দানের আধিক্য করিলে; এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালিনী নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথি সৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিলনা। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করাণ, প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্ মনে করেন।

ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছেদ হয়; অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া, মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকার বিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এস্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে

যে তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকেনা। লোক নিন্দা ভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্ম বন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্প শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; এজন্য ধর্ম্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্ম বন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?

এ কথার তাৎপর্য্য এরূপ নহে, যে স্ত্রীশিক্ষা ভাল নহে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে স্ত্রীগণকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার উৎকর্ষ সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হয় না বটে; প্রথম উদ্যমের ফল সামান্য হইবে; তথাপি এবিষয়ে সমাজের যত্ন আরও তীব্রতর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ নিন্দার ভাগী। স্ত্রীশিক্ষায় রাজপুরুষগণের নিতান্ত অমনোযোগ; স্ত্রীশিক্ষায় অতি অল্প ব্যয় হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ সংখ্যায় সমান; বিদ্যায় উভয়েরই অধিকার সমান; বালক শিক্ষায় যত টাকা রাজকোষ হইতে ব্যয় হয়, বালিকাশিক্ষায় তত না হইবে কেন? বালিকারা পড়ে না, বিবাহ হইলেই তাহারা অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি কথা অবলম্বন করিয়া যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় অর্থব্যয়ে নিরুৎসাহী, তাঁহারা অল্প বুঝেন। বহুলতর অর্থব্যয় করিলে এ সকল আপত্তি নিরাস করা যায়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ সমর্থন জন্য একখানি সাময়িকপত্র নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। তাহাহইলে এ সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার দেখিতে পাইতাম।

নবীনা সম্প্রদায় সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর কথা বলিতে আমাদের বাঁকি রহিল। বারান্তরে বলিব। বঙ্গসুন্দরীগণ আমাদের উপর রাগ করিবেন না; এবার কিছু যদি নিন্দা করিয়া থাকি, বারান্তরে প্রশংসা করিব। তাঁহাদের যতই দোষ নির্দ্দেশ করি না কেন, তাঁহারা যে বঙ্গীয় যুবকগণ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা শতমুখে স্বীকার করি। এখন যে বঙ্গদেশে ধর্ম্মের নাম শুনা যায়, আমাদের বিবেচনায় তাহার এক কারণ এই বঙ্গীয় যুবতীগণ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নিদান। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মাধব কর প্রণীত সংস্কৃত রোগ নিশ্চয় নামা গ্রন্থ। শ্রীউদয় চাঁদ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কলিকাতা। গণেশ যন্ত্র।

আমরা সর্ব্বদাই মনে করি যে এক্ষণকার ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালি চিকিৎসকেরা যদি আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তবে কিছু উপকার হইতে পারে। প্রথম উপকার, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বিজ্ঞানপারদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় উপকার, প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই কি? বলিতে পারি না; আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। তবে দেখিতেছি, দেশী চিকিৎসা অদ্যাপি বিলাতী চিকিৎসার প্রতিযোগিনী হইয়া, প্রচলিত আছে—বিলাতী চিকিৎসার প্রচার সত্বেও দেশী চিকিৎসার মান আজিও বজায় আছে—কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিত? দেশী ভূতত্ব, দেশী জ্যোতিষ, দেশী গণিত, সকল প্রকারের দেশী বিজ্ঞান, দেশী প্রাচীনভাষা পর্য্যন্ত, বিলাতী বিজ্ঞান, বিলাতী ভাষার কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, কেবল দেশী ন্যায় মীমাংসা শাস্ত্র, এবং দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র অদ্যাপি প্রবল। কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিতে পারে?

সে যাহাই হউক, উদয় চাঁদ বাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ভরসা করি অন্য চিকিৎসকেও এই পথে গমন করিবেন। আমরা যতদূর দেখিয়াছি,—অনুবাদ উত্তম হইয়াছে। নিদান লিখিত রোগ সকলের ইংরেজি নাম, টীকায় সন্নিবেশিত হওয়াতে আরও ভাল হইয়াছে। "নিদান" নাম শুনিলেই অনেকে ইহা দেখিতে ইচ্ছুক হইবেন সন্দেহ নাই। ইহার মূল্যও অল্প—১৲টাকা মাত্র; এবং গ্রন্থ বুঝিবার কোন কষ্ট নাই।

প্রমোদিনী। প্রথম খণ্ড।

পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রকাশিত সন ১২৮০।

এখানি সাময়িক পত্র। বৎসরে তিনবার প্রকাশ হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে যাঁহারা ইহা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা তরুণ বয়স্ক। সুতরাং, অন্য হইলে যে প্রণালীতে ইহার সমালোচনা করিতাম তাহা করিলাম না। পরামর্শ স্বরূপ দুই একটি কথা বলিব।

১ম। ৭২ পৃষ্ঠা পদ্য কেন? এ প্রকারের পদ্য ৭২ পৃষ্ঠা পাঠ করা, সুখদায়ক নহে

২য়। গদ্য প্রবন্ধ তিনটী। দুইটী উপন্যাস এবং তৃতীয়টি হুতোমী নক্সা। এখন

এ সকলের কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে। ইহার বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী নহি। ভাল হইলে ক্ষতি নাই—কিন্তু মধ্যশ্রেণী গল্প ও নক্সায় বিশেষ লাভ নাই।

৩য়। গদ্যের মধ্যে "কল্পনা মুকুর" নামক প্রবন্ধের ভাষাটী কথঞ্চিৎ ভাল। "পাগলের প্রলাপ" হুতোমী—সুতরাং তাহার ভাষায় ভাল কিছু নাই। "বিচিত্র অঙ্গীকার" নামক প্রবন্ধের ভাষা সংস্কৃত-বহুল, এবং অপ্রশংসনীয়। ইহা আদ্যোপান্ত অনর্থক শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। লেখক কি কাদম্বরীর অনুকরণে চেষ্টা পাইয়াছেন? সে প্রবৃত্তি ভাল নহে। আমরা ইতর লোকের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে বলি না। যে ভাষা সরল, অথচ বিশুদ্ধ, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

৪র্থ। লেখকদিগের অলঙ্কার প্রিয়তা আমাদিগের বড় ভাল লাগে নাই। তাঁহাদিগের উৎসর্গ পত্র পাঠ করিয়া দেখিবেন আমরা সত্য বলিতেছি কিনা—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ পাঁড়ে মহাশয়ের স্নেহরসার্দ্র নাম এই প্রমোদিনীর কুন্তলে,হীরক স্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে উপহার প্রদান করিলাম।"

কি উপহার প্রদান করিলেন? পুস্তক? সে কথা ত ব্যক্ত হয় নাই। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝাইতেছে, যে পাঁড়ে বাবুর নামই উপহার প্রদত্ত হইল। "তাঁহার শ্রীচরণে" কাহার শ্রীচরণে? বুঝায় যেন, প্রমোদিনীর শ্রীচরণে,লেখকদিগের অভিপ্রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর শ্রীচরণে। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর শ্রীচরণে, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাম কিরূপ উপহার? নামটী "স্নেহরসার্দ্র"—নাম আর্দ্র হয় কি প্রকারে? কোন লোক লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর নাম শুনিয়া "স্নেহরসার্দ্র" হইতে পারে তাহা হইলে শ্রোতার মন "স্নেহরসার্দ্র;" নামটি "স্নেহরসার্দ্র" নহে। আবার যাহা "আর্দ্র" তাহাকেই সেইখানে হীরকের সহিত তুলনা করা, উৎকৃষ্টালঙ্কার নহে। আমাদের বিবেচনায়, এত গণ্ডগোল না করিয়া অমুকের শ্রীচরণে প্রমোদিনী উপহার প্রদত্ত হইল, এই সরল কথা লিখিলেই ভাল হইত।

৫ম। পাকুড় হইতে এরূপ একখানি সাময়িক পত্র প্রচারারম্ভ হইয়াছে, ইহাতে প্রচারকদিগের উৎসাহ এবং বিদ্যানুশীলন প্রবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথমাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হউক, এই বাসনায় আমরা কিঞ্চিৎ কর্কশ পরামর্শ দিলাম।

কাব্য পেটিকা, রসকাদম্বিনী, অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার, চন্দ্রনাথ, উদাসিনী প্রভৃতি অনেকগুলিন গ্রন্থ আমাদিগের নিকট রহিয়াছে; স্থানাভাবে সমালোচনা হইতেছে না। গ্রন্থকারদিগের নিকট আমরা নিতান্ত লজ্জিত আছি। নিতান্ত ভরসা আছে, আগামী মাসে ঐ সকল গ্রন্থের সমালোচনা করিব।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের আদিম অবস্থা।

উপক্রমণিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কোষাগার বিষয়।

রাজা কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দিবেন না এইটী সামান্য নিয়ম। বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থলে অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্থলে কোন কোন ব্যক্তি একেবারেই কর ভার হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রী মধ্যে গণ্য।

ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদি যে সমস্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করেন রাজা উহার ষষ্ঠাংশের ফলভাগী। এই কারণে বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে রাজকর দিতে হইত না। বরং রাজা নিজে ক্লেশ পাইতেন তথাপি ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থানের পক্ষে অযত্নবান্ হইতেন না। অন্ধ, জড়, মূক, কুব্জ, আতুর সপ্ততিবর্ষীয় মনুষ্য স্থবির ব্যক্তি, অনাথা স্ত্রী অপোগণ্ড বালক ভিক্ষুক ও সংসারাশ্রমত্যাগী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে মুক্তছিলেন। (১)

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি কোন স্থলে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত নিধির সন্ধান পান উহা রাজ দ্বারে বিজ্ঞাপন করিয়াই আত্মসাত্ করিতে পারেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দৃষ্ট নিহিত নিধির বিষয়ে রাজার কিঞ্চিৎ মাত্র অধিকার দেখা যায় না। রাজা যদি স্বয়ং কোন গুপ্ত নিধির সন্ধান পাইতেন তবে তাহার অর্দ্ধাংশ বিদ্বান্ ভূদেব বর্গমধ্যে বিতরণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট আত্মসাত্ করিতে সক্ষম ছিলেন। অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণসাৎ না করিলে পাপের ভাগী হইতেন।

রাজা অথবা অন্য কোন রাজপুরুষ কর্ত্তৃক যদি কোন গুপ্ত নিধির আবিষ্কার হয় এবং পশ্চাৎ যদি কোন ব্যক্তি আসিয়া এই বস্তু আমার বলিয়া সত্যতা পূর্ব্বক প্রার্থনা করে তবে রাজা ঐ ধনের ষষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে যোগ্য, অবশিষ্ট অংশ বাদ সমুত্থায়ী ব্যক্তির। কিন্তু পরে যদি জানা যায় সে ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া লইয়াছে তবে তাহার দণ্ড বিধান পূর্ব্বক

---

(১) মনু।

ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করং।
নচ ক্ষুধাঽস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্॥ ১৩৩—অ ৭

অন্ধোজড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্ব্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করং॥ ৩৯৪—অ ৮

সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণসাৎ করিতেন এরূপ স্থলে রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক পাইতেন না।

অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে ঐধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ নিমিত্ত তিনবর্ষ পর্য্যন্ত কাল দেওয়া যাইত। ইংরেজি নিয়ম ছয় মাস, কিন্তু প্রাচীন নিয়মটিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ঐকাল মধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে অস্বামিক ধনের উত্তরাধিকারীর অন্বেষণ জন্য ঘোষণা প্রচার করা রীতি ছিল। তিন বর্ষ মধ্যে প্রকৃত স্বামী অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন ঐ ধন রাজকোষ পরিভুক্ত হইত। ইতিপূর্ব্বে উহা স্থাপিত ধনের ন্যায় বিবেচ্য থাকিত। তিন বৎসর মধ্যে অস্বামিক ধনের প্রার্থীর স্থিরতা হইলে ঐ অস্বামিক ধনের প্রত্যর্পণ কালে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণাদি দ্বারা তদীয় ধন বলিয়া প্রতীতি হইলে তাহাকে সমর্পিত হইত। প্রনষ্ট ধনের উদ্ধার কালে প্রনষ্টাধিগত ধনস্বামী রাজাকে স্থল ও বস্তু বিবেচনায় কোথাও বা ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দশমাংশ কোথাও বা দ্বাদশাংশ ঐবস্তুর রক্ষণ প্রত্যর্পণ ও অধিকারী নির্ণয়রূপ রাজধর্ম্মের রাজকরস্বরূপ দিতেন। রাজা কোন স্থলেই ষষ্ঠাংশের অধিক লইতেন না। প্রবঞ্চক উক্ত নিধির অষ্টমাংশ তুল্য দণ্ডভোগ করিত স্থল বিশেষে দ্রব্য বিবেচনায় দণ্ডের ন্যূনতা ছিল।

যেসকল ব্যক্তির ক্ষেত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিল না অথচ অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বন হইতে আহৃত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ওষধি বৃক্ষাদির রস পত্র, শাক, ফল, মূল, পুষ্প, ও তৃণ, বেণুনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত পাত্র, মৃণ্ময় পাত্র এবং সর্ব্বপ্রকার পাষাণময় দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাও রাজাকে কর দিত। ইহাদিগের নিকট হইতে রাজা তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিতেন। ইহাই প্রাচীন লাইসেন্‌স টেক্স।

যে ব্যক্তি বাণিজ্য কার্য্যে পটু, সর্ব্বপ্রকার বস্তুর অর্ঘ সংস্থাপনে সমর্থ, শুল্ক গ্রহণ সময়ে অগ্রে তদীয় সহায়তায় পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইত। সেই দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা যেপরিমাণে লাভ সম্ভাবনা জ্ঞান হইত, তাহারই বিংশতি ভাগের এক ভাগ শুল্কস্বরূপ রাজকর আদায় করা পদ্ধতি ছিল। মহার্ঘ বস্তুতেও কদাচ তদপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিতেন না।

যাহারা পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বস্তু বিক্রয় দ্বারা আত্ম পরিবারের ভরণপোষণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে প্রকার জনগণের সমীপে তত্তৎদ্রব্যোৎপন্ন লাভাংশের পঞ্চশত ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য। তাহাই রাজ করস্বরূপ।(২)

(২) বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিং।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হিসঃ॥
৩৭—অ ৮

ক্ষেত্র বিশেষে ফল বিশেষে কৃষকের পরিশ্রম বিবেচনায় ক্ষেত্রস্বামীর ব্যয় অনুসারে লভ্যের পরিমাণ বিবেচনায়, ধান্যাদি শস্যের প্রতি কোথাও লাভের ষষ্ঠাংশ কোথাও বা দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে রাজস্ব স্বরূপ প্রদত্ত হইত। রাজা ষষ্ঠাংশের অধিক গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিলেন না।

যস্তপশ্যোন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্দ্বিজেভ্যোদত্ত্বার্দ্ধমর্দ্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ॥ ৩৮
আদদীতাথ ষড্ভাগং প্রনষ্টাধিগতন্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ৩৩—ঐ
মমায়মিতি যোব্রুয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড্ভাগং রাজা দ্বাদশ - মেববা॥ ৩৫—ঐ
প্রনষ্ট স্বামিকং রিকৃথং রাজাত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্ব্বাকৃত্র্যব্দাদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ॥ ৩০।
আদদীতাথ ষড্ভাগং দ্রুমাংস মধুসর্পিষাং।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥ ১৩১—অ ৭
পত্রশাক তৃণানাঞ্চ বৈদলস্যচ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্যচ॥ ১৩২—ঐ
শুল্ক স্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্য বিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যুরর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপোহরেৎ॥ ৩৯৮—অ ৮।
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশু হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥ ১৩০—অ ৭

কোন গ্রামেই সমস্ত ভূমি প্রজা বিলি হইত না। যথায় কিঞ্চিন্মাত্র ভূমিও পতিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না। তথায় অগ্রে গোচারণ নিমিত্ত উর্ব্বর ভূমি বাদ রাখিয়া প্রজা পত্তন হইত। ঐ গোচারণ ভূমির চতুঃসীমায় যাহাদিগের ক্ষেত্র থাকিত তাহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রের পার্শ্বে বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক ক্ষেত্র কার্য্য সম্পাদন করিত। গোচারণ ভূমি চতুঃসীমার প্রত্যেক সীমা শতধনু পরিমিত রাখিবার রীতি। ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও এতদপেক্ষা অল্প রাখিবার প্রথা ছিল না। গণ্ডগ্রাম বা নগরের পক্ষে তিনগুণ অধিক পরিমিত ভূমি খণ্ড গোচারণ নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইত। চারি হস্তে এক ধনু হয়।

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর গ্রহণ করা রীতি ছিল না বটে, কিন্তু কোন না কোনরূপে সে ব্যক্তি অবশ্য দেয় রাজস্বের নিষ্ক্রয় স্বরূপ আত্ম পরিশ্রম দ্বারা তৎসাধ্য রাজকীয় কার্য্য সমাধা করিত। তদ্দ্বারা রাজার সাংসারিক কর্য্যের ব্যয়ের অনেক লাঘব হইয়া আসিত। এ পদ্ধতি অদ্যাপি অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। সে প্রকার কার্য্যে কাহারা ব্রতী ছিল তাহা দেখিতে গেলে ইহাই জানা যায় যে সূপকার, কাংশ্যকার, শঙ্খকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার, লেখক, কারুক, তৈলিক, রজক, নাপিত, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জন

করে তাহাদিগকে রাজা প্রতিমাসে এক এক দিন বিনা বেতনে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। উহাদিগের পরিশ্রমের মূল্যকেই রাজস্ব স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

বাস্তবাটীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন। ইহারা স্থল বিশেষে ব্যক্তি বিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরম্পরা সম্বন্ধে কেহই করভার হইতে মুক্ত নন। ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব দিতেন না বটে কিন্তু ইহারা সকল কার্য্যের অগ্রে রাজপূজা করিতেন। ঐ রাজপূজাই কর স্বরূপ। আরও দেখা যায় ইহারা পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে অগ্রে ভূস্বামীর পূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে স্বীয় অভীষ্ট প্রিতৃদেবের অর্চ্চনা করেন। (৩)

যদি কেহ বলেন ভূস্বামীর উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণ যে দান করেন তাহা ভূপতিকে দেওয়া হয় না। তাহার মীমাংসা স্থলে শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, তাহাতেই রাজা পরিতুষ্ট হন। বিশেষতঃ ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ দেওয়া অপেক্ষা, যথায় দিলে উপকার হয় তথায় দেওয়া উচিত। সুতরাং শ্রাদ্ধের অল্পপরিমিত বস্তু রাজসমীপে বস্তুমধ্যে গণ্য হইতে পারে না কিন্তু নিরন্ন ব্রাহ্মণের নিকট উহা উপাদেয় বস্তুমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, তদ্দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সম্পাদন হয়। ভূপতি কেবল এই দেখিবেন প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত। যখন পিতৃযজ্ঞ কালেও ভূস্বামীকে স্মরণ করা রীতি, তখন অবশ্য বলিতে হইবে ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনিষ্কৃতি সম্পাদন করে।

রাজা জলৌকা সদৃশ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া অল্পে অল্পে করগ্রহণ করেন, কেহই অধিক করভারাক্রান্ত হইলাম মনে করেন না। রাজা যে কেবল করগ্রহণের অধিকারী ছিলেন এমন নহে। তিনি প্রজার ধন, মান, প্রাণ ইত্যাদি সমুদায় বিষয় আত্মনিধি নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট পিতার তুল্য মান্য হইতেন। আচার ব্যবহার বিষয়েও তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা রীতি ছিল। রাজা প্রজাকে আত্মপুত্র সদৃশ জ্ঞান করিতেন।

(৩) মনু

ধনুঃশতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়োবাপি ত্রিগুণো নগরস্যতু॥ ২৩৭—অ ৮

সাংবৎসরিক মাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিং।
স্যাচ্চাম্নায় পরোলোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥ ৮০—অ ৭

যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসঙ্গজ্ঞিতং।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথক্‌জনং॥ ১৩৭—ঐ

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্যোপজীবিনঃ।
একৈককংকারয়েৎকর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥ ১৩৮—ঐ

অপ্রাপ্ত ব্যবহারাশ্রম।

রাজা কেবল আত্ম রক্ষা করিয়াই নিস্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবদীয় বিষয়, ধন, মান, জাতি সম্ভ্রম আচার ব্যবহার বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় আশৈশব কাল পর্য্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মধন নির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত। মৃতপিতৃক শিশু যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান্ না হয় তাবৎকাল নৃপতি উক্ত শিশুকে পুত্রনির্ব্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। মৃতপিতৃক তরুণ ব্যক্তি যে সময়ে আপন বিষয় বুঝিয়া লইতে সক্ষম হয় তখন রাজা সর্ব্বসমক্ষে তদীয় হস্তে যাবদীয় গচ্ছিত ধন বৃদ্ধিসমেত প্রত্যর্পণ করিতেন। অতএব আধুনিক "Court of ward" ইংরেজদিগের সৃষ্টি নহে। তবে ইংরেজেরা স্বার্থপর হইয়াই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভূস্বামীর তত্ত্বাবধারণ করেন, তাঁহাদিগের রাজস্বের ক্ষতি না হয়। ভারতবর্ষীয় রাজগণের সে উদ্দেশ্য নহে।

দ্বিজাতি সন্তান স্থলে সমাবর্ত্তন বিধি পর্য্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। অন্য জাতির পক্ষে প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত সীমা। বেদ বেদাঙ্গের অভ্যাসে ফল জন্মিলে বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্ত্তন কহা যায়। (৪)

অনাথ শরণ।

অনাথাস্ত্রীজনের প্রতিও রাজার দৃষ্টি ছিল। আর্য্য ভূপতিগণ যৎকালে ইন্দ্রিয় সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যখন প্রজারঞ্জনকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেন, তখন ইহারা আত্ম অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ সহধর্ম্মিণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া প্রজার সুখবৃদ্ধি এবং আপনার কুলমর্য্যাদা রক্ষা ও নিজের সুযশের দিগে ধাবিত ছিলেন। অনাথাস্ত্রীজাতিরও রাজার শাসন হেতু দুশ্চরিত্র হইতে পারিত না। উদ্ধত যুবা পুরুষও অনায়াসে আত্মস্ত্রী বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হইত না। ইহার বিস্তার পরে প্রদর্শিত হইবে এক্ষণে প্রক্রান্ত বিষয় আরম্ভ করা গেল।

বন্ধ্যাত্ব নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে স্ত্রীর স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তদীয় গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ যোগ্য ধন দানানন্তর বন্ধ্যা বনিতাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে সে স্ত্রী অনাথ শরণের অধিকার ভুক্ত। যে স্ত্রীলোক অনুদ্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদিরহিত, যে স্ত্রীজন প্রোষিত ভর্ত্তৃক, যে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুলে অভিভাবক নাই, অথবা যে স্ত্রী রোষাদি হেতু বশতঃ কাতরা, কিম্বা সামর্থ্য বিহীনা কিন্তু ইহার সকলেই সাধ্বী, তাহাদিগের ধন, মান, আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাবদীয় বিষয় ভূপতি মৃতপিতৃক বালকধনের ন্যায় রক্ষা করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই নির্দেশ, ইহার অন্য আচরণ করিলে রাজা মহাপাতকীর মধ্যে গণ্য।

(৪) মনু।
বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীত শৈশবঃ ॥—২৭ অ ৮

উন্মত্ত জড়, মূক, অন্ধ, আতুরাদি ব্যক্তিবর্গ রাজার অবশ্য পোষ্যবর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে আর বিশেষ নিয়ম করিতে হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহারও ধন থাকিত উহা মৃতপিতৃক শিশু-ধনের সদৃশ জ্ঞানে তৎপুত্রাদি উত্তরাধিকারীর বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজার অধীনে থাকিত। ইংরেজদিগের রাজ্যে এসকল নাই। কেবল যে তাঁহাদিগের রাজস্বের দায়ী, তাহারই 'বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হইতে হয়। যে রাজস্বের দায়ী নহে—সে মরুক বাঁচুক সে জন্য সরকারের কিছু আসিয়া যায় না। আর্য্যগণ সেরূপ ভাবিতেন না। তাঁহারা প্রজার মঙ্গল কামনায় নানাবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন করায় রাজা শব্দটী আর্য্যগণের কর্ণে অতি সুমধুর হইয়া আছে। আর্য্যগণ উপরি কথিত নিয়ম ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন। ইঁহারা কদাচ কোনকালে রাজ ভক্তি বিস্মৃত হন নাই। অদ্যাপি ইঁহাদিগের এমনি সংস্কার যে রাজদর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগকে কাল বিশেষ জ্ঞান করেন না। আর্য্যগণ রাজাকেই কখন সত্য যুগ, কখন ত্রেতা, কখন দ্বাপর, কখন কলি যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।(৫)

রাজা যখন অনলসভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক স্বয়ং সমস্ত বিষয় মীমাংসা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে স্বহস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ সত্যযুগ কহা যায়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগ আর কিছুই নহে। রাজার অবস্থা ও কার্য্য বিশেষ দ্বারা তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ যুগস্বরূপ জ্ঞান করা গিয়া থাকে।

নৃপতি যখন আত্ম কর্ত্তব্য বিষয়ের পরি সমাপ্তি বিধানে অভ্যুদ্যত কিন্তু শারীরিক ব্যাপার বিরহিত তখন তাঁহাকে ত্রেতাযুগ শব্দে অভিহিত করা যায়।

যখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভূপতির মনোযোগ ও প্রক্রান্ত বিষয়টিও অন্তঃকরণে জাগরূক আছে সত্য, পরন্তু কায়িক ও বাচিক ব্যাপার বিষয়ে তদীয় উৎসাহের অভাব দেখা যায় তখন ঐ অবস্থায় ভূপতিকে দ্বাপরযুগের স্বরূপ জ্ঞান করা যায়।

রাজা যখন কোন কার্য্য দেখেন না। নিদ্রাদি আলস্যে কালহরণ করেন তদীয় রাজকার্য্য অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হয় না তখন তাঁহাকে তদবস্থায় সাক্ষাৎ কলিযুগ কহা যায়।(৬)

কৃতং ত্রেতা যুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেবচ।
রাজ্ঞোবৃত্তানি সর্ব্বানি রাজাহি যুগমুচ্যতে॥
৩০১—অ ৯

(৫) মনু।
বন্ধ্যাস্বপুত্রাসুচৈবংস্যাৎরক্ষণং নিষ্কুলাসুচ।
পতিব্রতাসুচ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসুচ॥
২৮—অ ৮

(৬) মনু।
কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি সজাগ্রদ্দ্বাপরং যুগং।
কর্ম্মস্বভ্যুদ্যত স্ত্রেতা বিচরংস্তুকৃতং যুগং॥
৩০২—অ ৯

এই প্রথা অনুসারেই আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা আলস্যাদি পরতন্ত্র হইতেন তাঁহাদিগকে আর্য্যেরা পাপাত্মা অথবা সাক্ষাৎ কলি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ শব্দের তাৎপর্য্য কি? সত্যযুগে লোক সকল সত্ত্বগুণের কার্য্যে আশক্ত থাকিত। ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সত্ত্বগুণের লক্ষণ অনুমান করা যায়। ত্রেতাযুগে রজোগুণ প্রবেশ করিল। তখন অর্থ চিন্তা জন্য ধর্ম্ম একপাদ অন্তরে গেলেন। রজোগুণের সহায়তায় ত্রেতাযুগে লোকের অন্তঃকরণে একপাদ অধর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাপরে তমোগুণ আসিলেন তৎসাহায্যে লোকের মনে কাম প্রবৃত্তি জন্মিল, তখন ধর্ম্ম দ্বিপাদ অন্তরে থাকিলেন। কলিযুগে তমোগুণের প্রাধান্য হেতু ধর্ম্মকে ত্রিপাদ অন্তরে অপসৃত হইতে হইল। একারণেই রাজাকে যুগচতুষ্টয় স্বরূপ কহিয়াছেন।

আর্য্যগণ কোন্ জাতির পক্ষে কিরূপ কার্য্যকে পরম ধর্ম্ম করিয়াছেন তাহার নির্দ্ধারণে এই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণের পক্ষে একমাত্র তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। বার্ত্তা গ্রহণই বৈশ্যের প্রধান ধর্ম্ম। শূদ্র জাতি একমাত্র সেবা দ্বারা পরমার্থ পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। জাতি ধর্ম্ম ক্রমশঃ দেখান যাইবে।(৭)

চতুষ্পাৎ সকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মে নাগমঃ কশ্চিৎমনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে॥ ৮১—অ ১

ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভি র্ধর্ম্মশ্চাপৈতিপাদশঃ॥ ৮২—অ ১

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ মেষাং যথোত্তরং॥ ১০০ অ ১২

(৭) ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্যতু তপোবার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্যসেবনং॥ ২২৬—অ ১১

কমলাকান্তের দপ্তর।

অষ্টম সংখ্যা।

স্ত্রীলোকের রূপ।

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন যেদিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাহাদের রূপের ঝড় যেদিকে বয়, সেদিগে সকলের ধৈর্য্য চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্মকোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন

পুরুষের মন-চড়ায় তাহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাহাদের কর্ম্ম জাহাজ, ধর্ম্ম পান্সী, বুদ্ধি ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনী কুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনীশক্তির বশীভূত হইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ লতা গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান্—আবার, অনেককেই অপমানিত করিয়া ফিরিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দুরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমন্ত শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্লকমলে সৌর রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এইজন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবক কুলের উপমাস্তবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ, যথা, পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায়না বলিয়া দাড়িম্ব কদম্ব করিকুম্ভ এই বিষম

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেননা উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা নখর নিকর হিমকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।—শ্রী ভীষ্মদেব।

উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণীকুল-চরণবিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমন সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্র গামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি হাতী, এক দিন অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিগে রেইলওয়ে হয় নাই, সে দিগে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এককালে কামিনী ভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীশ, কদম্ব, গোলাপ, প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনীকান্তিগ্রথিত কুসুম মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভাল বাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিতসলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহকজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্‌রে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোরু, একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে! হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হৌক। তুমি বৎসর বৎসর সোনার জাহাজে চড়িয়া চীন দেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকার ভুক্ত হৌক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন। ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ, শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর

মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ, আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ি মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পিণী বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না; ভ্রূধনুতে কোপে তীক্ষ্ণশর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বন্ধ-চরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের শ্রীদেবীর স্বপ্নময়ী সুবর্ণনির্ম্মী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই

তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক জগন্নাথকে দোলায়; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষীবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষত স্তন্যপায়ী বালক দিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীলোকে ভূষণ বিনা মনুষ্য সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হই[illegible]। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে বিশাল দন্তে হস্তীর এত সৌন্দর্য্য, হস্তিনীর তাহা নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্র চূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে উচ্চশ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর" কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটী উদিত হইয়াছিল? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু রূপগর্বভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তেক জন্য না হউক; অত্যল্পকালের জন্য, সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি;

—আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই, যে অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকড়ি চালের ভাত, প্রণয় কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষা রূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বলদেখি,এই রূপক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে, নাদেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে, অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পীপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহারপ্রকৃত মূল্য নির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তিধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এককারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগ নেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম"। যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতিরঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গভঙ্গীকে মৃদুমন্দমলয়মারুতে দোদুল্যমানা ললিতা লবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালদেশে উল্কিচিত্রিত মিশি কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানব সমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহাহইলে হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্তভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তু প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসারসাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই, যে নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে কোটী গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্ম আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই, যে চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামীরচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে কিছুদিন হইল আমাদিগের দেশীয় অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে মহত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

চন্দ্রশেখর।

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

বাতাস উঠিল।

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল একএকবার দিনান্তে ফল মূলান্বেষণে বাহির হইত। সাতদিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া, স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল,—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তি সমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাতদিন সাত রাত্র কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞান পরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতে নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে, ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়া ছিল—সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্য-সন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্যচিন্তা শূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায় তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে একাগ্র চিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্যচক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট,—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তা রেখা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখ কুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন,—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্র জ্যোতি,

স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্ব জিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্র শোভিত শালতরু,—মাধবী জড়িত দেবদারু, কুসুম পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়, আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া, আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিস্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গ রঞ্জিত, স্নেহ পরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ, কিসের প্রতাপ?—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পাপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘ মণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য, আমার সুখস্বপ্ন তুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভাল বাসা, সমুদ্র তুল্য, অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গ ভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয় ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলামনা, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান,-অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমা জ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণু কণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপ স্বামী ধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয় সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে, যে এই মন্ত্রে চির প্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এমন্ত্রে বায়ুস্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর,—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়

মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদ পদ্মে গুণ গুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্ত পরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখ ব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে; আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নি পর্ব্বত মধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে স্বচ্ছ সলিলা তরতর বাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদী জলে বড়বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ভিন্ন শিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে, অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণ মেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগণবাসী অপ্সরা, কিন্নরাদি মেঘ তরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগণচারিণী ভৈরবী, রাক্ষসী, কৃষ্ণ মেঘে আরোহণ করিয়া, কৃষ্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন কত দেব দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর শবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন।

দেখিল, নক্ষত্র সুন্দরীগণ নীলাম্বর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি সকলে বাহির করিয়া, কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—দেখ, ভগিনি দেখ, মনুষ্য কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে! কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতী নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আর পর আরও ঊর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কল কল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতি দূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণ গতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল,—তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল,—মনে মনে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় তুমি—স্বামিন্! কোথায় স্বামী—স্ত্রীজাতির জীবন সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বে সর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি, চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে, সহস্র, সহস্র, সহস্র, প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারেন না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া, চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও—তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, যে কে তাঁহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পুরিল। সেই দুরন্ত নরক রব, সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহা মধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাত কূজনি শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে? কাহার মুখমণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

নৌকা ডুবিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল; মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর, তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর রাখিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া, বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়া ছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্পদিন বাঁচিব"—শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল,—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"অল্পদিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন,

"শৈবলিনি, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাত যোড় করিল;—বলিল, "আর একবার বসো। বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই। আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্ম হত্যায় কি পাপ আছে?" শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম, জলে ভাসিতেছিল,

চন্দ্র। "আছে। কেন মরিতে চাও?"

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈ। এ মন নরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈ। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রদিন নরক স্বপ্ন দেখি—

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল; নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি দেখিতেছ?"

শৈবলিনী, কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন ভয় পাইতেছ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈ। "সেই নরক!"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল,

"আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে, কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ু

রোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রাম প্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে ক্ষোদিতা—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল সুন্দরী, অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষ পরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল,—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ; সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীট রাশিতে গগন অন্ধকার! দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জু হস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিক বেত্রে তাহাকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষ পরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার! মার! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই! মার মার! যত পারিস মার! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার! মার!" শৈবলিনী যুক্ত করে, উন্নত আননে, সজল নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে; সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে "মার! মার! অসতীকে মার! আমি সতী, ও অসতী! মার! মার!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ, দৃষ্টিস্থির লোচনবিস্ফারিত করিয়া, বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন,

"শৈবলিনি! আমার সঙ্গে আইস!"

প্রথমে শৈবলিনী, শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহা দ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া, দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর, দেখিলেন শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেক করাতে, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল,

"আমি কোথায় আসিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীত হ-ইল, বলিল, "তুমি কে?"

চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

"স্বামী আমার সোণার মাছি
বেড়ায় ফুলে ফুলে,
তেকাটাতে এলে সখা, বুঝি পথ ভুলে?"

তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, যে যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণ মন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদু স্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে? রসো রসো! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী। আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি একটি ব্যাঙ্গ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্গটিকে গিলে ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হাঁগা সাহেব! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর গদ্গদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব! একি করিলে? একি করিলে?

শৈবলিনী গীত গায়িল

"কি করিলে প্রাণ সখি, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি নদী দুই কূল ভরিয়ে,

বলিতে লাগিল, মনোচোর কে? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে? চন্দ্রশেখর কে। ভাসিল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?"

চন্দ্রশেখর বলিল, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—

"আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমাকে মারিবে না!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ, চলিল—কখন হাসিতে লাগিল কখন কাঁদিতে লাগিল, কখন গায়িতে লাগিল।

চিহ্নিত সুহৃদ্।*

১

এস এস সখে! প্রিয় দরশন—
বাল সহচর—অনন্য-হৃদয়!
শৈশবে, সলিলে সলিল যেমন,
উভয় হৃদয় হইয়াছে লয়।
তোমার আমার জীবন যুগল,
এক বৃক্ষে দুই লতার মতন;
শৈশবে যখন হৃদয় কোমল,
অনন্ত বেষ্টনে করেছে বেষ্টন।

২

এক বিদ্যালয়ে পড়েছি দুজনে,
একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
সম সুখ দুঃখে ভাসিয়াছি মনে,
সরল হৃদয়ে শৈশব বেলা।
যেই প্রেমে ধরি গলায় গলায়,
যাইতাম সুখে অধ্যয়ন তরে;
যেই প্রেমে ধরি গলায় গলায়,
অধ্যয়ন করি আসিতাম ঘরে।

৩

সেই প্রেম——কত বৎসরের পরে
উছলিছে আজি, হৃদয়ে আমার,
নিদাঘে বিশুষ্ক পর্ব্বত নির্ঝরে,
যেন হলো আজি বরিষা সঞ্চার;—
সেই স্রোতে এই কয়েক বৎসর
গিয়াছে ভাসিয়া; আজি মনে লয়,
যুড়াতে কৈশোর বিদগ্ধ অন্তর,
ফিরে এল সেই শৈশব সময়।

৪

সংসার সাগর——চিন্তার তরঙ্গ—
দারিদ্র্য দাহন——দাসত্ব দংশন,
যেন অকস্মাৎ হলো স্বপ্ন ভঙ্গ,
বোধ হইতেছে, সকলি স্বপন।
আইস আবার গলায় গলায়,
কহি শুনি সুখ দুঃখ সমাচার,
বিদেশে, বিভূমে, ঈশ্বর কৃপায়,
আছিলে ত ভাল বল একবার?

৫

দুঃখিনী ভারতে অকূল সাগরে,
ভাসাইয়া যবে চলিলে সখা,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে,
দেখিয়া মলয়-অচল রেখা?
মলয়াবারের তীর সুবঙ্কিম,
মিশাইল যবে জলধি জলে?
মলয়-অচল উজ্জ্বল নীলিম,
মিশাইলে নীল আকাশ তলে?

৬

পার্থিব জগত, ছায়া বাজি প্রায়,
লুকাইলে দূরে; অসীম আকাশ
সসীম মণ্ডলে ঘেরিয়া তোমায়,
ঢাকিল যখন-নীলাম্বু নিবাস;
অধীনত্বে যেন সরোষে ফেনিয়া
অসীম জলধি, বীরদর্প ভরে,
সাজিল যখন ঊর্ম্মি আস্ফালিয়া,
কি ভাব উদয় হইল অন্তরে?

* Covenanted.

৭

কি ভাব উদয় হইল অন্তরে?
লঙ্ঘিয়া যখন ভীম পারাবার,
লঙ্ঘিয়া—হায় রে! হৃদয় বিদরে,—
অভাগা বাঙ্গালি অদৃষ্ট দুর্ব্বার,
অদূরে যখন করিলে দর্শন,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম শ্বেত ব্রিটনীয়া,
(রত্নাকর গর্ভে রত্ন সর্ব্বোত্তম)
হৃদয় কি তব উঠিল নাচিয়া?

৮

নির্জ্জীব, দুর্ব্বল, বাঙ্গালি হৃদয়,
নাচিল কি সখে! নামিলে যখন
ব্রিটনীয়া তীরে? কবিগণে কয়,
ইংলণ্ড পরশে হয় বিমোচন,
আজন্ম দাসের দাসত্ব বন্ধন——
পাপরাশি যথা জাহ্নবী পরশে;
কিন্তু ভারতের লতার বেষ্টন,
চির লৌহময় দুরদৃষ্ট বশে!

৯

ইতিহাসে কহে অভাগী ভারত,
ব্রিটনীয়া শিরে মুকুট-রতন;
কিন্তু সেই রত্ন কোথায়, কি মত,
ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন?
ভাবে কি কখন,—অভাগিনী পড়ি
হিমাদ্রি গহ্বরে, সমুদ্র ভিতরে,
(বহে শত নদী অশ্রুধারা ঝরি!)
মুমূর্ষার মত রহিয়াছে পড়ে?

১০

ভারত জীবন, যাহাদের করে,
জানেন কি তাঁরা ভারত অমর?
পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,
মুমূর্ষু জীবন হবে না অন্তর।
কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার,
আবার ভারত, ছাড়ি হিমাচল
তুলিবে মস্তক——মরি! দুরাশার

১১

কি সুখ—ছলনা! নাহি কাজ তাহে।
বল বল সখে! দেখেছ কি তুমি,
পতিতা বিগত বিপ্লব প্রবাহে,
জগৎ-গৌরব ফ্রাঞ্চ বীরভূমি?
ফরাসি গৌরব সমাধি "সিডনে" (১)
দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে বিহ্বল,
ফরাসি অদৃষ্টে—বাঙ্গালি নয়নে
ঝরেছিল না কি এক বিন্দু জল?

১২

রুসিয়া প্রুসিয়া—নব গৌরবিণী
রণ রঙ্গভূমে সিংহিনী যুগল!
চলিছে রসিয়া দক্ষিণ বাহিনী,
ব্রিটিশ হর্য্যক্ষ কটাক্ষে বিহ্বল!
একদিকে ফ্রাঞ্চ, ভূতল-শায়িনী,
অন্যত্রে প্রুসিয়া হঠাৎ-প্রবল,——
মরি দুই চিত্র!—ভাব প্রবাহিণী!
অন্ধ মানবের কি শিক্ষার স্থল!

১৩

আর এক পদ!——একেবারে তুমি
ডুবিলে অদৃষ্ট অতল সাগরে,
সম্মুখে তোমার রোম রঙ্গভূমি,
চিহ্নমাত্র আছে নদ টাইবরে!
ভুবন বিজয়ী অভিনেতৃগণ,

(১) Sedan.

সময়ের গর্ভে হইয়াছে লয়;
জগতবিস্ময় কীর্ত্তি অগণন,
কল কলে ওই নদে মাত্র কয়!

১৪

গ্রীকের গৌরব শ্মশান যুগল——
স্পার্টা, এথেন্স——করিয়া দর্শন,
ঝরিল না সখে! নয়নের জল,
হস্তিনা, অযোধ্যা, করিয়া স্মরণ?
তীর্থ "থর্ম্মপলি" দেখেছ কি হায়!
শত ত্রয়ে যথা, রক্তে আপনার,
স্বাধীনতা রত্ন রক্ষিল হেলায়?
ভারতে আমরা তুলনায় তার——

১৫

যাক্ সেই দুঃখ কি হবে বলিয়া?
বল সখে তব আছে কি স্মরণ?
যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া
বলেছিলে——মনে আছে কি এখন?
বলেছিলে—"মাতঃ ভারত দুঃখিনি!
তব দুঃখে মাত! হৃদয় বিকল;
সহিতে না পারি, দিবস যামিনী
ভারত বৈধব্য—মাতৃ চিতানল।"

১৬

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি,
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পসিয়া;
জগত জীবন ইউরোপে ভ্রমি,
আসিয়াছে সখে কি ফল লভিয়া?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন;
শিখেছ গণিতে নক্ষত্র মণ্ডল,
কিন্তু তাহে সখে! হবে কি বারন
"মাতার রোদন,—মাতৃ চিতানল?"

১৭

ইংরাজের শ্মশ্রু ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার——প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহ চর্ম্মে তুমি মেষ অল্প প্রাণ!

১৮

হয়েছ "চিহ্নিত"!—কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে সখে হইবে না ছিন্ন,
দীনা ভারতের অদৃষ্ট শৃঙ্খল।

* * * *

শ্রীনঃ

☞ এই উৎকৃষ্ট কবিতার শেষাংশ অনুমোদনীয় নহে।—বং সম্পাদক।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেল।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতা নিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রত্নে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুর গৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হে বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে? সঙ্গের লোক বলিল "আজ্ঞা হাঁ—দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।" বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি? কি দোষ?" ভৃত্য বলিল, "বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।" আমরা এই বঙ্গদর্শনে, কখন সর্ জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাঁহার নিন্দা তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবন স্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে, আমাদের ভয় করে যে পাছে কেহ বলে, যে বঙ্গদর্শনের উল্কি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা—(কোনগুলি পত্র আর কোনগুলি পত্রিকা তাহা আমরা ঠিক্ জানি না—কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি)—যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে—এবং সাম্বৎসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উল্কি পরে, তাহার অনেক সুখ।

এক্ষণে সর্ জর্জ কাম্বেল এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয় তবে আরও সুখ। সর জর্জ কাম্বেল গুণবান্ হউন বা না হউন উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষায়, আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরুতর দুর্ভিক্ষবহ্নিতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল—তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম—খবরের কাগজ চলিতেছিল, বাঙ্গালি বাবু গল্পের মজলিশে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সর্ জর্জের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে!

এইরূপ সর্ব্বজন নিন্দার্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্ জর্জ কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল,

এইজন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে এইরূপ সর্ব্বজন নিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্—নয়ত দুই। জিজ্ঞাস্য, সর্‌জর্জ কাম্বেল, অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্, বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল?

তাঁহার পূর্ব্বগামী শাসনকর্ত্তা সর্ উইলিয়ম গ্রে। সর্ উইলিয়ম গ্রের ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্‌ জর্জ কাম্বেল ও সর্ উইলিয়ম গ্রের এই ভাগ্যতারতম্য কোন দোষে বা কোন গুণে? কোন গুণে সর্ উইলিয়ম সকলের প্রিয়, কোন দোষে সর্ জর্জ সকলের অপ্রিয়?

যাঁহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটীশ ভারতীয় শাসন প্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল—ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্ত্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয় সে কোন্ রীতি অবলম্বন করিয়া?

সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি, একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিস্যানরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন, যে নদীতীরস্থ প্রাচীন বাঁধ সকল রক্ষিত হইতেছে না—তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে রিপোর্ট তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটরি সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন—তাঁহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল—তিনি বলিলেন ইহার বিশেষ অবস্থা জানিবে—অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় কি তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে তাহা লিখিবে। বোর্ড, ঐ পত্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিস্যানরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিস্যানর, অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া তাহার কোণে পেন্‌সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাক্সে ফেলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশির স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌঁছিল। কেরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায় সেই পথ,—দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন "সবডি-

বিজন ও ডেপুটিগণ বরাবর।" চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আট-চালা নিবাসী বোতামশূন্য চাপকান ধারী কাল কোল নাদুস নুদুস ডিপুটি বাহাদুরের ছিন্ন পাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধু লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরেরা প্রায় উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সবইনস্পেক্টর গণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন—সবইনস্পেক্টর পরওয়ানা কনষ্টেবলের হাওয়ালা করিল—কনষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ সেইখানে, কাল কোর্ত্তা কাল দাড়ি, এবং মোটা রুল লইয়া, দর্শন দিয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে "তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?" চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?" কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারিতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা খরচ লিখিয়া, কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। কনষ্টেবল আসিয়া সবইনস্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন "বাঁধ সব বেমেরামত—জমীদার মেরামত করে না—জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে।" ডিপুটি বাহাদুর লিখিলেন, "বাঁধ সব বেমেরামত,—জমীদারেরা মেরামত করে না—তাহারা মেরামত করিলেই হয়।" কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকন্তু "এক্ষণে জমীদারদিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।" কমিস্যনর, সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে, কি প্রকারে জমীদার বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে?" বোর্ড তত্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব, সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশে বিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিত্রপক্ষ তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল—শত্রুপক্ষ নানা জাতীয় ইংরেজি বাঙ্গালায় তাঁহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা এ প্রথা

অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন এইরূপ কার্য্য প্রণালীকে "কলে শাসন" বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে; কোন দিগ্ হইতে কোন কর্ম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস, বা অন্য প্রকার ফাঁপি উঠিয়া, কলে লাগিলে, কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিসানর প্রভৃতি অধোধঃ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মুদ্রিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলে তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে।

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখন কোন নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যথার্থ স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসন যন্ত্রের একটি অংশ মাত্র—যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরি লিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টাপূর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, আবার কলে মিশিয়া যায়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে সর উইলিয়ম গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্ জর্জ কাম্বেল তাহা করিতেন না।

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও, লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্ব্ব প্রচলিতা রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন, শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না; যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই, অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত।

সর্ উইলিয়ম গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল, কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উত্তমেরই

উদ্দেশ্য; কিন্তু সর্ উইলিয়ম গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্ জর্জ কাম্বেলের উদ্দেশ্য শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতেছি না যে সর্ জর্জ কাম্বেল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্ উইলিয়ম গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই, যে সর্ জর্জ কাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহাহইতে বিরত হইতেন না। সর্ উইলিয়ম গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয় আপনি হউক; কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক,—আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ন প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালি মহলে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালি বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি তাহা বুঝেন নাই; কেবল আট্‌কিন্‌সন সাহেব কল টিপিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়া কলের পুত্তলী সর্ উইলিয়ম গ্রে উচ্চ শিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন।

এমন নহে, যে সর্ জর্জ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে; যিনি ইচ্ছা তিনি শাসন কর্ত্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে; সকল শাসনকর্ত্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্ জর্জ কাম্বেল কলে সিদ্ধ তত্ত্বগুলি অবশ্যগ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্তৎস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর্ জর্জ কাম্বেল কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে সকলের মন রাখিয়া কাজ করিতেন; গালিগালাজকে বড় ভয় করিতেন। সম্বাদপত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন; ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনকে মুরুব্বি বলিয়া মানিতেন। সুখ্যাতির আশায় এবং গালির ভয়ে, তিনি সম্বাদপত্রের আজ্ঞাকারী ছিলেন; ব্রি, ই, আসোসিয়েসনের প্রধান মেম্বরদিগের কেনা বেচার মধ্যে ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেল, কাহারও নিকট সুখ্যাতি খুঁজিতেন না; কাহারও অনুরোধ রাখিতেন না। সম্বাদপত্র সকলকে ঘৃণা করিতেন ব্রিটীশ ই: আসোসিয়েসনকে ব্যঙ্গ করিতেন। অতএব একজন যে লো-

কের প্রিয়, আর একজন অপ্রিয় হইবেন ইহা সহজেই অনুমেয়।

সর্ উইলিয়ম গ্রে কিয়দংশে প্রিয়বাদী ছিলেন, সর্ জর্জ কাম্বেল বড় অপ্রিয়বাদী ছিলেন। সকলকে কটু বলায় সর্ জর্জ কাম্বেলের বিশেষ আমোদ ছিল। তাঁহার গুরুতর অহঙ্কারই এই অপ্রিয়বাদিত্বের একটী প্রধান কারণ। তিনি জানিতেন, যে পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত, এবং বিজ্ঞ, একা সর্ জর্জ কাম্বেল; আর সকল মনুষ্যই মূর্খ, নির্ব্বোধ, অসার, ভণ্ড এবং স্বার্থপর। তিরস্কারই তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার। এইরূপ তমোভিভূত হইয়া সর্ জর্জ কাম্বেল, কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করিতেন না। নিজেও দেশের অবস্থা কিছুই জানিতেন না। অথচ সকল বিষয়েই আত্মবুদ্ধিমত মীমাংসা করিয়া হস্তক্ষেপ করিতেন। তাহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছেন।

সর্ জর্জ কাম্বেল এদেশীয়গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, ইহারা অকর্ম্মণ্য—কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য। এই ঘৃণা, তাঁহার শাসন কার্য্যের আর একটি ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহার প্রতি ঘৃণা আছে তাহার সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখ দুঃখের ভাগী না হইলে, কখন প্রজার সুখ বৃদ্ধি, দুঃখ নিবারণ করা যায় না।

সর্ উইলিয়ম গ্রে, ও সর্ জর্জ কাম্বেল উভয়েই স্বেচ্ছাচারী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যিনি যাহা ধরিতেন, তিনি তাহা আর ছাড়িতে চাহিতেন না। দুই জনের "রোখ" বড় ভয়ানক ছিল—দণ্ড প্রণয়নের সাধ দুই জনেরই বড় গুরুতর ছিল। দুই জনেরই একটি নিতান্ত নিন্দনীয় দোষ ছিল, যে বিনাপরাধেও দণ্ডবিধান করিতেন। বিশেষ সর জর্জ কাম্বেলের ন্যায়নিষ্ঠতা কিছুই ছিল না।

স্থূল কথা এই যে সর্ জর্জ কাম্বেল অত্যন্ত গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, কৃষ্ণচর্ম্মে ঘৃণাবিশিষ্ট, পরোপদেশে বিরক্ত, স্বেচ্ছাচারী, অপ্রিয়বাদী, অপ্রিয়কারী অন্যায়পর শাসন কর্ত্তা ছিলেন। সর্ উইলিয়ম গ্রের এত দোষ ছিল না; তিনি কেবল স্থূলবুদ্ধি ছিলেন; কোন রূপে লোকের মন রাখিয়া, কলে শাসন করিয়া, নিন্দার হাত হইতে মুক্তিলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

গুণ পক্ষে, সর জর্জ কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত অভাব ছিল না। তিনি বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী, এবং অধ্যবসায় সম্পন্ন। দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, তিনি ক্ষিপ্রকারী এবং দূরদর্শী। তিনি সাম্যবাদী। প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া থাকুন, বা না থাকুন, তিনি প্রজার হিতৈষী। সর্ উইলিয়ম গ্রের গুণের মধ্যে কেবল ইহাই আমাদের স্মরণ হইতেছে, যে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিলেন। সর্ জর্জ কাম্বেলের মত বহু গুণে গুণবান্ ও বহু দোষে দোষী শাসনকর্ত্তা কেহই এদেশে আসেন

নাই; সর্ উইলিয়ম গ্রের মত দোষ শূন্য ও গুণ শূন্য কেহ আসেন নাই। গুণবান্ ও দোষযুক্তের শত্রু অনেক; নির্দ্দোষ ও নির্গুণের শত্রু থাকেনা। সর্ জর্জ কাম্বেলের নিন্দা এবং সর্ উইলিয়ম গ্রের সুখ্যাতির কারণই এই।

কিন্তু কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সে নিন্দা ও সুখ্যাতির সকল কারণ বজায় থাকে না। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছি।

রোডশেষের আইন প্রচার করার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল বিশেষ নিন্দিত, কিন্তু এবিষয়ে সর্ জর্জ কাম্বেলের দোষ কি? তিনি কেবল উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রোডশেষের দায়ী ডিউক্ অব আর্গাইল; অধস্তন কর্ম্মচারীর সাধ্য নাই উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সর্ জর্জ কাম্বেল রোডশেষ বিধিবদ্ধ করিয়া অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞাপালন করিয়াছেন মাত্র।

নূতন কার্য্যবিধি আইনের দুইটি নিয়মের জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল নিন্দিত হইয়া থাকেন। প্রথম, জুরির বিচারের অলঙ্ঘনীয়তার উচ্ছেদ, দ্বিতীয়, সরাসরি বিচারের প্রথা।

সরাসরি বিচার প্রথার আমরা অনুমোদন করি না। অনুমোদন করি না, তাহার কারণ এই যে এ দেশীয় বিচারকগণ অনেকেই এই ক্ষমতার অযোগ্য। কিন্তু বিচারক অযোগ্য বলিয়া, আইন অসম্পূর্ণ থাকিবে কেন? একটি কথা বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যেরূপ লিখিত বিচার প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে অনেক বিলম্ব হয়। বিচারকেরা যে কয়েকটির বিচার করিতে পারেন, সেই কয়টির বিচার করিয়া অবশিষ্টের দিন ফিরাইয়া দেন। এইরূপ অনেক মোকদ্দমার দিন, পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া যায়। অর্থী প্রত্যর্থী অনেকবার কষ্ট পাইয়া, রফা করিয়া চলিয়া যায়। না হয়, সাক্ষী পলায়; নয়, ধনী পক্ষ, সময় পাইলে অর্থ ব্যয় করিয়া সাক্ষিগণকে বশীভূত করে। এইরূপে বিচারকের অনবকাশে অনেক মোকদ্দমার বিচার একেবারে হয় না। ইহার দুইটী মাত্র উপায় সম্ভবে; প্রথম, বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয় বিচারকের অবকাশ বৃদ্ধি। প্রথম উপায়, অর্থব্যয়সাপেক্ষ; বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলে, আবার নূতন টেক্স বসাইতে হয়। টেক্সের নামে লোকের যেরূপ ভয়, টেক্স বসিলে লোকের যেরূপ কষ্ট, টেক্সের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজার যেরূপ অসন্তোষ তাহাতে আর টেক্স বসান সম্ভব নহে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা বাড়াইবার কোন উপায় নাই। অতএব বিচারকের অবসর বৃদ্ধি ভিন্ন এ অবিচার নিবারণের উপায়ান্তর নাই। বিচারকের অবসর বৃদ্ধির একমাত্র উপায় আছে। যাহাতে মোকদ্দমায় অল্প সময় লাগে, তাহা করিলেই অবসর বৃদ্ধি হইতে পারে। এই

জন্য সরাসরি বিচারের সৃষ্টি। ইহার অন্য কোন উপায় নাই—কেবল কতকগুলি মোকদ্দমায় লেখা পড়ার অল্পতা করা এক মাত্র উপায়। যদি বল, আপিল উঠিয়া গেল কেন? উত্তর, প্রমাণ লিপিবদ্ধ না থাকিলে কি দেখিয়া আপিল আদালত বিচার নিষ্পত্তি করিবেন।

জুরির বিষয়েও একটী বিশেষ কথা আছে। যদি হাঁড়ি গড়া, ঘটি গড়ায় নৈপুণ্য শিক্ষার অধীন, তবে বিচার কার্য্যেই শিক্ষার প্রয়োজন নাই, এ কথা নির্ব্বোধ বা কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই বলিবে। বিচার কার্য্য শিক্ষিত জজের দ্বারা হওয়াই কর্ত্তব্য—যে অনেক দিন ধরিয়া কোন একটি কাজ অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই শিক্ষিত বলিতেছি। যদি কাঁসারীকে ঘটী গড়িতে না দিয়া, তাঁতিকে কাপড় বুনিতে না দিয়া, পাঁচজন মাটি কাটা মজুরকে দিয়া ঘটি গড়ান, বা বস্ত্র বুনান, ভাল না হয়, তবে যে বিচারকার্য্য শিল্পকর্ম্মাপেক্ষা শতগুণে কঠিন, তাহাতেই কি কেবল, শিক্ষিতাপেক্ষা অশিক্ষিতের কার্য্য ভাল? অনেকে বলেন, একজন বিচারকের উপর নির্ভর করিলে ভুলের সম্ভাবনা অতএব একজন জজের অপেক্ষা পাঁচ জন জুরির বিচার ভাল। ইহা বলিলে বলিতে হয় যে একজন নিউটন অপেক্ষা পাঁচ জন পাঠশালার গুরু গণনায় ভাল, একজন হক্সলী অপেক্ষা পাঁচটা নেটিব ডাক্তার শারীরতত্ত্বে ভাল, একজন কালিদাস অপেক্ষা বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের পাঁচজন পত্র প্রেরক কবিত্বে ভাল। আমাদিগের সংস্কার আছে যে যাহা বিলাতী, তাহাই ভাল, বিলাতে জুরির প্রথা প্রচলিত আছে, সুতরাং আমাদের দেশেও ঠিক সেই জুরির বিচার চালাইতে হইবে! এরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট লোকে জানেন না যে ইংলণ্ডে যখন বিচারকেরা পক্ষপাতী ছিলেন, ধনীর বশীভূত হইয়া দীনের অন্যায় দণ্ড করিতেন, তখন দীনের, রক্ষার্থ দীনের দ্বারা দীনের বিচার, ধনীর দ্বারা ধনীর বিচার, সমানের দ্বারা সমানের বিচার, এই প্রথা সৃষ্ট হইয়াছিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডে সে অবস্থা নাই, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশাচারপ্রিয় দেশে দেশাচার শীঘ্র লোপ পায় না বলিয়াই উহা অদ্যাপি চলিতেছে। এবং কতকগুলি অনুকরণভক্ত দেশেও গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জুরির বিচারের প্রথার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ, বিশেষ প্রকারে জুরির বিচার প্রথার অযোগ্য। জুরির সৃষ্টি হইয়া অবধিই ভারতবর্ষে অবিচার হইতেছে—দোষী দোষ করিয়া, সেসন হইতে প্রায় খালাস পাইয়া আসিতেছে হুগলীতে নবীনের বিচার, ইহার একটি জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘোর অবিচার নিবারণের জন্যই সর্ জর্জ কাম্বেল জুরির আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। সে জন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি যে জুরির

প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করেন নাই, ইহাতেই আমরা দুঃখিত।

কার্য্যবিধি আইন সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদিগের বলিতে বাকি আছে। ব্রিটীশ-ভারতবর্ষীয় রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক—দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য। দেশীর জন্য এক আইন আদালত—সাহেবের জন্য ভিন্ন আইন আদালত। এই লজ্জাকর কলঙ্ক মেকলে হইতে লরেন্স পর্য্যন্ত অনেকে অপনীত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কেহ শক্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ কাম্বেল হইতেই সেই কার্য্য কিয়দংশে সিদ্ধ হইতেছে। এবিষয়ে তিনি দেশীয় লোকের পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। অন্য কেহ করিলে, এতদিন তাঁহার সুখ্যাতিতে দেশ পুরিয়া যাইত। সর্ জর্জ কাম্বেল এ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই।

উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার আর একটি নিন্দার কারণ। যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ করিতে হইবে, যে সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান অধিকার। শিক্ষায় ধনীর পুত্রের যে অধিকার, কৃষক পুত্রের সেই অধিকার। রাজকোষ হইতে ধনীদিগের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনদিগের শিক্ষায় অল্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায় বিগর্হিত কথা। বরং নির্ধনদিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয়, এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত; কেন না ধনিগণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্ধনগণ, সংখ্যায় অধিক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্য গতি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপর শিক্ষার্থ যে প্রণালীতে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে; দরিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে। যখন ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট হইতে এ প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া, ধনীর শিক্ষার ব্যয়ের লাঘব করিয়া, দরিদ্র শিক্ষার ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর্ উইলিয়ম গ্রে "উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা!" করিয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া, দেশের লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের মঙ্গল করেন নাই। যদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহা দরিদ্র শিক্ষায় ব্যয় করিবার জন্য সর্ জর্জ কাম্বেল উচ্চশিক্ষার ব্যয় কমাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না।

আরও কয়েকটি বিষয়ের সমালোচনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে এ প্রস্তাবের আর সম্প্রসারণ করিতে পারিলাম না। উপসংহারে বক্তব্য যে যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে সর্ জর্জ কাম্বেলের কৃত এমন কি কার্য্য আছে যে তজ্জন্য সর্ জর্জের কিছু প্রশংসা করিতে পারি? আমরা তাহা হইলে বলিব, যে

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি উপকার করিয়াছেন, ব্রিটীশজাত প্রজাকে এতদ্দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিয়াছেন, প্রবিনসিয়াল আয় ব্যয়, তাঁহার হস্তে যেরূপ সুনিয়মবিশিষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে যদি কাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সর্ উইলিয়ম গ্রের কৃত এমন কোন কার্য্য আছে, যে তজ্জন্য আমরা তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া প্রশংসা করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন? উচ্চশিক্ষার পক্ষ সমর্থন?

অনেকে এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া লেখকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এদেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে সর্ জর্জ কাম্বেল, মনুষ্যাকারে পিশাচ ছিলেন। আমরা পিশাচ বলিয়া তাঁহাকে বর্ণিত করি নাই। তিনি বহু দোষযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দোষের বর্ণনার অভাব নাই। যাহার অনেক দোষ, তাহার কোন গুণ আছে কি না, এ বিষয়ের সমালোচনার ফল আছে—যে এক চক্ষে দেখে সে অর্দ্ধেক অন্ধ। এ প্রস্তাবের জন্য, যদি কেহ রাগ করেন, আমাদের আপত্তি নাই। কোন শ্রেণীর পাঠকের সন্তোষের কামনায় কোন প্রকার কথা এ পত্রে লিখিত হয় না; কোন শ্রেণীর পাঠকের অসন্তোষের আশঙ্কায় কোন কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে, এ পত্রের লেখকেরা সঙ্কুচিত নহেন। বর্ত্তমান লেখক সর্ জর্জ কাম্বেল কর্ত্তৃক কোন অংশে উপকৃত বা সর্ উইলিয়ম গ্রে কর্ত্তৃক কোন অংশে অপকৃত নহেন; যাহা লিখিত হইল, সত্যানুরোধেই লিখিত হইল। এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে; ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে। যদি এই প্রবন্ধের সাহায্যে কেহ এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ প্রস্তাবের সার্থকতা হইল।

শ্রীভজরাম।

শ্রীহর্ষ।

ইউরোপে প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত নিচয় সঙ্কলিত হইয়া ক্রমেই প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক ও রোমক দিগের ইতিহাস তত্তৎ জাতির বিচক্ষণ পণ্ডিত বর্গের দ্বারা লিপিবদ্ধ হওয়াতে এক্ষণে উক্ত জাতিদ্বয়ের সুপ্রসিদ্ধ রাজা ও পণ্ডিতগণের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার কোন অসুবিধা হইতেছে না। কিন্তু আমরা রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্র, কুরু পাণ্ডব, ব্যাসদেব ও বাল্মীকির জীবন চরিত অবগত হইবার চেষ্টা করিলে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়। আমাদিগের দেশে প্রকৃত জীবন চরিত লিখিবার প্রথা ছিল না সুতরাং এক্ষণে প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেই নানা গোলযোগ

উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাচীন তাম্রশাসন, অশোক স্তম্ভ ও অন্যান্য জয়স্তম্ভ লিপি তথা মৌর্য্য, গুপ্ত, পালবংশীয় প্রভৃতি নৃপতিগণের প্রাচীন মুদ্রা সন্দর্শনে ভারতবর্ষের অনেক বিবরণ আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট জেনারেল কনিংহ্যামের ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করায় পৃথ্বীতলে প্রোথিত প্রাচীন তাম্র শাসন, মুদ্রা, প্রস্তর ফলকস্থ লিপি হইতে নানা প্রাচীন বিষয় জ্ঞাত হইতেছি। সম্প্রতি তিনি মথুরা কঙ্কালী স্তূপ মধ্যে তাম্রশাসন ও অনেক বৌদ্ধলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন এ সকল পুরাবৃত্ত লেখকগণের পরম আদরণীয় হইবেক।

তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির মুদ্রিত বিষয় পাঠে কোন নৃপতির কাল নিরূপণ নির্ব্বিঘ্নে স্থির হইতে পারে কিন্তু এক মাত্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে কোন্ প্রাচীন কবি বা মহাজনের জীবন চরিত সম্বন্ধীয় বিবরণ সঙ্কলন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহাতে নানা মুনির নানা মত; এক খানি গ্রন্থ এক রূপ এবং আর এক সময়ের অপর এক জন গ্রন্থকার সেই বিবরণ ভিন্ন প্রকার সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা হইতে সত্য নিরাকরণ করিয়া কেহই ভ্রমশূন্য প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। মহামহোপাধ্যায় উইলসন সাহেব যে সকল কবি ও নৃপতিগণের কাল নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, প্রায় সে সেকল আধুনিক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণের ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। লাসেন, পাণ্ডি, এডালং, সেজি প্রভৃতির ত কথাই নাই, ভট্ট মোক্ষমূলরেরও ঐতিহাসিক ভ্রম মৃত অধ্যাপক গোলড্‌ষ্টুকার কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে; কাজেই আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যদি কোন মহাত্মা আর্য্যগণের ইতিবৃত্ত বহু যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার প্রস্তাবও ভ্রমশূন্য হয় কিনা সন্দেহ; তবে এক বিষয়ের যতই তর্ক বিতর্ক চলিবে ততই তাহা ক্রমে উত্তম রূপ সামঞ্জস্য হইয়া আসিবে।

আমি প্রথম বর্ষের বঙ্গদর্শন ৫১৫ পৃষ্ঠায় শ্রীহর্ষাখ্য একটী বিবরণ প্রকাশ করি। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া গত সংখ্যার বঙ্গদর্শণে বিচক্ষণবর "শ্রী রাজ" স্বাক্ষরিত মহাশয় একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে দুই জন শ্রীহর্ষ। একজন নৈষধকার ও একজন রত্নাবলীপ্রণেতা। নৈষধকার শ্রীহর্ষকে কোন বিজ্ঞ বন্ধুর কথাতে চট্টোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ লিখিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত ভ্রম আমার প্রথম ভাগ ঐতিহাসিক রহস্যে সংশোধিত হইয়াছে।

আমি অনেক দিবস হইল একদা কথোপকথন চ্ছলে বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়াছিলাম যে শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব এবং ইহাঁর বংশজাত ধুরন্ধর মুখটী বঙ্গ দেশীয় মুখোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ। যথা

ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজাতঃ

ধুরন্ধর মুখরটী সচ মুখ্যঃ।

সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ বুলার সাহেব বম্বের আসিয়াটীক সোসাইটীর অধিবেশনে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব পাঠ করেন, তাহাতে তিনি জৈন লেখক রাজশেখরের প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে কবির জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আমি রাজশেখরের গ্রন্থ পাঠ করত উক্ত মহোদয়ের প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বঙ্গদর্শনে এবং ইংরাজী ভাষায় বম্বে প্রদেশের ইণ্ডিয়ান এন্‌টিকুয়ারী নামক মাসিক পত্রিকার সংখ্যাদ্বয়ে শ্রীহর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করি; শেষোক্ত প্রস্তাব দ্বয় মেং গ্রাউশ সাহেবের মত খণ্ডন করিয়া শ্রীহর্ষকে কবিচন্দ্র ভট্টের সমসাময়িক স্থির করিয়াছি। এই মর্ম্মে সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাহাও ঐতিহাসিক রহস্য পরিশিষ্টে প্রকাশ হইয়াছে। রাজশেখর ১৩৪৮ খৃঃ অঃ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার বিবরণ কবির পরিচয়ের সহিত ঐক্য আছে এবং পুরুষ পরীক্ষায় বিদ্যাপতি মেধাবী কথায় শ্রীহর্ষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও রাজশেখরের বিবরণের সহিত অনৈক্য হয় না। শ্রীহর্ষ স্বয়ং কহিয়াছেন তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে সম্মানসূচক তাম্বূলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; রাজশেখর এই নৃপতিকে কান্যকুব্জাধিপতি জয়ন্তচন্দ্র স্থির করিয়াছেন তাহা হইলে শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর ব্যক্তি। শ্রীহর্ষ "গৌড়োর্ব্বী শকুল প্রশস্তি" রচনা করাতে তাঁহার গৌড়ে আগমন স্থির হইতেছে। এক্ষণে একটী কথা গুরুতর বোধ হইতেছে; প্রস্তাব লেখক হল সাহেব কৃত বাসব দত্তার ভূমিকা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে ভোজদেব কৃত সরস্বতী কণ্ঠাভরণ মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ কথা প্রকৃত হইলে কিছু গোলযোগের বিষয় বটে, কেননা তাহা হইলে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান ছিলেন প্রমাণ হইবেক কিন্তু আমার নিকট রত্নেশ্বরের টীকা সহ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ আছে, তাহার মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাইলাম না এবং বুলার সাহেব লিখিয়াছেন তিনিও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কার গ্রন্থে দেখেন নাই। আফ্রেক্‌ট্‌ মহোদয়ও তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই, কাজেই এ কথাটি প্রামাণিক হইতেছেনা, আবার যদি কোন একখানি সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক থাকে, তবে তাহা অধুনিক কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিব —এজন্য তাহা কৃত্রিম। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি চাঁদকবি শ্রীহর্ষের সমকালিক। চাঁদ শ্রীহর্ষের মান্যবৃদ্ধি জন্য তাঁহার নাম পৃথ্বীরাজ চৌহানরাসের প্রস্তাবনায়, কালিদাসের পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে "নরের প্রধান, সার কবি শ্রীহর্ষ" বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ, কুমারপাল, হেমচন্দ্র, চাঁদ সকলেই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে প্রস্তাব লেখক যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সমুদয় ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ কর্ত্তৃক এবং পি, এন, পূর্ণিয়াকর্ত্তৃক Indian Antiquary প্রকাশিত হইয়াছে, আর তিনি যে কুসুমাঞ্জলীর তথা খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের শ্লোক লইয়া উদয়নাচার্য্য এবং বাচস্পতিমিশ্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা কিছুই নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইলনা, সমুদয় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বকতৈলঙ্গের লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখ আছে*।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ কৃত রত্নাবলী, ধাবকপ্রণীত প্রমাণ্ন করিবার নিমিত্ত "শ্রীরাজ" মহাশয় যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সমুদায় ইতি পূর্ব্বেও আমার কৃত প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল, তথাপি সে সকল প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বহু শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা স্বীকার করিয়াছেন এক "কাব্য প্রকাশের" প্রমাণ বেদবৎ মান্য করিয়া শ্রীহর্ষের কীর্ত্তি লোপ করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। প্রস্তাব লেখক বলেন "মধুসূদন" "ভাববোধিনী" নাম্নী ময়ূরাষ্টকের টীকায় লিখিয়াছেন যে বাণভট্ট "যে শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা।" মধুসূদন পঞ্চানন্দ বংশোদ্ভব মাধব ভট্টের পুত্র এবং বালকৃষ্ণের ছাত্র, তিনি ময়ূর শতকের টীকাকার। সেই টীকার নাম "ভাববোধিনী।" প্রস্তাব লেখক তাঁহাকে ভ্রমক্রমে ময়ূরাষ্টকের টীকাকার বলিয়াছেন। "ভাববোধিনী" ১৬৫৪ খৃঃ অঃ সুরাটে লিখিত হইয়াছিল। আমরা উহা দেখি নাই। সম্প্রতি অধ্যাপক বুলার সাহেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই টীকার প্রমাণ এবং মম্মটাচার্য্যের "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদিনামিব ধনম্" বাক্য আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এ সকল কথা প্রামাণিক স্থির করিবার চেষ্টা করিলে বলবৎ প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক।

শ্রীরামদাস সেন।

* Vide Indian Antiquary Page 297 Vol I:

পূর্ব্বরাগ।

১

দেখ সখি নাগর রাজে,
ও মুখ সুন্দর হেরি বিধুবর
জলদে লুকায় লাজে,
মরকত ভাতি জিনি তনু কাঁতি
ভূষিত বনফুল সাজে,
চলন সুরঙ্গে তরল তরঙ্গে
নূপুর রুণু রুণু বাজে,
সজনি নব বৃন্দাবনে মদন বিরাজে।

২

ফুটল শতদল সর-উর মাঝে,
সাজল উপবন নব বধূ সাজে,
জুটল অলিদল লুটল পরিমল
ছুটল মলয় বাতাসে,
কেতকী হাসল পিককুল ভাসল
মঙ্গল মাধবী মাসে,
তাহে সখি পুন পুন ব্রজপতি নিকরুণ
খরলোচন শর করত বিথার,
কৈসে জীয়ব সখি প্রাণ হমার।

৩

অধর বিকাশিত মধুরিম হাসে,
ডারি রমণী মন প্রেমক ফাঁসে,
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক বিলোকনে
কহত রভসময় বাত,
মনসিজ তাপে বিরহ বিলাপে
যুবতী মরমে মরি যাত,
পৈঠি হৃদয়মে নাশত ভরমে
হরত হরি মন প্রাণে,
সখিরে কৈসে রাখব অব কুলশীল মানে।

৪

মধুর মুরলীবর তান বরিখে,
মুরছত মুনি মন ভারত বিখে,
রাই রাই করি বাজত বাঁশরী
বিপিনে বোলায়ত মোয়,
হম কুল নারী কহই ন পারি
যৈসন হিয়ে মুঝ হোয়,
ডগমগ ডোলে পীরিতি হিলোলে
ফুটত রসে অতি গাঢ়ি,
সখি কৈসে রহব ঘরে মাধবে ছাড়ি।

রত্ন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রসকাদম্বিনী; অর্থাৎ সংস্কৃত অমরুশতক কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ। মূল্য ।৵০

সংস্কৃত অমরুশতক কাব্য আদিরস প্রধান। প্রকৃত আদিরস জগতের একটী দুর্লভ পদার্থ। ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধকবি মিল্টন যখন ইদন উদ্যান মধ্যে প্রথম নরদম্পতিকে সৃজন করিয়া, মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব্ব আদিরস সঙ্ঘটিত হইয়াছে! সরলা নিষ্পাপা লোকমাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদি পুরুষ প্রত্যেক লোমকূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপরি প্রভাত সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলঝল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য। সেই জন্য আদিরসের প্রাধান্য।

কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটা সামান্য কথায় বলে, যে মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছিঁড়িয়া গেলে, তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধেও সেইরূপ। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এবং বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থে আদিরসের কুৎসিত বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অমরুশতকেরও অনেকগুলি শ্লোক নিতান্ত অশ্লীল। অনুবাদক বলেন, যে একশত শ্লোকের মধ্যে কেবল পাঁচটি অশ্লীল, তিনি সেই পাঁচটি অনুবাদ করেন নাই। অন্যগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে, "অনেকে মনে করেন এই শতক অশ্লীলতা দোষে দূষিত," "উহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র," "এরূপ কাব্যও যদি অশ্লীল হয়, তবে আদিরসের কবিতা মাত্রই তাদৃশ দোষে দূষিত হইতে পারে।" আমরা অনুবাদক মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, অমরুশতক অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এমন কি, ইহার মঙ্গলাচরণ সূচক প্রথম শ্লোকটিই কিঞ্চিৎ অশ্লীল। সেই অশ্লীল ছত্রটি পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা বঙ্গদর্শন পাঠককে, (পাঠিকাকে নয়) আশীর্ব্বাদ ছলে, সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম।

এই অলকগুলি, ললাটে পড়িছে ঝুলি,
মণিময় কাণবালা দোলে ঝলমলে,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল, ফুটে যেন মুক্তাফল,
তিলক পুছিয়া যায়, সেই ঘর্ম্মজলে।
ছল ছল মিটি মিটি, সেই কামিনীর দিঠি,
অলস আবেশে আর শ্রম প্রেমভরেতে,
মুখখানি হোক তারি, তোমার মঙ্গলকারী,
কি কাজ কেশব-শিব ব্রহ্মাদি দেবেতে?

অমরুশতককাব্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনুবাদক মহাশয়ের সহিত এক মত হইল না বলিয়া, আমরা তাঁহার রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিলে, আমাদের অধর্ম্ম হইবে। রসকাদম্বিনীকারের অনুবাদ ক্ষমতা অতি সুন্দর। অনুবাদিত গ্রন্থ, অনেক সময়েই নীরস, কটমট, এবং বিস্তার বিশিষ্ট হয়, এরূপ হইয়াও হয়ত মূলের ভাব কিছুই থাকে না; কিন্তু রসকাদম্বিনী সেরূপ নহে। ইহার রচনা, অতি সহজ, সুমিষ্ট, এবং ইহাতে মূলের সকল কথাগুলি না থাকুক অমরুশতকের ভাবটি ইহাতে সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। নিজের কবিত্ব বোধ না থাকিলে কখন এরূপ হইত না, রসকাদম্বিনীকার একটি ক্ষুদ্র কবি। এত কথা বলিয়া যদি দুই চারিটি শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করি তাহাহইলে বিশেষ দোষ না হইলেও না হইতে পারে। দুটি মানের কবিতা দেখুন। এ মান শ্রীমতীর দুর্জ্জয় মান নহে। ইহা মান, অভিমান নহে। তুষার নিজে লুপ্ত হইয়া পানীয় জলের শীতলতা বৃদ্ধি করে,

বলিয়াই তুষারের আদর। এই মান তুষার—প্রণয়িনীর হৃদয় সরসীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গলিয়া গিয়া প্রণয়ভাণ্ডার শীতল করে বলিয়াই এ মানের আদর। এই মান, প্রণয়রূপ গানের পক্ষে প্রকৃতই মান। মানের ঘরে ক্ষণেক বিচ্ছেদ বটে, কিন্তু এই মান না থাকিলে প্রণয় গানের লয় সঙ্গতি হয় না।

প্রথম, মানে কেবল হাসি :—

স্ত্রীপুরুষ দুজনায়, বিমুখে মানের দায়,
শুয়ে র(ই)ল বিছানায়, মৌনব্রত ধরি,
সাধিতে উতলা মন, তথাপি না ছাড়ে পণ,
আপন গৌরব ধন, রাখে যত্ন করি।
ক্রমে কিছু উচ্চশিরে, আড়চোখে ধীরে ধীরে,
দোঁহে দোঁহা পানে ফিরে লাগিল দেখিতে,
চোখে চোখে হল মিল, ভাঙ্গিল মানের খিল
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিল হাসিতে হাসিতে॥

দ্বিতীয়, মানে, হাসি কান্না :—

দেখিত নিরখি মোরে, বিধুমুখী কি আচরে,
এই ভেবে চুপে আমি রহিনু যতনে,
প্রেয়সীও তাই হেরি, মানেতে হইল ভারী,
মনে কৈল এ ধূর্ত্ত কি কহে মোর সনে।
এইরূপ দুইজনে, বিস্মিত নয়নার্পণে,
পরস্পর দেখিতেছি হেন অবস্থায়,
আমি হাসিলাম ছলে, সে নারীও অশ্রুজলে,
ভাসিয়া ধৈরজ শূন্য করিল আমায়।

এইস্থলে এইরূপ মানের একটি গান তুলিব। রসকাদম্বিনী হইতে নহে।

তৃতীয়, মানে, ঘোর বিপদ।

মনে মনে সাধরে।
কে আগে সাধিবে বল, ঘটিল প্রমাদ রে।
নয়নেতে লাজ অতি, হৃদয় ব্যাকুল
উভয়ে ত্যজিতে নারে মান অনুরোধ রে।

চতুর্থ, এ মানেও ঘোর বিপদ বটে, কিন্তু কেবল একজনের।

ভুরু বাঁকাইয়া রই, তথাপি অমনি সই,
উতলা হইয়া আঁখি তারি পানে ধায় লো
চিত্ততো কর্কশ করি, তথাপি যে সহচরি!
অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, তার কি উপায় লো?
বাক্যরোধ করি বটে তবু বিশৃঙ্খলা ঘটে,
পোড়া মুখে হাসি পায় রাখা নাহি যায় লো
যদি সে জনের সনে, দেখা হয় তবে মেনে,
মানের নির্ব্বাহ করা, ঘটে বড় দায় লো॥

তবে ইনি একলা মান করিতে চান? মানিনী বটে!

পঞ্চম, আর এক প্রকার মান, কেবল কান্না।

মান করে কি প্রকারে, আনল সখীরা তারে,
পূর্ব্বে তাহা শিক্ষা দেয় নাই,
অঙ্গ ভঙ্গী বাঁকা কথা, যে সব মানের প্রথা
নাহি জানে বালা কিছু তাই।
কান্তের প্রথম দোষে, সে বালা কেবল রোষে
কি করিবে লাগিল কাঁদিতে,
অশ্রুধারা দর দরে কপোল বহিয়া ঝরে
বন্যা যেন আসিল আঁখিতে।

সেই বন্যার জল যে বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়াছে সেই জানে আদিরস কি।

কবিতা কুসুমমালিকা। প্রথমভাগ। মেডিকাল কালেজের ইংরাজি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহা কর্ত্তৃক

প্রণীত। মূল্য দুই আনা। মালাগাছটি অতি ছোট বটে, কিন্তু ইহার কুসুমগুলি নূতন না হউক কোমল, নির্ম্মল, ও সুগন্ধি। তাহার পরিচয় প্রদান করিব। প্রদোষকালে কোথায় কি হইতেছে দেখুন—

একস্থানে,

কোকিল-কূজিত-কণ্ঠে মা মামা বলিয়া,
জননী সদনে শিশু করিছে গমন,
সে রব শুনিয়া কাণে বাহু পসারিয়া,
লইছেন স্নেহময়ী সন্তানরতন।

আবার কোথায় বা,—

পরাণপুত্তলি পুত্রে দিয়া বিসর্জ্জন,
পুত্রশোকাতুরা এবে দুখিনী জননী,
ঘন ঘন বলি মুখে কোথা বাছাধন
পুরিছে রোদন বোলে আকাশ অবনি।

কোনস্থানে,—

গৃহকাজ পরিহরি সধবা কামিনী
গাঁথিয়া কুসুমহার অতি চিকনিয়া,
ভেটিতেছে নিজ নাথে যেন পাগলিনী,
দেখাতে হৃদয়-নাট পরাণ খুলিয়া

কিন্তু অন্যস্থানে,—

পরাণপিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ বিহনে
কোথা প্রাণনাথ বলি, বিরলে বসিয়া
ভাসিছে নয়ন নীরে বিরহিণীগণে,
কার না দহে গো প্রাণ সে রব শুনিয়া?*

*সংসার এইরূপই বটে, কোথাও হাসি, কোথাও কান্না। যে হাসি দেখে হাসিতে পারে, কান্না দেখে কাঁদিতে পারে, সেই সাধু।

নবরসাঙ্কুর, অর্থাৎ আদিহাস্যকরুণ প্রভৃতি নবরসের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। শ্রীরসিকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছাপাতে ছিল।৵ আনা, হাতে কাটিয়া করা হইয়াছে ৵০আনা মাত্র। রসিক বাবুকে আমরা চিনি না, কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ আপন নামের গৌরব রক্ষার্থ এই গ্রন্থ প্রচার করিতেন তাহাহইলে, আমাদিগের কোন কথাই বলিবার ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে "বালকবর্গের রসানুভব জন্য উক্ত নবরস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিতেছি।" আমরা জিজ্ঞাসা করি নবরসের আলঙ্কারিক ভেদ জ্ঞান কি বালকের বোধ্য? এমন কি—রসিক বাবু যে হাস্যরসের উদাহরণটি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদিগেরই করুণরসাত্মক বলিয়া বোধ হইয়াছে, অথচ আমরা নিতান্ত বালক নহি, সুতরাং এই নবরস যে বালকে রসিক বাবুর মত বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয় না। বিশেষ একটা সামান্য কথায় বলে, "না হলে রসিকা বয়োধিকা রস বুঝে না।" আমাদের মন্দ অদৃষ্ট, তাহাতেই রসিক বাবুকেও এত কথা বলিতে হইল। স্থূল কথা, রসবোধ বালকের হয় না, গ্রন্থখানি বালকের উপযোগী হয় নাই; এবং বালোপযোগী কাব্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হয় না।

পল্লীগ্রামদর্পণ। নাটক। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১২৭৯

সাল মূল্য একটাকা, মফস্বলে ডাকমাস্থল দুইআনা। এই 'নাটক' গ্রন্থের 'সারপ্রমুখ' মধ্যে লিখিত আছে "দর্পণখানি অদ্য দয়াদাক্ষিণ্যবান্ স্বদেশ হিতৈষী গুণিজনগণ সন্নিধানে সমর্পণ করিলাম।" অতগুলি আভিধানিক বিশেষণে স্বত্বস্থাপিন করিতে আমরা আপাতত প্রস্তুত নহি, সুতরাং ঐ সকল নানা বিশেষণ যুক্ত জনগণ সমীপে 'নাটক'কার যেসকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পূরণ করিতে আমরা অপারগ। তবে গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজকে গ্রন্থের প্রতি 'সস্নেহ সকৃপ কটাক্ষ করিতে" অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা সাহিত্য সমাজের সভ্যভাবে এই অনুরোধ রক্ষা করিব। অনুরোধ রক্ষা করিব তাহার অন্য কারণও আছে; এবিষয়ে আমরা বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার কিজন্য গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা ইংরেজিতে গ্রন্থের শিরোদেশে লিখিয়া দিয়াছেন; তিনি সমালোচকের নিকট গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন, For his favourable opinion if available. গ্রন্থের প্রশংসাবাদকল্পে আমরা এই বলিতে পারি, যে গ্রন্থকার পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বর্ণন জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ। এটি আমাদের মনের কথা বিদ্রূপের কথা নহে।

হেমলতা। ১মখণ্ড ১ম সংখ্যা পাক্ষিকপত্র। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। অনেক দিন হইল এখানি পাওয়া গিয়াছে। সময়াভাবে বা স্থানাভাবে সমালোচিত হয় নাই। সম্পাদক বলিয়াছেন ইহাতে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লিখিবেন। আমাদের অনুরোধ যেগুলি স্ত্রীলোকের, সেগুলি স্ত্রীলোকের বলিয়া চিহ্নিত করা থাকে। এ সংখ্যায় সেরূপ নাই বলিয়া আমরা হেমলতার সম্যক্ সমালোচন করিতে পারিলাম না। আর একটি যাহাতে স্ত্রীলোকে লিখিবে, তাহা অধিকতররূপে স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। তবে হেমলতা মধ্যে, এত ইংরেজির ছড়াছড়ি কেন? ইহার মধ্যে যে পরিণয় কুসুম নাটক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আর না প্রকাশিত হইলেই ভাল হয়। যাহাহউক আমরা হেমলতার স্থিতি ও উন্নতি আন্তরিক ইচ্ছা করি।

উদাসিনী। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র। মূল্য একটাকা। এরূপ কল্পনাপ্রসূত কাব্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। সরলা প্রেমউদাসিনী, সুরেন্দ্র প্রেমভিখারী। পিতৃ মাতৃ হীনা সরলা রাজরাণী না হইয়া, ঐশ্বর্য্যে মোহিত না হইয়া, যাহাকে ভালবাসিত তাহাকেই বরণ করেন। এইজন্য সরলাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে; তাহাতে সে দৃক্‌পাত করে নাই। প্রণয়ের বজ্রায়স সামর্থ এই কাব্য মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রণয় যতই পীড়িত হইয়াছে ততই বল সংগ্রহ করিয়াছে। শেষে প্রণয়েরই জয় হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বেই স্বয়ং প্রণয়দেব ও রতিদেবী এই নবদম্পতির সহায় হইয়াছেন। তখন ইহারা ছদ্মবেশে ছিলেন। হঠাৎ—

একিরে আবার নূতন ব্যাপার,
নূতন প্রকার রূপের ছটা
শত শত শশী যেন একাকার
পিছনে গভীর জলদ ঘটা।
নয়ন ঝলসে বরনের ভাসে
অমিয় অধরে অমৃত ক্ষরে,
বিলাস লালসা নয়নে বিকাশে
অলস গমনা রূপের ভরে
মরি মরি কিবে মালতি মালিকা
দুলে দুলে দোলে বিনোদ গলে,
দুলিছে কেমন কমল কলিকা
সমীর পরশে শ্রবণতলে।
ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয়,
পদ্মমালা গলে কেমন রাজে,
বেল যুঁই জাতি কুসুম নিচয়
তারকা ঝলকে কেশের মাঝে

আর একজনের

ঝক ঝক জ্বলে বরণ বিমল,
কষিত কাঞ্চন সোহাগে মাখা,
ঢল ঢল করে মুখ-শতদল,
ঢুলু ঢুলু প্রেমে নয়ন বাঁকা।
ফুলের মালিকা শোভিছে মাথে
পিছনে শোভিছে ফুলের তুণ,
ফুলে ফুলশর শোভিতেছে হাতে
ফুলের ধনুক ফুলের গুণ,

তখন এই প্রণয়দেব স্বয়ং পুরোহিত হইলেন; রতিদেবী নবদম্পতিকে বরণ করিতে লাগিলেন, আর—

হাসিয়া হাসিয়া দিগঙ্গনাগণে
হুলুধ্বনি দেয় মিলিয়া সবে,
কুসুম আশার বরষি সঘনে
কাঁপায় গগন উৎসব রবে।

তাহার পর

দেখিতে দেখিতে, স্বপন সমান,
চকিতে সে সব পাইল লয়,
বিস্ময় বিপ্লবে হারা হয়ে জ্ঞান,
সরলা সুরেন্দ্র চাহিয়া রয়।

আমরা নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বিদায় লইলাম।

মৃদঙ্গমঞ্জরী। শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত।

উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "যে সংগীতবৃক্ষের বাদ্যরূপ যে একটি মহতী শাখা আছে মৃদঙ্গমঞ্জরী গ্রন্থখানি তাহার মঞ্জরীরূপে কল্পিত হইল" এবং প্রার্থনা করিয়াছেন যে "গুণজ্ঞজনগণের কোমল করস্পর্শে ইহা প্রস্ফুটিত এবং ফলিত হইবেক,"

আমাদিগের বিবেচনায় মৃদঙ্গ মঞ্জরী কেবল মঞ্জরী মাত্র নহে বাদ্য শাস্ত্রের ইহা "উপক্রমণিকা" বলিয়া গণনীয় হইবেক, এবং ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থিগণের সঙ্গত করিবার সহজে ক্ষমতা জন্মিতে পারিবেক, অতএব গ্রন্থকার আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি।

"প্রবেশিকা" এবং "মৃদঙ্গের জন্ম বৃত্তান্ত" কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলে আমরা আপ্যায়িত হইতাম। মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ উপলক্ষে মৃদঙ্গের জন্ম হওয়াতে ইহাই বোধ হয়, যে আর্য্যেরা দেশীয় আদিম মনুষ্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের মাদল গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহা সুস্বরশালী করিয়াছেন।

হস্তপাঠ এবং শব্দ সাধন অতি সুচারু হইয়াছে, এবং উদ্ধৃত পরমগুলি অতি সাবধানে এবং বিচক্ষণতার সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে। লালা কেবলকৃষ্ণের বোলগুলি অতি মনোহর, কিন্তু গ্রন্থকারের অভিপ্রায় মত প্রকৃত মার্দ্দঙ্গিকের লক্ষণযুক্ত "গীতের বহুবিধ রীতিজ্ঞ সদা সন্তুষ্ট চিত্ত" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের প্রক্রমণিকাগুলিতে বিশেষ প্রীতিলাভ হয়, ইহাতে বাঙ্গালির বুদ্ধিজ্যোতিঃ, চাতুর্য্য, কোমলতা এবং মাধুর্য্য সম্পূর্ণ প্রকাশমান।

পরিশিষ্ট পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। বহু পরিশ্রম সহকারে প্রাচীন সংস্কৃত তান সকল যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা যদিও শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপকারের নহে, কিন্তু আদিমকালের আদর্শ এবং ইতিহাস মূলক বলিয়া আমাদিগের পরম যত্নের ধন, ভরসা করি কোন মহাত্মা ইহাদের জন্য, অবয়ব, কাল এবং প্রণালীর মীমাংসা করিবেন। সংস্কৃত এবং আধুনিক তালে যে মাত্র ভেদ দেখা যায় তাহা প্রগাঢ় ভেদ বোধ হয় না। মাত্রার তারতম্যে হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন বোধ জ্ঞান হইলেও, মূলে ঐক্য দেখা যায়।

চিত্ত-কানন। প্রথম ভাগ। শ্রী কানাইলাল মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, বেণ্টিঙ্ক প্রেস। ১২৮০

এ গ্রন্থও পদ্য। ইহার বিশেষ গুণ কিছুই নাই, এবং গুণশূন্যতা ভিন্ন অন্য কোন দোষ নাই। "রাবণের প্রতি মন্দোদরী।" প্রভৃতি দুই একটি কবিতা পড়া যায়।

কাব্যপেটিকা। শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত কলিকাতা মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮।৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৭।

এই গ্রন্থ সংস্কৃত পদ্যে খণ্ডকাব্যাকারে লিখিত। গ্রন্থকার এক এক রসাত্মক কতকগুলি কবিতা একত্র যোজনা করণানন্তর এক একটি পরিচ্ছেদের ন্যায় যোজনা করত এইরূপ কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। কবিতা যেরূপ, সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

মঙ্গলাচরণের পর "শৃঙ্গারকাব্যশীর্ষক" একটি পরিচ্ছেদ।

এ অংশটি পরিহার্য্য। এবিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে, সংস্কৃতভাষায় যতগুলি

অপাঠ্য, অশ্লীল গ্রন্থ আছে, ইহা তাহারই উদ্গীর্ণের উদ্গীরণ।

কাল বর্ণনটি মন্দ হয় নাই; ইহাতে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও কিঞ্চিৎ কবিত্ব আছে। আমরা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় এই অংশটিকে ভাল বলিলাম ও যথাস্থানে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"শান্তকাব্যানি" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি অশ্লীলতাদুষ্ট নহে, তথাপি সম্ভবতঃ শান্তরসোদ্দীপক হয় নাই; ইহার কোন কোন কবিতা ভাল, কোন কোন কবিতা সদোষও হইয়াছে।

রুগ্নো জীর্ণো বিশীর্ণঃ পদমপি চলিতুং
যো ন শক্নোতি তল্পা
ন্নিঃশৌচঃ পূতিগন্ধি বির্সৃজতি সমলং যত্র
ভুঙ্‌ক্তেঽপি তত্র।
শুশ্রূষাভির্বিরক্তঃ সপদি পরিজনো যাচতে
যস্য মৃত্যুং
সোঽপি প্রায়ো জুগুপ্সুংস্ত্রিয়মনুনয়তি
প্রেমবদ্ধাঙ্কয়োক্ত্যা॥

এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ যে, এমত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও জঘন্যা স্ত্রীকে অনুনয় করিয়া থাকে। এই বাক্যদ্বারা স্ত্রীজাতি প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; কিন্তু উক্ত বাক্য গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সিদ্ধি পক্ষে অনুকূল কি না বলিতে পারি না।

আত্মন্যেব তবারয় স্ত্বদপি কিং শত্রূন্
জিতাস্মন্যসে
দৈন্যংজ্ঞানলবেঽপি কোবত তথাপ্যাঢ্যা-
ভিমানো মহান্।
চারিত্রৈর্মলিনোঽসি গৌর ইতিচ শ্লাঘা
কথন্তে মৃষা
সর্ব্বো ভ্রাতরয়ং ভ্রমস্তব ভবাবর্ত্তে মুহু
র্ভ্রাম্যতঃ॥
প্রসন্নেত্বয়ি গৌরীশ কদা মে ছেৎস্যতে-
তমঃ।
প্রাতরভ্যুদিতে সূর্য্যে দিঙ্‌মূঢ়স্য যথা ভ্রমঃ।

ইহা মন্দ হয় নাই বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্লোকটীতে দৃষ্টান্তটী অতীব সুন্দর।

এক্ষণে কাল বর্ণন হইতে কিঞ্চিৎ।

গ্রীষ্ম

স্মের শিরীষ কুসুমৈস্তত পাটলাঙ্কঃ স্-
স্খংলপন্নিব কলং মশকারবেন।
ক্রীড়ন্নিব প্রখরবাতধুতৈ রজোভির্বালো-
ঽদ্য রিঙ্গতি ভুবোঽঙ্ক তলে নিদাঘঃ॥
গাত্রং বিশেষ বিশদং সলিলাবগাহাৎ
খিন্নো মুহুর্ব্যজন চালনতোঽগ্রহস্তৌ।
অঙ্গান্যশীরমলয়োদ্ভব চর্চ্চিতানি তাপো ন
শাম্যতি তথাপ্যধুনা জনানাম্॥
দিনেষু চণ্ডাতপদাহশঙ্কয়া পদং জনো
বাঞ্ছতি সর্ব্বতোবৃতং।
শূন্যং তথা রাত্রিষু চন্দ্রিকেশ্বরা ক্রম প্রতী-
পোঽপি সুখাবহস্তপে॥

বর্ষা

বজ্রপাত করকাভির্বর্ষয়োঃ সম্ভবেঽপ্যমৃত-
ভুন্দিলং ঘনং।

স্তৌতি চাতকযুবা কথীয়তে ঘাতুকাপিনমু
গৌঃ পয়স্বিনী ॥
পর্য্যায়তোঽদ্য বিরুতৈঃ সমমন্দ্রতারৈর্মত্তা-
প্লবাঃ কিমিতরেতর মালপন্তি।
উৎকূজিতৈর্মদকলা অপি মৎস্যরঙ্কাঃ কিং
প্রাবৃষং সুলভমীনতয়া স্তবন্তি ॥

এই শ্লোকগুলি উৎকৃষ্ট, ইহাতে স্বভাবের বৈচিত্র্য সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু এঅংশ মধ্যেও কোনঃ স্থানে ঋতুসংহারের ছায়া লক্ষিত হয়।

আমরা বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য ভাগ উদ্ধৃত করিলাম না। অন্যান্য অংশের পক্ষে আমাদিগের বক্তব্যও অধিক নাই; তবে চন্দ্রোদয় বর্ণন হইতে আর একটী শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

পূর্ব্বাচল ব্যবহিতোঽপি তমোভিভূতানা-
শ্বাসয়ন্নিব জনং কর মুন্নময্য।
উজ্জৃম্ভতে স্মরমপি ত্বরয়ন্নিবায়ং দেব্যার-
তেঃ কুতুক কন্দুকবৎ সুধাংশুঃ ॥

পাঠক দেখিবেন চূড়ামনি মহাশয় সম্ভাবনা সত্ত্বে কখনই আদ্যরসকে পরিত্যাগ করেন নাই; কিঞ্চিৎ সুবিধা পাইয়া কেমন "দেব্যারতেঃ কুতুক কন্দুকবৎ" প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ এই কবি যখন যেখানে সুযোগ দেখিয়াছেন তখনই কিকরুণ, কি শান্ত, সকলের ভিতরেই আদিরস প্রবেশ করাইয়াছেন। এই কারণ গ্রন্থখানি বিকৃত ও অশ্লীলতাদুষ্ট হইলেও গ্রন্থকার তাহা কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। ফলতঃ গ্রন্থকারের এই দোষটি অত্যন্ত প্রবল।

উপসংহারে বক্তব্য যে, এ গ্রন্থকারের অনুকরণ স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা মহদ্দোষ এই, ইহার অধিকাংশ কবিতা নিম্নশ্রেণীস্থ সংস্কৃত কবির অনুকৃতিমূলক। সত্য বটে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। আমরা যখন যাহা কিছু প্রচলিত দেখি, বিচার না করিয়া বিবেচনা না করিয়া তখনই তদভিমুখে ধাবমান হই। কিন্তু এ কথা অন্যান্য পক্ষে যাহাহউক এ পক্ষে তত শোভমান নহে। আমাদিগের অনুকরণপ্রিয়তা আছে বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিতে গিয়া শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ ক্রমাগত প্রচলিত কবিতা বা প্রস্তাবের ছত্রেঽ অনুকরণ করিলে চলিবে না। রচনা বিষয়ে অনুকরণের আরও মহোদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া বসেন। এ বিষয়ের বহুবিধ প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে; পাঠক দেখিবেন অনেক আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও সাময়িক পত্রিকা লেখকদিগের এই দশা। সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত প্রচলিত। প্রাচীন মহাকবিরা যে প্রণালীতে যে কোন বস্তু বর্ণন করিয়াছেন, অধস্তন কবিরা সেইঽ বস্তু বর্ণন স্থলে তাঁহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অনেক

সংস্কৃত কবির কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও কবিতা সুরস হয় নাই; এই নিমিত্ত অধিকাংশ সংস্কৃতগ্রন্থে সাদৃশ্য যোজনা প্রায়ই এক-রূপ ও এই নিমিত্তই অধস্তন সংস্কৃত কাব্যের উত্তরোত্তর অধোগতি। আমরা এইস্থলে এ বিষয়ের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। সকলেই জানেন যে মুখ বর্ণনায় উপমাস্থলে চন্দ্রপদ্ম সংস্কৃত গ্রন্থকারের এ কায়ত্ত। কিন্তু যে কবি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মুখের সাদৃশ্য স্থলে চন্দ্রপদ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, ও যে কবি তদ্দ্বারা কিবল অনুচিকীর্ষা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন উভয়ের কবিত্বে কিরূপ প্রভেদ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা কলে অনুভব করিতে পারিবেন।

চন্দ্রংগতা পদ্ম গুণান্নভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা
চান্দ্রমসীমভিখ্যাং।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রিয়ং
প্রীতিমবাপ লক্ষ্মী॥

অন্যত্র

ধৃতলাঞ্ছনগোময়াঞ্চলং বিধুমালেপন
পাণ্ডরং বিধিঃ
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজা নহ্ন নীরাজন বর্দ্ধ-
মানকং॥
সুষমা বিষয়ে পরীক্ষণে নিখিলং পদ্ম ম-
ভাজি তন্মুখাৎ।
অধুনাপি নভঙ্গলক্ষণং সলিলোন্মজ্জন মু-
জ্‌ঝতি স্ফুটং॥

পাঠক দেখিবেন প্রথম কবিতাটী ও শেষ দুইটী একই ভাবাত্মক, কিন্তু কবি সুলভ রচনা ও অনুচিকীর্ষা বশতঃ প্রথমটী যে পরিমাণে হৃদয়গ্রাহিণী, অন্য দুইটী সেই পরিমাণে কর্ণজ্বর।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য যে এই কাব্যখানির ভাষা অতি বিশদ, আর ছন্দগুলি সর্ব্বত্রই সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে, শ্রুতিকটু বা কাঠিন্য দোষ কুত্রাপি নাই।

অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবহার।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল বিদ্যারত্ন প্রণীত।

একদা কোন দুর্ভিক্ষ দুঃখনিবারণী সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। একজন সুবিজ্ঞ সভ্য প্রস্তাব করিলেন, যে চাউল সস্তা করিবার অন্য উপায় নাই, বাজারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক। যখনই দুর্ভিক্ষের কোন সূচনা উপস্থিত হয়, তখনই দেশীয় লোকে প্রায় বাজারের দর বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন। পুনশ্চ দেশীয় লোকে সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে দেশের অনিষ্ট হইতেছে, বিলাতীয় সওদাগরেরা আসিয়া দেশের টাকা টা লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সকল গুরুতর ভ্রম যে ভ্রম, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝান, প্রায় অসাধ্য। এ সকল ভ্রমে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে—অনেক অবাঞ্ছনীয় বিষয়ে বৃথা যত্ন হইতেছে, অনেক মঙ্গলের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা হইতেছে, অনেক বৃথা ভয়ে লোকে কষ্ট পাইতেছেন। কিসে সামাজিক উন্নতি কিসে অবনতি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না; সমাজের

গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাঁহারা অশক্ত। এই সকল দেখিয়া আমাদিগের সর্ব্বদা মনে হইত, যে যত দিন না বাঙ্গালাভাষায় অর্থশাস্ত্রের প্রচার হয়, তত দিন দেশের উন্নতির প্রধান পথ রুদ্ধ। যিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় প্রচার করিবেন, তিনি দেশের পরম উপকার করিবেন। নৃসিংহ বাবু দেশের এই মহৎ উপকার করিয়াছেন।

আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নৃসিংহ বাবুর অনেক প্রশংসা করিয়াছি। আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে অর্থশাস্ত্র যে রূপ দুরূহ, তাহা সকলের বোধগম্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইহার প্রণয়ন করা অসাধ্য। নৃসিংহ বাবু সে অসাধ্য ও সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ, সকলেরই বোধগম্য। অতি সরল ভাষায়, অতিশয় কঠিন তত্ত্ব সকল অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থ শাস্ত্র বিষয়ক এরূপ পরিষ্কৃত রচনা ইংরাজিতেও বিরল। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বোধ হয় নৃসিংহ বাবু এই শাস্ত্র অতি সুন্দর রূপে নিজে বুঝিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা রচনায় তিনি বিশেষ ক্ষমতা শালী।

নৃসিংহ বাবু বিস্তর আয়াস সহকারে নানা গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন। কোন এক জন লেখকের মতের অনুগামী হয়েন নাই। ইহা ভালই করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির মূল্য অতি অল্প, অথচ তাহাতে বিস্তর কথা আছে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এরূপ সুমূল্য প্রায় দেখা যায় না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য লোকের শিক্ষা, নিজের লাভ নহে। আমরা নৃসিংহ বাবুর কাছে ইহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমাদিগের বিবেচনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অর্থশাস্ত্রের মূল নীতি সকল শিখান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থখানি তাহার বিশেষ উপযোগী। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি, এগ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে প্রচারিত করুন।

ঐতিহাসিক রহস্য। প্রথম ভাগ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত। কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী।

এই গ্রন্থে কতক গুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। যথা (১) ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, (২) মহাকবি কালিদাস, (৩) বররুচি, (৪) শ্রীহর্ষ, (৫) হেমচন্দ্র, (৬) হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, (৭) বেদপ্রচার (৮) গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, (৯) শ্রীমদ্ভাগবত (১০) ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র। এবং একটি পরিশিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ক প্রবন্ধটি রহস্য সন্দর্ভ হইতে পুনর্মুদ্রিত, এবং অবশিষ্ট সকল গুলিই বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অল্পাংশ ভিন্ন এই গ্রন্থ বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত বলিয়া আমরা ইহার সবিশেষ সমালোচনাহইতে বিরত হইলাম। কেননা, ইহার প্রশংসা করিলে একপ্রকার আত্মপ্রশংসা করিতে হয়। বিশেষ, এই সকল প্রবন্ধ প্রথমে এই পত্রের সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত হয়।

তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রামদাস বাবু এক জন বিখ্যাত লেখক এবং পুরাবৃত্তবেত্তা। এবং এই সকল প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। এপ্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থ সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববেত্তা" ভট্ট মোক্ষ মূলর " কে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ ।*

আমরা একজন সুলেখককে অদ্য পাঠক দিগের নিকট পরিচিত করিতেছি। "চন্দ্রনাথ" পাঠ করিয়া আমাদিগের এইরূপ বোধ হইয়াছে, যে ইহার প্রণেতা সুলেখক বটে, কিন্তু তিনি যেমন সুলেখক, গ্রন্থ তত ভাল হয় নাই। বোধ হয় ক্ষেত্রপাল বাবুর এই প্রথম গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াই আমরা তাঁহাকে সুলেখক বলিতেছি, অথচ গ্রন্থখানির তত প্রশংসা করি না।

অথচ গ্রন্থখানির এ পরিমাণে উৎকর্ষ আছে, যে ইহার দোষনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থ সকল এরূপ জঘন্য, যে ঘৃণা করিয়া আমরা তাহার দোষনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হই না। অনেক গ্রন্থকার এই বলিয়া আমাদিগের নিকট মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে "আমার গ্রন্থের উপর ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, কিন্তু দোষ কিছু নির্ব্বাচন করা হয় নাই।" তাঁহারা বুঝেন না, যে যাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, তাহার কোথায় ঔষধ দিব? যাঁহার এক পৃষ্ঠার দোষবর্ণনে দশ পৃষ্ঠা লিখিতে হয়, ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাঁহার কত দোষ লিখিব? তাঁহাদিগের দোষনির্ব্বাচনের কোন ফলও দেখা যায় না। দোষ নির্ব্বাচনে দুইটি মাত্র উদ্দেশ্য—এক, গ্রন্থকার, আপন দোষ সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন; আর এক অন্যকে সতর্ক করা। এ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথম উদ্দেশ্য, অরণ্যে রোদন মাত্র—যাঁহার রচনা দেখিয়া ভবিষ্যতের আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া কি করিব? দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেও যত্ন নিষ্প্রয়োজন—যাহা কেহ পড়িবে না তৎসম্বন্ধে পরকে সতর্ক করিবার আবশ্যকতা কি?

এই সকল কারণে অধিকাংশ গ্রন্থের সবিস্তার দোষকীর্ত্তনে আমরা বিরত; কখন কখন কোন গ্রন্থের প্রতি এতাদৃশ ঘৃণা জন্মে, যে তাহার কিছু মাত্র দোষের উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, যাঁহার কিছু গুণ আছে, তাঁহার দোষ থাকিলেই তিনিই নিন্দার ভাগী হয়েন—গ্রন্থ কিয়ৎপরিমাণে উৎকৃষ্ট না হইলে তাঁহার দোষ ব্যাখ্যায় আমরা প্রবৃত্ত হই না।

চন্দ্রনাথের "কিছু" গুণ আছে বলিলে অন্যায় বলা হয়—ইহার অনেক গুণ আছে। অনেক দোষও আছে। দোষ গুণের দুই একটা বলিতেছি।

অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যোপন্যাসে দুইটি পৃথক্ উপাখ্যান, একত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। লিয়রে, এইরূপ দুইটি উপা-

* চন্দ্রনাথ। উপন্যাস। শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা স্কুল-বুক প্রেস।

খ্যান; একটির নায়ক স্বয়ং লিয়র, আর একটির নায়ক এড্‌মণ্ড ও এড্‌গার। "নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নে" ঐরূপ, দুইটি নায়ক এবং দুই নায়িকা, দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের বিষয়ীভূত। ঐবান্‌হোর, এক উপাখ্যানের নায়ক ঐবান্‌হো, অপরের নায়ক রাজা রিচার্ড। কেনিল্‌বর্থে, একটি উপাখ্যানের নায়ক, লেষ্টর, নায়িকা রাজ্ঞী; অপরের নায়ক ট্রেসিলিয়ন, নায়িকা এমি। এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট কাব্য, নাটক, উপন্যাসে আছে, কিন্তু এই সকলেই, স্বতন্ত্র উপাখ্যান গুলি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত, এক সূত্রে গ্রন্থিত হইয়াছে, দুই স্রোতঃ এক খাদে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রতিভাশূন্য লেখকের হস্তে তাহা হয় না—উদাহরণ —"মিষ্টরিস"।

চন্দ্রনাথে, দুইটি কেন, চারিটি পৃথক্ পৃথক্ উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে যথা—

১। সৌরেন্দ্র হেমলতার কথা।
২। নবীন সুলোচনার কথা।
৩। নিস্তারিণী সদানন্দের কথা।
৪। মহেন্দ্র মনোরমার কথা।

এই চারিটি উপন্যাসের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। চারিটি স্বতন্ত্রই আছে। চারিটি পৃথক্ পৃথক্ লিখিলেই ভাল হইত—বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। কেবল, এ উপন্যাসের পরিচ্ছেদ, ও উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে, ও উপন্যাসের পরিচ্ছেদ, এ উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, ক্ষেত্রপাল বাবু চারিখানির এক টাইটলপেজ, এক নাম দিয়া, জোর করিয়া এই এক গণ্ডা নবেলকে একখানি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

মূলবিষয়নির্ম্মাণে এইরূপ কৌশলের অভাব। স্বতন্ত্র উপাখ্যানগুলির গ্রন্থনে বিশেষ প্রশংসনীয় নির্ম্মাণকৌশল দেখিতে পাইলাম না। সদানন্দ নিস্তারিণীর উপাখ্যানে কিঞ্চিৎ কৌশল আছে—নবীনের উপাখ্যানেও কিঞ্চিৎ—কিন্তু অপর দুইটিতে কিছু মাত্র নাই।

দ্বিতীয়, চরিত্র। সৌরেন্দ্র কিছু হয় নাই; হেমলতাও না। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কেহ নহে। নবীন, সামান্য প্রকার; সুলোচনা, কাপির কাপি, তস্য কাপি। উপেন্দ্র, সাধারণ নাটকের বওয়াটে বাবু মাত্র—আলালের ঘরের দুলালের "প্রপরা-অপ-পৌত্র।" তাঁহার পারিষদেরা মতিলালের পারিষদের "সু-উৎ-পরিদৌহিত্র" মাত্র। কেবল রূপচাঁদ সুন্দর হইয়াছে—অতি সুন্দর হইয়াছে। মহেন্দ্র বা মনোরমা বিশেষ কিছু না; বিনোদও না। সদানন্দ, উত্তম হইয়াছে; নিস্তারিণী উত্তম হইয়াছে। মতিয়া, এক নজর বৈ দেখা দেয় নাই; কিন্তু সেই এক নজরে অনেক সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছে।

ইহা কেহ প্রত্যাশা করে না, যে কোন কাব্যের সকল নায়ক নায়িকাগুলির চরিত্র উত্তম হইবে। সকলগুলিকে

পরিস্ফুট করা যাইতেও পারে না। একখানি গ্রন্থে দুই একটি চরিত্র সুচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়। সদানন্দ, নিস্তারিণী, এবং রূপচাঁদকে দেখিয়া, চরিত্রচিত্রবিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিলাম।

ক্ষেত্রপাল বাবু চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন—তাঁহার গ্রন্থে নূতন সৃষ্টি কিছুই নাই। তিনি চিত্রকর মাত্র—কয়টি চিত্র উত্তম হইয়াছে।

তৃতীয়, সংস্থান। যে সকল অবস্থা বিশেষে নায়ক নায়িকাগণকে সংস্থাপিত করিলে, রসবিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি। ইহাতে নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার, বা নাটককার, কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সংস্থানই রসের আকর। ক্ষেত্রপাল বাবুর ইহাতে বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। নবীন সুলোচনার উপাখ্যান সুসংস্থানে পরিপূর্ণ।

চতুর্থ। রস। ইহাতেও ক্ষেত্রপাল বাবুর ক্ষমতা মন্দ নহে। অনেক স্থানে, করুণ ও হাস্যরসের অবতারণায় বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন। পশ্চাৎ উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

ভাষা। ক্ষেত্র বাবুর ভাষা বহুবিধ। সচরাচর হুতোমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ভাষা বাঙ্গালিরা লিখিয়া থাকেন—সে ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া যে ভাষা কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় তাহাতেই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আবার অনেক স্থানে হুতোমী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা লিপির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক স্থানে ভাষা সরল ও সুমধুর—স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট।

৫ম। রুচি। ক্ষেত্রপাল বাবুর রুচির নিন্দা করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। ৭৩ পৃষ্ঠায়, নিম্ন হইতে গণিয়া নবম পংক্তি পাঠ করুন—অশ্লীলতা দোষের উদাহরণ পাওয়া যাইবে। "স্বামী" অর্থে তাঁহার নায়িকারা ভর্ত্তা শব্দের অপভ্রংশটিই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহারা স্ব২ স্বামীকে সুখের সময়ে, দুঃখের সময়ে, সকল সময়ে, "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতে ব্যস্ত। কিন্তু এ সকল সামান্য দোষ। একটি গুরুতর, এবং মার্জ্জনাতীত রুচির দোষ এই যে তিনি, গাঢ় রঙে পাপের চিত্র আঁকিয়া তাহাকে পাঠকের নয়নপথে ধরিয়াছেন—পাপের সে চিত্রের জন্য বহু যত্নে রঙ ফলাইয়া, বহু যত্নে তাহাতে তুলি ঘষিয়াছেন। তাহাতে পাপের মোহিনীশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। উদাহরণ—মহেন্দ্র মনোরমা সম্বন্ধে ৮৪।৮৫ এবং ১৭৩।১৭৪ পৃষ্ঠার লিখিত বিবরণ। সত্য বটে, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধই কাব্যের সামগ্রী—এবং রাবণ হইতে মোহন্ত পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠের পাপবর্ণনা কাব্যের একটি কার্য্য। কিন্তু এখানে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে পাপের বিঘ্ন হয় না—পুষ্টি হয়। কবির কর্ত্তব্য, পাপের সিদ্ধির উপর আব

রণ নিক্ষেপ করিয় তাহার লক্ষণ, গতি, এবং ফল বর্ণিত করেন।

উপাখ্যানের শেষভাগে গ্রন্থকার যাকে পাইয়াছেন, তাহাকে মারিয়াছেন। সুলোচনা মরিল, নবীন মরিল, মহেন্দ্র মরিল, মনোরমা মরিল, সদানন্দ মরিল, আরও কে২ মরিল। অনেক তরুণ লেখক ইংরেজি নাটকের অনুকরণ করিতে গিয়া এইরূপ কসাইয়ের কাজ করিয়াফেলেন। ক্ষেত্রপাল বাবুকে এই গোহত্যা গুলির প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করি।

সবিস্তারে আমরা চন্দ্রনাথের দোষ বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া, আমরা সবিস্তারে গ্রন্থের গুণের পরিচয় দিবার জন্য, নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম একটি বর্ণনা।—

"রজনী অবসান; কিন্তু এখন প্রভাত হয় নাই। চন্দ্রমা গগনমধ্যস্থ জ্যোতিঃহীন, পূর্ব্বদিকে শুক্রগ্রহ একাকী, সমুজ্জল। সপ্তর্ষি মণ্ডল বায়ুকোণে বিলীন প্রায়। অন্ধকার পাংশুবর্ণ। নীলবর্ণগগনে মেঘাবলী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া চন্দ্রমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। পক্ষিগণ কুলায় হইতে এক এক বার কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া নিস্তব্ধ জগতে সুস্বরলহরী বিস্তার করত পুনরায় কুলায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নীরবে রহিয়াছে—বোধ হয় উহারা নিশি অবসান হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। ভাগীরথীর জল এখন শশিকলার সুন্দর ছবি লইয়া নৃত্য করিতেছে। মন্দ মন্দ বায়ুভরে তরঙ্গরাজি আসিয়া তটে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হইতেছে। বৃক্ষ-পত্র হইতে নিশির শিশির বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে,—এমন সময়ে রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য এক হস্তে একখানি কোশা, অপর হস্তে পরিধেয় ধুতি ও নামাবলী লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাস্নানে আসিতেছেন; পথ ঘাট জনহীন, একাকী মৃদুস্বরে—

হে কেশীজনমথন, মধু কৃন্তন মুরারে।
(জয়) জয় মীন-রূপ-ধর, জয় বরাহবর,
কূর্ম্মরূপধর, বামন বিহারে।

হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন— হইয়া দেখিলেন তিন জন ধীবর জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছে; তাহাদিগের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র নৌকাতে একজন মনুষ্য দাঁড় হস্তে বসিয়া আছে, পরপারে —আবদ্ধ নৌকাশ্রেণী হইতে দীপমালা ভাগীরথীর জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া কম্পিত হইতেছে।"

তার পর সদানন্দ নিস্তারিণীর সম্বাদ

"কর্ত্তা রেগেছেন দেখে খুদি চাক্‌রাণী কাটের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল; এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ মলের শব্দ কর্ত্তার কাণে গেল। কর্ত্তা গিন্নী আস্‌ছেন বুঝ্‌তে পেরে রাগভরে মুখখানি গোঁজ্ করে রইলেন। গিন্নী ঝম্ ঝম্ করতে করতে ঘরের ভিতরে

এলেন। গিন্নী দেখ্‌তে মন্দ নয়, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন পিটনগুলি বেশ মাট মাট, তাতে আবার যৌবনকাল, যৌবন জুয়ারের জল কানে কান্, টল্ টল, বানের টান, কুটগাছ্‌টি দিলে দুভাগ হয়ে যায়—কানে কতকগুলি মাকৃড়ি, খোঁপা ফিরিঙ্গি গোচ্ করে বাঁধা জরি দিয়ে মোড়া, হাতে চার্‌গাচা করে সোণার দম্‌দম্, দুপায়ে চারগাচি মল্, পরণে একখানি অতি সরু সিম্‌লের ধুতী—পরা মাত্র, আঁচলে একটী রিং, তাতে কতকগুলি চাবি ঝোলান। এই আঁচলটি ঢং করে বেড় দিয়ে কাঁদের উপর ফেলেচেন! চল্‌বার কি ঠসক্! আস্তে আস্তে হেল্‌তে দুল্‌তে যাচ্চেন, এম্‌নি ভাবে যাচ্চেন যেন প্রতি পদে পদে বল্‌চেন্ আমার এ যৌবনের ভার আমি আর বইতে পারিনে, যদি কেউ মন বুঝে নেয় তো দিতে রাজি আছি। গিন্নী এইরূপ ভাবে ঘরের ভিতর এলেন, কর্ত্তা হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন দেখ্‌লেন, দেখে ভ্রুক্ষেপও করলেন্ না। আন্‌লা থেকে একখানি আট্‌পউরে কাপড় নিয়ে, পরা কাপড়খানি ছাড়তে লাগ্‌লেন। সদানন্দ আরো জ্বলে উঠলেন, শেষে আর থাক্‌তে না পেরে বল্‌লেন, " কোথায় গিয়েছিলে?"

গিন্নী। যেখানে যাই না কেন, আবারতো ফিরে এসেছি।

কর্ত্তা। আসবেনা তো যাবে কোন্ চুলোয়?

গিন্নী। চুলোয় সত্তি, তুমি যে রেগে গর্ গর্ কর্‌চো তোমার কি হয়েছে?

কর্ত্তা। বুকে বসে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্চো আবার কি হয়েছে?

গিন্নী। পাকা দাড়ী ওপ্‌ড়ালে কি লেগে থাকে—কাঁচা হলেই লাগে।

কর্ত্তা। আমি কি বুড়?

গিন্নী। আমি সে ভাবে বলিনে—না—তুমি বুড় নও আমি বুড়—তুমি ষোল বছরের ছোক্‌রা, মরণ আর্‌কি যত বয়স হচ্চে তত ছোট হচ্চেন্।

কর্ত্তা। (ভয়ঙ্কর রেগে) মর্ বলে গালাগাল্ দিলে যে বড়? আমি মোলে তুমি নিশ্চিন্ত হও——

গিন্নী। (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বালাই—তোমাকে কি গাল দিতে পারি? আকাশে থুথু ফেল্‌লে আপনারি গায়ে লাগে—তোমাকে যে ভালবাসে সে মরুক্।

কর্ত্তা। আবার ঠাট্টা—গালের্ উপর আবার ঠাট্টা—

গিন্নী। বেস্ আমি কি ঠাট্টা কর্‌লুম্, আমি বল্‌লুম্ তোমাকে যে ভালবাসে সে মরুক্—আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তুমি আমাকে দূর্ ছাই কর, এই জন্যে আমি মরি।

কর্ত্তা। (কিছু নরম্ হয়ে) তুমি যে আমাকে ভালবাস তা আমি দেখ্‌তিই পাচ্চি; আমি বাড়ী থেকে একটু বেরিয়ে গিয়েছিলুম্ আর তুমি উমাচরণ ভদ্দরের বাড়ী কর্ত্তাভজার্ দলে গিয়ে মিশে ছিলে।

গিন্নী। তাতে কি দুস্য হয়েছে—এই অন্ধকার বাড়ীতে চুপ্ করে না থেকে একটু গান্ টান্ শুনতে যাই, তাতে তোমার এত রাগ কেন?

কর্ত্তা। রাগ্ কেন? ও সব বদ্‌মাইসের দল, ওখানে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে যায় না।

গিন্নী। না—ওখানে সব ছোটলোকের মেয়েরা আসে, ওরা ধর্ম্মের কথা কয়, ওরা বদ্‌মাইস্; আর তুমি ভুলেও ধর্ম্মের কথা মুখে আন না—কেবল টাকা টাকা কর, তুমিই সাধু।

কর্ত্তা। আমি অধার্ম্মিক্ই হই, আর অসাধুই হই, আমাকে ভালবাসা ও আমার সেবা করা তোমার ধর্ম্ম।

গিন্নী। আমি কি তা কর্‌চি নি, আমি এও কর্‌চি ওও কর্‌চি।

কর্ত্তা। তা হবে না, শুক্রবার হলে তুমি আর ওখানে যেতে পাবে না।

গিন্নী। (মহা বিপদ দেখে) বলি তুমি আমার সঙ্গে অ্যাত লেগেচ কেন? তোমার অনেক টাকা দেখে আমার বাপ মা তোমায় বেচে গিয়েছে, তাই তুমি যা ইচ্ছে তাই বল্‌চো; আমি যদি বড় মানুষের মেয়ে হতুম্, আমার বাপের যদি বিষয় থাক্‌তো তাহলে আর তুমি আমাকে দু পাদিয়ে থ্যাংলাতে পার্‌তে না—এক মুঠ খেতে দেও বলে কি অ্যাত—(বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।)

কর্ত্তা। (মহা কাঁপরে) আমি তোমাকে কখন অযত্ন করেছি, না তোমাকে কখন বকি, তবে তুমি কর্ত্তাভজার দলে গিয়েছিলে বলে রাগ্ করেছিলুম্, রাগের ভরে দুটো নিষ্ঠুর কথা বলেছি, তা ঝক্‌মারি করেছি, আর কেঁদনা, তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়; তুমি কিসে সুখে থাক্‌বে বলে ভেবে ভেবে আমার শরীর আধখানি হয়ে গেছে, আমার আর সে রকম্ বল নাই, সে রং নাই, এই দেখ কাল হয়ে গিয়েছি, আমি সর্ব্বদাই তোমার বিষয় ভাবি।

গিন্নী। ভাব্‌বেনা কেন? সদাই আমার দোষ ভাব, তোমার জন্যে আমার একটু স্বস্তি নেই, কোথায় যাবার যো নেই, কারো সঙ্গে কথা কবার যো নেই, একটু ছাতের উপর দাঁড়াবার যো নেই, ছিনে জোঁকের মত সর্ব্বদাই সঙ্গে লেগে আছো—ছি! পুরুষ মানুষের কি অ্যাত মেয়ে ন্যাক্‌ড়া হওয়া ভাল? তোমার আচরণ দেখে আমার এম্‌নি ঘেন্না হয়, যে গলায় একগাছা দড়ী দিয়ে মরি। (এই বলিয়া গিন্নী পুনরায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।)

কর্ত্তা। (সকাতরে) আমি ঝক্‌মারি করেছি, আমার ঘাট্ হয়েছে, তুমি আর কেঁদনা আমি আর কিছু বল্‌বো না।

গিন্নী। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বল আমায় কখন কিছু বল্‌বেনা, আমাকে শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ছেড়ে দেবে—বল? না বল্লে আমি আর খাব দাব

না, আমি—(এই বলে ঢিপ্‌করে শুয়ে পড়্‌লেন)

কর্ত্তা। (অগত্যা) এই গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি আমি তোমাকে আর কিছু বল্‌বো না।

গিন্নী। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দেবে, বল?

কর্ত্তা। দেবো।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, দেবে?

কর্ত্তা। আঃ! আচ্ছা দেবো।"

তার পর বিনাপরাধে চোর বলিয়া অবরুদ্ধ হওয়ার পরে, নবীনের গৃহে প্রত্যাগমন।

তারপর নবীনের পুলিষ হইতে প্রত্যাগমন।

"পর দিন, সোমবার, বেলা পাঁচটা বেজেচে, নবীনবাবু সদ্বিচারক মহাত্মা রবার্ট সাহেবের নিরুপেক্ষ বিচারে নির্দ্দোষী প্রকাশ হয়ে পুলিস থেকে বেরিয়ে একবার মনে করিলেন আপিসে যাই। সাহেব একেতো প্রতিকূল অম্‌নিতিই দোষ না পেয়ে তাড়াবার পন্থা করে, আজ আবার এই কামাই হয়েচে, কোন খবর পাঠাতে পারি নি—নিশ্চয় জরিমানা করেচে। কিন্তু সুলোচনাকে কাল রাত্রে যে রকম দেখে এসেচি, তাতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌তে পারি নি, মন কেমন হু হু কর্‌চে আগেত বাড়ী যাই, প্রাণটা জুড়াগ। মনে মনে এই চিন্তার পর যত শীঘ্র চল্‌তে পারেন চলে বাড়ীর দরোজায় এসে দাঁড়ালেন। দরোজা দেওয়া—ঘা দিতে লাগ্‌লেন। বাড়ীর ভিতর থেকে দাসী দরোজায় ঘা মারা শব্দ শুন্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে দিতে এল। ছেলে দুটিও সেই সঙ্গে—"সদি, বাবা এয়েচে, বাবা এয়েচে" জিজ্ঞাসা কর্‌তে কর্‌তে দৌড়িয়ে দাসীর সঙ্গে এল। দরোজা খুলিতেও বিলম্ব সহিল না। ছেলে দুটি কপাটের ফাঁক দিয়ে "বাবা, বাবা, এয়চ?" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। নবীনবাবু বাহির থেকে—"হ্যাঁ বাবা এসেচি" বলে সাড়া দিলেন। দাসী দরোজা খুলে দিলে। ছেলে দুটি ওম্‌নি দৌড়িয়ে নবীনবাবুর হাঁটুদুটো জাপ্‌টিয়ে ধর্‌লে। বড় ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ চক্ষে তিরস্কার করিবার ভাবে "বাবা কোথায় গিয়েছিলে? মার অসুখ—মা উঠ্‌তে পারে না আমরা আজ ভাত খাই নি।" ছোট ছেলেটি "বাবা কোথায় গিছ্‌লি?" বলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। নবীনবাবুর চক্ষু দুটি তাই দেখে জলে আবরিয়ে এল। তিনি বড় ছেলেটির দাড়ি ধরে "আজ ভাত খেতে পাওনি বাবা?" বলেই আপনি ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একটি ছেলের হাত ধরে, আর একটিকে বুকে করে নিয়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গেলেন—গিয়ে দেখেন সাধ্বী সুলোচনা ধরাবলুণ্ঠিতা, তাঁহার স্বাভাবিক হাস্যবদনখানি অতি ম্লান, মস্তকের কেশরাশি আলুলায়িত,

চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধরের আর সে রক্তিম আভা নাই, শুষ্ক, পাণ্ডুবর্ণ, মন্দ মন্দ কম্পিত। যে প্রফুল্ল নয়নদুটীর জ্যোতিঃ নবীনবাবুর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিত, সেই নয়ন দুটিতে আহা! আজ কালিমা পড়িয়াছে—স্বর ক্ষীণ ও অপরিস্ফুট—অস্থিরা, ধরোপরি এপাশ ওপাশ করিতেছেন। নবীনবাবু প্রাণাধিকা সুলোচনাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া "হা প্রিয়তমে—রে চণ্ডাল গোলোক তুই কি করিলি" বলিয়া তিনি সুলোচনার নিকট বসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা স্বামীকে প্রত্যাগত দেখিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত, তৎপরে তাঁহার সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিত হইয়া, উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিলেন—উঠিতে পারিলেন না। নবীনবাবু সযত্নে সুলোচনার মস্তকটি আপনার ক্রোড়ে রাখিলেন। সুলোচনা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বামীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "আমার প্রাণ ক্যামন কর্‌চে—তোমার কি হলো তুমি এখন ক্যান বল্‌চো না আবার কি তোমায় নিয়ে—?"

ইত্যাদি। ভরসা করি, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে আমরা কেন বলিয়াছি যে লেখক সুলেখক বটে, কিন্তু গ্রন্থ তত ভাল হয় নাই।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

চতুর্থ প্রস্তাব—রাজধর্ম্ম।

রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে রামায়ণ হইতে যে উপকরণ সমষ্টি সংগৃহীত হইবে, তাহাই যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাল্মীকির সময়ে, ভারতে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, ইহা বিবেচনাসিদ্ধ নহে। কাজে এবং কথায় সচরাচর যতটুকু অন্তর দেখা যায়, এখানেও বোধ হয় সেইরূপ হইতে পারে। মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কার্য্য এবং মনুষ্যের অবস্থা, এতদুভয়ের বৃত্তান্ত বিষয়ে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য হয়। প্রথমোক্ত বিষয়ে অত্যুক্তি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, শেষোক্ত বিষয়ে তত নহে।

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবদ্বয়ে যেরূপ দেশ প্রদেশাদির আকৃতি এবং অবস্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা প্রতীত হইবে যে রামায়ণের সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, আর্য্যভূভাগে এক ছত্র রাজা কেহ ছিলেন না। মহাভারতে যেমন দেখা যায় যে, কোন কোন প্রতাপশালী রাজা মধ্যে মধ্যে একাধিকারের চেষ্টা

করিয়াছেন এবং কখন বা সফলও হইয়াছেন, আবার কখন বা নৈরাশ্যে পতিত হইয়াছেন; রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ব্যতীত আর কোথাও সেরূপ লক্ষিত হয় না। উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখনীনিঃসৃত কি না এবিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সন্দেহ আছে, (১) যাহাহউক এই প্রবন্ধলিখনে উক্ত কাণ্ড পরিত্যক্ত বলিয়া এই প্রস্তাবের পাঠকেরা জানিবেন।

আর্য্য-ভূমি এই সময়ে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন অধীশ্বর। ইনি আপন অধিকার মধ্যে যথাসম্ভব রাজকার্য্য অন্যরাজশাসনবশ্য হইয়া সমাধা করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ কাহার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইহাদিগের একতাসূত্রে বন্ধন করিবার অনেক বিষয় থাকাতে কদাচ কেহ কাহার বিরোধী হইতেন না। আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপ আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সর্ব্বত্রই একরূপ, এক ধর্ম্মাক্রান্ত, একই নিয়মাধীন এবং সেই নিয়মকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্রই সমান ভাবে পূজনীয়; তাঁহারাই একালে একতাবন্ধনের দৃঢ়রজ্জু স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ বহুদূর ব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না। ফলতঃ বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু পৃথক লক্ষিত হইলেও, অন্তঃপ্রকৃতি নির্ব্বিশেষে একরূপ ছিল। রামায়ণে যথায় যাগ যজ্ঞাদি মহোৎসবের ব্যাপার, তথায়ই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ রাজগণকে একত্রে আমোদ আহ্লাদে নিমগ্ন থাকিতে দেখা যায়। দশরথের পুত্রকামনায় যে যজ্ঞ হয় তাহাতে আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত রাজবর্গ একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য মহোৎসবেও। মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে ও অন্যান্য উৎসবকালেও ঐ রূপ সৌহার্দ্দের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আবার রাজাদিগের আপনাপনির মধ্যে বিবাদেরও অভাব নাই। রামায়ণে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, কেবল ইহার দ্বারাই তৎকালে রাজাদিগের পরস্পরের সহ সদ্ভাবে অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।

(১) এতদ্বিষয় সবিস্তারে Griffith's Ramayan, Vol. I Introduction p. XXIII to XXV দেখ। তথায় "There is every reason to believe that the seventh Book is a later addition." পুনশ্চ উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত "Traditions and legends only distantly connected with the Ramayan properly so called." &c.—Gorresio. পুনশ্চ নূতন সংযোজন সম্বন্ধে "whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in the case of the old parts spontaneously burst out of the heart's fulness like the free song of a child &c."—Westminister Review Vol. L.

আর্য্যবংশের এই সময়ের রাজ্য সংস্থানের ব্যবস্থা অবলোকন করিলে, ইউরোপ খণ্ডের খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যম কালীয় ফিউডাল রাজ্য বিভাগের কথা মনে উদয় হয়। বস্তুতঃ পরস্পরের মধ্যে অল্প বৈলক্ষণ্য; তদ্ব্যতীত, ভারতীয় রাজ্যসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত। এতদুভয়ের উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে না। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপাতে বর্ব্বর জাতিরা যেমন যুদ্ধাধিকারান্তে, বিগ্রহলব্ধ বস্তুর বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া, তাহাতে একেশ্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল, আবার সেই সকল ভূখণ্ড যেমন অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলকে নিয়ম বিশেষের বশবর্ত্তী করিয়া অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইত, সেই রূপ প্রাচীন কালে আর্য্যগণও আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যসংস্থাপন করেন, এবং অংশনির্দ্দেশের নিমিত্তই অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। দশরথের এত ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি তাঁহার সভায় বহুসংখ্যক অধীন রাজগণের (২।১) অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতের উন্নতি ও অধম বর্ণের দুর্দ্দশা উভয়েতেই সমান। ঋগ্বেদ (১।১৭৩।১০, ৮।৬২।১১ ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া মানব ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত (রাজধর্ম্ম অধ্যায়ে) গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতির শাসন কর্তৃত্ব পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কার্য্য কি, তাহা ঋগ্বেদ দ্বারা স্পষ্ট কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না; কিন্তু মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয় যে ইহারা সেই সেই গ্রাম ও পুরের শাসন কর্ত্তা এবং যাবতীয় রাজকার্য্যের সম্পাদক। যখন কোন নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা যে সম্পূর্ণ নূতন এমন নহে, এবং যাহা পুরাতন তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। বরং তাহাই ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া উন্নতিসাধন করা হয় এবং কোন কোনটা যেমন নূতন হয় আবার তেমনি কোন কোনটা পুরাতন অবিকল রাখিয়া দেওয়া হয়। নূতন যাহা হয়, তাহার মধ্যে এমনও অনেক হয় যে তাহা প্রণয়নসময়ে কার্য্যে পরিণত না হইয়া পরে হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ঋগ্বেদের সাময়িক আচার ব্যবহারের সহ মনুর, এবং রামায়ণ মনুর পূর্ব্বে বা পরে হউক, তাহার সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে। একের বর্ণিত বিষয় অন্যের ভাব পরিস্ফুট করিতে অনেক সক্ষম। যাহা হউক, এই গ্রাম ও পুরপতি প্রভৃতিগণ ফিউডাল সাময়িক স্থান বিশেষের বর্গোমাষ্টারের ন্যায়। বাহ্যিক আকার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে যথেচ্ছাচারের আধিক্য উভয়স্থানেই সমান; বিশেষ এই যে একস্থানের যথেচ্ছাচার প্রায় সকল সময়েই সুবুদ্ধিপ্রসূত, অপর স্থানে নিরক্ষরচিত্ত হইতে উদ্ভব। ফলপ্রসবিতার মধ্যে দেখা যায়

যে, ফিউডাল প্রভুরা পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ বিসম্বাদে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্নান করিতেন, আর্য্যেরা তৎপরিবর্ত্তে প্রেমসংমিলনে মনের সুখে কালযাপন করিতেন। ফিউডাল প্রজারা ভিন্ন ভিন্ন শাসনে থাকিয়াও, আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি, দেশস্থ সমস্ত অধিবাসীর অভ্যন্তরে একরূপ থাকায়, এবং বহিঃশত্রুর ও আভ্যন্তরিকশত্রুর উত্তেজনায় একতার মূল্যাবধারণ করিয়া, কালে তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্ব সংমিলনে জগতের সুখবিকাশক সভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর আর্য্যেরা এক প্রকৃতি সত্বেও, তদভাবে দৈহিক সুখপরবশে ও একতার মর্ম্ম অনবগতে, জ্ঞাতিবিদ্বেষিতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রতা দোষে এমনি নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন, যে এখন আপন অন্ন পরিপাকের ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই।

আভ্যন্তরিক রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহা বহুলভাবে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হইবে। ভরত রামের অনুসরণে নির্গত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে তাঁহার দেখা পাইলে, রাম রাজ্যের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (২)

২।১০০ (৩) তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্র শরপ্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল, বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হয়। (৪) বৎস! তুমি ত

(২) এই রাজনীতিগুলি গ্রিফিথ সাহেব কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদে নাই। তৎকৃত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৯৯, ১০০, ১০১সর্গ এবং হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত রামায়ণের ঐ কাণ্ডের ১০০ সর্গ মিলাইয়া দেখ। গ্রিফিথ সাহেব স্লিগলকর্ত্তৃক সংগৃহীত রামায়ণ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন, এই রামায়ণ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঠ দৃষ্টে। আমার আদর্শমূল পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত রামায়ণের প্রথম তিন কাণ্ড, অপর তিন কাণ্ড হস্তলিপি। আমার আদর্শ পুস্তকে যাহা যাহা আছে আমি মূল প্রস্তাবে তাহাই গ্রহণ করিতেছি ইহা জ্ঞাতব্য।

(৩)। এই অংশের অনুবাদ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের অনুবাদ হইতে গৃহীত হইল। উক্ত ভট্টাচার্য্য এই অংশের ব্যাখ্যার্থে রামানুজ হইতে যে কিছু টীকার অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা টীকার স্থানে "—হে" চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া অবিকল রাখা হইল, তদ্ব্যতীত যত টীকা সে সকল আমার দ্বারা সংগৃহীত।

(৪) "কচ্চিদাত্মসমা বৃদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ সম্বোধনক্ষমাঃ।২৫।
কুলীনাশ্চানুরক্তাশ্চ কৃতাস্তে বীর মন্ত্রিণঃ।
বিজয়ো মন্ত্রমূলো হি রাজ্ঞো ভবতি ভারত।।২৬।
কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রৈস্তে অমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।

নিদ্রার বশীভূত নহ ? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক ? রাত্রি শেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর ? তুমি একাকী বা বহুলোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না ? যে বিষয় নির্ণীত হয় তাহা ত গোপনে থাকে ? (৫) যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য্য অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক ? (৬) তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে, এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন ? যে সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উঁহারা ত তাহা জানিতে পারেন না ? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না ? (৭) সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক ? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞলোকেই সর্ব্বতোভাবে শুভসাধন

রাষ্ট্রং সুরক্ষিতং তাত!————— ॥২৭।
মহাভারত সভাপর্ব্ব।৫।

কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত! মন্ত্রিণঃ ॥১৫।
মন্ত্রো বিজয়মূলো হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতা মন্ত্রিধুরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥১৬।
অযোধ্যাকাণ্ড।১০০।

ইহার মধ্যে চোর কে ?

(৫) কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎকালেঽপি বুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনর্থবিৎ।২৮।
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি ॥২৯।
মহাভারত ২।৫

কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎকালেঽববুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থ নৈপুনম্॥১৭।
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিত্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি ॥১৮
অযোধ্যাকাণ্ড ।১০০।

চোর কে ?

(৬)। কচ্চিদর্থান্ বিনিশ্চিত্য লঘুমূলান্ মহোদয়ান্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন বিঘ্নয়সি তাদৃশান্ ॥৩০।
মহাভারত।২৫।

কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন দীর্ঘয়সি রাঘব ॥১৯।
অযোধ্যাকাণ্ড ॥১০০।

চোর কে ?

বিরক্ত হইয়া আর সাদৃশ্য উঠাইয়া দেখাইলাম না। ফলতঃ সভাপর্ব্বোক্ত ও রামায়ণোক্ত রাজনীতি কিছু কিছু বাদ দিয়া একটি অপরের নকল বলিয়া লওয়া যায়।

(৭)। "কচ্চিন্ন কৃতকৈর্দুতৈর্যে চাপ্য পরিশঙ্কিতাঃ।
তত্তো বা তব চামাত্যৈর্ভিদ্যতে মন্ত্রিতং তথা ॥২৩।
সভাসর্ব্ব।৫।

অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টচেতা রাজা ও হীন সমাজের প্রতি এ উপদেশ বর্ত্তে।

করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহাহইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ এক-জন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস! উন্নতশ্রেণীতে উন্নত, মধ্যমশ্রেণীতে মধ্যম, এবং অধমশ্রেণীতে অধম ভৃত্য ত নিযুক্ত করিয়াছ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাঁহারা উৎকোচগ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদি-গকে ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্র-দান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগ-পর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদি প্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, (৮) অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক? যিনি মহাবীর ধীর ধীমান্ সৎকু-লোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধ বিশারদ এবং যাঁহারা লোকসমক্ষে আপ-নার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন (৯) প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অস-ন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণপরিত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান্ অনু-কূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ*

(৮) "উপায়কুশলং বৈদ্যং"—মূল রামায়ণে, তদ্ব্যাখ্যায় উপায়কুশলং সামা-দ্যুপায় চতুরং বৈদ্যং বিদ্যাবিদং রাজ-নীতিশাস্ত্রজ্ঞং"।—রামানুজ। ইহা অতি মূর্খের রাজনীতি এবং অল্পদর্শিতার পরি-চয়, এবং সমাজের সতত অশান্ত ও শঙ্কিত ভাবজ্ঞাপক। এইরূপ (যেমন সংবাদপত্রে দৃষ্ট) পারস্যের সাহ একদা সাদর্লণ্ডের ডিউকের বৈভব দেখিয়া, তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে, এজন্য বৃটনীয় যুবরা-জের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি-লেন।

(৯)। ইহা অতি বিচক্ষণ নীতি। ইউ-রোপখণ্ডে অল্পকাল হইল ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে মোগল বংশ এই নীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

* ১। মন্ত্রী, ২। পুরোহিত, ৩। যুব-রাজ, ৪। সেনাপতি, ৫। দৌবারিক, ৬ অন্তঃপুরাধিকারী, ৭। বন্ধনাগারাধিকারী,

ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ,† প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়া ত সমুদয় জানিতেছ? যে শত্রু দূরীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে, দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংশ্রব নাই? * * * * কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্ট সাধন ও অনিষ্টনিবারণপূর্ব্বক তুমিত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? (১০) অধিকারে যত লোক আছে ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহাদিগের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? (১১) তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কি রূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদয়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? (১২) রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া, রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,—না এক কালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতি দর্শন ও অদর্শন এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থ প্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গসকল ধন ধান্য জলযন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পী ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা, ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধুলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না

৮। ধনাধ্যক্ষ, ৯। রাজাজ্ঞানিবেদক, ১০। প্রাড়্বিবাক নামক ব্যবহার জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত), ১১। ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২। ব্যবহার নির্ণায়ক সভ্য (জুরি), ১৩। বেতন দানাধ্যক্ষ, ১৪। কর্ম্মান্তে বেতন গ্রাহী ১৫। নগরাধ্যক্ষ, ১৬। আটবিক, ১৭ দণ্ডাধিকারী, ১৮। দুর্গপাল।—হে।

† পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ এই তিনটি বাদ দিয়া পঞ্চদশ।—হে।

(১০) অধম জাতির পক্ষে সামাজিক শাসন কঠোর থাকিলেও, রাজদ্বারে তাহাদের কিরূপ অবস্থা, তাহা এই বাক্যে উপলব্ধি হয়। ইউরোপের সভ্যতার পথপ্রদর্শক রোমক জাতির প্রাচীন অবস্থায়ও এরূপ লোকদিগের পক্ষে যেরূপ কঠোর নিয়ম ছিল, তাহার সহিত এখানে তুলনা করিয়া দেখা উচিত। Cod. Justice. T. XI. tit. 47, & 49 দ্রষ্টব্য।

(১১) তৎকালে স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতি কতদূর, এবং মনুষ্যবর্গের তৎপ্রতি কতদূর আস্থা, এই বাক্য তাহার পরিচায়ক। ঐ ঋগ্বেদে "ইন্দ্রশ্চিদ্ ঘ তদ্ অব্রবীৎ স্ত্রিয়াঃ অশাস্যম্ মনঃ। উতো অহ ক্রতুং রঘুম্।"—৮—৩৩—১৭।

(১২) বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের খেদ্দা ডিপার্টমেণ্টের ন্যায়।

করিয়া, তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ডপ্রদান কর না? (১৩) যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন? দেখ, যাহাদের উপর মিথ্যাভিযোগের সম্যক্ বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশুসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য ও প্রধান প্রধান লোক দিগকে ত বাক্য ব্যবহারে ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথাকালে ধর্ম্ম অর্থ কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? (১৪) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয় সেবা, একব্যক্তির সহিত রাজ্য চিন্তা ও অনর্থ দর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান, মন্ত্রণা প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, এবং সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধ যাত্রা, তুমিত এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ* (১৫) পঞ্চবর্গ† (১৬) চতুর্বর্গ‡

(১৩) এই সুনিয়ম বৃটনদ্বীপ একজন রাজার মস্তক ছেদন, অপরকে দূরীকরণ ব্যতীত সুদৃঢ় করিতে পারেন নাই। ইউরোপ ভূভাগ অতি অল্পকাল হইল, ইহার মধুর মর্ম্ম অবগত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য আসিয়ার অনেক স্থানে এখনও নহে।

১৪। " পূর্ব্বাহ্নে চাচরেদ্ধর্ম্মং মধ্যাহ্নে-
র্থমুপার্জয়েৎ।
সায়াহ্নে চাচরেৎ কামমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥—
দক্ষোক্ত কালব্যাবস্থা।

* মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীপারতন্ত্র্য, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ও বৃথা পর্যটন।—হে।

১৫। উক্ত বিষয়ে
" মৃগয়াক্ষৌ দিবাস্বাপঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
ত্রৌর্য্যত্রিকম্ বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণ ॥ "
মনু। ৬ অ।

† জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, ইরিণ দুর্গ (সর্ব্ব শস্য পূর্ণ প্রদেশ) ধান্বন দুর্গ (গ্রীষ্মকালে অগম্য)।।

১৬। উক্ত বিষয়ে
" পঞ্চবর্গস্তু চৌদকং পার্ব্বতং বার্ক্ষমৈরিণং ধান্বনং তথা। ইতি দুর্গং পঞ্চবিধং পঞ্চ বর্গ উদাহৃতঃ। ইরিণং সর্ব্বশস্য শূন্য প্রদেশঃ তৎসম্বন্ধি দুর্গমৈরিণং তস্যাপি পরৈর্গন্তুমশক্যত্বাৎ। ধান্বনম উষ্ণকালে দুর্গং ভবতি।—রামানুজ।

‡ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।—হে।

সপ্তবর্গ¶ অষ্টবর্গ§ (১৭) ও ত্রিবর্গের (১৮) ফলাফল ত করিয়াছ? ত্রয়ী (১৯) বার্ত্তা (২০) ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয় জয়, ষাড়্গুণ্য(২১)* দৈব ও মানুষ ব্যসন, (২২) রাজকৃত্য,† বিংশতিবর্গ,‡ প্রকৃতিবর্গ,¶ মণ্ডল,§ (২৩) বিরক্ত প্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাশক্ত, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনি, বলব্যসনি, অদেশস্থ, বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, ও অসত্য ধর্ম্মরত, ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।—হে।

¶ স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল ও সুহৃদ্।—হে।

§ কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনি, আকর, করাদান, ও শূন্য নিবেশন।—হে।

(১৭) অথবা
"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহমীর্ষাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টক ॥"
—রামানুজ।

(১৮) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(১৯) বেদত্রয়ী।

(২০) বার্ত্তা কৃষ্যাদি।

* সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ। হে।

(২১) "সন্ধির্নাবিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়।" —রামানুজ

অথবা
"ষড়্গুণাঃ বক্তা প্রগল্ভো মেধাবী স্মৃতিমান্নয়বিৎ কবিঃ।"—নীলকণ্ঠ।

(২২) "হুতাশনো জলং ব্যাধি র্দুর্ভিক্ষোমরকস্তথেত্যেতদ্দৈবম্। মানুষস্তু আয়ুক্তকেভ্যশ্চোরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ। পৃথিবীপতি লোভাচ্চ ব্যসনং মানুষম্বিদমিতি।"—রামানুজ

† অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণকোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শত্রুহইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।—হে।

‡ বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি বহিস্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন,

¶ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, ও দণ্ড।—হে।

§ দ্বাদশরাজমণ্ডল।—হে।

(২৩) উক্ত উভয়বিধ বিষয়ে
"অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গাণি কোশোদণ্ডশ্চ পঞ্চমঃ।
এতা প্রকৃতয়স্তজ্জ্ঞৈ বিজিগীষোরুদাহৃতাঃ ॥
সম্পন্নস্তু প্রকৃতিভি র্মহোৎসাহঃ কৃতশ্রমঃ।
জেতু মেষণশীলশ্চ বিজিগীষুরিতি স্মৃতঃ ॥
অরির্মিত্রমরের্মিত্রং মিত্রমিত্রমতঃ পরঃ।
অথারিমিত্রমিত্রঞ্চ বিজিগীষোঃ পুরস্থতাঃ ॥
পার্ষ্ণিগ্রাহস্ততঃ পশ্চাদাক্রন্দস্তদনন্তরং।
আসারা বলয়শ্চৈব বিজিগীষোস্তু পৃষ্ঠতঃ ॥
অরেশ্চ বিজিগীষোশ্চ মধ্যমো ভূম্যনন্তরঃ।
অনুগ্রাহ সংহতয়োর্ব্যস্তয়োর্নিগ্রহে প্রভুঃ ॥
মণ্ডলাদ্বহিরেতেষামুদাসীনো বলাধিকঃ।
অনুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাঞ্চবধে প্রভুঃ ॥
ইতি কামন্দকীয়ে উক্ত নীলকণ্ঠোদ্ধৃত।

যাত্রা, (২৪) দণ্ডবিধান, দ্বিযোনী, * সন্ধি ও বিগ্রহ এ সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়া কলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে? ভার্য্যা সকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিষ্ফল হয় নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এই প্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুষ্কর, যশস্কর, এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক।"

প্রচলিত হউক অথবা প্রচলিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাউক, সমাজের মধ্যে রাজনীতির গতি এই পর্য্যন্ত। আবার রাজ্য অরাজক হইলে কিরূপ দুরবস্থা হইত তাহা দেখা যাউক। রাজা দশরথের মৃত্যুতে রাজ্য অরাজক হওয়ায় অমাত্যবর্গ রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বশিষ্ঠের নিকট বলিতেছেন।

২। ৬৭২৫ (২৫)—"অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্য গৃহনির্ম্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন; ধনবান্ যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত, ও নট নর্ত্তক নিশ্চিন্ত এবং দেশের উন্নতি সাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্ত্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন; কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান্ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না। অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্য দ্রব্য লইয়া দূরপথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন ষষ্ঠ বৎসরের মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টাবন্ধনপূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্র বিচার করিতে বিরত হন; এবং ধর্ম্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে

২৪। "যাত্রা যানং তচ্চ পঞ্চবিধম্।
"বিগ্রহ সন্ধায় তথা সম্ভূয়াথ প্রসঙ্গতঃ।
উপেক্ষ চেতি নিপুণৈ র্যানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥
—রামানুজ।

* সন্ধি ও বিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধিভাব ও আশ্রয় সন্ধি যোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহ যোনিক।

হে।

২৫। পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ।

দক্ষিণা দান ও মাল্যমোদক প্রস্তুত করিতে শংসয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরু রাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাঁহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না; অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্য ও তদ্রূপ; এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্মমর্য্যদা লঙ্ঘন করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ।"

ভরতের প্রতি রামের প্রশ্নচ্ছলে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তৎসাময়িক রাজধর্ম্ম কতদূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও বহ্বাড়ম্বর বিশিষ্ট ইহা প্রতিপন্ন হইবে। ঐ নীতি সমূহের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিলে, উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে নৃপতিগণের কণ্ঠভূষণ হইবার যোগ্য। এতদূর উৎকর্ষ সত্বেও আলোচকের ক্ষোভ নিবারণ হয় না, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না; কেন? প্রজাদিগের অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে ইহার মূল রোপিত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত রাজনিয়ম সমুদয় যতই কেন উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হউক না, পরক্ষণে বর্ণিত অরাজকতার স্বভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্য্যালোচনে অনুমিত হইতেছে যে, যিনি যখন রাজা থাকিতেন, উক্ত নিয়ম গুলির অনুষ্ঠানবিষয়ে তাঁহারই প্রকৃতির উপর অনেক নির্ভর করিত। একের উপর নির্ভর করে বলিয়াই অরাজকতায় এত দুর্দ্দশার সম্ভব; রাজা এবং প্রজা এ উভয়ের উপর সমানরূপে নির্ভর করিলে উহার অর্দ্ধেকও হইতে পারে না; অথবা প্রজার উপর যদি অধিক নির্ভর থাকে, তবে রাজা মরিলেন কি বাঁচিলেন তাহা লোকে জানিতেও পারে না, অথবা জানিতে চায়ও না। ফলতঃ সেইকালে রাজকার্য্যে সাধারণ প্রজাবর্গের হস্ত কতদূর ছিল, তাহা নিরূপণার্থে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

রাজা যদি ঐ সকল সুনিয়মের অনুষ্ঠান করিতেন, তবে ইহা জ্ঞাতব্য নহে যে তিনি প্রকৃতিবর্গের নিকট বাধ্যতা বশতঃ ওরূপ করিতেন। প্রকৃতিবর্গও কেমন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান জন্য রাজাকে বাধ্য করিতে হয় তাহা জানিতেন না। রাজা যদি সৎ হইতেন তবে তিনি দেবপ্রেরিত অথবা দেবাবতার বলিয়া পূজ্য। অসৎ হইলে লোকে অদৃষ্টের দোষ দিয়া ক্ষান্ত থাকিত। আ-

রও অসৎ হইলে, নৈরাশ্যসম্ভূত ক্ষণিক উন্মত্ততা এবং ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে রাজচ্যুত করিত, এই পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত। চকিতের ন্যায় পরক্ষণেই পূর্ব্বকথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, আবার পূর্ব্বমত ধীরভাব ধারণ করিয়া অদৃষ্টসাগরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিরস্ত থাকিত। সুতরাং তাহাদের যে কোন উদ্বেগ, স্থায়ীরূপে কার্য্যকারী হইতে পারে নাই, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ও সম্যক্ প্রকারে আচরিত হইত না তাহা অনুমান সিদ্ধ।

একাধিপত্য সম্পন্ন রাজার দৌরাত্ম্য অপরিসীম। এরূপ রাজা আশানুরূপ সৎ হইলেও দৌরাত্ম্য আশানুরূপ নিবারিত হয় না। যেহেতু সে সময়ে যাহা কিছু হইয়া থাকে সকলই একটি মাত্র চিত্তপ্রসূত। মনুষ্যচিত্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল, ভিন্ন ভিন্ন চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুণ এবং হীনতার আধার। বহু চিত্তের একত্র সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সংযোজনে ভারাধিক্য হওয়ায়, হীনতা ও ভ্রান্তি হ্রস্বতেজা হইয়া থাকে। সুতরাং এক চিত্তের কার্য্যে যতদূর ভ্রান্তি প্রবেশ করে, বহু চিত্ত সংযোগে তাহা হইতে পায় না। একাধিপত্য রাজ্যে এক চিত্তের কার্য্য, হয় রাজার, নতুবা অমাত্য প্রধানের—ফলপ্রসবিতায় উভয়ই এক। এরূপ রাজ্যে সৎ রাজা সদভিপ্রায়যুক্ত হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ কার্য্যে পরিণত করার দোষে এবং তদ্রূপ অপরাপর কারণে অনেক অসৎ কার্য্য করিয়া থাকেন।

যাহাহউক সমাজ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, প্রজাগণ চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট হইয়া শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না। এই সময়ে একাধিপত্যযুক্ত রাজার প্রয়োজন। আভ্যন্তরিক অত্যাচার থাকিলেও তিনি প্রজাগণকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অত্যাচারে উত্তেজিত হইলে উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, প্রজাগণ এই সময়ে উৎসাহযুক্ত হইয়া পরস্পর সংমিলনে আত্মোন্নতি করিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ভারতে ইহার বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়াছে। এখানে প্রজাদের মধ্যে আত্ম বিরোধভাব, ইহার এক পক্ষ ব্রাহ্মণগণ, অপর পক্ষ সাধারণ জনবর্গ। সাধারণ জনবর্গের প্রতি দ্বিবিধ অত্যাচার, প্রথমতঃ রাজার, দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণের। এতদুভয় কারণে তাহাদিগের চক্ষু উন্মিলিত হইবার অবসর হয় নাই। ব্রাহ্মণেরাও তন্নিমিত্ত আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে তাহাদের যথোচিত সাহায্য না পাইয়া হীন বল হইয়াছিলেন। জ্ঞানবত্তার যদিও তাঁহারা বাহ্যিকভাবে পূজ্য ছিলেন বটে কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজারা তাঁহাদিগকে যে কলে চালাইতেন প্রায় সেই কলে চলিতেন। আবার এরূপ সমাজের উপর যাহার আধিপত্য তাঁহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। উহা কিরূপ অনু-

রিত, পুষ্পিত ও ফলবতী হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের সহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে। যাহাহউক বাল্মীকির সময়ে এরূপ ভাবের বাল্যাবস্থা।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমলাকান্তের দপ্তর।

নবম সংখ্যা।

বিবাহ।

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকার বিবাহ। বৈকালশৈশব অবসান প্রায়, কলিকা কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেক গুলি কন্যাভার গ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উচু, স্থলপদ্ম অতদূর নামিল না। জবা, এ বিবাহে অসম্মত ছিলনা, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায়না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমর রাজ ঘটক হইয়া মল্লিকাবৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,

"গুন! গুন! গুন! মেয়ে আছে?"

মল্লিকা বৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুন্‌গুন্‌গুন্ গুন্‌গুনাগুন্ মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিত নয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর, একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুন! গুন! গুন! গুন দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলেনা। বৃক্ষ বলিলেন "আমার মেয়ে গুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজ পুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিগে মল্লিকার

ান্ধ্যা ঠাকুরাণী দিদি আসিয়া তাহাকে ত বুঝাইতে লাগিল—বলিল "দিদি, কবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আ সিবে না—লক্ষ্মী আমার,চাঁদ আমার,সোণা আমার" ইত্যাদি। কলিকা কত বার াড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ুরাইল, কতবার বলিল, "ঠান্ দিদি, ্ই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্ব- াবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল; তখন ঘটক হাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। ন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, গুণগুণগুন গুন্ গুণাগুণ্! কন্যা গুণ- তী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দি- বন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্র- মর বলিলেন "গুণ্ গুণ্, আপনার অ- নক গুণ্—ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল। তাও, হবে।"

ভ্রমর—"বলি ঘটকালীর কিছু আ- াম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ— ণ গুণ গুণ।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল াখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের থা বল— বর কে?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র।—তাঁর নেক গুণ্-ন্-ন্"

"কে তিনি?"

"গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়। তাঁর নেক গুণ।"

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই, এসকল শুনিতে- ছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলা- চার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমাকীর্ত্তন ক- রিতে ছিলেন। বলিতেছিলেন, যে গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না ই- হারা "ফুলে" মেল। যদি বল সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক, কেন না ইহারা সাক্ষাৎ বাঙ্গা মালীর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল এ কুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,লাফাইয়া লাফা- ইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল; ভ্রমর বলিল, "আজি কাল ফুটিবে।"

গোধুলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উ- চ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারা বাজি হইতে লাগিল; কো- কিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল।

অনেক বরযাত্র চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবা গোষ্ঠী—শ্বেতজবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি, সবংশে আসিয়াছিল। করবীরের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া ছুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক, নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একপাল পিঁপড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল কুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস, বাহকের বায়না লইয়া ছিলেন; তখন হুঁ—হুম করিয়া অনেক মস্তানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম বর, বরযাত্র সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম পুরোহিত উপস্থিত; নশীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীয়ন্ত কুসুম রূপিণী) কুসুম লতা সুচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর ঘরে লইয়াগেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গনের, রাঙ্গা মুখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল;

বকুল, একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল তখন—

"কমল কাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি ঢুলে পড়্‌বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল;—চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্প বাসর কোথায় মিশিল?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শুভ্র স্মিত সুধাময়ী পুষ্পসুন্দরী সকল কোথা গেল? যে খানে সব যাইবে সেই খানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূত সাগরগর্ভে। যে খানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে সেই খানে—ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম যেসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়াছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

শাসন প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভারত ভূমির অদৃষ্ট যেকালে সুপ্রসন্ন ছিল তৎকালে ইহার যে দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইত সর্ব্বদিগেই সুন্দর দৃশ্যে পরিপূর্ণ বোধ হইত। পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ সমস্ত ধরাতলে অগ্রগণ্য ছিলেন। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন পাপের আধিক্য হইতে লাগিল অমনি তাহার নিবৃত্তিচেষ্টায় সকলেই তন্মনস্ক হইলেন।

ভিন্নদেশীয় ও আধুনিক সভ্যজাতির

চক্ষে যাহা সামান্য দোষ বলিয়া গণ্য ভারতবর্ষীয়দিগের নয়নপথে সেগুলি সে প্রকার সামান্য অপরাধ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য নয়। ইহাঁদিগের নিকট অকার্য্য চিন্তা, কুকর্ম্ম, কুপরামর্শ, কুসঙ্গ কুব্যবহার মাত্রই দোষজনক। দোষ মাত্রই পাপোৎপত্তির মূল।

ইহাঁরা পাপে রত না হইতে পারেন এই কারণে শাস্ত্রকারেরা আত্মা ও মনকে সকল কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ কহিয়াছেন। (১) এই জাতির ধর্ম্মোপদেশকগণ মনুষ্য দিগকে শাস্ত্রের নিয়মাধীন করিয়া সংসার রক্ষার নিমিত্ত সমাজঘটিত যে সকল নিয়ম করিয়াছেন তাহার কতকগুলি অদ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

ইহাদিগের বিচারপ্রণালীর কতিপয় বিষয় পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে, এক্ষণে ব্যবহার সংহিতার নিয়মানুসারে কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ ও তত্তৎকার্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে অথবা অজ্ঞানকৃত হইলে কিরূপ দোষ ঘটে ও সেই দোষ গুলি কি প্রকার পাতকে পরিণত হয় এবং তাহার দণ্ডই বা কতদূর হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে দণ্ডনীতিঘটিত বিষয়ের তাবৎ কার্য্য ও শাসন প্রণালী জানা যায়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বিচারপ্রণালীর বিষয় এক প্রকার বলা হইয়াছে। কিন্তু মকদ্দমার আপীলের কথা কিছু বলা হয় নাই। তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ আপীলের কথা অগ্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বিচারকালে যদি অভিযোক্তা অথবা প্রতিযোগী ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ প্রয়োগাদি পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে পুনর্বিচার হইতে পারে। প্রাড্‌বিবাকাদি কর্তৃক নিষ্পাদিত বিচারের প্রকৃত দোষপ্রদর্শন করিতে না পারিলে পুনর্বিচারস্থলে অভিযোগটী পুনর্নিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইত না। পুনর্বিচারদর্শনকালে রাজাকে বিচারাসনে উপস্থিত থাকিতে হইত। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে পুনর্বিচার স্থগিত থাকিত। প্রথম ধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পন্ন বিচারে দোষ দৃষ্ট হইলে দ্বিতীয় ধর্ম্মাধিকরণের মতানুসারে নৃপতিকর্তৃক প্রথম বিচারকের দণ্ডবিধান করা রীতি ছিল। (২)

(১) মনু বচনার্দ্ধ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।

(২) অসদ্বিচারেতু বিচারান্তরমাহ নারদঃ। অসাক্ষিকন্তু যদ্দৃষ্টং বিমার্গেণচ তীরিতং।
অসম্মত মতৈর্দৃষ্টং পুনর্দর্শনমর্হতি॥
অসাক্ষিক মিত্য প্রামাণিকোপলক্ষণং।
তথা যাজ্ঞবল্ক্য।—
দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্টা ব্যবহারান্নৃপেণতু।
সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমং॥
তীরিতাঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র ক্বচন যত্নবেৎ।
কৃতংতদ্ধর্ম্মতো বিদ্যান্নতদ্ভূয়ো নিবর্ত্তয়েৎ॥ ২২৩

সুবিচার না করিলে রাজ দ্বার হইতে তিরস্কৃত, দণ্ডিত, লোক সমাজে ঘৃণিত এবং পরকালে নরকভাগী হইতে হইবে এই ভয়ে অধিকাংশ বিচারকই জ্ঞানগোচরে কদাপি অবিচার করিতেন না। সেই হেতুই ইঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অধিকাংশ স্থলে প্রায় আপীল হইত না। সুতরাং পুনর্বিচারের কথা অল্প পরিমাণে দেখা যায়। আপীলের ভাগ অতি অল্প হইবার আরও একটী বিশেষ গুরুতর কারণ লক্ষিত হয়। সেটী এই—বাদী প্রতিবাদী কি প্রকার অবস্থার লোক, তাহাদিগের কেমন বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ ও কি বিষয়ক অভিযোগ কি প্রকার সাক্ষী আছে উহা অগ্রে পরীক্ষীত হইত। তৎপরে বিবেচনানুসারে সেটী বিচার যোগ্য কি না জ্ঞান হইলে তাহার মীমাংসাজন্য বিচারাসনে অর্পিত হইত।

বিশেষতঃ বিবাদমাত্রই যে ধর্ম্মাধিকরণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত তাহা নয়। কুল, মিত্র, শ্রেণী, পরিবার রক্ষক পিতা, মাতা, এবং গুরু পুরোহিতাদি দ্বারা অনেক স্থলে বিবাদভঞ্জন করা রীতি ছিল বলিয়া অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতরূপে সুপদ্ধতি অনুসারে মীমাংসা হইয়া আসিত তন্নিবন্ধন পুনর্বিচারের স্থল থাকিত না। আরও একটী বিশেষ কথা এই যে আর্য্যজাতির সমাজবন্ধনগ্রন্থি সমস্ত এমন দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে যে সত্যকালে যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহা ত্রেতাদি তিন যুগে নিষিদ্ধ ও তাদৃশ পাপ জনক না হইলেও ইহাদিগের আবহমান কালের সংস্কার অনুসারে চিরকালই উহা নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদিগের সমাজের এক জন দোষ করিলে সমাজের সমস্ত লোককে দোষী ও পাপলিপ্ত জ্ঞান করা যায়।

ইঁহারা এমনি তেজস্বী ও ধার্ম্মিক ছিলেন যে মন্দ কর্ম্মমাত্র ইঁহাদিগের ঘৃণার বিষয় ছিল। কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক পাপচিন্তাকেও মনে স্থান দিতেন না। এমন এককাল গিয়াছে যেকালে পাপী ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনেও ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির অধঃপতন ও নরকভোগ জ্ঞান হইত। এখন সেকাল কোথা গেল!—দ্বিতীয় যুগে পাপীর সংস্পর্শে মনুষ্যের পাপ লেখে। ক্রমে লোকের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তৃতীয় যুগে পাপীর অন্নভক্ষণে পাপ জননের বিধি হইল। চতুর্থ যুগে কুকর্ম্মকরণ দ্বারাই পাপোৎপত্তির বিধি থাকিল বটে—কিন্তু সংস্কারের গুণে, উপদেশের গুণে, সমাজের প্রথানুসারে পাপীর সঙ্গে কথোপকথনাদি চতুর্ব্বিধ বিষয়ই সর্ব্বকালে আর্য্যজাতির নিকট পাপজনক বলিয়া নির্ণীত আছে।

অমাত্যাঃ প্রাড়্‌বিবাকোবা যৎকুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎস্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্‌ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ ॥ ২৩৪
মনু ৯, অ।

ভারতবর্ষীয়েরা পাপকার্য্যে এরূপ ভয় করেন, পাপপঙ্ক ইহাদিগের শরীর ও মনকে এরূপ কলুষিত করে যে ইহারা পাপক্রিয়ার ধ্বনি শুনিতেও ইচ্ছা করেন না। ইহাদিগের অন্তরাত্মাই ইহাদিগের পাপ পুণ্যের সাক্ষী। সত্যকালে দেশমধ্যে কোন ব্যক্তি পাপপঙ্কে পতিত হইলে ধার্ম্মিকলোকেরা সে দেশ পরিত্যাগ করিতেন। ত্রেতাযুগে পতিত ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিত সে গ্রামে ধার্ম্মিকগণ বাস করিতেন না। দ্বাপরে পাপী ব্যক্তি ও তৎসংসৃষ্ট লোকমাত্রকেই পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা রীতি ছিল। কলিতে কথোপকথনে তাদৃশ দোষ না হউক কিন্তু পারতপক্ষে সখ্য আদান প্রদান ও অন্নভোজনে দোষ জন্মে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এস্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত বলিতে হইবে। পাপীকে এই প্রকারে ঘৃণা করাতে আর্য্যসমাজে দোষ প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং বৃথা অভিযোগ হইত না। সত্য অভিযোগের সত্য মীমাংসা হইত বলিয়া আপীলের স্থল থাকিত না।[৩]

অভিযোগের পূর্ব্বে যে প্রকারে শপথ ও দিব্য করান হইত তাহার নিয়মে এই জানা যায় যে স্বল্পকারণে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে পুত্রবান্ পুরুষ সবন্ধু ব্যক্তি ও পুত্রবতী নারীদিগকে পুত্রের মস্তকস্পর্শ অথবা প্রিয়ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। বৈশ্যজাতিকে শপথ করাইতে হইলে গোরু শস্য ও কাঞ্চন দ্বারা শপথ করানই প্রকৃত শিষ্টাচার। ক্ষত্রিয়জাতিকে শপথ করাইতে হইলে সত্য বল মিথ্যা বলিও না পাপ হইবে এইরূপ কহিতে হয়। ব্রাহ্মণকে শপথ করাইবার সময় কি জান যথার্থ বল এইমাত্র বলিলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার পাতক দ্বারা শপথ করান রীতি প্রচলিত ছিল।

দিব্য বিষয়ে—দেবতা, ব্রাহ্মণ, বাহন, অস্ত্র, গো, বৃষ, বীজ ও স্বর্ণাদি দ্বারা দিব্য করান যায়। লোকসমাজে ও বিচারাসনের সম্মুখে এইরূপে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের অপলাপ পুরঃসর কোন্ ব্যক্তি অসত্য কহিতে সাহসী হন? যিনি মিথ্যা কথনে অথবা ছলে সাহসী হন তাঁহারও আকার ইঙ্গিত, চেষ্টা মুখভঙ্গী ও বিকৃত স্বরাদি দ্বারা তাঁহার মিথ্যাকথন প্রকাশ পায়। মিথ্যাবাদী জন সংসার মাঝে অতি অপদার্থ মধ্যে গণ্য হয়। মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড আছে সে দণ্ড স্থলবিশেষে অতি

(৩) কৃতে পতিত সম্ভাষাৎ ত্রেতায়াং স্পর্শনেনতু।
দ্বাপরে ভক্ষণে তস্য কলৌ পতিত কর্ম্মণা ॥২৬
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥২৫
কৃতেতু লিপ্যতে দেশ স্ত্রেতায়াং গ্রামএবচ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কলৌ কর্ত্তা বিলিপ্যতে ॥২৫
পরাশর সংহিতা ১ম অধ্যায়।

ভয়ানক; বিশেষতঃ হিন্দুজাতিরা লঘু পাপেও গুরুদণ্ড করিতেন বলিয়া কেহ নিতান্ত মর্ম্মান্তিক পীড়া না পাইলে কাহারও বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ করিত না।

শপথ ও দিব্য অদ্যাপি পল্লীগ্রামমাত্রে প্রচলিত আছে। উহা দ্বারা স্ত্রীলোকের কলহ, বালকগণের বিবাদ ও অজ্ঞলোকের বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধীয় বিবাদের মীমাংসা হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হয় না।[৪]

বিচারকার্য্য সুচারুরূপে যথার্থরূপে ও ন্যায়ানুসারী না হইলে পাপ জন্মে, ঐ পাপ চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া প্রথম পাদ পরিমিত অংশ রাজার স্কন্ধে নির্ভর করে। দ্বিতীয় পাদপরিমিত ভাগ বিচারকের শরীর ও মনকে স্পর্শ করে। তৃতীয় পাদাংশ সাক্ষীকে আক্রমণ করে। চতুর্থ পাদ প্রমাণাংশ অভিযোক্তাকে পাপী করিয়া থাকে। সুতরাং দেখাযাইতেছে বিচারকার্য্যের দোষে প্রকৃত পাপকারীর স্কন্ধ হইতে পাপের ¾ অংশ বিচারক নৃপতি ও সাক্ষীর স্কন্ধে পতিত হইতেছে। এই জ্ঞানটী সুদৃঢ় থাকাতেই সর্ব্বত্র সুবিচারই দেখা যাইত অবিচার প্রায়ই দেখা যাইত না।

আর্য্যজাতির মতে ব্যবহারকাণ্ড চারিভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম পাদ পূর্ব্বপক্ষ। উত্তরপক্ষকে দ্বিতীয় পাদ ধরা যায়। ক্রিয়াকে তৃতীয় পাদ কহা গিয়া থাকে। নির্ণয় দ্বারা ব্যবহারকাণ্ডের চতুর্থ পাদ নির্দ্ধারিত হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাদীর কথাগুলি পূর্ব্বপক্ষ, প্রতিযোগী ব্যক্তির প্রতিবচনগুলি উত্তরপক্ষ, লেখ্য ও সাক্ষীর বচন প্রমাণাদি ক্রিয়াপক্ষ, নিষ্পত্তিকে নির্ণয়পক্ষ কহা গিয়া থাকে।৫

[৪] গোবীজ কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রংসর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেবং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥
দেব ব্রাহ্মণে পাদাংশ্চ পুত্রদারশিরাংসিচ।
এতেতু শপথাঃপ্রোক্তামনুনা স্বল্পকারণৈঃ॥
সাহসেম্বপি শাপেচ দিব্যানিতু বিশোধনং।
বৃহস্পতি সংহিতা।
শপথ প্রকারমাহ নারদঃ।
সত্যবাহন শস্ত্রাণি গোবীজ কণকানিচ।
স্পৃশেচ্ছিরাংসি পুত্রাণাং দারাণাং সুহৃদাস্তথা।
দিব্যতত্ত্বধৃতবচন।

[৫] পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃসাক্ষিণমিচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদোরাজানমিচ্ছতি॥
এনোগচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে।
ব্যবহারতত্ত্বধৃত মনুনারদ বৌধায়ন হারীত বচন।
পূর্ব্বপক্ষঃস্মৃতঃপাদো দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ॥
বৃহস্পতি সংহিতা।

কমল বিলাসী।

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপনলহরী!—
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরস সরসে নীরদ বরণ
সলিল ভ্রমিছে বিহরি।
কত সরোজিনী সরোবর পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে,
অপূর্ব্ব সুবাস বিতরি।
সরোবর তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল;
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল,
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী।
ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা পেয়ে সে সুগন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা, শোক তাপ পাশরি।
ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি।
আনন্দে অঘোর মধুমত্ত মন,
ত্যজি বারি পুনঃ, উঠে কতক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ
হৃদয়ে সুখের লহরী।
পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদল—
কোরক বিকচ নলিনী অমল

মকরন্দ লৈয়ে ঢালে অবিরল
পুরিয়া পুরিয়া গাগরী।
পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায়;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী।
মধুমাখা হাসি বদনে বিকাস,
পদ্মমধু বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্ম সুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী।
বিছায়ে কোমল কমল পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহর উপাধান তায়,
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী।
তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর;
দুগ্ধফেণনিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী উপরি!
এরূপে কুসুম শয়ন পাতিয়া,
বিলাসিনীগণ হাসিয়া হাসিয়া,
হৃদয়বল্লভ পারশে বসিয়া
ছড়ায় বিলাস লহরী;
কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়নসফরী;
অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া,
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী তুলিয়া,

বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী;
কেহ বা আপন নয়নঅঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয় আঁখি পরে—সলাজ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি;
কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে,
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়হৃদি পরে,
অলক্ত লাঞ্ছনে দেহ চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি।

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা,
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা:
কেহ বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা
চরণ পারশে প্রহরী।

বসিয়া এভাবে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচরি
পূরিছে পল্লববল্লরী।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অগণন
"বউ কথা কও" সুন্দরী

উঠিল ডাকিয়া, পুরি চারি দিক—
বেণু বীণা রব মধুর অধিক
জগৎ সংসার করিল অলীক,
ছড়ায়ে গীতের লহরী।

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাবিছে—"সে সব মিছার"
"শ্রম, আশা ভ্রম সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি;—

"কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে!
"রসের বাগান সুখের মেদিনী
নারীফুল ফুটে তাতে।
"যে জানে মথিতে এ সুখ জলধি
সেই সে পীযূষ পায়;
"সখের বাজার সুখের মেদিনী
রসের বেসাতি তায়!"

*   *   *   *

"হায় সে পীযূষ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে!
"হায়—ধন, মান—যশ, প্রাণের নিগড়!
কণ্টক আশার বনে!
"এ যে—সুখের ধরণী, ভাবনা উদাস
ইহাতে নাহিক সাজে;
"হেথা—প্রাণের সারঙ্গ প্রমোদে বাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে!
"শুধু—রসিক যে জন রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায়!
"ডুবে—নারীসুধাকূপে লভে প্রেমসুধা
দ্বিজ এই গীত গায়।"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে;
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতরি।
চারু কিসলয় হইল বিকাস;
তরুরাজি কোলে মৃদু মৃদু শ্বাস
কুসুম চুম্বিল মলয় বাতাস—
লতিকা উঠিল শিহরি;
তুলিয়া কলাপ মদন বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর;

নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি।
গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী।
যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ কুসুমে ভূষিয়া,
ধীর নাদে মৃদু মর্ম্মরি!
মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সংহরি।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ;
চারি দিকে খালি হেরি চারু বেশ
কমল-সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি;

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ
সরোবর তীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি সে অপূর্ব্ব নগরী!

ষড় ঋতু ক্রমে কত আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট আবার শরতে লুকায়,
নিশিরে করিয়া সুন্দরী;

শিশিরের কোলে হিমঋতু আসে,
নিশিঅশ্রুজলে তরুদল ভাসে;
প্রাণী সে সকল তখনও বিলাসে
অঘোর দিবস শর্ব্বরী!

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না জলে,
সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে,
অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে—
জগত সংসার পাশরি।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল পীযূষ পিয়ে পুনর্ব্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনা ছলায়!—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতরি!

নাহি দেখে কভু সে শোভার মুখ!
ঘোরতর যবে প্রকৃতির বুক
ঘনঘটাজালে—পতন উন্মুখ
বিজলি বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি শোভা তখন!
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচয়ে প্রকৃতি সুন্দরী!

নেচে নেচে যবে ঘন ঘন ফোঁটা
পড়ে ধরাতলে ভেদি গিরি কোঠা
সরিৎ সরসী উলটা পালটা
অদৃশ্য কন্দর শিখরী।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য লহরী!

যে ভাব পরশে প্রাণে ফুল ফুটে
থাকে চির কাল, প্রাণিচিত্ত পুটে,

নিত্য পরিমল নিত্য যাছে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী;—
যে ভাব পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন—
জীবন মরণ বিস্মরি;—
না পরশে কভু তাদের পরাণ;
জীবন কাটায় করি মধু গান;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ,
নারী পায়ে ধরা চাকরি!
এই রূপে হেরি সে চারু অঞ্চল;
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর?
ধূধূ করে শূন্য পুরাকাল যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরী।

হায় রে কিরূপে এছার জীবন
এ ভাবে, এখানে, যাপে প্রাণিগণ!
ভুলে কি ইহারা ভাবে না কখন
এ বিলাস ভোগ পাশরি?

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায়?
কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথায়—
ভ্রমিতে সংসার ভিতরি!

পিতৃকুলগত কোন মহাভাগে
দিয়াছে সুমন্ত্র? শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য তরঙ্গে উতরি।

নরজাতি যত হের ধরা মাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে;
নিরখিলে তায় হৃদিতন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি।
এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন?
অপূর্ব্ব বা কিবা নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য উপরি?
ভাবিতে ভাবিতে কত দূরি যাই,
পুরী প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লব বল্লরী।

প্রাণিগণ সেথা করিছে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর, তরুতলে বাস,
সেইরূপে নারী প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা
ছাড়িয়া পলায় নগরী।

কাছে কাছে আছে শোণার পিঞ্জর,
স্বর্ণ শিকলি শতেক লহর;
যদি কেহ উঠে শুনে অন্য স্বর
বিলাস প্রমোদ পাশরি;—

অমনি তাহারে বাঁধে সে শৃঙ্খলে,
অমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে,
তবু সে না ছাড়ে সুন্দরী।

ভয়ে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায়;
ভাবি কেন, হায়, প্রবেশি সেথায়,

কিরূপে বাঁচিব করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী!
হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন!—
খেলিছে বঙ্গের উপরি!
আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপন লহরী!

চন্দ্রশেখর।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কথা।

পূর্ব্ব কথা যাহা বলি নাই এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব।

যে দিন আমিয়ট, ফষ্টরের সহিত, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দস্বামী জানিলেন, যে ফষ্টর, ও দলনীবেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে এ সম্বাদ অবগত করিলেন, বলিলেন,

"এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ অদ্য হইতে তাহার কার্য্য কর। এই যবনকন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিতা হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারি না। তাহাদিগের অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দস্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব। চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে, অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দস্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে, উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে শৈবলিনী পৃথক্ নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দস্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফষ্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দস্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দস্বামী, চিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তিনি তটপন্থে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন; বিশেষ তিনি আহার নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দস্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "একবার, নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি। চল, তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভৃতে রহিল; তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছু দূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দস্বামী, অনন্তবুদ্ধিশালী—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতে ছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

চ। না।

র। তবে, অদ্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয় তথাপি ফিরিল না। তখন, রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, ইহার অনুসরণ করি।"

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দস্বামী বলিলেন,

"তোমার বাহুতে বল কত?"

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগত প্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে, স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ২ আসিও।"

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার

এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দস্বামী মনেং ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। কল্য প্রাতে পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিতভিন্ন তোমার ব্রত নাই। তাহার উদ্ধার সম্পন্ন করিয়া, তুমি এইখানে আসিও। সেই মঠে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত যাইব। মুরসিদাবাদে গেলে যবন কন্যার উদ্ধারের অবশ্য উপায় করিতে পারিব। বর্ষারম্ভে গঙ্গা অত্যন্ত বেগবতী হইয়াছেন—নৌকাপথে যাইব, তটপথে ফিরিব। অন্যের দ্বিগুণ পথ আমি চলিতে পারি। সপ্তাহ মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব।"

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দস্বামী, তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

চন্দ্রশেখর, দলনীকে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া, আত্যন্তিক পরিশ্রম করিয়া, অষ্টম রাত্রে সেই পার্ব্বত্য মঠে আসিয়া রমানন্দস্বামীকে প্রণাম করিলেন। রমানন্দস্বামী সপ্তাহ বৃত্তান্ত তাঁহাকে সবিস্তারে, অবগত করিয়া, প্রভাতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাও বিবৃত করা গিয়াছে।

উন্মাদগ্রস্তা শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দস্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,

"ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই একদিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে মধ্যেং আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

হুকুম।

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাশেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাশেম প্রথমেই কাটোয়ায় যুদ্ধ হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজালক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাশেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষেরপাত্র লইয়া দলনীর নিকট গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব, আমাকে বেইয়াত করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল,?"

মহম্মদ তকি, বলিল, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি?

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নী স্বরূপ ছিলেন। সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে মন্মথ, চিন্তাগুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?" মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "যথার্থ বটে। জাল নহে। কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ?

মহ। আপনি কি বিষপান করিবেন না কি?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন,

"যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা, সবে মাত্র যৌবন বর্ষায়, রূপের নদী পূরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? সর্পের এত রূপ দিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কাণে২ বলিল—"হৃদয় মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরি—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে২ ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজ-রাজেশ্বর! শাহানশাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরিব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত! তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবী-পতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার-সাগর—কোথায় রহিলে?—আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু

তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না,—এই আমার দুঃখ।”

করিমন নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, “লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও—যে আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাঁকি যাহা থাকে তুমি লইও।”

করিমন, দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ২ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ, লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল—“করিমন বাঁদী আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।”

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল “বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।”

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন দলনী আসনে উর্দ্ধমুখে, উর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্ত করে বসিয়া আছেন—বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বক্ষে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছেন।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?”

দলনী বলিলেন, “ও বিষ। আমি তোমার মত নিমক হারাম নই—প্রভুর আজ্ঞাপালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—আমার এই উচ্ছিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।”

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সম্রাট্ ও বরাট।

মীর কাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হঠিয়া আসিয়াছিল। ভগ্ন কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ, আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয়গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীর কাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন, একদা জানাইল যে এক জন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর।

তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে-হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীর কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন হষ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের শত্রু বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারন হষ্টিং লিখিয়াছিলেন, "এ স্ত্রীলোক কে তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল, যে কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভাল মন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস্ বাদী—মরিবি—?"

কুলসম্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল—"নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর-হোসেন কুলসমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল—এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীর কাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেই খানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্‌সম্ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম লোকে রটাইতেছে, যে দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছেন। সত্য কি?"

নবাব। "আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—"

কুলসম আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিগ্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—একজন কুল্‌সমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম্, বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।

শুনুন, যে সুবে বাঙ্গালা বেহারের,

মীর কাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে, তাহার বেগম ছিল। সে, নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া, কেহ আর কুল্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না—সকলেই পরস্পরের মুখের দিগে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম বলিতে লাগিল—

"গুর্‌গন খাঁ ও দৌলাত উন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন, মীর কাসেমের গৃহে বাঁদী স্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুই জনে গুর্‌গন খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গন খাঁর সঙ্গে যে সকল কথা বার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্ত্তন, অশ্বারোহী গুর্‌গন খাঁর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ, চন্দ্রশেখরের সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি; ইংরেজগণ কৃত আক্রমণ, এবং শৈবলিনী ভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট্ প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাঁহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টর কৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল।—

"আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম সে আমাকে বিবাহ করিবে। মনে করিয়াছিলাম নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম হষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন, তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

এই বলিয়া কুল্‌সম কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শতশত রশ্মি প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে, বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজ দণ্ড, তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিলনা। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল! তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া, কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম সত্যই বলিয়াছে।—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন, "শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজ উদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচরে মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা সেই দলনীর কবরের কাছে আমারে কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞাপালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব

—আলিহিব্রাহিম খাঁ?"

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন, নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

হিব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া, অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে?"

সকলেই যোড় হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন,

"কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনী কে,? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্ফান্ যুক্ত করে নিবেদন করিল, "আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া মহম্মদ ইর্ফান্ বিদায় হইল।

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুরগণ খাঁ কত দূর?"

অমাত্য বর্গ বলিলেন," তিনি ফৌজ লইয়া উদয় নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌছেন নাই। নবাব, মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ?"

এক জনকে চুপি চুপি বলিলেন, "তাঁরি।"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসনত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া দলনী! দলনী! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন!

এসংসারে নবাবি এইরূপ।

তিন রকম।

নং ১

বঙ্গদর্শনে "নবীনা এবং প্রাচীনা" কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা লিখি। জানেন না যে সম্মার্জ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন দিগে ভারি হইবে?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন প্রাচীনে, নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন, পিতা মাতাকে; নবীনের ভক্তি কন্যা পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোনার বেনে। সত্যবটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে, তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে, ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি, তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ, সম্বন্ধীর উপর বর্ত্তিয়াছে, অপত্য স্নেহ ঘোড়া কুক্কুরের উপর বর্ত্তিয়াছে; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্ত্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ্ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর, নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখা পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্ম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেননা তোমাদের সে বন্ধনের দড়ী, এক দিগে শুঁড়ী, আর একদিগে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম্ম দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিতেছ—গরিব "নবীনা" খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্ম্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশুখ্রীষ্ট? ধর্ম্ম মান? পাপ পুণ্য মান? কিছু না—কেবল আ-

মাদের এই আলতা পরা মল বেড়া শ্রীচরণ মান; সেও নাতির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী।

নং ২

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে একিঙ্করীকুল, কোন দোষে দোষী? আমরা কি জানি?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে "নবীনার" প্রতি এত কটূক্তি কেন?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে; জাতিতে কাঠ মল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি—দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ, আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন নাকাটাইবে?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ আমরা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা, এতস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, যে অন্য ধর্ম্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীতা নহি? ছি! ধর্ম্মভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্ম্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম্ম জানি না। লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্ ধর্ম্মে বাঁধিবেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া এই পাতিব্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন্ ধর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখা পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা পড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্মশিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখা পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব কখন?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা!

শ্রী লক্ষ্মীমণি দেবী।

নং ৩

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি “নবীনা এবং প্রবীণা” লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজরি, তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য (?) বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ চল চল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবেনা! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে!—কপাল খানা! আবার বলেন কাজ করে না!

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;—দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখনা। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এক একটি আধমণি বস্তা—আমরা যাই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত!

ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখা পড়া শিখিয়া,—ধর্ম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা, একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন, আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে, আমরা “দ্বিতীয় সংসার” করিব—জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধারণ করিবেন,—বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন সুখের সীমা থাকিবে না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চস্‌মার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি

স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া, তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এসো—আমরা আপিশে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না।

শ্রী রসময়ী দাসী।

পরিমাণ রহস্য।

২ সংখ্যা।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ।)

লোকের বিশ্বাস আছে, যে সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্র "অতল।"

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রা নিবাসী প্রাচীন গণিত ব্যবসায়িগণ, অনুমান করিতেন, যে নিকটস্থ পর্ব্বত সকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediteraneau) সমুদ্রের অনেকস্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আল্‌প্‌স পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতাও ঐ রূপ।

মিশর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেকজান্দ্রা ও রোড্‌সের মধ্যে নয়সহস্র নয়শত, এবং মাল্টার পূর্ব্বে ১৫০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোলটের কস্মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে একস্থানে ২৬০০০ ফিট রশী নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেসবি লিখেন যে সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের কারণ সমুদ্রের

জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সম্বর্ত্তন কাল, (৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমরা জানিনা, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্র, গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of Semidiurnal Co-efficients" স্থির করিয়া ছিলেন, তাহা হইতেও এই রূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১, ৪৫৬ সেকেণ্ড বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে, কেবল পত্রপ্রেরণ হয় এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তি ক্রমে ইচ্ছা করে, যে নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি; কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যে খানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। ব্লাঙ্ক্ শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মাশ্যস বলেন যে তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় "গগন পর্য্যটন" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্য কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না শব্দ তরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না। বিও নামক বিজ্ঞানবিৎ, পারিসের লৌহনির্ম্মিত জল প্রণালী মুখে কর্ণ রাখিয়া ৩১২০ ফিট হইতে ফ্লুটের গীত শুনিতে পাইয়াছিলেন। ফ্লুট কি, অতি মৃদু কাণে কাণে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যদি কেহ আপনার ঘরে খাটে শুইয়া, গৃহান্তরে বন্ধু

প্রতিবাসীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে চাহেন, তবে দুই গৃহের মধ্যে চোঙ্গা- নির্ম্মাণ করিলেই তাহা পারেন।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দ তরঙ্গ সকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিগ্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এ পার হইতে ডাকিলে ও পারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্টর লিখেন, যে তিনি পোর্ট বৌযেনের এ পার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১॥০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যে জিব্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাস যোগ্য কি?

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে, যে আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক, সপ্তবর্ণের সমবায়; সেই সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গবৈচিত্রই জগতের বর্ণবৈচিত্রের কারণ। কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দেখি।

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭, ৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়; এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪০০০, বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১, ১১০ বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২২, ০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যে তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গ সকল, কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন, রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও।

(সমুদ্র তরঙ্গ।)

এই অচিন্ত্য বেগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগরতরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিৎস্রু সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মি সকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ" শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিৎস্রু সাহেব লিখেন ১৮৪৩ অব্দে কর্ব্বালের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন, যে জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়। তাহাতে ঐস্থান সমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ উর্ম্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জল শূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পর পারে, সানফ্রান্সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল ব্যবধান। ঐ ৪৮০০, মাইল তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬॥ মাইল চলিয়াছিলেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রিপুবিহার। শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র।

এখানি কাব্য গ্রন্থ। ভূমিকা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে;—

"সাহিত্য সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান স্বরূপ, তাহাতে বিমল পরিমল পরিপূরিত পদ-প্রসূনরাজী সর্ব্বদা বিকসিত হইয়া সুরসিক ভাবুক ভ্রমণকারীর চিত্ত অনুরঞ্জিত করে। আমি একদা ভাবুক ভাবে ঐ মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কষ্টে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি” ইত্যাদি।

আর কি গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইবে? যদি হয়, তবে এক স্থান হইতে নিম্ন লিখিত কয় পংক্তি উদ্ধার করিলাম।

রিপুদল দুরাচার কদাচারে রত।
বিষম বিলাসি—মতি না হয় বিগত॥
প্রভুতা প্রভূত মান, করেছে প্রয়াণ।
তাহাতে তাড়িত হয়ে মনে অভিমান॥
বিশঙ্ক বিপক্ষগণ, বলিষ্ঠ প্রধান।
সহজত “নয় ভারী, বিজয়বিধান॥”
কেমনে এমন ধনে, হইবে বিরত।
অচির-উদিত-ভানু, চির অস্তগত॥
বাসনা বিরোধ হেতু বিরোধীর সনে।
ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে॥
ইত্যাদি

পাঠক কি ইহার কিছু বুঝিয়াছেন? না বুঝিয়া থাকেন, “প্রভুতা প্রভূত” এবং “ভাবিয়া ভয়াল দলে, ভয়োদিত মনে” পড়িয়া সুখী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা ইহা পড়িয়া বলিতে পারি যে “সাহিত্য সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান স্বরূপ ইহাতে রিপুবিহার প্রভৃতি নানা প্রকার আগাছা জন্মে। আগাছা গুলি কাটিয়া আথা ধরান, গৃহস্থ লোকের কর্ত্তব্য।

বেহুলা নখিন্দর নাম চম্পূকাব্যম্। গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিভোগী হুগলি বিদ্যালয় ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত শ্রীভগবচ্চন্দ্র বিশারদ প্রণীতম্। কলিকাতা রাজধান্যাং বি এম্‌স্ যন্ত্রে মুদ্রিতম্।

বেহুলার প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। এখানি সংস্কৃত। ইহার উদ্দেশ্য, আধুনিক বিদ্যার্থিবর্গের উপকার। গ্রন্থখানি সেই জন্য অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে।

বিশারদ মহাশয় বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁহার নিকট বঙ্গদর্শনের গ্রন্থ সমালোচকেরা অনেক ঋণে বদ্ধ। শিষ্যের দ্বারা অধ্যাপকের গ্রন্থ রীতিমত সমালোচিত হইতে পারে না। তবে, ইহা বলায় বোধ হয় দোষ নাই, যে সংস্কৃত কাব্যামোদী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। এবং শিক্ষার্থিগণ উপকৃত হইবেন। তবে, অনেকের এরূপ বোধ আছে, যে আধুনিক লেখকের গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপে লাটিন শিখিতে কাইসর, বর্জিল, হরেস ত্যাগ করিয়া কেহ “স্কুলমেন” দিগের লাটিন অধ্যয়ন করে না। কিন্তু সংস্কৃত সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গ্রন্থ সকল একণে বিদ্যার্থিগণের দ্বারা অধীত হইতেছে। তাঁহারা যখন লিখিয়াছিলেন, তখনও সংস্কৃত ভারতবর্ষের চলিত ভাষা ছিল না—এক্ষণকার ন্যায় পণ্ডিতের ভাষা ছিল মাত্র। অতএব, ভাষা জ্ঞানে তাঁহাদিগেরও যেরূপ ব্যুৎপত্তি সম্ভাবনা, আধুনিক লেখকেরও সেই রূপ।

বাঙ্গালির বাহুবল।

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। সর্ব্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালির বাহুতে বল নাই, ইহা সত্য-কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা যাউক কখন ছিল কি না।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নাই। যাহা বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত বলিয়া পাঠশালার বালকগণ কর্ত্তৃক অধীত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নহে, বাঙ্গালার মুসলমানদিগের পুরাবৃত্ত। উহা বাঙ্গালির দাসত্বের পুরাবৃত্ত; বাঙ্গালার অধঃপাতের ইতিহাস। সত্য বটে, যেমন বাঙ্গালার পূর্ব্বাবস্থার কোন লিখিত বৃত্ত নাই, সেই রূপ ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশেরও নাই। নাই, কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধানে অনেক কথা জানিয়াছেন। পশ্চিমভারতের, মধ্য ভারতের, দক্ষিণ ভারতের, পূর্ব্ব গৌরবের অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। পুরাবৃত্ত থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে, যে মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত এক ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে দিগ্বিজয়ী যুনানীগণ শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে সেই বীরেরা, আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিনশতবৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব বীরত্ব, পূর্ব্ব গৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে যখন পশ্চিম ভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্ সকল প্রণীত হইতে ছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পদশালিনী নগরী সকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্য ভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত।(১) কেবল ইহাই জানি যে যখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একত্রিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ড সকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর, অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্য জাতির

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গে-ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে, চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্য্যটনে আসেন, তখন তিনি দেখিয়াছিলেন, যে এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

তবে, ইহার পরে শুনা যায়, যে পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ, বৃহৎরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড় নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমত কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালি জাতি, এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়া ছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম, কিম্বদন্তী আছে, যে দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশীগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙ্হাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার দিল্লীপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত, যে তাহা হইলে অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যাইত। বঙ্গহইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপাল রাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কাশী প্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সেমত পরিত্যক্ত হইতেছে। (২)

তৃতীয়। লক্ষণ সেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশ জেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায়, যে সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ "সমতট" রাজাবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয় পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ, খর্ব্বাকৃত দুর্ব্বলগঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে যেরূপ হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি

(২) See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall. p xxxv, Note 2.

চিরকাল দুর্ব্বল, সেই সেই কারণ যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রকৃতির ফল। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মত গুলির, সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে ভূমি উর্ব্বরা হইলে, আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায় বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য। মনুষ্যকে সর্ব্বদা নিরত রাখে, এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আর ও উর্ব্বর দেশ আছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্সের অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষার উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সেই আমেরিকাবাসীদিগের বলের পরিচয় দাসত্বের যুদ্ধে বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের ভয়ে আজি কালি, ইউরোপের দুর্দ্দান্ত বলশালী জাতিরাও তটস্থ। তবে বলা যাইতে পারে ইহারা তরুণ জাতি। উর্ব্বরতার কুফল আজিও আমেরিকায় ফলে নাই।

ইটালি ও গ্রীসের ভূমিও অত্যন্ত উর্ব্বরা। আধুনিক গ্রীসীয় ও ইতালীয়গণ বলশালী বলিয়া বিখ্যাত নহেন বটে, কিন্তু এককালে সেই উর্ব্বর প্রদেশ বাসিগণ পৃথিবী জয় করিয়াছিল। তখন কি সে সকল দেশের ভূমি উর্ব্বরা ছিল না?

অনেকে বলেন জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্ব্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে একটি কথা আছে। বায়ু যে পরিমাণে উষ্ণ তাহাতে সেই পরিমাণে অদৃশ্য জলকণা গুপ্ত ভাবে থাকে। বায়ুতত্ত্ববিদেরা ইহাকে "Saturation" বলেন। বায়ুর তাপানুযায়ী জল বায়ুমধ্যে থাকিলে, কখন সে বায়ুকে আর্দ্র বলা যায় না। কেন না, সেটুকু তাপেরই আনুষঙ্গিক। সে পরিমাণের জলসিক্ততার যে দোষ, তাহা তাপের ফল মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে বাঙ্গালার বায়ু যে বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ, সে কি কেবল তাপের কারণে, না তাপের যাহা ধারণীয়, তাহার অতিরিক্ত জলসিক্ততার কারণে?

কেবল তাপে কখন এরূপ ঘটিতে পা-

রেনা। যদি ঘটিত, তবে আরবগণ দিগ্বিজয়ী হইল কি প্রকারে? আরবের ন্যায় কোন দেশ তপ্ত? আরবীয়ের ন্যায় বলবান্ কে? ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ এমত আছে, যে বঙ্গদেশের ন্যায় তাপশালী। কিন্তু উড়িষ্যা ও আসাম ভিন্ন কোন্ দেশের লোক বাঙ্গালির ন্যায় দুর্ব্বল? তবে, যদি বলেন, বায়ুর ধারণাশক্তির অতিরিক্ত জলসিক্ততাই পীড়ার কারণ, তাহা হইলে প্রমাণ করিতে হইবে বঙ্গদেশের বায়ু ধারণাশক্তির অতিরিক্ত জল ধারণ করে। বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্গদেশের বায়ু ইংলণ্ডের বায়ু হইতেও শুষ্ক। যিনি এই বিস্ময়কর কথায় অবিশ্বাস করিবেন তিনি নিম্নোদ্ধৃত টীকা পাঠ করিবেন। (৩)

অনেকে মোটামুটি বলেন যে জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ।

যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই বলসম্বন্ধে অনেক তারতম্য দেখা যাইত। বাঙ্গালা অতি বৃহদ্দেশ, উহারমধ্যে অনেক প্রকার জল বায়ু আছে। রঙ্গপুর দিনাজপুর, যেরূপ অস্বাস্থ্যকর, মেদিনীপুর, বীরভূম ঠিক তাহার বিপরীত। এ কথা সত্য হইলে, রঙ্গপুর দিনাজপুর অঞ্চলের লোক অপেক্ষা, মেদিনীপুর বীরভূম প্রদেশের লোক, এবং পার্ব্বত্য বন্যজাতি সকল সবল হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সকলেই সমান দুর্ব্বল, কোন তারতম্য দেখা যায় না।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল।

---

(৩) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial; and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observation. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England. A comparative table is subjoined of the mean vapour tension and relative humidity of London and Calcutta in each month of the year, and the mean of the whole year; the data for the former place being taken from an essay on the climate of London by the late Professor Daniell, those for the latter from the results of the hourly observations registered at Surveyer General's Office Calcutta, and computed in the Meteoro-

এদেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায়, যে তাহাতে ষ্টার্চ্চ, গ্লুটেন, প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রোজন প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই

logical Office of Bengal. The former are deduced from 17 year's, the latter from 14 year's observations.

Mean Vapour Tension in Thousandths of an inch.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apl.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	sept	oct.	Nov.	Decm.	Average.
London.	·245	·264	·280	·315	·340	·490	·534	·530	·468	·389	·310	·281	·376· inch.
Calcutta	·487	·549	·695	·805	·889	·947	·954	·950	·950	·828	·605	·489	·762.

Mean Relative Humidity:—Saturation 100.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apl.	May	Jun.	Jul.	Aug.	sept.	oct.	Nov.	Decm.	year.
London.	97	94	89	84	82	82	84	85	91	94	96	97	89
Calcutta	71	68	67	69	73	81	85	86	85	78	73	72	76

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relatively to the dry air, is then, on the average of the year, about twice as great as in that of London; but the relative humiditiy of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of an European climate.—Bengal Administration Report, 1872-73, Statestical Summary page.5-6.

শরীরের পুষ্টি। মাংসপেষী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে, ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্— "ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন, শত ভাগে দশ ভাগ থাকে; (৪) মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ, (৫) এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইবে বৈ কি?

ইহাতে জনষ্টোন বলেন যে বাঙ্গালি "ভাতে পুষিয়া লয়"—অর্থাৎ এত ভাত খায়, যে সকলেরই পেটের খোল বাড়িয়া গিয়া পেট "নেও" হইয়া পড়ে। সুতরাং গ্লুটেনের মাত্রা সমান হইয়া যায়। আরও দাল, কলাই, মাছ, দুগ্ধ প্রভৃতিতে গ্লুটেন যথেষ্ট আছে,—তাহাতেও ভাতের দোষ সারিতে পারে।

তাহা ভিন্ন আরও একটি কথা আছে। ইংরেজ সৈন্য বড় বলবান্। তন্মধ্যে আইরিষ সৈনিক দিগের বিশেষ যশ। তাহারা বড় বলবান্ ও সাহসী। আয়র্লণ্ডের প্রধান খাদ্য, আলু। আলুতে গ্লুটেন চালের ন্যায় অতি অল্প। শত ভাগেরমধ্যে আট ভাগ মাত্র (৭) যদি আলু খেকো আয়রিষ বীর পুরুষ হইল, তবে ভেতো বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইল কি দোষে?

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতাপিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহার শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয় সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি?

এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের একটি কৌতুকাবহ কথা মনে হয়। এ দেশের মনুষ্য যে প্রকার দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রাকার, এ দেশের গোবৃষ, অশ্ব, ছাগ প্রভৃতিও সেইরূপ। বঙ্গীয় মনুষ্যের ন্যায় বঙ্গীয় পশুগণও কি বাল্যবিবাহপরায়ণ? ইহা কি সত্য যে সভ্য দেশের পশুগণও সভ্য এবং কুসংস্কারশূন্য বলিয়া বাল্য বিবাহে বিমুখ—কেবল বাঙ্গালিপশুই অকালে ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছু?

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, এবং বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের, বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে অল্প-কালে, সে দুর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে, ইহাও বলা যাইতে পারে, যে এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে কোন কালে,

(৪) Johnstone's Chemistry of Common Life Vol. 1, p 100.

(৫) Ibid p 125,

(৬) Ibid 101.

(৭) Ibid—P 115.

এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে গোধূমাদির চাস এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি কালে জল বায়ুও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ পদার্থের বলে, ভূমি ক্রমশঃ উৰ্দ্ধোত্থান, ক্রমশঃ নিমজ্জনকরে—তাহাতে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে মনুষ্য বাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা—সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ুশীত তাপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশদিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণসাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীন এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে, বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নাম মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্য শীত প্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণ প্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল, যে ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত। এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে, বহু সংখ্যক ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল,—এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্ন মাত্র নাই। লাব্রাডর, এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মেনেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছিলেন।(৮)

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর সম্ভা-

(৮) The Scientific American.

ঘনা। না ঘটিবারই সম্ভাব না। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন না দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। কিন্তু শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে, কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার, ইউরোপ, আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। রুষ, বলিষ্ঠ কিন্তু অদ্যাপি উন্নত নহে। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবলব্যতীতও উন্নতি ঘটে। দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১ম। স্কট্‌লণ্ড, অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। কোনকালে বাহুবলে বিশেষ বলবান্ নহে। ইংলণ্ডীয় রাজগণ সর্ব্বদা ইহার উপর অত্যাচার করিতেন; স্কট্‌লণ্ড কখন কষ্টে আত্মরক্ষা করিত, কখন পারিত না। এজন্য স্কট্‌লণ্ড যত দিন, ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, ততদিন স্কট্‌লণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ড হইতে অল্পতর হইয়াছিল। পরে ইংলণ্ডের প্রথম জেমসের সময়ে, ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড এক রাজ্য হইল। স্কট্‌লণ্ড আত্মরক্ষার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। তখন স্কট্‌লণ্ডের উন্নতি অতি দ্রুতবেগে হইতে লাগিল। এক্ষণে স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ড হইতে কোন অংশে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নহে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা কোন অংশে বাহুবল বাড়ে নাই। স্কটেরা বাহুবলে বলবন্ত না হইয়াও উন্নত হইয়াছে।

২য়। গারিবলদির সময় হইতে ইটালী কিঞ্চিৎ বাহুবল প্রদর্শন করিয়াছে। সেও অল্প দিন। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্বাবস্থা ধরিতে হয়। পূর্ব্বাবস্থা ধরিতে গেলে আধুনিক ইটালীকে ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বাহুবলশূন্য রাজ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু উন্নতিতে ইটালী, কোন ইউরোপীয় রাজ্যের অপেক্ষায় লঘু নহে। কতকগুলি লঘুচেতা লোক আছেন—এদেশে আছেন, ইউরোপেও আছেন, এবং মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই লেখক, তাঁহারা বাহুবলকেই উন্নতি বলেন। তাঁহারা ইটালীয়দিগকে অত্যুন্নত জাতি মধ্যে না গণিলেও গণিতে পারেন। কিন্তু যে সকল সুখের সমবায়কে জাতীয় উন্নতি বলা যায়, তাহাতে ইটালী কোন দেশের অপেক্ষা ন্যূন

নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই ইটালী ও স্কটলণ্ড, এই দুই বাহুবল বিহীন রাজ্যমধ্যে যত মহল্লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, এত অল্প ভূমির মধ্যে এত বহুসংখ্যক নরশ্রেষ্ঠ আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এখানেও বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি। এখানেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব্বে পোপের প্রতাপে, অধুনা ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার হেতু প্রয়োজন হয় নাই। কেবল বিনিমিয়া, পর হস্তগত ছিল।

এই সকল কথার আলোচনা করিয়া মনে উদয় হয়, অধুনা বাঙ্গালারও আত্ম রক্ষার প্রয়োজন নাই, কেন না ইংরেজ বাঙ্গালা রক্ষা করিতেছে। অতএব বাঙ্গালির উন্নতির জন্য বাঙ্গালির বাহুবলের প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডের অধীনে থাকিয়া ইংলণ্ডের বাহুবলরক্ষিত হইয়া, বাঙ্গালা কি ইটালী ও স্কটলণ্ডের ন্যায় উন্নত হইতে পারিবে না?

অসম্ভব কিছুই নহে--বরং সেই লক্ষণই দেখা যাইতেছে। তবে, ইংরেজের রাজ্যশাসনের যে সকল দোষ, তাঁহাদিগের ভারতীয় রাজনীতিতে যে সকল উন্নতিনাশক নিয়ম আছে, তাহা অপনীত হওয়া চাই। দেশী বিদেশী প্রজায়, সর্ব্বপ্রকার অধিকারের সমতা চাই। ইহা নহিলে, দেশের উন্নতি নাই। ইংরেজের শাসনপ্রণালী কিয়দংশে পরিশুদ্ধ হউক। তাহাহইলেই দুর্ব্বল বাঙ্গালির উন্নতি হইবে। বরং ইংরেজের অধীনে থাকাই, বাঙ্গালির উন্নতির এক মাত্র উপায় বলিয়া বোধ হয়। কেন না যে বাহুবল, আত্মরক্ষার্থ উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন, যাহা বাঙ্গালির নিজের নাই, বা হইবার সম্ভাবনা নাই, ইংরেজ তাহা দিতেছে—ইংরেজের বাহুবল আমাদিগের নিজের বাহুবলের কার্য্য করিতেছে।

দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবারও সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, **শারীরিক বল বাহুবল নহে।**

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে? এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে, অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণামান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফল বিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে, ইংরেজেরা শারীরিক বলে

লঘু। শারীরিক বলে, শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক, ইংরেজের পদাবনত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস, এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া, শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস, এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল, কোন কালে নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে, এ চারিটি বাঙ্গালির চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয় মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে, যে তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি, যে নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, বাঙ্গালির উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কাল মধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে, যে সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন [১] বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় [২] যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, [৩] যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, [৪] যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

অতএব বাঙ্গালির ভরসা নাই, একথা সত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা ইংরেজের নিন্দায় সুখী, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে এক্ষণে বাঙ্গালির প্রধান ভরসা ইংরেজ।

চার্ব্বাকদর্শন।

এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহ আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে যে দর্শনে বেদের প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, সেইগুলি নাস্তিক, যথা বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকদর্শন; এবং যে যে দর্শনে বেদ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে সে সমুদায় আস্তিক পদ বাচ্য, যদিও তন্মধ্যে কোন কোনটি নিরীশ্বর, যথা কাপিল ও জৈমিনি দর্শন। যে সাংখ্যে ঈশ্বর অসিদ্ধ, এবং যে পূর্ব্বমীমাংসায় মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, সে সাংখ্য ও মীমাংসা আস্তিক; এবং বেদ বহির্ভূত বৌদ্ধ সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা আদি বৌদ্ধ মানিলেও নাস্তিক। ধন্য শব্দপ্রয়োগের কৌশল! এতৎ প্রবন্ধে আমরা নাস্তিক দর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনের সমালোচনা করিব।

কয়েকটি প্রধান বিষয়ে এতদ্দেশীয় অপর সমুদায় দর্শনের সহিত চার্ব্বাকদর্শনের বিবাদ। উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ, সকল দর্শনেই পরলোক স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল চার্ব্বাক মতাবলম্বীরাই পরলোক মানেন না। এজন্য চার্ব্বাকদর্শনের আর একটি নাম লোকায়তদর্শন, কেন না ইহলোকই ইহার সর্ব্বস্ব।

সকল দর্শনেই অনুমান প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; কেবল চার্ব্বাকদর্শনেই প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য। যাহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চার্ব্বাক শিষ্যেরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এই নিমিত্তই তাঁহারা ঈশ্বর, পরলোক ও দেহাতিরিক্ত আত্মা মানেন না। সুতরাং চার্ব্বাকদর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা অন্যায় নহে।

এতদ্দেশীয় অন্যান্য দর্শনকারেরা দুঃখ মিশ্রিত সংসারের সুখ চাহেন না। তাঁহারা যে মোক্ষ প্রার্থনা করেন তাহাতে সুখ দুঃখ কিছুই নাই; সংসার বন্ধন বিমোচন, প্রবৃত্তিদ্বেষের নির্ব্বাণ, আন্তরিক স্থৈর্য্য, ইহাই তাঁহাদিগের কামনা। কেবল চার্ব্বাক মতে সাংসারিক সুখই জীবনের উদ্দেশ্য।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চার্ব্বাককে "বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃহস্পতি বা চার্ব্বাক লিখিত কোন গ্রন্থ দেখা যায় না। কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে মাধবাচার্য্য পশ্চাল্লিখিত শ্লোকগুলি বৃহস্পতির উক্ত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদা ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমি-
ষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি-
কারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়
কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ু স্তত্র
দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানা মত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং
পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনি-
র্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়োন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যানি নত্বন্যদ্বিদ্যতে
কচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশা-
চরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ
শ্রুতম্॥
অশ্বস্যাত্রহি * * * পত্নীগ্রাহ্য প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তি-
তম্।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমীরিতম্॥

"স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মা নাই; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়া ও ফলদায়িনী হয় না। অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বুদ্ধি পৌরুষ-হীনদিগেরই ধাতৃনির্ম্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্বপিতাকে বলি-দান করে না? যে জন্তুগণ মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পর্য্যটকদিগের পাথেয় সঙ্গে রাখি-বার প্রয়োজন নাই। যদি স্বর্গস্থিত লোকে ভূতলস্থ দানে তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তি নিমি-ত্ত ভূতলে অন্ন কেন না দাও? যত দিন জীবিত থাক, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর; ঋণ করিয়াও ঘৃত খাও; ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত হইয়া কেহ পরলোকে যায়, তবে বন্ধুস্নেহে আকুল হইয়া কেন ফি-রিয়া না আইসে? সুতরাং মৃতদিগের প্রেতকার্য্য বিহিত করা ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র; অন্য কিছু নহে। তিন বেদের কর্ত্তা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর। জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি পণ্ডিতদিগের বচন সকলেই শুনিয়াছে। লিখিত আছে যে অশ্বমেধে * * * রাজপত্নী ধরিবেন। ভণ্ডগণ ইত্যাকার কত কি ধরিবার কথা লিখিয়াছে। তদ্রূপ মাংসভক্ষণ নিশা-চর নির্দ্দিষ্ট।"

কোন্ সময়ে চার্ব্বাক বা বৃহস্পতির মত প্রচারিত হয়, স্থির করা কঠিন। বিষ্ণু-পুরাণে ইহার প্রতি কটাক্ষ লক্ষিত হয়, যথা।

অন্যানপ্যন্য পাষণ্ড প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ।
দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহ বিমো-
হকৃৎ॥

স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাং॥
কেচিদ্ হি নিন্দাং বেদানাং দেবানাং অপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যেচ দ্বিজন্মনাং॥
নৈতদ্‌যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবিংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতং॥
যজ্ঞৈরনেকৈ র্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ॥
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তি র্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্ত মন্যেন চেৎ ততঃ॥
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥
জন শ্রদ্ধেয় মিত্যেতদবগম্য ততোবচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাম্ যন্ময়েরিতং।
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ॥
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়া ন্যৈশ্চভবদ্বি ধৈঃ॥
মায়ামোহেন দৈতেয়াঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ॥
ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্ দ্বিজ।
হতাশ্চতেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ॥
স্বধর্ম্মকবচস্তেষাং অভূদ্যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্ব্বং নেশুর্নষ্টেচ তত্রতে।

"হে দ্বিজ, মায়ামোহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া অন্যান্য বহু প্রকার পাষণ্ড প্রকারে দৈত্যদিগকে বিমুগ্ধ করিলেন। মায়ামোহ কর্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুর সকল অল্পকালেই ত্রিবেদমার্গাশ্রিত কথা সমুদয় পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ, কেহ বেদের নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা দেবের, কেহ বা যজ্ঞ কর্ম্মকলাপের, এবং কেহ বা ব্রাহ্মণের। হিংসায় ধর্ম্ম হয় এ বাক্য যুক্তিসহ নহে; অগ্নিতে ঘৃত দগ্ধ করিলে কোন ফল আছে, ইহা বালকের উক্তি। ইন্দ্র যদি অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া শম্যাদি কাষ্ঠ ভক্ষণ করেন, পত্রভুক্ পশু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদি যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, স্বপিতাকে যজমান কেন মারিয়া ফেলে না? যদি অন্যের ভুক্ত অন্নে পুরুষের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ কর, তাহাদিগের আর অন্ন বহন করিতে হইবে না। তন্নিমিত্ত এই বাক্য জনশ্রদ্ধেয় ইহা বুঝিয়া শাস্ত্রের মোক্ষ নির্ণায়ক বাক্য অবহেলাপূর্ব্বক আমি যাহা বলিতেছি তাহাতেই শ্রদ্ধা কর। হে মহাসুরগণ, আপ্ত বাক্য আকাশ হইতে পড়ে না; আমার কাছে ও তোমাদিগের ন্যায় লোকের কাছে যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রাহ্য। এইরূপ বিবিধপ্রকারে মায়ামোহ দৈত্যদিগের চিত্ত বিকৃত করিয়া দিলে, তিন বেদের প্রতি তাহাদি-

গের আর রুচি রহিল না। এই প্রকারে দৈত্যগণ বিপথগামী হইলে অমরগণ পরম উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, হে দ্বিজ, দেবাসুরে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল; এবং দেবতাদিগের হস্তেই সম্মার্গপরিত্যাগী অসুরেরা নিহত হইল। হে দ্বিজ, প্রথমে অসুরদিগের যে ধর্ম্ম কবচ ছিল, তদ্দ্বারা পূর্ব্বে তাহারা রক্ষিত হইত, এক্ষণে সেই ধর্ম্ম কবচ নষ্ট হওয়ায় তাহারা বিনষ্ট হইল।"

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে চার্ব্বাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা

নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিপ্রজনে পুনঃ।
রাজানং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মা চার্ব্বাকো রাক্ষসোঽব্রবীৎ॥
তত্র দুর্যোধনসখা ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ।
সাক্ষঃ শিখী ত্রিদণ্ডীচ ধৃষ্টো বিগত সাধ্বসঃ॥
বৃতঃ সর্ব্বৈস্তথা বিপ্রৈরাশীর্ব্বাদ বিবক্ষুভিঃ।
পরং সহস্রৈ রাজেন্দ্র তপোনিয়ম সংশ্রিতৈঃ॥
স দুষ্টঃ পাপমাশংসুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাং॥
অনামন্ত্র্যৈব তান্ বিপ্রাং স্তমুবাচ মহীপতিং॥
চার্ব্বাক উবাচ।
ইমে প্রাহুর্দ্বিজাসর্ব্বে সমারোপ্য বচো ময়ি।
ধিগ্ ভবন্তং কুনৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমস্তু বৈ॥
কিংতেন স্যাদ্ধি কৌন্তেয় কৃত্বেমং জ্ঞাতি সংক্ষয়ং।
ঘাতয়িত্বা গুরূংশ্চৈব মৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতং॥
ইতি তে বৈ দ্বিজাঃ শ্রুত্বা তস্য দুষ্টস্য রক্ষসঃ।
বিব্যথুশ্চুক্রুশুশ্চৈব তস্য বাক্য প্রধর্ষিতাঃ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সচ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রীড়িতা পরমোদ্বিগ্না স্তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে॥

* * *

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।
"এষ দুর্য্যোধন সখা চার্ব্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি॥
নবয়ং ব্রূম ধর্ম্মাত্মন্ ব্যেতু তে ভয়মীদৃশং।
উপতিষ্ঠতু কল্যাণং ভবন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥"
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তে ব্রাহ্মণা সর্ব্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধ মূর্চ্ছিতাঃ।
নির্ভৎসয়ন্তঃ শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপ রাক্ষসং॥
স পপাত বিনির্দ্দগ্ধস্তেজসা ব্রহ্মবাদিনাং
মাহেন্দ্রাশনি নির্দ্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব॥

"অনন্তর দ্বিজগণ নিঃশব্দ হইলে ছদ্মব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষস রাজাকে বলিতে লাগিল। সেই অক্ষ শিখা ত্রিদণ্ড সম্বলিত ভিক্ষুবেশধারী, নির্লজ্জ ও নির্ভীক দুর্য্যোধনসখা সহস্র সহস্র তপোনিরত আশীর্ব্বাদ প্রদানাভিলাষী বিপ্রবর্গে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট কামনা করিয়া অন্য দ্বিজগণকে না

জিজ্ঞাসিয়াই ভূপতিকে বলিল, " এই সমুদায় বিপ্রগণ আমার প্রতি আরোপ করিয়া বলিতেছেন, ধিক্ তুমি, কুনৃপতি, জ্ঞাতিঘাতী; হে কৌন্তেয় জ্ঞাতি এবং গুরু ক্ষয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল? তোমার পক্ষেই মৃত্যুই শ্রেয়; জীবন ধারণ নহে।" তখন সেই দুষ্ট রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া দ্বিজগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ব্রাহ্মণগণ ও রাজা যুধিষ্ঠির লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন। " এ দুর্য্যোধন সখা চার্ব্বাক নামা রাক্ষস। পরিব্রাজকরূপে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে। হে ধর্ম্মাত্মন্, আমরা এ সকল বাক্য বলি নাই, আপনি ঈদৃশ ভয় পরিত্যাগ করুন। ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার কল্যাণ হউক।

" বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করতঃ হুঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপ রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। বজ্র দগ্ধ অঙ্কুরবান্ পাদপের ন্যায় ব্রহ্মবাদীদিগের তেজে দগ্ধ হইয়া সে পতিত হইল।"

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যখন মহর্ষি জাবালি রামচন্দ্রকে অরণ্যযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার উক্তি মধ্যে চার্ব্বাক মত লক্ষিত হয়, যথা

অর্থধর্ম্মপরা যে যে তাংস্তাংশ্চোচামি নেতরান্।
তেহি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য নেমিরে ॥
অষ্টকাপিতৃদৈবত্য মিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিমশিষ্যতি ॥
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহ মন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎপথ্যশনং ভবেৎ ॥
দানসংবলনাহ্যেতে গ্রন্থামেধাবিভিঃকৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরুবুদ্ধিং মহামতে ॥
প্রত্যক্ষং যত্তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥

" যাঁহারা শাস্ত্রার্থধর্ম্মপরায়ণ, আমি তাহাদিগের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। তাহারা ইহলোকে দুঃখ পাইয়া, অন্তে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করে; দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন ধ্বংস হয়; মৃতব্যক্তি কি আহার করিতে পারে? যদি একের ভুক্ত অন্ন অন্যের দেহে যায়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে শ্রাদ্ধ কর, তাহার পাথেয়ের প্রয়োজন হইবে না। যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, বিষয় বাসনা ত্যাগ কর, এইরূপ দানপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম কোন কাজের নয়, হে মহাত্মন্, তুমি এই বুদ্ধি কর। পরোক্ষ পশ্চাতে রাখিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অনুষ্ঠান কর।"

এপর্য্যন্ত যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল

সে সকল পর্য্যালোচনা করিলে এই মাত্র প্রতীতি জন্মে যে বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত ও রামায়ন তাহাদিগের বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার অগ্রে চার্ব্বাকদর্শন প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকে বিবেচনা করেন রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ বুদ্ধ দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু এমতটী প্রামাণ্য হইলেও আমাদিগের জানিবার উপায় নাই যে, আমাদিগের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সেই প্রথম রচিত ভাগের অন্তর্গত কি না। সুতরাং মহাভারতে চার্ব্বাকের নাম এবং রামায়ণে তদীয় প্রত্যক্ষবাদ লক্ষিত হইলেও, লোকায়তদর্শন প্রচারের সময় নির্ণীত হইতেছে না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন শান্তি পর্ব্বে দুর্য্যোধনের সমকালীন লোক বলিয়া চার্ব্বাকের বর্ণনা দেখা যায়, এবং অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি ঋষির মুখে লোকায়তিক উপদেশ শুনা যায়, তখন চার্ব্বাক মত প্রাচীন মত বলিয়া বহুকাল হইতে গ্রাহ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ করা উচিত। যিনি এই মতের প্রবর্ত্তক, তাঁহার নাম বৃহস্পতি। খণ্ডন খণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ তাঁহাকে দেবগুরু বলিয়াছেন। ইহাও তাঁহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ। লোকে যাঁহার বুদ্ধির সহিত তুলনা দিয়া থাকে, তিনিই কি সেই বৃহস্পতি? ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে এক জন বহস্পতি আছেন। তিনিও তর্কানুরাগী। তিনি লিখিয়াছেন

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ, "কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত নয়; যেহেতু যুক্তি হীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।"

কিন্তু তর্কানুরাগী হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রকার বৃহস্পতি বেদবিরোধী নাস্তিক বৃহস্পতি হইতে পারেন না।

যদি উপরে উপরে দেখা যায়, তাহাহইলে লোকায়তদর্শন প্রচারের সময় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে উদিত হয়। এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং ইহা কাপিলদর্শনের পরে রচিত হইবার সম্ভাবনা। এই দর্শনে বেদ ও পশুবধের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়; সুতরাং এরূপ অনুমেয় যে ইহা বেদবিদ্বেষী অহিংসাধর্ম্মাবলম্বী বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালের। কিন্তু কে বলিতে পারে যে কপিল বা শাক্যসিংহের পূর্ব্বে নাস্তিক মত প্রচলিত ছিল না বা প্রকাশিত হয় নাই, অথবা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে নাই?

এতদ্দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান করিতে গেলেই অন্ধকার দেখিতে হয়। ইউরোপের ইতিহাসে যেরূপ পর্য্যায়ক্রমে এক মতের পর অপর মতের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, এ দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। বোধ হয় যেন সকল দর্শনই এক সময়ে দেখা দিয়া

ছিল। প্রত্যেক দার্শনিকদলের মূল সূত্র গ্রন্থে অপর দর্শন সূত্রের উল্লেখ বা মতখণ্ডন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, কাপিল সূত্রের প্রথমাধ্যায়ে ২০ হইতে ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত বৈদান্তিক অবিদ্যাবাদখণ্ডন এবং ১৫০ ও ১৫১ সূত্রে একাত্মবাদখণ্ডন আছে। উক্ত অধ্যায়ের ২৫ সূত্রে লিখিত আছে,

ন বয়ং ষট্ পদার্থবাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ,

অর্থাৎ "আমরা বৈশেষিকাদিদিগের ন্যায় ষট্ পদার্থবাদী নহি।" আবার ২৭ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদখণ্ডন দৃষ্ট হয়। সুতরাং কপিলের সাংখ্য সূত্রে বেদান্ত, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ অন্ততঃ এই তিন মতের প্রাগস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। এইরূপ যদি আবার বেদান্ত সূত্রের দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে যে ২৮ ও ৩১ সূত্রে পতঞ্জলিকৃত যোগ দর্শনের উল্লেখ আছে, ২ ও ৩ সূত্রে সাংখ্য মত খণ্ডন আছে, এবং অন্যান্য স্থলে কণাদের পরমাণুবাদ লইয়া বিবাদ আছে। এই নিমিত্ত কেবল সূত্রগুলি দেখিয়া স্থির করিবার উপায় নাই যে অগ্র পশ্চাৎ কোন্ দর্শনের কখন্ উৎপত্তি হইয়াছে। বোধ হয় যখন, সকল দর্শনেরই প্রচার হইয়া পরস্পরের খণ্ডন চেষ্টা চলিতে ছিল, সেই সময়ে প্রচলিত মূল দর্শন সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। যদি কপিল, বদরায়ণ, গৌতম প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতপ্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, যে সূত্রগুলি তাঁহাদিগের নামে চলিতেছে, সেগুলি তাঁহাদিগের রচিত নহে; তাঁহাদিগের মতানুসারী শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক অনেক বাদানুবাদের পরে লিখিত। সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বর কৃষ্ণ কাপিল সূত্র সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ঋষি দয়া করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্ত্র আসুরিকে দিয়াছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ ইহাকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।" (১) আবার দেখ যখন জৈমিনি সূত্রে জৈমিনির দোহাই ও বেদান্ত সূত্রে বদরায়ণের দোহাই দেখা যায়, তখন এগুলি তাঁহাদিগের লিখিত না হইয়া শিষ্য প্রশিষ্যের লিখিত হইবারই সম্ভাবনা। (২)

যদিও ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি পর্য্যায় নির্ণয় পূর্ব্বক দার্শনিক মত প্রবর্ত্তক ঋষিবর্গের সময় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। সকল দর্শনই সূত্রাকারে লিখিত। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের যে

(১) এতৎপবিত্র মগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেনচ বহুধা কৃতং তন্ত্রং ॥৭০।

(২) Vide a Lecture on "Hindu Philosophy" delivered by the present writer on the 14th of March 1867 at the Bethune society and published in the transactions of the society in 1870.

কাল সূত্রপ্রধান, সেই কালেই দর্শন সকলের আবির্ভাব; ভট্টমোক্ষমূলর সাহেবের মতে খ্রীষ্টাব্দের ৬০০ হইতে ২০০ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কালের ব্যাপ্তি। এই সময়ের শিরোভূষণ বুদ্ধদেব। বোধ হয়, তাঁহার জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দার্শনিককালের আরম্ভ। সংসার দুঃখময়, ইহাই এতদ্দেশীয় দর্শনের মূলতত্ত্ব। শাক্যসিংহ জন্মিবার পূর্ব্বেই ইহা এতদ্দেশবাসীরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এজন্যই কাতর হইয়া কত লোক সংসার পরিত্যাগ করিতেছিল। যখন বুদ্ধদেব সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া মোক্ষ পথের পথিক হইলেন, তিনি বহুসংখ্যক লোককে তৎসদৃশদশাপন্ন দেখিতে পাইলেন। কি প্রকারে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, তৎকালে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই প্রশ্ন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বৈদিককালের কবিদিগের ন্যায় তাঁহারা সাংসারিক সুখপ্রার্থী ছিলেন না। উচ্চ পদ, বিচিত্র বেশ ভূষা, সুরম্য হর্ম্ম্য, উপাদেয় খাদ্য, সুন্দরী নারী, বহু সংখ্যক সন্তান, শত বর্ষ বয়ঃক্রম, এ সকলে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি হইত না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে সাংসারিক সুখের আঁতে আঁতে দুঃখ। এই জন্যই তাঁহাদিগের সংসারের প্রতি বিরক্তি। এই জন্যই তাঁহাদিগের সংসার বন্ধন ছেদন চেষ্টা। সংসার তাঁহাদিগের পক্ষে কেন এত ক্লেশকর বোধ হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কিন্তু এরূপ হইবার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, এমত নহে। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ হিমালয় সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য করিতেও যেমন প্রবৃত্তি হইত, শরীর ও মনেরও তেমনই স্ফূর্ত্তি ছিল। বিশেষতঃ তাঁহারা দস্যুদিগকে জয় করিয়া দিন দিন নূতন নূতন প্রদেশে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত অনেকেই অনন্যচিত্ত হইয়া উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত আপনাদিগের পার্থিব সুখবর্দ্ধনার্থেই প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎকালে সমাজের বন্ধনও এমন শিথিল ছিল, যে লোকে ইচ্ছানুসারে চলিতে পারিত; বর্ণাশ্রম বা তন্নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের জাল এত দূর বিস্তৃত ছিল না, যে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া কাহাকেও স্বাধীনতা ও সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইত। কিন্তু সৌত্রিক সময়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তখন আর্য্যগণ উষ্ণ অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী। পরিশ্রম করিতে গেলে তাঁহাদিগের কষ্ট হয়। সুখ অপেক্ষা শান্তিই তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে যে পরিমাণে সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগের দুঃখানুভব শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। এদিকে সামাজিক শাসনও বাড়িয়াছে। জাতিভেদ, আশ্রম বিভাগ, ও কর্ম্মকাণ্ড স্থিরীকৃত হইয়া স্বাধীন গতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে; স্বেচ্ছানুসারে সুখান্বেষণে যে দিকে সে দিকে

যাইবার উপায় নাই। জীবন ভার বোধ হইয়াছে। সংসারের প্রতি আস্থা নাই। দুঃখের কিসে নিবারণ হইবে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে এ প্রশ্নের উত্তর কি কেহ দেন নাই? বোধ হয় দিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলেন যে কপিলদেব শাক্যসিংহের পূর্ব্ব কালবর্ত্তী বুদ্ধ। সাংখ্যদর্শন প্রবর্ত্তক ঋষির নামও কপিল; এবং স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে গেলেও সাংখ্যদর্শনকেই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল বলিয়া বিশ্বাস হয়। কপিল নিরীশ্বর, বুদ্ধদেবও নিরীশ্বর। কপিল সাংসারিক দুঃখে কাতর, বুদ্ধদেবও সাংসারিক দুঃখে কাতর। কপিল বলেন, দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা; বুদ্ধদেবও সেই সকল কথা বলেন। আবার ভাবিয়া দেখ, বৌদ্ধদিগের যে ক্ষণিকত্ববাদ তাহাও সাংখ্য মত হইতে উৎপন্ন। কপিল শিষ্যেরা বলেন যে কার্য্য, কারণের রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব দেখিলেন যে জগৎ প্রতি ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রতি ক্ষণে নূতন কার্য্যরূপে পরিণত হইতেছে; সুতরাং ভাবিলেন কোন পদার্থই ক্ষণাধিক স্থায়ী নহে। এই ক্ষণিকত্ববাদই সপ্রমাণ করিতেছে যে বৌদ্ধ মত অনেক দার্শনিক আলোচনার শেষ ফল। যত দিন লোকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, ততদিন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদী, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, প্রভৃতিকে বহুকাল স্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস করে; অনেক দার্শনিক চর্চ্চা না হইলে কেহ বুঝিতে পারে না, যে মুহূর্ত্তপরিবর্ত্তনশীলতাই এই বিপুল বিশ্বের প্রধান লক্ষণ।

সাংখ্য মত প্রবর্ত্তক কপিল ঋষিই যে কেবল বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এমন নহে; বোধ হয় লোকায়ত মত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতিও শাক্যসিংহের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে একদা বৃহস্পতি গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, তাহাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া যায় এবং মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু গায়ত্রীর মৃত্যু নাই; তজ্জন্য প্রতি খণ্ড মস্তিষ্ক বসা হইতে এক একটি বষট্‌কার দেবের উৎপত্তি হইল।(৩) আমাদিগের বোধ হয় এই গল্পের মধ্যে একটি মহামূল্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। গায়ত্রীই হিন্দুধর্ম্মের বীজ মন্ত্র। বৃহস্পতি সেই গায়ত্রীর ম-

(৩) The Taittiriya Brahmana relates an interesting anecdote regarding the origin of the word Vashat. The God presiding over Vashat is Vashatkara. The anecdote is as follows. Once upon a time Vrihaspati struck the Goddess Gayatri on the head, which was smashed into pieces and the brain spilt. But Gayatri is immortal, and every drop of her brain so spilt was alive, and became Vashatkara. The commentator adds Vashat is derived from Vasa, grease, brain matter."

P. xxxvi, Appendix to Durgapuja by Pratapa chandra Ghosha, B. A.

স্তকে আঘাত করেন। সুতরাং ইহাতে বুঝাইতেছে যে বৃহস্পতি হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে বৃহস্পতির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি নাস্তিক মত প্রবর্ত্তক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহাহইলে স্বীকার করিতে হইতেছে যে লোকায়তবাদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সংকলিত হইবার পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পুরাতন কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে সৌত্রিক সময়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপ্রধানকালে কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম বাড়াবাড়ির আমলে লোকায়তমতের উৎপত্তি হয়। ভট্ট মোক্ষমূলর সাহেবের মতে ব্রাহ্মণপ্রধানকাল খ্রীষ্ট জন্মিবার ৮০০ হইতে ৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অতএব এরূপ অনুমান নিতান্ত অন্যায় নহে যে নাস্তিক মত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ সাতাইশ শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে তাঁহার মত দ্বারা কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে রামায়ণ, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণেও তাঁহার যুক্তি সকল প্রবেশ করিয়াছে। উপনিষদ ও দর্শন সমূহে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহাও বৃহস্পতির তর্ক সম্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার প্রাধান্য বিলোপও যে তাঁহার হস্তে কত দূর ঘটিয়াছিল, কে নির্ণয় করিবে? বোধ হয় যেন তাঁহার নাস্তিকতাই কপিল, বুদ্ধ ও জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে; এবং তাঁহার প্রত্যক্ষবাদ বিরুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষার্থ তর্ক করিতে গিয়া অনুমান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের আদিম অবস্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিচারদর্শনের কাল নির্দ্ধারণ।

দিবসের প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইলেই বিচার কার্য্য আরম্ভ হইত। চতুর্থ যাম পর্য্যন্ত বিচারদর্শনের সীমা। ইহাদ্বারা এক প্রকার ইহাই স্থির হয়, যে দিবা দুই প্রহর অতিবাহিত হইলে সেদিন আর নূতন অভিযোগের বিষয় শ্রুত হইত না। কিন্তু কার্য্য বিশেষে, স্থল বিশেষে ও বিষয় বিশেষে নূতন অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারিত। কার্য্যের লাঘব গৌরব ও অবস্থা বিবেচনায় সেদিন উহা উপেক্ষিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে উহার বিষয় বিবেচিত হইত। পূর্ব্বোপস্থিত বিষয়

বলিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাত হইত না। ইহাদিগের বিধান সংহিতায় সামান্য নিয়ম ও বিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ইহারা স্থল বিশেষে নিয়ম সঙ্কোচ ও বিস্তার করিতে পারিতেন।(১)

তামাদি (অর্থাৎ কালাতিক্রম দোষ) হিন্দুজাতিরা স্বল্পকালে কোন ব্যক্তির স্বত্ব ধ্বংস করিতেন না। ধন সম্বন্ধের অভিযোগে ন্যূনকল্পে দশবৎসর অতিক্রান্ত না হইলে কালাত্যয় দোষ ঘটিত না। ধন স্বামীর সমক্ষে কোন ব্যক্তি নির্বিবাদে দশবৎসর কাল ধনাদি উপভোগ না করিলে তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভূমি বিষয়ে স্বামীর সমক্ষে নির্ব্বিবাদে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপভোগ প্রমাণ না করিতে পারিলে ঐ ভূমি বিষয়ে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মিত না। সুতরাং ভূমি বিষয়ে বিংশতি বর্ষ পরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে উপভোক্তার স্বত্ব হইবার সম্ভাবনা থাকিত। বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে অভিযোগ ঘটিলে যাহার ভূমি তাহারই হয়।(২)

পরোক্ষে যদি কোন ব্যক্তি তাহার তিনপুরুষ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির ধন এবং ভূম্যাদি উপভোগ করিয়া থাকেন যাহাদিগের বস্তু তাহারা যদি তিনপুরুষমধ্যে কোন বিবাদ উত্থাপন না করে তবে ঐ বস্তু উপভোক্তার স্বত্ব হয়। পরন্তু জ্ঞাতি বন্ধু, সাকুল্য, জামাতা, শ্রোত্রিয় রাজা ও রাজমন্ত্রী যদি বহুকাল উপভোগ করেন তথাপি অন্যের বস্তুতে ইহাদিগের স্বামিত্ব জন্মে না। যাহার বস্তু তাহারই স্বত্ব। এরূপ ব্যক্তির উপভোগে প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্বধ্বংস হয় না। (৩)

---

(১) দিবসস্যাষ্টমংভাগং মুক্ত্বা ভাগ-
ত্রয়স্তু যৎ।
স কালো ব্যবহারাণাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ
স্মৃতঃ॥

(২) পশ্যতোঽব্রুবতো হানির্ভূমৈ বিং-
শতিবার্ষিকী।
পরেণ ভুজ্যমানস্য ধনস্য দশবার্ষিকী।
যাজ্ঞবল্ক্য।
ভুক্তিঃ স্ত্রিপুরুষী সিধ্যেৎ পরোক্ষা নাত্র
সংশয়ঃ।

অনিবৃত্তে সপিণ্ডত্বে সাকুল্যানাং ন
সিদ্ধতি॥
বিবাহ শ্রোত্রিয়ৈর্ভুক্তং রাজামাত্যৈ
স্তথৈবচ।
সুদীর্ঘেণাপি কালেন তেষাং সিধ্যেৎ
নতদ্ধনং॥
অশক্তালস রোগার্ত্ত বাল ভীত প্রবা-
সিনাং।
শাসনারূঢ় মন্যেন ভুক্তা ভুক্তং নহী-
য়তে॥
বৃহস্পতি সংহিতা।

(৩) সনাভি বান্ধবৈর্বাপি ভুক্তং যৎ
স্বজনৈস্তথা।
ভোগাৎ তত্র ন সিদ্ধিঃস্যাৎ ভোগমন্যেষু
কল্পয়েৎ॥
ন ভোগঃ কল্পয়েৎ স্ত্রীষু দেবরাজ ধনে-
ষুচ।
বাল শ্রোত্রিয় বৃদ্ধেন প্রাপ্তেচ পিতৃতঃ
ক্রমাৎ॥
কাত্যায়ন সংহিতা।

অশক্ত, জড়, রোগার্ত্ত, বালক, ভীত-ব্যক্তি, প্রবাসী জন এবং রাজকার্য্যে নিয়োগ হেতু ভিন্নদেশস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষেই হউক অথবা পরোক্ষেই হউক উপভোগ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির বস্তুতে উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মে না। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে ধনস্বামীর সমক্ষে যদি উপভোগ প্রমাণ হয় তবে উপেক্ষা নিবন্ধন সে বস্তুতে উপভোক্তারই স্বামিত্ব হয়, প্রকৃত ধনস্বামীর স্বত্ব লোপ পাইয়া থাকে।

স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়ে কি প্রকারে ভোগাদির দ্বারা স্বত্ব নাশ হয়, উপভোক্তার স্বামিত্ব জন্মে ইহা নির্ণীত হইলে বিচারপদ্ধতির নিয়ম স্থিরীকৃত হইতে পারে। বিধান সংহিতা পরিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীযুক্ত হইলে বিচার কার্য্যের সুবিধা হয় এই কারণে প্রথমে বিধান সংহিতার স্থূল স্থূল নিয়ম গুলি বলা উচিত। তদনুসারে অগ্রে লিপির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

দেখ মানুষ মাত্রেরই ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে; বিশেষতঃ অলিখিত বিষয় ষাণ্মাষিক কাল পর্য্যন্ত আলোচিত না হইলে উহা বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়। এই কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বিধাতার সৃষ্ট অক্ষরকেই বাক্যের প্রতিনিধি করিয়াছেন। অক্ষর দর্শন মাত্র সর্ব্ববিষয় স্মরণ পথে উদিত হয়। অক্ষর দ্বারা সমস্ত বিষয়গুলি চিত্রিত ছবির ন্যায় দেদীপ্যমান দেখা যায়। যতকাল লিখিত পত্রখানি থাকে তাবৎ কালমধ্যে সে বিষয়ের কোন অঙ্গের বিকলতা ঘটিতে পারে না। কোন বিষয়েই বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই কারণে আর্য্যগণ বর্ণাবলীর নাম অক্ষর রাখিয়াছেন। অক্ষর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলে ইহাই বোধ হয় যে যাহার ক্ষয় নাই তাহাকেই অক্ষর শব্দ নির্দ্দেশ করা যায়।

পত্রারূঢ় লেখ্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। পত্রশব্দে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, তাড়িতপত্র ধরা গিয়াথাকে।

লেখ্য ভেদ।

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তরদানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত। তাহাকে তাম্রশাসন অথবা তাম্রপত্র বলা গিয়া থাকে। ঐ দানপত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই নাম, গোত্রাদি এবং পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিজনিত যশোগীত, দানের কাল, পরিমাণ ও সীমাদির উল্লেখ থাকে। তাম্রফলকের অভাবে তৎপরিবর্ত্তে পটে লিখিত হইত। বোধ হয় ঐ পট আর কিছুই নহে কাষ্ঠময় ফলক বিশেষ। যে হেতু বিচার নিষ্পত্তি কালে জয় পত্রের পাণ্ডুলেখ্য কাষ্ঠময় ফলকে লিখন পূর্ব্বক সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইত। কাষ্ঠ ফলকের ব্যবহার অদ্যাপি ব্যবসাদার লোকের

দায় সীমা দাস ধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয় স্বঞ্চ নভোগেন প্রনশ্যতি॥
নারদ সংহিতা।

মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রস্তর ফলকে দেব প্রতিষ্ঠাদির বিষয় ক্ষোদিত হইত এক্ষণেও হইয়া থাকে।(৪)

মৌখিক বাক্য অপলাপ হইতে পারে, লিখিত বাক্য সহজে অপহ্নব করিবার সাধ্য থাকে না—সুতরাং ব্যবহার বিষয়ে লিখিত প্রমাণই মৌখিক বাক্য অপেক্ষা গৌরবান্বিত।

দানলেখ্যের সাধারণ নাম দান পত্র; তাম্র ফলকে লিখিত হইলে শাসন পত্র কহা যায়। নৃপতি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অথবা কোন বীরের প্রতি তাহার শৌর্য্যাদিগুণে পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করেন এবং পারিতোষিক দানের প্রমাণ স্বরূপ যে লিখিত পত্র দেন তাহাকে প্রসাদ পত্র কহা যায়। ইহাকেই এক্ষণকার Pension. ধরা যাইতে পারে। বিচার নিষ্পত্তি করিয়া জয়ী ব্যক্তিকে যে লেখ্য দেওয়া গিয়া থাকে তাহারই নাম জয়পত্র। দায়াদগণ অথবা যাহার সঙ্গে বিভাগের সম্ভাবনা থাকে তাহারা পরস্পর যে লেখ্যকে বিভাগ ক্রিয়ার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন তাহাকে বিভাগ পত্র কহা যায়। ক্রয় বিক্রয় স্থলে উভয় পক্ষের যে লেখ্য প্রস্তুত হয় উহার প্রথম পক্ষকে ক্রয়লেখ্য দ্বিতীয় পক্ষকে বিক্রয় বা সম্মতি লেখ্য কহাগিয়া থাকে। বন্ধক রাখিয়া উভয় পক্ষ হইতে যে লেখ্য আদান প্রদান হয়, উহার মধ্যে উত্তমর্ণের দত্ত লেখ্যকে সম্মতি পত্র অধমর্ণের প্রদত্ত পত্রকে আধিলেখ্য নামে কহা যায়। (৫)

(৪) ষাণ্মাসিকেতু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে মতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥
বৃহস্পতি সংহিতা।
পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ন্যূনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥
ব্যাসসংহিতা।

(৫) দত্ত্বা ভূম্যাদিকং রাজা তাম্রপত্রে ঽথবা পটে।
শাসনং কারয়েৎ ধর্ম্ম্যং স্থানবংশাদি সংযুতং॥
সেবা শৌর্য্যাদিনা তুষ্টঃ প্রসাদ লিখিত ন্তুতৎ।
যদ্বৃত্তং ব্যবহারেষু পূর্ব্বোপক্ষোত্তরাদিকং॥
ক্রিয়াবধারণোপেতং জয়পত্রেঽখিলং লিখেৎ।
ভ্রাতরঃ সংবিভক্তা যে অবিরোধাৎ পরস্পরং॥
বিভাগ পত্রং কুর্ব্বন্তি ভাগলেখ্যং তদুচ্যতে।
ভূমিং দত্বাতু যঃ পত্রং কুর্য্যাৎ চন্দ্রার্ক কালিকং॥
অনাচ্ছেদ্য মনাহার্য্যং দানলেখ্যং তদুচ্যতে।
গ্রামো দেশশ্চ যঃ কুর্য্যাৎ মতং লেখ্যং পরস্পরং।
রাজা বিরোধি ধর্ম্মার্থে সম্বিৎ পত্রং বদন্তিচ।
ধনং বৃদ্ধ্যা গৃহীত্বাতু স্বয়ং কুর্য্যাচ্চকারয়েৎ॥
উদ্ধার পত্রং তৎ প্রোক্তং ঋণ লেখ্যং মনীষিভিঃ॥
বৃহস্পতি সংহিতা।

প্রজাবর্গ রাজ শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া রাজার নিকট যেসকল প্রতিজ্ঞা পত্র দেয় তাহার নাম সম্বিৎ পত্র। দাস প্রভুর সেবা শুশ্রূষা করিবে বলিয়া প্রভুর নিকট যে লেখ্য প্রদান করে তাহার নাম দাসলেখ্য। অধমর্ণ ঋণ লইয়া উত্তমর্ণকে যে লেখ্য দেয় তাহার নাম কুসীদ লেখ্য অথবা ঋণ লেখ্য। রাজা প্রজাকে, প্রভু ভৃত্যকে এবং উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যে লেখ্য দেন তাহার নাম সম্মতি পত্র।

তমাদি ঘটিত কথার সবিশেষ উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রে উত্তমর্ণ, অধমর্ণ, ঋণ, শুদ, গচ্ছিত এবং লেখন প্রকারাদি নির্ণয় করা আবশ্যক। ঋণদাতাকে আর্য্য জাতির ভাষায় উত্তমর্ণ কহা যায়। ঋণী ব্যক্তির উপাধি অধমর্ণ। যাবৎ পরিমিত বস্তু ঋণ দেওয়া যায় তাহার নাম মূল। যাহা বৃদ্ধি হয় তাহার নাম শুদ অথবা কুসীদ। কুসীদ শব্দে মন্দ পথ বুঝায়। শাস্ত্রানুসারে ঋণের বৃদ্ধি গ্রহণ অতিশয় নিন্দনীয় এ কারণে শুদের নাম কুসীদ হইয়াছে। শুদ ব্যবসায়ীকে কুসীদজীবী বলে। এই ব্যবসায়টী বৈশ্য জাতির নিজস্ব স্বরূপ, ইহাতে ঐ জাতির পাপ জন্মে না।

পুরাকালে অর্থ ব্যবহারে কদাচ দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু ধান্য বৃদ্ধি পক্ষে তমাদি কালের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত শুদের বৃদ্ধির বৃদ্ধি ধরিলেও প্রত্যেক বর্ষে শতকরা পাঁচ অংশের অধিক পাইতেন না। শেষ সীমায় মূল ও বৃদ্ধির সঙ্গে ধরিয়া দ্বিগুণের অধিক দেওয়া যাইত না। যাঁহারা বর্ষে বর্ষে অথবা মাসে মাসে বৃদ্ধি গ্রহণ করিতেন তাঁহারা চক্র বৃদ্ধি অথবা কাল বৃদ্ধি পাইতেন না। বৃদ্ধির বৃদ্ধিকে চক্র বৃদ্ধি শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ বৃদ্ধি ঋণী ব্যক্তি স্বীকার পূর্ব্বক না লিখিয়া দিলে উত্তমর্ণ নিজ ইচ্ছায় চক্র বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে অধিকারী ছিলেন না। কায়িক শ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি পরিশোধ হয় তাহার নাম কায়িকা। মাসে মাসে দেয় শুদকে কালিকা বলা যায়। সময় বিশেষে কালে কালে যে ঋণ শোধ হয় তাহার নামও কালিকা। ইহাকেই কীস্তি বন্দী বলা যায়। (৬)

---

(৬) কুসীদ বৃদ্ধি র্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি
সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদেলবে বাহ্যে নাতিক্রামতি
পঞ্চতাং ॥১৫১
কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন
সিদ্ধতি। ১৫২
কুসীদ পথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি॥
নাতি সাম্বৎসরীং বৃদ্ধিং নচাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কাল বৃদ্ধিঃকারিতা কায়িকাচ যা॥
১৫৩
মনু ৮ অ।
কায়িকা কায়সংযুক্তা মাস গ্রাহ্যাচ
কালিকা।
বৃদ্ধের্ব্বৃদ্ধিশ্চক্র বৃদ্ধিঃ কারিতা ঋণিনা
কৃতা॥
ভাগো যদ্দ্বিগুণাদূর্দ্ধং চক্রবৃদ্ধিশ্চ গৃহ্যতে।
মূর্লঞ্চ সোদয়ং পশ্চাৎ বর্দ্ধ্যং তদ্বিগর্হিতং॥
বৃহস্পতি সংহিতা।

অপরিমিত বৃদ্ধি।

ইহা কোন ব্যক্তির আপৎকাল ভিন্ন গ্রাহ্য নহে। এই বৃদ্ধির অঙ্গীকার পত্র বিলক্ষণরূপ প্রমাণাদি দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বিগুণের অধিক শুদ লইতে পারগ হন না। কিন্তু ঋণী কর্ত্তৃক লিখিত প্রমাণ থাকিলে অধমর্ণের নিকট হইতে তদঙ্গীকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে (৭)

ব্যবসার স্থলে মূলধনের পরিমাণ ও শুদের কথা লাভের অংশের উল্লেখ না থাকিলে ধনস্বামী লাভাংশের অশীতি ভাগ ও শ্রমকারী লাভাংশের বিংশতি ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। যাহারা ব্যবসায়ে শুদ গ্রহণ করে তাহারা ধর্ম্মানুসারে শতকরা দুইভাগ শুদ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে (৮)

প্রণয় হেতু প্রিয় ব্যক্তিকে ঋণদিলে যাবৎ বৃদ্ধি গ্রহণের উল্লেখ না হইবে তাবৎ কাল বৃদ্ধি থাকিবে না। যখন বৃদ্ধি যাচ্ঞা করিবেন তদবধি বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি উত্তমর্ণ যাঞ্চা করিয়াও শুদ প্রাপ্ত না হন তবে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারেন না। (৯)

কথা প্রসঙ্গে আর একটী কথার উল্লেখ করা অতীব আবশ্যক জ্ঞান হইল। আর্য্য জাতির নিকট কাহারও চাকুরী তমাদি হইত কি না। বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী অসুস্থতা অথবা বার্দ্ধক্যাদি হেতু বশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইলে বেতন পাইতেন কি না। তাহাদিগের কর্ম্মে তাহাদিগের পুত্রাদির উত্তরাধিকারিত্ব জন্মিত কি না।—তাহার নির্দ্ধারণে এই জানা যায় যে বিশ্বস্ত ও প্রিয় কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কেবল পীড়া কালে বেতন পাইত এমন নয় অক্ষম অবস্থায় পূর্ণ মাত্রায় যাবজ্জীবন বৃত্তি ভোগ করিত। সম্ভাবনা স্থলে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চাকুরী ও নিষ্কর ভূমি উপভোগ করিতে পাইত।(১০)

---

(৭) কাত্যায়ন

ঋণিকেন কৃতা বৃদ্ধি রধিকা সংপ্রকল্পিতা।
আপৎকালে কৃতা নিত্যং দাতব্যা কারিতা তথা॥
অন্যথা কারিতা বৃদ্ধি র্ন দাতব্যা কথঞ্চন॥

(৮) মনু অধ্যায়—যথা—

বশিষ্ঠোবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্ত বিবর্দ্ধিনীং।
অশীতি ভাগং গৃহ্ণীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকং শতে॥১৪০
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং বা গৃহ্লানো না ভবত্যর্থ কিল্বিষী॥১৪১

(৯)বিষ্ণু বচন।

প্রীতিদত্তং নবর্দ্ধেত যাবন্ন প্রতি যাচিতং।
যাচ্যমানং ন দত্তঞ্চে দ্বর্দ্ধতে পঞ্চকং শতং॥

(১০)মনু ৮ম অধ্যায়

আর্ত্তস্তকুর্য্যাৎ স্বস্থঃসন্ যথাভাষিত মাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনং॥২১৬

পাঠক মনে করিবেন আর্য্য জাতি ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাহা নহে। পাঠক তুমি সভ্য হইতে ইচ্ছা কর? যাহারা রাজপথ কুৎসিত করে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে মানস করিয়াছ? স্থল বিশেষে কাহাকেও কি দোষ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ কর? তুমি হাতুড়ে বৈদ্যের ও গণ্ডমূর্খের চিকিৎসা নিবারণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ? ক্ষুদ্র ব্যবসা দার (ফড়ে) দিগকে শাস্তি দিতে বাসনা কর? কেন না তাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য মধ্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিসানদিয়া মন্দ করে। তদ্দ্বারা লোকের পীড়া জন্মে। তুমি যাহার জন্য এত খেদিত সেগুলি আর্য্য জাতির চক্ষে অগ্রেই দোষ বলিয়া পতিত হইয়াছিল।

গর্ব্ভিণী, রোগী, ও বালক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি যদি অনাপৎকালে রাজমার্গ অপরিষ্কৃত করিত তাহা হইলে তাহাকে অগ্রে রাজ পথ পরিষ্কৃত করিতে হইত তৎপরে স্থল বিশেষে তাহার দুই পণ বরাটক (কৌড়ী) দণ্ড হইত। গর্ব্ভিণী, বালক ও রোগার্ত্ত ব্যক্তি ঐ প্রকার কুব্যবহার আর না করে এজন্য তিরস্কৃত হইত।(১১)

চিকিৎসকের দ্বারা পশু সম্বন্ধে অমঙ্গল ঘটিলে প্রথম সাহস, মানুষের পক্ষে অমঙ্গল ঘটিলে দ্বিতীয় সাহস দণ্ড হইত। অদূষিত দ্রব্য দূষিত করিলে দোষ কারীর প্রথম সাহস দণ্ড দেওয়া রীতি ছিল। দণ্ডের প্রমাণ ও স্বাক্ষীস্বরূপ দণ্ডনীতি প্রকরণে লিখিত হইবে। (১২)

(১১)সমুৎসৃজে দ্রাজমার্গে যস্তু মেধ্য
মনাপদি।
স দ্বৌকার্ষ্যাপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাপি
শোধয়েৎ॥ ২৮২
আপদ্‌গতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ব্ভিণী বাল
এববা।
পরিভাষণ মর্হন্তি তঞ্চ শোধ্য মিতি
স্থিতিঃ মনু ৯ অ॥ ২৮৩
(১২) চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যা
প্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষুচ
মধ্যমঃ॥ ২৮৪
অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে
তথা।
মনীনামপরাধেচ দণ্ডঃ প্রথম
সাহসঃ। ২৮৬
মনু ৯অ।

চন্দ্রশেখর।

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

জন ষ্ট্যালকার্ট।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পর পীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্য রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে সে অত্যাচার কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কথনও সম্ভব নহে। যাহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাহার দ্বারা রাজ্য স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। কুল্‌সমকে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল, যে ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফষ্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফল ভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয় অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্ব্ব প্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃত সংকল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে এক জন স্থইস্ বা জর্ম্মান মীরকাসেমের সেনাদল মধ্যে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয় নালায় যবন শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তা-

হার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর, আপন নাম গোপন করিয়া, জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন, লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুল্‌সমকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন, যে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, এক জন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যালকার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকা পানে দৃষ্টি করিয়া, কিঞ্চিৎ বিকৃত কণ্ঠে কহিল,

"লরেন্স ফষ্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল—"নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যালকার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই একবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল, যে এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন, যে এটি ইংরেজদিগের নিয়ম বহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরঃস্থ কেশশূন্য আঘাত চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যালকার্ট কি আঘাত চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল?

আমীর হোসেন, বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া, কুল্‌সমকে ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্‌সমকে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন।

কুল্‌সম্ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

আমীর সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্ আসিল। ফষ্টরকে দেখিয়া, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন,

"সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে শিপাহী দিন্, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

আবার বেদগ্রামে।

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ, তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতীয় নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাট সকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্য সামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে—কোথাও পচিযাছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন, যে ঐ খানে দাঁড়াইয়া, পুস্তক রাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, যে গৃহত্যাগী হইব, সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসী হইব। আবার সেই গৃহে আসিতে হইল,—সর্ব্বত্যাগী হইতে

পারেন নাই, সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই, কেন না অপরাধিনী শৈবলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাহার পর মনে করিয়া ছিলেন, রাজবিপ্লব ঘটাইবেন, দ্বিতীয় চাণক্য হইবেন—কই তাও ত পারিলেন না—শৈবলিনী আবার জড়াইল। মনে করিয়াছিলেন, পরহিতব্রত সফল করিবেন, তাহাতেও শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিলেন না, তবে আর কেন? শৈবলিনীই সকলের সার, শৈবলিনীই সংসার। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন,

"শৈবলিনি!"

শৈবলিনী, কথা কহিল না: কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্ব স্বপ্নদৃষ্ট করবীরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত লোচনে চারিদিগ্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপিং হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল। চন্দ্রশেখর সাশ্রুলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এদিগে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল, যে চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরিজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া, শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড় না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিন্‌তে পারিস্?"

শৈবলিনী, বলিল, "পারি—তুই পার্ব্বতী।"

সুন্দরী বলিল—"মরণ আর কি তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়েফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্লুম। পার্ব্বতী দিদি একটি গীত গা না?"

আমার মরম কথা তাইলো তাই?
আমার শ্যামের বামে কইসে রাই?
আমার মেঘের কোলে কইসে চাঁদ?
মিছেলো পেতেছি পিরিতি ফাঁদ?

কিছু ঠিক পাইনে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেথানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।"

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখ পানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জল বিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিগে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহারে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে, আসিয়া দর্শন দিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ঔষধ লইয়া যাইব। বলিলেন, ঔষধ আনিয়াছি। ইহা অব্যর্থ, কিন্তু শুভক্ষণে সেবন করাইতে হইবে।

চন্দ্রশেখর, গণনা করিয়া বলিলেন, আজি রাত্রি চারিদণ্ডের পর উত্তম সময়। সেই সময়ে ঔষধ সেবন করান স্থির হইল।

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

যোগবল না PSYCHIC FORCE?

ঔষধ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, রমানন্দস্বামী বিশেষ রূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন;

কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পারামার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে, রমানন্দস্বামী ঔষধ সেবনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য শয্যারচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়াদিল।

রমানন্দ স্বামী তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

রমানন্দ স্বামী, তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবা মাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেল—কেবল চন্দ্রশেখর রহিলেন। রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমিও যাও। সকলকে লইয়া এত দূরে অবস্থিত কর, যে আমার পাঠ্য মন্ত্র কেহ না শুনিতে পায়। আমি ডাকিবা মাত্র আসিও।"

চন্দ্রশেখর গৃহের বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। রমানন্দ স্বামীর হস্তে ঔষধি প্রস্তুত।

সকলে বাহিরে গেলে, রমানন্দ স্বামী ঔষধ মাটীতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু২ গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। রমানন্দ স্বামী স্থির দৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া বসিয়া রহিলেন—ক্রমে, শৈবলিনী ভীতা হইয়া উঠিয়া বসিল।

রমানন্দ স্বামী তাহাকে বলিলেন, "একটি কথা কহিবে না কেবল আমার চক্ষের প্রতি চাহিয়া থাকিবে।"

উন্মাদিনী আরও ভীতা হইয়া তাহাই করিল। তখন, রমানন্দ স্বামী তাহার ললাট, চক্ষু, প্রভৃতির নিকট নানাপ্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল—অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন রমানন্দস্বামী ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী, নিদ্রিতাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন "আমি কে?"

শৈবলিনী, পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "রমানন্দ স্বামী।"

র। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

র। শৈবলিনী কে?

শৈ। স্বামীর নাম করিতে নাই।

র। বল।

শৈ। চন্দ্রশেখরের স্ত্রী।

র। এ কোন স্থান ?

শৈ। বেদগ্রাম—আমার স্বামীর গৃহ।

র। বাহিরে কে কে আছে ?

শৈ। আমার স্বামী, প্রতাপ, ও সুন্দরী।

র। তুই এস্থান হইতে গিয়াছিলি কেন ?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

র। এ সকল কথা এত দিন তোর মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

র। কেন ?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

র। সত্য সত্য না কাপট্য আছে ?

শৈ। সত্য সত্য, কাপট্য নাই।

র। তবে এখন ?

শৈ। এখন এযে স্বপ্ন—এ আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

র। তবে সত্য কথা বলিবি ?

শৈ। বলিব।

র। তুই ফষ্টরের সঙ্গে গেলি কেন ?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

রমানন্দ চমকিয়া উঠিলেন—সহস্র চক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি!

র। তবে কি ?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক্ করিল কেন ?

রমানন্দ স্বামী, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সে দিনের গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে ?"

শৈ। পড়ে

র। কি কি কথা হইয়াছিল ?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া, রমানন্দ স্বামী মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন ?"

শৈ। বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে, প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

র। বাস মাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী ?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

র। নচেৎ ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

র। ফষ্টর সম্বন্ধে ?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

রমানন্দ স্বামী খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া, কহিলেন,

"সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল ব-লিল—"সত্যই বলিয়াছি।"

রমানন্দ স্বামী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন,

"তবে ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়া জাতি ভ্রষ্ট হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্র দর্শী। বলুন, আমি জাতিভ্রষ্ট কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

রমানন্দ স্বামী অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

র। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর, আর পার্ব্বতী।

র। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

র। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। নিকটে—উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

রমানন্দ স্বামী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার রোগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণ কৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

র। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিষ পাই, ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

র। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

র। কেন, তোমার স্বামীর গৃহে?

শৈ। স্বামী আর গ্রহণ করিবেন?

র। যদি করেন?

শৈ। তবে কায়মনে তাঁহার পদসেবা করি।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল পাইয়াছ বলিতেছ—বল ও কিসের শব্দ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

র। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইরফান—নবাবের সৈনিক।

র। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

র। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে?

শৈ। না। দুই জনকে আনিতে এক-সময় আদেশ করেন।

র। কোন চিন্তা নাই। নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন, যে "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "এখনই শুনিবে। চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইরফান আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। এদিগে, যথাকালে রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীকে মহৌষধ সেবন করাইলেন।

জৈন ধর্ম্ম।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানেই জৈনধর্ম্মের সমুন্নতি। শাক্যসিংহের উপদেশ মালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎ কালীন ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করত বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎস চতুর্দ্দিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহা বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের তাহাই ঘটিল এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীন প্রভা ধারণ করিল। এই অবসরে জৈন ধর্ম্ম শনৈঃ২ পাদবিক্ষেপ করিতে২ মহাজনের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। সদ্বিদ্বান্‌গণ আচার্য্যের উপদেশ মূলভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জৈন ধর্ম্মের নানা গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্ম্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্ম প্রগাঢ় কল্পনাপ্রসূত নহে, সুতরাং ইহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়া লইয়া ইহা নির্ম্মিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি মালা ইহাতে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু তথাপি মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজঃ। জৈন ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্ম, ইহাতে পৌত্তলিক উপাসনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই, এজন্য ইহার অভিনবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈন গ্রন্থ সকল রচিত

হইয়াছে। প্রথম সূত্র গ্রন্থ ; ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কল্পসূত্র, দশ বৈকালিক সূত্র, ক্ষেত্র সমাস সূত্র, চতুর্ব্বিংশতি সূত্র, নবতত্ত্ব সূত্র, প্রতিক্রমণ সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, স্মরণ সূত্র, পক্ষীসূত্র, অতি প্রসিদ্ধ। ইহাভিন্ন এক বিংশতি স্থান, উপদেশ মালা, বালা-বিবোধ, উপাধান বিধি, প্রশ্নোত্তর—রত্নমালা, আত্মানুসাশন, আরাধনা প্রকার প্রভৃতি জ্ঞান কাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনস্তব, বৃহৎ শান্তিস্তব, মহাবীর স্তব, ঋষভ স্তব, পার্শ্বনাথ স্তব, কল্যাণ মন্দির স্তোত্র প্রভৃতি স্তবগ্রন্থ। পুরাণ অনেকগুলি এবং সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত ; তাহার মধ্যে এক্ষণে পদ্ম পুরাণ, মহাবীর চরিত, নেমি রাজর্ষি চরিত, চিত্র সেন চরিত, মৃগাবতী চরিত, গজসিংহ চরিত, সাধু চরিত প্রভৃতি সুপ্রাপ্য। অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সাধারণের বোধাধিকারার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ নিচয় এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্রও প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীপ্পনী লিখিয়া দিয়াছেন। জৈনদিগের গ্রন্থ মধ্যে কল্পসূত্র অতীব আদরণীয়। এই গ্রন্থ মহাবীরের পরলোক গমনের ৯৮০ বৎসর পর অর্থাৎ ৪১১ খৃঃ অঃ রচিত হয়, কিন্তু কেহ২ অনুমান করেন যে উহা ৬৩২ খৃঃ অঃ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভদ্রবহু গুজরাট্ নিবাসী, তিনি ধ্রুবসেনের রাজ্যশাসন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে ষ্টীভিন্‌সন সাহেব অনুমান করেন, তিনি চারিশত খ্রীষ্টাব্দের লোক। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খৃঃ অঃ মধ্যে রচিত। যশোবিজয় কৃত সংস্কৃত টীকা অতি বিশদ। দেবীচন্দ্র কল্প সূত্রের গুজরাটী অনুবাদ করিবার সময় জ্ঞান—বিমল ও সময়-সুন্দর নামক টীকা দ্বয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের অষ্ট দিবস জৈনাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কল্পসূত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কল্পসূত্রে লিখিত আছে, যেমন বিশ্বমধ্যে অর্হতের ন্যায় পরম দেবতা ও মুক্তির ন্যায় পরম পদ আর নাই, (নার্হতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং) তদ্রূপ শ্রীকল্প সূত্রের ন্যায় ভূমণ্ডলে ধর্ম্মগ্রন্থ আর বর্ত্তমান নাই। কল্পসূত্র সর্ব্ব গ্রন্থের শিরোরত্ন স্বরূপ। এই কল্পদ্রুমের শ্রীবীর চরিত্র বীজ, শ্রীপার্শ্ব চরিত্র অঙ্কুর, শ্রীঋষভ-চরিত বৃক্ষমূল এবং শাখা, শ্রীনেমি-চরিত বৃন্ত, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিজ্ঞান সুগন্ধ, এবং মোক্ষ ইহার ফল; অধিক কি ইহার অধ্যয়নে জীব জরা মরণ প্রভৃতি সাংসারিক কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষমার্গে গমন করেন। এই রূপ কল্পসূত্র সম্বন্ধে অনেক ফলশ্রুতি আছে, তাহা

সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে। ভদ্রবহু এই গ্রন্থ দশ শ্রুত স্কন্ধ অষ্টমাধ্যায়ন এবং প্রত্যাখ্যান হইতে সঙ্কলন করেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত যথা প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ জিন চরিত কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাচারী সূত্র ব্যাখ্যান। আমরা কল্প সূত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

মহাবীর কর্তৃক জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈনদিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর * এজন্য হেমচন্দ্রের মতে ইঁহার অপর নাম অন্তিম জিন। মহাবীর চরিত অনুসারে ইনিই প্রথমে শত্রুমর্দ্দনের রাজ্য শাসন কালে বিজয় নগরের একটী গ্রামে নয়সার নামে প্রধান গ্রাম্য লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মজন্য মায়াময় মনুষ্য দেহ পরিত্যক্ত হইলেই সৌধর্ম্ম নামক স্বর্গ লোকে গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের পৌত্র মরীচি নামে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহণ করত ব্রহ্ম লোকে গমন করিলেন। তৎপরে কয়েক বার বিলাসপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করত ক্রমে কয়েক লক্ষ বৎসর জৈন স্বর্গে বাস করিয়া অবশেষে রাজগৃহের নৃপতি বিশ্বভূত নামে ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে ত্রিপৃষ্ট, চক্রবর্ত্তী, প্রিয় মিত্র, এবং তৃতীয় বার সন্ন্যাসধর্ম্ম রত নন্দন নামে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দনের মৃত আত্মা কুন্দ গ্রামের কোদল বংশোদ্ভব ঋষভ দত্ত নামক ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী দেব নন্দীর গর্ভে প্রবেশ করিলে, তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। এই স্বপ্নে তিনি হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য্য, সৈনিক, কুম্ভ, পদ্ম-শোভিত সরোবর, সাগর, ঋষ্যাশ্রম, মুক্তাবলী এবং নির্ধূম পাবক দেখিতে পাইলেন, যথা।—

গয়, বসহ, সীহ, অভিসেগ্য, দাম, সসি, দিনয়রং, জহং, কুম্ভ, পউমসর, সাগর, বিমান ভবন, রয়নুঞ্চয়, সিহিচ।

জলন্ধার বংশোদ্ভবা দেবনন্দী এই স্বপ্নদৃষ্টে অতীব চিন্তাকুল চিত্তে স্বামীর নিকট সমুদয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষভ দত্ত তপস্বী, জ্ঞানবান্, তিনি যোগবলে স্বপ্নবিবরণ সমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে এবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি রূপে শশধরের ন্যায় এবং বিদ্যায় বৃহস্পতি তুল্য। সেই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব এই বেদ চতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ (ইহাও বেদের অংশ বিশেষ) নির্ঘন্টু (বৈদিক শব্দ সংগ্রহ) শিক্ষাকল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গ নিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিশেষরূপে অবগত হইবেন। ষষ্ঠীতন্ত্র কাপিল শাস্ত্রে (অর্থাৎ

* "তীর্য্যতে সংসারসমুদ্রাদনেনেতি তীর্থং তৎ করোতীতি তীর্থঙ্করঃ" হেমচন্দ্র টীকা।

ষষ্ঠী পন্থা সাংখ্য দর্শন) পণ্ডিত হইবেন। গণিত শাস্ত্রে কুশল হইবেন। যজ্ঞ বিদ্যায়, ব্যাকরণবিদ্যায়, ছন্দঃশাস্ত্রে, জ্যোতিঃ শাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণ বাক্যে (বেদভাগ বিশেষ) সন্ন্যাস শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হইবেন।‡ এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না কিন্তু দেব লীলা মনুষ্যের বোধগম্য নহে! দেবরাজ মহেন্দ্র দেখিলেন পূর্ব্ব পরম্পরা অর্হত, চক্রবর্ত্তী, এবং বাসুদেবের জন্ম ইক্ষাকু এবং হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে, তাহাতে এপ্রকার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তীর্থঙ্করের জন্মগ্রহণ অতীব লজ্জাকর; এজন্য মায়া বলে দেবনন্দীর গর্ভ হইতে শেষ তীর্থঙ্করকে ভারত ক্ষেত্রের রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্যপ বংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নৃপতির রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালন করিলেন। পুত্র প্রসবে রাজ্ঞী ত্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে স্থাবর জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম বর্দ্ধমান রাখিলেন এবং শক্র তাঁহার দেবতা ও মনুষ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব জন্য তাঁহার মহাবীর আখ্যা প্রদান করিলেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্যা যশোদার পাণি পীড়ন করিলেন। এই উদ্বাহের অল্পকাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী একটী কন্যা জন্মিল। এই কন্যার কুমার জামলি পাণিগ্রহণ করেন। ইতি মধ্যে মহাবীরের পিতা মাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দি বর্দ্ধনকে রাজ্য ভার প্রদান করতঃ যতি ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের গোশল নামক নীচ কুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্শ্বনাথ জিনের মতাবলম্বী বর্দ্ধন স্থরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধান সম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী দিগম্বর, তিনি পার্শ্বনাথের মতাবলম্বী শ্বেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল, "নিগ্রন্থাঃ পার্শ্ব শিষ্যাঃ বয়ং" তাহাতে গোশল প্রত্যুত্তর কহিল "কথম্ভ য়ূয়ং নিগ্রন্থা বস্ত্রাদি গ্রন্থ

‡ জুবন গমনুপ্যত্তে। রিউবেয়। জউব্বেয়। সাম বেয়। অথব্বণ বেয়। ইতিহাস পঞ্চমাণং। নিঘংটুচ্ছট্টনং। সঙ্গোবং গগানং। চউক্ক বেয়ানং। সারই। বারই। ধারই। সউংগবী। সট্টি তন্ত বিসারই। সিখানে। সিখাকপ্পে। বাগরণে। ছন্দে। নিরুত্তে। জীই সামরণে। অণম্নয়। বংভন্ন এসু। পরিবায়ত্রসু। সুপরি নিব্বিট্‌টিএ। আবিভবিস্মই॥

ধারিণঃ। কেবলং জীবিকা হেতোরিয়ং পাষণ্ডকল্পনা। বস্ত্রাদিসঙ্গরহিতো নিরপেক্ষো বপুষ্যপি। ধর্ম্মাচার্য্যো হি যাদৃগুমে নির্গ্রন্থা স্তাদৃশাঃ খলু।*

মহাবীর এইরূপ সশিষ্য ৬বৎসর মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্র ভূমি, সুদ্ধি ভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোন্দগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার এক শিষ্য তেজঃ লেশ্যা যোগ শিক্ষা করিয়া, স্বয়ং জিনত্ব † প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই। তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলে নৃপতি শতানীক তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপবাসাদি শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার বৈশাখ মাসে ঋজুপালিকা নদী তীরস্থ শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে২ কেবল জ্ঞানলাভ হইল। এই জ্ঞানই জৈন ধর্ম্মের চরম সীমা। এক্ষণে মহাবীর জিনপদ বাচ্য হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ, দুঃখ, স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে "সিদ্ধ বুদ্ধে মুত্তে অন্তগডে পরিনিব্বুউ সব্বদুঃখপহিণে" "অর্থাৎ সর্ব্ব সন্তাপাভাবাৎ" সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, "যথা অণংতে অণুত্তরে নিব্বধাই নিরাবরণে কসিনে কেবল বরণানন্দ সনা সমুপ্যন্নে।"

মহাবীরের চতুর্দ্দশ শিষ্য সর্ব্ব প্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন তুল্য মহাপণ্ডিত যথা "অজিনাণং জিনসংকাসং সর্ব্বাখর সন্নি পাইন" (অজিনাপি জিন সদৃশাঃ সর্ব্বাক্ষর সমূহ জ্ঞাতারঃ।)

মগধের গোতম বংশীয় বসুভূতি, ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতিএবং বায়ুভূতি নামক তিন পুত্র। হেমচন্দ্র ইহাদিগের সকলকে গৌ-

* আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নির্গ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তদুত্তরে গোশল কহিল "তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্ত্র গ্রন্থি দেখিতেছি। হায়! হায়! কোন পাষণ্ড ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য যেমন বাহ্য শরীরে বস্ত্রাদি সঙ্গ রহিত তেমনি অন্তরেও সঙ্গ রহিত। আমাদের অন্তর্বহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

† জয়তি রাগদ্বেষ মোহানিতি জিনঃ। হেমচন্দ্র টীকা॥

তম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মন্দিত, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচল ভ্রাতা, মৈত্রেয়, মহাবীরের একাদশ গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্য দ্বারা জৈন ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সসানিক এবং শ্রীণিক নামক কৌশম্বী এবং রাজগৃহের নৃপদ্বয়কে জৈন মতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

* ইন্দ্রভূতি রগ্নিভূতি র্ব্বায়ুভূতিশ্চ গৌতমঃ।

জৈন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ কহিয়াছিলেন, কুমার পাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করিবেন; এতৎ সম্বন্ধে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে এই মাত্র লিখিত আছে যথা "ততঃ কুমার পালস্ত বাহড়ো বস্তু পালবিৎ। সময়াদ্যা ভবিষ্যন্তি শাসনেঽস্মিন প্রভাবকাঃ।"

ক্রমশঃ

শ্রী রা

পাগলিনী।

১

পাগলিনী রে আমার!
এই কান্না, এই হাসি; এই আনন্দের রাশি;
এই দেখি মুখ চন্দ্র বিষাদে আঁধার;
এই নাচ, এই গাও; এই যাও, ফিরে চাও;
এই অন্তর্ধান, এই গলায় আবার;
পাগলিনী রে আমার!

২

চঞ্চল চিত্তের স্রোত;—
কিবা সুখ, দুঃখ তায়, স্থির না থাকিতে পায়,
ভেসে যায় স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের আকার;
এই প্রেম বরিষায়, সেই স্রোত পূর্ণ-কায়,
এই মান নিদাঘেতে বিশুষ্ক আবার;
পাগলিনী রে আমার!

৩

পিঞ্জরের পাখী তুমি,
বেড়াও পিঞ্জরমাঝে, চরণে শৃঙ্খল বাজে,
নাহি জ্ঞান, আনন্দেতে গাও অনিবার
স্বভাব, সঙ্গীতরাশি, আঁধারেশ্যামেরবাঁশী;
যে বুলি বলাই তাহা বল আরবার,
পাগলিনী রে আমার!

৪

এই পাগলিনী মূর্ত্তি,—
একমাত্র, বাঙ্গালির দুঃখ সাগরের তীর,
এই মূর্ত্তি,—একমাত্র গৃহ অলঙ্কার;
বাঙ্গালির শূন্য ঘরে, এই মূর্ত্তি শোভা ধরে,
অন্য মূর্ত্তি কদাচিত শোভিবে না আর,
পাগলিনী রে আমার!

৫

শোভিবে না আহ্লাদিনী।
আহ্লাদিনী বঙ্গঘরে! নিঝ রিণীপ্রভাকরে!
মরুভূমি মধ্যে মৃগ তৃষ্ণিকা সঞ্চার!
জ্বলিতেছে চিতা প্রায়, যাহার হৃদয় হায়!
তাহার আলয়ে কিসে আহ্লাদ আবার?
পাগলিনী রে আমার!

৬

শোভিবে না বিষাদিনী।
বাহিরের দুঃখানলে, নিরন্তর চিত্ত জ্বলে,
তাহাতে বিষাদ যদি গৃহেতে আবার,
হতভাগ্য বঙ্গবাসী, হইবেক ভস্মরাশি,
কোথায় যুড়াবে এই যন্ত্রণা তাহার,
পাগলিনী রে আমার!

৭

গম্ভীরা ব্রাহ্মিকা মূর্ত্তি!
নাহি সুখ, নাহি দুঃখ, সতত বিষণ্ণ মুখ,
পাপে অনুতাপে চিত্ত দহে অনিবার!
এই পাপরাশি হায়! যাবে কোন তপস্যায়?
এত পাপ যার ঘরে কি সুখ তাহার,
পাগলিনী রে আমার?

৮

নাহি চাহি কোন মূর্ত্তি;—
আহ্লাদিনী, বিষাদিনী, কিম্বা পাপ প্রয়াসিনী
নাহি চাহি অন্য ছবি গৃহেতে আমার,
ওই কান্না, ওই হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
ওই বালিকার শূন্য-হৃদয় তোমার,
পাগলিনী রে আমার!

৯

জ্বলিয়া অনন্ত দুঃখে,
যবে দগ্ধ কলেবরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,
দেখিব বিষাদে মাখা সকল সংসার,
তখন হাসিয়া সুখে, কোমল প্রসন্ন মুখে,
ধরিয়া গলায় মম, হাসিও আবার,
পাগলিনী রে আমার!

১০

কিম্বা যদি হাসি মুখ,
দেখি প্রিয়ে! কোনদিন,—বিদ্যুৎকৌমুদীলীন
অধর টিপিয়া, শুনি সুখ সমাচার,
"পাই নাথ! যেই সুখ, নিরখি তোমার মুখ,"
বলিও—"তাহার কাছে, কি সুখ আবার!"
পাগলিনী রে আমার!

১১

এই বরিষার মত,
তব মুখে সদা দেখি, মেঘে চন্দ্রে মাখা মাখি
মান বিদ্যুতেতে মাখা আদর আমার;
তব কান্না, তব হাসি, তাই এত ভাল বাসি,
তরল চঞ্চল ওই হৃদয় তোমার,
পাগলিনী রে আমার,

১২

যে চাহে দেখিতে প্রিয়ে!
অচঞ্চল সৌদামিনী, অচঞ্চল কাদম্বিনী,
অচঞ্চল আহ্লাদিনী,—হউক তাহার।
আমি মেঘে ভাল বাসি, চঞ্চলা চপলা হাসি;
আমি ভাল বাসি তোরে,—চাঞ্চল্য সবার!
পাগলিনী রে আমার!

শ্রীনঃ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আর্য্যদর্শন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, সম্পাদিত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১ শাল।

গত দুইবৎসর মধ্যে আমরা অনেক গুলি ইংরেজি ও বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র সমাদর পূর্ব্বক, পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের সহিত এখানিও পরিচিত করিতেছি। ফলে এ খানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক; আপনার গুণে ইহা সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে।

এ পত্রের রচনা প্রণালী অতি পরিষ্কার; যে সকল বিষয় ইহাতে লিখিত হইতেছে, তাহা সারগর্ভ, ও লেখকেরা কৃতবিদ্য, এবং লিপিকুশল। তবে, সকল প্রবন্ধ গুলি যে তুল্যরূপে প্রশংসনীয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য "আত্মারাম পড়!" এবং "শত্রুসিংহ" ইত্যভিধেয় প্রবন্ধদ্বয়ের কোন প্রশংসা করা যায় না।

কোন জাতি নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ, আর এক অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন, স্ববুদ্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতীয়েরা অনুবাদ ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই। রোমক সাহিত্য যুনানী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা, অনুবাদ করেন; মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন। মেঘনাদ বধ, ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী, "Merry Wives of Windsor" নামক নাটকের অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ে, অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য, এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুরকণ দুই এক জন বিশেষ প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে; ভাল হইলেও, উপকারিতায় সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না। আমরা দেখিলাম যে আর্য্যদর্শন লেখকেরা এবিষয়ে যথার্থ কার্য্যকারিতা বুঝিয়াছেন। ইহা সদ্বিবেচনা এবং বিজ্ঞতার কাজ হইয়াছে। এই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিতে পারিবেন, এমত সম্ভাবনা।

ইহাও বক্তব্য, যে সকল প্রবন্ধগুলি, অনুবাদমূলক নহে। অনেক স্থানে, লেখকেরা আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াছেন, এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় ও দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, এই পত্র

দীর্ঘজীবী হইয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

বান্ধব। মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গাল প্রেস।

ইহা আর এক খানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেক গুলি, উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল না। অথচ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ যে পশ্চিম বঙ্গবাসিগণ অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে ন্যূন, ইহা আমরা স্বীকার করি না। অতএব ঢাকা হইতে এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে এই পত্রের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং মুদ্রাকার্য্য, এ প্রদেশের মাসিক পত্র সকলের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। ভরসা করি, ইহার আকার বাড়িবে, এবং মুদ্রাকার্য্যের উন্নতি ঘটিবে।

কিন্তু পত্র আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর, এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে, বাঙ্গালায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।

কাব্য কৌমুদী। প্রথম খণ্ড। শ্রী শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। কলিকাতা, রামায়ণ যন্ত্রে। ১৭৯৬ শকাব্দা।

এখানি পদ্য গ্রন্থ। দুই একটি কবিতা মন্দ নহে। দুই একটি নিতান্ত নীরস ও অসার। ইহার একটি গদ্য উপক্রমণিকা আছে। উপক্রমণিকা অতি পরিষ্কার, এবং বাক্যাড়ম্বর ও অনাবশ্যক বিস্তৃতি শূন্য কিন্তু ইহাতে অনেক ভ্রমাত্মক কথা আছে।

ললিতা সুন্দরী। প্রথম সর্গ। শ্রী অধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা। ১৯৩১

এখানি পদ্য। গ্রন্থকারের অনুরোধ, যে আমরা তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পংক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করি। লেখক অতি তরুণ বয়স্ক, আমরা জানিয়াছি। অতএব এখন তাঁহার এ আশা পূর্ণ না হইলেও তিনি রাগ করিতে পারেন না। যখন তিনি কোন উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন, তখনও আমরা প্রতি পংক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সমালোচিত করিতে পারিব না—ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাহা পাঁচবৎসরে সম্পন্ন হইতে পারে না—তবে সাধ্যানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব। উপস্থিত কাব্যে, নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।

স্বর্ণলতা নাটক। শ্রী দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কতক গুলি গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের, অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য। তাহা-

কেবল কবিই দেখিতে পান। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য—সেই জন্য নাটকের সৃষ্টি। বঙ্গদেশে নাটকের সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—মোহন্তের মোকদ্দামা, নাপিতের মোকদ্দামা—কুলীনের বহুবিবাহ—কি মজার শনিবার, ইত্যাদি বিষয়ের প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত হয়। কতকগুলি নাটককারের উদ্দেশ্য "সসিয়েল রিফরমেশ্যন।" এ সসিয়েল রিফরমেশ্যন অর্থে সমাজ সংস্করণ নহে—ইহার অর্থ বিলাতী রেওয়াজ। যদি দেশে এমত কোন প্রথা থাকে যে ইংরেজে তাহার বিপরীতাচরণ করে, তবে নাটকের দ্বারা তাহার নিন্দা করিতে হইবে। দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন, যে দেশী প্রথা সকল প্রায় পূর্ব্বগামী নাটককারগণ উৎসৃষ্ট করিয়াছেন—নীলের চাস হইতে তীর্থ ভক্তি পর্য্যন্ত কিছু বাঁকি নাই; অতএব তিনি "মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়" যে কত অনিষ্ট, তাহার বর্ণনা জন্য নাটক লিখিয়াছেন। নাটক খানি ৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতএব দেবেন্দ্র বাবুর দিন কোনমতে কাটিয়াগেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নাটককারেরা কি লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি। আমরা তাঁহাদিগের উপকারার্থ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটি বিষয় স্থির করিয়াছি—ভরসা করি, তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মনোনীত করিবেন। যথা বাঙ্গালি মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "মুরগী নাটক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। আর, এদেশে অশ্বের দ্বারা চাস না হইয়া বলদের দ্বারা চাস হয়, এই কুপ্রথার নিন্দার্থে "বলদ মহিমা" নামে আর এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। "রোড্ শেষ নাটক" "দুর্ভিক্ষ নাটক" প্রভৃতি নাটক এপর্য্যন্ত হয় নাই—ভরসা করি, শীঘ্র হইবে। হইলে, যেমন হউক, স্বর্ণলতা নাটকের অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে পারিবে না।

তত্ত্ব কুসুম। অর্থাৎ মনের প্রতি ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ। শ্রী দ্বারকানাথ ঘোষ প্রণীত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

"তত্ত্ব কুসুম" যদি এইরূপ, তত্ত্বের ফল না জানি কেমন? দ্বারকানাথ বাবু, অতি সরলপ্রকৃতির লোক সন্দেহ নাই। নচেৎ এ গ্রন্থ প্রচারিত করিতে কখন সাহস করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে গ্রন্থখানি আমরা পাইয়াছি, তাহাতে "দ্বিতীয় সংস্করণ" লেখা আছে। বাঙ্গালির পায় শত নমস্কার। তাঁহারা যদি ইহার প্রথম সংস্করণ কিনিয়া পড়িয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অসাধ্য কার্য্য নাই। এবং তাঁহাদের কোন ভরসাও নাই।

মহাগুরু নিপাতের পর অশৌচাবস্থায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার। "প্রত্ন কম্রনন্দিনী" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। কলিকাতা সত্য যন্ত্র। ১৭৯৬।

গ্রন্থারম্ভে লিখিত হইয়াছে "কোন মহাশয় ব্যক্তি, তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে অশৌচব্যবস্থার কর্ত্তব্য বিষয়ে একখানি ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার উত্তর প্রত্যুত্তরে একটি সুদীর্ঘ বিচার নিস্পন্ন হয়। ঐ সকল বাদানুবাদের পাঠে অনেকের উপকার হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাহা (গ্রন্থে) প্রকটীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রার্থই উদ্দেশ্য, বিবাদীর কেহই পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন না; অতএব তাঁহাদের পরিচয় না দেওয়াই বিধেয় হইয়াছে।"

বিবাদীরা পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন না, কিন্তু গ্রন্থখানি এই শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ। আর, পণ্ডিতদিগের কৃত স্মৃতি শাস্ত্র ঘটিত বিচারে যেরূপ অভদ্রতা, এবং গালির ব্যবহার পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে, ইহাতে তাহার কিছু মাত্র নাই। বিচারকেরা কেবল পণ্ডিত নহেন, বিশেষ ভদ্রলোক।

ঋতুবিলাস। "রিপু বিহার" রচয়িতা শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৭৯ সাল

এই গ্রন্থের উপরে লেখা আছে,

অসম কুসুম ফুল্ল বল্লরী নূতন।
পরিমলপূর্ণ কিনা দেখ ভৃঙ্গগণ॥

আমরা ভৃঙ্গ নহি—মনুষ্য জাতীয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দিই—এই জন্য বোধ হয় এ "বল্লরীতে" নূতন কিছু দেখিলাম না—বা পরিমল পাইলাম না।—উদাহরণ, গ্রন্থারম্ভেই

বসন্ত ঋতুর উদয়।

বসন্ত ঋতুপতি, সংহতি সদাগতি,
প্রবেশে সরসে এ ভুবনে।
ফুটনে ফুলকুল, লুঠনে সমাকুল,
মধুপ ধাইছে একমনে॥
নিকুঞ্জ মঞ্জ বনে, মাতিয়া বঁধু সনে,
কোকিল কলতি একতানে।
বঞ্জুল শাখাপরে, সারিকা থরে থরে,
রঞ্জিছে মন গুঞ্জন গানে॥
হেরিয়া কাল মধু, কাঁদিছে কোক-বধূ,
মোহিত দহিত কলেবরে।
ছাড়িয়া প্রাণকান্ত, অন্তর নহে শান্ত,
হায়রে! বিরহ বিষজ্বরে॥
মল্লিকা মুগ্ধভাতি, তাহাতে ভৃঙ্গপাঁতি,
পশিয়া ডাকিছে কলকলে।
অহো! আনন্দ মনে, স্বামীর আগমনে,
বাজাইছে কম্বু দল বলে॥
সলিলে সরোজিনী, সুবন প্রেমাধিনী,
হাসিয়া ভাসিছে সুখ-হ্রদে।
মনোজ যোধবর, হানিছে খরশর,
মাতিছে ধনিকা কামমদে॥

ইহাতে নূতন কি? পরিমল কোথায়? তবে এ গ্রন্থ "রিপুবিহারের" অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল।

গ্রন্থকার যে সকল দুরূহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, টীকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিয়াছেন। দুরূহ শব্দ ব্যবহারের এত

প্রয়োজন কি ছিল? অভিধান বিক্রেতা দিগের নিকট আমাদের নিবেদন—অভিধান গুলির একটু দাম বাড়াইবেন।

বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য।

সটীক। শ্রীরামকুমার নন্দী প্রণীত। শ্রীরামপুর। আলফ্রেড যন্ত্র। ১২৭৯শাল।

এখানি পদ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন, দেখিয়া, এই কবি, তাহার উত্তর দিয়াছেন। দত্ত-মহাশয় কেবল নায়িকার উক্তি সকল লিখিয়া গিয়াছেন; মেয়ে মানুষের কথা কে সহ্য করিতে পারে? রামকুমার বাবু তাহার উত্তর দিয়াছেন। পুরুষ জাতির মুখ রাখিয়াছেন সন্দেহ নাই।

মধ্যহইতে বাবু দক্ষিণাচরণ রায়, আসিয়া গ্রন্থভূমিকায় লেখকের এক জীবন চরিত লিখিয়া দিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

এই জীবন বৃত্তে, আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, এই উত্তরদায়ক কবি এক্ষণে কাছাড়ে ডিপুটি কমিশ্যনরের আফিশে একৌণ্টেণ্ট, এবং মনি অর্ডর এজেণ্ট। ইনি পূর্ব্বে আফিশে নকল নবিশ ছিলেন। বোধ হয়, পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দক্ষিণাবাবুর সমালোচনার উদাহরণ স্বরূপ, কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলা সম্বোধনে, কামদেবকে উল্লেখ করিয়া যে কয়েকটি পংক্তি লিখিয়াছেন, উহা বিশুদ্ধ রচনা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। শব্দ গুলি এমন ধ্বনিকারক যে অন্তঃস্থান পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতিধ্বনি সবলে প্রতিঘাত হইতে থাকে এবং অন্তঃকরণ যেন তৎসহ নৃত্য করিয়া উঠে এ কথা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন?

যথা,

'অনুভব মনোভব দুরন্ত প্রহারী,
কে সহে তাহার স্মর নশ্বর জগতে
নর নারী! হীন শক্তি তুহিন শিখরে,
আত্ম সম্বরণে শম্ভু শম্বরারি শরে,
বিহীন সম্বিত অজ অম্বুজ সম্ভব,
জম্ভভেদী শক্র, ভেদিলে যে কুসুমেষু
কুসম বিশিখে।"

শব্দ গুলি ধ্বনি কারকই বটে। সমালোচনা পড়িয়া, আমাদিগের সাধারণীর চানাচুর মনে পড়িল, "ইস্মে প্রাড্ বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায়, সহানুভূতি হ্যায়, উচ্ছৃখল হ্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন হ্যায়।" সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জন্য, গ্রন্থখানি সটীক করা হইয়াছে—কেন না রঘুবংশাদি সকলই সটীক; এবং হেমবাবু, মেঘনাদবধের টীকা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। টীকারও কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

পন্নগপতি—অনন্ত
দিতিসুত—অসুর
ত্রিদশ—দেবতা
ইন্দ্রজাল—ভোজবাজি, ভেলকি!

কাব্য সম্বন্ধে, কেবল ইহাই বলা প্রয়োজন, যে কাব্যখানি আদ্যোপান্ত বীরা-

ঙ্গনার অনুকরণ—অনুকরণের অনুকরণ—সুতরাং ইহাতে বিশেষ প্রশংসনীয় কিছু দেখা যায় না। স্থানে স্থানে, মাধুর্য্য আছে।

বৈদেহী বৈধব্য কাব্য। শ্রী অনাথ বন্ধু রায় প্রণীত। ঢাকা গিরিশ যন্ত্র।

এ গ্রন্থখানির বিষয় কুশীলবের পালা। রামপুত্রদিগের কথাবার্ত্তা গুলিও যাত্রার ন্যায় হইয়াছে। স্থানে স্থানে, কিঞ্চিৎ কবিত্ব দেখা যায়। অনেকস্থানে ইহা দুর্ব্বোধ্য, অর্থব্যক্তি ভালরূপে হয় নাই।

সুশ্রুত। প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান। বাঙ্গালা অনুবাদ এবং সংস্করণ শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। বিক্টোরিয়া যন্ত্র।

আধুনিক লোকের ইংরেজি চিকিৎসাতেই ভক্তি। আমাদিগের বোধ আছে, অন্যান্য বিদ্যায়, ইউরোপীয়দিগের যেরূপ প্রাধান্য, চিকিৎসা শাস্ত্রে সেরূপ নহে। দেশী চিকিৎসা প্রণালীতে অনেক সময়েই ইংরেজি চিকিৎসা অপেক্ষা সুসিদ্ধি জন্মিয়া থাকে। দেশী চিকিৎসা, বাঙ্গালা চিকিৎসা, উভয়ের গুণ, উভয়ের অভাব আছে। একের যাহা আছে, দ্বিতীয়ের তাহা নাই; দ্বিতীয়ের যাহা আছে, প্রথমের তাহা নাই। উভয়ে সংমিলিত হইলেই পরস্পরের অভাব পূর্ণ হইয়া সর্ব্ব রোগ শান্তিদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক্তারেরা প্রায় সংস্কৃত জানেন না, বৈদ্যেরা কেহই ইংরেজি জানেন না। এজন্য উভয়ের বিদ্যা অসম্পূর্ণ রহিতেছে। এক্ষণে যদি, দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়, তবে দেশী ডাক্তারগণ, তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারেন। অতএব অম্বিকা বাবুর এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং হিতকর। তাঁহাকে উৎসাহ দান করা, বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত তাহা অত্যন্ত দুরূহ—তিনি বিশেষ সাধুবাদের পাত্র। অনুবাদ অতি প্রাঞ্জল হইতেছে।

রামোদ্বাহ নাটক। অর্থাৎ রামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্র।

অশুভক্ষণে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত করিয়াছিলেন। ভরসা ছিল, বাঙ্গালার অঙ্গুলিকণ্ডুয়ন ব্যাধিগ্রস্ত মহাশয়েরা, বিষয়াভাবে কাব্যনাটক রচনায় বিমুখ হইবেন। কিন্তু রামায়ণ থাকিতে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রামের বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামের যুদ্ধ, কুশীলবের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়াবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপাঠ্য কাব্য নাটকের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে রত্ন আছে বলিয়া, অধ্যবসায়শালী বাঙ্গালি কবিগণ অবিরত লোণা জল সেচিতেছেন। সম্প্রতি আর একখানি রামোদ্বাহ নাটক উপস্থিত। রামোদ্বাহ বলিলে কেহ যদি না বুঝিতে পারেন, এই জন্য, গ্রন্থকার

বলিয়া দিয়াছেন, "অর্থাৎ শ্রীরামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন।" আমরা গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম। পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ এই নাটক হইতে একটি কৌশল্যা বিলাপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"কৌশ—[কপালে করাঘাত করিতে করিতে] যা! আবার আমার কপালে একি হলো! মহারাজ এই কথা কইতে কইতে এমন হলেন কেন! (গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিয়া) শক্ত মক্ত দেখ্চি যে! কি করি! মহারাজ বুঝি পুত্রশোকে প্রাণ পরিহার কল্লেন! (চরণ স্পর্শ করিয়া ক্রন্দন করিতে২) মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান করুন আপনকার ভূমিশয্যা কেন?—এরূপ অবস্থাবলোকনে বিষ বিন্দুর ন্যায় আমার নয়নে দরদরিত বারি ধারা বরিষণ হচ্চে। হৃদয় বল্লভ! ত্বরায় গাত্রোত্থান করুন্? আপনাকে নীতি শিক্ষা দেওয়া অবলাঙ্গনার বিধেয় নয়। আপনি এত কাতর হবেন না? অগ্রে প্রাণ ধন রঘুমনির তত্ত্বানুসন্ধানে সংখ্যাতিরিক্ত যুদ্ধোৎসাহী সেনাদিগকে পাঠাইয়া দিন্? পরে যাহা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাই কর্বেন—(চরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাম গণ্ডে হস্ত দিয়া) আহা! গুণমনি রাম বিনা যেন আমাকে বৎস হারা গাভীর ন্যায় করেচে! আর তৃষিতা চাতকিনী যদ্রূপ কাদম্বিনী সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা হয়ে উর্দ্ধদৃষ্টে অবিরত চঞ্চুব্যাদান করিতে থাকে, আমিও তদ্রূপ নীলমণির আসার আশায় রাজ-পন্থাবলোকন করিতে থাকি। আহা! আমার হৃদয় আকাশে আর কি সে রাম-চন্দ্রের উদয় হবে! তিনি যে অস্তাচলে!—তবে বাঁচনে সুখ কি—"

ত্রুটি কি? ইহাতে কপালে করাঘাত আছে, চরণস্পর্শ আছে, ভূমিশয্যা আছে, বিষবিন্দু আছে, হৃদয়বল্লভ আছে, চাতকিনী আছে, কাদম্বিনী আছে, নীলমনি আছে, নাই কি? যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে এক "আসার আশায়" তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সাধারণীর তেলে ভাজা চানাচুর কোথায় লাগে?

ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির আদিম অবস্থা।

শাসন প্রণালী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

পাঠক, তোমাকে সে দিন বলিয়াছি বিচার প্রণালী সাক্ষীর বিষয় ও সমাজ প্রথা আমূল বিজ্ঞাপন করিব। অদ্য এই তিন বিষয়ের কিছু কিছু শ্রবণ কর। তত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক পাঠ কর, দেখিবে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ কোন বিষয়েই অন্যের নিমিত্ত কিছু অবশিষ্ট রাখিয়া যান নাই। তুমি সভ্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ উহা কত কাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতিরা অভ্যাস করিয়াছেন। সাক্ষীর লক্ষণ, ব্যবসায়, আচার, ব্যবহার ও জাতি প্রভৃতি অবগত হইলে বুঝিবে ঋষিগণ ঐ বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুসরণে কত ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন।

প্রিয়দর্শন, অদ্য আমি তোমাদিগকে বিচারকের কর্ত্তব্য বলিব। তুমি আর্য্যজাতিকে স্বার্থপর বলিয়া বৃথা অপবাদ দিয়া থাক তোমার সে ভ্রম দূর করিবার ইচ্ছা করে।

দেখ আর্য্যভূপতিগণ কাহাকেও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেন না। যে ব্যক্তি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইত তাহাকেও অসৎকার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করিতেন। ধর্ম্মাধিকরণের অথবা বিচারাদির ব্যয় সঙ্কুলনার্থ কোন প্রকার কৌশলাদি দ্বারা প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক অর্থ গৃহীত হইত না। (১)

আর্য্যজাতির নিকট কোন ব্যক্তি বিচার প্রার্থী হইলে তাহাকে প্রতিজ্ঞা পত্রের [কাগচের] মূল্য (Court Fees) দিতে হইত না। প্রতিবাদীকেও উত্তরপক্ষ সমর্থন নিমিত্ত উত্তর পত্রের আলেখ্য জন্য পত্র শুল্ক দেওয়ার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ইহাদিগের নিকট হইতে পদাতিকের বেতনাদির সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নাই।

রাজকীয় সমস্ত ভৃত্যই রাজকোষ হইতে বেতন, ভৃতি, অন্নাচ্ছাদন এবং স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী বৃত্তিও ভোগ করিত। আর্য্যজাতির নিকট যে ব্যক্তির কার্য্য সুখকর, হিতকর ও প্রিয়তর বোধ হইত সে ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থা অথবা অন্য কোন হেতু বশতঃ প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে তদীয় পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের পুরস্কার প্রাপ্ত হইত।

পুরস্কার বা পেনসান (২) এ বিষয়টী

(১) শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধঞ্চ ভূতানামহিতঞ্চযৎ।
ন তৎপ্রবর্ত্তয়েদ্রাজা প্রবৃত্তঞ্চ নিবর্ত্তয়েৎ॥
মনু কাত্যায়ন।

(২) কচ্চিৎ পুরুষকারেণ পুরুষঃ কর্ম্মশোভয়ন্।

রাজার প্রসন্নতা অথবা ইচ্ছার উপর অধিক নির্ভর করিত না। রাজনীতির নিয়মানুসারেই বাধ্য ভৃত্য ও কর্ম্মচারী মাত্রেই রাজদত্ত বৃত্তি উপভোগ করিতে অধিকারী ছিল। সুতরাং কেহই অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট কিছু গ্রহণ করিতে সক্ষম ছিল না। যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিত রাজা তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহাকে স্বরাজ্যবহিষ্কৃত করিতেন।

এই কারণে পদাতিকেরাও অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট কিঞ্চিন্মাত্র লালসা রাখিত না।(৩)

রাজ ভৃত্য যদি তাহাদিগের ভরণপোষণ জন্য বিচারকের নিকট অভিযোগ করিত ধর্ম্মাধিকরণ অমনি মুক্ত হস্তে তাহার পক্ষে ডিক্রী দিতেন। আর্য্যেরা জানিতেন ভৃত্যবর্গ অবাধ্য হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং বেতনাদির বিষয়ে বড় গুণনিষ্ঠ ছিলেন। সামান্য ভৃত্যেরা শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দাস্য বৃত্তির নিষ্ক্রয় স্বরূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে ছয় পণ হইতে এক পণ পর্য্যন্ত দৈনিক বৃত্তি পাইত। উভয় ব্যক্তিই বর্ষ মধ্যে দুইবার পরিধেয় পাইবার যোগ্য বলিয়া অভিহিত, তাহাদিগের অন্ন সংস্থান জন্য প্রতি মাসে ধান্য প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উৎকৃষ্ট ভৃত্য ছয় মাস অন্তে ছয় যোড় কাপড় ও প্রত্যেক মাসে ছয় দ্রোণ পরিমিত ধান্য গ্রহণের অধিকারী; অপকৃষ্ট ভৃত্য মাসিক এক দ্রোণ পরিমিত ধান্য এবং ষান্মাসিকে এক যোড় বস্ত্র পাইত। চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়।' এক আঢ়ীর পরিমাণ চারি পুষ্কল। আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল কহা যায়। কুঞ্চির পরিমাণ অষ্ট মুষ্টি। বঙ্গভাষায় কুঞ্চির পরিবর্ত্তে কুণিকা খুঁচি হইয়াছে।[৪]

মুষ্টির পরিমাণকে ন্যূনকল্পে একছটাক ধরিলেও এক দ্রোণে এক মণ পাঁচসের ধান্য ধরা যায়—বোধ হয় মুষ্টিমধ্যে এতদপেক্ষা অধিক ধান্য ধরে। প্রিয়দর্শন, তুমি মনে করিতেছ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুই শ্রেণী দাস ছিল, মধ্যবিধ ভৃত্য ছিল না। তুমি কেন ভাব না ন্যূন সংখ্যার পরিমাণ এক পণ এক যোড় বস্ত্র, এক দ্রোণ ধান্য, ঊর্দ্ধ সংখ্যার পরিমাণ ছয় পণ, ছয় জোড় বস্ত্র ও ছয় দ্রোণ ধান্য পর্য্যন্ত

লভতে মানমধিকং ভূয়ো বা ভক্তবেতনম্॥৫৩

মহাভারত—সভাপর্ব্ব অধ্যায় ৫।

(৩) উৎকোচকাশ্চোপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা

মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃসহ॥২৫৮

মনু—অ ৯

(৪) পণোদেয়োঽবকৃষ্টস্য ষডুৎকৃষ্টস্য বেতনং।

ষান্মাসিক স্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ॥১২৬

মনু— অ ৭

অষ্টমুষ্টির্ভবেৎকুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌচ পুষ্কলং।
পুষ্কলানিতু চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
চতুরাঢ়কোভবেদ্দ্রোণ ইতি কুল্লুকভট্টধৃত মনুটীকা।

বিচারাসন হইতে ডিক্রী পাইত নতুবা মধ্যবিধ কিঙ্করের প্রতি মধ্যবিধ নিয়ম ছিল।

ভৃত্যগণের পরিচয় স্থলে উচ্চতম কর্ম্মচারিবর্গের উল্লেখ করা নিতান্ত দোষাবহ; এজন্য উহা এখানে পরিত্যক্ত হইল। স্থল বিশেষে দেখিতে পাইবেন।

বিচার প্রণালীর কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যের কথা উঠিয়াছে সুতরাং প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না। পদাতিক, তুমি বিচারাসনের উপকরণ মধ্যে গণ্য, কাজেই তোমাকে আসরে নামাইলাম, তুমি রাগ করিও না। এক্ষণে তোমাদিগের দোষে বিচার যত নষ্ট হয়, বোধ হয় পূর্ব্বে তাহার সহস্রাংশের একাংশও সে প্রকার হইত না। পদাতিক, তোমরা রাজার গূঢ় চর ও চক্ষু; তোমরা সুশীল হও, এই ইচ্ছা; অন্ধ হইও না।

অভিযোগ বিষয়।

অভিযোগ উপস্থিত করিবার সময় বাদীকে অগ্রে দোষনির্ম্মুক্ত প্রতিজ্ঞা, সংকারণান্বিত সাধ্য, লোক প্রসিদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতে হয়। ইহার বিপরীত হইলে অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না এবং প্রতিবাদীকেও উত্তর পক্ষ সমর্থন নিমিত্ত আহ্বান না করা বিচারাসনের রীতি ছিল না। ব্যবহার প্রকরণে প্রতিজ্ঞা পত্রই সার বস্তু; উহা সদোষ হইলে বাদী নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন। [৫]

বিচারক প্রথমতই দেখিবেন বাদী যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে সেগুলি প্রতিজ্ঞা পত্রে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে লিখিত, পূর্ব্বাপর সংলগ্ন, বিরুদ্ধ কারণ বিনির্ম্মুক্ত, বিরোধিবাক্যের প্রতিরোধক, অন্য প্রমাণে অকাট্য এবং লেখনটী অতি সুন্দররূপে ও স্বল্পাক্ষরে বিরচিত হইয়াছে তবেই গ্রহণ যোগ্য জ্ঞান করিবেন। এবম্বিধ পক্ষ গ্রহণান্তর প্রতিবাদীকে উত্তর পক্ষ সমর্থনজন্য বিচারাসন হইতে লেখ্য প্রেরণ দ্বারা আহ্বান করিবার রীতি। (৬)

বাদী যে সকল বাদ উত্থাপন করে সেই সকল বাদবাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা বাক্যের অর্থের নাম পক্ষ, বিচার্য্য বিষয় সার্থক কি না বিবেচনা অনুসারে দেখা কর্ত্তব্য, তদনুসারে বাদ উত্থাপন কালে দেশ কাল পাত্র, বর্ষ, মাস, কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি, দিন সংখ্যার নাম,

---

(৫) নারদ বচন যথা
সারস্তু ব্যবহারাণাং প্রতিজ্ঞা সমুদাহৃতা।
তদ্ধানৌ হীয়তে বাদী তরস্তামুত্তরো ভবেৎ॥

(৬) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।
উপস্থিতে বিবাদেতু বাদী-পক্ষং প্রকাশয়েৎ।
নিরবদ্যাং সৎপ্রতিজ্ঞং প্রমাণাগমসম্মতং॥
দেশকালং সমাং মাসং পক্ষাহো জাতি নামচ।
দ্রব্য সংখ্যোদয়ং পীড়াং ক্ষমা লিঙ্গঞ্চ লেখয়েৎ॥

উভয় পক্ষের নাম গোত্রাদি এবং পীড়া প্রদান, পরে প্রতিবাদী অভিযোগ নিবারণ জন্য বাদীর প্রতি ক্ষমা চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল কি না, ইত্যাদি তাবৎ বিষয় বিশেষতঃ সাধ্য, প্রমাণ, দ্রব্যসংখ্যা ও কি বিষয়ক অভিযোগ তৎসমুদায় প্রকাশ করিবে; এবং ঐ পত্রে উভয় পক্ষের বাসস্থান জাতি বয়ঃক্রম ও কাহার অধিকারে বাস তৎ সমস্ত পরিষ্কৃত রূপে ক্রমান্বয়ে লিখিত থাকিবে।(৭)

প্রতিবাদী যাবৎ কালপর্য্যন্ত উত্তর প্রদান না করে তাবৎ কাল মধ্যে বাদী নিজকৃত ভাষাপত্র সংশোধন করিতে অধিকারী।(৮)

উত্তর প্রদান হইলে ভাষা পত্রের ন্যূনাধিক্য পরিহার করিবার কাহারও ক্ষমতা থাকে না, প্রতিজ্ঞাপত্রকেই ভাষাপত্র কহা যায়। ভাষা পত্রের লেখক কায়স্থ ব্যক্তি। তাহার পরীক্ষক উদাসীন বিজ্ঞ ব্যক্তি। যে ব্যক্তির সঙ্গে কোন পক্ষের কোন সংশ্রব নাই তাহাকেই উদাসীন কহা যায়।

শাস্ত্রকারেরা কহেন শতরঞ্চাদি দ্যূতক্রীড়ায়, ব্রতে, যজ্ঞকর্ম্মে ও ব্যবহারাদি বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা নিজে ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না। উদাসীন ব্যক্তিরা তত্তাবৎ পুঙ্খানুপঙ্খ রূপে দেখিতে পান। তাঁহাদিগের দর্শনপথে ও বুদ্ধিমার্গে অন্যের দোষ গুণ পতিত হয় অতএব রাজদ্বারে যাইবার অগ্রে বিজ্ঞ ও উদাসীন ব্যক্তিকে ভাষাপত্র দেখাইবে। তদীয় পরামর্শে ভাষাপত্র পরিশুদ্ধ করিবে।(৯)

প্রিয়দর্শন! তুমি আমাকে একটা কথা

কাত্যায়ন সংহিতা {
নিবেশ্য কালং বর্ষঞ্চ মাসং পক্ষং তিথিং তথা।
বেলাং প্রদেশং বিষয়ং স্থানং জাত্যা কৃতী বয়ঃ॥
সাধ্য প্রমাণং দ্রব্যঞ্চ সংখ্যাং নাম তথাত্মনঃ।
রাজ্ঞাঞ্চ ক্রমশো নাম নিবাসং সাধ্যনামচ।
ক্রমাৎ পিতৃণাং নামানি লেখয়েৎ রাজসন্নিধৌ॥
}

প্রতিজ্ঞা দোষ নির্ম্মুক্তং সাধ্যং সৎকারণান্বিতং।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষ বিদো বিদুঃ॥

কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি।

স্বল্পাক্ষরঃ প্রভূতার্থো নিঃসন্দিগ্ধো নিরাকুলঃ।
বিরোধিকারণৈর্ম্মুক্তো বিরোধি প্রতিরোধকঃ॥
যদাত্বেবং বিধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ব্ব বাদিনা।
দদ্যাত্তৎ পক্ষ সম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরং॥

কাত্যায়ন।

(৭) বচনস্ত প্রতিজ্ঞাং তদর্থশ্চ পক্ষতা।
অসঙ্করেণ বক্তব্যং ব্যবহারেষু বাদিভিঃ॥

(৮) শোধয়েৎ পূর্ব্ব পক্ষন্তু যাবন্নোত্তর দর্শনং।
উত্তরেণাবরুদ্ধস্য নিবৃত্তং শোধনং ভবেৎ॥

(৯) শুচীন্ প্রজ্ঞান্ স্বধর্ম্মজ্ঞান্ কুরু মুদ্রা করাহিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্॥১০

পরাশর—আচারপ্রকরণ।

জিজ্ঞাসা করিতে পার, স্থল বিশেষে বাচনিক অভিযোগ হইত কি না। তাহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম ছিল। পাঠক, তুমি বুঝিয়াছ এরূপ স্থলে কি হইত? এখানে প্রাড়্‌বিবাক নিজেই অর্থীর স্বভাবোক্ত বাক্যগুলি শুনিয়া লিখন পূর্ব্বক ভাষা পত্রের প্রতিজ্ঞা, পক্ষ ও সাধ্য সংস্থাপন করিতেন। (১০) বাচনিক অভিযোগের বিষয় গুলি অগ্রে পাণ্ডু লেখ্য স্বরূপে কাষ্ঠ ফলকে লিখিত হইত, তৎ পরে তাহা অভিযোক্তাকে শ্রবণ করাণই প্রসিদ্ধ রীতি। উহা শ্রবণ করিয়া অভিযোক্তা যদি তদীয় তৎকালের বিস্মৃত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তবে তদ্বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক ফলকস্থিত পাণ্ডু লেখ্যের বিষয়গুলি যথাক্রমে প্রতিলিপি করিয়া প্রাড়্‌বিবাককে স্বহস্তে ভাষা পত্র সম্পন্ন করিতে হইত।

যে বিচারক অর্থিবাক্যের প্রতিকূল বাক্য লেখেন অথবা প্রত্যর্থীর উত্তর, বাক্য বিরুদ্ধ ভাবে অর্থীকে জ্ঞাপন করান, স্থল বিশেষে উভয় পক্ষেরই বিপর্য্যয় কথা লেখেন তিনি আর্য্য জাতির শাসন অনুসারে চৌর সদৃশ পাপী ও দণ্ডনীয় ব্যক্তি; রাজা এরূপ ব্যক্তিকে চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি প্রদান করিতেন। লেখক তোমাদিগকে একটী কথা বিজ্ঞাপন করি, তোমরা যদি সভ্যতাভিমানে মত্ত না হও তবে মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিবে! দেখ আর্য্য জাতির বিচার কার্য্য কতক্ষণ পরে নৃপতিসন্নিধানে উপস্থিত হয়। (১১)

তোমরা প্রথম বিচারস্থলকে নিম্ন আদালত বলিয়া থাক। দ্বিতীয় স্থলকে উচ্চ আদালত বা আপীল আদালত বল। তৃতীয় স্থলকে সর্ব্বোচ্চ কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে প্রধান বিচার স্থল নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাক। এই প্রকারে ক্রমশঃ দেশ শাসন কর্ত্তা হইতে রাজা বা রাজ্ঞী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে উচ্চ, উচ্চতর, ও উচ্চতম কহিয়া থাক, লেখকের ও সে প্রকার বলিবার পথ আছে।

মনু ও নারদ ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়াছেন প্রথমে বাদী প্রতিবাদীর স্বজনের নিকটে বিচার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, দ্বিতীয় কল্পে বাণিজ্য ব্যবসায়ী মধ্যস্থ বর্গদ্বারা বিচার নিষ্পত্তি মন্দনয়,

---

দাতেচ ব্যবহারেচ প্রবৃত্তে যজ্ঞ কর্ম্মণি।
যানি পশ্যন্ত্যু দাসীনাঃ কর্ত্তা তানি নপশ্যতি॥
ব্যাস সংহিতা।

(১০) পূর্ব্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽথ লেখয়েৎ।
পাণ্ডু লেখ্যেন ফলকে পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥
কাত্যায়ন।

(১১) অন্যদুক্তং লিখেদ্যোঽন্যৎ অর্থিপ্রত্যর্থিনাং বচঃ।
চৌরবৎ শাসয়েত্তন্তু ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ॥
কাত্যায়ন।

কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাত্বধিকৃতা নৃপাঃ।
প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাং গুরোরেবোত্তরোত্তরং।
মনু নারদৌ॥

তৃতীয় কল্পে সদ্বিদ্যাসম্পন্ন বিপ্রজাতির সভায় বিচার্য্য বিষয় নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদিগের পরেই নৃপতি সদস্য পরিবৃত প্রাড়্‌বিবাকাদিদ্বারা বিচার দর্শন সমাধা হওয়া উচিত। সর্ব্ব শেষে নৃপতি অমাত্য পরিবৃত হইয়া স্বয়ং বিচারদর্শন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম যথাক্রমে কুল, শ্রেণী, গণ, অধিকৃত ও নৃপতি শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রিয়দর্শন, তুমি অভিজ্ঞ, তোমার বুদ্ধিবিবেচনায় আর্য্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রকার দিগকে আধুনিক সভ্য জাতির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সচিব অপেক্ষা প্রগাঢ় বুদ্ধি বলিয়া বিশেষ অনুভব হয় কি? কি সমকক্ষ বা তোমার মতে হীনকল্পবলিয়া বোধ হয় তাঁহাদিগকে তুমি যাহাই জ্ঞান কর কিছু ক্ষতি নাই। তাঁহাদিগের পরামর্শ শুন তৎকৃত মীমাংসা দেখ অবশ্য তোমার ভক্তি হইবে। নৃপতি অথবা বিচারক অগ্রে বাদী প্রতিবাদীর ভ্রম প্রমাদ কথিত বিষয় গুলি নিরাস করিতেন। তৎপরে যথার্থ তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন। সদোষ অপ্রসিদ্ধ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বাদের খণ্ডন না করিয়া কদাচ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

পাঠক, তুমি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার সদোষ, অপ্রসিদ্ধ, নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক বিবাদের লক্ষণ বল তবে তোমরা বুঝিবে। (১২)

যে বিষয় দ্বারা বাদীর কোন প্রকার অনিষ্ট অথবা মানহানির সম্ভাবনা নাই তদ্রূপ বাক্যকে সদোষ বাদ কহা যায়। যেমন অমুক আমার প্রতি হাস্য করিয়াছে।

যাহা কখন ঘটে নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই, তদ্রূপ বাক্যে বাদ উত্থাপন করিলে তাহাকে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন কেহ কহিল আমার একটী গর্দ্দভ ছিল অমুক তাহার শৃঙ্গদ্বয় ভগ্ন করিয়া লইয়াছে। এ বাক্যকে কেনা অপ্রসিদ্ধ বলিবে।

কোন কোন স্থলে ব্যক্তি বিশেষের এ প্রকার স্বভাব আছে যে তাহাদিগের নিজের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা না থাকিলেও অন্যের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া বিবাদ করে; তদবস্থায় যে বাদ প্রতিবাদ তাহাকে নিষ্প্রয়োজন কহা গিয়া থাকে। সংসারে এমন ব্যক্তিও অনেক আছেন যাঁহারা নিজকৃত অপরাধকে দোষ বলিয়া গণ্য করিতে জানেন না এবং

(১২) অপ্রসিদ্ধং সদোষঞ্চ নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনং।
অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা রাজা পক্ষং বিবর্জ্জয়েৎ॥
বৃহস্পতি॥
নকেনচিৎ কৃতোযস্তু সোঽপ্রসিদ্ধ উদাহৃতঃ।
কার্য্যবাধবিহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো নিষ্প্রয়োজনং॥
অল্পাপরাধশ্চাল্পার্ত্তো নিরর্থক উদাহৃতঃ।
কার্য্যবাধ বিহীনশ্চ বিজ্ঞেয়ো নিষ্প্রয়োজনং॥
বৃহস্পতি।

অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তি বিশেষকে ভর্ৎসনা, তাড়না ও প্রহারাদি করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রতিফল স্বরূপ সামান্য লোক হইতে গ্লানিসূচক অপবাদ অথবা অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের বশে অভিযোগ করেন; তদবস্থায় ঐরূপ অভিযোগকে শাস্ত্র কারেরা নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্যাবতী স্ত্রীজাতিকে লেখক লীলাবতী বা লাবণ্যবতী বলিয়া সম্বোধন করিবে তোমরা তাহাতে রুষ্ট হইও না। তোমরাও লেখকের কথা শুনিয়া বিচার করিতে পার সুতরাং তোমাদিগকে যদি এখানে আহ্বান না করি তবে আমার সভ্য, অভিজ্ঞ, প্রিয়দর্শন পাঠকগণ আমাকে অসহৃদয় কহিবেন। তাঁহাদিগের মন স্তুষ্টি ও তোমাদিগের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য তোমাদিগকেও ডাকিব। তোমরা কোন শঙ্কা করিও না। তোমাদিগকে বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ও অক্ষমালা, নলের দময়ন্তী, কৃষ্ণের রুক্মিনী, সত্যবানের সাবিত্রী, শিবের পার্ব্বতী ও গৌরী, এবং অন্যান্য বিচক্ষণা সাধ্বী স্ত্রীলোক দিগের তুল্য জ্ঞান করি। তাঁহারা পুরুষদিগের সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে সকল বিষয় বিচার করিতে পারিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষাও বুদ্ধি বৈচিত্র প্রদর্শন করিতেন। তাই তোমাদিগকে স্মরণ করিলাম। রাম সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাদিগকে সীতার সমান বলিতে বাসনা করি না। সেই জন্যে তোমাদিগকে সীতা শব্দে আখ্যা দিলাম না। লক্ষ্মী অতি চঞ্চলা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে উপমা দিতে ইচ্ছাও করি না। সরস্বতী কহিলে উপমার স্থল থাকিবে না এজন্য সেটী বাদ দিলাম।

পাঠক তোমাকে সেদিন কহিয়াছি সাক্ষীর বিষয় আদ্যোপান্ত বলিব, অদ্য আরম্ভ করিলাম ভারতবর্ষের ঋষিগণ এ বিষয়ের যতদূর নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায় কহিব; তুমি দেখ তাঁহারা কোন্ কথা সভ্য জাতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন।

সাক্ষি প্রকরণ

কোন ঘটনা স্থলে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ না করিলে তদ্বিষয়ে সাক্ষী হইতে পারে না, অতএব সাক্ষী হইবার অগ্রে স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ অত্যাবশ্যক। যিনি সাক্ষিধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাঁহাকে সত্য বলা উচিত। সত্য কথায় ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যথা দৃষ্ট ও যথাশ্রুত বিষয় কহিবে কিন্তু ধর্ম্মাধিকরণে আহূত বা পরিপৃষ্ট না হইলে কদাচ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী দিবে না, তাহাতে পাপ লিখে। স্থল বিশেষে ও কার্য্য বিশেষে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষী দিবার বিধি দেখা যায়, তথায় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত সাক্ষ্য দানে অধর্ম্ম হয় না। বিধি ও নিষেধ স্থলে সাক্ষী সাক্ষ্য ব্যতিক্রম করিলে দণ্ড ও পাপ ভাগী হন।[১৩]

(১৩) সমক্ষদর্শনাৎসাক্ষী শ্রবণাচ্চৈব সিদ্ধতি।

সাক্ষ্য গ্রহণ কালাদি।

আর্য্যেরা সাক্ষ্য গ্রহণের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে ইহাই স্পষ্ট অনুমান হয় যে যখন জগতের সমস্ত প্রাণী সুস্থভাবে থাকে সেই সময়কেই ঋষিগণ সাক্ষ্য গ্রহণের প্রকৃত কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সে সময়ের নাম পূর্ব্বাহ্ন।[১৪]

সাক্ষ্য গ্রহণ ধর্ম্মাধিকরণের মধ্যেই হইত। দেব ও ব্রাহ্মণ সমীপে অর্থী প্রত্যর্থীর সমক্ষে প্রাড়্বিবাক অথবা রাজা স্বয়ং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেন। সাক্ষী ব্যক্তি পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া যথা দৃষ্ট ও যথা শ্রুত বিষয় সত্য প্রমাণ কহিত; সাক্ষ্য গ্রহণ সময়ে প্রাড়্বিবাক ও সভ্যগণ সাক্ষীর নিকট সত্যের প্রশংসা ও মিথ্যার দোষ প্রখ্যাপন করিতেন। সাক্ষীকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রশ্ন করা হইত। কেহ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আভাস দ্বারা সাক্ষীকে সহায়তা করিতেন না। অথবা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেন না।

কাহার সাক্ষী কে উহা তোমাকে বলি নাই। প্রিয় দর্শন, তুমি নিশ্চয় জানিবে, জাতি, বয়স, ধর্ম্ম, ব্যবসায়, শ্রেণী, কুল ও মর্য্যাদা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কার্য্য বিশেষে সাক্ষিযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

তত্র সত্যংব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং নহীয়তে ॥৭৪

যত্রানিবদ্ধোহপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন।
পৃষ্টস্তত্রাপি তদ্ব্রূয়াৎ যথা পৃষ্টং যথা শ্রুতং ॥৭০

মনু ৮ অ

যঃ সাক্ষীনৈব নির্দ্দিষ্টো না হুতোনৈব দেশিতঃ।
ব্রূয়াৎ মিথ্যেতি তথ্যংবা দণ্ড্যংসোপি নরাধিপৈঃ॥

মিতাক্ষরা ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন।

(১৪) দেব ব্রাহ্মণ সান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছে দৃতং দ্বিজান্।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোবাপি পূর্ব্বাহ্ণে বৈশুচিঃ শুচীন্ ॥৮৭

সভান্তঃসাক্ষিণঃ সর্ব্বানর্থিপ্রত্যর্থি সন্নিধৌ।
প্রাড়্বিবাকোহনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্ ॥৭৯

সত্যং সাক্ষী ব্রুবন্ সাক্ষ্যে লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চার্থ গতাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্ম নির্ম্মিতা ॥৮১

সাক্ষ্যেহনৃতং বদন্ সাক্ষী পাশৈর্বধ্যেত বারুণৈঃ।
বিবশঃ শত মায়াতি তস্মাৎসাক্ষী বদেদৃতং ॥৮২

আত্মৈবহ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণ মুত্তমং ॥৮৪

মন্যন্তেনৈবপাপকৃতো নকশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
তাংস্তদেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তর পুরুষঃ ॥৮৫

মনু—৮ অ

স্বভাবোক্তং বচস্তেষাং গ্রাহ্যং যদ্দোষ বর্জ্জিতং।
উক্তেহপি সাক্ষিণো রাজ্ঞা নপ্রষ্টব্যাঃ পুনঃ পুনঃ

নারদ সংহিতা

পাষণ্ড, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অপোগণ্ড বালক, ছলকারী, জটাধারী, ছদ্মবেশী লোক, স্ত্রীজাতি, ধূর্ত্ত প্রভৃতি যাবতীয় মন্দ সংসর্গী ব্যক্তি ও পথিককে আর্য্যেরা সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করিতেন না।

রাজা, সন্ন্যাসী বিদ্বান্ ও অতি বৃদ্ধবর্গকে সাক্ষ্য দান হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন; কেহ সাক্ষ্য মানিলে ইহাদিগকে সাক্ষী হইতে হইত না। এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে কাহাকেও কেহ সাক্ষী মানিলে সাক্ষ্যদান বিরহে সাক্ষীর ভর্ৎসনা ও নিগ্রহ হইত।(১৫) ইহা দণ্ডবিধির প্রকরণে দেখান যাইবে।

প্রিয়দর্শন, এখন তুমি কহিতে পার কেমন বিবাদে কোন ব্যক্তি কাহার সাক্ষী হইত উহা বল। আমি অগ্রে তাহাই কহিব তৎপরে সাক্ষীর লক্ষণাদি শুনিবে। সাক্ষিপ্রকরণ অত্যন্ত বিস্তৃত এক দিনে বলিলে তোমাদিগের মনস্তুষ্টি হইবে না; পড়িবে ও ক্লেশ বোধ হইবে অতএব ক্রমে ক্রমে বিষয়ান্তরের বিরাম স্থলে সমুদায় কহিব। অদ্য সমাজ সংস্কার উপনীত করিতে বাঞ্ছা করি।

সমাজের ক্ষমতা

প্রাচীন রাজর্ষিবর্গ দোষ সংশোধনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইঁহারা সমাজ বন্ধনের বল বুঝিয়াছিলেন। সমাজের কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। যদি কোন ব্যক্তি দোষী বলিয়া পরিগণিত হইত, রাজা তাহার সে দোষ সংশোধন নিমিত্ত যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিতেন এবং সমাজের অভিপ্রায় অনুসারে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে সংস্থাপন করিতেন। এইরূপে আর্য্য সমাজের বল বিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎকালে উন্মার্গপ্রস্থিত, কুলচ্যুত, শ্রেণী ভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গও বিনীত ভাবে রাজার নিকট আসিয়া নিজ দোষের দণ্ড গ্রহণ করিলে রাজা যথাযোগ্য দণ্ডপ্রদান পূর্ব্বক সমাজের নিকট উহার আত্মশুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেন। সে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিয়া সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে তৎকুলে ও সমাজের পথে প্রবেশ করিতে অধিকার দিতে পারিতেন। যে রাজা এইরূপ লোকহিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন তিনি লোকসমাজে অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশোলাভ করিতেন। এবং শাস্ত্রকারদিগের মতে এমন রাজার স্বর্গগমনপথ সদা

---

(১৫) দাসো নৈকৃতিকোঽশ্রাদ্ধ বৃদ্ধ স্ত্রী বালচক্রিকা।
মত্তোন্মত্ত প্রমত্তার্ত্ত কিতবা গ্রাম যাজকাঃ॥
মহাপথিক সামুদ্র বাল প্রব্রজিতাতুরাঃ।
বাদ্ধিক শ্রোত্রিয়া চারহীন ক্লীবকুশীলবৌ।
নাস্তিক ব্রাত্যদারাগ্নি যোগিনোঽযাজ্যযাজকাঃ।
একস্থানী সহাচারী নটচেবেতে সনাভয়ঃ॥
নারদ সংহিতা

উদ্ঘাটিত, তিনি চিরকাল স্বর্গে বাস করিবার যোগ্য। যখন তিনি স্বর্গগামী হন তখন দেবলোকেরাও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া বিরত থাকিতে পারেন না। প্রিয় দর্শন, এখন ক্রমেই সমাজের বল খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে দুর্দ্দশারও এক শেষ; এখন একবার সর্ব্বজন হিতকারী পরাশর মুনির কথিত এক জন হিন্দু ভূপতির আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক।(১৬]

উপাধি ও সম্মান

বিদেশি, তুমি মনে করিয়াছ আমি তোমাকে ভুলাইবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছি, তুমি একবার ভ্রমে বা স্বপ্নেও সে প্রকার চিন্তা করিও না। আমি অপ্রমাণ কোন কথা তোমার নিকট বলিব না। তুমি একবার প্রমাণ প্রয়োগগুলি অন্য ব্যক্তির নিকট মিলাইয়া দেখ। ঠিক্ মিলে যায় কি না। হে সভ্য। তোমাদিগকে নমস্কার, তোমরা যেমন পুরাতন জিনিস ঘসে মেজে নূতন বলিয়া বাহির কর এ জাতির মধ্যে সে প্রকার পাইবে না। ইহাদিগের পুরাতন দ্রব্যজাত যাহা আছে সেগুলির যদি কেহ একবার পর্দ্দা ঝাড়িয়া বাহির করে তবে তোমার প্রদর্শিত পরিপাটি নূতন দ্রব্যগুলি প্রাচীন আর্য্যজাতির নিকট পুরাতন ও কীটাকুলিত অথবা জর্জরিত বলিয়া বোধ হইবে।

তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুস্বামিগণকে, সামন্ত রাজাদিগকে, করদভূপতিবর্গকে ও মিত্র সম্রাট্ সমূহকে সম্মান করিয়া থাক, স্থল বিশেষে উপাধি দিয়া থাক, বিদ্বান্ মণ্ডলীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রদানকর; কার্য্য কুশল লোকদিগকে কেবল বাহবা দিয়া তাহাদিগের আকার গত বাহ্যভাব পরিত্যক্ত করিয়া কতক মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম বটে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মনে প্রবেশ করিতে পার না। আর্য্যেরা অন্ধকে পদ্মলোচন কহিতেন না। যদি কহিতেন অবশ্য তাহার দর্শন শক্তি দিতেন। ইহারা যাহাকে সম্মান বা উপাধি দিতেন তাহার আন্তরিক বল ও উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কেবল উপাধি পাইয়া তাহাকে অন্নসংস্থান জন্য অন্য লোকের উপাসনা করিতে হইত না। সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভরণপোষণের শক্তি প্রদান হইত। তাহার উন্নতির দ্বার রুদ্ধ থাকিত না, সে, সাধ্যসত্ত্বে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারিত।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান করেন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ফল পান; তদ্রূপ যে শরণাগত প্রতিপালন পূর্ব্বক গুণিগণের, বৃদ্ধজনের, সাধুশীলের, সামন্ত ভূপতি প্রভৃতির ও মণ্ডলদিগের সম্মান করেন তি-

---

(১৬) যস্ত্যক্ত মার্গাণি কুলানি রাজা
শ্রেণীশ্চ জাতিশ্চ গুণাশ্চ লোকান্।
আনীয় মার্গে বিদধাতি ধর্ম্মান্
নাকেঽপি গীর্ব্বাণ গণৈঃ প্রশস্তঃ॥

৮৫শ্লোক।

বৃহৎ পরাশর সংহিতা ৫অধ্যায় আচার প্রকরণ।

নিও সমস্ত যজ্ঞ ফলের অধিকারী এবং যে রাজা এবম্বিধ ব্যক্তির অসম্মানহেতু মনঃপীড়া জন্মান তিনি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হন ।(১৭)

(১৭) দণ্ডং দণ্ড্যেষু কুর্ব্বাণো রাজা যজ্ঞ
ফলং লভেৎ ।
বৃদ্ধান্ সাধূন্ দ্বিজান মৌলান যো ন
সম্মানয়েন্নৃপঃ ।
পীড়াং করোতি চামীষাং রাজা শীঘ্রং
ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥
পরাশর সংহিতা ২২শ্লো—১০ অধ্যায়

জৈনধর্ম্ম ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।

মহাবীর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন । সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব শাস্ত্রে(১) পণ্ডিত ৩০০ শত শ্রমণ, ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী,(২) ৭০০ শত কেবলী.(৩) ৫০০ শত মনোবিৎ, ৪০০ শত বাদী, একলক্ষ ঊনষষ্টি সহস্র শ্রাবক, এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গোতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গণধর সঙ্গে ছিল । মহাবীর এই সকল প্রগাঢ় চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন । পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয় । ইউরোপীয় পুরাবিৎগণের মতানুসারে শেষ তীর্থঙ্করের খৃষ্ট জন্মাইবার ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল ।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশতি জিন, তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপর্শ, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্প

(১) সূত্রিতানি গণধরৈ রঙ্গেভ্যঃ পূর্ব্বমেব যৎ । পূর্ব্বানিত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ । ইতি মহাবীর চরিতম্ । জৈনদিগের অঙ্গ শাস্ত্রের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্গ বা পূর্ব্বতন্ত্র বলে । পূর্ব্ব নামক শাস্ত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যায় বিভক্ত ॥

(২) "অসমাক্ দর্শনাদি গুণ জনিত ক্ষয়োপশম নিমিত্তমবিচ্ছিন্ন বিষয়ং জ্ঞান মবধিঃ ।" ইতি জৈন সূত্র বিবরণম্ । ভ্রমাদি দোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন (ধারা বাহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে ॥

(৩) সর্ব্বথাবরণ বিলয়ে চেতন স্বরূপা আবির্ভাবঃ কেবলং তদস্যাস্তি কেবলী ॥
হেমচন্দ্র টীকা ॥

দন্ত, শীতলা, শ্রেয়ংশ, বাসুপূজ্য, বিমলা, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্ত, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষে সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যমধ্যে পার্শ্বনাথ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যথা———

"তত্রাসীদশ্বসেনাখ্যো জিনাজ্ঞাকলনো নৃপঃ।
অভিরাম গুণোদ্দামা বামা বামাশয়াজনি॥
সর্ব্ব বামা শিরোরত্নং শীলধ্যানাস্য বল্লভা॥
সান্যদা যামিনী যামে তুর্য্যে বর্ষা-স্থাকরান্॥
শয়ানা শয়নীয়ে প্রাপশ্যৎ স্বপ্নাংশ্চতুর্দ্দশ॥
চৈত্রে সিতৌ চতুর্থ্যাং ভে বিশাখায়াং জিনেশ্বরঃ।
তদ্গর্ভে প্রাণতামগাচ্চ্যোতশ্চ জগত্রয়ে॥
পূর্ণেঽথকালে পৌষস্য দশম্যাং মিত্রভে স্থতম্।
সা স্থত শ্যামলং সর্পধ্বজমিজ্যং সুরাসুরৈঃ॥"

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামে অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম বামা। বামা দেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যেন চৈত্র শুক্ল চতুর্থীতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জৈনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে মিত্র দৈবত্ত নক্ষত্রে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাঁহার মাতা বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন। এ কথা মুখেও বলিতেন, অতঃপর ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন যথা——

অস্বাস্মিন্‌গর্ভগে পার্শ্বে সর্পং সর্পন্ত মৈক্ষত।
ইতীব নির্মমে তস্য পার্শ্ব ইত্যভিধাং পিতা॥

পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয় কালই নির্দ্দোষে অতিবাহিত হয়। পরে বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয় যথা——

"আয়ুর্ব্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেত শৈলং গতো
মাসেনানশনেন কর্ম্ম বিলয়ং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা॥
সার্দ্ধংতৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টম দিনে মাসে শুচৌ নির্বৃতে
রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতাস্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাথো জিনঃ।—

জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দ-

র্শন গ্রন্থ ও বস্তু নির্ণয়, তর্ক প্রণালী উদ্ভাবন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ এই, যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা গ্রন্থ নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল—

সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড, (গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র) আপ্ত নিশ্চয়ালঙ্কার (অহং চন্দ্র সূরি গ্রন্থকার) তৌতাতিক (তুতাতভট্ট গ্রন্থকার) বীতরাগস্তুতি। অর্হৎ প্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোগদেব (ইনি গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না) তত্ত্বার্থ সূত্র। অর্হত (ইনিও গ্রন্থ নির্ম্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই) পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য (ইনিও গ্রন্থকার) স্বরূপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রাচার্য্য। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্য্য (গ্রন্থকার) স্যাদ্বাদ। স্যাদ্বাদ মুঞ্জরী। জিনদত্ত সূরি প্রভৃতি (গ্রন্থকার)

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্ম প্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত সূরি বলিয়াছেন যথা—

জিন দত্ত সূরিণা জৈনং মতমিথ মুক্তম্।

বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দানলা-
ভয়োঃ।
অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্।
হিংসারত্য রতো রাগদ্বেষৌ রতি রতি
স্মরঃ।
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন
যস্য সঃ।
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানো-
পদেশকঃ।
জ্ঞান দর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তিনি।
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষ মনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি স-
প্ত বা।
জিবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোঽ
পিচ।
বন্ধো নির্জরণং মুক্তি রেষাং ব্যাখ্যাধু-
নোচ্যতে।
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ
সৎকর্ম্ম পুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপ-
র্য্যয়ঃ।
আশ্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বিযোজনম্॥
অষ্ট কর্ম্মক্ষয়ান্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈ-
শ্চন।
পুণ্যস্য সংশ্রবে পাপস্যাশ্রবে ক্রিয়তে
পুনঃ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকাগূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নির্ব্যাবৃত্তির্জিনো-
দিতা॥
সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃনিঃসঙ্গা জৈন-
সাধবঃ॥

লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাশিনোগৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যু র্জিনর্ষয়ঃ॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং মেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ইতি॥

মর্ম্ম এই—এই মতের উপাস্য দেবতা জিন। বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ যাঁহার নাই তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা, জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণ দ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্ক রীতির নাম স্যাদ্বাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক মতে ৯টী, এক মতে ৭টী। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সম্মিশ্র। এই সকল তত্ত্বের নাম জীব(১) অজীব(২) পুণ্য[৩] পাপ[৪] আশ্রব[৫] সম্বর[৬] বন্ধ[৭] নির্জরণ[৮] মুক্তি[৯]। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব—সৎকর্ম্ম সমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধন জনকতা আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জর—অষ্ট কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জারণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত, কেশ-সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরেরা উহা করে না। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্য লিঙ্গক—ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ" ক্ষিত্যাদি পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যে হেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য। যে বস্তু জন্য হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। এইরূপ ঈশ্বরানুমান জৈনেরা করে না। তাহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। তাহারা এই মাত্র বলে, যে, কোন সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর। যথা

সর্ব্বজ্ঞো জিত রাগাদি দোষ স্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থ বাদীচ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ। ইতি অহং চন্দ্র সূরি।

উহাদের ঈশ্বরানুমান প্রণালী এই যে, কোন এক আত্মা সর্ব্ব পদার্থ সাক্ষাৎকারী আছে, কারণ যখন দেখা যায় যে আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞান প্রতিবন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। যাহার জ্ঞান প্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ক কৌশল

আছে, তত্তাবতের অবতারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

জৈন মতে জীব দুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুই প্রকার, সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষা ক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত। ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ গণ্ডলোক প্রভৃতি দ্বি ইন্দ্রিয় ত্রি ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস ৪ প্রকার। পৃথিবী জল বৃক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাবগতি। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্র চর্চ্চা জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখস্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত উর্দ্ধ গমন। "গত্বাগত্য বিবর্ত্তন্তে চন্দ্র সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশ মাগতাঃ।" ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গি অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে, সাধারণতঃ তাহাদের পূজা পদ্ধতি মন্ত্র যথা "ওঁম্ শ্রীং—ঋষভেয় স্বস্তি—ওঁম্ মহ্বীংহম্,—ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য, আদি গুরুভ্যোনমঃ ওঁম্ হ্রীং শ্রীম্ সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ" ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা—

"নমো অরীহন্তানং নমো সিদ্ধানং নমো আয়রীয়াণং নমো উজ্জহ্যয়াণং নমো লোইসর্ব্বসাহূণং।"

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহে, তাহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানে যে—ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ। সর্ব্বসুখানাং প্রধানহেতুত্বাৎ। তস্যোৎপত্তির্মনুজাঃ। সারং তেনৈব মানুষ্যে। অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রেরই প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীব মধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন "স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ" স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল, ও "সাধূনাং আচারঃ" সাধু সম্মত আচার অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে "পুরুষ প্রধানত্বাৎ ধর্ম্মস্য" অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনুষ্যেরা উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। যতিগণেরকর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা—

চৈত্যো পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং সাম্বৎসরিক প্রতিক্রমণং মিথঃ সাধর্ম্মিকং শমনং অষ্টমং তপশ্চ।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ(১) সাধুদিগের বন্দনা করা [২] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান[৪] ইন্দ্রিয় দমন [৫] এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ ঘোষণা আছে

—"অমারী—ঘোষনাদ" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যু মুখে পতিত করিওনা।

জৈনধর্ম্মের এই মাত্র সার নীতি যথা—

"ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্ম্মং সনাতনম্।
স্বদেহেনাপি সত্বানাং বিধেহ্যুপকৃতিং তথা॥
তদ্বৈরিণ্যাপি মাবৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায়চ॥
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুর্মুক্তপরিগ্রহঃ।
দয়া প্রধানো ধর্ম্মশ্চ ত্রয়মেতৎ সদাস্তমে॥

[শত্রুঞ্জয় মহাত্ম্যম্]

যে সকল নীতি উদ্ধৃত হইল তাহা সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের সার ভাগ, সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম্ম তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে, তাহাতেই উদয়ানাচার্য্য কহেন—

"যত্বসাধারণো মুখ মণ্ডলী করণাদিঃ কেশোল্লুঞ্চনাদির্নাসৌ সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তে।"

"অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকা গ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন, প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

অমর সিংহ এবং হেমচন্দ্র দুই জন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোষকার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। অমর সিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ৫০০পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অমর সিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈন গ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, যতীশ্বর, বজ্রসেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীমন্, বিজয় সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলী জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক তরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর সূরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর সূরি ৪৭৭ শকে প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা।†

† "সপ্ত সপ্ততি মব্দানা মতিক্রম্য চতুঃ শতীন্।
বিক্রমাব্দাচ্ছিল্লাদিত্যো ভবিতা বিক্ষ বুদ্ধি কৃৎ।
"সপ্ত সপ্ত চতুঃ সরেঃ গতে বৈক্রম বৎসরে।

জগৎ সেঠেরসঙ্গে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এক্ষণে সুবিখ্যাত সেঠ বংশধরেরা জৈন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকর স্থান। তাঁহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহুব্যয়ে নির্ম্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ পূজারিরূপে নিযুক্ত আছে।

শ্রীরামদাস সেন।

"শ্রীশত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যং বক্তি ভক্তি প্রণোদিতঃ
বলাভ্যাং শ্রীসুরাষ্ট্রেশ শিলাদিত্যস্য চাগ্রহাৎ।"
ইতি শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যং।

‡ সরে—শতে। অয়মব্যয় শব্দঃ।

চন্দ্রশেখর।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

দরবারে।

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন—শেষ রাজা, কেন না, মীর কাসেমের পরে যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বারদিয়া, মুক্তাপ্রবাল রজত কাঞ্চন শোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ, মুক্তাহীরকমণ্ডিত হইয়া, শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরক খণ্ডরঞ্জিত করিয়া, দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ, যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দীগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইরফান বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।" নবাব, প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে, আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কে?"

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিলেন, যে এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিলেন, "এতকাল ইংরেজ নামে কালি

দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।” ফষ্টর, বলিলেন,

“আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।”

নবাব। তুমি কোন জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সে জন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন্—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া, হাসিলেন বলিলেন, “জানিলাম তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে।”

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক: কে বলিয়াছিল, যে চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইরফান চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখাইয়া কহিলেন, “ইহাকে চেন?”

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সম কোথায়? কুল্‌সমও আসিল।

নবাব ফষ্টরকে বলিলেন, “এই বাঁদীকে চেন?”

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইরফান, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ, এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন পক্ষে যাই। এই জন্য শত্রু পক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি-হিব্রাহিম খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন,

“কুল্‌সম! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে?”

কুল্‌সম, আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—“জাঁহাপনা! আমি এই আম দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক, মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন্! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন্।”

মহম্মদ তকি, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?”

কুল্‌সম, বিস্ফারিত লোচনে, গর্জ্জন

করিয়া, বলিতে লাগিল—“ আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই! যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর!”

ন। কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মাবতার! যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা কথা প্রশ্ন করুন্।”

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, “তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।”

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখরের নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—”

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল,—“আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।”

চন্দ্রশেখরের মুখ ম্লান হইল। নবাব অনুমতি করিলেন, “তবে শৈবলিনীকে আন।”

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী, রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলি ধূষরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফষ্টর শিহরিল,

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাকে চেন?”

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন্। আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুর দংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ, বিশুষ্ক হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে, ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল,—বলিল,

“আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন্।”

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিম্বদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষত মুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কু-

রেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধ ভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধ মৃত হইয়া প্রোথিত থাকে—কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্তপশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, উর্দ্ধনয়নে ডাকিতে লাগিল—"O Father! That art in Heaven! take pity on a poor erring soul! Thy will be done!" মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই—চিরকাল পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর!"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল!

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রু বিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত সেই দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদ গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে "আমি তোকে কুক্কুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূষরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল—"না।"

সকলেই শুনিল "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি কে করিল ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে বজ্র গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল যে "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে তাহা নহে সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায়

আসিবে তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই। কখন তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

পুনরপি বজ্রগম্ভীর শব্দে প্রশ্ন হইল, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন—"কি রাঁধিত?"

ফষ্টর—"কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।"

প্রশ্ন "জল?"

ফ। "গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।"

চন্দ্রশেখর, ফষ্টরের সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়া, ফষ্টরকে আলিঙ্গন দিতে চাহিলেন, এমত সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুব্রুম্ ধুব্রুম্ ধুম্ বুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও?" ইরফান্, কাতরস্বরে, বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম্ দুড়ুম্ বুম্" আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! শত শত কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীম নাদ লক্ষে লক্ষে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারিদিক্ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল; ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইল—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বু মধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! কি শুনিলে?"

চন্দ্রশেখর রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "গুরুদেব! যাহা শুনিলাম তাহা এ জন্মে কখন শুনিব, এমন ভরসা করি নাই। কিন্তু এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারি দিকে

গোলা বৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক্ ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব? আপনিই বা কেন এখানে আসিলেন?”

রমানন্দস্বামী বলিলেন, “চিন্তা নাই, —দেখিতেছ না, কোন্ দিগে যবন সেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্—বলবান্—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়নপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই।”

তিনজনে পলায়নোদ্যত যবন সেনার পশ্চাদ্গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে এক দল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দর্পিতপদে ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন, যে প্রতাপ।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “ও কিও প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।”

“আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্নস্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।”

এই বলিয়া প্রতাপ, তিনজনকে নিজক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি যবনশিবিরের নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমর ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমন কালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে শৈবলিনী সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা করিবেন?”

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, “এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া, ইহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।”

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ, বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, “আমার একটা কথা কাণে কাণে শুনিবে—আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।”

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন “তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?”

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখপ্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী,

তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "চুপ! এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব —কিন্তু তোমার অনুমতি সাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন—তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্ব কথা সকল তাঁহাকে বলিয়া; ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন—বলিলেন, "বলিও। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনি?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ, করিয়া, অশ্বে কষাঘাত পূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমন কালে চন্দ্রশেখর, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও?"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ, বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে। তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন। বলিলেন,

"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন—তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে—যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ, বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোক মুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন,

"প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?"

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কষাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া, রমানন্দস্বামী উ-

দ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। আজি সাক্ষাৎ না হয় কালি হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি। রমানন্দ-স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দস্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ, যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব, স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ "জল! জল!" করিয়া, আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা ভ্রাতা পিতা বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দস্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত, পদাতিক, রিক্তহস্তে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, রক্তে প্লাবিত হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না।

শ্রান্ত হইয়া রমানন্দস্বামী এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। সেই স্থান দিয়া একজন শিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দস্বামী, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে?"

শিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা? শিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া শিপাহী পলাইল।

রমানন্দস্বামী গড়ের দিগে গেলেন; দেখিলেন, যুদ্ধ নাই। কয়েক জন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্রে স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী, তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী, তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, সেই প্রতাপ!—আহত মৃতপ্রায়—এখনও জীবিত।

রমানন্দস্বামী, জল আনিয়া তাহার মুখে দিলেন। প্রতাপ, তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য, হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর!"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য!

আরোগ্যের—আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।”

রমানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম—কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?”

প্রতাপ বলিল, “আপনি, কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?”

স্বামী বলিলেন, “যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যে সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয় তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।”

প্রতাপ বলিলেন, “শৈবলিনী বলিয়াছিল, যে এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যে আমার পরম প্রীতির পাত্র, যে আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমর ক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।”

রমানন্দস্বামীর চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দস্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, “এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।”

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দস্বামী বলিতে লাগিলেন, “শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য, হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে?”

সুপ্ত সিংহ যেন, জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল—“কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যু কালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এজন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম।

আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দস্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্রে এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয় জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন, তোমারমত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দস্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে ধীরে, প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণশয্যায়, অনিন্দজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ! অনন্ত ধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেই খানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেই ধামে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভাল বাসিতে চাহিবে না।

পরিশিষ্ট।

লরেন্স ফষ্টর, নবাবের তাম্বুর বাহিরে আসিয়া, কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না; যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাঁহার শত্রু। বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরেজ সেনা এক দল যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল। ফষ্টর একজন মৃত যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদে ধরা পড়িলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক, তাঁহার পরা ছিল না।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন?"

ফষ্টর বলিল, "আমি লরেন্স ফষ্টর। মুসলমানেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।"

সার্জেণ্ট বলিল, "দুইজন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবে।" যুদ্ধাবসানে লরেন্সফষ্টর, ইংরেজ সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "জানি। লরেন্সফষ্টর, পলাতক রাজবিদ্রোহী—

যবনসেনামধ্যে পদ গ্রহণ করিয়াছে উহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইবে।"

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতি মত বিচার হইয়া ফষ্টরের ফাঁসি হইল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই জানিল যে শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আহ্লাদে, সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল। আহ্লাদে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে প্রায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই, পুনর্ব্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রমানন্দস্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

রমানন্দস্বামী প্রতাপের মৃত্যুসম্বাদ লইয়া আসিলেন। কেন, প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। চন্দ্রশেখর, অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, উদয় নালার মাঠে গিয়া, প্রতাপের দেহ লইয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। কিয়দ্দিবস, প্রতাপের শোকে, এরূপ অধীর হইয়া রহিলেন, যে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রমানন্দস্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয় নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎ সেঠদিগকে গঙ্গা জলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুর্‌গণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশক্রমে উদয় নালা যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয় নালা পর্য্যন্ত, যান নাই—নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। ভাব গতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব সৈন্যাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুর্‌গণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন—বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।

কুল্‌সম, যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের ভৃত্যবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। কাসেম আলি ফকিরি গ্রহণ করিলে, সে মীর জাফেরের অবরোধে নিযুক্ত হইল। দলনীকে কখন ভুলিল না।

সমাপ্ত।

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প।*

একদল মনুষ্য বলেন, যে এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা, সুখাভিলাষী তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্ম্মে, কেহ অধর্ম্মে; কাহার সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথাও কর। সুন্দর ফুল গুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও,—ঘটী বাটী পিতল কাঁশা ও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্নে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্য তৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্য তৃষা যে রূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপ সংস্পর্শ শূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু, অনেক সময়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্য্য জনিত সুখ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যে টুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্য জনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

* সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্য জাতির শিল্পচাতুরি, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত। কলিকাতা। ১৯৩০।

দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয়, বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনেকরিতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগ জনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ, পৌনঃপুণ্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ, চিরনূতন, এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া, নেড়ার গীত গাইয়া মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট্ বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকলে, প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালিবাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ চূড়ামণি গ্লাডষ্টোন্, স্কটলণ্ড জাত মনুষ্যদিগের মধ্যে, হিউম্ আদাম স্মিথ হণ্টর, কার্লাইল থাকিতে ওয়াল্টর স্কটকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্প বিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায় ভেদে, সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির, কেবল বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই। যথা ইন্দ্রধনু, আকাশ প্রভৃতি

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে, যথা পুষ্প।

কতকগুলির, বর্ণ, ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে, যথা উরগ।

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি, ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল।

মনুষ্যের, বর্ণ, আকার, গতি, ও রব, ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী, বর্ণ, আকার, গতি, রব, ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্র বিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন, আকার তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদ্যের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব, যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, শ্রীমাণি বাবু তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দিয়াছেন। নামটি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। যদি কালিদাস প্রেতাবস্থায় শুনিতে পান যে কুমার সম্ভব, শকুন্তলা রচনা, "শিল্প" বিদ্যা মাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই, এবং যে শিল্প বিদ্যার প্রভাবে ইলোরার প্রকাণ্ড গুহাট্টালিকা খোদিত হইয়াছিল, তাহাকে "সূক্ষ্ম" বলা একটু অসঙ্গত হয়। যাহাহউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না।

কাব্যের সঙ্গে, অন্যান্য "সূক্ষ্মশিল্পের," এত প্রকৃতিগত বিভেদ, যে এক্ষণে, অনেকেই ইহাকে আর "সূক্ষ্ম শিল্প" মধ্যে গণ্য করেন না; নৃত্য গীত, সামাজিক সামগ্রী, একা বিদ্বানের নহে, সুতরাং উহাও একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং "সূক্ষ্ম শিল্প" নাম করিলে, আপাততঃ চিত্র, ভাস্কর্য্য, এবং স্থাপত্যই মনে পড়ে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমাণির গ্রন্থের বিষয়, কেবল এই তিন বিদ্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, এই তিন বিদ্যার কিরূপ প্রচার এবং উন্নতি ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে, সাধারণতঃ সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য।

তৎপরে গ্রন্থকার, অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এ দেশের শিল্পকার্য্য যে প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু শ্রীমাণি বাবু ইহার যেরূপ প্রাচীনতা প্রতিজ্ঞাত করিয়াছেন, সেরূপ প্রাচীনতা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। অশোকের পূর্ব্বকালিক স্থাপত্য বিদ্যার কোন চিহ্ন এ দেশে যে বর্ত্তমান নাই, তাহা আপাততঃ স্বীকার করিতে হইবে।

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর কোন জাতির অপেক্ষায় স্থাপত্য দক্ষতায় ন্যূন ছিলেন না। ভারতবর্ষীয়েরা, কাব্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় প্রাধান্যলাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু স্থাপত্যে যেরূপ তাঁহাদিগের প্রাধান্য প্রতিবাদের অতীত, বোধ হয়, সেরূপ আর কোন বিদ্যায় নহে। ফর্গুসন সাহেবের যে কয়টি কথা শ্রীমাণি বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও তাহা পুনরুদ্ধৃত না ক-

করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, যে:—

"ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত পৃথক্ যে, মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সংস্কারোৎপত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোন জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। * * * ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বহ্বায়াস-সাধ্য-গঠন নৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। ইহার অলঙ্কার প্রাচুর্য্যই আশ্চর্য্য ভাব উদ্দীপক এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠনগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকলের সৌন্দর্য্য ও মাধুরি এবং প্রধান গঠনটীর সহিত সে সকলের উপযোগিতা, সর্ব্বস্থলেই দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

"ভারতবর্ষীয়েরা স্তম্ভের বিশেষ বিশেষ অংশ ও ভূষণের দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ে ইজিপ্ত এবং গ্রীশীয়দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পিল্লার ভূষণ এবং যে সকল মনুষ্য-মূর্ত্তি ইমারত বহন করে (Caryatides) তৎসম্বন্ধে তাঁহারা উক্ত উভয় জাতিকে পরাজয় করিয়াছেন।"

শ্রীমানি বাবু ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যে সকল ভূগর্ভ এবং পর্ব্বতাভ্যন্তরে খোদিত হইয়া প্রস্তুত; দ্বিতীয়, যে সকল পর্ব্বতের বাহ্যাভ্যন্তরে উভয়েই খোদিত, এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত।

প্রথম শ্রেণীর স্থাপত্যের উদাহরণ স্বরূপ ইলোরার গুহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্য্যে যত প্রকার গঠন ও অলঙ্কার পারিপাট্য থাকিতে পারে সে সকলই এই গুহা সকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, গুম্বজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য—ইহার কিছুরই অভাব নাই।"

"অত্রত্য গৃহ সকল প্রায় দ্বিতল। কোন কোনটী তিনতলও আছে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎপ্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌গুহাস্থ ইন্দ্র সভা অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিণী; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের ন্যায় নহে—একটী হাঁড়ী বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম পাপ্‌ড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন-প্রণালী কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু উল্‌টা হাঁড়ী বলিয়া আমাদিগের অনাদর করা উচিত নহে। কারণ, হাঁড়ীর গঠন কিছু বিশ্রী নহে, প্রত্যুতঃ শ্রীসম্পন্ন, তাহাতে ইহার মনোহর ভাস্কর্য্য, এবং

সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ-সংযুক্ত-গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। অপরন্তু, এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিম্নে আম্লাশিলার (আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তূলাকার ও পল বিশিষ্ট বলিয়া আম্লাশিলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত। এই গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলক-শ্রেণী বা গরাদিয়া সকল কর্ত্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশ দ্বার অতীব মনোহর গঠনে গঠিত—দ্বাদশটী সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য খচিত ইহার দিব্য গুম্বজ অদ্যাপিও সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় চিত্রপটে ইন্দ্র সভার যে চিত্র প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারা পাঠক ইহার সুচারু রচনাচাতুর্য্য কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।"

"ইন্দ্র সভার অন্তঃপাতি তিনটী গুহা আছে। একটি ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪৮ পাদ প্রস্থ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধ-মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে; ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বিতীয়-গুহা-গর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানীর মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত আছে। তৃতীয় গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে গজারূঢ়-পুরুষ এবং শার্দ্দূল-পৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মূর্ত্তি থাকায়, ইহাদিগকে ইন্দ্র ও শচী অনুমানে ব্রাহ্মণেরা এই গুহাত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা রাখিয়াছেন। কিন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রীমূর্ত্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"'ডুমার লয়না' অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অনেক দেব দেবীরও মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে।

"ইলোরার আর একটী প্রসিদ্ধ গুহার নাম 'কৈলাস'; ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখানা আছে, এবং এতন্মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতাদিগের লীলাপ্রকাশক মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, ইহা পাঁচটী মন্দিরে সম্পূর্ণ। মধ্যস্থ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দির সকল খোদিত গজ ও শার্দ্দূলযুক্ত উপানোপরি স্থাপিত। এই গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটী চাঁদনীর মধ্যে এত দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে যে, ইহাকে

হিন্দুদেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসমুদয়ই পর্ব্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুম্বজ এবং অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি—এ সকলই এক খণ্ড প্রস্তর, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে। এই সমস্ত পর্ব্বত খোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।"

"দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপতি কীর্ত্তি সকলের মধ্যে চিলামব্রুমের মন্দিরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"চিলামব্রুমের মন্দিরগুলি ১৩৩২ পাদ দীর্ঘ, ৯৩৬ পাদ প্রস্থ, এবং ৩০ পাদ উচ্চ ও ৭ পাদ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রায় মধ্যস্থলে ও ঈষৎ পূর্ব্বদিকে একটি চমৎকার বৃহদাকার মন্দির আছে। ইহা দীর্ঘে ২২৪ পাদ এবং প্রস্থে ৬৪ পাদ; ইহার সম্মুখে এক চাঁদনী আছে, উহা সহস্র স্তম্ভে সুশোভিত! উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তি সকল ভারতবর্ষীয় যাবতীয় দেব দেবীর আদর্শে খোদিত। কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে যে, তাহা ভূমণ্ডলের অন্য কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুষ্কোণাকার-স্তম্ভ-শ্রেণী-সংলগ্ন এক প্রস্তর-শৃঙ্খল খোদিত আছে, তাহা দীর্ঘে ১৪৬ পাদ এবং তাহার প্রত্যেক কড়া তিন পাদ দীর্ঘ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ভিত্তিসংলগ্ন নহে, কেবল মাত্র স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সংযোজিত, অবশিষ্টাংশ শূন্যে ঝুলিয়া আছে। অপর এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এরূপ উৎকৃষ্ট খোদিত মূর্ত্তি সকল এবং এরূপ দুইটী মনোহর শোভা-সম্পন্ন পিল্লা আছে যে, প্রসিদ্ধ শিল্প-নিপুণ গ্রীকজাতিও উক্ত প্রকার গঠনে ঐরূপ অলঙ্কার যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

মহাবালীপুরের মন্দিরের প্রসঙ্গে লিখিত আছে, যে "এই নগরস্থ প্রধান মন্দিরে সাতিশয় সুন্দর গঠনে সুশোভিত মনুষ্য-মূর্ত্তি সকল অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। একজন ইউরোপীয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের কোন কোন অংশ বিশেষতঃ মুখশ্রী, সুবিখ্যাত ভাস্করবিদ্যা-বিশারদ কানবা কৃত মূর্ত্তি সকলের তুল্য।"

তৃতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যের প্রধান উদাহরণ, ভুবনেশ্বর। আবু পর্ব্বতস্থ জৈন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অলঙ্কার সম্বন্ধে শ্রীমাণি বাবু লিখিয়াছেন, যে তাহার সাদৃশ্য বোধ হয় ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

"বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহ্বায়াসসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা ইহার চাঁদনী লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন

যে, সে কৃষ্টফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দির সকল এই জৈন চাঁদ্‌নীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্ত্তি ১০৩২ খ্রীঃঅব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০-০০০০ অষ্টাদশ কোটী টাকা এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।”

ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যের দুইটী মাত্র দোষের উল্লেখ আছে, বিজনতা এবং আলোকাভাব।

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব, স্থাপত্য গৌরবের ন্যায় নহে, তথাপি আমাদিগের প্রাচীন ভাস্কর্য্য, আধুনিক দেশী ভাস্কর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণে প্রশংসনীয়।

শ্রীমানি বাবু কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,

“বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক সাহেব মহোদয় ভুবনেশ্বরান্তর্গত এক মন্দিরভিত্তিতে একটী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তিনি বলেন যে উহা কোমল ও সুখস্পর্শ রক্ত মাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না! বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয় ভাস্কর্য্যের ইহা একটী প্রধান ধর্ম্ম—সর্ব্বত্রেই ইহার গৌরবের কথা শ্রবণগোচর হয়। পাঠক! বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে এইরূপ সুখস্পর্শ ও কোমল গঠন এবং মনোহর অঙ্গবিন্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের লক্ষণ। অতএব আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন যে আর্য্যগণ এই সকল উৎকৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্ত্যাদি বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! এই জাতীয় শিল্পের অপর একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম “প্রয়োজন সিদ্ধি” অর্থাৎ, শিল্পী পুত্তলিকাদিগকে যে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন দৃষ্টি মাত্রে দর্শকের মনে সেই সেই উদ্দেশ্য-সাধনভাবের উপলব্ধি হয়। আমি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিক ভাস্কর্য্যে এই মহদ্‌গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন!”

পরে মথুরার বিখ্যাত পুত্তলিকা সকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে উহা গ্রীকশিল্পিনির্ম্মিত সাইলেনসের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করেন। শ্রীমানি বাবু এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে উহা হিন্দু শিল্পকরের খোদিত, কৃষ্ণলীলা বর্ণন। সাইলেনস নহে—বলরাম। যদি এই ভাস্কর্য্য হিন্দু প্রণীত

* গ্রীক্ জাতিরা মথুরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, এ কথা অসম্ভব বলিয়া শ্রীমানি মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর। হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, যে গ্রীক্‌জাতীয়েরা মধ্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিত। মহাভাষ্যের বিখ্যাত উদাহরণ “অরুণৎ যবনো সাকেতম্”, শ্রীমানি মহাশয় কি বিস্মৃত হইয়াছেন? যখন গ্রীকেরা অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছিল, তখন মথুরায় না আসিবে কেন?

হয়, তবে সে হিন্দু গ্রীকদিগের নিকট শিল্প শিক্ষা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহার বিশেষ চিহ্ন আছে। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নশ্বর চিত্রপট, অযত্নে রাখিলে, প্রস্তরাদির ন্যায় অধিককাল স্থায়ী হয় না; এজন্য শ্রীমানি বাবু অজন্তা ও বাঘের গুহাস্থিত ফ্রেস্কো পেণ্টিং ভিন্ন আর কোন চিত্রের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ তাঁহাকে নাটকের সাক্ষিতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সে প্রমাণ আমরা বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচনা করি না; কবির স্বভাব এই যে প্রকৃত অনুৎকৃষ্ট হইলেও, তাহাকে উৎকর্ষ প্রদান করেন। উত্তরচরিত ও শকুন্তলায় যে চিত্র বিদ্যার পরিচয় আছে, ততদূর নৈপুণ্য যে ভারতবর্ষীয়েরা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

যাহাহউক, শ্রীমানি বাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে শ্রীমানি বাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত, এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টিলাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এত কথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি।

উপসংহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটা কথা নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালি বাবুদিগের নিকট সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধে কোন কথা বলা, দুই চারি জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন, অন্যের কাছে, ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌন্দর্য্যানুরাগিণী প্রবৃত্তি, বোধ হয় এত অল্প অন্য কোন সভ্যজাতির নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই, সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং বাঙ্গালিরা এখনও যে সভ্যপদ বাচ্য নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। তাঁহারা গৃহিণীর মুখখানি সুন্দর দেখিতে ভালবাসেন বটে—এবং কতকটা পুত্রবধূর সম্বন্ধেও তাই, কিন্তু অন্যত্র সে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তত বলবতী নহে। সঙ্গতি থাকিলেও ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া বালিশ, দুর্গন্ধ মসি এবং তৈল চিত্রিত জাজিম, আমরা বড় ভালবাসি। পরিধেয় সম্বন্ধে রজককে বঞ্চনা করাই বাঙ্গালি জাতির জীবনযাত্রার একটি প্রধান বীরত্ব। গৃহমধ্যে, পূতিগন্ধবিশিষ্ট, কদর্য্য কীটসঙ্কুল, দৃষ্টিপীড়ক কতকগুলি স্থান না থাকিলে বাঙ্গালির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বরং বন্যপশু পরিষ্কৃতাবস্থায় থাকে, তথাপি বাঙ্গালি নহে। ঈদৃশ জাতির সৌন্দর্য্যস্পৃহা কোথায়? এবং যে বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, তাহার আদর কি প্রকারে সম্ভবে? সুতরাং বাঙ্গালার সূক্ষ্ম শিল্পের এত দুর্দ্দশা।

স্বীকার করি, সকল দোষ টুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ;—পূর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তা-

তাতেই অসংখ্য সন্তান সন্ততি লইয়া গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা, বাঙ্গালির দারিদ্র জন্য। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও, সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ; যে ধর্ম্মানুসারে, উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তুত হর্ম্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও, দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি, করিয়া শত মুদ্রায়, কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য, ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকল নবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অনুকরণ স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। সৌন্দর্য্যবিচার শক্তি, সৌন্দর্য্য রসাস্বাদন সুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।

ঐতিহাসিক ভ্রম।

অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে বাঙ্গালিরা কখনও বিদেশ বিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যেদিন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেনবংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।

কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বলা আবশ্যক হইতেছে যে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালি বলিতে আমরা কি বুঝি। সর্ব্ববাদিসম্মত কথা কহিবার উদ্দেশে আমরা মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম এ কয়েকটীকে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিব। সুতরাং আমাদিগের অবলম্বিত বাঙ্গালার চতুঃসীমা এইরূপ হইতেছে; উত্তরে, সিকিম ও ভোটরাজ্য এবং গারো ও খস পাহাড়; পশ্চিমে, মহানন্দানদী এবং রাজমহল ও ছোটনাগপুরের পাহাড়; দক্ষিণে, সুবর্ণরেখানদী ও বঙ্গসাগর; পূর্ব্বে, চট্টগ্রামলুসাই মনিপুর-পাহাড়শ্রেণী ও আসাম প্রদেশ। এই চতুঃসীমাবদ্ধস্থানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি। যদিও বাঙ্গালা ভাষা আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙ্গালিরা উড়িষ্যা, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি বঙ্গদেশবহিঃস্থ বাঙ্গালির সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গদেশের আর্য্যরাজত্বকালের পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং আমাদিগকে বিদেশীয় লেখক ও প্রাচীন অনুশাসন পত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে যে এগুলি লিখিত দেশীয় ইতিহাস অপেক্ষাও প্রামাণ্য।

মহাবংশ, রাজরত্নাকরী ও রাজাবলী এ তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে সিংহলের পূর্ব্ববিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই তিনখানিতেই এই মর্ম্মের কথা আছে যে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ, প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইলে, সাত শত সঙ্গী লইয়া অর্ণবপোত আরোহণ করেন এবং অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সেখানকার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন;

অনন্তর বিজয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিয়া মন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার ঐতিহাসিক রাজবংশের আদিপুরুষ; এবং সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবনলীলা সমাপ্ত হয়, সেই বৎসর বিজয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মত এই যে বুদ্ধ দেবের তিরোভাব খ্রীষ্টাব্দের ৫৪৩ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটে; কেবল ভট্টমোক্ষমূলর সাহেব এই ঘটনার কাল খ্রীঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর বলিয়া স্থির করেন। যাহাহউক, স্বীকার করিতে হইতেছে যে খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালিরা, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির ন্যায়, সমুদ্রপথে সাহস পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া বিদেশ বিজয় করিয়াছিল।

বিদেশীয় লেখক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা দুইখানি অনুশাসন পত্রের কথা বলিব। একখানি মুঙ্গেরে ও অপরখানি বুদাল নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ দুইখানির ইংরাজী অনুবাদ এসিয়াটিক রিসার্চ্চের প্রথম খণ্ডে আছে।(১) প্রথমখানি গৌড়াধিপতি দেবপাল দেবের প্রদত্ত। উহাতে লিখিত আছে যে তাঁহার বিজয়ি সেনা তখন মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ মুঙ্গেরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; সেখানে বর্ত্মের জন্য নদীর উপর যে নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকে পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিত; সেখানে উত্তরদেশীয় নরপতিগণ এত অশ্ব পাঠাইতেন, যে তাহাদিগের পদধূলীতে দিক্ অন্ধকার হইত; সেখানে জম্বুদ্বীপের এত ক্ষমতাশালী নৃপালগণ সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিতেছিলেন যে তাঁহাদিগের পরিচারকবর্গের পদভরে পৃথিবী বসিয়া যাইতেছিল।(২) বিজয়িসেনা ও সামন্ত ভূপতি নিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দেবপাল যে অনুশাসন পত্র বাহির করিতেছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিতেছেন যে গঙ্গোত্তরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এবং লক্ষ্মীকূল হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত, সমুদায় স্থান তিনি জয় করিয়াছিলেন; এবং যুদ্ধার্থে তাঁহার ঘোটক সকল কাম্বোজদেশে উপস্থিত হইয়া কান্তা সন্দর্শনে আনন্দধ্বনি করি-

(১) See Asiatic Researches Vol.1

(২) "At Moodgo—ghiri where is encamped his victorious army; across whose rivor is constructed for a road a bridge of boats, which is mistakon for a chain of mountains; ...whither the Princes of the North send so many troops of horse that the dust of thier hoops spreads darkness on all sides; whither so many mighty chiefs of Jamboo Dwipa resort to pay their respects, that the earth sinks beneath the weight of the feet of their attendants. There Deva Paladeva (who walking in the foot-steps of the mighty Lord of the great Soogots ...issues his commands."

য়াছিল।(৩) লক্ষীকুল পূর্ব্বদেশীয় লক্ষী-পুর, এবং কাম্বোজদেশ রঘুবংশ দৃষ্টে সিন্ধুনদের অপর পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। রঘু পারসীক ও হূণদিগকে পরাজিত করিয়া কাম্বোজদেশীয় রাজগণকে আক্রমণ করেন; এবং উক্ত দেশে উৎকৃষ্ট অশ্বের উল্লেখও দেখা যায়।(৪) মুঙ্গেরের অনুশাসন পত্র পাঠ করিয়া বোধ হয় যে গৌড়াধিপ দেবপাল দেব সমুদয় ভারতভূমির রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। বুদালের প্রস্তর লেখ্য দ্বারা ও এই মতের সমর্থন হয়। এটী পালরাজবংশের একজন মন্ত্রীর আদেশানুসারে প্রস্তুত; এবং ইহাতে কেদার মিশ্র নামক এক ব্যক্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে তাঁহার বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর বহুকাল নির্ম্মূলীকৃত উৎকলকুলের ও খর্ব্বীকৃতগর্ব্ব হূণদিগের দেশ, মহিমাবিচ্যুত দ্রাবিড় ও গুর্জ্জররাজের রাজ্য এবং সার্ব্বভৌম সমুদ্র মেখল রাজসিংহাসন উপভোগ করেন।(৫)

বাঙ্গালিদিগের বিদেশ বিজয় বিষয়ে আর এক খানি অনুশাসন পত্রের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। অনেকে জানেন যে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; তাঁহারা এক সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহারাই জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির প্রস্তুত করান। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে তাঁহারাও বাঙ্গালি ছিলেন। পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য উইল্‌সন সাহেব ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে কল্‌ভিন্ সাহেব যে অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হন তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ নহেন; যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল; তিনি গঙ্গা রাঢ়ীর অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি

(৩) "He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well known bridge, which was constructed by the enemy of Dasasya, from the river of Luckicool, as far as the habitation of Boroon,...who going to subdue other princes, his young horses meeting their females at Kamboge, they mutually neighed for joy."

(৪) কাম্বোজাঃ সমরেসোঢ়ুং তস্ত
বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমা-
নতাঃ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা স্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলে-
শ্বরং॥"
৪ সর্গ রঘুবংশ।

(৫) "Trusting to his wisdom, the king of Gour for a long time enjoyed the country of the eradicated race of Ootkola, of the Hoons of humbled pride, of the Kings of Dravir and Goorjas whose glory was reduced, and the universal sea-girt throne."

ছিলেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে।(৬)

বাঙ্গালিরা বিদেশ বিজয় করিয়াছিল, ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সেনবংশের রাজত্ব শেষ ও বাঙ্গালার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই। মিনহাজই সিরাজ বঙ্গদেশে আসিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির কোন কোন সঙ্গীর মুখে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গবিজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন; "তবকৎইনসিরী" নামক গ্রন্থে ইহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত; উহাতে লাক্ষ্মণেয় সেনের পলায়ন বর্ণনা করিয়া মিনহাজ বলেন যে "রায় লাক্ষ্মণেয় সঙ্কনট ও বঙ্গাভিমুখে চলিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশের অধিপতি আছেন।"(৭) বাস্তবিক বখতিয়ার কেবল লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় প্রদেশ অধিকার করেন; পদ্মার অপর পার্শ্ববর্ত্তী প্রকৃত বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই।(৮) আরবী-পারসী-বিদ্যাবিশারদ ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে "বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমুদায় বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায়; তিনি কেবল মিথিলার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশ, বারেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ, এবং বগড়ির উত্তর পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। বিজিত প্রদেশ উহার প্রধান নগরী হইতে লক্ষ্মণাবতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।"(৯) "তবকৎইন সিরীতে" এবং মুসলমান রাজত্বকালের প্রথম শতাব্দীর কোন মুদ্রাতে স্বর্ণ

(৬) "An inscription procured, since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that Choranga was not the founder of Gungavansa family, but that the first who came into Kalinga was Ananta varma—also called Kolahala, sovereign of Gunga Rarhi—the low country on the right bank of the Ganges or Tumlook and Midnapore; this occurred at the end of the eleventh century of our era."

p. CXXVIII Wilson's Preface to Mackenzie Collection.

(৭) Rai Lokhmoniya went towards Sanknat and Bengal, where he died. His sons are to this day rulers in the territory of Bengal."

See Elliot's History of India told by her own Historians.

(৮) "Distinct from the country of Lakhnauti is Banga, and in this part of Bengal the descendants of the Lakmaniyah kings of Nadiya still reigned in A. H. 658, or 1260. A. D. when Minhaji siraj, the auther of the Tabaqat, wrote his history."

H. Blochmann's Geography and History of Bengal,

(৯) "It would be wrong to believe that Bakhtyar Khiligi conquered the whole of Bengal, he merely took possession of the south eastern parts of Mithila, Barendra, the Nothern portions of Radha. and the north western tracts of Bagdi. This conquered territory received from its capital the name of Lakhnauti."

Blochmann's History, and Geography of Bengal.

গ্রামের নামোল্লেখ না থাকাতে, ১২৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গ সেনবংশীয় রাজাদিগের হাতে ছিল, মিন্‌হাজের এই উক্তির সমর্থন হইতেছে। "তারিখিবরণি" নামক ইতিহাস গ্রন্থে বুলবনের রাজ্যশাসন সময়ে (১২৮০ খৃঃ অব্দে) স্থবর্ণগ্রাম এক জন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রথম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; কিন্তু তগলকসার সময়ে (১৩২৩ খৃঃ অব্দে) সোণার গাঁ ও সাতগাঁয় মুসলমান শাসনকর্ত্তা প্রবেশ করিয়াছে, এবং স্থবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী এই তিনটী সম্মিলিত প্রদেশের সাধারণ নাম "বাঙ্গালা" হইয়াছে।(১০)

এক প্রকার প্রদর্শিত হইল যে, যদিও ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালায় উপস্থিত হয়, তথাপি সেনবংশ ধ্বংস করিতে তাহাদিগের প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছিল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে এই ঘটনার পরেও মুসলমানদিগের প্রভুত্ব এ দেশের কোন কোন স্থলে কখনও সংস্থাপিত হয় নাই এবং কোন কোন স্থলে বহুকালান্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুবিখ্যাত বুক্‌ম্যান সাহেব "বাঙ্গালার ভূবৃত্তান্ত ও ইতিহাস" নামক প্রস্তাবে এতদ্দেশীয় মুসলমান রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেই সকলই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন।

হণ্টর সাহেব বলেন যে বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই।(১১) বুক্‌ম্যান সাহেব এখানকার মুসলমান রাজ্যের পশ্চিম সীমা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই মতের প্রতিপোষকতা হয়। তিনি কহেন, "দৃষ্ট হইবে যে এই সীমা দ্বারা কাহালগাঁর দক্ষিণ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত সমুদায় সাঁওতাল পরগণা, পাচেট, এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্য, বর্জ্জিত হইতেছে।"(১২)

দক্ষিণ পশ্চিমে মেদিনীপুর ও হিজলি ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উক্ত বৎসর হিন্দু সেনা-

(১০) "Minhaj's remark that Banga was, in 1260, still in the hands of Lakhman Sen's descendants is confirmed by the fact that Sunnargaon is not mentioned in the Tabaqat nor does it occur on the coins of the first century of Mahomedan rule. It is first mentioned in the Tarikhi Barini, as the residence, during Balban's reign, of an independent Rai; but under Tughluq Shah (A. D. 1323) Sunnargaon and Satgaon which likewise appear for the first time are the seats of Mahomedan Governors, the term Bangalah being now applied to the united provinces of Lakhnauti, Satgaon and Sunargaon."

See also p. 238, Journal of the Asiatic Society of Bengal, part 1 1873.

(১১) See Hunter's Rural Bengal.

(১২) "This boundary, it will be seen, excludes the whole of the Santal Parganahs from the south of Khalgaon to the Barakar, Pachet and the territory of the Rajahs of Bishnupur (Bankura.)"

পতি কালাপাহাড়ের প্রভাবে তাহা উৎকল সহ বঙ্গেশ সুলেমানসাহের হস্তগত হয়।(১৩)

দক্ষিণে আকবরের সময়েও আমরা প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্যের নাম শুনিতে পাই। আকবরনামা দৃষ্টে জানা যায় সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশে (১৫৭৪ খৃঃ অব্দে, মুকুন্দ নামে একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু জমীদার ছিলেন। ফরিদপুর সম্মুখস্থ "চর মুকুন্দিয়া" নামক দ্বীপে তাঁহার নামের চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে। তিনি দিল্লির সম্রাটের একজন সেনানায়ককে নিহত করেন; এবং তদীয় পুত্র শত্রুজিৎ জাহাঙ্গীর সাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে কর দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্ট দেন। শত্রুজিৎ কুচবেহারের রাজার সহিত যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সাহজাহানের রাজত্ব সময়ে (১৬৩৬ খৃঃ অব্দে) বন্দীকৃত ও বিনষ্ট হন।(১৪)

পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা, ভুলুয়া, নওয়াখালি, এবং চট্টগ্রাম বহুকাল বিবাদ ভূমি ছিল; খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সেগুলি প্রায় ত্রিপুরার ও আরাকানের রাজাদিগের অধিকৃত ছিল। রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকা নগরীতে উঠিয়া আসিবার পরে বাঙ্গালায় মুসলমান রাজ্যের সীমা ফণীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ঔরেঙ্গেব পাদসাহের সময়ে চট্টগ্রাম হস্তগত হয়।(১৫) শ্রীহট্ট বিজয় ১৩৮৪

(১৩) "I mentioned Mahall, Mandalghat at the confluence of the Rupnarain and the Hughli as the south west frontier of Bengal. The districts of Midnapur and Hijli (south east of Midnapur) were therefore excluded. They belonged to the Kingdom of Orissa till A. H. 775, or A. D. 1567, when Suliman, king of Bengal, and his general Kalapahar defeated Mukund Dev, the last Gujptai" G. H. B.

(১৪) "When Akbar's amy, in 1574, under Munim Khan Khanan invaded Bengal and Orissa, Murad Khan one of the officers was dispatched to south-eastern Bengal. He conquered, says Akbarnama, Sirkars Bakla and Fathabad, and settled there; but after some time he came into collision with Mukund, the powerful Hindu Zemindar of Fathabad and Boshnah, who in order to get rid of him, invited him to a feast and murdered him together with his sons...The name of Mukund still lives in the name of the large island "Char Mukundia" in the Ganges opposite Faridpore...His son Satrjit gave Jahangir's Governors of Bengal no end of trouble and refused to send in the customary peshkosh or do homage at the court of Dhaka. He was in secret understanding with the Rajahs of Koch Behar and Coch Hajo, and was at last, in the reign of Shahjahan, captured and executed at Dhaka (about 1636. A. D.)" G. H. B.

(১৫) "Tiparah, Bhaluah, Noakhali and District Chatgaon were contested grounds of which the Rajahs of Tiparah and Arakan were at least before the 17th century oftener masters than the Mahomedans. It was only after the transfer of the capital from Rajmahall to

খ্রীষ্টাব্দে ঘটে।(১৬) ত্রিপুরা, হিরম্বা বা কাছাড়, জয়ন্তী, খস, গারো এবং কারিকরি পর্ব্বতপ্রদেশ, এ সকল মুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হয় নাই।[১৭] আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে "ত্রিপুরা স্বাধীন; ইহার রাজার নাম বিজয় মাণিক। রাজাদিগের সকলের নামেই মাণিক আছে; এবং প্রধান বংশীয়দিগের নামে নারায়ণ আছে।"[১৮]

উত্তর বাঙ্গালার রাজগণ এমন পরাক্রান্ত ছিলেন যে তাঁহারা এক প্রকার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন।[১৯] যে গণেশ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ওয়েষ্টমেকট সাহেবের মতে তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ।[২০] রঙ্গপুরের উত্তরে কামতা নামে একটি রাজ্য ছিল; ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন সাহের সময়ে উহা অধিকৃত হয়।[২১] কামতা রাজবংশের তিরোভাবের পরে কোচরাজবংশের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে; পরিশেষে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঔরেঙ্গেবের সেনাপতি মিরজুম্লা উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন।[২২]

এপর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির প্রায় একশত বৎসর পরে সেন বংশের রাজ্য ধ্বংস হয়; এবং তদনন্তরও বিষ্ণুপুর, পাচেট্, ত্রিপুরা, জয়ন্তী, এ সকল স্থানের রাজগণ মুসলমান্ দিগের রাজত্ব কালে আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তরে অনেক জমিদার বহুকাল স্বাধীন ছিলেন।

Dhaka, that the south-east frontier of Bengal was extended to the Phani River, which was the imperial frontier till the beginning of Aurangzib's reign, when Chatgaon was permanently conquered; assessed, and annexed to Subah Bangalah." G. H. B.

(১৬) "Silhet...was conquered in A. D. 1384." G. H. B.

(১৭) "The neighbouring countries to the east were Tiparah, Kachhar (the old Hirumba), the territories of the independent Rajahs of the Jaintia, Khascah, and Garo Hills, and on the left bank of the Brahmaputra, the Karibari Hlils, the Zemindars of which were the Rajahs of Sosang." G. H. B.

(১৮) "Tiparah is independent; its king is Bijai Manik. The kings all bear the name of Manik, and the nobles that of Narain."—Ain Akbari.

(১৯) "The Rajahs of Nrothern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the times of Bakhtiar Khliji." G. H. B.

(২০) See Dinajpur Raj in the Calautta Review.

(২১) "Kamata was invaded, about 1498 A. D. by Hasain Shah and legends state that the town was destroyed and Nilamba, the last Kamata Rajah, was taken prisoner." G. H B.

(২২) "The Kamata family was succeeded by the Koch dynasty.... Aurangzib's army under Mir Jumblah took Koch Bihar on the 19th December 1661." G. H. B.

এক্ষণে আমরা জমিদারদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। বিষ্ণুপুর, পাচেট্, দিনাজপুর, এই সকল স্থানের রাজারা এবং পূর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশায় মুকুন্দ ও শত্রুজিৎ জমিদারপদবাচ্য। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে জমিদারেরা কেবল করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ের আমরা অপর প্রমাণ দিতেছি। আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে সুবা বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে। [২৩] এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। বাস্তবিক অনেক জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ না করিয়া কর আদায় করা যাইত না। সুবিখ্যাত পাদরি লং সাহেব ইংরাজ রাজ্যের প্রথম আমলের কাগজ পত্রের যে সকল অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে তখন বর্দ্ধমান, বীরভুম, বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুরের রাজারা সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদিগের অনেক কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন। [২৪]

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার কমিসনর ষ্টর্লিং সাহেব উক্ত দেশের ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে যে মিনিট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ব্বকালের জমিদারেরা কি ছিলেন একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ঐ লেখার মর্ম্ম নিম্নে গৃহীত হইল; [২৫]

(২৩) "The Zemindars (who are mostly Koits) furnish also 23,330 cavalry 801,158 infantry, 170 elephants, 4,260 cannon and 4,400 boats." Gladwin's AinAkbari vol. II.

(২৪) See Selections from Indian Recordes, edited by the Rev, Mr Long.

(২৫) "At the settlement formed by the ministers of Akbar it was considered just and politic to make some provisions for the principal branches of the family of the dethroned Hindu Rajahs. To the actual heir, Ramchunder Deo, therefore was assigned Khoordah and the four pergunnas extending from thence to the sea at Pooree as a Zemendaree, with the title of Zemindar, and the Rajahs of Khoordah have been in consequence down to the present day styled Zemindars of Orissa. The Zemindaree of Aul or Killa Aul on the eastern side of the district, was granted under the same title to another member of the Royal family who claimed the Raj as descended from the last dependant sovereign Teliga Mokoond Deb; and Killah Puttia Sarrungurh to a third, with the Zemindaree of two or three pergunnahs long since resumed.

"These descendants of the Royal family and Showuks, or hereditary officers of state, were the only officially recognized Zemindars in Cuttack for a period of more than a century and a half after the reign of Akbar. Their situations answer to the sense in which the term Zemindar is used by Ferishteh, who invariably speaks of the "Rayan Zemindaran Dukhun,"

"উড়িষ্যা বন্দোবস্তের সময়ে আক্‌বরের মন্ত্রিগণ সিংহাসনচ্যুত রাজবংশের প্রধান শাখাগুলির ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ন্যায় এবং রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য জ্ঞান করিলেন। তজ্জন্য বাস্তবিক উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রদেবকে, জমিদার আখ্যা দিয়া, খোড়দা এবং তথা হইতে পুরীসন্নিহিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চারিটী পরগণা, জমিদারীস্বরূপ প্রদত্ত হইল, এবং এ নিমিত্ত খোড়দার রাজাদিগকে অদ্যাপি উড়িষ্যার জমিদার বলে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যাসহকৃত রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে কেল্লা আউলের জমিদারী দেওয়া হইল; এ ব্যক্তি তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের বংশীয় বলিয়া রাজ্যপ্রার্থী ছিল। কেল্লা পুটিয়া সারঙ্গগড় এবং দুই তিন পরগণার জমিদারি তৃতীয় এক জনকে প্রদত্ত হয়।

"আকবর সাহের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পর পর্য্যন্ত এই রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গ এবং পুরুষানুক্রমিক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত আর কেহই কটকে জমীদার বলিয়া রাজদ্বারে স্বীকৃত হইত না। ফেরেস্তা 'দক্ষিণের রায় ও জমীদারদিগকে' পরাক্রান্ত, সেনাবলবিশিষ্ট, এবং বহু দুর্গাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ফেরেস্তা যে অর্থে জমিদার শব্দের প্রয়োগ করেন পূর্ব্বোল্লিখিত জমিদারদিগের পদ তদনুরূপ ছিল। উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে তাঁহারা বিষয় সম্পত্তি পাইতেন; আপন আপন প্রভুত্বাধীন স্থানে জীবন মৃত্যু বিধান শক্তি ধারণ করিতেন; সাধ্যানুরূপ সৈন্য রাখিতেন; এবং যদি কিছু দিতে হইত, অতিসামান্য করই দিতেন।"

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বকালের জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন ছিলেন, এবং কেহ বা বর্ত্তমান রাজপুতানার করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্য ছিল, গড় ছিল; এবং তাঁহারা স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিতেন ও অপরাধের দণ্ড দিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু জমিদার ছিল; সুতরাং প্রায় সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও হিন্দুসমাজপ্রচলিত রীত্যনুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজধানী সন্নিহিত স্থান ব্যতীত কোথাও মুসলমান রাজাদিগের সহিত প্রজাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল না।

as powerful and formidable chiefs, commanding troops, and possessing forts like the Barons of the middle ages. They succeeded by inheritance, exercised powers of life and death within their lordships or jurisdictions, maintained forces proportioned to their means, and paid, if any thing only a light tribute, as their tenure was that of military service."

Stirling's Minute appended to Mr. Toynbee's History of Orissa.

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। পুরুবিক্রম নাটক। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭১৬। মূল্য ১৲টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দর সা (Alexander), পুরু (Porus), তক্ষশীল (Taxilus), এফেষ্টিয়ান (Hephostion) ইহারাই প্রধান; মহিলাগণের মধ্যে প্রধানা ঐলবিলা—কল্পপর্ব্বতের রাণী, এবং অম্বালিকা তক্ষশীলের ভগিনী।

মহাবীর সেকেন্দর সিন্ধুনদী পার হইয়া ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাণী ঐলবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থ কৃতসংকল্পা। তিনি অবিবাহিতা, রূপ-গুণবতী। প্রচার করিয়াছেন যে, "যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন।" মনে মনে পুরুরাজের শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরুরাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। পুরুরাজ এদিকে যথার্থই বীরপুরুষ ও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দরে প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক। এদিকে অম্বালিকাও সেই অসদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অম্বালিকাকে সেকেন্দর পূর্ব্বে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; অম্বালিকা এক্ষণে সেকেন্দরে অনুরক্তা। ভ্রাতা ভগিনী উভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিল, যে, উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে। কিন্তু ঐলবিলা তক্ষশীলকে ঘৃণাকরেন এবং পুরুরাজে একান্ত অনুরাগিণী, সুতরাং ঐলবিলা ও পুরুরাজ মধ্যে প্রথমে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ভ্রাতা ও ভগিনীতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া আসিলেন। পুরুরাজে ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল। একজন যবন সেনা অন্যায় আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে আঘাতিত করিল। পুরুরাজ বন্দী ও শায়িত। ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা কতক সিদ্ধ হইল। পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মোচন করিলেন, অম্বালিকাকে গ্রহণ করিলেন না; অম্বালিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহভঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের মিলন করিয়া দিলেন।

এই উপন্যাসে বৈচিত্র আছে। কিন্তু লেখার তাদৃশ বৈচিত্র নাই। সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি নীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান, এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্য বিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই গুজরত ও মারফত লেখা আছে বলিয়া বোধ হয়। আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই কথাগুলি ছাপিয়াছে আর আমরা পড়িলাম। নহিলে অঙ্গ কণ্টকিত হইল না কেন? গ্রন্থের এই মর্ম্মভেদকতার অভাবে আমাদের দুঃখ হইয়াছে। পুরুবিক্রম সন্দর্শনে যে অন্তরাত্মা জানিল না তাহাতেই আমাদের দুঃখ হইয়াছে। যাহাহউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।

২। কুলীন কন্যা, অথবা কমলিনী, শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা। নং ১১ কলেজ স্কোয়ার রায় যন্ত্রে শ্রী বাবুরাম সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত মূল্য বার আনা মাত্র।

গ্রন্থকার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বঙ্গদর্শনের পাঠক বর্গের নিকট পরিচিত। গতবৎসর শ্রাবণমাসে আমরা তৎ প্রণীত 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটকের সমালোচনা করিয়াছিলাম; বৎসরান্তে আবার তিনি সাহিত্য সংসারে দর্শন দান করিয়াছেন।

এই নাটকের উপন্যাস পৌরাণিকী ঘটনামূলক নহে। কুলীন কন্যা কমলিনী আধুনিকী, গল্পটিও সুতরাং আধুনিক। গল্পটি শুদ্ধ আধুনিক নহে, হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতের মোকদ্দামামূলক। 'যে ভয়ে পলাও তুমি, সেই দেবী আমি।' এই সকল সামাজিক নাটককে আমরা ভয় করি; আর বঙ্গীয় কবিগণ আমাদিগকে জ্বালাতন করিবার জন্যই যেন, সামাজিক নাটকে দেশ প্লাবিত করিতেছেন। শ্রাবণ মাসে (স্বর্ণলতাকে) বিদায় দিয়াছি আবার শ্রাবণ শেষ না হইতেই 'কমলিনী' উপস্থিতা। আমরা গ্রন্থকারকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গীয় কুমারীরা কি কমলিনীকে আদর্শ করিয়া নীতি শিক্ষা করিবে? বাহকে শিবিকা লইয়া আসিয়া কমলিনীকে বলিল গ্রামান্তরে দিননাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে; কমলিনী অমনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া পিতা মাতার প্রীতি বিস্মৃত হইয়া, কুল মান ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া শিবিকারোহণ করিলেন! এই উদাহরণ সংক্রামক হইলে বাঙ্গালার উন্নতি হইবে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজের সংস্কারক বলিয়া আমরা কখনই এ সমাজের কলঙ্ক করিব না। এইরূপ আচরণের জন্যই আমরা কমলিনীর দুঃখে

দুঃখিত হই নাই। কমলিনী যখন কালী-বাড়ীতে বসিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন:—

"মা দুর্গে কি আমায় দয়া করবেন? আমি যে মহাপাতকিনী, আমি যে কুল-কলঙ্কিনী, মা! আমি যে মা বাপের মনে ব্যথা দিয়ে এসেছি!" তখন আমরা মনে মনে বলিলাম, "তোমার জন্য দুঃখ করিব কি? তুমি মেয়ে ভাল নও, এখন আপনার পাপের ফল আপনি ভোগ কর।" কিন্তু ভৈরবেশ্বরী পূজকের পত্নী মনোরমা নিকটে ছিলেন, তিনি বোধ হয়, আমাদের মত সামাজিক নাটক পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠিন করেন নাই, সুতরাং তিনি সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন:

"আর কেঁদ না মা চুপ কর, তুমি ত আর আপনার ইচ্ছায় আসনি তবে তোমার দোষকি? চুপ্‌কর।" কিন্তু কমলিনীর মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না; কমলিনী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন:

"মা, আমার দোষ নয়, অমন কথা বোল না, আমি যে দিনুর কাছে যাব বলে, ইচ্ছা করেই পাল্‌কিতে উঠেছিলাম, আমার পাপের যে সীমা নাই মা, আঃ মাগো কোথা রৈলে, এজন্মে আর কি তোমার পা দুখানি দেখতে পাব, মা?" এত দুঃখ দেখিয়া এত আক্ষেপেও আমাদের চক্ষে জল আসিল না।

কুলীনকুমারীই হউন আর বংশজ দুহিতাই হউন, যিনি এখনকার 'পবিত্র প্রণয়ের' অনুরোধে কুলত্যাগ করেন, তিনি বিলাতের সিলিংনবেলিষ্টগণের কাছে সুখ্যাতি পাইতে পারেন, আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব না।

আর নাটকের নায়ক দিননাথ আগামী বর্ষে আইনে পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাকেও দুটা কথা বলি।

দিননাথ (স্বগত)। "আমাদের প্রণয় অপবিত্র নয়—লালসাসম্ভূত অচিরজাতও নয়, তবে আমি কমলকে কেন না বিবাহ করিব?" ইত্যাদি

দিননাথের এ যুক্তিতে আমরা অনুমত নহি। আবেগসন্ধুক্ষণ অপরিণত বয়সে কি কেহ বলিতে পারে, কোন চিত্ত চাঞ্চল্যটি লালসা সম্ভূত অচিরজাত, আর কোনটি স্বার্থসাধন শূন্য? কেহ বলিতে পারুক আর নাই পারুক আমরা বেশ বলিতে পারি দিননাথ তাহা বলিতে পারেন না। দিননাথ নিতান্ত অপরিপক্ক, দিননাথ বালক বলিলেই হয়; যে দিননাথ প্রণয়িনী বিচ্ছেদে একেবারে জ্ঞান শূন্য হয়েন, যাঁহার তরল বুদ্ধি লোপ পায়, বাতুলতা আক্রমণ করে সে দিননাথ কি আপনার চিত্তাবেগ পরীক্ষা করিতে পারে? কখনই না। দিননাথ বঙ্গীয় যুবকের আদর্শ নহে। কমলিনী কুমারীবর্গের অনুকরণীয়া নহেন। নাটক খানিতে বিলাতী সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, নাটকখানি ভাল নহে।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

পঞ্চম প্রস্তাব--রাজন্যবর্গ।

দেশাধিপতিগণ দেববংশজ, দেবাবতার বা দেবদত্ত ক্ষমতাযুক্ত এবং তাঁহারাই নিয়ন্তা ও তাঁহাদের বাক্যই নিয়ম, এই বিশ্বাস ও বিষয় সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় শকের মধ্যম কালীয় ইউরোপ খণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যাইবে যে পূর্ব্বাপর উহা প্রজা সাধারণের কিরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল এবং রাজারা উহা লোকহৃদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপীয় আধুনিক ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে দেখা যায় যে জর্ম্মণির জঙ্গলে কতকগুলি বর্ব্বরজাতি বাস করিতেছে। তাহারা অস্থির, দৃঢ়কায়, সতত দ্বন্দ্বপ্রিয় এবং দস্যুবৃত্তি লালসায় একজনের আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যাহার অনুগত হইতেছে, তিনি প্রথমতঃ আধিপত্য হেতু, দ্বিতীয়তঃ ওডিন (বুধ) বা তীস্কো ইত্যাদি দেববংশজাতত্ব হেতু তাহাদিগের নিকট ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন। অতএব জর্ম্মণির জঙ্গলেই ইউরোপীয় রাজদেবত্বভাবের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু অতি সঙ্কুচিতভাবে। পরে ইহারা যখন দস্যুবৃত্তির অনুসরণক্রমে ধ্বংসপ্রায় রোমকভূমে অবতীর্ণ হইল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্মানুসারে রাজারা আপন আপন ক্ষমতায় দেবত্বভাব সংযোজিত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এই ব্যস্ততার সূত্রপাত মিরোবিঞ্জীয় রাজাদিগের আমল হইতে হয়। কিন্তু অপরিচিত ভূভাগে, অপরিচিত ধর্ম্মে পরিণত সহচর বর্ব্বরেরা সে মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অক্ষমতাবশতঃ, এবং ওডিন প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবশ্রেণীতে ভক্তিচ্যুত হওয়ায়, এখন রাজাকে কেবল দস্যুবৃত্তির অধিনায়কস্বরূপ দেখিতে লাগিল। সুতরাং মিরোবিঞ্জীয়দিগের চেষ্টা ফলবতী হইতে পায় নাই। কার্লোবিঞ্জীয় রাজাদিগের সময়েও এই চেষ্টা আরম্ভ হয়, কিন্তু নূতন আকারে। এবংশেও পেপিন হইল এবং চার্লস মার্টেল পর্য্যন্ত প্রজাগণের বিশ্বাসে রাজা কেবল বলাধিনায়ক মাত্র ছিলেন। তৎপরে পেপিন ঐ দেবত্বভাবলাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সার্লেমান কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ইউরোপের মধ্যমকালীয় ইতিহাসে অল্পজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিও জ্ঞাত আছেন বোধ হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে এইক্ষণপ্রতিষ্ঠিত দেবত্বভাবের উপর ভক্তির অনেক হ্রাস হওয়াতে, রাজতন্ত্র ছন্নছাড়া হইয়া যায় এবং তদ্বিনিময়ে ফিউডাল প্রথা পুষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই ফিউডাল

প্রথাই ইউরোপের উন্নতিপথের পথদর্শক স্বরূপ।

রাজার দেবত্বভাবে বিশ্বাস প্রজাদিগের অত্যাচার সহিষ্ণুতার এবং হেয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়ার এক প্রধানতম কারণ; এবং সেই দেবত্বে বিশ্বাসাবিশ্বাসের প্রকার এবং তারতম্য প্রজাবর্গের চিত্তবৃত্তির এবং অবস্থার উন্নতি বা অবনতির আংশিক পরিচায়ক, ও ভাবী উন্নতি বা অবনতির আংশিক ভাবে ভবিষ্যৎজ্ঞাপক। এই নিমিত্ত এতদ্বিষয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে আলোচিত হইতেছে। ভারতে বৈদিক সময় হইতে রাজারা দেবাবতার। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রকারের মতে

"ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য
শাশ্বতী॥৪।
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি
ভূমিপঃ।
মহতীদেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥৮।"
মনু ৭ম অ।

ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের ইঁহাদিগের সারভূত অংশ লইয়া রাজার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা বালক হইলেও সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে তাঁহাকে অসম্মান করিবে না। যেহেতু তিনি মহাদেবতা নররূপে অবস্থান করিতেছেন।——

বাল্মীকির সাময়িক

"পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো
গুরুঃ।
ইন্দ্রস্যেব চতুর্ভাগঃ" ইত্যাদি।
৩য় কাণ্ড—১ম সর্গ।

—যেহেতু রাজা ইন্দ্রের চতুর্থাংশের অবতার, এ নিমিত্ত তিনি পূজনীয়, মাননীয়, দণ্ডধর এবং গুরু। ইত্যাদি।—

পুনশ্চ আরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গে, রাবণকে সীতাহরণে উদ্যত দেখিয়া, তাহাহইতে নিবারণ করিবার নিমিত্ত মারীচ কতকগুলি প্রবোধবাক্য কহায়, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম এই।—"আমি তোমাকে আমার বাক্যের দোষগুণ বিচার করিতে বলি নাই, কেবল তোমার সাহায্য চাহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি তোমার এতগুলি বাক্য প্রয়োগে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অতি অন্যায় হইয়াছে, যেহেতু রাজা সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্ব অবস্থাতেই পূজনীয়, কারণ

"পঞ্চরূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ॥"
১২।৩।৪।

রাবণের বাক্য দ্বারা এখানে ইহাও প্রতীতি হইতেছে যে এই দেবত্বজ্ঞান বিশ্বাসের আশ্রয়ে রাজারা কতদূর স্পর্দ্ধাযুক্ত হইতে পারেন। ইতিবৃত্তও সাক্ষ্য দিতেছে যে যেখানে এই বিশ্বাস দৃঢ় প্রবল, ও প্রজাকর্ত্তৃক বাধা দান শিথিল হইয়া আইসে, সেইখানেই রাজা দারুণ

দাম্ভিক হইয়া উঠেন। আর্য্যগণের দীর্ঘাধিপত্যের মধ্যে ভারতে দ্বিতীয় জেমসের ন্যায় একইভাবে উৎপন্ন-স্বভাববিশিষ্ট অনেক রাজা হইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জেমসকে দূরীকারক প্রজার ন্যায় প্রজাও ভারতে ছিল না এমন নহে। আক্ষেপের বিষয় এই যে ভারতীয়েরা দূরীকরণের ফলের তেমন মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না।—অত্যাচারের নিমিত্ত একজন রাজ্যবিচ্যুত হইলে, তাহার উত্তরাধিকারী কিঞ্চিৎ সদ্‌গুণ দর্শাইলেই, প্রজাবর্গ তাঁহাতে তাহাদের কল্পনায়ত্ত রাজদেবত্বভাবের পরিচয় পাইল জ্ঞান করিয়া, ভবিষ্যতের পক্ষে অদূরদর্শিতাভাবে সন্দেহবিহীন হইয়া, পূর্ব্ববৎ শান্ত এবং নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিত!

বাল্মীকির সাময়িক আর্য্যেরা কথিত মত, নিরন্তর অত্যাচার সহ্য করিতেন না। এবং রাজার দেবত্ব ভাব, আর্য্যাধিপত্যের অন্যান্য সময়ের সহ তুলনে, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাবে তাঁহাদের মনে অবস্থান করিত। রাজার ঐ দেবত্ব কিরূপ বন্ধন বিযুক্ত হইলে এ সময়ে অনর্থ উৎপত্তি হইত তাহা দেখা কর্ত্তব্য। রাবণ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে, মারীচ তাহার প্রতি কহিতেছে, যেহেতু "রাজমূলোহি ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ," সুতরাং যাহাতে তিনি সুপথভ্রষ্ট না হয়েন এজন্য সকলে তাঁহাকে সাবধান করিবে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া অসৎপথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব মন্ত্রীরা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, কারণ তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে সর্ব্বসাধারণ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারেন। যে রাজা অতি উগ্রস্বভাব, অবিনীত ও প্রতিকূল, তিনি রাজ্যশাসনে অক্ষম। এবং যিনি অসৎ মন্ত্রীর সহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন তিনি বিনষ্ট হয়েন।(১) পুনশ্চ

"তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্ব্বিতং শঠম্।
ব্যসনে নাভিধাবন্তি সর্ব্বভূতানি পার্থিবম্॥১৫
অভিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্॥"
১৬৩।৪১

—তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অমাত্যাদি সকলের প্রতি উগ্রস্বভাব, কৃপণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ রাজা বিপদে পতিত হইলেও কেহ তাহার সহায়তায় উদ্যত হয় না। অভিমানী, অগ্রাহ্য এবং আপনাতেই সকল গুণের সম্ভব এরূপ ভাবযুক্ত এবং যিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ, বিপদে স্বজনেও তাঁহার সংহার করিয়া থাকে।—ইত্যাদি।

যথায় রাজদেবত্বে বিশ্বাস, যথায় রাজতন্ত্র শাসনের উপর প্রকৃতিবর্গের আস্থা, তথায় রাজাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, এবিষয়ে কাহার কিরূপ মত

(১) কিরূপ কার্য্যে রাজার দেবত্ব দূর হয়, এবং রাজা কিরূপ শাস্তির যোগ্য বা বশবর্ত্তী হইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে মনুর মত সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

তাহা বলিতে পারি না। ব্লাডিমীর মনোমেকস মৃত্যুকালীন পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন “ ব্রত, উপবাস, মঠাশ্রম প্রভৃতি দ্বারা রাজা স্মরণীয় হয়েন না, তাহার উপায় কেবল কার্য্য।” এ উপদেশের সফলতা যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে তাহার সন্দেহ নাই।

বৃটন্দ্বীপ যখন উন্নতির পথস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যখন তাহার জনৈক অধীশ্বর সমবেত প্রজাগণের মধ্যে এক মাত্র তিনি নাম স্বাক্ষরে সক্ষম বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছেন, ভারত তখন পার্থিব গৌরবের শেষ সীমা অবলোকন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। সেখান হইতে বাল্মীকির সময় অনেক দূর, অনেক পুরাতন; রোম তখন গর্ভশয্যাশায়ী, গ্রীকেরা তখন কি করিতেছিল তাহা স্মরণ হয় না! তখন ভারতের রাজবর্গ কি করিতেন? অপরিসীম ক্ষমতা যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, যাঁহারা দেবাবতার, তাঁহারা কিরূপ গুণবান্ হইলে লোকের মনঃপূত হইত? অন্ততঃ লোকে সম্ভাবিত বলিয়া কি প্রত্যাশা করিত?

“ সর্ব্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।”
২।১।২০

এই রাজাদিগের বিদ্যাবত্তা, এই রাজাদিগের গুণবত্তা। সর্ব্ববিদ্যার ভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। এ কালের সর্ব্ববিদ্যার ভাব সম্যক্ প্রকারে হউক বা আংশিকই হউক, তৃতীয় প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। তারা, বালীর নিকট রামের গুণবর্ণনস্থলে কহিতেছেন,

“আর্ত্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনঃ।
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ॥
ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্।”
৪।১৫

—বিপন্নের গতি, এক মাত্র যশের ভাজন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন এবং পিতৃ আজ্ঞার বশবর্ত্তী, হিমালয় যেরূপ সমস্ত ধাতুর আকর, তিনিও তদ্রূপ গুণসমূহের আকর স্থান।—

পুনশ্চ দশরথের পুত্রবর্গ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তৎ সম্বন্ধে এরূপ কথিত হইয়াছে।

“ সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ॥২৫
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ॥২৬
ইষ্টঃ সর্ব্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্ম্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠেচ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ॥২৭
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।”
১।১৮

—সকলেই বেদবিদ্ শূর এবং লোকহিতে রত ও জ্ঞান এবং গুণসম্পন্ন হই-

য়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাম সত্য পরাক্রম মহাতেজোবন্ত এবং নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় সর্ব্বজন মনোরঞ্জক হইয়াছিলেন। তিনি গজস্কন্ধে ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণক্ষম এবং রথচর্য্যায় ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ও পিতৃসেবা পরায়ণ হইয়াছিলেন।—

পুনশ্চ

"শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথ্যমানস্তু বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি॥১২
শ্রেষ্ঠংশাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তোব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থধর্ম্মৌচ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো নচালসঃ॥২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থ বিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণ বাজিনাম্॥২৮
ধনুর্ব্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথ সম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্ত্তাচ সেনানায় বিশারদঃ॥"
২৯।২।১

—অস্ত্রাভ্যাস কালীন অবসর যাহা পায়েন, তাহাও বৃথা নষ্ট না করিয়া শীল বৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ এরূপ সজ্জনগণের সহিত সদালাপ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র সমূহ ও প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদিতে পারদর্শী। তিনি অলস হইয়া অর্থ ও ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া অর্থাৎ সংগ্রহ কার্য্যের সহ অবিরোধভাবে সুখকামনা করিয়া থাকেন। বিহার কালীন শিল্প সমস্ত অর্থাৎ গীতবাদ্য চিত্র কর্ম্মাদিতে এবং অর্থবিদ্যায় সুপটু। হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যে পারগ। ধনুর্ব্বিদ্দিগের শ্রেষ্ঠ ও লোকে অতিরথ বলিয়া মান্য। বিপক্ষ সৈন্যাভিমুখে গমন, সংহারকরণ এবং সৈন্য সমাবেশ কার্য্যে পারদর্শী।—

রাজাদিগের প্রথম রাজকার্য্যে প্রবেশ সময় কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, কিরূপ উপদেশে উপদিষ্ট হইয়া প্রবেশ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রস্তাবে দশরথ কর্ত্তৃক রামের প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ভূয়োবিনয় মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ।৪২
কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব বাসনানিচ।
পরোক্ষয়া বর্ত্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা॥৪৩
অমাত্য প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়।
কোষাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্॥৪৪
ইষ্টানুরক্তঃপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্।
তস্য নন্দতি মিত্রাণি লব্ধামৃত মিবামরাঃ।"৪৫

—নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে বিনয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে। কামক্রোধসহচর

ব্যসন সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। পরোক্ষাপরোক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কোষাগার ও আয়ুধাগার পূর্ণ করিয়া অমাত্যবর্গ এবং প্রজাবর্গের প্রিয় হইবে ও চিত্তরঞ্জন করিবে। যিনি এরূপ ইষ্টানুরক্ত-প্রকৃতি হইয়া রাজ্যপালন করেন, তাঁহার মিত্রবর্গ অমরগণের অমৃতলাভের ন্যায় আনন্দলাভ করেন।—(২)

বাল্মীকির বর্ণনায় রামের তাৎকালিক চিত্তারত্ব রাজগুণোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাবণ তেমনিই রাজ-দোষবিশিষ্ট। বোধ হয় যে কিছু উৎকৃষ্ট রাজগুণ বাল্মীকি মনে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা রামে আরোপ করিয়াছেন, আবার তেমনি যে কিছু রাজ-দোষ, তাহা রাবণে আরোপিত হইয়াছে। এমন স্থলে রাবণের গুণভাগ আলোচনা করিয়া কথিত রামগুণের পার্শ্বে স্থাপিত করিলে, প্রকৃতভাব উপলব্ধি করা সহজ হইয়া আইসে। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে এই সময়ে সংস্কৃত মৃত হইয়া শিক্ষিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সুতরাং শিক্ষা ভিন্ন সে ভাষায় প্রবেশাধিকার নাই এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ব্যতীত বেদবিদ্যায় অধিকার হয় না। রামায়ণের স্থানান্তরে দেখা যায়

"যদিবাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
সেয়মালক্ষ্য রূপঞ্চ জানকী ভাষিতঞ্চ মে॥
রাবণং মন্যমানা মাং পুনস্ত্রাসং গমিষ্যতি।" ৫।২৯

হনুমান্ অশোকবনে জানকীকে দেখিতে পাইয়া কিরূপে তাঁহার সম্ভাষ করিবেন, তাহা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে—যদি আমি দ্বিজাতিগণের ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি, তাহা হইলে আমার (অনার্য্যজাতিত্ব হেতু) এই রূপে এরূপ উচ্চ দ্বিজাতি ভাষার সম্ভব দেখিয়া, জানকী আমাকে মায়ারূপধারী রাবণ মনে করিয়া ত্রাসযুক্ত হইতে পারেন।—পুনশ্চ পরিব্রাজকরূপী রাবণ সীতা হরণার্থে কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া

"দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষ মুদীরয়ন্।" ১৪।৩।৪৬

"ব্রহ্মঘোষং ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় বেদঘোষমুদীরয়ন্ কুর্ব্বন্।"—রামানুজ।

অতঃপর রাবণ অনেকক্ষণ ব্রাহ্মণভাবে সেই কুটীরে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই সীতার প্রতীত হইয়াছে। রাবণ অনার্য্য, রাবণ রাক্ষস, রাবণ দেবদ্বেষী, রাবণ বেদপ্রতিপাদক ধর্ম্মের বিরোধী, রাবণ যজ্ঞহন্তা, রাবণ পাপাবতার; তথাপি রাবণ যুদ্ধবিদ্যায় রামের সমকক্ষ, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, বেদবিদ্যায় অভ্যস্ত,

(২) এই প্রস্তাবেতে উদ্ধৃত এই অংশ, ইহার পূর্ব্বগত ও পরস্থিত অনেক উদ্ধৃত অংশ অবিকল শ্লোকানুযায়ী অনুবাদ না করিয়া, পরিস্ফুট করণার্থে টীকাকারের ভাব অনেক স্থানে অনুবাদ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। এনিমিত্ত মূলাংশ দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করা গেল।

এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ গূঢ় মর্ম্মজ্ঞাত যে পরিব্রাজক রূপ ধরিয়া, যতক্ষণ না সীতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ততক্ষণ সীতাকে তাহার ব্রাহ্মণত্বে ভ্রান্তময়ী করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এ সকলের দ্বারা সুন্দররূপে অনুভূত হয় যে সেই সময়ে রাজাদের মধ্যে কেহ কদাচ মূর্খ থাকিতেন। প্রায় সকলেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতেন। (৩) যদি বা কাহার কাহার কার্য্য নীতিশাস্ত্রানুসারী সর্ব্ব সময়ে না হইত, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে সেই সকল শাস্ত্র সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদের দর্শনবহির্ভূত ছিল এমন বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, সুযোগ পাইলে, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই নীতিশাস্ত্রের বিধি অনেক সময়ে অবহেলা করিতেন। মনুষ্য প্রকৃতিই এইরূপ!

অতি আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই যে রাজারা সুশিক্ষিত হইয়াও সময়ে সময়ে গুরুতর পাপে লিপ্ত হইতেন। সুশিক্ষিত হইলেও নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রম ক্ষমাযোগ্য, লোকেও সচরাচর ক্ষমা করিয়া থাকে। যদিও সাধারণ একজন লোকের কথিত নীতিপথে সামান্য ব্যতিক্রমের ফল, এবং দেশের শুভাশুভ যাহার উপর নির্ভর করে এরূপ একজনের তথাবিধ ব্যতিক্রমের ফল, স্বতন্ত্র হইবার সম্ভব,—সামান্য এক ব্যক্তির দোষে সমাজ দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে হউক, অনুভবনীয় বা অননুভবনীয় ভাবে হউক অতি অল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, কিন্তু একজন রাজ্যেশ্বরের সেই দোষে হয় ত সমাজ বিশ্রঙ্খল হইয়া যায়;—তথাপি দূর ব্যবধানে স্থিত দর্শকের চক্ষে উভয়ই সমান ক্ষমাযোগ্য হইতে পারে, তাহার চক্ষে উভয়ই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু যে দোষ অতি গুরুতর বলিয়া খ্যাত, যাহা কেবল স্বার্থে কৃত, যাহা অশিক্ষিত দুর্জ্জনেও কদাচ সম্ভব, এরূপ বা তথাবিধ দোষে, শিক্ষিত লিপ্ত হইলে, তাহা অতি ঘৃণিত এবং কদাচ ক্ষমাযোগ্য নহে। শিক্ষিত ব্যক্তি যদি আবার এরূপ হয়েন, যে যিনি মানবীয় সম্ভাবিত বা তদুচ্চতর অভাবকেও জয় করিয়া উপরে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে সেই সেই দোষ সম্ভাবিত হইলে পূর্ব্বকথিতাপেক্ষা বহুগুণে পাপী বলিয়া ধরা যায়। বাল্মীকির সময়ে এরূপ পাপের পাপী রাজপরিবারে বোধ হয় নিতান্ত কম ছিল না, যে হেতু ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতা পুত্রে, বিরোধ বিদ্রোহ, তদানুষঙ্গিক হত্যাদি পাপময় ব্যাপারের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্যই এ পাপ নানা কারণে উৎপত্তি লাভ করিত, কিন্তু সেরূপ কারণ সাধারণ মানবমণ্ডলীতে প্রায় দুই এক জন মধ্যস্থের করায়ত্ত।

এতদ্ব্যতীত দেখা যায় যে বাল্মীকি স্থানে স্থানে কহিয়াছেন, (৩।২ ইত্যাদি), রাজারা বঞ্চনাচতুর, বিশ্বাসের ভাণ করিয়া সুযোগ মতে বিনাশ করে, অত্যন্ত কপটাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি। ইহা

৩। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজাদিগের শিক্ষাবিষয় দ্রষ্টব্য।

অতি নীচ প্রকৃতির কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। আর্য্য রাজাদিগের এ স্বভাব অতি ঘৃণাস্পদ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মযুদ্ধের এত গৌরব, শিক্ষার এত আদর, বীর্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের অলঙ্কার বলিয়া গণ্য, সেখানে এরূপ স্বভাব কেন এবং কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? ওরূপ স্বভাব ত অধঃপতিত, নিরাশগ্রস্ত, পদে পদে দলিত, এমন সমাজেরই সম্পত্তি এবং অস্ত্র!—তাৎকালিক আর্য্যদিগের এরূপ স্বভাবযুক্ত হওয়ার অন্যান্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই একটি কারণ পাওয়া যায়।—আর্য্যরাজাদিগের পরস্পরের মধ্যে অতি অল্পই কলহ হইত। ইহাঁদিগের সহিত নিরন্তর দ্বন্দ্ব সূত্রে সম্বন্ধ কেবল অনার্য্যদিগের ছিল। তাহারা নিরক্ষর, উচ্চভাবরহিত চিত্ত, তেজোদ্ভবন্যায় পথের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, সম্মুখ শত্রুতায় অপারগ, অথচ তাহাদের আর্য্যদিগের প্রতি শত্রুতা করিবার ইচ্ছা বিষম বলবতী। কাজে কাজেই ইহারা নিরন্তর কপটাচরণ করিয়া আর্য্যগণকে জ্বালাতন করিত। আর্য্যগণও যে বিষে বিষ, সেই বিষে নির্ব্বিষ করিতে গিয়া, সময়ে উহা তাঁহাদিগের স্বভাব স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রাজকুমারেরা সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্ব হইতে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিতেন।(৪) ক্রমে একটি একটি করিয়া অনেক গুলি হইত।(৫) রাজারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির কন্যাই (৬) বিবাহ করিতে পারিতেন। তাহাদিগকে যথাক্রমে মহিষী, বাবাতা, ও পরিবৃক্তি কহিত। সস্ত্রীক রাজকুমারেরা পৃথক্ রাজগৃহ আশ্রয় না করিয়া, রাজপুরমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ অন্তঃপুরে বাস করিতেন। রামায়ণের এক স্থান হইতে অন্তঃপুরের বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহার দ্বারা উহার ভাব জ্ঞাপিত হইতে পারে। দশরথ কৈকেয়ীকে রামাভিষেকের সম্বাদ দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া (২।১০।১২-১৬) দেখিলেন, কুব্জ ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল উহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হংস

(৪) বিবাহ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইত এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত, গৃহধর্ম্ম প্রস্তাবে কথিত হইবে।

(৫) রাজা প্রজা উভয়েরই মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ঋগ্বেদের ৭।১৮।২, ১।১০৫।৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(৬) মনু ৩।১৩। ব্রাহ্মণের চারিজাতির কন্যাই বিবাহ যোগ্য। ক্ষত্রিয়ের স্ব জাতি হইতে নিম্নে তিনজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহ যোগ্যা। বৈশ্যেরা ঐরূপ আত্ম হইতে নিম্নে দুই জাতির অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা বিবাহ করিতে পারিত। শূদ্রের কেবল শূদ্র কন্যা বিবাহযোগ্যা। নীচজাতি আপনা হইতে উচ্চ জাতির কন্যা গ্রহণে অক্ষম। পুনশ্চ ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্যে "রাজ্ঞাংহি ত্রিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ। উত্তম মধ্যমাধমজাতীয়াঃ। তাসাং মধ্যে উত্তম জাতেঃ ক্ষত্রিয়ায়াঃ মহিষীতি নাম। মধ্যম জাতের্বৈশ্যায়াঃ বাবাতেতি। অধম জাতেঃ শূদ্রায়াঃ পরিবৃক্তিঃ।"

কলরব করিতেছে। বাদ্য বাদিত হইতেছে। লতাগৃহ ও চিত্রিত গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এই বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকা সকল অতি সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অন্নপানে ও মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া।" ইত্যাদি।—হে।(৭)

রাজারা বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই প্রায় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া, ধর্ম্মকামনায় বনপ্রবেশ করিতেন। ২।২—রাজপুত্রদের অভিষেকের পূর্ব্বাহ্নে অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজাদিগের, রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তির ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতি গৃহীত হইত। কিন্তু পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাজ্য লইয়া বিবাদ বিসম্বাদের উল্লেখ থাকায়, অনুমান হয় যে ওরূপ সম্মতি গ্রহণ করা কেবল নামে মাত্র এবং ঐ সম্মতির উপর নূতন অভিষেক অল্পই নির্ভর করিত। যাহাহউক ক্ষীণতা সত্বেও প্রথাটি প্রশংসনীয় এবং প্রার্থনীয়। নানা কারণে উহার ধ্বংস না হইলে, সময়ে অনেক সুফল ফলিতে পারিত। বৃটনের "বিজ্ঞ" ইতি খ্যাত যে সমাজ দিনামার রাজাদিগের নিরন্তর পদানত থাকিয়া, তাহাদের ভালমন্দ সকল বাক্যই অনুমোদন করিয়াছে, সময়ে তাহাই মহাসভা রূপে পরিণত হইয়া এরূপ প্রতাপান্বিত হয়, যে, তাহার প্রতাপে তৃতীয় জর্জ চোখের জলে ভাসিয়া হানোবরে যাইয়া শান্তিলাভ করিতে উৎসুক হয়েন।

অনন্তর অভিষেকযোগ্য রাজকুমার নিরূপিত হইলে, অভিষেকের যেরূপ আয়োজন হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হইবে। ২।৩—"সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদায়, পূজার দ্রব্য. সর্ব্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্তবস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্যক হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রাতে মহারাজার অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখ। মালা, চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজ প্রসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, এরূপ দধি ও ক্ষীরমিশ্রিত সুদৃশ্য ও সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভূত দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় মাত্র স্বস্তিবাচন হইবে।

(৭) এই অংশ পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। যথায় যথায় উক্ত পণ্ডিত কৃত অনুবাদ গৃহীত হইবে, তথায় তথায় তাহা জ্ঞাপনার্থে অনুবাদ ভাগের শেষে "হে" চিহ্ন দেওয়া থাকিবে।

এক্ষণে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিতা হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন এবং চৈত্যসমুদয়ে অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ-দ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্বারা দেব পূজা কর। বীরপুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসিচর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উৎসবময় অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করুক।"—হে।

তাহার পর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, যেরূপ রাজদৃশ্যের আড়ম্বর হইত, তাহা অভিষেকের নির্দ্ধারিত দিনে রামের রাজভাব কিছুমাত্র না দেখিয়া, বিস্ময় বশতঃ সীতা রামের প্রতি যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন, তাহাতে উপলব্ধি হইবে। ২।২৬—"শতশলাকারচিত শ্বেত ছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই! শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামর যুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত ইহা ব্যজন করিতেছে না! সুত, মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল গীত গান করিয়া আজ কৈ তোমার স্তুতিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ্ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্প-রথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান্ অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাববান্ হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচার-কেরা সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে আগমন করিল!"—হে

রাজাদিগের প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে, কিরূপ আড়ম্বর হইত তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। ২।৬৫—"রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সুত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রিনাদ নির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজ-ভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণি-বাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্যসকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্র-দানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতি-বুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্রস্থান ও তীর্থের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধা-চার সেবানিপুণ বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নান বিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণকলসে হরিচন্দনসুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় বেণু, পানীয় গঙ্গোদক এবং পরিধেয় বস্ত্র ও

আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদায়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত রাজ-দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল।"—হে।

অনন্তর রাজারা শয্যা হইতে উত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া মন্ত্রী ও অপরাপর অমাত্যবর্গ সহ রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ১।৭—মন্ত্রী আটজন, (৮) ইঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয়। এই অন্য জাতির মধ্যে শূদ্র স্থান পাইত কি না তাহা রামায়ণে ব্যক্ত নাই।(৯) কিন্তু ইঁহাদের যেরূপ গুণাবলি কথিত হইয়াছে, তাহা তৎসাময়িক কঠোরশাসনাধীন শূদ্রে সম্ভব নহে।

(৮) "মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধ
লক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত
পরীক্ষিতান্॥" ৫৪
মনু ৭ অ।

রামায়ণের সাময়িক বন্দোবস্ত অধিক উন্নত বলিয়া বোধ হয়। মনু এই নিযুক্ত মন্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণদের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু রামায়ণে কথিত আটজন মন্ত্রী ব্যতীত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এবং ঋত্বিক্ ছিলেন, ইঁহারা সকলে মিলিয়া কার্য্য করিতেন।

(৯) মনু সংহিতা সপ্তম অধ্যায়—মন্ত্রীদিগের সদ্বংশজাতত্বের উপর এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাহাতে শূদ্রেরা বিনা উল্লেখেই বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে হনুমান্ সুগ্রীবের মন্ত্রী, কিন্তু এ উভয়ই বানরজাতি, অনার্য্য, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রে অধিকার নাই, অথবা থাকিলেও বেদে কখনই ছিল না। কিন্তু হনুমান্ সুগ্রীবের আজ্ঞামত রামের নিকট দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিলে, রাম লক্ষণের নিকট হনুমানের প্রশংসা করিয়া কহিতেছেন,

"নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥"

৪।৩

—ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় যাহার বিদিত নহে, সে এরূপ বাক্য বলিতে অশক্ত। ইনি নিশ্চয়ই পদার্থস্বরূপ নির্ণয়োপযোগী ন্যায়, সাহিত্য, ব্যাকরণ অনেকবার শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, কারণ এতবাক্য কহিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ ইঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না।—

এখন দেখা যাইতেছে হনুমান্ অনার্য্য বানর হইলেও বেদ বিদ্যা এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইঁহার দ্বারা কি এরূপ বোধ হয় যে আর্য্যব্যতীত শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতিরাও মন্ত্রিত্ব কার্য্যদক্ষতার উপযোগী বেদ ও নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত হইতে পারিত, এবং তাহাদের সে শিক্ষা ফলে পরিণত হইত? বোধ হয় না। তবে কি চতুর্দ্দিকে জাতীয় শাসনে কঠোরতা-সত্ত্বেও বাল্মীকি ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন? তাহাও নহে। উক্তবাক্য দ্বারা

মন্ত্রীদিগের বিদ্যাবত্তার কতক পরিমাণে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এই মাত্র, তদ্ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। তবে যে এরূপ বিদ্যাবত্তা অনার্য্য বানর হনুমানের প্রতি বাল্মীকি আরোপ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় হনুমান্ দেব অংশ, পবনপুত্র এবং নারায়ণরূপী রামের ভক্ত বলিয়া।

কথিত আটজন মন্ত্রীর সকলেই বীর পুরুষ, নানা শাস্ত্রবিদ্, মন্ত্রজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, হিতেরত, অর্থবিদ্, লোকপ্রিয়, যশস্বী এবং সুবক্তা। ইহারা যুক্তকরে রাজপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া যথাসম্ভব উপদেশ প্রদান করিতেন। তদ্ভিন্ন দুই জন মুখ্য ঋত্বিক এবং সাত জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীও থাকিতেন এবং তাঁহারা রাজকার্য্যে পরামর্শ দান করিতেন। স্বদেশ এবং বিদেশবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থে দূত নিয়োজিত থাকিত এবং শার্লেমানের সাময়িক প্রথার ন্যায় রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য গোপনে অনুসন্ধানের নিমিত্ত এবং প্রকাশ্যে পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত গুপ্তচর ও চর সকল নিযুক্ত থাকিত। ৩।৬।১১, ২।৭৫।২৫ ইত্যাদি—

রাজারা প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ (১০) কর গ্রহণ করিতেন। কোন বিশেষ দ্রব্যের উপর ভিন্ন হারে কর আদায় হইত অথবা সমস্ত বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর আদায় হইত, ইহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সমস্ত অথবা যে বস্তুর উপরেই ষষ্ঠাংশ হারে কর গৃহীত হউক না কেন, উহা, সেই সময় বিবেচনা করিলে, দুর্ব্বহ তাহার সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কহেন যেখানেই করভার অধিক, সেইখানেই সমাজ সেই পরিমাণে উন্নত। এ কথা অন্য কোথাও খাটিলে খাটিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সমাজ এতদূর উন্নত হয় নাই, যে ষষ্ঠাংশ করভার অবলীলাক্রমে বহন করিতে সমর্থ। এরূপ সমাজে অধঃশ্রেণী কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিত তাহা অনুমান করা সহজ। ফলতঃ সেই সময় ও এই করভার বিবেচনা করিলে, আর্য্যরাজারা সমাজের যে কিছু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অবিবেচক বলা যাইতে পারে। যাহাহউক ভারত, তবু আনন্দে কাল কাটাইয়াছে।

করাদান ও বাণিজ্যবিনিময় কিরূপ উপায়ে সাধিত হইত, তাহা যতদূর অবধারণ করিতে পারা যায়, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। গ্রীসীয় পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে স্পার্টা নামক বিখ্যাত সাধারণ তন্ত্রে লৌহখণ্ড এতদর্থে ব্যবহৃত

(১০) মনুর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যাউক। সংহিতা ৭।১৩০—১৩২।—অন্যান্য দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর নির্ণয় করিয়া, কেবল পশু ও সুবর্ণলাভের উপর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, এবং কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপর তারতম্য বিবেচনা অনুসারে ছয় আট বা দ্বাদশ অংশের এক অংশ রাজা লইতেন।

হইত। রোমরাজ্যে রাজা সর্বিয়স-তলিয়সের পূর্ব্বে তাম্রখণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাঁহার সময় হইতে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। বৃটনদ্বীপে, নর্ম্মাণজাতীয় রাজা উইলিয়ম কর্ত্তৃক বৃটন অধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে, যে যাহা উৎপন্ন করিত সে সেই দ্রব্য দ্বারা রাজকর প্রদান করিত। অদ্যাপি অনেক অসভ্যস্থানে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদিগের ঘরের দ্বারে লুসাইজাতি গজদন্ত, শুষ্ক পশু, গয়াল প্রভৃতি গরুদ্বারা রাজকর প্রদান করিয়া থাকে।(১১) পাশ্চাত্য ভূভাগে ধাতুমুদ্রার প্রাচীনতম উল্লেখ বাইবেল গ্রন্থে দেখা যায়। তথায় একস্থানে(১২) কথিত আছে যে আব্রাহাম ম্যাকফিনার ভূমির মূল্যস্বরূপ এফ্রণকে চারি শত শেকল নামক ধাতু মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা ঐ কালীয় বণিকদিগের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা ছিল। যদি বাইবেলের রচনার সময়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাইবেলে কথিত মত আব্রাহামের সময়ও ঐ মুদ্রার প্রচলন কাল গ্রাহ্য করা যায়, তাহাহইলে ঐ মুদ্রা খৃষ্টের উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তৎপূর্ব্বে মুদ্রা প্রচলনের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মুদ্রার বিষয় ইহাও লিখিত আছে, যে আব্রাহাম যৎকালে এফ্রণকে চারি শত শেকল প্রদান করেন, উহা গণনায় নিষ্পত্তি না হইয়া ওজনের দ্বারা প্রদত্ত হয়। এ নিমিত্ত বোধ হয় যে উহার প্রত্যেকের পরিমাণের উপর বড় বিশ্বাস না থাকায়, দানাদান কালীন ওজন পদ্ধতি গৃহীত হইত। সুতরাং উহা কোন টাঁকশাল হইতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া, ঐ পরিমাণ বরাবর রক্ষার্থে বিশেষ কোন উপায়যুক্ত হইয়া বাহির হইত না। এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের বহুস্থানে উল্লেখ আছে, একস্থান মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা, "দশোহিরণ্যপিণ্ডম্ দিবোদাসাদ্ অসানিষম্।"—৬।৪৭।২৩। এই হিরণ্যপিণ্ড কি রূপ পরিমাণ বিশিষ্ট তাহা ঋগ্বেদ দ্বারা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। অনুমান

(১১) গত লুসাই যুদ্ধে ধাতুমুদ্রা লইয়া কৌতুকাবহ ঘটনা হয়। দেবগিরি নামক স্থানের ওধারে যে সকল লুসাইজাতি বসতি করে, তাহারা তৎপূর্ব্বে কখন টাকা দেখে নাই। তাহাদের নিকট হইতে পশু ও কুক্কুটের বিনিময়ে ইংরেজ পক্ষীয় লোকের দ্বারা একবার ধাতুমুদ্রা প্রদত্ত হওয়ায়, তাহারা সেই প্রথম টাকার মুখ দেখে, কিন্তু দেখিবামাত্র তাহার উপর এত মায়া বসে ও তাহা লাভের ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে তখন এক একটি মুরগী এক টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া শেষে কেহ কেহ ডবল পয়সায় পারা মাখাইয়া টাকা বলিয়া দিতে আরম্ভ করে। তাহারা তাহাও টাকা জ্ঞানে আনন্দে গ্রহণ করিত। ইহারা টাকা লইয়া তাহার চাকচিক্য হেতু গলায় গাঁথিয়া পরিত, তদ্ভিন্ন তাহার অন্যরূপ ব্যবহার তাহাদের সিদ্ধান্তে আসিত না।

(১২) Genesis XXIII

হয় যে উহা সাদৃশ্যে শেকলের সঙ্গে সম জাতীয় হইতে পারে, অর্থাৎ শেকল পাশ্চাত্য ভূমিতে যে ভাবে যে অবস্থায় চলিত, ভারতে হিরণ্যপিণ্ডের অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত বা অবনত বলিয়া বোধ হয় না। তথা হইতে রামায়ণের সময় অবতারণ করিলে দেখা যায় যে এখন আর হিরণ্যপিণ্ডের ব্যবহার নাই, তৎপরিবর্ত্তে স্বুবর্ণ ও নিষ্ক প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের আকার প্রকার বা পরিমাণ(১৩) যদিও রামায়ণে নাই, এবং থাকিবারও কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি ইহাদের উল্লেখেই অনুমান হয় যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট; এবং সর্ব্বদা সেই পরিমাণ রক্ষা করিয়াছে, কারণ যেখানেই উহার দান আদান ক্রিয়া, তথায়ই গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে, ওজনের দ্বারা কুত্রাপি নহে। এখন জিজ্ঞাস্য যে ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বদা কি উপায়ে রক্ষিত হইতে পারে? ইহাতে ব্যবহার সাক্ষ্য দিতেছে যে রাজনিয়মাধীন কোন চিহ্নে মুদ্রার চতুর্দ্দিক চিহ্নিত না হইলে অসৎগণের কৌশল হইতে পরিমাণ রক্ষা হয় না। রামানুজ রামায়ণের ২। ২৩। ১০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে "স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক সহস্র।" পুর্ব্বোক্ত অনুমানস্থল না থাকিলে, রামানুজ আধুনিক লোক বলিয়া, তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইত এবং তাঁহার কথায় কথনই বিশ্বাস করিতাম না। 'নামাঙ্কিত, একান্তই না হউক কিন্তু কোন চিহ্নে চিহ্নিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই অনুমান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু ব্যথার ব্যথী আর্য্যসন্তানগণের নিকট হইবে না বোধ হয়। ফলতঃ ডিওমীড় প্রভৃতি হোমারিক ব্যক্তিগণ যখন পশ্বাদি বিনিময় দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র ও দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন, ভারত সে সময় প্রকৃত মুদ্রাপদে বাচ্য মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। ১৪

১৩। স্বুবর্ণ ও নিষ্কের পরিমাণ মনুসংহিতায় এরূপ দেওয়া আছে।

সর্ষপাঃ ষট্ যবোমধ্যস্ত্রিযবন্তেক কৃষ্ণলং।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে স্বুবর্ণস্তু ষোড়শ॥"
১৩৪

"চতুঃ সৌবর্ণিকোনিষ্কঃ।" ১৩৭।
৮ অ।

অর্থাৎ

৬ সর্ষপ	=	=	১ যবোমধ্য।
৩ যবোমধ্য	=	=	১ কৃষ্ণল।
৫ কৃষ্ণল	=	=	১ মাষা।
১৬ মাষা	=	=	১ স্বুবর্ণ।
৪ স্বুবর্ণ	=	=	১ নিষ্ক।

(১৪) প্রিন্সেপ সাহেব যত প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার Indian Antigutes vol I পুস্তকে Plate VIIতে বিহাটের নিকট প্রাপ্ত মুদ্রার যে সকল ছবি দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে প্রথম সংখ্যক মুদ্রা নানা কারণে অনুমিত হয় যে উহা খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের। ঐ মুদ্রারও আকার প্রকারে দেখা যায় যে উহার উভয় পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে ছবি ও অক্ষরে অঙ্কিত। সত্যই মুদ্রার ওরূপ ভাব ঐ মুদ্রার তারিখ হইতে প্রচলিত হয় নাই। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে চলিত হইয়া আসিয়া থাকিবে বোধ হয়।

রাজাদিগের মধ্যে উপহার দেওয়ার নিমিত্ত কিরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত ছিল, তাহা কেকয় রাজ কর্ত্তৃক ভরতকে উপহার প্রদত্ত দ্রব্যদ্বারা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তথায় (২)৭০) ৪ কথিত হইয়াছে যে উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালবদন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শশত অশ্ব ভরতকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

ভারত এখন প্রাচীন গৌরবের প্রথম পর্য্যায়ের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছেন। এখন রাজন্যবর্গের তেজস্বিতা অপরিসীম। যদিও উহা ব্রহ্ম তেজে এখন কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্বগৌরব হইয়াছে, তথাপি তেজ সূর্য্যবৎ প্রদীপ্তমান। পূর্ব্বের ন্যায় এখন পশুবৎ তেজ নহে, তাহার সহ সদসদ্ বিবেচনা প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হইয়াছে। সমাজে এখন বীর্য্যের গৌরব এত অধিক যে রাম এত গুণসম্পন্ন হওয়াতেও, বাল্মীকি তাঁহার বল পরীক্ষা ব্যতীত বিবাহ দিতে সক্ষম হইলেন না। সীতা স্ত্রীলোক হইয়াও বীর্য্যগৌরব এতদূর বুঝিতেন যে তিনি, রাবণ কর্ত্তৃক জয়লব্ধ না হইয়া হৃত হইয়াছেন বলিয়া, রাবণকে কতই ধিক্কার দিয়াছিলেন। আবার পরশুরামকে ব্রাহ্মণ জানিয়াও, যদিও রাম ব্রাহ্মণে ভক্তি বশতঃ প্রথমে অস্ত্রোত্তোলন করেন নাই, কিন্তু পরশুরাম ভ্রমক্রমে তাহা ভীরুতা হেতু অর্থাৎ ভিরুতায় অস্ত্রোত্তোলন করেন নাই জ্ঞান করিয়া, যখন ভর্ৎসনা করিলেন, তখন রাম ভক্তি মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদর্পে কহিলেন,

"বীর্য্যহীন মিবাশক্তং ক্ষত্রধর্ম্মেণ ভার্গব।"
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেহদ্য পরাক্রমম্॥"

কি মধুর বাক্য! এবাক্যের কি তখন প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, না প্রতিধ্বনি উহা স্বীয় করগত রাখিয়া আজি পর্য্যন্ত ধ্বনিত করিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন? তবে কবে হইবে? যে দিন হইবে, সেই না জানি কি সুখের দিন! ভারত সন্তানেরা সেই দিন সে মধুর ধ্বনিতে কতই আনন্দ লাভ করিবেন, কতই পোষিত আশা ফলবতী ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে থাকিবেন। তাঁহাদের সে সুখের চিন্তামাত্রেই আমরা যখন এত সুখী হইতেছি, তখন তাঁহাদের সে সুখ যে কত উন্নত তাহা কে বলিতে পারে!

ইতি পঞ্চম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাণভট্ট।

বিখ্যাত নামা বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যসংসারমধ্যে একখানি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ব্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনয় ভাগ। গ্রন্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই এজন্য তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চার্লস্ ডিকেন্স "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার শেষ উপন্যাস গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাঁহার উপযুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক উইল্কী কলিন্‌স্‌ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারমধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরল। কোন সংস্কৃত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং বাণ পুত্র দেখিলেন তাঁহার পিতার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিলোপ হইবার সম্ভাবনা এজন্য কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া গ্রন্থখানি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুনবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাস ভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনা প্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণতনয়ের গ্রন্থ রচনা দ্বারা যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পিতৃকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষ ভাগ রচনা না করিলে গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বোধ করি এত দিন লোপ পাইত; সুতরাং এতাদৃশ কুলপাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোক মধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

বভূব বাৎস্যায়ন বংশ সম্ভবো
দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃসতাম্।
অনেকভূপার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ
কুবের নামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ।
উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে
সদা পুরোডাসপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে
সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥
জগুর্গৃহে গ্রস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ
সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমানা বটবঃ পদে পদে
যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ।

হিরণ্যগর্ভোভুবনাণ্ডকাদিব
ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণোবিনতোদরাদিব
দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ॥
বিবৃন্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং
দিনে দিনে শিষ্যগণা নবা নবাঃ।
উষস্সু লগ্নাঃ শ্রবণেঽধিকাং শ্রিয়ং
প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব॥
বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ
স্ফুরন্মহাবীর সনাথ মূর্ত্তিভিঃ।
মখৈরসংখ্যৈ রজয়ৎ সুরালয়ং
সুখেনযো যূপকরৈর্গজৈ রিব॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং
সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং
ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্॥
মহাত্মনো যস্য সুদূর নির্গতাঃ
কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ।
দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা
গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব॥
দিশামলীকালকভঙ্গতাং গত-
স্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বর ধূমসঞ্চয়ো
মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ॥
সরস্বতী পাণি সরোজ সম্পুট-
প্রমৃষ্টহোম শ্রমশীকরাম্ভস।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপা-
স্ততঃ সুতোবাণ ইতি ব্যজায়ত॥

অর্থাৎ অশেষ গুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়ন বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অদ্ভুত যাজ্ঞিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, [তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যাজ্ঞিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে] সেই কুবের হইতে অর্থপতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির অনেক গুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন [৮] [৯] শ্লোকদ্বয়োক্ত বিশেষণ সম্পন্ন চিত্রভানুর যে তনয় জন্মে! তাঁহার নাম বাণ——

বাৎস্যায়ন
[গোত্র]
|
কুবের।
|
অর্থপতি।
|
চিত্রভানু।
|
বাণ।
|
তৎপুত্র॥

বাণ ভট্ট গ্রন্থমধ্যে এই মাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কবিবৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। সারঙ্গধর পদ্ধতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখর ধৃত এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয় যথা—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যাযন্ মাতঙ্গ দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভব সভ্যঃ সমো বাণ ময়ূরয়োঃ।

এই শ্লোকে মাতঙ্গ দিবাকর, বাণ ও ময়ূরকে শ্রীহর্ষরাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কহেন বাণ ও ময়ূর সমসাময়িক কিন্তু মাতঙ্গ দিবাকরের নাম অন্য কোন গ্রন্থে দেখি নাই। পণ্ডিতবর হলসাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরি স্থির করিয়াছেন, এটী প্রামাণিক হইতেও পারে, কেন না মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক্ষণে এই তিন জনের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

বাণভট্ট হর্ষচরিত প্রণেতা। কাণ্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অঃ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া ছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতুনলিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কাণ্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহাঁন কহেন এই হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাণ্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কাণ্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙ সিয়াঙের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যষ্টীগৃহ এবং মণিপুরে বাস করিয়া কাণ্যকুব্জ গমন করেন। বাণভট্ট, ময়ূর ভট্টের জামাতা। ইহাঁদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ূরভট্ট উজ্জয়িনীবাসী। তিনি এবং বাণভট্ট উভয়ে বৃদ্ধ ভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, এজন্য পরস্পর বিদ্যা বিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা এই বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে কাশ্মীরে বিদ্যা পরীক্ষা জন্যগমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্দ গ্রন্থ ভার বহনকরিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে কহিল এই ৫০০ শত বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; এতৎশ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে২ কিয়দ্দূরে দেখেন পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে; তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত২ ধিক্কার দিয়া পরস্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ূরভট্ট সরস্বতী কর্ত্তৃক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা জন্য আর

করিলেন "শত চন্দ্রং নভস্থলং।" ময়ূর নিমেষ মধ্যে তাহার পদ পূরণ করিয়া কহিলেন—

দামোদর করাঘাত বিহ্বলীকৃত চেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্থলম্।

এইরূপ সমস্যা পূরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে ভ্রুকুটী কুটিল করত ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন "তোমরা উভয়েই সৎকবি এবং সুপণ্ডিত কিন্তু বাণ তুমি গর্ব্বে হুঙ্কার ধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার গর্ব্ব হ্রাস করিবার জন্য "ওঁ" শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ উক্ত টীপ্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনায় সমালোচন সময়ে তোমার বিদ্যা গৌরব খর্ব্ব হইল; অতএব পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে উভয়ের চেতন হইল এবং সেই অবধি রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। ময়ূর ভট্ট তাঁহার কন্যার কণ্ঠ স্বর শুনিয়া হঠাৎ গবাক্ষ দ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন বাণ তাঁহার স্ত্রীর পদযুগল ধারণ করিয়া বার২ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও দুঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনয় বাক্যে ও শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্ট গোপনে এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্ব্বিত তাম্বূল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "এই চর্ব্বিত তাম্বূলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবা মাত্র ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূর ভট্ট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সূর্য্যদেবের মন্দিরে স্তব আরম্ভ করিলেন এবং একান্ত চিত্তে "জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভবমিব দধতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে স্তবারম্ভ করিলে, ষষ্ঠ শ্লোক —"শীর্ণঘ্রাণাঙ্‌ঘ্রি পানিন্" ইত্যাদি পাঠ মাত্র ভগবান্ অংশুমালী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্য শতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্টের প্রতি বন্দী; ময়ূরভট্ট অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইল। রাজা ময়ূরকে আদর করিতে লাগিলেন এবং সভাসদ্‌গণও

তাঁহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা দেখিয়া বাণভট্টের অসহ্য বোধ হইল। তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্ত পদ অস্ত্রদ্বারা খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্যে চণ্ডীকা শতকে চণ্ডীর স্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদ বিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প একজন জৈন টীকাকারের লিখিত, তাঁহার হিন্দুগণাপেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ূর ও বাণভট্টের বিষয় লিখিয়াই তাঁহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি ইচ্ছানুসারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিলেন। মনাতঙ্গ সূরি এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে বৃদ্ধ ভোজকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্প কিন্তু তাহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ূর, এবং বাণ এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্য শতকের টীকাকার মধুসূদনও এইরূপ বাণ ও ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্কর বিজয়ে দৃষ্ট হয় খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে বাণ ও ময়ূর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডীকাশতক, এবং কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তা। হর্ষ চরিতে শ্রীহর্ষরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার শঙ্কর ভট্টকৃত টীকা আছে কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে চণ্ডীকা শতক বিরচিত। উহা আদ্যোপান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে লিখিত আছে বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী তাঁহার উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য। কবি ইহার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন "দ্বিজ শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুণ্ঠিত বুদ্ধি দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন"† এ গর্ব্বোক্তি তাঁহার নিতান্ত অর্থশূন্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদম্বরী এই তিনখানি প্রসিদ্ধ গদ্য কাব্য, তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুমার ভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর চেতোবিলাস চম্পূ প্রভৃতির গদ্য রচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত হয় না। দীর্ঘ সমাস ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাতে গ্রন্থখানির রচনা স্থানে২ কিঞ্চিৎ নীরস হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় একখানি কাদম্বরী কথা

† দ্বিজেন তেনাক্ষত কণ্ঠ কৌণ্ঠ্যয়া
মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধবৈদগ্ধ্যাবিলাসমুগ্ধয়া
ধিয়া নিবদ্ধে যমতিদ্বয়ী কথা।

সার নামক কাব্য গ্রন্থ আছে। উহা ৮ সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাস ভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টকৃত পার্ব্বতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তার লেখনীপ্রসূত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন অলঙ্কার গ্রন্থ মধ্যে পার্ব্বতীপরিণয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্বরী গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের ঐক্য আছে যথা——

অস্তি কবিসার্ব্বভৌমো বৎস্যান্বয় জলধি সম্ভবোবাণঃ।
নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলাসিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়ন বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। রচনা দৃষ্টে নাটক খানি কাদম্বরী প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদাসের কুমার সম্ভব হইতে গৃহীত এবং কোন২ কবিতার কুমার সম্ভবের কবিতার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এই নাটক ৫অঙ্কে সম্পূর্ণ।

শ্রীরাম দাস সেন

রজনী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তোমাদের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা, আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমারা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যুথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার

প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুথিকা সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে কানায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্ত ভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যতদিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহ কর্ম্ম করিতেন। অবকাশ মতে পিতা মাতা উভয়েই আমাদিগের মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুল দেখিতে শুনি বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক-প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই,
ফুটলোনাকো কলি—

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই আমি পুরুষ কি মেয়ে! তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল। আমি বলিব না।

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কানা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গ রঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা আমিও যদি কানা হতেম!"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতে ছিলাম। শুনিলাম মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার। অত্যুচ্চ, অটল অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন,—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্ট মহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স্ পনের বৎসর। সতের বৎসর বয়সে—বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে, কালীচরণ বসু

নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলানার দোকান ছিল। সেও কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—এজন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালী বসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সমুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ—জিজ্ঞাসা করিল "ও কেও?"

আমি বলিলাম "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতে থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস না—তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন, তুই আমার বর হবি?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক অনেককাল আমার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "হাঁ গা বলে কি কলে গা?" বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি—সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বড় বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সেকালের মালিনীমাসী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেন না সে বড়বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া, রসিক মহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পনি আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা। তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তার গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা, লোকে

বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিত লবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে । রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিত-লবঙ্গ-লতা, নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্ধুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশীতে ইপিকা, বাতে ফানেল, এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিত-লবঙ্গ-লতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি তিনি রূপসী। রূপ যাউক্, গুণ শুনিয়াছি। লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে, একটি এই যে তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে ভালবাসে কি না সন্দেহ। ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চসমাগুলি, লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া, যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত। সদানন্দের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারি আনার ফুল লইয়া দুইটাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ আমি কাণা। মালা পাইলে, লবঙ্গ গালি দিত, বলিত এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস কেন? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—দুই বার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক, রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে, আমাদিগের দিনপাত হইত না। তবে যাহা রয় সয়, তাই ভাল, বলিয়া মাতা, লবঙ্গের কাছে, অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া সদানন্দকে সাজাইত। সাজাইয়া,

বলিত, দেখ, রতিপতি। রামসদয় বলিত, দেখ, সাক্ষাৎ—অঞ্জনানন্দন। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত,

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশী ?"—

লবঙ্গ। "আজ্ঞে, ঠাকুরদাদা মহাশয় দাসী হাজির।"

রাম। "আমি যদি মরি ?"

লব। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত "আমি বিষ খাইব।" রামসদয়, তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়ীতে ফুল যোগান দুঃখ কেন? শুন।

একদিন মার জ্বর। অন্তঃপুরে, বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণ ছিল। বেত্র হস্তে সর্ব্বত্রে যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ি ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো! দেখ্‌তে পাস্‌নে? কাণা নাকি?" আমি ভাবিতাম "দুজনেই।"

ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কিলো কাণী—আবার ফুল লইয়া মর্‌তে এয়েছিস্ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল

"একে ছোট মা?"

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন পুত্র! বড় পুত্রের কণ্ঠ এক দিন, শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন, এবার বড় মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "ও কাণা ফুল ওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী! আমি বলিবা কোন ভদ্র লোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন, গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্র লোকের মেয়ে হয় না?"

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটীত ভদ্র লোকের মেয়ের মতই বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হইল কিসে?"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের

সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়াও চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্র বাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত গা।"

আমি জড় সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।"

চাব কি ছাই!

"আমার দিকে চোখ ফিরাও।"

কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুণ জ্বেলে দিই। সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম!

সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুথী, জাঁতি, মল্লিকা, সেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি। সর্ব্ব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত, কাণার সুখ দুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আমরি মরি—সে নবনীত সুকুমার—পুষ্পগন্ধময়, বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ দুঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা তুমি, বিলোল কটাক্ষকুশলিনি! কি বুঝিবে।

ছোট বাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত সেই জন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, "তা না সারুক টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না?"

ছোট বাবু। "কেন, এঁর কি বিবাহ হয় নাই।"

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোট বাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল "এমন ছেলেও দেখি নাই! আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে মানুষ, সকল কথা ত জানি না। বিবাহ কি হয়?"

ছোট বাবু, ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখ আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে ললিত-লবঙ্গ-লতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সে স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড় মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্ত্যনীয়

শক্তিধর, অনন্তবৈচিত্রবিশিষ্ট জড় পদার্থ সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য, বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষজাতি, দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময়স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত—থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কি অপরাধে দেখিতে পাইব না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখনও দেখিব না?

না! না! অদৃষ্টে নাই। হৃদয় মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু, শব্দস্পর্শ গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

দেবতত্ত্ব।

সচরাচর আমাদিগের চতুঃ পার্শ্বে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগের মধ্যে অনেক গূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। আমরা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি, মানব শিশু হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে আনন্দে দৌড়িতেছে; সহসা কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালে বাধিয়া পড়িয়া গেল; কোমল অঙ্গে ব্যথা পাইল; অমনি উঠিয়া উক্ত কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালকে মারিতে লাগিল। মারি দেখিয়া আমরা হাসি। হাসি কেন? আমরা জানি যে কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়াল অচেতন, শিশু উহাকে সচেতন জ্ঞান করিতেছে, শিশু ভাবিতেছে যে মারিলে উহার গাত্রে বেদনা লাগিবে। কিন্তু আমরা যতবড় বি-

ম্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হই না কেন, আমাদিগের হাসিবার কারণ অতি অল্পই আছে। আমরাও এককালে ঐ শিশুর সদৃশ ছিলাম। জ্ঞানোন্নতিসহকারে শিশুর ভ্রম দূর হইবে; সে জানিতে পারিবে যে কপাট, কাষ্ঠাসন, দেওয়ালপ্রভৃতি জড় পদার্থ, সচেতন নহে। কিন্তু প্রথমতঃ এই সকল বস্তুকে সচেতন জ্ঞান করাই শিশুর স্বভাবসিদ্ধ। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপর পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হই। শিশুও এইরূপ করিয়া থাকে। আদৌ যে পদার্থের কারণত্ব তাহার জ্ঞানগোচর হয়, সেটী তাহার সচেতন আত্মা; বিশ্বপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াই সে আপনাকে কতকগুলি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং জানিতে পায় যে সে নিজে ইচ্ছা ও চেতনাবিশিষ্ট। সুতরাং যেখানে কোন কার্য্য দেখে, সেখানেই সচেতন ও ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা কল্পনা করে। ইহাতে তাহার ভ্রম হয় বটে, কিন্তু অনুমানের অন্য পথ অবলম্বন করিবার শক্তি তাহার নাই। যখন তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে, তখন সে বুঝিতে পারিবে যে প্রথমে যে সকল নির্জ্জীব পদার্থকে সচেতন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, ইচ্ছা এবং চেতনার প্রধান লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই; সুতরাং তখন তাহার ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইবে।

জ্ঞানসম্বন্ধে আদিম কালের মানবগণ এখনকার শিশুদিগের ন্যায় ছিলেন। আমরা যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা জগৎ কার্য্যের ব্যাখ্যা করি, তাঁহারা সে সকল কিছুই জানিতেন না। এ বিশ্ব তাঁহাদিগের নিকটে অসম্বদ্ধ ঘটনাবলীপূর্ণ বোধ হইত। আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বসাদৃশ্যে জগৎকার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্রই সচেতন এবং ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা অনুমান করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন যে বায়ুর প্রভাবে কখন বা লতাপল্লব মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে, কখন বা মহদাকার মহীরুহ ভঙ্গ বা সমূলে উন্মূলিত হইতেছে; দেখিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে বায়ু সচেতন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল কার্য্য করিতেছেন। সূর্য্য কখন অন্ধকার বিনষ্ট এবং জগৎ আলোকিত করিতেছেন, কখন বা প্রখর উত্তাপদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন; দেখিয়া তাঁহারা ভাবিতেন যে সূর্য্যও চেতনা বিশিষ্ট এবং কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন হন বলিয়া ইচ্ছাক্রমেই এরূপ করেন। অগ্নি কখন শীতার্ত্তের ক্লেশমোচন করিতেছেন, কখন আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, কখন তিমির হরণ পূর্ব্বক নিশাকালে পদার্থ প্রকাশ ও ভয় নিবারণ করিতেছেন, কখন বা ভীমমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কাননরাজী বা গৃহাবলী ভস্মসাৎ করিতেছেন; দেখিয়া তাঁহারা কল্পনা করিতেন যে অগ্নি সচেতন এবং কখন তুষ্ট কখন রুষ্ট হন বলিয়া এই সকল কার্য্য

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বকালে প্রাকৃতিক ঘটনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অতিমানুষিক সচেতন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কোন কোনটী মনুষ্যের মঙ্গলকর, কোন কোনটী অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রথমোক্তদিগকে দেব, এবং শেষোক্তদিগকে অসুর বা দৈত্য বলিতেন। তাঁহাদিগের লিখনভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে তাৎকালিক অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া শুনিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষে আলোক যেরূপ উপকারী বোধ হইত, সেরূপ আর কিছুই হইত না; এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রভাশালী সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্তুতিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এই কারণেই আবার, যে মেঘ দিনমণি ও নিশামণিকে আবৃত করিয়া জগৎপ্রকাশক জ্যোতিঃ হরণ করিত, যে রাত্রি পৃথিবীমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন করিত, এবং যে রাহু করাল কবল ব্যাদানপূর্ব্বক প্রভাকর ও সুধাকরকে গ্রাস করিত, তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা যে কেবল প্রলাপ বাক্য বলিতেছি না, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। দেবগণ প্রাচীন দিগের আরাধ্য, এবং দীপ্ত্যর্থবোধক দিব্‌ধাতু হইতে দেব শব্দের উৎপত্তি। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান শত্রু বৃত্র, এবং বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ।(১) অসুরেরা দেববিরোধী, এবং রাত্রির একটী নাম অসুরা।(২) রাহু গ্রহণের কারণ এবং একজন প্রবল দৈত্য।

ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা জানা যায় যে মধ্য এসিয়ার আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই আর্য্যজাতির মধ্যে দেবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত দেবস্‌,(৩) লাটিন দেউস্‌ (Deus), গ্রীক্ থেওস (Theos), ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পারসিক ভাষায় দেউ শব্দে দৈত্য এবং অহুর শব্দে দেবতা, বুঝায়। যে কারণে সংস্কৃত সপ্তাহ পারসীতে হপ্তা, সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু পারসীতে হপ্তহেন্দু, হইয়াছে, সেই কারণেই সংস্কৃত অসুর পারসীতে অহুর হইয়াছে। অসুর প্রাচীন পারসিকদিগের উপাস্য, এবং দেব ঘৃণ্য; ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইয়া হিন্দু এবং পারসিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

যে যে নৈসর্গিক ঘটনা লইয়া যে যে দেবতা কল্পিত, সেই সেই নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সেই সেই দেবতাকে পুরাতন ঋষিগণ কত আখ্যা দিয়াছিলেন। এই আখ্যাগুলি অনেক সময়ে প্রাকৃততত্ত্বসমুদ্ভবা কবিকল্পনার সৃষ্টি। কাল-

---

(১) তারানাথ কৃত শব্দস্তোম মহানিধি দেখ।

(২) তারানাথ কৃত শব্দস্তোম মহানিধি দেখ।

(৩) দেবশব্দের প্রথমার একবচন, দেবঃ বা দেবস্‌।

ক্রমে তাহাদিগের মূল ভুলিয়া গিয়া লোকে যখন তাহাদিগের ব্যাখ্যা চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন দেবতত্ত্ব সংক্রান্ত নানাবিধ উপাখ্যানের উৎপত্তি হইল। ভট্টমোক্ষমূলর বলেন, "যে সকল লোকে সুবর্ণবর্ণ সৌরকররাজীকে তরুপল্লবের সহিত যেন খেলিতে দেখিয়াছে, এই সকল প্রসারিত করদিগকে হস্ত বা বাহু বলিয়া বর্ণনা করা সে সকল লোকের অতি স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে বেদে সূর্য্যের অন্যতর নাম সবিতা "হিরণ্য পাণি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কে ভাবিতে পারিত যে এমন একটী সরল উপমা ঔপাখ্যানিক ভ্রমের কারণ হইবে? কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে বেদের টীকাকারগণ সূর্য্যের হিরণ্যপাণি নামে তদীয় রশ্মির সুবর্ণ কান্তি না বুঝিয়া, তদুপাসকদিগের উপর বর্ষণ করিবার নিমিত্ত তদীয় হস্তে স্বর্ণ আছে, ইহাই বুঝিয়াছিলেন। পুরাতন স্বাভাবিক আখ্যা হইতে একপ্রকার উপদেশ গৃহীত হইয়াছে, এবং লোকে এই বলিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছে যে তদীয় যাজকদিগকে দিবার জন্য তাঁহার হস্তে স্বর্ণ আছে। "......তিনি যে কেবল উপদেশে পরিণত হইয়াছেন এমন নহে; তিনি একটী উত্তম উপাখ্যানের বিষয়ও হইয়াছেন। হিরণ্যপাণি সূর্য্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে লোকে অশক্ত হউক বা অনিচ্ছুক থাকুক, ইহা নিশ্চিত যে দেবতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুরাতন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে যজ্ঞে সূর্য্য আপনার হস্ত কাটিয়া ফেলেন এবং যাজকেরা তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে সুবর্ণহস্ত প্রদান করেন। উত্তরকালে সূর্য্য সবিতা নামে আপনি যাজক হইয়াছেন; এবং কিরূপে যজ্ঞবিশেষে স্বহস্ত কাটিয়া ফেলেন, আর কিরূপে অপর যাজকেরা তজ্জন্য স্বর্ণহস্ত নির্ম্মাণ করেন, তদ্বিষয়ক একটী উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।"*

* It was, for instance, a very natural idea for people who watched the golden beams of the sun playing as it were with the foliage of trees, to speak of these outstretched rays as hands or arms. Thus we see that in the Vedas, Savitar, one of the names of the sun, is called golden-handed (হিরণ্য পাণি). Who would have thought that such a simple metaphor could have ever caused any mythological misunderstanding? Nevertheless we find that the commentators of the Vedas see in the name golden-handed, as applied to the Sun, not the golden splendour of his rays, but the gold which he carries in his hands, and which he is ready to shower on his pious worshippers. A kind of moral is drawn from the old natural epithet, and people are encouraged to worship the Sun, because he has gold in his hands to bestow on his priests......He was not only turned into a lesson, but he also grew into a respectable myth. Whether people failed to see the natural meaning of the golden-handed sun, or whether thy would not see it, certain it is that the early theological treatises of the

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অনেক দেবতাই সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। সূর্য্যার্ঘ প্রদান কালে এই মন্ত্রটী উচ্চারিত হয়।

"নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে,
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।"

অর্থাৎ

"ব্রহ্মপ্রভাযুক্ত বিষ্ণুতেজোময় জগৎ প্রসবিতা শুচি কর্ম্মফলদায়ী সবিতা বিবস্বৎকে নমস্কার।" ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই সূর্য্যের নামভেদ মাত্র। যখন আমরা সূর্য্যোদয় কালকে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত বলি, এবং ব্রহ্মাকে রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করি, তখন কি মনে হয় না যে উদয়কালীন সূর্য্যকে প্রথমে ব্রহ্মা বলিত? আর ব্রহ্মা যে সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। সূর্য্যোদয়ে তিমিরাচ্ছন্ন জগতের প্রকাশ এবং নিদ্রিত জীবের জাগরণরূপ পুনর্জ্জীবন হয়। নিশাবসানে প্রভাকর দর্শনে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ দিগের মনে যে গভীর ভাব ও আনন্দের উৎপত্তি হইত, তাহা আমাদিগের বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমাদিগের ন্যায় তাঁহারা সবিতার উদয়াস্তের কারণ জানিতেন না; কিন্তু তৎসঙ্গে আপন আপন সুখ দুঃখের অনেক যোগ দেখিতে পাইতেন। দুর্দ্দান্ত নিশাচরদিগকে তাড়াইয়া, অন্ধকার বিনাশ করিয়া, কুজ্ঝটিকা নিবারণ করিতে করিতে, যখন দিনমণি পূর্ব্বদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া উদিত হইতেন, তাঁহার রশ্মির মৃত্যুসঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে যেন বিশ্বসংসার পুনর্জ্জীবিত হইত। মধুময়ী ঊষা তাঁহার আগমন সম্বাদ দিত, সুগন্ধ গন্ধবহ তাঁহার অভিনন্দন করিত, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ তাঁহার আগমনী গাইত, নব নব কুসুমে এবং নীহার মুক্তাফলে সুসজ্জিত হইয়া ধরণী নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করিত, এবং চতুর্দ্দিকে প্রফুল্ল জীবন স্রোত প্রবাহিত হইয়া নিঃশব্দে বা উচ্চ নিনাদে ঈদৃশ সুখপ্রদ দেবের মহিমা প্রচার করিত। যখন মেঘ আসিয়া দিবাপতির প্রভা আবরণ করিত, অবনী-সুন্দরী যেন দুঃখে ম্লানমূর্ত্তি হইতেন। প্রাচীন আর্য্যকবি এই দুঃখে দুঃখিত হইতেন; তাঁহার আননও বিবর্ণ হইত। কিন্তু যখন দিননাথ নীরদনাগপাশ ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইতেন, উল্লাসে কবি বিজয় সঙ্গীত গাইতেন। যখন হীনপ্রভ রবি পশ্চিমে ডুবিতেন, আর্য্য ঋষির অন্তঃকরণের শক্তিও ডুবিত, এবং স্বনিবাসে গমন পূর্ব্বক এই ভাবিতে

Brahmans tell of the Sun as having cut his hand at a sacrifice, and the priests having replaced it by an artificial hand made of gold. Nay, in later times the Sun, under the name of Savitar, becomes himself a priest, and a legend is told, how at a sacrifice he cut off his hand, and how the other priests made a golden hand for him."

Max Muller's Lectures on the Science of Language.
2nd Series Pages 378-79

ভাবিতে নিদ্রার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন যে পুনরায় আপনি অথবা সূর্য্য উঠিবেন কি না সন্দেহ। তৎকালে প্রভাকরের গতি বা পরিণাম সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন কথাই কহেন নাই; সুতরাং কল্পনার বিচিত্র সৃষ্টির বিস্তীর্ণ স্থান ছিল। আলোক এবং অন্ধকার, দিবা এবং রাত্রি, সূর্য্য এবং মেঘ, ইহাদিগের পরস্পর যুদ্ধ মঙ্গলশক্তি ও অমঙ্গল শক্তির যুদ্ধের ন্যায় প্রাচীনকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চক্ষে লাগিত। তাঁহারা অতিশয় উৎসাহ সহকারে এই সৌর নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিতেন; এবং কখন ভক্তিতে, কখন যুক্তিতে, কখন বা কবিত্বে, পরিপূর্ণ বাক্যে আপনাদিগের উচ্ছ্বসিত অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করিতেন। দূর প্রতিধ্বনিবৎ সেই অপুনরাগম্য কালের কোন কোন বাক্য বেদে শ্রুত হয়; এবং তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশে অনেক দেবতার প্রকৃতি নির্ণীত হয়।

আমরা বলিয়াছি যে সূর্য্যই ব্রহ্মা। এটী নূতন কথা নহে। সুবিখ্যাত কুমারিল্ল ভট্ট যখন বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই কথা বলিয়াছিলেন। কথিত আছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তদীয় কন্যা উষাতে উপগত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এই আপত্তি করিলে কুমারিল্ল ভট্ট বলিয়াছিলেন,

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয় বেলায়ামুষসমুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতিতদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণ কিরণাখ্যবীজ নিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ।" অর্থাৎ

"প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। উষার সহিত তাঁহার তেজ সংযোগ ঘটে, এজন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।"

বিষ্ণু যে সূর্য্য, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

"ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে
পদং।"

অর্থাৎ

"বিষ্ণু ইহা পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিনস্থলে তিনি পদ স্থাপন করিয়াছিলেন।" নিরুক্তকার যাস্ক ইহার পশ্চাদুদ্ধৃত অর্থ লিখিয়াছেন:—

"যদ্ ইদম্ কিঞ্চ তদ্ বিক্রমতে বিষ্ণুঃ।
ত্রিধা নিধাত্তে পদং।
ত্রেধাভাব্য পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দিবি"
ইতি শাকপূণিঃ।

"সমারোহণে বিষ্ণুপাদে গয়াশিরসি"
ইতিঔর্ণবাভঃ।

অর্থাৎ

"যাহা কিছু আছে, বিষ্ণু পরিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পদ তিনি ত্রিধা স্থাপন

করিয়াছেন, অর্থাৎ শাকপূণির মতে পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং আকাশে; ঔর্ণবাভের মতে সমারোহণে, বিষ্ণুপাদে এবং গয়াশিরে।”

দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের টীকার এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

“বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথং ইতি যত আহ ‘ত্রেধা নিদাধে পদম্,’ নিধাত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ।
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ।
পার্থীব্যোগ্নির্ভূত্বা
পৃথিব্যাম্ যৎকিঞ্চিদস্তিতদ্ বিক্রমতে
তদধিতিষ্ঠতি।
অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা।
সমারোহণে,
উদয়গিরাবুদ্যন্ পদমেকং নিধাত্তে।
বিষ্ণুপাদে, মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে।
গয়াশিরসি, অস্তগিরাবিত্যৌর্ণবাভ আ-
চার্য্যোমন্যতে।”

অর্থাৎ

“বিষ্ণু আদিত্য। কেন? কারণ, উক্ত হইয়াছে যে তিন স্থলে তিনি পদ স্থাপন করেন। কোথায় এরূপ করেন? শাকপূনির মতে, পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, এবং আকাশে। অগ্নিরূপে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহাতে পরিক্রম, তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে। আকাশে সূর্য্যরূপে।...... ঔর্ণবাভ আচার্য্যের মতে তিনি একপাদ উদয়কালে সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে স্থাপন করেন; একপাদ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুপাদে বা অন্তরীক্ষে; একপাদ গয়াশিরে অর্থাৎ অস্তগিরিতে।”

গয়াশির শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া, বিষ্ণুগয়াশিরে একপাদ স্থাপন করিয়াছিলেন ঔর্ণবাভ ঋষির এই কথা লইয়া লোকে যে গয়াসুরের গল্প রচনা করিয়াছে এবং সুবিধাক্রমে গয়ানামক একটী স্থান থাকায় এই উপলক্ষে তাহার মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে, ইহা বোধ হয় পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কোন একটী আখ্যার প্রকৃত অর্থভেদ করিতে না পারিয়া, কল্পনাদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই, অধিকাংশ দেবঘটিত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে পদে পদেই এই সত্যটী লক্ষিত হইবে।

কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু নহে, রুদ্র ও সূর্য্য। এবিষয়ে আমাদিগের অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই; প্রচলিত “রৌদ্র” শব্দই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। যখন সূর্য্য কিরণকে আমরা “রৌদ্র” বলিতেছি, তখন পূর্ব্বকালে যে সূর্য্যকে রুদ্র বলিত তাহার সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রই দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, কিন্তু বৈদিক সময়ে অপর তিনটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, “তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানোবায়ু র্বা ইন্দ্রোবান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাম্ মহাভাগ্যাদেকৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপিবা কর্ম্ম পৃথক্

স্থান্ যথা হোতাঽধ্বর্য্যু ব্র্হ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।”

অর্থাৎ

“নিরুক্তকার দিগের মতে দেবতা তিনটী; অগ্নি, পৃথিবী যাহার স্থান; বায়ু বা ইন্দ্র, অন্তরীক্ষ যাহার স্থান; এবং সূর্য্য, আকাশ যাহার স্থান। তাঁহাদিগের মহিমা প্রকাশার্থে তাঁহাদিগকে বহু নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে; অথবা তাঁহাদিগের কার্য্যভেদ প্রদর্শনার্থে, যথা একই ব্যক্তি কার্য্যভেদে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।”

আমরা দেখাইয়াছি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনটীই সূর্য্যের নামান্তর। এক্ষণে আমরা ইন্দ্রের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব; কারণ তিনি অদ্যাপি নামে দেবাধিপতি, এবং বৈদিক কালে অতি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শব্দস্তোম মহানিধিতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঐশ্বর্য্যার্থবোধক ইদি ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, এবং উহার যে সকল অর্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বাদশ অর্কের অন্তর্গত একটি অর্ক আছে।

কুমারিল্ল ভট্টের মতেও, ইন্দ্র সূর্য্য। ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে গিয়া কুমারিল্ল লিখিয়াছেন,

“সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দ বাচ্যায়াঃক্ষয়াত্মকজরণ হেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যা জার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।”

অর্থাৎ

“তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নয়।”

এই উপাখ্যান সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে অহল্যা গোতমের স্ত্রী ছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় যে গোতম শব্দের অর্থ চন্দ্র, গো (রশ্মি) এবং তম্ (বাঞ্ছা করা) হইতে ইহার উৎপত্তি; কেন না চন্দ্র যে সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হন, ইহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ জানিতেন,

যথা,

“পিতুঃপ্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ
শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে
রনুপ্রবেশাদিব বাল চন্দ্রমা॥”

রঘুবংশ।

অর্থাৎ

“সমগ্রসম্পদসম্পন্ন পিতার প্রযত্নে তাঁহার সুন্দর শরীরাবয়ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যেমন সূর্য্য রশ্মির অনুপ্রবেশে বাল চন্দ্রমা বৃদ্ধি পায়।”

অথবা এমনও হইতে পারে যে বাস্তবিক গোতম নামে একজন ঋষি ছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম অহল্যা ছিল। পরে লোকে এই অহল্যার সহিত সূর্য্যদুহিতা অহল্যার একতা অনুমান করিয়া গোতম মুনির স্ত্রীকে ইন্দ্র হরণ করেন এই গল্পটীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

বোধ হয়, এক অহল্যাকে অপর অহল্যা ভাবিয়া এই উপাখ্যানের আর একটী অংশ কল্পিত হইয়াছে। কথিত আছে যে পতির অভিসম্পাতে অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন; বহুকালান্তে রাম সীতা বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তারানাথ বলেন যে কর্ষণার্থ বোধক হল্ ধাতু হইতে অহল্যা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অহল্যা শব্দের অর্থ "যাহা কর্ষণযোগ্য নহে অর্থাৎ প্রস্তরময় ভূমি।" এই অহল্যার সহিত সূর্য্যদুহিতা অহল্যার একতা ভাবিলে অহল্যার পাষাণ হইবার কথা সৃষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য নহে। রাম সীতারে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে অহল্যাকে মুক্ত করিলেন, ইহারও গূঢ় অর্থ আছে। রাম শব্দের উত্তর আরাম বা সুখস্বচ্ছন্দ; সীতা কৃষ্টভূমি; অহল্যা অকৃষ্য ভূমি। সুতরাং ভাবার্থ এই হইতেছে, যে অকৃষ্য ভূমি মুক্ত করিয়া কৃষিকার্য্য করিলে মনুষ্যে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সীতার জন্মবিষয়ে যাহা কিছু লিখিত আছে; তাহাতেও আমাদিগের কথারই প্রতিপোষকতা হয়। সীতা পৃথিবীর কন্যা, অযোনিসম্ভবা, ভূমিকর্ষণকালে লাঙ্গলের ফালে উঠিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের দুইটি নামের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। তিনি না কি প্রথমে গোতমের শাপে সহস্রযোনি, পরে সেই মুনির প্রসাদে সহস্রাক্ষ হইয়াছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় ইন্দ্রকে সহস্রযোনি বলিবার অর্থ এই যে তিনি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি কখন সূর্য্য, কখন বায়ু, কখন বিষ্ণু, কখন বৃত্রহন্, ইত্যাদি; কেন না কার্য্য বা মাহাত্ম্যভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। সহস্রাক্ষ বলিতে সূর্য্যের সহস্র দিক্ প্রকাশক কিরণমালা; নতুবা অন্তরীক্ষপতি বলিয়া ইন্দ্রকে আকাশের সহিত এক জ্ঞান করিয়া আকাশের অসংখ্য তারকানিচয়কে তাঁহার চক্ষু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

মেঘের নাম বৃত্র; সেই বৃত্রের সহিত বেদে ইন্দ্রের অর্থাৎ সূর্য্যের ক্রমাগত যুদ্ধ। এই ঘটনা এবং দিবারাত্রির বিরোধ অবলম্বন করিয়াই বৃত্রাসুরের উপাখ্যান এবং দেবাসুরের সমর সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কখন কখন আমরা দেবতাদিগের পরাজয় দেখিতে পাই। মেঘ অথবা রাত্রি যেমন দিনমণিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, দৈত্যগণও তেমনই দেবগণকে সময়ে সময়ে পরাভূত করে। দিনমণি যেমন তৎকালে মহিমাবিচ্যুত হইয়া কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন, তেমনই দৈত্যযুদ্ধে বিগতগৌরব দেব-

গণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় লুক্কায়িত থাকেন। সময়ে সময়ে যেমন মেঘদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য মুক্ত হইবেন আশা জন্মে, তেমনই মধ্যে মধ্যে দৈত্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং দেবতাদিগের জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সহসা আবার যেমন নূতন মেঘ আসিয়া দিবাকরকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনই আবার নূতন দৈত্যসেনা সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া বিজয়প্রত্যাশী দেবতাদিগকে অভিভূত করে। কিন্তু মেঘের যত কেন প্রতাপ হউক না, মেঘ অশ্ব, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি যে কোন ভয়ানক মূর্ত্তি ধরুক না, পরিশেষে সূর্য্যের যেরূপ নিশ্চিত জয়লাভ হয়; তদ্রূপ দৈত্যগণ যত কেন প্রবল হউক না, তাহারা মায়া বলে যত কেন ভীষণাকার ধারণ করুক না, অবশেষে প্রভাশালী অমর নির্জ্জর দেবগণের জয়লাভ হইবেই হইবে।

দিনে সূর্য্যের আলোক আমাদিগের সহায়; রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোক। চন্দ্রসংক্রান্ত দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এবার এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

দীপ্ত্যর্থবোধক চদ্‌ ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দের উৎপত্তি। সুধাময়ী জ্যোৎস্না বিতরণ করিয়া নিশাসময়ে হিংস্রজন্তু ও শত্রুগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ চন্দ্র দেখাইয়া দিতেন। কেন তাঁহাকে দেবতা বলিয়া আদিকালের লোকে পূজা না করিবে? দিবাভাগে জ্বলিয়া পুড়িয়া যামিনীতে চন্দ্রালোকে বসিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়, এবং কাহার চিত্তে না ভক্তি ও প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে? কিন্তু চন্দ্র যদিও উপাস্য দেবতা, তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন কেন এই বিষয়ের চিন্তা প্রাচীন কবিদিগের মনে উঠিতে লাগিল। কেহ চিহ্নের আকার দেখিয়া কল্পনা বলে তাঁহাকে শশাঙ্ক, কেহ বা মৃগাঙ্ক বলিলেন। অমনি কেহ অনুমান করিলেন যে বাস্তবিক তাঁহার কোলে একটী মৃগশিশু বা শশশিশু আছে। কেহ বা আরও সূক্ষ্ম টানিয়া স্থির করিলেন, যে চন্দ্র মৃগ চুরি করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন। অন্য একদল এই কলঙ্কের অপর কারণ কল্পনা করিলেন। ইঁহারা বলিলেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কিত হইয়াছেন। এ কথার মূল আমাদিগের যেরূপ বোধ হয় নিম্নে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতিগ্রহ দেবগুরু অর্থাৎ দীপ্তিতে শ্রেষ্ঠ; এই কারণেই তারকাসভামাঝে তাঁহার শোভাসন্দর্শন করিয়া বোধ হয় কোন কবি তাঁহাকে তারাপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। চন্দ্র যেরূপে তারকামণ্ডলীতে বিরাজ করেন, তাহা দেখিয়া আর কোন কবি তাঁহাকে তারাপতি বলিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়ের তারাপতিত্বের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া একটি বিকৃত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। দেবগুরু বলিয়া বৃহস্পতির স্কন্ধে না চাপিয়া, দোষটী চন্দ্রের স্কন্ধেই

চাপিয়াছে; এবং বিচারকালে চন্দ্রের কলঙ্কও তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। কে না জানে যে কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির দোষ সহসা বিশ্বাস্য হয় না, বিশেষতঃ যদি তাহার বিপক্ষ দাগী লোক হয়?

যে শাস্ত্রকারেরা পরদারাকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অশ্লীল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। পুরাতন আখ্যার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিবার দোষে যে প্রকারে কালক্রমে উক্তবিধ উপাখ্যান সকলের উৎপত্তি হয়, শব্দ বিজ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। যাঁহারা এই বিষয়ের অধিক সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানাদির যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া নূতন আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী।

(১)

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী?
যৌবনের সুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী!
এই কি সে করতল শিরীষ কোমল?
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল!
এই কি সে প্রাণহরা চোরা প্রিয় আঁখি?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি!
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার?—
পালঙ্ক উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ়জন বলে;
অলকার কেশগুলি হেরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।

(২)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়!
সোণার বিগ্রহে যদি পূজ একদিন,
সেও রে পরশ দোষে হয় রে মলিন!
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন!
কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে;
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে!
সংসারের সুখ-পদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে।
বলে আর ফিরেফিরে নেহারেনেহারেধীরে
নারী আসা নিদ্রার সরসে।

(৩)

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল!
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে!
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া;
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী লতায়!
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়
নবতরু রোপেছি আনিয়া!
সে নবীন তরু এই হায়রে আমিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া!

(৪)

"কেন, নাথ, কেন কেন" বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন;
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার,
বলে "নাথ, হের দেখ এখনও বাহার;
"চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
"ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায়;
"কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
"সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।
"মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেইখেলা আবার খেলিব;
সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

(৫)

কি দিবিরে পাগলিনি—পাবি কি কোথায়?
সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায়!
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটী তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে—সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকিতে জর জর নীরস শরীর,
সেও হায় গত প্রায় বজ্রাহত শীর!
রোপিনু যে এত সাধে ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
কটি তরু আছে বল তার?
কটি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার!

(৬)

পাগলিনী কোথা পাবি সে শোভা আবার—
সে ফুলের মধু, বাস, এখন সে আবার!
"কোথা পাব? এস নাথ দর্পণের কাছে,
"দেখাই সে শোভা যত, এবে কোথা আছে।
"কেন নাথ, নাই কি হে?—এই ত সে সব;
"সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
"সেই ত অমিয় মাখা, এখনও তোমার,
"নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মাঝার!—
"সেই বাহুলতা এই অধরে সে তিল এই
তখনও যা ছিলে, নাথ, এখনও ত সেই;
"সেই আমি সেই প্রাণ হৃদয়েতে সেই গান
তখন এখন্ কই প্রভেদ ত নেই।"

(৭)

"প্রভেদ কি নাই"—হায় হায় রে কপটী,
দেখ্ দেখি একবার নয়ন পালটি
যৌবনের কুঞ্জবন—কত ছিল তায়
সারি, শ্যামা, শুক পিক্ পাতায় পাতায়!
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া;
এখনও কি সেই পাখী, আছে কি সে রব?
সেইরূপে কাছে এসে করে কি সে সব?

কত উড়ে গেছে তার, উড়ু উড়ু কত আর,
কত হায় নীরবে বসিয়া
অসুখে শাখীতে লুটে ডাকিলেআসেনাছুটে
কাঁদে বসি সংগীত ভুলিয়া!

(৮)

এখন বাজে না আর সে কুহক বাঁসী
মোহিণী মায়ার মুখে—সকলি রে বাসি
নিগন্ধ জগতে এবে,—নিগন্ধ হৃদয়
বসন্তের বাস শূন্য, ফণীর আলয়!
যাছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী—কাঁচ পাই না কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সি, সেই আশার আরসি
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী?" নাথ কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন
বক্ষে তুলে আনি সুখে রাখিলা স্বামির বুকে
পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন!

কমলাকান্তের দপ্তর।

বড় বাজার।

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চির-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নশীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি, তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ, এবং নবনীত খাইতেছি। আহার কালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানবচরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথমদিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এতদিনে জানিলাম মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এতদিনে জানিয়াছি যে যেসকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয় ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা! এক্ষণে জানিয়াছি, যে ভক্তিপ্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গর্ব—আকাশ-

কুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্য জাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব; তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ; ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না, যে গোরু কাহারও নহে; গোরু, গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে, এসংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয়, প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্য প্রিয়, যে বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া, কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্ব সংসার, একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি। সকলই অনবরত ডাকিতেছে "আমার দোকানে ভাল জিনিস—খরিদ্দার চলেআয়"—সকলেরই এক মাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকান দার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে, আফিঙ্গের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁদে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিস ঘরে নাই সেই দোকানে আগে যাইতে হয়। দেখিলাম, যে সংসারের সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম ছোট বড় রুই কাতলা মৃগেল ইলিশ, চুনো পুঁটি কই মাগুর, খরিদ্দারের জন্য লেজ আছাড়াইয়া ধড় ফড় করিতেছে; বড়

বেলা বাড়িতেছে, তত কলসা ফুলাইয়া, হাঁ করিয়া, বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছুনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়ব—বোঝা বিক্রী হইলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিনত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিন্‌বে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয় আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ দার সাহস করিস—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাত্তি ঝাঁটা—গলায় বাঁধলো শাশুড়িরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পালায়!" কেহ ডাকিতেছে "ওরে আমার শরম পুঁটি, বিক্রী হইলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে—সংসারের দিন সুখে কাটবে আমার এই শরম পুঁটির বলে।"* কেহ বলিতেছে "কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এই রূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না আমার নিরামিষ ঘর করনা। দেখিলাম মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল এমাছ কত দিন খাইব।" দালাল বলিল, "দুদিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছুনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। একস্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলিগায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘট পটত্ব ঘত্ব পত্ব,—ঘরে চাল থাকিলেই স-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনানারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে ব্রাহ্মণীই পরমপদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আ-

* এগুলি কমলাকান্তের লেখা নহে। আমি বসাইয়া দিয়াছি। সে দিন সাধারণীর চানাচুর দেখিয়া লোভ সামলাইতে পারিলাম না—এক আধ গ্রাস চুরি করিয়া খাইয়াছি। ভরসা করি চানাচুরওয়ালা পেটুক ব্রাহ্মণের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শ্রী ভীষ্মদেব খোষ নবিশ।

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতু-

মার ঘরে নাই, ইহা অন্যান্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই "অতন্ত্য অভাব।" অভাব নিত্য কি অনিত্য যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে নিত্যই অত্যন্ত-অভাব। অতএব আমাদের ঝুনানারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনানারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ, বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনানারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনানারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনানারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?

"না বাপু দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলিনা—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম ইহাদিগের সম্মুখেই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনানারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে

MESSRS BROWN JONES
AND ROBINSON
NUT SUPPLIERS
ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.
MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON,
offer to the Indian Public
A Large Assortment of
NUTS.
PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL AND ILLOGICAL,
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
and
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING
THEIR DENTAL SUPERFLUITIES
CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা

ৰ্ব্বিধ; অন্যান্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, আর অত্যন্তাভাব। শ্রী কমলাকান্ত

ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্‌সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—কালা মাথা বা বাঙ্গালীর হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে, বা বৈদ্যুতীয় বলে, বা চৌম্বুক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণে সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বুকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড় পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অম্লজন, ও যবক্ষারজনের সামান্য যোগ; জলে, জলজন ও অম্লজনের রাসায়নিক যোগ; আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, ও আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব, এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, কালা মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্‌সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমার মস্তকে পড়িবে; পর্কশন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।”

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতে ছিলাম, এমত সময়ে, সহসা দেখিলাম যে ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠী হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনানারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে “এ কি হইল?” সাহেবেরা বলিলেন “ইহাকে বলে Asiatic Researches.” আমি তখন, ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Physiological researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন, বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য; দেখিলাম দেবর্ষি তুল্য জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যগণ নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছে—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের দোকান?

বালকেরা বলিল, “বাঙ্গালা সাহিত্য?”

“বেচিতেছে কে?”

“আমরাই বেচি। দুই একজন বড়

মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্চাবলি নামক গ্রন্থে পাইবেন।”

“কিনিতেছে কে?”

“আমরাই।”

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম। দেখিলাম যত উমেদার, মোসায়েব, সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাকে চাকুরি আছে, শুনিতে পাইলেই, পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছেত—আচ্ছা তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আব্দাশ, তোমার কাণে অবিরত খোষামোদের গন্ধতেল ঢালিব—আমার বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সে ময়রাপটি। সম্বাদপত্র লেখক নামে ময়রাগণ, গুড়েসন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া সস্তাদরে, বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটার আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোষামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড়মন লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাটি দোকান

দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্তযশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

আর কোথাও সুযশঃ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম সেটা কসাই খানা। টুপি মাথায় শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাই সকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড়২ পশু সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু সকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল "এও গোরু কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়ে হাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নশীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোল টুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শিক্ষানবিশের পদ্য। শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া কদমতলা, সাধারণী যন্ত্র। ১২৮১।

"শ্রী অক্ষয় চন্দ্র সরকার" এই নাম-যুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন, যে অক্ষয় বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাঁহার এইমাত্র বলিব, যে বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। সেগুলি তিনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এরূপ ভরসা আছে। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধ গুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে অক্ষয় বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য লেখক, অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অক্ষয় বাবু গদ্যে যাদৃশ অদ্ভুত শক্তিশালী পদ্যে সেরূপ নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব শিক্ষানবিশের পদ্য, তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত পরিচয় নহে। তবে, ইহা "শিক্ষানবিশের পদ্য।" শিক্ষানবিশের জন্য প্রণীত, এবং অক্ষয় বাবু যখন নিজে শিক্ষানবিশ ছিলেন, তৎকালে প্রণীত।

গ্রন্থভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থের পরিচয় দিতেছি।

"বিষয় কার্য্যের শিক্ষানবিশী অবস্থায় অবকাশকালে বায়রণ হইতে একটু আধটু অনুবাদ করিতাম। তাহাতে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছন্দোবন্ধ রচনা লিখিতে অভ্যাস করা; গৌণ উদ্দেশ্য অবকাশ কর্ত্তন; কোন কোন স্থানের অনুবাদ কিছু ভাল হইলে একটু আহ্লাদও হইত। এইরূপে 'বন্দীর বিলাপ,' 'ভারতবর্ষ,'ও 'সাগরের' জন্ম।

অবিকল ভাষানুবাদ করি নাই, রসানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহা জানি, সুতরাং প্রশংসাবাদ প্রাপ্তি লোভে এই গ্রন্থের প্রকাশ নহে। তবে রসজ্ঞ ভাল বলিলে কিছু আহ্লাদ হইবেই হইবে।

কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বালকবৃন্দের কিছু উপকার হইতে পারিবে। রসপূর্ণ কাব্য গ্রন্থ হইতে ছন্দোবন্ধে রসানুবাদের চেষ্টা করিলে, অল্প অল্প ছন্দোবোধ হয়, রসগ্রাহকতা কিঞ্চিৎ জন্মে, এবং ভাষাজ্ঞানও কিছু পরিপুষ্ট হয়। যাঁহারা বালকবৃন্দের ঐ ত্রিবিধ উন্নতির কামনা করেন, তাঁহারা **শিক্ষানবিশের পদ্য** হইতে, বোধ হয় কিছু সাহায্য পাইতে পারিবেন। এবং এমনও বোধ হয়, যে বালকে আপনা আপনি এই ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে কিছু ফল লাভ করিবে।

আর একটি কথা আছে। এই পুস্ত-

কের অধিকাংশই বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রণের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে পারিবেন। আর এ শিক্ষা সৎশিক্ষা।

আজি কালি বায়রণের কাব্যের সম্যক্ সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই বায়রণানুকরণ দেখিতে পাই। এমন সময় বায়রণ কোন্ বিষয়ে কিরূপ লিখিয়া ছিলেন, তাহা জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে। যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বায়রণের কাব্যের কিঞ্চিৎ নমুনা পাইবেন।

অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

Roll on, thou deep and dark blue
Ocean, roll,
সুনীল গম্ভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল,
Ten thousand fleets sweep over
thee in vain;
লক্ষপোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায়!
Man marks the earth with ruin—
ধরাধাম ধ্বংস করে মানবের বল,
his control.
Stops with the shore;
নর গরিমার সীমা সাগর বেলায়,
upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor
doth remain
A shadow of mans ravage, save
his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায়,
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে; মানব যখন
When, for a moment, like a drop
of rain
সহসা সাগর গর্ব্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with
bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
Without a grave, unknell'd
uncoffin'd and unknown.
সে দেহ বহন করে? কে করে দহন?
কেবা হরি বোল বলে? কে করে ক্রন্দন?"

ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে ইংরাজি পদ্যের এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আমরা আর কোথায় দেখি নাই।

এ গ্রন্থে দুইটি মাত্র পদ্য, অনুবাদিত বা অনুকৃত নহে। তন্মধ্যে হাসিকান্নার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মলিন ভুবন কেন বিষাদে বিকল?
ধরাধর বরষিছে কেন আঁখি জল?
কাছে গঙ্গা ভরাজলে, কিনারায় টলটলে,
প্রবল পবন বলে কেন করে কল কল?
কুলেতে কদম্ব গাছে বিহঙ্গ বসিয়া আছে,
নাহি গায় নাহি নাচে, কেন ভয়েতে বিহ্বল?
পর পারে দৃষ্টি হয়, সব অন্ধকার ময়,
সহে বৃষ্টি তরুচয়, নীরবে নিচল!
এই যে চাহিল রবি, ধরাধরে নব ছবি,
পুলকে বলিছে কবি বলিহারি কল!
কাঁদে বিশ্ব কাঁদি আমি, হাসিনু হাসালে তুমি,
হাসিকান্না পূর্ণভূমি: তোমারি কৌশল!"

২। দুঃখমালা। ভ্রাতৃ বিয়োগে ভগিনীর খেদ। কোন হিন্দু মহিলা প্রণীত। খেদের আর সমালোচন কি? খেদে খেদই ভাল দেখায়। বিশেষ গ্রন্থে সন্নিবেশিত এক খানি পদ্যময় পত্র ও প্রকাশকের একটি টীকা পাঠে জানিলাম যে, নবীনা রচয়িত্রী এখন কেবল ভ্রাতৃশোকে খিন্না নহেন, বালিকা, অল্প বয়সে একটি পুত্ররত্নে শোভিতা হইয়াছিলেন, বিধাতা সেই ছেলে বয়সের ছেলেটিকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং দুঃখমালা এখন নিত্য নিত্য নূতন দুঃখই প্রদর্শন করে মাত্র।

"করিয়াছি কত পাপ, তাই পাই হেন তাপ,
জন্মান্তরে কারে বুঝি ভ্রাতৃহীন করেছি।
লয়ে কার ভ্রাতাধন, দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন,
জন্মের মতন কারে শোকনীরে ফেলেছি।
হেনদুঃখসেইপাপে, পুড়ি ভ্রাতাশোকতাপে,
শোকাগ্নিতে দগ্ধ আমি হই দিবানিশি।
ভুলি তারে মনে করি, কিন্তু সেভুলিতেনারি,
সদা মনে জাগিতেছে সেই মুখ শশী।
সে রূপ যে মধুময়, যখন হে মনে হয়,
সুধাংশু জিনিয়া তার ছিল যে বদন।
আকাশের চাঁদ মোরা, হাতেপেয়ে হনু হারা,
পদ্ম ফুল দিয়ে জলে করিহে রোদন।

লেখাটি বেশ সরল, সরস এবং কষ্টকল্পনা সম্ভূত নহে বলিয়াই বোধ হয়। আমরা ভরসা করি, নবীনা লেখিকা শীঘ্র হৃদয়শান্তি লাভ করবেন।

৩। তারাবাই। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি বঙ্গ মহিলাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন;

"হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্ম্মণের একান্ত বাসনা ॥"

আমাদেরও একান্ত বাসনা যে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সফল হয়। সুতরাং কর্কশ কঠিন সমালোচনায় কোমল করে প্রদত্ত উপহার রত্নের আর গৌরব লাঘব করিব না। বাস্তবিক গ্রন্থখানিতে প্রশংসা অপ্রশংসার কিছুই নাই। বীররস প্রধানা নায়িকা তারাবাই বলিতেছেন।—নায়ককে বলিতেছেন:—

"গুলঞ্চর পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হচ্চে যেন আমি তারমতন অনন্ত বাহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারিজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি—"এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্ কালে দেখি নাই!!

৪। বিবাহ ও পুত্রত্ব সম্বন্ধে মনুর মত। স্থানাভাব প্রযুক্ত এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক গ্রন্থের সমালোচনা হইতেছে না। ক্রমে হইবে। গ্রন্থকারগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

চার্ব্বাকদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য সমাজে প্রধানতঃ দুই দলের লোক আছে। এক দলের দৃষ্টি সুখের দিকে, অন্য দলের দৃষ্টি ধর্ম্মের দিকে। এক দলের নিকটে পৃথিবী আমোদ প্রমোদের স্থান, অপর দলের নিকটে দুঃখময় সঙ্কটভূমি। এক দল ইহলোকের ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত, অপর দল পারলৌকিক চিন্তায় মগ্ন। এক দল বিষয়ী, অপর দল বৈরাগী। এক দলের অবলম্বন যুক্তি, অপর দলের অবলম্বন বিশ্বাস। এক দল জড় জগতের তত্ত্ব নির্ণয়ে সমুৎসুক, অপর দল জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রকৃতি নিরূপণে যত্নশীল। এক দল প্রত্যক্ষগোচর পদার্থপুঞ্জে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তুর বিচার দ্বারা মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিতে চাহেন না, অপর দল প্রত্যক্ষ জগৎ অসারবৎ জ্ঞান করিয়া অপ্রত্যক্ষ নিত্য পদার্থের ধ্যানে রত। এক দলের বিবেচনা এই যে আপনাদিগের বুদ্ধিবলে সকলই করিতে পারেন, অপর দল আপনাদিগকে অক্ষম জ্ঞান করিয়া পদে পদে দেবানুগ্রহের প্রার্থী। এক দল তার্কিক, অপর দল ভক্ত। এক দল কথায় কথায় প্রমাণ চাহেন, অপর দল শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির বাক্য শুনিলেই তাহার সত্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না। এক দল বর্ত্তমান সময় এবং উপস্থিত ঘটনাবলী হইতে সুখাকর্ষণে প্রবৃত্ত, অপর দল অতীতের উৎকর্ষ এবং ভবিষ্যতের মাহাত্ম্য চিন্তনে বিমুগ্ধ হইয়া সাংসারিক সম্পদকে অবহেলা করেন।

ইহা সহজেই অনুভূত হইবে যে চার্ব্বাকদর্শন প্রথম দলের শাস্ত্র। ইউরোপখণ্ডে আরিষ্টটল্, এপিকুরস্, বেকন্, বেন্থাম, কোম্‌ত, মিল প্রভৃতি যে দলের মুখপাত, ভারতবর্ষে বৃহস্পতি এবং চার্ব্বাকও সেই দলের চূড়ামণি। সত্য বটে, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে; কিন্তু ইহারা সকলেই সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করেন, সকলেই যুক্তিমার্গানুগামী, এবং সকলেই ইহলোক লইয়া ব্যস্ত।

যাঁহারা দুঃখমিশ্রিত বলিয়া সুখভোগ করিতে চাহেন না, চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা তাঁহাদিগকে পশুবৎ মূর্খ বলেন। মৎস্যে শল্ক এবং কণ্টক আছে বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব না? ধান্যের তুষ বাছিতে হইবে বলিয়া কি অন্নাহার পরিত্যাগ করিব?* কণ্টকের ভয়ে কি কমল তুলিব না?

* "সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব মাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎ-

শশধরের কলঙ্ক আছে বলিয়া কি তাহার সুধাময়ী জ্যোৎস্নায় অঙ্গ ঢালিয়া শরীর মন শীতল করিব না? বায়ুতে ধূলা আছে আশঙ্কা করিয়া কি গ্রীষ্মকালে মন্দ মন্দ প্রবাহিত সুস্নিগ্ধ দক্ষিণানিল সেবন করিব না? জলকর্দ্দমাক্ত হইবার ভয়ে কি কৃষ্ট এবং বৃষ্টিসিক্ত ক্ষেত্রে শস্য বপন করিতে বিরত থাকিব? অথবা কি ভিক্ষুকের যাচ্ঞা আশঙ্কা করিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিব না?

বিমল সুখ যদিও এ সংসারে নাই, তথাপি যাহা আছে তাহা অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নহে। আমরা যদি গৃহী হই, এক সময়ে যেমন দারা সুত বন্ধুগণের প্রফুল্ল আনন দেখিয়া সুখী হই, অপর সময়ে তেমনই তাহাদিগের পীড়া বা বিপজ্জনিত বিষণ্ণ বদন দেখিয়া দুঃখিত হই। এক সময়ে যেমন পুত্রের বিকসিত মুখকমলের হাস্যরাশি বা নন্দিনীর আনন্দময়ী মূর্ত্তির লাবণ্যছটা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দরসে অভিষিক্ত হই, অপর সময়ে, তাহাদিগের শীর্ণ কলেবর বা মৃত দেহ দর্শন করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এক সময়ে যাহার প্রণয়ে সংসার আলোকময় দেখি, অপর সময়ে তাহার বিরহে সমুদয় জগৎ অন্ধকার বোধ হয়। এইরূপে যাহা এক সময়ে সুখের কারণ হইতেছে, তাহাই অপর সময়ে দুঃখের কারণ হয়। যদি আমরা কাহারও সহিত সম্বন্ধ না রাখি, যদি ভূমণ্ডলে এমন কেহই না থাকে যাহার দুঃখে বা অভাবে আমাদিগের ক্লেশ হয়, তাহা হইলেও আমরা দুঃখের হাত এড়াইতে পারি না। যে এই জনাকীর্ণ জগতীতলে একা আছে, যাহার মনের কথা বলিবার একটিমাত্র লোক নাই, যাহার প্রীতির পাত্র কেহই নাই, তাহার চিত্ত উৎসাহশূন্য, নির্জ্জীব, দুঃখময়, মরুতুল্য নীরস। যদি এরূপ অবস্থায় কাহারও অন্তঃকরণে শান্তি বিরাজ করে, সে ব্যক্তি সামান্য মানব নহে। কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধ বিরহিত হইয়াও যে সুখী থাকিতে পারে, সেও রোগ এবং দৈব ঘটনার স্রোত হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে না। সহসা যন্ত্রণাদায়িনী পীড়া আসিয়া সমুদায় উলট্ পালট্ করিতে পারে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের আনন্দ দূরীভূত হয়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর মনোহর শোভা, উষার শীতল সমীরণ, কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের সুমধুর সংগীত, আর সুধা বর্ষণ করে না। যে বন্ধুবিনাও একাকী হর্ষোৎফুল্ল থাকিতে পারে, শারীরিক পীড়ায় তাহাকেও অস্থির করে, তাহাকেও কাতর করে। এতদ্ব্যতি-

স্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখ ভয়ান্নানুকূলবেদনীয়ং সুখংত্যক্তুমুচিতম্।......যদি কশ্চিদ্ ভীরুর্দৃষ্টং সুখংত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।”

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

রিক্ত কখন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, কখন বজ্রাঘাত, কখন দুর্ভিক্ষ, কখন ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, কখন অতিরিক্ত সূর্য্যোত্তাপ, কখন দুঃসহ বৃষ্টিপাত, কখন অতিশয় শৈত্য, উপস্থিত হইয়া আমাদিগের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে। তথাপি আমরা বলি যে এ সংসার দুঃখময় নহে। দুঃখ যদিও সর্ব্বত্র আছে; যদিও রাজার প্রাসাদে এবং দরিদ্রের কুটীরে, পণ্ডিতের উন্নত চিত্তে এবং মূর্খের সঙ্কীর্ণ মনে, বিলাসীর প্রিয় ভবনে এবং যোগীর গিরিগুহায়, দুঃখ অবস্থিতি করে; যদিও পথে ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে, কান্তারে, শ্মশানে, মশানে, সকল স্থানেই দুঃখ বিরাজিত; তথাপি দুঃখ অপেক্ষা মানুষের সুখের ভাগ অনেক অধিক। নতুবা কেন লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক জীবন ভার বহন করে? কেন লোকে মরিতে কুণ্ঠিত হয়? কেন রবিচন্দ্রতারাসুশোভিত তরুলতাপল্লবপুষ্পবিভূষিত পরিমলবহমলয়মারুতসেবিত বিবিধভোগ্যবস্তুপরিপূরিত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অধিকাংশ মনুষ্যেই বিপদ্ জ্ঞান করে? যদি বাস্তবিক দুঃখই সুখাপেক্ষা সংসারে অধিক থাকিত, তাহাহইলে আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিজীবী মানবজাতি জীবনজ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিত। অধিকাংশ লোকে মরিতে অনিচ্ছুক, ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে নরকুলের সুখের পরিমাণ দুঃখের পরিমাণাপেক্ষা অনেক অধিক।

আবারও ভাবিতে হয় যে দুঃখ আছে, বলিয়া হয় ত সুখ অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। যে পরিশ্রমক্লেশ সহ্য না করে, সে ভাল করিয়া বিশ্রামের সুখ অনুভব করিতে পারে না। যে কখন রোগগ্রস্ত হয় নাই, সে স্বাস্থ্যে যে কি আরাম ও স্বচ্ছন্দতা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে না। ক্ষুধাজনিত কষ্ট হয় বলিয়াই আহারে এত তৃপ্তি জন্মে। তৃষ্ণায় যাতনা আছে বলিয়াই শীতল সলিলপানে এত সুখ। যে তামসী নিশাকালে আকাশমণ্ডল ঘনজলধরজালে আচ্ছাদিত হয়, নক্ষত্রমালা অদৃশ্য হইয়া যায়, তরুরাজি গৃহাবলী প্রভৃতি লণ্ডভণ্ড করত প্রচণ্ড ঝটিকাপ্রবাহ বহিতে থাকে, তীরতুল্য তেজে অজস্র বৃষ্টিধারা পড়িতে থাকে, ভীষণ নিনাদে গগন মেদিনী কম্পমান করিয়া মাঝে মাঝে অশনিপাত হয়; সেই নিশার অবসানে যদি জলদদল অন্তর্হিত হয় এবং জগৎ শান্তভাব অবলম্বন করে, তাহাহইলে হাসিতে হাসিতে, মহিমারাশিতে তিমির বিনাশ করিয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইতে ছড়াইতে, কমল ফুটাইতে ফুটাইতে, যখন দিবাকর উদিত হন, সে দিন তাঁহাকে অন্য দিনাপেক্ষা কত মনোহর বোধ হয়। এইরূপে বিরহের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আঁতে আঁতে জ্বলিয়া পুড়িয়া, অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া, বারম্বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, যখন প্রিয়সমাগম পুনরায় হয়, তখন সে মিলনে যে গাঢ় সুখ জন্মে

তাহা বিচ্ছেদশূন্য ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধির অতীত। বাস্তবিক একই অবস্থায় বহুকাল থাকা মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর, সে অবস্থা যতই কেন বাঞ্ছনীয় হউক না। যাহা কিছু কাল ভাল লাগে, পরে তাহাই বারম্বার উপভোগ দ্বারা বিরক্তিকর হইয়া উঠে। একটি সুস্বাদু বস্তু প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে, কালক্রমে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। অতএব আস্বাদের পরিবর্বর্ত্তন আবশ্যক। কেবল মধুর রস অবলম্বন করিলেই চলিবে না, কটু কষায় তিক্তও চাই।

যখন মানবজীবনে দুঃখাপেক্ষা সুখ অনেক অধিক, এবং যখন দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের এত গৌরব, তখন দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া সুখের প্রতি অবহেলা করা মূর্খতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চার্ব্বাকমতাবলম্বীদিগের ন্যায় সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য, সুখকেই পরম পুরুষার্থ, জ্ঞান করিতে পারি না। সুখ বলিতে তাঁহারা যদি ইন্দ্রিয় সুখ অথবা আত্মসুখ বুঝিতেন, যেরূপ তাঁহাদিগের শত্রু হিন্দু গ্রন্থকারদিগের কথায় প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই যে কেবল আমাদিগের আপত্তি হইত এরূপ নহে। যে হিতবাদে আন্তরিক সুখের এবং অধিকাংশ মনুষ্যের সুখের প্রাধান্য, সে হিতবাদও আমরা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ভাবি না। আমাদিগের বিবেচনা এই যে আমরা কেবল সুখভোগ করিতে জন্ম পরিগ্রহ করি নাই। সুখ যেমন আমাদিগের একটি লক্ষ্য, তেমনই আমাদিগের আরও দুইটী মহৎ লক্ষ্য আছে, সত্য এবং স্বাধীনতা। আমরা কেবল ভোগশক্তিশালী জীব নহি, আমাদিগের জ্ঞান এবং ইচ্ছাও আছে। ভোগশক্তি যেমন সুখ চায়, জ্ঞান তেমনই সত্য চায়, ইচ্ছাও তেমনি স্বাধীনতা চায়। ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেয়ের পারিপাট্যে ভোগশক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি সত্য বিনা ম্লান হইবে; ইচ্ছা স্বাধীনতা সংস্থাপন ও ক্ষমতাবিস্তার বিনা অসন্তুষ্ট হইবে। বুদ্ধি সত্য পাইলে, এবং ইচ্ছা স্বাধীনতা পাইলে সুখ জন্মে, যথার্থ; কিন্তু যে কেবল সুখের জন্য সত্যের বা স্বাধীনতার অনুসরণ করে, আমরা বুঝি যে তাহার লক্ষ্য যে ব্যক্তি সত্যের জন্য সত্য এবং স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা চায় তাহার লক্ষ্যের ন্যায় মহৎ নহে।

দুঃখ আছে বলিয়া সুখের প্রতি উপেক্ষা করা মূর্খতা, এই সিদ্ধান্তের পরে স্থির করা আবশ্যক যে এই সুখ বলিতে কেবল ইহকালের সুখ বুঝাইবে, না পরকালের সুখও বুঝাইবে। চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বলেন, ইহকালের সুখ। পরকাল অসম্ভব। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, যেমন সুরা সমুৎপাদক দ্রব্যচয় সমবেত হইলে মাদকতাশক্তি জন্মে।*

* অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে।

সুতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটিবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না; যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তাহা দেহান্তর্গত। অতএব দেহের বিনাশে তাহার অবস্থিতি অসম্ভব।

আবার দেখ যখন বলিতেছ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি পীড়িত, আমি সুস্থ, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, তখন তুমি দেহ হইতে আত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করিতেছ না।† সত্য বটে, আমার দেহ, এ কথাও তুমি বলিয়া থাক; কিন্তু এটি ঔপচারিক প্রয়োগ, যেমন রাহুর মস্তক।‡ যেরূপ রাহুর মস্তক এবং রাহু অভিন্ন, কথার কৌশলে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমার দেহ এবং আমি সেইরূপ অভিন্ন। আমার দেহ, এই ব্যবহার অবলম্বন করিয়া যদি বলিতে চাও যে আত্মাই আমি, দেহ আমার বটে কিন্তু আমি নয়; তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ হইবে না। আমরা যেমন "আমার দেহ" বলি, তেমনই "আমার আত্মা" ও বলিয়া থাকি। যদি "আমার দেহ" এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ দৃষ্টে আত্মাকে আমি বলিতে চাও, তবে "আমার আত্মা" এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে দেহকে আমি বলিতে হইবে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই, চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বিজ্ঞান অদ্যাপি অশক্ত। যে সকল প্রাকৃতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত অকাট্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সে সকল বরং লোকায়তবাদের অনুকূল। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অংশবিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তিবিশেষের হ্রাস বা লোপ হয়, এবং বৃদ্ধকালে মস্তিষ্কের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতাসহকারে মনের ক্ষীণতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্য সমন্বিত মানসিক ব্যাপার সমুদায়, স্নায়ুমণ্ডলের উপর, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপর, নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তদীয় উপাদান নিচয়ে পরি-

---

কিন্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো
মদশক্তিবৎ॥
সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত লোকায়তবচনং।

† অহং স্থূলকৃশোহস্মীতি সামানাধি-
করণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন
চাপরঃ॥
সর্ব্বোদর্শনোদ্ধৃত লোকায়তবচনং।

‡ মমদেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপ-
চারিকী॥
সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃতং।

গত হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস, মুখে তাঁহারা কিছু বলুন বা না বলুন। কিন্তু এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবেত্তৃগণের মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপে, কেহ কেহ প্রেততত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের দল ক্রমেই পুষ্ট হইতেছে। তাঁহারা যদি সিদ্ধকাম হন, তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একাল পর্য্যন্ত পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন জন্য অনুমান প্রমাণই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহলোকে শিষ্টের পুরস্কার এবং দুষ্টের দমন হয় না, ইহলোকে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, অতএব পরলোক আছে। যেমন ঘট পটাদির কর্ত্তা আছে, তেমনই এই বিশাল জগতেরও এক জন কর্ত্তা থাকিবে, অতএব ঈশ্বর আছেন। এই প্রকার অনুমান অবলম্বন করিয়াই পরলোক এবং ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয় করাই রীতি। চার্ব্বাক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন যে আদৌ অনুমান অগ্রাহ্য। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি বল প্রত্যক্ষ দ্বারা। তবে কোন্ প্রকার প্রত্যক্ষ, বাহ্য না আন্তর? চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটিলে, তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং এরূপ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে সম্ভব হইলেও, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসম্ভব।* কিন্তু ব্যাপ্তি ত্রিকালব্যাপিনী। যখন আমরা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির উল্লেখ করি, তখন আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বহ্নি ধূমের নিয়ত সহচর, কেবল বর্ত্তমানের নহে, ভূত এবং ভবিষ্যৎকালেরও সহচর। যখন আমরা জন্মি নাই, তখনও বহ্নি, ধূমের সহচর ছিল। যখন আমাদিগের মৃত্যু হইবে, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর থাকিবে। এইরূপ ত্রিকালব্যাপিনী ব্যাপ্তির জ্ঞান কখন বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে না। যদি বল মানস প্রত্যক্ষদ্বারা এরূপ জ্ঞান হইবে, তাহাও প্রামাণ্য নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ।* সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি, মানস

*"ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্। ন প্রথমঃ তস্য সম্প্রযুক্ত বিষয়জ্ঞানজনকত্বেন ভবতি প্রসরসম্ভবেঽপি ভূতভবিষ্যতোস্তদসম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তের্দুর্জ্ঞানত্বাৎ।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

* "নাপি চরমঃ অন্তঃকরণস্য বহিরিন্দ্রিয় তন্ত্রত্বেন বাহ্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদুক্তম্ চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্র বহির্মন ইতি।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

Compare with the dictum "Nothing is in the intellect which was not originally in the senses."

প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবারও সেই আপত্তি। যদি বল অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানলাভ হয়, তাহাহইলে অনবস্থা দোষ ঘটে;† কারণ, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান সাপেক্ষ বলিতেছ। যদি শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় স্থির কর, তাহাহইলেও আপত্তি আছে। কাণাদ মতানুসারে শব্দ অনুমানের অন্তর্ভূত; যদি বল তদন্তর্ভূত নহে, ভাবিয়া দেখ শব্দের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান হয়। লোকে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করে, কোন্ পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, অনুমান দ্বারা আমরা বিবেচনা করিয়া লই। মনে কর কেহ বলিল, ঘট লইয়া আইস; যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ হইল, সে ব্যক্তি বস্তু বিশেষ লইয়া আসিল; আমরা অমনি অনুমান করিলাম, যে এই বস্তুই ঘট। এই প্রকার বৃদ্ধব্যবহার দৃষ্টে যখন শব্দার্থের অনুমান হয়, তখন অনুমানকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয় শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলে সেই দোষই হইতেছে।‡ আবার দেখ, স্বার্থানুমানে শব্দ প্রয়োগ নাই; এস্থলে কিরূপে শব্দ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হইবে?* অনুমান সিদ্ধ করিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা উপাধিশূন্য অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। যখন আমরা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে ধূম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে। এরূপ অন্য নিরপেক্ষতার জ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষ স্থলগুলিতে সম্ভব, তথাপি অপ্রত্যক্ষভূত ভবিষ্যদন্তর্গত বা দূরদেশবর্ত্তী স্থলে অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে না।†

যাঁহারা পরিজ্ঞাত স্থলগুলিতে বস্তুদ্বয়ের সাহচর্য্যমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের নিয়ত সহচারিতা অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত আপত্তিগুলি তাঁহাদিগের পক্ষে অকাট্য; কিন্তু যাঁহারা সাহচর্য্যাতিরিক্ত কার্য্যকারণসম্বন্ধ বা নৈসর্গিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তি নিরূপণ করেন, তাঁ-

† "নাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানোপায়ঃ তত্র তত্রাপ্যেবমিতি অনবস্থাদোষস্থ্যপ্রসঙ্গাৎ।
সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

‡ নাপি শব্দস্তদুপায়ঃ কাণাদ মতানুসারেণানুমান এবান্তর্ভাবাৎ অনন্তর্ভাবে বা বৃদ্ধব্যবহাররূপ লিঙ্গাবগতি সাপেক্ষতয়া প্রাগুক্ত দূষণলঙ্ঘনাজঙ্ঘালত্বাৎ।
সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

* অনুপদিষ্টাবিনাভাবস্য পুরুষস্যার্থান্তর দর্শনে নার্থান্তরানুমিত্যভাবে স্বার্থানুমান কথায়াঃ কথা শেষত্বপ্রসঙ্গাৎ। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাক দর্শনং।

† উপাধ্যভাবোঽপি দুরবগমঃ উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্ব নিয়মাসম্ভবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্যাপ্রত্যক্ষতয়া অনুমাদ্যপেক্ষায়া মুক্ত দূষণানতিবৃত্তেঃ। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

হারা এ প্রকার তর্কে ভীত হইবেন না।‡ কিরূপ সাহচর্য্য হইতে ব্যাপ্তি নির্ণীত হয় এ প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের সমালোচনা অসম্ভব। যাঁহারা এতৎসংক্রান্ত বিস্তীর্ণ বিচার অবগত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা নৈয়ায়িকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

যদি বেদ দ্বারা ঈশ্বর এবং পরলোক সংস্থাপন করিতে যাও, চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বলেন যে বেদ আদৌ অপ্রামাণ্য; কারণ উহা প্রত্যক্ষবিলোপী, যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধূর্ত্ততাসমুদ্ভূত। প্রত্যক্ষে যাহাতে সুখ পাওয়া যায়, বেদে তাহাকে দুঃখের কারণ বলে; প্রত্যক্ষে যাহাতে দুঃখ দেখা যায়, বেদে তাহা সুখের হেতু। সাংসারিক সুখদায়ী কত ভোগ্য বস্তু পারলৌকিক দুঃখমূলক বলিয়া বেদানুসারে পরিত্যাজ্য; এবং কষ্টকর উপবাস যজ্ঞ প্রভৃতি ভবিষ্যৎ সুখসম্পাদক বলিয়া শ্রুতিতে আদৃত। মৃতব্যক্তি দূরবর্ত্তী প্রেতলোকে থাকিয়া পৃথিবীতলে প্রদত্ত অথবা অপরভক্ষিত আহার দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়, এইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বেদে কত আছে। আর সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণকে দানের বিধি থাকায়, এ সকল যে ব্রাহ্মণদিগের ধূর্ত্ততাসম্ভূত তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।* সুতরাং বেদ বাক্যে নির্ভর করিয়া ঈশ্বর বা পরলোক মানা যায় না।

চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের দ্বারা আমাদিগের বোধ হয় কয়েকটী উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ইহলোক দুঃখময় নহে, এবং সুখ পরিত্যাজ্য নহে। তাঁহারা শিখাইয়াছেন যে শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তি প্রবল। তাঁহারা অনুমানের মূল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়ায়িকদিগকে উক্ত মূলের প্রকৃত বলাবল বুঝিতে ও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন।

‡ কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ॥
সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃতং।

* সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত বৃহস্পতি বচনমালা এবং নৈষধ চরিতের সপ্তদশ সর্গ দেখ।

জাতিভেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিগূঢ় মর্ম্ম।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৮-১৭৪ এবং ৩৩৭-৩৫৬ পৃষ্ঠার পরে)

আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এতদ্দেশীয় জাতিভেদ প্রথার অনেক লক্ষণ অন্যান্য দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে আমরাই কেবল লৌকিক নিয়ম পরিবর্ত্তন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়াছি; অন্যত্র লোকে যখন বুঝিতে পারে যে প্রচলিত নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় না করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইব তখন তাহারা সেই ক্ষতি নিবারণে প্রবৃত্ত হয়। আমরা বলি যে প্রাচীন প্রথা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারিলেই ভাল; প্রাচীন প্রথা কেন? যে প্রথাটী প্রচলিত আছে তাহা অভিনব হইলেও তজ্জনিত ক্ষতি নিবারণের যথাযোগ্য উপায় অবলম্বনে আমরা নিতান্ত পরাঙ্মুখ। ফলতঃ আমাদিগের অবস্থা এখন এমনই মন্দ হইয়াছে যে কোন ২ কুপ্রথা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সমাজ ত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পরন্তু আমাদিগের মধ্যে সামাজিক প্রথা আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় না একথা সত্য নহে; তবে সমাজ একবাক্যে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে পারেন না। ক্রমশঃ নিয়মলঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াই নূতন প্রথা প্রচলিত হয়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় তর্ক উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি সকলকে নিরস্ত করিতে পারিতেন কিম্বা পণ্ডিত মাত্রেই যদি তাহার অনুমোদন করিতেন তথাচ তল্লিখিত প্রথা পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যিনি প্রথমে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতেন তাঁহাকে অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতে হইত। অতএব "লোকে যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রীয় প্রমাণকে অধিকতর মান্য করে;" কার্য্যকালে এই কল্পনার স্থল দেখা যায় না।

পাশ্চাত্য মতের প্রভাব আর কিছুতে না হউক একটী বিষয়ে বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে পিতৃপৈতামহিক নিয়ম অবহেলন করা দূরে থাকুক তাহার প্রতিবাদ করিলেও সমাজচ্যুত হইতে হইত। "অমুক নাস্তিক উহার জলগ্রহণ করা হইবেক না।" এইরূপ কথা অনেকের মনেই উদয় হইত। শাস্ত্রোক্তি দেশের অমঙ্গলদায়ক একথা মুখাগ্র করিলে ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, বন্ধ হইবে, এমত আশঙ্কা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। সুতরাং

শাস্ত্রীয় বিধানের দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা কাহারই ছিল না। কিন্তু এখন, কার্য্যে তুমি যদি কোন প্রথা অতিক্রম না কর তবে তোমার মতামত ব্যক্ত করিলে কেহ তোমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না। তুমি যদি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ কর তবে কোন শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তোমার স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে যথা নিয়মে গায়ত্রী আদি জপ কর এবং মুক্ত কণ্ঠে বল যে বেদ মান্য করা ভ্রান্তি মাত্র তবে তোমাকে কোন গুরুতর সামাজিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক না।

আমরা যে লভ্য একবার আয়ত্ত করি পরে তাহার প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না; কিন্তু উপরোক্ত অভিনব রীতি সামান্য উন্নতির লক্ষণ নহে। ফলতঃ জনসাধারণের মতপরিবর্ত্তন হইলে যে তাহা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইবেক না, এ কথা মনে করা ভ্রম। এবং কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে লোকের জ্ঞানযোগ হইবে না, ইহাও অসম্ভব কথা। অতএব আমাদিগের সামাজিক প্রথা সমগ্রের গুণাগুণ যতই সমালোচিত হয়—ততই মঙ্গলের বিষয়।

কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অযৌক্তিক কিম্বা ক্লেশ জনক, একথা বুঝিয়াও কি আমরা তাহা রক্ষা করি, না তাহা প্রতিপালনে আমাদিগের ক্লেশ বোধই হয় না?

শাসন যতই প্রবল হউক, কোন শাসন প্রণালী এবং তদাশ্রিত লোকসমূহের প্রকৃতি মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য না থাকিলে কখনই তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। রাজশাসন ও সমাজশাসন মধ্যে এক বিশেষ এই যে রাজা স্পষ্টাক্ষরে দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে নিগ্রহ করেন। সমাজ তাদৃশ স্থলে আশ্রয় হরণ এবং অনুগ্রহ রহিত করিয়াই তাহাকে ক্লেশ দেন। সমাজবিক্রম বহু আধারে ব্যাপ্ত। তাহার সমষ্টি রাজ-বিক্রম অপেক্ষা হীন বলিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিবিধ দণ্ড অবলোকন করিলে রাজ-বিক্রমকে অপেক্ষাকৃত উগ্র বলিয়া বোধ হয়। সমাজ-বিক্রম রাজ-বিক্রমের ন্যায় ভয়াবহ নহে। রাজনিয়ম লঙ্ঘনে যেমন আশঙ্কা হয় সমাজ-নিয়মের অন্যথা করিবার সময়ে লোকের মনে তাদৃশ ভীতি জন্মে না। অতএব যে স্থলে কোন সামাজিক নিয়ম বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইতেছে দেখা যায়, সেখানে সাধারণ লোকদিগকে তাহার অনুমোদনকারী মনে করা ন্যায়সঙ্গত। কেন না মনুষ্য উপস্থিত সুখ দুঃখের বিষয় অতি সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন। দণ্ডাশঙ্কা দণ্ডেরই অঙ্গ বিশেষ। যখন কোন নিয়ম প্রতিপালনের ক্লেশ তল্লঙ্ঘন জনিত দণ্ডাশঙ্কার যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে তখন সেই নিয়ম কোনমতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সামাজিক দণ্ডের বিভীষিকা স্বভাবতঃই অল্প সুতরাং তদ্দ্বারা কোন নিয়ম প্রবর্ত্তনার্থ নিয়মটী এরূপ করা আবশ্যক যেন তাহা

লোকের স্বভাবানুযায়ী এবং সহজে রক্ষিত হইবার যোগ্য হয়।

জাতিভেদের আদিবিষয়ে যিনি যেরূপ অনুমান করুন উহা যে এতদ্দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এবং বৌদ্ধ রাজ্য বিষয়ে যে মতামত থাকুক মুসলমান অধিকার হইতে এই প্রথা রক্ষণ বিষয়ের রাজ সাহায্য অপসারিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কেহই দ্বিরুক্তি করিতে পারেন না। অতএব তদবধি জাতিভেদ একমাত্র সমাজশাসনের দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে একথা স্বীকার করিতে হইবেক সুতরাং আমাদিগের প্রকৃতির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকাও মানিতে হইবেক।

কিন্তু লোকের প্রকৃতি? প্রকৃতি কাহাকে বলি?—আমরা আত্মার অস্তিত্ব বা লক্ষণ বিষয়ে কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ব্যক্তি মাত্রের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রকাশ হয় যে প্রত্যেকের কার্য্যের বিশেষ প্রণালী আছে। লোকের সমস্ত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত নহে, তথাপি স্থূল২ বিষয়ে ব্যক্তি প্রতি এক একটী কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং সেই প্রণালী দেখিয়াই লোকের চরিত্র স্থির হয়। আবার ভিন্ন২ লোকের চরিত্র বিষয়ে নানা প্রকার ঐক্য দৃষ্ট হয় তদনুসারেই সেই শ্রেণীস্থ লোকের সাধারণ প্রকৃতি ধৃত হয়।

জাতিভেদ নিয়ম সমস্ত ভারতবর্ষ বিস্তার করিয়া আছে; অন্যত্র ইহার কোন২ লক্ষণ থাকিলেও সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না এবং তৎসমুদায় এখানকার ন্যায় প্রবল নহে। আমরা চরিত্রগুণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি, অন্যত্র এতদভাবে লোকে অসুখীও নহে। তাহারাও স্বদেশের প্রথার পরিবর্ত্তে এই প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলে আপনাদিগকে নিতান্ত উৎপীড়িত জ্ঞান করিবেক সন্দেহ নাই। ইহার হেতু কি? আমরাই বা কেন নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ পদাবলম্বন করিতে দেখিলে ছি ছি করি এবং অন্য দেশেই বা কেন এরূপ ঘটনা হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামত সকলের অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলে লোকে কষ্টবোধ করে?

লোকসংখ্যার দ্বারা জাতিভেদের দোষগুণ নিরাকরণ করিতে হইলে আমরা অন্য দেশের নিকট পরাস্ত হইব। কারণ আমরা কেবল জাতিভেদের প্রতি অনুরক্ত নহি। এদেশে ইহার যে সকল নিয়ম আছে আমাদিগের মতে তাহাই উৎকৃষ্ট সামাজিক প্রথা; অন্যত্র বিভিন্ন প্রকার জাতিবিষয়ক ব্যবস্থা দেখিলে আমরা কখনই তাহার অনুমোদন করিবনা। এই জন্য সমস্ত পৃথিবীর লোকের সহিত তুলনায় এতদ্দেশীয় জাতিভেদ নিয়মানুসারী লোকসংখ্যা অবশ্যই ন্যূন হইবেক।

যাহারা জাতিভেদ গ্রাহ্য করে না তাহার মধ্যে অনেকে আমাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে কেহই

আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণের তুল্য নহে, এ কথা বলিলেও এই সমস্যা উপস্থিত হয় যে যাঁহারা পদে২ উন্নতির উদ্দেশে প্রথাপরিবর্ত্তনে উদ্যত তাঁহারা কেন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন করেন না? পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে সংস্কৃত শাস্ত্র অন্য জাতির (nation) দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু এখন ইংলণ্ডে, ফরাসি ও জরমাণিতে বেদ পুরাণাদির যে সমাদর দৃষ্ট হয় তাহাতে এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কিন্তু কই ঐ সকল দেশে ত জাতিভেদ নিয়মের প্রতি কোন আস্থা নাই! অতএব আমাদিগের পক্ষে লোকাধিক্য বা বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের ভান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্যই অন্য কোন হেতু থাকিবেক যে তাহাতেই আমরা জাতিভেদ নিয়মের বশীভূত থাকিয়া ইহাতে কোন ক্লেশ বোধ করি না। অতএব এতদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রাণিতত্ত্ব অনুসারে জাতিভেদের দোষ গুণ বিচার।

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনেকাংশ পিতৃ কিম্বা মাতৃ পক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় এ কথা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অভিনব প্রাণিতত্ত্ববেত্তৃগণ এক নূতন কথা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে অভ্যাসের এমন অদ্ভুত গুণ যে এতদ্দ্বারা স্নায়ু সমূহের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া মস্তিষ্কের বিনা সংযোগে এবং আন্তরিক বাসনা অভাবে দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইতে পারে। এমন কি যে এই ধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে চালিত হইয়া এক জনের দোষ গুণ হইতে তদ্বংশজাত অন্য ব্যক্তির ইন্দ্রিয় এবং মনের আকৃতি বিকৃতি উৎপন্ন হয়। কথিত আছে যে সুরাপায়ীদিগের বংশজাত সন্তানাদি কখন সুরাপান না করিয়াও সুরাসক্ত হয়। *

অতএব কোন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বা স্বধর্ম্ম অক্ষত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তন্নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের বিবাহ না করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ এতাদৃশ বিবাহ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক তাহারা কথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের দোষও অধিকার করিবে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ এই বিষয়ের বিঘ্নদায়ক ছিল কিন্তু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ বা প্রাচীন বলিয়া উহা সম্যক্‌রূপে নিষিদ্ধ হয় নাই। কালে তাহা রহিত হইয়া জাতিভেদ প্রথার উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু যতদিন কোন সমাজের লোক সংখ্যা অল্প থাকে ততদিন এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অন্যের অনায়ত্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ স্বশ্রেণিমধ্যে বিবাহার্থ পরিত্যজ্য হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট লোক সর্ব্বশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। তখন প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য রক্ষার্থ শ্রেণীর বিচার না করিয়া ব্যক্তি বিশেষের দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক

বিবাহ দিলেই ক্রমশঃ গুণবিশিষ্ট স্ত্রী পুরুষের সহযোগে বংশের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন যেমন শ্রেষ্ঠ বর্ণের ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ, তদনুরূপ নিকৃষ্ট বর্ণের উন্নতির নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বর্ণের সহিত বিবাহ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফলতঃ যাহাতে উৎকৃষ্ট বর্ণের উপকার তাহাতেই যদি অপকৃষ্ট বর্ণের অপকার হয় তবে এতাদৃশ নিয়মে সমগ্র সমাজের মঙ্গল কি? এই জন্য কোন২ লোক মনে করিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণগণের স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই হিন্দু শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা ইহার অনুমোদন করি না।

কিন্তু উল্লিখিত কয়েকটী হেতু মনে করিয়া কেহ জাতিভেদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ কল্পনা অপেক্ষা আর একটী সহজ কল্পনা প্রদর্শিত হইতে পারে।

নানা কারণে পৈতৃক ব্যবসা গ্রহণ করাই লোকের পক্ষে সুলভ। এবং এক এক বর্ণান্তর্গত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের সকলের উপার্জ্জনের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তাদৃশ বৃদ্ধি নিবারণের ইচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ ঘটনা তদ্ভিন্ন অসবর্ণ বিবাহের সন্তান গণকে বহিষ্কৃত করিতে পারিলে এতাদৃশ কামনাসিদ্ধি হইতে পারিবে এইরূপ বিবেচনাও স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং নিয়ামক বিশেষের দূরভিসন্ধি বিনা লোকের বৃত্তিভেদ এবং অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াঅসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ হইতে কাল বিলম্ব হয়।

যতদিন ধনসঞ্চয় না হয় ততদিন দায় বিভাগের জন্য বিবাদও ঘটে না এবং দায়ক্রমনির্ণয় বা শাস্ত্রকারের প্রয়োজনও থাকে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই লোকের আচরণ অনুসারে অনেক স্থলে একএকটী প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থলে কেবল পিতৃপৈতামহিক নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেইরূপ উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবেক, জনসমাজে এতাদৃশ তর্ক উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অনেকে স্বভাবতঃ পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকিবেক। এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ হইলে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেক তাহার চিন্তা উদয় হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হৃদ্যতা এবং তদ্ধেতু বিবাহাদি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। তখন অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ এককালে নিষিদ্ধ হইবার কথা নহে। ক্রমশঃ নানা কারণে এতাদৃশ বিবাহ কুপ্রথা স্বরূপ গণ্য হইয়া পরিত্যক্ত এবং নিষিদ্ধ হওয়া সহজ কল্পনা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অন্যান্য দেশে এ প্রকার প্রথা কাল সহকারে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবং আমাদিগের দেশে অসবর্ণ বিবাহ এক কালেই রহিত হইয়াছে। আমাদিগের মনের গতিই ধারাবাহিক, সেই-

জন্য গত কল্য যাহা করিয়াছি অদ্য তাহার ব্যত্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সেই হেতু অন্য ব্যবসা গ্রহণ করা সহজ হইলেও সেদিকে অন্তঃকরণ ধাবিত হয় না। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হউক না হউক তাহা আমাদিগের সমাজ প্রচলিত নাই ইহাই প্রথা রক্ষার যথেষ্ট হেতু। প্রথান্তর প্রবর্ত্তিত হইলে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, হইবার উপায় আছে কি না সেদিকে মনই যায় না। নূতন প্রথা দেখিলে বিজাতীয় বলিয়া বিতৃষ্ণা জন্মে।

শিক্ষা লাভ বিষয়ে জাতিভেদ প্রথার দোষগুণ বিচার।

জাতিভেদ নিয়ম হইতে ব্যবসা রক্ষার এক সদুপায় হইয়াছে। অন্যান্য দেশে কোন বিষয় শিখিবার জন্য দুই উপায় আছে। এক বিদ্যালয় অপর আপ্রেণ্টিসের নিয়ম। কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয় সমূহ কেবল শাস্ত্র অধ্যাপনের নিমিত্তই নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধুনা বৃত্তি শিখিবার জন্যও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে যথা এঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তি ইত্যাদি।

আপ্রেণ্টিস হইবার প্রণালী এই। প্রথমতঃ যে ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবেক তাহা স্থির করিয়া সেই ব্যবসাবলম্বী কোন ব্যক্তির সহিত এইরূপ চুক্তি করিতে হয় যে “আমি এতদিন বিনা বেতনে তোমার নিকট থাকিয়া তোমার ব্যবসা শিক্ষা এবং তোমার অধীন কার্য্য করিব। যদি নিয়মিত কালমধ্যে তোমার কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাই তবে এত দণ্ড দিব।” কালপূর্ণ হইলে উভয়ে অন্য নিয়ম করিয়া একত্র কার্য্য করিতে এবং তদনুসারে লাভালাভ বিভাগ করিয়া লইতে পারে অথবা শিষ্য (আপ্রেণ্টিস) স্বয়ং পৃথক্ রূপে অভ্যাসিত ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে। যদি কেহ গুরুর নিকট প্রতিষ্ঠা পত্র না পাইয়া কোন ব্যবসা আরম্ভ করে তবে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে না। এবং সেই ব্যবসায়ী অন্যান্য ব্যক্তি তাহার সহিত একত্রে কার্য্য করে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যেও এক বর্ণের লোক অন্যবর্ণের সহিত একত্র ব্যবসা করিত না। এখন ইহার এই মাত্র অবশেষ আছে যে বিভিন্ন বর্ণ মধ্যে আহার ও বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত নিষেধের নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে প্রথমতঃ কার্য্যগতিকে একটি প্রথা পড়িয়া যায় পরে সেই প্রথাই পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্ম ও তাহা উল্লঙ্ঘন অধর্ম্ম এইরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে; শাস্ত্রকারেরা তাহাই লিপিবদ্ধ করেন এবং লোকে বৈরনির্যাতনার্থে তাহার সাহায্য গ্রহণ করে। এখনও ঠিক এরূপ ঘটনা চলিতেছে। যদি তোমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি প্রথা লঙ্ঘন করে তবে তুমি তাহার প্রতি উপেক্ষা কর কিন্তু কোন বিপক্ষ তাদৃশ কার্য্য করিলে শাস্ত্র বা প্রথার উল্লেখ করিয়া দণ্ড বিধানের চেষ্টা কর সুতরাং ইহাতে প্রথাভঙ্গ গোপনীয় বিষয় হইয়া উঠে। অথবা কার্য্যে দোষ আছে কি না, ধারাবাহিক হইলে এ কথা মনে উদয় হইবে

না সুতরাং সে বিচারের দোহাই দিবে কি প্রকারে?

জাতিভেদ এবং আপ্রেণ্টিস বিষয়ক নিয়ম দ্বয় তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবেক যে উভয়ের কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন কিন্তু শাসন তুল্য। কেবল প্রথমোক্ত প্রথাতে আমরা শিক্ষক ও বৃত্তি অনুসন্ধান বিষয়ে ধারাবাহিক মতে পিতৃ পিতামহের প্রতি নির্ভর করি এবং গুরু শিষ্য মধ্যে স্ব২ অবস্থা ও প্রয়োজন মতে নূতন নিয়ম না করিয়া এক পিতৃ আজ্ঞা পালনের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। ধারাবহন প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব, ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবেক যে, যে স্থলে পিতা কিম্বা তদভাবে সজাতীয় কোন ব্যক্তি শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই উপদেশের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পৃথক্ গুরু গ্রহণ করিবার নিয়ম হইয়াছে। তাহাতেও গুরু শিষ্য মধ্যে স্বানুবর্ত্তী সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে পৈতৃক সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।

যদি সকলেরই এক একটি ব্যবসা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় তবে অনেক বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক হইবেক। যথা "আমি এই ব্যবসা দ্বারা উত্তমরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব অথবা অন্য কোন ব্যবসা গ্রহণ করিলে তুল্য শ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত ফললাভ করিব? আমার মনস্তুষ্টির জন্য অন্য কোন ব্যবসা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না? অমুক অমুক ব্যবসার লাভালাভ কি এবং লোক সংখ্যা কত? অমুক ব্যবসা গ্রহণান্তে অমুক স্থানে গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে আমার লাভ বৃদ্ধি হইবেক কি না?" ইত্যাদি। কিন্তু যাহারা শ্মশ্রুবিশিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পরিবার রক্ষণের ভারগ্রস্ত হয় তাহাদিগের চিন্তা করিবার সময় কোথা? একবার বিলাস সুখাস্বাদন করিলে মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হয় এবং তাহাতে অন্য চিন্তার কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটে; বিশেষতঃ স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলে স্বেচ্ছামত ব্যবসা গ্রহণ করা দুষ্কর। "কি জানি অধিক লাভের প্রত্যাশায় যদি সামান্য লাভেও বঞ্চিত হই, তবে এতগুলি পরিবারের উপায় কি হইবেক?" এইরূপ চিন্তা প্রযুক্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহারা সহজেই পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহাদিগের মন একেবারে নিস্পন্দপ্রায় হইয়া গিয়াছে তাহারা অবলীলাক্রমেই পিতৃ পিতামহের অনুগামী হয়। "মাছিমারা কাপি" কেবল কেরাণীগণের স্বধর্ম্ম নহে। ধারাবহন প্রকৃতির ফল।

ফলতঃ জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পৈতৃক আবাস ভদ্রাসনে আসক্তি এবং একান্নবর্ত্তী থাকিবার প্রথা সমস্তই যেন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। হঠাৎ পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না কিন্তু একটি প্রথা লঙ্ঘন করিলেই অন্যগুলির অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ব্যাঘাত হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন হইলে আবাস পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নূতন আবাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে

ভিন্ন গ্রাম ভিন্ন দেশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এবং তাহা হইতে আচার ব্যবহারের অনেক ব্যত্যয় ঘটে।† ভদ্রাসন ত্যাগ করিলে বহু পরিবার একান্নে রক্ষা করা সহজ নহে। নূতন স্থানে নূতন সমাজে বৃত্তির কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় সহজেই হইতে পারে।

কিন্তু বাল্যবিবাহ জাতিভেদ নিয়মের প্রধান সহকারী। লেখকের ধারণা এই যে স্ত্রীজাতির অন্তঃপুরে বাসও প্রাচীন প্রথা। যদি এ কথা সত্য হয় তবে ইহাও বাল্যবিবাহের সহকারী। কন্যার বুদ্ধিশক্তি সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহার পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হইলে পিতৃ মনোনীত সবর্ণপাত্র বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না, বুদ্ধিস্ফূর্তি হইলে অসবর্ণপাত্রে স্বয়ংই চিত্ত সমর্পণ করিতে পারে। কন্যা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হইলে এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব এই অভিসন্ধিতেই হউক কিম্বা রাক্ষস, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ বিবাহ নিবারণার্থই হউক অথবা যে অন্য কোন কারণেই হউক, বালিকা বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া অসবর্ণ বিবাহ এবং বর্ণসঙ্কর নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছে। আবার চিন্তা করিলে এ কথাও মনে হয় যে জাতিভেদ, ভদ্রাসনে আসক্তি এবং একান্নবর্ত্তী থাকিবার নিয়ম সমস্তই এক ধারাবাহিক প্রকৃতি হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতে পারে। বালিকাবিবাহ প্রথা যত্নসহকারে প্রবর্ত্তিত মনে হয় কিন্তু তাহা অপর প্রথা কয়েকটীর ফল কি হেতু ইহা বিশেষ করিয়া স্থির করা কঠিন। সে যাহাহউক এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে আপ্রেন্‌টিস শিখাইবার প্রথা অভাবে লোকের ব্যবসা শিক্ষারনিমিত্ত পিতৃ উপদেশই উৎকৃষ্ট উপায়।

তদ্ভিন্ন যদি উল্লিখিত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের কথা সত্য হয় তবে পুরুষানুক্রমে এক বৃত্তি প্রতিপালিত হইলে ক্রমশঃ তদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে জাতীয় ব্যবসা শিক্ষা বিলক্ষণ সহজ হইয়া উঠিবেক। সমাজের আদ্যাবস্থাতে আপ্রেন্‌টিস প্রণালী সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং উপদেশ দ্বারা সভ্যতার উন্নতিসাধন নিমিত্ত জাতিভেদ ব্যবস্থাই অত্যুৎকৃষ্ট।

কিন্তু ইহার দোষ এই যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন বৃত্তি অবলম্বন করিলে লোকে যেমন যত্নসহকারে তাহাতে নিযুক্ত হয় পৈতৃক বলিয়া গ্রহণ করিলে সচরাচর সেরূপ উৎসাহ হয় না।

লোকে নিয়মাধীন থাকিতে হইলেই

†আমরা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে বারাণসীতে জনেক রাঢ়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বৈদিকের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়াগে কয়েকজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জুতার ব্যবসা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কায়স্থটী প্রয়োজন মতে স্বহস্তে চর্ম্ম সীবন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। আর বিদেশবাসী কোন২ বাঙ্গালি স্ত্রীগণের অন্তঃপুরবাস মোচন করিয়াছেন এ কথা অনেকেই জানেন।

কষ্ট বোধ করে। "এই নিয়মের অন্যথা করিতে পারি না" এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইলেই স্বভাবতঃ ক্লেশের স্থল হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের সেরূপ যন্ত্রণা বোধ হয় না, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে আমরা নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছি। আমরা একজন সংস্কৃতভাষাজ্ঞ ধার্ম্মিক কায়স্থের কথা শুনিয়াছি যে তিনি কুলপুরোহিতের মূর্খতা নিবন্ধন বৈরক্তি প্রযুক্ত স্বয়ং দুর্গোৎসবের মন্ত্রপাঠ করিতে বসিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোন২ লোকের নিকট নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এই বৈরক্তি তেজের লক্ষণ। এবং নিজে মন্ত্রপাঠে সক্ষম হইলেও যে লোকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলে ক্ষুণ্ণচিত্ত হয় না ইহাই আশ্চর্য্য এবং কাপুরুষত্বের লক্ষণ।

বর্ণের তারতম্য অনুসারে বৃত্তির সমাদরের ন্যূনাতিরেক হয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বর্ণের বৃত্তিগুলিই বিশিষ্টরূপ উন্নতিলাভ করে, অন্যান্য বৃত্তি হেয় বলিয়া তাহার প্রতি কেহ যত্ন করে না। কিন্তু সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থে সকলই প্রয়োজন। কোন পদার্থই তুচ্ছ নহে। আমাদিগের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলেন কিন্তু শিল্প কর্ম্ম কেবল নিকৃষ্ট বর্ণের ব্যবসা ছিল বলিয়া তাহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। বরং অভ্যাসগুণে ধারাবহন প্রকৃতি এতই প্রবল হইয়াছে যে কি ব্রাহ্মণ কি নিকৃষ্টবর্ণ কেহই উন্নতি কি পরিবর্ত্তনের চিন্তাও করেন না। ভিন্ন২ মনুষ্যের বুদ্ধি ভিন্ন২ প্রণালীতে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ চিরকাল একস্থানে একই পদার্থ অবলোকন করে তাহাহইলে তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না; নূতন পদার্থ দেখিলে যে সকল নূতন ভাব মনে উদয় হয় তাহা তাহার দুর্লভ। তদ্রূপ যদি বংশানুক্রমে একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা যায় তাহাহইলে কার্য্যান্তর দেখিবার ইচ্ছা হয় না এবং বুদ্ধির গতিরোধ হইয়া যায়।

কোন কায়স্থ একটি টাকা ব্যয় করিলে তাহার কপর্দ্দকের হিসাব দিবে। কিন্তু একজন কৃষককে বল "তোমার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ জীব রোপিত কত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে সম্বৎসর কত ব্যয় কতই বা লাভ হইল?" সে কখনই ইহার সদুত্তর করিতে পারিবেক না। পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনিয়াছে সেইরূপ উত্তর দিবে। কিন্তু যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিখিয়া রাখিত তাহা হইলে কবে বীজের দোষে কবে ভূমির দোষে শস্যোৎপত্তির ন্যূনতা ঘটিল তাহা জানিতে এবং এতদুভয়ের হেতু বুঝিতে পারিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে পারিত। কৃষক কায়স্থের বুদ্ধি লইয়া এ সকল বিষয়ে হিসাব রাখে না। কায়স্থ ধারাবাহিক মতে হিসাবই লিখেন কিন্তু অনেক স্থলে হিসাবের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। কৃষকের ন্যায় অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে দৃক্‌পাত করেন না সুতরাং অনেক সময়ে অপ্রয়োজন হিসাবে বৃথা কালক্ষেপণ করেন এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ

দেন যে "বিস্তর কার্য্য করিতেছি।" আর কৃষক বলেন যে "আমার অত কথায় কাজ কি?"

আমরা সকলেই মনে করি যে গৃহাদি যত মজবুত হয় ততই ভাল। এঞ্জিনিয়ারেরা বলেন যে, যে কার্য্যে যত দৃঢ়তা আবশ্যক তদতিরিক্ত দৃঢ় করিলে বৃথা অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু যখন শুভঙ্কর মসলার বল ও গাঁথুনির দৃঢ়তা পরিমাণ করিবার সঙ্কেত স্থির করিয়া দেন নাই তখন তাহার প্রতি উপেক্ষা করাই ধারাবাহিক বাঙ্গালিদিগের স্বধর্ম্ম হইবেক ইহাতে বিচিত্র কি?

আজিকালি জগৎ প্রসিদ্ধ জর্ম্মান সৈন্যের কথা মনে করিলে আমাদিগের হীনতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবেক। যুদ্ধকালে সেনাগণকে শ্রেণীবদ্ধ রাখা অধ্যক্ষদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। যেন সকলে অনায়াসে আজ্ঞা শুনিতে পায় এবং কেহ ত্রুটি করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ হইয়া নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু এখন কামান ছুড়িবার প্রণালী এতই পরিপক্ব হইয়াছে যে ক্ষিপ্রহস্ত বিপক্ষের সম্মুখে সৈন্যগণ ঘন ঘন পংক্তিতে অগ্রসর হইতে পারে না; কামান পর্য্যন্ত যাইয়া রঞ্জক ঘর বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই বারম্বার গোলাবর্ষণে প্রায় সমুদায়কে ভূতলশায়ী হইতে হয়; এতাদৃশ স্থলে সৈন্যগণ ফাঁক২ ছাড়া২ করিয়া অগ্রসর হইলে কার্য্য উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া না থাকিলে যে ক্ষতি হয় তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইবে? জর্ম্মান সৈন্যেরা ক্রমশঃ এমনি সুবোধ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাদিগকে যুদ্ধারম্ভকালে একটি আজ্ঞা দিলে সকলেই আপনাপনি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে, অন্যান্য সৈন্যের ন্যায় তাহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় না। যাঁহারা অধিক সংখ্যক লোককে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে শ্রমজীবীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে কত বৃথা ব্যয় হয়। এবং তাঁহারাই বুঝিবেন যে জর্ম্মান সৈন্য কি অসাধারণ গুনসম্পন্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় কৃষকগণ একাধারে এতদ্দেশীয় কায়স্থ ও কৃষকের বুদ্ধি একত্রিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারগণ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে গণিতশাস্ত্র নিয়োজিত করিয়াছেন। জর্ম্মান সেনাগণ নানা শাস্ত্রোপার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই সকল দেশের শ্রমজীবিগণ আপনাদিগের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে নানা বিষয়ে আত্মসংযম করিতেছে এতদ্দেশে বিশ্বাস্য বোধ হয় না কিন্তু সুইটজরলণ্ড দেশের অতি দরিদ্র ইতর ব্যক্তিরা আপনাদিগের ভাবি অবস্থা সম্বন্ধে এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছে যে বংশ বৃদ্ধি হইলে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাঘাত হইবেক বলিয়া সন্তানোৎপাদন বিষয়ে পদে২ আত্মসম্বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বীজগণিত সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের বংশাবলীর পক্ষে এতদূর গণনা করা অসাধ্য হই-

য়াছে। আমাদিগের মধ্যে যিনি অতি কর্ম্মঠ কি পণ্ডিত তিনি একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিব এই বাসনাই করেন। অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে ক্রমশঃ স্থূল হইয়া যায়। মনে নূতন ভাব উদিত না হইলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না এবং চিন্তা স্তম্ভিত হইয়া যায়। নূতন ভাব সংগ্রহ করিবার জন্য সময়ে২ মনকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে বিযুক্ত করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত করা আবশ্যক। এই জন্য সকল ব্যবসার প্রথমে লেখা পড়া শিক্ষা করা উচিত এবং যেমন বীজ পরিশোধনার্থ ভিন্ন বংশে বিবাহ করা প্রয়োজন তদ্রূপ মানসিক দর্শন বিস্তারিত করিবার জন্য নানা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে হৃদ্যতা ও কুটুম্বিতা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। আপ্রেণ্টিস প্রথার দোষ নাই এ কথা বলি না। অন্যের অধীন না হইয়া পিতা পিতৃব্য কিম্বা জ্ঞাতি কুটুম্বের অধীন হইয়া ব্যবসা শিক্ষা করিলে শিষ্যের অনেক কষ্ট নিবারিত হইতে পারে কিন্তু পদে২ ব্যবসা নির্ব্বাচন, এবং পরের শিষ্য হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের প্রয়োজন হয় তাহা এক মহোপদেশ। আমাদিগের মধ্যেও গুরূপদেশের বিধান ছিল কিন্তু এখন তাহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যায়াম শিক্ষাতে দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে উহাতেও ধারাবহন প্রণালী প্রবিষ্ট হইয়া নানা দোষের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে উল্লিখিত প্রাণিতত্ত্বের নূতন আবিষ্কার অবশ্যই জাতিভেদ প্রথার সাপেক্ষ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির আদিম অবস্থা।

শাসনপ্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর সাক্ষিবিষয়াদি)

স্থল বিশেষে সাক্ষীর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য, স্থল বিশেষে পরীক্ষা নাকরিয়াই সাক্ষ্য গ্রহণ করা বিধেয়; সাক্ষী পরীক্ষিত হউক আর নাই হউক, সাক্ষী উপস্থিত হইলেই কালক্ষয় নাকরিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। কাল বিলম্বে সাক্ষীর দোষ হইলে বিচারক পাতকী হইবেন।(১)

বিচার নিষ্পাদন সময়ে যেখানে সাক্ষীর আগমন সম্ভাবনা ও সামর্থ্য নাথাকে তথায় তল্লিখিত পত্রাদি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ হয়। সেই লেখ্য তাহার কি না তদ্বিষয়ের সন্দেহ নিরাস জন্য তদীয় অন্য লেখ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা রীতি ইহা চিরপ্রসিদ্ধ।(২)

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণকে ঋষিগণ কেন সাক্ষিযোগ্য জ্ঞান করেন নাই তাহা শুন। অজ্ঞতা হেতু শিশুজন, স্ত্রীলোকের মিথ্যা কথন অস্বাভাবিক নহে, এই কারণে কামিনী কুল, (৩) জাল কারী ব্যক্তি দিগের পাপ কার্য্যে অভ্যাস আছে সুতরাং তৎকথিত সত্য বাক্যকে লোকে কুট সাক্ষ্য জ্ঞান করে তন্নিবন্ধন জাল কারী, বন্ধুজনেরা স্নেহ প্রযুক্ত অসত্য কহিতে সম্মত হইতে পরেন তদ্ধেতু সুহৃজ্জন, শত্রু ব্যক্তি পূর্ব্বাচরিত বৈর নির্য্যাতনের প্রতি শোধ বুদ্ধিতে বিপরীত কহিতে পারে অতএব ইহাদের সাক্ষী গ্রাহ্য নহে।

---

(১) কাত্যায়ন { ন কালহরণংকার্য্যং রাজ্ঞা সাক্ষিপ্রভাষণে। মহান্ দোষো ভবেৎ কালাদধর্ম্ম বৃত্তিলক্ষণঃ।

নারদ { অন্তর্ব্বেশ্মনি রাত্রৌচ বহির্গ্রামাচ্চ যন্ত্রবেৎ। এতস্মিন্নভিযোগে তু পরীক্ষা নাত্র সাক্ষিণাম্॥

মনু অঃ ৮ঃ { অনুভাবিতু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্। অন্তর্ব্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে ॥৬৯

সাহসেষুচ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষুচ। বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥৭২

(২) অশক্য আগমো যত্র বিদেশ প্রতিবাসিনাম্। ত্রৈবিদ্য প্রেষিতং তত্র লেখ্যং-সাক্ষ্যং প্রদাপয়েৎ॥ কাত্যায়ন।

(৩) কাত্যায়ন { বালোঽজ্ঞানাদসত্যাৎ স্ত্রী পাপাভ্যাসাচ্চ কুটকৃত্। বিব্রূয়াদ্বান্ধবঃ স্নেহাদ্বৈরনির্য্যাতনাদরিঃ॥

এইরূপ বিচার শাস্তিকার্য্যেই প্রচলিত; সাহসিক কার্য্যাদিতে ইহাদের সাক্ষীও গ্রাহ্য হয়।(৪)

পাঠক তোমাকে যাহা বলিতেছি তদ্বিষয়ে তোমার মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা অতএব তুমি যেখানে যেখানে শাস্তি কার্য্যের নাম শুনিবে তাহাকে দেওয়ানী ও যেখানে যেখানে সাহসিক কার্য্য এই শব্দ শুনিবে তাহাকে ফৌজদারি বিচার মনে করিবে তাহা হইলে তোমার মনে কোন দ্বিধা জন্মিবে না। পাঠক তুমি এখন নিশ্চয় বুঝিলে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, ভয়, মৈত্র, রাগ, দ্বেষ ও অজ্ঞানাদি হেতু বশতঃ মিথ্যা বলিবার সম্ভাবনা, ইহা বিবেচনা করিয়াই ঋষিগণ সাক্ষী বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইয়া রহিয়াছেন।(৫)

সাক্ষ্য কার্য্যে কামিনীজনের বিবাদে কামিনীকুল, দ্বিজাতির বিবাদে তৎ সদৃশ দ্বিজাতি, শূদ্রগণের বিষয়ে শূদ্র ব্যক্তি, অন্ত্যজ ব্যক্তি বর্গের সাক্ষ্যে অন্ত্যজ মনুষ্যই সাক্ষী হইবে; সদৃশ সাক্ষী না হইলে শাস্তি কার্য্যে গ্রাহ্য হয় না।(৬)

উভয় পক্ষের সাক্ষ্যে তুল্যতা থাকিলে সদ্‌গুণাদিসম্বন্ধ ব্যক্তির কথা বিশিষ্ট প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে।(৭) সাক্ষীর বিষয় অদ্য এই পর্য্যন্ত রাখা গেল ইহা ক্রমে ক্রমে বলিব নতুবা পাঠকের বিরক্তি ও অরুচি জন্মিতে পারে।

* সম্ভূয় সমুত্থান।

অনেকেই কহিয়া থাকেন আর্য্যজাতির প্রবৃত্তি বাণিজ্য বিষয়ে বিস্তৃত ছিল না বলিয়া সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্যের গুণ জানিতে পারেন নাই। যদি তাহা অবগত হইতে পারিতেন তবে কি আমাদের ভাবনা থাকিত?

পাঠক তুমি লেখকের কথাগুলি শুনিয়া যথার্থ মীমাংসা করিবে। তুমি জান আর্য্যজাতির বাণিজ্য কার্য্যের ভার বৈশ্যগণের প্রতি অর্পিত ছিল। তাহারা যে

---

(৪) উশনা — দাসোঽন্ধো বধিরঃ কুষ্ঠী স্ত্রীবালস্থবিরাদয়ঃ।
এতে অনভিসম্বন্ধাঃ সাহসে সাক্ষিণো মতাঃ॥

মনু অঃ ৮ — স্ত্রীনাম সম্ভবে কার্য্যং বালেন স্থবিরেণবা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা॥৭০

নারদ — ব্যাঘাতাচ্চ নৃপাজ্ঞায়াং সংগ্রহে সাহসেষুচ।
স্তেয় পারুষ্যয়োশ্চৈব ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ॥

(৫) যাজ্ঞবল্ক্য — অসাক্ষ্য পিহি শাস্ত্রেষু দৃষ্টঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।
বচনাদ্ দোষতো ভেদাৎ স্বয়মুক্তির্মৃতান্তরঃ॥

(৬) মনু ৮ অ; শ্লো ৬৮ — স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যু দ্বিজানাং সদৃশদ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তি শূদ্রাণামন্ত্যানা মন্ত্যযোনয়ঃ॥

(৭) দ্বৈধে বহুনাং বচনং সমেতু গুণিনাং বচঃ।
গুণিদ্বৈধেতু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তরাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্য জানিত না তাহা কি বিশ্বাস কর? যদি কর তবে তোমার ভ্রমপ্রমাদ নিরাস করাই অগ্রে উচিত। সিংহলদ্বীপে যবদ্বীপে ও পূর্ব্ব উপদ্বীপের কতিপয় স্থলে ও চীনের লোকের সঙ্গে যে বাণিজ্য চলিত তাহার প্রমাণ অনেক শুনিয়াছ। এক্ষণে তুমি কেবল এই কথার প্রমাণ চাও যে যদি সম্মিলিত সম্প্রদায় পরিভুক্ত বাণিজ্য থাকিত তাহাহইলে তাহার কোন নাম(৮) অবশ্য আর্য্যগণের ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ থাকিত। তদনুসারে তোমাকে সম্ভূয়সমুত্থানের কথা বলিতেছি। বাণিজ্য ব্যবসায়ী জনগণের মধ্যে যদি কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পরের অর্থ ও কায়িক শ্রম বিনিয়োগ পুরঃসর ক্ষতি বৃদ্ধির আনুমানিক সীমা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে বাণিজ্য করে তবে তাহাকে তদবস্থায় সম্ভূয়সমুত্থান কহা যায়।(৯)

পাঠক যেদিন অবধি সম্ভূয়সমুত্থান কার্য্য স্থগিত হইয়াছে সেই দিন অবধি ভারতের দুর্দ্দশার প্রাথমিক সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে। কোন্ সময়ে এই যে জাতিসাধারণহিতকর কার্য্যের পথে কণ্টক পড়িয়াছে তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। তবে এই মাত্র বলা যায় যে কলিকালের আদি ভাগেই উহার লোপ হইয়াছে। অন্য তিন যুগে যে সকল কার্য্য মানবগণের হিতজনক ও সুসাধ্য ছিল তাহার কতকগুলি কলিকালে মনুষ্যজাতির পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক ও অকীর্ত্তিকর ও অসাধ্যসাধন ভাবিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষিগণ শাস্ত্রে "মাতার দিব্বি" দিয়া(১০) সেগুলি কলিতে অধর্ম্মজনক ও নরক প্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতের আর্য্যগণের মন সর্ব্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত। সুতরাং অস্বর্গ কার্য্যে তাঁহাদিগের মন কেন যাইবে? কাজেই সমুদ্রযাত্রা রহিত হইল। এইটিই সম্ভূয় সমুত্থানের অন্তরায় বলিয়া অনুমিত হয়। বিদেশীয়দিগের সঙ্গে সংশ্রব না থাকিলে বাণিজ্য বিস্তার হয় না।

সম্ভূয় সমুত্থান বিবাদে কত দূর দণ্ডের পরিমাণ তাহা যখন শাস্ত্রে আছে তখন

(৮) সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক্ (কর্ণধারস্তু নাবিকঃ।)
অমরকোষ পাতাল বর্গ।

(৯) সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতাং।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বাসম্বিদা কৃতৌ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ব্যবহার কাণ্ড ২৬২
সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশ প্রকল্পনা॥
মনু অঃ ৮ শ্লো ২১১

(১০) সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ॥
ব্যাস প্রশ্নঃ পরাশর সংহিতা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।

বিষ্ণু পুরাণে { বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌযুগে নৃণাং।

আদি পুরাণে { যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো নকর্ত্তব্যঃ কলৌযুগে। পাপ প্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নর স্তথা॥

অবশ্যই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগণিত। লেখক বলিতে পারে স্থল-পথে বাণিজ্য সহজ নহে। দ্রব্যাদির আ-সার প্রসার অনায়াস সাধ্য না হইলে বাণিজ্যে লাভ হয় না। এই কারণেই প্রথমাবধি স্থল পথের বাণিজ্যে লোকের তাদৃশ আস্থা দেখা যায় নাই। অবশেষে যখন সমুদ্র যাত্রা(১১) রহিত হইয়া গেল তখন আর্য্যজাতির পতনের উন্মেষকাল, তৎকালে লোকের প্রতিভা লোপ হইবার উপক্রম। বিশেষতঃ তৎকালে ইহাদিগের গৃহ বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। যখন আ-ত্মীয়গণের সঙ্গে প্রণয় নাই তখন অপরি-চিত ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপে পরিচয় হইতে পারে? সেই অন্তর্ব্বিচ্ছেদকালে প্রজাগণ প্রানরক্ষার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত ছিল এ-রূপ অবস্থায় কি কোন ব্যক্তির স্বদেশানু-রাগ প্রবল থাকে? তখন কেবল আত্ম রক্ষার চিন্তা। সুতরাং সম্ভুয়সমুত্থান রহিত হইল।

পূর্ত্তকার্য্য (PUBLIC WORKS)

আমাদিগের সভ্যজাতিরা বলিবেন ভারতবর্ষীয়দিগকে তাঁহারা পূর্ত্তকার্য্যের ফল শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের উপ-দেশ না পাইলে অথবা আদর্শ না দে-খিলে ভারতের আর্য্যগণ কদাচ পূর্ত্তকার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। বৈদেশিক পরিব্রাজক! তুমি একবার ভারত পরিভ্র-মণ কর। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ও কাব্য পাঠ কর অবশ্য নানা স্থলে পূর্ত্ত কার্য্য দেখিতে পাইবে। যদি তোমার নারদ, মার্কণ্ডেয় মুনি, ভূষণ্ডী কাক অথবা কোন ভারতীয় উপন্যাস বক্তা বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে অবশ্য পূর্ত্ত কার্য্যের অনেক সমাচার পাইবে। নারদ ও যুধিষ্ঠির সম্বাদেও ওই রূপ কথা বার্ত্তা দেখা যায় মহাভারত সভাপর্ব্ব দেখ।

পাঠক তুমি কাশী চল; জ্ঞানবাপী ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি তীর্থ দেখ। যদি বৃন্দাবন যাও তবে সেখানেও বনরাজী দেখিয়া পরিতোষ লাভ করিতে পারিবে। তুমি কি অক্ষয় বটের কথা শুন নাই! অক্ষয় বটের এত মাহাত্ম্য কেন। ছায়া-দান দ্বারা তিনি ক্লান্ত জনগণের শ্রান্তি অপনয়নপূর্ব্বক স্বস্তি ও শান্তি প্রদান করেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন কর। নরেন্দ্রহ্রদ চক্রতীর্থ মার্কণ্ডেয়হ্রদ ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর শ্বেত গঙ্গা প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পূর্ত্ত কার্য্য।

অক্ষয় বটের কথা শুনিয়াছ সর্ব্বস্থানে তাঁহার পূজা হয়।

রাম ভরতকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে কি কি বিষয়ের

(১১) সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ ।
মাংসদানং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্যচ ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
উদ্বাহ তত্ত্ব ধৃত বৃহন্নারদীয় বচন ।

উপদেশ দিয়াছিলেন? (১২) পাঠক তুমি রামায়ণ পড়; প্রজাদিগের জন্য রাম কত ব্যস্ত হইয়া ভরতকে কহিলেন, ভ্রাতঃ তুমি প্রজাদিগের সঙ্গে সমদুঃখসুখী কিনা? তুমি প্রজাদিগকে স্থলবিশেষে বীজ, ভোজ্য ও ঋণ দিয়া থাক কিনা? মরুদেশ ও অল্পতোয় বিশিষ্ট প্রদেশ সকলে বৃহৎ বৃহৎ তড়াগাদি করিয়া দিয়াছ কিনা? প্রজাগণ দেবমাতৃক বলিয়া কৃষির নিমিত্ত যে খেদ করিত তাহাদের সে খেদ নিবৃত্তি করিয়াছ কি না? এখন সমুদায় রাজ্যকে অদেবমাতৃক বলিতে পারি কি না? বৈদেশিক, তুমি বলিতে পার যদি ইহাদিগের সে বুদ্ধিই ছিল তবে প্রশস্ত রাজবর্ত্মের কথা শ্রবণ করা যায় না কেন? তুমি মনে করিয়াছ ইহাদিগের ইতিহাস নাই, তুমি যাহা বলিবে তাহার উত্তর দিতে পারিব না। মহাভারত ও রামায়ণকে কি পদার্থ জ্ঞান কর? তাহাতে প্রশস্ত রাজপথের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। রাজমার্গ অপরিষ্কৃত করিলে সাপরাধ ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয় ও স্থল বিশেষে তিরস্কার হইয়া থাকে তাহা তোমাকে দেখাইয়াছি। (মনু—অ ৯০—)২৮২।২৮৩ শ্লোক। যদি বল বাঁধা রাস্তার ধারে সারি বাঁধা গাছ নাই। তাহার প্রমাণ জন্য আমি দীলিপ রাজার বশিষ্ঠের আশ্রমগমন ও রঘুরাজার দিগ্বিজয় যাত্রার কথা উল্লেখ করিব। দিলীপ যে সময়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইতেছেন তখন তাঁহার দর্শনলালসায় বৃদ্ধ গোপগণ সদ্যোজাত নবনীত উপহার সমভিব্যাহারে বশিষ্ঠাশ্রমাভিমুখের রাজমার্গে উপস্থিত আছে। রাজা সেই সকল বৃদ্ধদিগকে রাজবর্ত্মস্থিত বৃক্ষশ্রেণীগত বনজ বৃক্ষগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বশিষ্ঠ আশ্রমে চলিলেন। রঘু যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন শরৎ কাল। অগাধ জলবিশিষ্ট নদীগুলি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল নিঃসারণ পূর্ব্বক সুখতার্য্য ও অল্পজলা করিয়াছিলেন। মরুদেশগুলিকে সজল করিয়াছিলেন। যে সকল নদী নাব্য ছিল সেগুলি সেতুবন্ধন দ্বারা অনায়াসতার্য্য করিয়াছিলেন। রঘু যুদ্ধযাত্রাকালে যে স্থান মহারণ্য দেখিয়াছিলেন তাহার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তখন সেস্থল সুগম্য সুপরিষ্কৃত ও অনাবৃত স্থল হয়। (১৩)

(১২) কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানিচ বৃহন্তিচ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষি র্দেব মাতৃকা॥ ৭৮
মহাভারত সভাপর্ব্ব অধ্যায় ৫

(১৩) সর্গ ২ — হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষ বৃদ্ধা সুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গ শাখিনাম্।

৪র্থ ২৪শ্লো — সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈ প্রেরয়ামাস তংশক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥

ঐ ৩১ শ্লো — মরুপৃষ্ঠান্যুদম্ভাংসি নাব্যাঃ সুপ্রতরা নদীঃ।
বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমত্বাচ্চকার সঃ॥

রঘুবংশ

এখন পাঠক তুমি শাস্ত্রের আদেশ চাও; পূর্ত্তকার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রশংসা শুনিতে মানস করিয়াছ; তুমি প্রাচীন ঋষিদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ কর। দ্বিজগণ সর্ব্বদা সমাহিত চিত্তে ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য সমাধা করিবেন। ইষ্টকার্য্য দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। পূর্ত্তকার্য্যই মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ। যে ব্যক্তি দিনেকের নিমিত্তে ভূমি খনন করিয়া সুস্বাদু বারি প্রদান করেন, তদীয় জলাশয়ে অন্য প্রাণিবর্গের জলপানের সম্ভাবনা না থাকিলেও তৃষ্ণার্ত্ত এক মাত্র গোধনের তৃপ্তি সাধনেই তাঁহার জলাশয় করণের সম্পূর্ণ ফল জন্মে।(১৪) সেই বারিক্ষেত্রই তাঁহার সপ্তকুল উদ্ধারের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

যাঁহার প্ররোপিত তরুরাজীর সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া জীবগণ ক্লান্তি দূর করে তাহার পক্ষে সেই পাদপশ্রেণীই, ভূমিদাতা ও গোদান কর্ত্তার সহিত সালোক্য প্রদানের সোপানস্বরূপ। যে ধর্ম্মমতি পরকীয় বাপী কূপ তড়াগাদি দেবমন্দিরাদির যথাসম্ভব পঙ্কোদ্ধার ও জীর্ণ সংস্কার করেন তিনিও পূর্ব্বোক্তরূপে স্বর্গফলভাগী হন। জীর্ণ সংস্কারাদিও অভিনব পূর্ত্তকার্য্যের সদৃশ গণ্য। ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্যে দ্বিজাতিত্রয়েরই সমান অধিকার। শূদ্রগণের কেবল পূর্ত্তকার্য্যে অধিকার দেখা যায়। ইষ্টকার্য্যে শূদ্রগণ নিতান্ত অনধিকারী।(১৫)

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যপালন, নাস্তিক হইতে বেদের রক্ষা, আতিথ্য, বৈশ্বদেবের পূজা এই কয়েকটি কার্য্যের নাম ইষ্ট।(১৬)

জলাশয়,দান, বৃক্ষরোপণ, প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ, পঙ্কোদ্ধারকার্য্য ও জীর্ণসংস্কার পান্থনিবাস, বাঁধাঘাট ও দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা অতিথিশালা প্রভৃতির নির্ম্মাণ-

(১৪) ইষ্টাপূর্ত্ত
ইষ্টা পূর্ত্তেতু কর্ত্তব্যো
ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং
পূর্ত্তে মোক্ষ মবাপ্নুয়াৎ॥
একাহ মপি কর্ত্তব্যং
ভূমিষ্ঠ মুদকং শুভং।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত
যত্র গো র্বিতৃষী ভবেৎ॥
লিখিত সংহিতা।

(১৫) ভূমি দানেন যে লোকা
গো দানেনচ কীর্ত্তিতাঃ।
তাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ
পাদপানাং প্ররোপণে॥
বাপী কূপ তড়াগানি
দেবতায়তনানিচ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্ত
সপূর্ত্ত ফল মশ্নুতে॥
লিখিত সংহিতা।

(১৬) অগ্নিহোত্রং তপঃসত্যং
বেদানাঞ্চৈব পালনং।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ
ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং
সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ
পূর্ত্তে ধর্ম্মেণ বৈদিকে॥
লিখিত সংহিতা।

কার্য্য পূর্ত্তমধ্যে গণ্য। কুল্যাদির বিষয় ইংরাজী দেখ। তথায় ঋক্বেদের বচন প্রমাণ উদ্ধার করা গেল।

Vide Murs Sanskrit Texts, Vol. V.

R. V. IV 57, is a Hymn in which the ক্ষেত্রস্যপতি, or deity who is the protector of the soil or of a husbandry, is addressed and a blessing is invoked on field operations, and their instruments, and on the Cultivators (কীনাস). Compare X. 117, 7 উর্ব্বরা, Cultivated and fertile land, is mentioned in various places. Water courses (কুল্যা), which may or may not have been artificial, are alluded to in III, 45, 3, and X 43, 7 (সমক্ষরন্ সোমাসঃ ইন্দ্রম্ কুল্যাঃ ইব হ্রদম্), as bending to ponds or lakes; and waters which are expressly referred to as following in channels which had been dug up for them are mentioned in VII 49, 9 "যাঃ আপো দিব্যা উক্তবা শ্রবন্তি খনিত্রিমাঃ উক্তবা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ।" and from this it is not unreasonable to infer that then Irrigation of lands under cultivations may have been practised (Page 465)

শ্রী লাল।

রজনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি, আমি প্রায় প্রত্যহ রাম সদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না—কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্র বাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেওবা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই। অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যা-

হই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম যাইব না—আবার যাইতাম। এরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? আমিই কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য, বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার সারেঙ্গ এসরাজ বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল? তা ত নয়। তবে কি? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ, রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে এক জনকে সকলে সমান রূপবান্ দেখে না কেন—একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপদর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখমাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্ব সময় না হইবে?

শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারে ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখন যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে—আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার সুখস্বপ্ন, কেবল তাহার যন্ত্রণা জন্য। বধিরের, সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য; আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চার, তেমনই যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহার আবার ফিরিয়া

দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুঃশূন্য মূর্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেই রূপ পাষাণী মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণ মধ্যে এ সুখ দুঃখ সমাকুল প্রণয়লালসাপরবশ হৃদয় কেন পুরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না কেন? এসংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এসংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহুবৎসর গিয়াছে—বহুবৎসর আসিতেও পারে। বৎসরে বৎসরে বহুদিবস—দিবসে দিবসে বহুদণ্ড—দণ্ডেদণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত জন্য, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তোমরা আমার গল্প শুনিতে বসিয়াছ কেন? আমার এ গল্পে রাজা নাই—রাজপুত্র নাই বীরপুরুষ নাই—যুদ্ধ নাই—চুরি ডাকাতি নাই—লুকাচুরি নাই—খুন জখম নাই। অতি দীন দুঃখিনীর দুঃখের কথা। দুঃখিনী অতি সামান্য, কথাও সামান্য, কেবল দুঃখ অসামান্য। রস পাইবে কি? রসিক রসিকাগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা অন্যত্র রসানুসন্ধান করুন। আমার দুঃখ আমাতেই থাক।

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না—কিন্তু কদাচিৎ দুই এক দিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম আমি ছোটবাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা এক দিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার, মনে ভাবিতাম ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন—কি বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোট বাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এদিগে আমার যাতয়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতা মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না পিতা মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়া শব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন,

"তবে একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে ?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈকি ? অমন বড় মানুষ লোক, কথাদিলে কি আর নড় চড় আছে ? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা, পরে এত করবে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গাল নয়—হাজার দুহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যেদিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "টাকার কি কাণার বিয়ে হয়?" ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা ভরসা হইতে পারে, যে বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সেই দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে। তাঁতে আর ছোট বাবুতে টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছে।

হরনাথ বসু, রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু২ জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা মাতার কথায় বুঝিলাম গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়িবৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতা মাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি, যে সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম যদি সে বড় মানুষ বলিয়া, অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ

দুঃখিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম, না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন তবে, তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড় মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ—অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথা গুলি ভুলিয়া যাই।

যথা সময়ে, আবাররামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়া ছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিগে আগুন জ্বলিতেছে—আগে কোন দিগ্‌ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না! কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল,

"কাণি—তোর বিয়ে হবে।"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন, ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম। বলিলাম, "কেন আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল,

"আমলো! তোর কি বিয়ের মন নাই নাকি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল,

"পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে করবিনে কেন?"

আমি বলিলাম—"খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল,

"আঃ মলো! বের বলিতেছি—নহিলে খেঙরা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম—আমার দুই অন্ধচক্ষে জল পড়িতেছিল—তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতে ছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম,—কই, তিরস্কারের কথা কিছুই ত বলা হয় নাই—অকস্মাৎ কা-

হার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণ শক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই একবার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয় আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম! অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম—কাণে বাজিতে লাগিল—"কে রজনি।" আমি উত্তর করিলাম না—মনে করিলাম আর দুই এক বার জিজ্ঞাসা করুন্—আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রজনি! কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না—আরও জিজ্ঞাসা করুন্। মনে করিলাম আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমার কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে?"

আমি সেবার উত্তর করিলাম—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ, যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম,

"ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোট বাবু হাসিলেন,—বলিলেন, "ছোট মার কথা ধরিও না—তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস—এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে, কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম—তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখিতে পাও না—সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—তিনি আমার হাত ধরিবেন! ধরুন্ না—লোকে নিন্দা করে করুক্—আমার নারীজন্ম সার্থক হউক! আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু—বলিব কি? কি বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত ধরিলেন!

যেন একটি প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি, সেই সময়ে, ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে

ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া, কোন বন্য বৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি! আর কি মনে হইয়াছিল—তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া, ছোট বাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেই সঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময়ে কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছোট বাবু ছোট মার কাছে গিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা? সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন,—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোট বাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া, নিজ প্রয়োজনে বড় মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এদিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন-স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবারাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এবিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গ-লতার যত্ন, ছোট বাবু ঘটক—এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোট বাবু ঘটক! আমি একা অন্ধ কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতা পিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপালবসুর বিবাহ ছিল—তাহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল, চম্পক লতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখা পড়া শিখান নাই—কোনপ্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে

চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তার পর কোন গ্রামে, বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টর হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তার পর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু লং সাহেবের আইনে বাধিয়া গেল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোট বাবুর মোসাহেবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপা দিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"টাকার কথা সত্য ত? যেই কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সে বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কান পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি! না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না!"

হীরালাল। কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরিব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে? তাতে আবার কাণা মেয়ে, আবার বয়েসও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়ঃস্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্বশ্চুভিশ্চুশাং পত্রিকার এডিটর ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল্ সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এতবড় পণ্ডিত জামাই হাত ছাড়া হয় ভাবিয়া শেষ একটু দুঃখিত হইলেন; শেষে বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এবিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।

হীরা। তাঁদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড় মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাঁদের বড় বিশ্বাস করিও না। এই বলিয়া হীরালাল চুপিচুপি কি বলিল তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন "সে কি? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল। চারিদিক্ দেখিয়া বলিল,

"তোমার ঘরে মদ নাই, বটেহে?" পিতা বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "মদ! কিজন্য রাখিব!"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের ন্যায় বলিল,

"সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে, ওগুলা যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করিতে না পারিয়া, ক্ষুণ্ণমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারিদিক্ হইতে উচ্ছ্বাসিত বরিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। যোড়হাত করিয়া বলিলাম—"আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবড় থাকিব।"

মা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম--কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা, বিরক্ত হইলেন—রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ডুবিলাম।

সেই দিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচ সংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়া ছিলেন। এ সব সময়ে হয়,

আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম কেগা?

উত্তর "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—"আমার যম কি আছে? তবে এত দিন কোথা ছিলে।"

স্ত্রীলোকটির রাগ শান্তি হইল না। "এখন জানবি! বড় বিয়ের সাধ! পোড়ার মুখী; আবাগী।" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হা দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন—তোমার সঙ্গে কথা আছে।" এত গালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয় তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ মা কে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতে ও কিছু হয় নাই।

চাঁপা, একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি?"

আমি। কি?

চাঁপা। দুদিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি?"

ভাবিলাম, মন্দ কি? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন?"

চাঁপা আমার, সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া ছিল; সে বলিল "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ ত বল্?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠ ফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে এক মাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে ঠিক

থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব বাহির হইয়া আসিস্।”

আমি সম্মত হইলাম।

রাত্র দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক২ করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া, আমি দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম চাঁপা দাড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। এক বার ভাবিলাম না, একবার বুঝিলাম না, যে কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি। পিতা মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল, যে অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব। রজনীনাম যে কলঙ্কে ডুবিবে, তাহা একবারও মনে পড়িল না।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুর বাড়ী?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সদ্যই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল—পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এভয়ে বড় তাড়া তাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল, যে আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর কাহাকে আমার সঙ্গে দিল? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ—আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনাসহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—আমার উপর দেবতা আছেন: তাঁহারা কখন লবঙ্গ লতার ন্যায়, পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য?

তখন জানিতাম না যে ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে, তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্য শূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসার চক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথায় শব্দ নাই—দুই একখানা গাড়ির শব্দ—দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ! আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—

"হীরালাল বাবু আপনার গায় জোর কেমন?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি?"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। "তোমার হাতে কিসের লাঠি।"

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার?

হীরা। সাধ্য কি!

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম,—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

কমলাকান্তের দপ্তর।

একাদশ সংখ্যা।

আমার দুর্গোৎসব।

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোতঃ, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোতঃ—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হই-

তেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে, দিগন্ত আলো করিতেছে—আবার নিবিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুলজলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে, হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা! হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর জন কেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কাল স্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! আমি সেই কাল স্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থ সাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম অর্থ, সুখ দুঃখ দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর! এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ সমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নব বলধারিণি, নব দর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি—এসো মা, গৃহে এসো—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশকোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধন ধান্য দায়িকে! নগাঙ্ক শোভিনি নগেন্দ্র বালিকে! শরৎ সুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু সেবিতে সিন্ধুপূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি, শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণ ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্ত কালস্থায়িনি! শক্তি দাও, সন্তানে, অনন্তশক্তি প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা! এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয়

কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব —না পারি এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা গৃহে এস —যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না —সেই অনন্ত কাল সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব— সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি!

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁশি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত শানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো।—" বড় পূজার ধূম বাঁধিবে। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি।
দ্বেষক দলনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্ত পালিকে॥

জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে,
পাপ তাপ ভয় শোক নাশিকে।
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে,
জয় মা কালি করালি অম্বিকে।

জয় হিমালয় নগবালিকে,
অতুলিত পূর্ণচন্দ্র ভালিকে।
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে,
জয় মা কমলাকান্ত পালিকে॥

নমোস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমস্ততে কামচরে সদা ধ্রুবে॥

ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি
ত্রাহিমাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি।
নমোস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোস্তুতে।
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে।
ত্রায়স্বমাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোস্তুবিমোচিতঃ॥*

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২। গৌড়েশ্বর নাটক। শ্রী রমেশচন্দ্র লাহীড়ি কর্তৃক প্রণীত। সন ১২৮০ সাল। কলিকাতা শিবাদহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

গ্রন্থকার পুস্তকের আবরণ পত্রে একটী "বিজ্ঞাপন" দিয়াছেন :—

বিজ্ঞাপন।

"সহৃদয় অথচ চিন্তাশীল পাঠকবর্গের হস্তে এই নাটক অর্পণ করিলাম।"

চিন্তাশীলের পক্ষে এই গ্রন্থ নূতন নহে। ইহা জাল রামায়ণ অথবা জাল অযোধ্যা কাণ্ড। লেখকের কবিত্ব শক্তি আছে, সুতরাং তিনি এ পথ অবলম্বন করিয়া ভাল করেন নাই। স্বয়ং ভবভূতি যে বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া দূরে অবস্থান করেন, সেই বাল্মীকির অযোধ্যা কাণ্ডের কাপি করিয়া লাহিড়ী মহাশয় যে নাটক রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। শুদ্ধ কাপি করিলেও ক্ষতি ছিল না; গ্রন্থকার কাপি করেন নাই জাল করিয়াছেন। নামের, ঘটনার, সময়ের, চরিত্রের, ফের ফার করিয়া গৌড়েশ্বর নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। অথচ——

গৌড়েশ্বর চন্দ্রকেতু	রাজাদশরথ
সুধীর	রামচন্দ্র
রঘুবর সুরেন্দ্র	কুমার লক্ষ্মণ
বলরাম	ভরত
জাবালি	বশিষ্ঠ
বিজয়া	কৌশল্যা
কুন্তলা	কৈকেয়ী
তারা	মন্থরা
মনোরমা।	সীতা।
সুরসুন্দরী	উর্ম্মিলা।

গৌড়েশ্বরে, সেই দশরথের স্ত্রৈণ্য, চাপল্য স্নেহ, মায়া ও পরিণাম।
কুমার সুধীরে, শ্রীরামচন্দ্রের সেই বীরত্ব ও ধীরত্ব।

রঘুবর স্থরেন্দ্রে. কুমার লক্ষ্মণের সেই প্রতাপ সেই ঔদ্ধত্য সকলই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

কুন্তলায়, কৈকেয়ীর সপত্নী ভাব, ও তারা দাসীতে মন্থরার সেই কুচক্র সকলই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এরূপ প্রতারণায় গ্রন্থকার কিছু লাভ করিতে পারেন নাই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি আছে। তাহার পরিচয়। সুর সুন্দরী রঘুবরকে বলিতেছেন:—

"নাথ! নাহি দেখিয়াছি হেন কাল নিশী, নাহি ছিল আশা দেখিব দিনের মুখ আর! পোহাইল যদি এ কাল সর্ব্বরী, না দিব যাইতে রণে, আজ। সারানিশী কাঁদিয়াছে আকুল পরাণ, প্রাণনাথ, দেখিয়া স্বপনে অমঙ্গল: রক্তবৃষ্টি মাঝে পড়ি নরমুণ্ড, অসজ্ঞা, ছাইয়া মেদিনী, হাসিল বিকট হাসি, ব্যাদান করিয়া মুখ, আইলা ধাইয়া, খাইতে মোর হৃদয়ের প্রাণ, আতঙ্কে দিলাম হাত হৃদে, দেখিলাম আকুল হইয়া নাহি প্রাণনাথে, আছে শুধু মৃতহৃদি হরি লইয়াছে কেবা হৃদয়ের নিধি!!"

অন্য স্থান হইতে: আচার্য্য জাবালি গৌড়েশ্বরের মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছেন:—

"দেখরে সংসার, রাজসুখ! যাহে মুগ্ধ সবে; নরপাল হারাইল প্রাণ নিজে অপালনে! অন্তিমের বন্ধুতার নাহি একজন; কেহ নাহি বসিল শিয়রে শুনাতে শেষের এ ভয়ঙ্কর দিনের আশ্রয় রাম-নাম। কেহ নাহি দেখিল নিবিতে এ রাজদীপ! নিমিলিতে রাজ আঁখি এ মহানিদ্রায়! না পড়িল এক বিন্দু অশ্রুজল, ভিজাইতে সে দুর্গম দেশের দারুণ পথ! পাশরি রাজারে এ সঙ্কটে, সবে মত্ত পূরণেতে নিজ নিজ সাধ! আহা! কিবা রুক্ষ মরুভূম রাজার জীবন! এ সংসারে সুখউৎস প্রেম আদান-প্রদান-স্নেহ; কিন্তু হায়! রাজন্য জীবন বঞ্চিত, প্রেম রত্নাকরে!"

আবার বলি গ্রন্থকারের এরূপ রচনা ভঙ্গি ও কবিত্ব আছে, তিনি এরূপ পথ অবলম্বন করিয়া ভাল করেন নাই।

২। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এলাহাবাদ বিক্টোরিয়া যন্ত্র।

এগ্রন্থ খানি উৎকৃষ্ট। এরূপ গ্রন্থের আমরা বিশেষ সমাদর করিয়া থাকি। ইহার ভূমিকা পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। পাঠ করিয়া পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইবেন। ইহার মতামতের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না—ভূমিকা হইতে শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝাইতেছে। 'গ্রন্থকারের মুখে, এরূপ পরিচয় দেওয়াই বিধেয়।

"আমি হিন্দুকুলশিরোমনি মনুর বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মত এই প্রস্তাবে প্র-

কাশ করিলাম। ইহাতে মনুর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ ব্যবস্থা-প্রনয়ন-কৌশল ও তাঁহার মতের বিশুদ্ধতা প্রদর্শন ভিন্ন আরো কিছু লক্ষ্য আছে। ইহাতে উত্তম মধ্যম অধম বহু প্রকার বিবাহ নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সমুদায়ই প্রাচীন প্রথা ও তাহা মনুর ব্যবস্থা-সম্মত। যে প্রচলিত হিন্দুবিবাহ রীতির গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইল; যদি এই বিশুদ্ধ রীতি কাহারো দৃষ্টিতে অবিশুদ্ধ বোধ হয়—যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া অন্যবিধ বিবাহে প্রবৃত্ত হইতে কাহারো একান্ত আগ্রহ হয়, মনুর ব্যবস্থা তাঁহার অনুকূল হইবে। তাঁহার সহিত অন্য লোকের সহানুভূতি না হইতে পারে, কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" কিন্তু তাঁহার কার্য্য একান্ত শাস্ত্র বহির্ভূত হইবে না—তাঁহাকে হিন্দু সম্প্রদায় চ্যুত হইতে হইবে না। এই রূপ মনোমত বিবাহ করিতে পান না বলিয়া অনেকে হিন্দুদিগকে গালি দিয়া যান—অসভ্য বলিয়া বোধ করেন, তখন সকলের নিকট হিন্দু সভ্য হইবেন!

কিন্তু একটি কথা আছে। কতকগুলি বিবাহ-নিয়ম আছে, সেই গুলিকে মনু শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়াছেন, কতকগুলিকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহাদের মর্য্যাদাও স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বিবাহের পরস্পর যেরূপ মর্য্যাদা নিরূপিত আছে, বর্ত্তমান কালে তাহার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সেই মর্য্যাদাভেদ চিরকাল থাকিবে। তাহা হিন্দুগণ প্রাণান্তেও ভুলিতে পারিবে না। তাহা হিমাচলের অঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, সমুদায় ভারত-সমুদ্রের জলেও তাহা ধৌত হইবে না।"

৩। প্রমোদ কামিনী কাব্য।

শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

গোল্ডস্মিথ প্রণীত "হর্মিট" নামক গীতিকাব্য অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, গোল্ডস্মিথের ঐ কাব্যও প্রাচীনতর গীতিকাব্যের অনুসারী। অতএব এখানি নকলের নকল। বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিকাংশ এই রূপ হইতেছে।

"নকল" শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। স্বয়ং সেক্ষপীয়রও অনেক সময়ে, নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব্ব নাটক সকল রচনা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।

আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা বলিতেছি না। ইহা গোল্ডস্মিথের কাব্য হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট—কিন্তু মন্দও নহে। গোল্ডস্মিথের কাব্য ও এই কাব্য

এক বিষয় লইয়া রচিত হইলেও, এত মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। হর্মিটের সরলতা ও মাধুর্য্য প্রমোদকামিনী কাব্যে নাই। ইহা অধিকতর জটিল, এ প্রেম তত পরিশুদ্ধ নহে, এবং অধিকতর পরিস্ফুট। সে অনির্ব্বচনীয় মাধুরি এবং কোমলতা দেখিলাম না। ইহাতে অনেক আবর্জ্জনা জমিয়াছে। কিন্তু কবির কবিত্বের অভাব নাই; এবং এক এক স্থানে মধুর বটে। গ্রন্থকার, নিতান্ত নকলনবিশও নহেন; অনেক স্থানে নূতন বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইঁহার কবিত্বের পরিচয় দিবার জন্য, একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

পরদিন বিধুমুখ উদিলে তপন,
—পরি পুরি পুরুষের সাজ,
খুঁজিব সে রসরাজ;
এপ্রতিজ্ঞা পুরাইতে করিল মনন।

কোকনদ-বিনিন্দিত চরণ-কমলে,
কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয়ে,
পোড়া লোক-লাজ ভয়ে
পরিল পাদুকা-যুগ বসিয়া বিরলে।

কাঁচলি উপরে বামা মুকুতার নরে,
ধরেছে অপূর্ব্ব বিভা,
পাইয়া রূপের নিভা,
নিশার শিশির যথা দিনকর করে!

জিনিয়া চম্পক-কলি অঙ্গুলি নিকরে,
হীরক অঙ্গুরী ধরি,
পরিল যতন করি,
দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন অমল অম্বরে!

মস্তকে পরিল তাজ মুনি-মনোহর;
মনের মতন করে
সাজাইয়া অম্বরে,
চলিল মাধবীলতা যথা তরুবর

মনোগতি ছুটে অশ্ব তুলিছে কামিনী;
যথা সরোবর কোলে,
মৃদু মলয় হিল্লোলে,
দোলে রে সুখের দোলে নবীনা নলিনী!

মধুকণা ঘর্ম্মবারি বদনকমলে,
সেজেছে কি চমৎকার,
যেন সুধার আধার,
তারা বেড়া চাঁদ মরি উদিত ভূতলে।

৪। হিতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। অর্থাৎ হিতোপদেশপূর্ণ বাঙ্গালায় পদ্যগ্রন্থ। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র।

এ গ্রন্থখানিও বালক শিক্ষার্থ। অতএব ইহা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। বিশেষ গ্রন্থকার সমালোচনাকারীর নিকট যেরূপ কাতরোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে সুতরাং ক্ষান্ত হইতে হইতেছে। আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

এই যে নিষাদ দেহের মৃগ-অন্বেষণে
ধাইতে কানন-মাঝে; তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র
পূর্ণ-তূনী পৃষ্ঠদেশে—সাক্ষাৎ সমন
সম। পরিহরি বৃক শার্দ্দূল বারণ
মৃগেন্দ্র ভীষণ-মূর্ত্তি, বিকট বরাহ
প্রচণ্ড মহিষ আদি বৃহজ্জন্তুগণ,
শাণিত সায়কে শুধু করিলে শিকার
বিড়াল বঞ্চক আদি ক্ষুদ্র পশুচয়

হয় কি পৌরুষ তার? ইথে কি কখন
হয় স্বার্থকতা তার ভীষণ শরের?
তেমন পুস্তক দোষ-গুণ-বিচারীর
হয় কি উচিত কভু? যাপিতে সময়
কঠিন সমালোচনে নব লেখকের
কার্য্য, যাহার শকতি নহে পরিণত।
যদি হও বহুদর্শী, বিচার তাদের
কাব্য সবিশেষ—খ্যাতাপন্ন কবি যাঁরা
দেশের ভিতর, যাঁদের কবিত্ব যশঃ
স্বদেশে বিদেশে।

পাঠক হয় ত, শেষাংশ পড়িয়া ভাবিবেন, যে এরূপ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করার অপেক্ষা "কঠিন সমালোচনা" আর কিছু হইতে পারে না, এবং "বিড়াল বঞ্চক আদি" শিকারের জন্য, ইহার অপেক্ষা ভীষণ শরের প্রয়োজন করে না। আমাদিগের সে অভিপ্রায় নহে, তাহাহইলে আরও তুলিতাম।

৫। THE MUSIC and Musical Notation of various countries. By Loke Nath Ghose Calcutta, J. N. Ghose and Biswas.

এখানি নানা দেশীয় স্বরলিপি বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার, সংগীত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নহেন, এবং তাঁহার সংগ্রহও বিস্তর, তবে আড়ম্বর অতি ভয়ানক। এ গ্রন্থ, "To his Excellency the Right Hon'le Thomas George Baring, Baron Northbrook of Stratton, G. M. S. I, Viceroy and Governor General of India," কে, উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় কেবল একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ জন্য, Dr. Burney, Sir John Hawkins, Sir William Ouseley, Sir William Jones, Captain Willard, G. F. Graham Esq, Arthur Whitten Esq, W. C. Stafford Esq, Councillor Tilesius, M. Villoteau, এই সকল ব্যক্তির নাম নীত হইয়াছে, এবং গ্রন্থে আফ্রিকা, আমেরিকা, আরব, আরমাণি, আসিয়ায়, ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, দামাস্ক, মিশর, ফলাশা, গ্রীস, ইহুদা, ইস্কাপিক, জাপান, কামস্কাট্‌কা, লুচু, মলয়, নবজীলণ্ড, পারস্য, সিম্পরপল, সণ্ডিচদ্বীপ, তিব্বত, যেজিদি, এই সকল দেশের স্বরলিপি পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বর্ষণ যত হউক না হউক, গর্জ্জন এ গ্রন্থের বিশিষ্টরূপে উদ্দেশ্য, ইহা দেখা যাইতেছে। বোধ হয় সেই জন্যই ইহা ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ লেখক, ইংরেজি লিখিতে জানেন না। এরূপ কদর্য্য ইংরেজির সঙ্গে লর্ড নর্থব্রুকের নাম গাঁথিয়া না দিলেই ভাল হইত। "বাবু ইংরেজির" উপর এত গালি বর্ষণ এই সকল লেখকের দোষে।

৬। জীবন মরীচিকা। অর্থাৎ সসংারে সুখসাধনার্থ লোকেরা যে সকল চেষ্টা করেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে তৎসমুদায় যে অকর্ম্মণ্য হয়, ইহাই প্রতীয়মান করণোপযোগী কতিপয় বিবরণ মিরাজ অব লাইফ নামক ইংরেজি গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক অনু-

বাদিত। কলিকাতা। হিতৈষী যন্ত্র। ১২৭৬।

যাহারা অনুবাদ করেন, তাঁহারা যশের অল্পই আকাঙ্ক্ষা রাখেন। অনুবাদ ভাল হইলে প্রশংসার ভাগ মূলগ্রন্থকার পাইয়া থাকেন, অনুবাদ মন্দ হইলে, নিন্দার ভাগ অনুবাদকের। এই গ্রন্থে আমরা নিন্দার কিছুই পাইলাম না, ইহা বিশেষ প্রশংসা বলিতে হইবে। ফলতঃ গৌরনারায়ণ বাবু কেবল অনুবাদ করেন নাই, ক্বচিৎ স্বকপোলকল্পিত ভাবগর্ভ কাব্য বাক্যও বিন্যস্ত করিয়াছেন। গৌরনারায়ণ বাবু সুশিক্ষিত এবং বিদ্বান্—তিনি যে এরূপ সামান্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

৭। গীতহার। অর্থাৎ নানাবিষয়ক শুদ্ধ সংগীত। শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা বেঙ্গল সুপিরিয়র যন্ত্র। ১৮৭৪

বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ ও রুচিকর গানের অভাব; কেন না অধিকাংশই বাঙ্গালা গীত আদিরসঘটিত; এই অভাব দূরীকরণার্থ গঙ্গাধর বাবু কতকগুলি গীত রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। উদ্দেশ্যটি প্রশংসনীয়, কিন্তু গঙ্গাধর বাবু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গীতগুলিতে কবিত্ব না থাকিলে তাহা সাধারণে চলিত হইবে না। এ গীতগুলি বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু কবিত্বশূন্য। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা, অথবা সর্ জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের আক্রমণ হইতে উচ্চ শিক্ষা রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধে গীত কিরূপ মুগ্ধকর হইবার সম্ভাবনা, তাহা পাঠক এক প্রকার অনুমান করিতে পারেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তি সকলেই পারেন—কিন্তু গঙ্গাধর বাবু সে দরের কবি নহেন। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় গীত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

দেশের হিতসাধনে হও আগুয়ান,
ধনবান বিদ্বান বল বুদ্ধিমান——(সবে)
কর এমন উপায়, যাহাতে উচ্চ শিক্ষায়,
সুলভে বঙ্গবাসীরে লভিতে পারে ॥
সভ্য ইউরোপে আর আমেরিকায়,
দলে বলে সত্বরে চলহে তথায়——
বিবিধ শিল্প সন্ধান, যন্ত্র কলাদি নির্ম্মাণ,
শিখে আসি কর দূর, নিজ অভাবেরে ॥
(ডাক্তার)
সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভায়,
সাহায্য প্রদান সবে করহে ত্বরায়——
ধনী মানী জ্ঞানী ধীর, স্বাধীন সাহসী বীর,
অচিরে হইবে সবে বিজ্ঞানেরি জোরে ॥

৮। পদ্যমুকুল। প্রথমভাগ। শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তিবিরচিত। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস।

এই গ্রন্থখানি বালিকাদিগের পাঠার্থ প্রণীত। কোন বালিকায় পড়ে পড়ুক। গ্রন্থের বিশেষ কোন গুণ নাই।

৯। নব মালিকা। বিবিধ বিষয়িণী পদ্যমালা। শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক (প্রণীত?)। কলিকাতা।

এ রূপ কবিতা সম্বন্ধে অধিক কিছু

বলিবার নাই। স্থানেং সুকবিত্ব আছে। উদাহরণে পাঠক বুঝিবেন। এ অংশ কিছু ভাল বলিয়াই, আমরা এত ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি।

ওই দেখ; দেখ, দেখ, জন্মিল কুমার;
আনন্দে পূরিল পুর! জুড়ালো সংসার!
উঠিল উৎসবধ্বনি, বাদ্য-গণ্ডগোল!
মঙ্গল-শংখের শব্দে বাড়িল কল্লোল!

স্নেহ-নীরে ঢল ঢল জনক-নয়ন!
সহ উপজিল আশা, সংসার-বন্ধন!
অমৃত-লহরীসম শিশুর ক্রন্দন।
শ্রবণে প্রবেশি মূর্চ্ছা করে রে হরণ!

ভুলিল প্রসবব্যথা! উপজিল বল!
স্নিগ্ধ হলো রক্ত আঁখি পেয়ে হর্ষজল!
উৎসুক হইয়া মাতা ভাবে মনে মন,
কতক্ষণে স্তন দিয়া জুড়াই জীবন!

আগন্তুক, প্রতিবাসী, আত্মীয়, স্বজন,
সকলে প্রফুল্ল! হেরি জুড়ায় জীবন;
ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট হয়; হৃদয় মোহিত,
অনন্দে ডুবিয়া রই; শরীর সুখিত।

কিসলয়সম শিশু বাড়ে দিন দিন!
জনক-জননী আশা-ক্রমশঃ প্রবীণ!
হাত পা নাড়িয়া জাদু খেলে নিজ মনে!
বিস্তারে বংশের গর্ব্ব অঙ্গের ক্ষেপণে!
কাঁচা মুখে কাঁচা হাসি কাড়ি লয় মন!
জলজ-অন্তরে-শোভে আরক্ত বরণ!
রাঙ্গা ঠোঁটে ভাঙ্গা কথা কত সুধা ধরে!
বুঝি না কি বলে বীণা, তবু প্রাণ হরে!
জুড়িয়া মায়ের কোলে বেঁচে থাক ধন!
জনক জননী আশা করো রে পূরণ।

ও কি হলো! ফের, ফের, কর দরশন!
"কি হলো, কি হলো হায়!" উঠিলক্রন্দন!
হায় রে নিষ্ঠুর কাল! এ কি ব্যবহার!
অভাগীর আশা-বন্ধ করিলি সংহার!
হরেছ প্রাণের পতি; ভেঙ্গেছ তরণী;
ফলক ধরিয়া তবু ভেসেছিল ধনী।
সেটুকু লইলি কাড়ি, পাষাণ-সমান!
ডুবিল; ডুবিল ওই; হারালো পরাণ!
আহা; তার আর্ত্তনাদে পূরিল হৃদয়!
অপার সংসার-জল! নারী বৈ ত নয়!

এ কি রে তামাসা তোর! একি খেলা খেল!
দেখ আঁখি মেলি কাল! ভয়ে মারা গেল!
কেন দিলি দেখাইলি, সুখের পুতলি?
কেন বা লইলি তার চক্ষে দিয়া ধূলি?
হাহাকার রবে রামা ধরণী লুঠায়!

আজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরি বুক ফাটি যায়!
এটি তার; ওটি তার; এখানে বসিত;
হেথায় খেলিত; ভাল এটি গো বাসিত।
এতক্ষণে ঘরে আসি বসিত দুয়ারে;
সুধারবে মা! মা! বলে ডাকিত আমারে।

মুছায়ে গায়ের ধূলি, করিয়া চুম্বন,
কালি যে দিয়াছি তারে স্তনা এতক্ষণ!
সেই ত রহেছে সব বসন ভূষণ;
কেন নাহি হেরি মোর জীবনের ধন!
বাছার সামগ্রী তোরা বুকজুড়ান ধন;
আজি কেন মনস্তাপ কর উৎপাদন।
সেই ত আইল রবি, আলো ত্রিসংসার;
মোর শয্যা ঘেরি কেন হলো অন্ধকার;
উঠ রে সোণার জাদু! হলো কত বেলা;
এসেছে ওদের ছেলে; যাও কর খেলা।

সেই ত এসেছে সন্ধ্যা, অন্ধকার তায়;
মা বলি ডাকিয়া কেন ঝুলনা গলায়?
কি দোষ হয়েছে জাদু? কি কষ্ট পেয়েছ?
কেন রে এখনো মোরে ভুলিয়া রহেছ?

এস না আমার বাছা; আমায় বল না;
ধন প্রাণ দিয়া তোর পূরাই বাসনা।
সত্য কি ত্যজিলি মোরে? ওরে দাগাদার!
বলিয়া ডুকুরে উঠে? করে হাহাকার!

মনে হলো গর্ভাবস্থা, প্রসব-যাতনা!
সত্য হতে কল্পনায় দ্বিগুণ তাড়না!
অজ্ঞান-তন্দ্রায় রহে অভিভূত-প্রায়;
শব্দমাত্রে "বাছা এলি" বলি উঠি চায়।

মোহবশে হেরিবারে তুলিয়া নয়ন,
চারিদিক্ শূন্য হেরি নামায় বদন!
জলে, স্থলে, শূন্যে, প্রাণী, অপ্রাণী, স্থাবরে
যেদিকে ফিরায় চক্ষু, ভাসে আঁখি-নীরে!

শয়নে, ভ্রমণে, নিদ্রা-আহার-ব্যবহারে,
আলাপে, আমোদ আর মন নাহি সরে!
ফুরালো সংসারসুখ! মিছে আর বাস
সংসারে! হয়েছে তার জীবিতবিনাশ!

সহজে অশক্ত নারী; তাহে শোক-ক্ষীণ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুনঃ হলো আঁখি হীন;
সাহস হারালো; বুক ভাঙ্গিল এখন;
সংসারগহনে কিসে করে বিচরণ!
চারিদিক্ অন্ধকার; না চলে চরণ।
অণুমাত্র রশ্মি ছিল্ করিলি হরণ!
বৈশাখে পাতাকা যেন কম্পিত-শরীর!
নিরন্তর হাহাকার! সতত অধীর!
আর না দেখিতে পারি; বাহিরায় প্রাণ,
কে পারে বারিতে কাল! তুমি বলবান্?

১০। বিলাপতরঙ্গ। অর্থাৎ মাতৃবিয়োগ বিধুর কতিপয় সন্তানের আক্ষেপ। শ্রীমহিমাচন্দ্র বসু প্রকাশিত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র।

এরূপ বিষয় লইয়া, যিনি অপকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারেন তিনি অসাধারণ মনুষ্য সন্দেহ নাই। এই কাব্যের লেখক, বা লেখকেরা অসাধারণ মনুষ্য নহেন, এজন্য ইহাঁতে নিতান্ত অপকৃষ্ট কিছু নাই। বিশেষ ভালও কিছু নাই। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র। ইহার অধিকাংশই চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

১১। শ্রীমন্মহীধরকৃত বেদদীপ নামা সহিতা উদাত্তাদি স্বরচিহ্ন সমন্বিতা শ্রীশুক্লযজুর্ব্বেদঃ বাজসনেয়ি সংহিতা মাধ্যন্দিনী শাখা। কাশ্যধীতবেদাদি শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমিণা সংটিপ্য সংশোধ্য চ প্রকাশ্যতে। কলিকাতা, সত্যযন্ত্র।

আমরা দেখিলাম, মূল ও ভাষ্য ব্যতীত একটি বাঙ্গালা অনুবাদও ইহার সঙ্গে আছে। এবং তৎপূর্ব্বে একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখিত হইয়াছে। সামশ্রমি মহাশয় বিখ্যাত পণ্ডিত। অতএব যজুর্ব্বেদ প্রকাশের তিনি উপযুক্ত। তাঁহার লিখিত বেদের পরিচয় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, বেদ ব্যাখ্যাকারী সাহেবদিগেরপাণ্ডিত্যের সঙ্গে ইহার কত প্রভেদ।

"বেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভক্ত। পদ্যময় রচনাবলি সংগৃহীত হইয়া ঋক্ নামে, গদ্যময় রচনা-

বলি সঙ্গৃহীত হইয়া যজু নামে, গীতিময় রচনাবলি সঙ্গৃহীত হইয়া সাম নামে প্রসিদ্ধ হয়; এইরূপ রচনানুসারে বেদবিভাগ হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্তই ত্রিবিধ রচনা-বিমিশ্র থাকায় ত্রয়ী নামে ব্যবহৃত হইত। সেই অবস্থাতেই ঐ ত্রয়ী বেদহইতে অঙ্গিরোবংশাবতংস মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিক প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করিয়া তাহাই অধ্যাপন, যজনাদি দ্বারা সুপ্রচলিত করত স্বীয় নামে প্রথিত করেন। সুতরাং ত্রয়ী বেদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথর্ব্ব নামে অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছে, অপর বৃহৎ অংশটি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচনানুসারে ভাগত্রয়ে বিভাগীকৃত হইয়া অবধি বেদ চতুরংশ ইহা সার্ব্বজনীন হইয়াছে।

এই স্থলে ইহাও বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, ঐ ত্রয়ীর আদিবিভক্ত অংশদ্বয়ের কার্য্যতঃ দুইটি সম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছে, যখন ঐ অথর্ব্ব নামক ক্ষুদ্রাংশের অনুসারে কোন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই ত্রিভাগীকৃত বৃহৎ অংশের কোনরূপ অপেক্ষা থাকে না—এইরূপ যখন এই বৃহদংশীয় কোন যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় তখন ঐ ক্ষুদ্রাংশ অথর্ব্বের কোন আবশ্যকই থাকে না। পরং বৃহদংশের তিন অংশই পরস্পর-সাপেক্ষ, বৃহদংশের অনুসারে কোন একটি যজ্ঞ আরব্ধ করিলে তাহাতে ঋগ্বেদের, যজুর্ব্বেদের ও সামবেদের এই বেদাংশত্রয়েরই আবশ্যক হয় অর্থাৎ যেমন কেবল অথর্ব্ব বেদ লইয়া অথর্ব্ববেদীয় যাগানুষ্ঠান হইতে পারে, তদ্রূপ কেবল ঋগ্বেদ মাত্রে বা কেবল যজু অথবা সামবেদমাত্রে কোন যাগই সম্পন্ন হইতে পারে না, উহারা সম্পূর্ণই পরস্পরাপেক্ষ —একটি অশ্বমেধ ক্রতু আরম্ভ করিলে উহাতে গদ্য, পদ্য, গীতি ত্রিবিধ মন্ত্রেরই অপেক্ষা হইয়া থাকে। পরং ঐ তিন প্রকারের সমস্ত মন্ত্র ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের একত্র দুর্লভ। সুতরাং ঐ ভাগত্রয়েরই উপযোগিতা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে ঐ যজ্ঞের উপযোগী কোন মন্ত্রই অথর্ব্ব নামক ক্ষুদ্রাংশে না থাকায় তাহার কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হয় না—এইরূপ অথর্ব্ব বেদীয় শ্যেনাদি যাগের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গদ্য, পদ্য, গীতিময় মন্ত্রগুলি একত্র অথর্ব্ব বেদেই সংগৃহীত থাকা প্রযুক্ত ঐ অনুষ্ঠানে ঐ ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না—অথর্ব্ব বেদের সহিত এই বেদত্রয়ের সর্ব্বথা অসম্বন্ধ ভাবের ইহাই একমাত্র নিদান।।”

এই গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই গৃহে থাকা কর্ত্তব্য। দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দশ টাকা।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

ব্যবসায় বিভাগ।

অনেকের মুখেই শুনাযায় যে ব্রাহ্মণগণ নিতাস্ত স্বার্থপর ছিলেন, নিজের স্বত্ব বিলক্ষণ বুঝিতেন, অন্যজাতির প্রতি সমদুঃখ সুখী ছিলেন না। প্রিয়দর্শন পাঠক, তুমি কি বিবেচনা কর ইহারা নিস্পৃহ ছিলেন না, ইহাঁদিগের সহানুভূতি ছিলনা? আমি বিবেচনা করি আর্য্যজাতির ব্যবসায় শ্রেণীগত বৃত্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথার ইতর বিশেষ দেখিয়াই তোমার সে ভ্রম জন্মিয়াছে। তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রেণীগত বৃত্তিবিভাগ ও বৈবাহিক প্রথা আমূল পর্য্যালোচনা কর তোমার সে ভ্রম অনেকাংশে দূর হইবার সম্ভাবনা। সংপ্রতি তোমার ভ্রমপ্রমাদ নিরাস জন্যই আর্য্যজাতির শ্রেণীগত বৃত্তি (ব্যবসায় বিভাগ) ও বিবাহ লিখিত হইল।

ব্রাহ্মণেরা ষট্‌কর্ম্মশালীছিলেন। এই ছয়টির নাম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ছয়টী বৃত্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ। অনাপত্‌ কালে এতদ্ব্যতীত বৃত্তিদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে দ্বিজবরেরা পতিত হইতেন। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য লোপ পাইত। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন। দেখ দেখি ইহাঁরা কি নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন? আপত্‌কাল ব্যতিরিক্তস্থলে ইহারা ক্ষত্রিয় বৃত্তিও অবলম্বনে সমর্থ ছিলেন না। মনু (৮৯ শ্লো অ ৩য়)

ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপ্রতিপালন, দান, যজ্ঞ, ও অধ্যয়ন এই চারিটী বৃত্তির অনুসরণ পুরঃসর আত্মজীবিকা নির্ব্বাহে অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ অবিরত বিষয়বাসনায় প্রতিবিদ্ধ হইলেন। রাজন্যগণ স্পৃহাপরিশূন্য হইয়া নিরন্তর বিষয়বাসনাতে কালাতিপাত করিলেও শাস্ত্রানুসারে পতিত বা অশ্রদ্ধেয় হইবেন না, শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে তাঁহারা এককালে যাবদীয় সাংসারিক সুখ ভোগের অধিকারী থাকিলেন। ব্রাহ্মণগণ যদি নিতান্ত স্বার্থপর হইতেন তাহা হইলে কি ইহাঁরা এ অধিকারটী আপনাদিগের আয়ত্ত ও নিজস্ব করিতে পারিতেন না? মনু (শ্লো ৯০ অ ৩য়)

বৈশ্যজাতির প্রতি পশুরক্ষার ভার, দান, কৃষি, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য ও কুসীদ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের আদেশ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পশুরক্ষা, বাণিজ্য অথবা কুসীদ ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে হেয় এবং সমাজবহিষ্কৃত হইতেন। বাণিজ্য লাভকর কার্য্য, স্বার্থপর ব্যক্তিরা কি লাভের বস্তুটীকে স্বকীয় বৃত্তিমধ্যে রাখিতে যোগ্য

হইতেন না। অন্যের বৃত্তি বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন কেন? মনু (শ্লো ৯১ অ ৩য়)

শূদ্রগণ অসূয়াপরিশূন্য হইয়া দ্বিজাতি দিগের সেবা শুশ্রূষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন ইহাই তাঁহাদিগের বৃত্তি। মনু (শ্লো ৯২ অ ৩য়)

ভবিষ্য পুরাণে অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে যে অষ্টাদশ পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রগণের বিশেষ অধিকার থাকিল। অগ্রে বিদ্যা না হইলে পুরাণাদি পাঠ ও বিচারে কি প্রকারে ক্ষমতা জন্মিতে পারে? ব্রাহ্মণগণ অনেক সময়ে শূদ্রের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়াছেন; তৎসমস্ত শূদ্রকৃত্য বিচারস্থলে নির্দ্দেশ করা যাইবে। অদ্য শূদ্রের পুরাণাদি শাস্ত্রে অধিকার দেখান গেল। শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনেও প্রতিষিদ্ধ নন। (১)

দ্বিজগণের বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার থাকায় তাহারা অনায়াসে ব্রহ্ম নির্ণয়ে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। অধ্যাপনার ভার কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই বর্ত্তিল। এখানে দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি আত্মনিগ্রহ ও তপস্যাদি দ্বারা ব্রহ্মনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন কালক্রমে তিনিও ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুল হইতে, প্রসকণ্ব বৈশ্য বংশ হইতে, শূদ্রক শূদ্রজাতি হইতে এবং যবন ঋষি ম্লেচ্ছ গোষ্ঠী হইতে প্রথমে ঋষি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন তৎপরে ব্রাহ্মণ্য অধিকার করিয়া বিপ্রগণ মধ্যে পরিগণিত হন।

প্রিয়দর্শন পাঠক ও লীলাবতি, সদাচার সৎক্রিয়ান্বিত, আত্মমনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বড় ইতর বিশেষ দেখিতে পাইবে না।(২)

দ্বিজাতিত্ব।

আর্য্য সন্তানগণ জন্মমাত্রেই দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হন না। প্রসূতির গর্ভে জন্মযোগ্য কালে তাঁহাদিগের গর্ভাধান ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে জাতকরণ হইয়া থাকে। অন্নপ্রাশন ক্রিয়ার সঙ্গে অথবা কুলাচার অনুযায়ী অন্নাশনের পূর্ব্বেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে নামকরণ সমাধা হয়। তৎপরে চূড়াকরণ। এটি স্থল বিশেষে উপনয়নের পূর্ব্বে স্থল বিশেষে সমকালেও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) চতুর্ণামপি বর্ণানাং যানি প্রোক্তানি বেধসা।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি রাজেন্দ্র শৃণু তানি নৃপোত্তম॥
বিশেষতস্তু শূদ্রাণাং পাবনানি মনীষিভিঃ।
অষ্টাদশ পুরাণানি চরিতং রাঘবস্যচ॥
রামস্য কুরুশার্দ্দূল ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে।
তথোক্তং ভারতং বীর পারাশর্য্যেন ধীমতা।
বেদার্থং সকলং যানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণিচ প্রভো।
ভবিষ্যপুরাণীয় বচন(শূদ্রকৃত্য বিচারণাতত্ত্ব)

(২) শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণোভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎপ্রত্যবরো ভবেৎ।
পরাশর বচন।

কেবল উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজপদ প্রাপ্ত হন না। উপনয়নের পূর্ব্বে গর্ভাধানাদি পঞ্চ মহা সংস্কার যথা বিধানে ও যথাকালে সমাহিত না হইলে দ্বিজাতি পদের অযোগ্য হন। উপনীত হইলেই ইহাদিগকে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রত, হোম, উপবাস এবং অন্যান্য মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি যোগ্য করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ শব্দের যোগ্য হন। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। মনু (শ্লো ২৭।২৮ অধ্যায় ২)

উপনীত হইলেই ইহাদিগের দ্বিভোজন রহিত হয়। যাবৎকাল ব্রহ্মচর্য্যে থাকেন তাবৎকাল ইহাঁদিগকে একাহারে থাকিতে হয়। সমাবর্ত্তনবিধি সমাপ্তির পর রাত্রিকালে আহার করিতে নিষিদ্ধ নন বটে, কিন্তু কোন ব্রত নিয়মের অধীন হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইতে হইলে ইহাঁদিগকে পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয় ও একাহারী থাকা বিধি। ক্রিয়া সমাপ্তির প্রাক্কালে আর জলগ্রহণেও অধিকারী নন। শূদ্রাদি এরূপ কঠোর ব্রতে কয় দিন সুস্থ মনে দিনযাপন করিতে সমর্থ হন! নিস্পৃহতা কাহার নাম জান? বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগের নাম নিস্পৃহতা।

কেহ কেহ বলেন কেবল শূদ্রজাতির প্রতিই ব্রাহ্মণগণের দৌরাত্ম্য ছিল। লেখক সে কথা কহে না। লেখক বলে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং স্ত্রীজাতি ইহাদিগের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মনির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন তাঁহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী স্থির করিয়াছেন। জড়, মূক, বধির, স্ত্রী ও শূদ্র ইহাদিগকে বেদে অনধিকারী করিবার তাৎপর্য্য কি বিচার করিয়া দেখ ঋষিগণকে স্বার্থপর বলিয়া বোধ হইবে না। (মনু শ্লোক ৫২ অ ২)

ভোজ্য দ্রব্য।

শূদ্রাদি জাতিরা যত্র তত্র বাস করিতে পারে। তাহারা অপেয় পান অখাদ্য ভোজন করিলেও এককালে শূদ্রত্ব পরিভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অপেয়পান ও অভোজ্য ভোজন করিলেই পতিত ও ব্রাহ্মণ্য হইতে রহিত হন। ইহাদিগের পরিশুদ্ধ ভোজ্য দ্রব্য মধ্যে অতি অল্প সামগ্রী দেখা যায়। যথা

প্রথম কল্প—যব, তিল, তণ্ডুল, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, হরিদ্রা, দধি।

দ্বিতীয় কল্প বা অপকর্ষ—গুড়, দাড়িম, বিল্বফল, আম্র, পনস, কদলী।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মকর্ম্ম যিনি দেখিয়াছেন তিনি এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য শ্রাদ্ধপাত্রে অথবা পূজার দ্রব্য মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না।

যাঁহারা আমিষভোজনের যোগ্য অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের বা দেবযজ্ঞের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে মৎস্য মাংস ভোজন করান যাইতে পারে। শশক, শল্লকী, গোধা, কূর্ম্ম, গণ্ডার, ছাগ, মেষ ও হরিণ। অধুনা সভ্য লোকদিগের মধ্যে

গোধিকা ভোজন দেখা যায় না। ইতর লোকের মধ্যে গোধিকা ভক্ষণ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণের ফুল্লরা ও কালকেতুর মাংস বিক্রয় দেখ।

মৎস্যের মধ্যে পাঠীন, রোহিত, মদ্গুরাদি কয়েকটী পবিত্র। অন্য গুলির মধ্যে একবিধ দুইটীর এক এক জাতি পরিত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। খাদ্য বিচারে সমুদায় বিবৃত হইবে।

দুগ্ধ নানাপ্রকার তন্মধ্যে ছাগ, মেষ, মহিষ ও গোদুগ্ধ দুগ্ধমধ্যে গণ্য। গাভী দুগ্ধই পবিত্র। অন্যগুলি তত পবিত্র নহে।

মর্য্যাদা।

আর্য্যেরা শূদ্রদিগকেও কার্য্যবিশেষে ও সময় অনুসারে মর্য্যাদার সহিত স্থান দান করিতেন। শূদ্রব্যক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলেই বৃদ্ধ বলিয়া সভায় সম্মান পাইত। ইহাদিগের বিধান সংহিতায় অস্ত্রধারী ব্যক্তি, দশমীদশাগ্রস্ত জন, রুগ্নশরীরী ভারবাহী ক্লান্তজন, স্ত্রীজাতি, স্নাতকব্রাহ্মণ, রাজা এবং বিবাহ সময়ে বর সম্মানের যোগ্য। এসকল ব্যক্তি কাল বিশেষে স্থলবিশেষে অগ্রগামী অথবা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলে দোষী হন না বরং অনেক সময়ে সম্মান প্রাপ্তি বিষয়ে ইহাদিগকে অগ্রসর করিতে হয় এবং ইহাদিগের জন্য পথ পরিত্যাগ করিতে হয়।

এবং যে স্থলে ইহাদিগের সকলের সমাবেশ হয় তথায় স্নাতক দ্বিজবর ও রাজা সর্ব্বাগ্রে মান্য। রাজা ও স্নাতকের মধ্যে স্নাতক নৃপকেই অগ্রসর করা বিধেয়। কিন্তু অস্নাতক রাজা ও স্নাতক ব্রাহ্মণের মধ্যে স্নাতক অগ্রগণ্য। (৩)

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ।

পাঠক তুমি কহিতে পার যে ব্যক্তির বয়ঃক্রম অধিক সেই ব্যক্তিই মান্য। আর্য্যজাতিরা মান্য গণ্য ব্যক্তি বর্গকে সে প্রকারে গণনা করিতেন না। ইহারা সমবেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের-মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সংজ্ঞা দিতেন। ব্রাহ্মণগণ বয়ঃক্রমে কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি জ্ঞানাপন্ন হইতেন তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা তথাকার শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়গণ শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরাক্রান্ত হইলেই জ্যেষ্ঠ। বৈশ্যগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই জ্যেষ্ঠ। শূদ্রব্যক্তি জন্ম অনুসারে বৃদ্ধ হইলেই জ্যেষ্ঠ। কেবল বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন সভামধ্যে জ্যেষ্ঠ কিন্তু সমাজমধ্যে জাতি অনুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয় না। জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা অনেক পৃথক্ জানিতে হইবে।

---

(৩) পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি দশমীং গতঃ॥ ১৩৭
চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥ ১৩৮
তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতক পার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্॥ ১৩৯
(মনু ২য় অ)

কেবল বয়ঃক্রম অথবা পক্ক কেশ ও শরীরের ললিত ও পলিতাদি দ্বারা মান্য হয় না—জ্ঞান ধনের দ্বারা যিনি মান্য তিনিই জ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধের লক্ষণ তোমরা যাহা মনে কর তাহা নহে। (৪)

বিবাহ।

দ্বিজাতিরা বেদপাঠ সমাপ্তির পর গুরু অনুজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহ পুরঃসর গৃহস্থাশ্রমে বাসকরিতেন। নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি হইলেও ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষের অধিক কাল গুরুকুলে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত না। মধ্যবিধ রূপ বুদ্ধিমান্ হইলে অষ্টাদশ বর্ষ তদপেক্ষা বুদ্ধিমত্তর হইলে নববর্ষ পর্য্যন্ত থাকিতে হইত। কুশাগ্রবুদ্ধি হইলে বেদের মর্ম্মগ্রহ মাত্রেই তিনি গুরুগৃহহইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। তিনি তৎকালেই গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ ও সংসার আশ্রমের দ্বারস্বরূপ ভার্য্যাগ্রহণের অধিকারী হইতেন। মনু(শ্লো ১।২ অ ৩।)

প্রিয়দর্শন পাঠক, তুমি কহিবে বড় কঠোর নিয়ম ছিল, কালের গতি অনুসারে সংসারের স্রোত ফিরিয়াছে। ব্রাহ্মণের যেদিন উপনয়ন হয় সেই দিন হইতে তিনি সাবিত্রী গ্রহণে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অধুনা অনেক স্থলে দেখিবে ঐ দিনেই সমুদায় ব্রহ্মচর্য্য আদ্যন্ত সমাপ্ত হয়। কোথাও বা ত্রিরাত্রি মাত্র ব্রহ্মচর্য্য কোথাও বা একাদশাহ কাল ব্যাপিয়া ব্রহ্মচর্য্য। তৎকালমধ্যে যতদূর সম্ভবপর ততদূরই বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের সীমা। ঐ দিবসেই সমাবর্ত্তন বিধি সমাহিত হয়। সমাবর্ত্তনের পরেই বিবাহের যোগ্য, সুতরাং এক্ষণে বিপ্রগণ সাতবৎসরপরেই দারপরিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপত্র পান। পূর্ব্বকাল ও বর্ত্তমান কালের কি ইতর বিশেষ তাহা দেখ।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে দ্বিজগণ অসবর্ণা কন্যা গ্রহণে অধিকারী ছিলেন। তথাপি দ্বিজগণ সর্ব্বাগ্রে স্বজাতীয়া ও সুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার পাণিগ্রহণেই অধিকারী (মনু শ্লো ৪ অ ৩)

মাতামহ কুলে কুলগন্ধে যাহার সহিত সপ্তমপুরুষ অতিক্রান্ত হইয়াছে যে স্থলে কন্যা ও পাত্রের সঙ্গে উভয় কুলের গোত্রের বা প্রবরের ঐক্য না থাকে। পিতৃবন্ধু, মাতৃ বন্ধুদিগের সঙ্গে রক্ত সংস্রবে পঞ্চমপুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে সেইস্থলের সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যা পাণিগ্রহণ কার্য্যে প্রশস্ত। মনু(শ্লো ৫ অ৩)।

শাসন প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সাক্ষিবিষয়—মিথ্যা সাক্ষী ও দণ্ড।

আর্য্যজাতিরা কোন কোন স্থলে কোন

(৪) বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ১৫৫
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোহনূচানঃ স নো মহান্॥ ১৫৪
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈযুবা প্যধীয়ানস্তং দেবাঃস্থবিরো বিদুঃ॥ ১৫৬
(মনু ২য় অ)

কোন সাক্ষীকে স্বভাবতঃ বিধান সংহিতার নিয়মানুসারে মিথ্যা জ্ঞান করেন তাহা প্রদর্শন করা গেল। যথা

লোভহেতু যেব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি বন্ধুতার অনুরোধে সাক্ষ্যদিতে বাধ্য হয়। সাক্ষী দিয়া আমি যদি অমুকের এই এই কার্য্যটী সিদ্ধ করিয়াদিতে পারি তাহা হইলে আমার কামচরিতার্থ হইতে পারে—পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট কৃতাপরাধ আছে, এখন সময় পাইয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধমানসে ক্রোধহেতু যথায় সাক্ষ্য দেয়, অজ্ঞান বশতঃ যথায় সাক্ষ্যদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যেস্থলে বালকত্ব নিবন্ধন চাপল্য হেতু সাক্ষ্য দেয় তৎ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞান করা বিধেয়। (৫)

দণ্ডের পরিমাণ।

অর্থপ্রাপ্তির লালসা স্থলে ন্যূনকল্পে সহস্রতোলক পরিমিত রৌপ্যের দণ্ড হইত। মোহ হেতু প্রথম সাহস পরিমিত দণ্ড, ভয় হেতু মধ্যম সাহস, বন্ধুতা হেতু সাহস দণ্ডের চতুর্গুণ পরিমিত দণ্ড নির্দ্ধারিত ছিল। এই দণ্ডগুলি ঋণ দান ও ঋণ পরিশোধ বিষয়ে। অন্য স্থলে অন্য সাক্ষীর অন্য প্রকার দণ্ড জানিবে। কামহেতু সাহস দণ্ডের দশগুণ পরিমাণ দণ্ড হয়। ক্রোধহেতু সাহস দণ্ডের ত্রিগুণ, অজ্ঞান হেতু দুইশত মুদ্রা বালস্বভাব সুলভ অজ্ঞতা হেতু একশত মুদ্রা দণ্ড হয়। (৬)

জালকারীর দণ্ড।

আর্য্যজাতিরা জালকারী ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য মিথ্যা শপথ মিথ্যা ভাষণকে গুরুতর পাপ বলিয়া জানেন। জালকারী ও কূট সাক্ষীকে মনুষ্য সমাজের কণ্টক স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঋষিরা কূট সাক্ষীর কত নিন্দা করিয়াছেন! তাহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছেন। মহাপাতকীর যে দণ্ড সে দণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজা ইহাকে কারাগারে স্থানদানেও শঙ্কিত হইতেন। বিচারকেরাও ইহাকে অশ্রদ্ধা করিতে ক্রটি করেন নাই। এবং যেব্যক্তির পক্ষ হইয়া ইহারা পক্ষ সমর্থন করে তিনিও কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে তাহাকে কি আর কদাচ বিশ্বাস করেন? সে যখন রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় তদবধি তাহার আত্মীয় স্বজন ও পরিবারবর্গ তাহাকে আর সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়? সেই ব্যক্তিই কি আপনাকে আপনি ধিক্কার দেয় না? তাহার

(৫) লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধত্তথৈবচ।
অজ্ঞানাৎ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ।।১১৮
লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্ত মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসং।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণং ।।১২০

(৬) কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরং।
অজ্ঞানাদ্দ্বেশতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেবতু ।।১২১ মনু ৮ম অ

অন্তরাত্মা কি তাহাকে কোন দিন অনুতাপে দগ্ধ করেন না? অবশ্য করিতে পারেন। এইগুলি বিবেচনা করিয়া ঋষিগণ কূট সাক্ষীর দণ্ড—অতিভয়ানক করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে উচিত দণ্ডবিধান পূর্ব্বক স্বদেশবহিষ্কৃত করা হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবল নির্ব্বাসন দণ্ডছিল। দশবিধ পাপকর্ম্মের সাক্ষীর দশবিধ দণ্ড ছিল। উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, নাসা, কর্ণ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ ইহার যে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্রব হেতু যে বিষয়ে কূট সাক্ষ্য হইত, কূট কারীর (জালকারীর) সেই সেই অঙ্গের শাস্তি বিধান পূর্ব্বক নির্ব্বাসন প্রসিদ্ধ আছে। (৭)

(৭) এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্মনীষিভিঃ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারার্থ মধর্ম্ম নিয়মায়চ ॥১২২
কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাং স্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ ॥ ১২৩
দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
এষু বর্ণেষু যানি স্যু রক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥১২৪
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌপাদৌচ পঞ্চমং।
চক্ষুর্নাসাচ কর্ণৌচ ধনং দেহ স্তথৈবচ ॥
১২৫ মনু ৮ অ

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

জাতিভেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমাজ শাসন।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৮-১৭৪ এবং ৩০৭-৩১৩ পৃষ্ঠার পরে)

জাতিভেদ প্রথা রাজ্যশাসনের সহকারী। শাসনের আতিশয্যে শাসিত ব্যক্তি গণের তেজোহ্রাস হয় এইজন্য কোন২ ইউরোপীয় শাস্ত্রবেত্তা বলেন যে শাসন সংকীর্ণ করিয়া স্বানুবর্ত্তিতা বৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতে যে কিছু ক্ষতি হইবেক তাহা প্রকারান্তরে পরিত হইয়া যাইবেক। আর কেহ২ বলেন যে কালে লোকের বুদ্ধি ও আচরণের উন্নতি হইলে সমাজশাসন এবং রাজশাসনের সুপ্রণালী হইয়া লোকের স্বানুবর্ত্তিতা এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা উভয়েই সামঞ্জস্য হইবেক। ফলতঃ শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে কত চেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার অবধি নাই।

শাসন দুই প্রকার রাজশাসন এবং সমাজশাসন। আমরা ধর্ম্মশাসনকে সমাজশাসনের মধ্যে গণ্য করিলাম। ন্যায়ানুসারে বিশ্লেষ করিলে রাজকার্য্য- এক ব্যক্তি, সমগ্র সমাজ অথবা কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত বলিয়া গণ্য হই-বেক। তন্মধ্যে দৃষ্ট হইবেক যে যদি পদে২ রাজাকে কিম্বা রাজকর্ম্মচারীকে আসিয়া লোকের কুকর্ম্ম নিবারণ করিতে হয় তবে কোন মতেই রাজ্যরক্ষা হয় না। বস্তুতঃ রাজ্যশাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই লোকে আত্মরক্ষা অভ্যাস করিয়াছে এবং কখন বলপ্রয়োগ কখন ভয়প্রদর্শন কখন মিত্রতা কখন নিন্দা এবং কখন বা সংসর্গ পরিত্যাগ দ্বারা পরস্পরের অসদাচরণ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকের নিজে২ বলপ্রয়োগ করিতে হইলেই সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটে এইজন্য তাহার ভার রাজহস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। রাজশাসনের দ্বারা যাহা সুসিদ্ধ না হয় তাহা সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যে রাজ্য এক কিম্বা কতিপয় ব্যক্তির শাসনাধীন সেখানে অবশিষ্ট লোকের কর্ত্তৃত্ব স্বভাবতঃ স্বল্প হয় কিন্তু যদি রাজা অথবা রাজপদাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বাহুল্য রূপে ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন তবে সেখানে সমাজ, কার্য্যগতিকে শাসন ক্রিয়ার অনেক ভার গ্রহণ করেন। আমাদিগের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল তাহা পুরাবৃত্ত অভাবে স্থির করা যায় না কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে রাজগণ এখনও যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন বোধ হয় তাহা প্রাচীন প্রথার আদর্শ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণে সেই আদর্শেই যে জমীদারগণও প্রজাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক না হইতে পারে।

জাতিভেদ প্রথাতে রাজার একাধিপত্য নাই কারণ রাজা অন্যায় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে হিন্দুশাস্ত্রমতে রাজদ্রোহিতা নিষিদ্ধ নহে। তদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র মধ্যেও ক্ষমতার তারতম্য ছিল। একাকী ব্রাহ্মণেরাই যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন তাহাও নহে। মনে কর কোন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা সকলে এক বাক্যে কোন হীনবর্ণ কিম্বা কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির যাজন ক্রিয়া স্বীকার করিলেন তাহা হইলেই যে গ্রামস্থ অপরাপর লোক ব্রাহ্মণগণের অনুগামী হইবেক এ কথা বলা যায় না।

কিন্তু যত লোকের মধ্যেই কর্ত্তৃত্ব বিস্তৃত থাকুক তাঁহারা সকলে কখনই সমকক্ষ নহেন। রাজা কোন অন্যায় আজ্ঞা দিলে ব্রাহ্মণগণ প্রজাদিগকে তাহা প্রতিপালনে প্রতিষেধ করিতে পারেন না। রাজা সভাস্থ হইয়া অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এক এক জন রাজার অধিকারও অতি সামান্য ছিল এই জন্য তিনি একবারে আইনকারক জজ সৈন্যাধ্যক্ষ সমস্ত পদের ভারই গ্রহণ করিতেন। গ্রামে২ এখনকার ন্যায় বহুসংখ্যক রাজ-

কর্ম্মচারী থাকিত না। তদভাবে গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা রাজ্যশাসনের কোন২ কার্য্য করিতেন।

প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায় যে পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে লোকে কখন মকদ্দামা করিত না। এখনও প্রবল জমীদারদিগের অধিকারস্থ প্রজাগণ নায়েব এবং জমীদার ভিন্ন অন্যের নিকট নালিশ করিতে সাহসী হয় না। তদ্রূপ পূর্ব্বে প্রতি গ্রামের এক এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক সমস্ত প্রতিবাসীদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন। জাতিমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক অন্যায়কারী ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য দণ্ড করিতেন। লোকের জাতিপাত করিতেন। এখন সমস্তই গিয়াছে কেবল শেষোক্ত কার্য্য লইয়া পল্লীগ্রামে দলাদলি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাজশাসন নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহারা জাতিভেদ প্রণালীর ফল স্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা যে ঠিক সর্ব্বত্র শাস্ত্রীয় বিধান মতে কার্য্য করিতেন তাহা নহে। বিচারকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিতেন না। বল প্রয়োগের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহ করিতেন না। শূদ্রগণকে একান্ত দাসত্ব পদে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। মুসলমান আধিপত্য হইতে সে সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পূর্ব্ব প্রথা মতে কথঞ্চিৎরূপে সমাজ রক্ষা করিতেন। এখন আর সেরূপ নাই। নাই বলিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কিসে এই প্রথা গেল? অভিনিবেশ করিয়া দেখিলে প্রকাশ হইবে যে এখন রাজশাসন বৃদ্ধি হইয়াই সমাজশাসন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। গ্রামে২ পুলিস মধ্যে২ থানা তাহার উপরে ডেপুটি মেজেষ্টর এবং মুনসব প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়া রাজদণ্ড অতি সামান্য লোকের বাসস্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। রাজসাহায্য প্রাপ্ত হইলে লোকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট সামাজিক আধিপত্যে সন্তুষ্ট থাকিবে কেন? সামাজিক শাসনে জাতিভেদ নিয়মানুসারে ইতরজাতিগণের যে হীনতা ছিল রাজা তাহা গ্রাহ্য করেন না সুতরাং দুর্ব্বলের সহায় হইয়া ইতরলোকদিগকে ভদ্র মণ্ডলীর সমকক্ষ করিতেছেন।

কিন্তু এতদ্দেশে ধারাবহন প্রকৃতি লোকের মনে কি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে! এত বন্দোবস্তেতেও গ্রাম্য কর্ত্তাদিগের সমস্ত প্রাধান্য বিনষ্ট হয় নাই। এখনও জমিদারগণ অনেকানেক বিবাদ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। মফস্বলে পিনাল কোডের বিধান এখনও কেবল দুর্ব্বৃত্তের ভয় প্রদর্শক জুজু স্বরূপ হইয়া আছে। লোকে কার্য্য করিবার সময়ে পিতৃপৈতামহিক প্রথাই মান্য করে। চুরি করা বস্তু ক্রয় করিতে নাই একথা প্রায় কেহই মানে না—কিন্তু মূল্য দিলে দ্রব্য পরিশুদ্ধ হয় এসংস্কার বিলক্ষণ বদ্ধমূল রহিয়াছে।

সে যাহা হউক প্রাচীন ও অভিনব প্রথার মধ্যে ইতর বিশেষ কি?

অভিনব প্রথার মূল ইউরোপীয় সাধা-

রণতন্ত্র। সমস্ত লোকের সমকক্ষতা বৃদ্ধি করিবার জন্য শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইলে রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয় ইহাতে সামাজিক শাসনের এই লাঘব হইয়া থাকে যে সমাজ মধ্যে কেহ স্বতঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্যের প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করিতে পারেন না। সমস্ত লোক সমবেত হইয়া যাহাদিগকে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহজন্য নিয়োগ করে তাঁহারাই কর্ত্তৃত্ব করেন। সুতরাং বিশিষ্ট ব্যক্তি গণের ক্ষমতা হ্রস্ব হইয়া সমাজনিযোজিত কর্ম্মচারিগণের পদের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত কর্ম্মচারিনিয়োগ বিষয়ে সকলেরই অধিকার থাকাতে তৎকর্ত্তৃক কোন অত্যাচার হইলে সামান্য লোকেরাই সমবেত হইয়া তাহা নিবারণ করিতে পারে। বাস্তবিক যে থানে লোক সমূহ এমন বুদ্ধিমান্ ও তেজীয়ান্ হয় যে স্ব২ মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছামত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া লোকবল সংগ্রহ করিতে পারে সে থানে লোকের সমকক্ষতা স্বভাবতঃই বর্ত্তমান আছে, সাধারণতন্ত্র তাদৃশ লোকের প্রতিষ্ঠিত শাসন কার্য্যের প্রণালী মাত্র।

আমাদিগের দেশে জাতিভেদের ফল বলিয়াই হউক অথবা উহার হেতু স্বরূপই হউক লোকের সমকক্ষতা নাই। রাজা সাধারণতন্ত্রী বলিয়া স্বদেশের প্রথা এখানে প্রচলিত করিলেই যে লোক নূতন প্রণালীমতে কার্য্য করিতে পারিবে ইহা মহৎ ভ্রমের বিষয়। ভবিষ্যতে কি হইবেক তাহার বিচার করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী এবং দেশস্থ লোকের প্রকৃতির মধ্যে এখনও যে সামঞ্জস্য হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন। এদেশে এখন এক রাজার আধিপত্য নাই সমগ্র ইংরাজ সম্প্রদায় আধিপত্য করিতেছেন। নামে সকল প্রজাই রাজসন্নিধানে তুল্য। কিন্তু উহা বাক্য মাত্র। আমাদিগের সমকক্ষতা করিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধি না থাকিলে কেবল শাসন প্রণালীও রাজাজ্ঞাতে কি হয়? কিন্তু প্রণালীর গুণে কর্ম্মচারিগণের প্রাদুর্ভাব হইয়া দেশীয় লোকের মধ্যে ন্যূনাতিরেক প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কেননা জাতিভেদ মতে যে সকল সম্প্রদায়ে প্রাধান্য ছিল এখন তাহাদিগের স্থলে এক ইংরাজ জাতি উপবেশন করিয়াছেন। ইহাঁরা দেশীয় ধর্ম্মানুসারে ব্যক্তির হস্তে না দিয়া পদের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন সুতরাং সকল লোকেই পরস্পরে সমকক্ষ হইতেছে কিন্তু রাজ সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ পৃথক্ এবং দেশীয় ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজ মণ্ডলীর অধীন। দেশীয় লোক সমকক্ষ হইয়া পরস্পরে বৈরিতা করিতে বিলক্ষণ সক্ষম হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণ তন্ত্রের কোন লক্ষণ নাই। সকলেই সমান হইতেছেন কিন্তু সকলেই রাজসন্নিধানে বলহীন হইতেছেন। অতএব পূর্ব্বে সামাজিক শাসনে যাহারা

নিকৃষ্ট ছিল তাহারা তেজোলাভ করে নাই। তদূর্দ্ধস্থ সম্প্রদায়ে অত্যাচার দমন হইয়াছে কিন্তু তাহাদিগের নিজের আত্মসংযম বা অধীন শ্রেণীর তেজোবৃদ্ধি প্রযুক্ত এই ঘটনা হয় নাই। অপর এক সম্প্রদায়, রাজা ও সমাজ উভয়েরই শাসন একায়ত্ত করাতে এই রূপ ঘটনা হইয়াছে। এতাদৃশ প্রণালীতে অত্যাচার নিবারিত হইলে সভ্যতার বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবেক কিনা তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন।

যে তিন প্রকার শাসন প্রণালীর কথা বলা গিয়াছে তাহার প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবেক যে মনুষ্য মনুষ্যের উপর কয়েকটী বলের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। বাহুবল বুদ্ধিবল ধর্ম্মবল এবং এই তিনের ফল স্বরূপ অর্থবল ও বংশ মর্য্যাদা। তন্মধ্যে বাহুবল বিচারে নিকৃষ্ট কিন্তু কার্য্যে প্রধান, পণ্ডিতেরা বলেন যে কালে বুদ্ধি কিম্বা ধর্ম্মবলই প্রধান হইবেক। বাহুবল কথঞ্চিৎরূপে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত হইলে প্রথমতঃ বংশ মর্য্যাদা অনন্তর অর্থবলেরই প্রাদুর্ভাব হইয়াথাকে।

জাতিভেদ বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার প্রণালী বিশেষ। ব্রাহ্মণগণ, সর্ব্বোচ্চপদাভিষিক্ত বিদ্যা এবং ধর্ম্মালোচনাতে নিয়োজিত হওয়াতে তাঁহাদিগের গুণে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্যও রক্ষিত হইয়াছিল। বাহুবলের প্রাধান্যে অর্থবল স্বভাবতঃ হীন থাকিত কেবল ব্রাহ্মণপ্রসাদাৎ ধর্ম্মবুদ্ধিসহকারে বাহুবলের সাম্য হইয়া শূদ্র ও বৈশ্যবর্ণের কথঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইহাতেও তাহাদিগের নিজের কোন মাহাত্ম্য ছিল না; আপনাদিগের তেজ অভাবে কেবল ব্রাহ্মণ আশ্রয়েই ইহারা ধনশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু ধারাবহন প্রকৃতির বশতাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগের দুরবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা শূদ্র ও বৈশ্যের গুণসমূহে অবহেলা করাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগের হস্ত হইতে রাজপদ হৃত হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের পূর্ব্বোন্নতি বিলক্ষণ প্রভাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কারণ যে সকল বিদ্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একায়ত্ত ছিল তাহা সকলেরই অনায়ত্ত হইল। কিন্তু যদি বাহুবল সম্প্রদায় বিশেষের হস্তগত না হইয়া সকলের আয়ত্ত থাকিত এবং রাজভয়ে না হইয়া আত্মসংযমের দ্বারা সকলেই প্রথমতঃ অর্থ ক্রমশঃ ধর্ম্ম লাভ করিত তাহাহইলে ক্ষত্রিয় বিনাশেই দেশের তেজোনাশ এবং ব্রাহ্মণ বিনা দেশের বিদ্যালোপ হইত না এবং পূর্ব্বে যাহারা এই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহারা শূদ্রের শ্রমশীলতা অভাবে উহাদিগের তুল্য হইয়া পড়িতেন না। এখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েই স্ব২ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং ধর্ম্ম ও বাহুবলের অভাবে অর্থবলেরই প্রাদুর্ভাব। একবার অর্থবলের প্রাদুর্ভাব না হইয়া গেলে লোকে অর্থের অসারতা বুঝিয়া কখন ধর্ম্মে নিবিষ্ট

হইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতে এই কুলক্ষণ দৃষ্ট হইবেক যে লোকে বাহুবলের দোষ গুণ বুঝিতে পারে নাই। আত্মরক্ষার্থ বাহুবল প্রয়োজন কিন্তু তাহা এই প্রকারে সম্বরণ করিতে হইবেক যেন তুমি পরের হানি করিতে নিযুক্ত না হও। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতি বাহুবলের আস্বাদই জানিত না অতএব সম্বরণের দ্বারা তাহাদিগের ধর্ম্মলাভ কি প্রকারে হইবেক? এখন দূর্ব্বল শূদ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বাহুবলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থবলের প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে আত্মসংযম শিখিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ভীরুগণের স্বধর্ম্ম হইতে নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয় এবং ধনবৃদ্ধিতে তাহার সম্যক্ প্রতিকার হওয়া অসম্ভাবিত। আর যুদ্ধশিক্ষা না করিলে কখন সুচারু মতে লোকবল সংগৃহীত হইতে পারে না। কোম্‌ৎ বলেন, সমাজে সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধপ্রিয়তা সর্ব্বান্তে শ্রমপ্রিয়তা ঘটিয়া থাকে। তাঁহার মতে শ্রমজীবিগণ সৈনিক পুরুষ দিগের ন্যায় তেজীয়ান্ ও আজ্ঞাবাহী হইলেই পূর্ণোন্নতি হইবেক। আমাদিগের দুর্দ্দশা প্রযুক্ত যুদ্ধপ্রিয়তা সর্ব্বব্যাপী হইবার পূর্ব্বেই শ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং সমস্ত লোকে ভীরু ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া লোকবল সমাহরণের অযোগ্য হইয়াছে।

জাতিভেদ নিয়মে বংশানুসারে ব্যবসা নির্দ্দেশ দ্বারা সকল লোক সকল বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং তদ্দ্বারা যে শাসনপ্রণালীর কার্য্য সিদ্ধি হইত তাহাতে দুষ্টের দমন হইলেও সমগ্র সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। এখন সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতেও মঙ্গল নাই। বংশানুক্রমে কার্য্য করিবার বাসনা দূরীকৃত না হইলে জাতিভেদ প্রথা অতিক্রান্ত হইবেক না। নূতন নিয়ম প্রচারিত হইয়া কেবল লোকের অবরুদ্ধ কুপ্রবৃত্তি সমূহ স্ফূর্ত্তি পাইয়া পরে আসিয়া অধীনতা মোচন করিলে কখনই মুক্ত ব্যক্তির মাহাত্ম্য থাকে না।

অনেকে বলেন বাঙ্গালিরা অত্যন্ত মোকদ্দামাপ্রিয়। চিন্তা করিলে প্রকাশ হইবেক যে মোকদ্দামাপ্রিয়তার মধ্যে-প্রথম অর্থলাভ অথবা পরের ক্ষতি করিবার বাসনা, দ্বিতীয়, এই বাসনা বলদ্বারা সুসিদ্ধ না করিয়া রাজার সাহায্য গ্রহণ,—এই দুটী লক্ষণ আছে। অর্থলাভেচ্ছা শ্রমপ্রিয়তা হইতে উৎপন্ন হয়। কত প্রকারে অর্থলাভ করা যাইতে পারে তাহা আমাদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা ভাল বুঝেন। এইজন্যেই রেলওয়ে গাড়ীতে পা ভাঙ্গিলে তাহার প্রতিকারার্থে কোম্পানীর নামে নালিস করিবার বাসনা বাঙ্গালির বুদ্ধিতে কখন প্রবেশ করে না। আমাদিগের মোকদ্দামার অধিকাংশ আন্তরিক বিরোধ ও পরের ক্ষতি করিবার বাসনা হইতে উত্থাপিত হয়। ইংরাজেরা এরূপ স্থলে

হয় ক্রোধসম্বরণ করেন নচেৎ অসহ্য হইলে বাহুবলের দ্বারা শক্রদমন করিয়া মনের ক্লেশ দূর করেন। আমরা তাহাতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। অপমানিত হইলে হরমুতের দাবিতে নালিশ করিতেই ভালবাসি। অতএব শ্রমশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ মোকদ্দামা উপস্থিত হয় তাহার সংখ্যা আমাদিগের মধ্যে অল্প। আর জেদের মোকদ্দামাই অধিক। কারণ আমাদিগের যুদ্ধশিক্ষা হয় নাই। পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়গণের আচরণ আমাদিগের বিপরীত, অন্যান্য বর্ণ আমাদিগের সদৃশ। রাজসাহায্য গ্রহণেচ্ছা শ্রমপ্রিয়তার ফল বটে কিন্তু ক্রোধ নিবৃত্তির নিমিত্ত তদবলম্বন, তাদৃশ ইচ্ছার বিকৃতি। আমাদিগের মিথ্যাকথন বিষয়ে যে নিন্দা আছে তাহার এক হেতু, যথাযথ জ্ঞানলাভের প্রতি উপেক্ষা এবং অপর হেতু উল্লিখিত ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত রাজসাহায্য অবলম্বন। নিজের লাভালাভের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পরের ক্ষতি করিতে ব্যগ্র হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার থাকে না। এইজন্যেই যুদ্ধপ্রিয়তা ধর্ম্ম বিচারে নিন্দনীয়। কিন্তু তাহাহইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আত্মসংযম আবশ্যক। দুর্ব্বল ও ভীতগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় বটে কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম নাই।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছি যে বঙ্গবাসিগণের মধ্যে কায়স্থবর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব ও সুবর্ণ বনিকদিগের বৈশ্যত্বের কথা পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যত বর্ণ দৃষ্ট হয় সকলেই বর্ণসঙ্কর কেহই প্রকৃত শূদ্র বলিয়া গণ্য নহে। এইজন্যে বর্ত্তমান কালে শূদ্রশব্দে মিশ্রবর্ণ সমূহ বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। ইহাদিগের ব্যবসা কবে নির্দ্দিষ্ট হইল? ঐ সকল বর্ণোৎপত্তি ও তাহাদিগের ব্যবসা বিভেদ কি সমসাময়িক? ইহা কিরূপে হইবে? পূর্ব্বে কি গোপ মালাকরের ব্যবসা ছিল না?

প্রথম কল্পে মিশ্রবর্ণগণ অবশ্যই স্বেচ্ছামতে ব্যবসা গ্রহণ করিয়া থাকিবেক এবং বোধ হয় যৎকালে এত মিশ্রবর্ণ ছিল না তখন শূদ্রেরাও স্বেচ্ছানুসারে বর্ত্তমান ব্যবসা সমূহের এক একটি অবলম্বন করিত।

কিন্তু তাহাতে বংশানুক্রম রক্ষা হইত কি না? মনে কর যখন সূত্রধার ও কর্ম্মকার এই মিশ্রবর্ণদ্বয় উৎপন্ন হয় নাই তৎকালে ইহাদিগের ব্যবসা কে নির্ব্বাহ করিত? শূদ্রগণ অথবা অন্য মিশ্রবর্ণ। কিন্তু তাহারা কি বংশানুক্রমে ধারাবাহিক মতে স্ব২ ব্যবসা প্রতিপালন করিত না স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিষিদ্ধ যে কোন ব্যবসা অবলম্বন করিত? যদি প্রথম কল্পনা গ্রহণ করা যায় তবে প্রাচীন কালের নিমিত্তেও শূদ্র শব্দে পৃথক্‌ বর্ণসমষ্টি মনে করিতে হইবেক। কিন্তু তাহাদিগের আদি প্রকাশ নাই অতএব কোন সময়ে তাহারা অবশ্যই অভিন্ন অবস্থায় থাকিবেক। উভয় কল্পনা-

তেই স্বীকার করিতে হইবেক যে মিশ্রবর্ণ উৎপত্তির পরে হউক কিম্বা পূর্ব্বেই হউক কোন এক সময়ে দ্বিজগণের নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা ভিন্ন আর যে২ ব্যবসা তত্তৎকালে প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় শূদ্র বা মিশ্রবর্ণগণ বংশানুক্রমে না হইয়া স্বেচ্ছামতে অবলম্বন করিত।

অনন্তর এই সকল ব্যবসা, জাতিভেদ ও বংশানুক্রম প্রথা প্রবিষ্ট হইবার হেতু কি? আর কিছুই নহে কেবল পূর্ব্বপ্রচলিত জাতিভেদ বিধানের অনুকরণ হইতেই এত বর্ণ উপস্থিত হইয়াছে। যত দিন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল ততদিন মিশ্র বর্ণের লোকেরা হয় পিতৃ মাতৃবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাহাদিগের ব্যবসা অবলম্বন করিত নতুবা তাঁহাদিগের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে স্বেচ্ছামত অন্য কোন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া স্বস্ব বংশে তাহাই রক্ষা করিত। পরে জাতিভেদ প্রথার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া এতাদৃশ নূতন বর্ণোৎপত্তি স্থগিত হইয়া গেলে প্রকৃত শূদ্রগণ তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আবার পৃথক্ বর্ণ সংস্থাপন করিতে লাগিল এবং মিশ্রবর্ণদিগের দৃষ্টান্তে আপনাদিগের মিশ্র আদি কল্পনা করিয়া লইল। ইহার স্থল এখনও কোথাও২ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ অনেকেই যজন যাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা কোন ব্যবসা অবলম্বন করিতেছেন? সকলেই নানাবিধ চাকরি করেন নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন পাচকদিগকে পরিত্যাগ করিলে এই সকল চাকরির অধিকাংশ লেখা পড়া সংসৃষ্ট। লেখকের বিবেচনাতে এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থ বর্ণের ব্যবসা। আবার দেখ অধুনাতন প্রথানুসারে অনেক নিকৃষ্ট বর্ণের লোকও লেখা পড়া শিখিতেছে কিন্তু শিখিয়া তাহারা কি পৈতৃক ব্যবসা প্রতিপালন করে? কেহই না। সকলেই এক কায়স্থ বর্ণের ব্যবসা করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণই বল কি নিকৃষ্ট বর্ণই বল একবার উল্লিখিত মতে নূতন ব্যবসা গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের বংশাবলীও তাহাতেই অনুরক্ত থাকেন। অতএব শূদ্র নাম যেমন হইয়াছে সেইরূপ কায়স্থ ব্যবসাও ক্রমে বহুবর্ণাধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবেক। কিন্তু উভয় স্থলেই এক ধারাবহন প্রকৃতিই অধিষ্ঠান করিতেছে। অভিনব বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী ইউরোপীয় সভ্যতার ফল কিন্তু সেই বীজ বঙ্গে রোপিত হইয়া ফল স্বরূপ কেবল এক নূতন প্রকার কায়স্থ উৎপন্ন হইতেছে।

আবার দেখ যখন বঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধের বিবাদ সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যবনের প্রাদুর্ভাবে সমাজ এখনকার ন্যায় আলোড়িত হয় নাই, তখন হিন্দু সমাজ লোকের উন্নতির জন্য কি করিয়াছেন? বল্লালসেন কৌলীন্য সংস্থাপন এবং দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মেল বন্ধ করেন। মধুমক্ষিকা গৃহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে একই প্রকার সম ষড়্ভুজ কোষ নির্ম্মাণ করে।

হিন্দুগণ কেবল জাতির মধ্যে জাতি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইদানীন্তন কৃতবিদ্য যুবকগণেরমধ্যে অনেকে মনেং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেহবা প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টান কেহ ব্রাহ্ম হইয়াছেন। পূর্ব্বেও ধর্ম্ম লইয়া বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। শাক্ত শৈবের কথা দূরে যাউক দেশীয় মুসলমানের অধিকাংশ হিন্দুবংশোদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। * বৈষ্ণবেরাই কি? সকলেই ধর্ম্মোদ্দেশে গমন করিয়া এক একটী পৃথক্ বর্ণ হইয়াছেন। যখন সেদিন ব্রাহ্মগণ একান্ত ব্যস্ত হইয়া রাজসাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিবাহবিধান হিন্দু শাস্ত্র হইতে পৃথক্ বলিয়া নূতন আকারে সংস্কৃত করিলেন তখনই মনে করিয়াছি যে ঐ দেখ মধুমক্ষিকা আর একটী কোষ নির্ম্মাণ করিতেছে।

ব্রাহ্মগণ উপলক্ষে আমাদিগের মহা আক্ষেপ এই যে তাঁহারাও একটী জাতি হইতে চলিলেন। আমরা বিদ্যা বুদ্ধি বল অর্থ সকল বিষয়েই এখনও জগতের নানা জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এখান হইতে সমস্ত জগতের ধর্ম্মের একতা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এখন জাতিভেদ বিনষ্ট হইতেছে। তাহা সুসিদ্ধ না; হইলেও ভারতবাসিগণের মন সতেজ এবং কর্ম্মঠ হইবেক না; এখন অনন্যমনা হইয়া কালের সহকারিতা করিয়া যদি এই প্রথা অপনীত করিতে পারাযায় তাহা হইলেই এ যুগের কীর্ত্তি সম্পন্ন হইবেক। খ্রীষ্টান ব্রাহ্মেরা যে একথা বুঝেন না ইহা বড় দুঃখের কথা। কিন্তু আবার যখন দেখি যে এদেশীয় আর এক সম্প্রদায়—(ইহাদিগকে rationalist নামে আখ্যায়িত করাই সহজ) ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলনে বিরত হইয়াছেন আবার ব্যবহারে কোন দ্বিধা করেন না কেবল ন্যায়পরতা সত্যনিষ্ঠা আদি কতিপয় নিয়মকেই সকল শাস্ত্রের নিদান ভূমে স্থির করিয়াছেন। যখন দেখি যে ইহারাও মুসলমানদিগের প্রতি বিমুখ তখন মনে হয় বুঝি আমরা কখনই জাতিভেদ ও ধারাবহনপ্রকৃতি অতিক্রান্ত করিতে পারিব না।

ধারাবহনপ্রকৃতি কেবল এই সকল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ নিবারণ দ্বারা বর্ণভেদ পূর্ণতালাভ করিলে জাতিবিদ্বেষ বিলক্ষণ বলবৎ হইতেছে। কোন বর্ণ শ্রেষ্ঠ এবং কেহ নিকৃষ্ট ও অস্পর্শীয় ইত্যাকার ধারণা বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বরং ইহার হ্রাসে কতক মঙ্গল লক্ষণ মনে করা যায় কিন্তু পূর্ব্বে জাতি পরস্পরার মধ্যে প্রকৃতির নিন্দাবাদ ছিল না। এখন কায়স্থ, নাপিত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ,

* একথা সুস্থির করিবার উৎকৃষ্ট উপায় ভাষা পরীক্ষা। অনেক মুসলমান পুরুষেরা কখন বাঙ্গালা কখন উর্দ্দুতে কথা কহেন বটে কিন্তু প্রকৃত বঙ্গীয়দিগের মহিলাগণ স্বভাবতঃ বঙ্গভাষাতেই আলাপ করিয়া থাকেন।

এবং সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকে ধূর্ত্ত এবং পক্ষান্তরে তন্তুবায় বর্ণ এবং রাঢ়শ্রেণীকে নির্ব্বোধ মনে করা এতই প্রবল হইয়াছে যে লোকে ইহার প্রতি লক্ষ্যই করেন না।

কিন্তু জাতিভেদ প্রথা হইতে যত ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের হৃদ্যতা নাশের ন্যায় আর কিছুই নহে। আমরা পূর্ব্বে জাতি (nation) ও বর্ণ (caste) শব্দের বিভিন্নতা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু দেশের অবস্থা গুণেই তাদৃশ প্রয়োজনের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণ সমূহের মধ্যে বিভেদ বলবৎ হইয়া বিভিন্ন বর্ণের স্থলে এক২টি পৃথক্ জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদির মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র নৈকট্য লক্ষিত হইত তাহাহইলে লোকে মুসলমান ইংরাজকে জাতি নামে ব্যক্ত করিত না। এখন রাজপীড়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া আমরা বর্ণ সমূহের ঐক্য স্থাপনে ব্যগ্র হইয়াছি। ইহাতেও এত মত ভেদ এই বড় দুঃখ।

শ্রীয।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—ব্রাহ্মণবর্গ।

ব্রাহ্মণবর্গ প্রাচীন ভারতের শিরোভূষণস্থ সর্ব্বোত্তম রত্ন। ভারত অদৃষ্ট ক্ষেত্রে ইঁহারা বিধাতা স্বরূপ। তাঁহাদের অপরিসীম গুণে উক্তরূপ উচ্চাভিধান প্রদান করিয়াও তৃপ্তি বোধ হয় না। যে গুণ হেতু ব্রাহ্মণেরা সভ্যতম সমাজ মধ্যেও "দেব" ইত্যাখ্যায় নির্ব্বিবাদে পূজিত হইয়াছিলেন, সে গুণ কখনই সাধারণ নহে। কিন্তু হতভাগ্য ভারত অদৃষ্টে তাঁহাদের সেই গুণ, গুণ হইয়া দোষ হইয়াছে, তাঁহারা যদি এতদূর গুণশালী না হইতেন, সাধারণে বোধ হয় তাঁহাদের বাক্যে মোহিত হইয়া যথা প্রদর্শিত পথে অন্ধের ন্যায় ধাবিত হইত না এবং দুর্দ্দশার দিন আগমন আরও কিছু দিন স্থগিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা ভারতকে যেমন প্রাচীন সভ্যতার উচ্চতম সোপানে উঠাইয়াছিলেন,—যে সোপান তাঁহার পদস্পর্শে ধন্য বলিয়া জগৎস্থ জনগণ প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা সংযুত হইয়া দর্শনার্থে ক্রমেই আগ্রহযুক্ত হইতেছেন; সেই ভারতকে আবার তাঁহারা তেমনিই অধঃপাতিত করিয়াছেন। অবনতিকারক ব্রাহ্মণদিগের সহিত এখানে কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহারা উন্নতি কারক, উন্নতিসাধন করিয়া কিঞ্চিৎ অলস ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ।

ব্রাহ্মণদিগের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে তাঁহাদের গুণভাগ পরিদর্শন দ্বারা মানসিক গতি অবগত না হইলে, সমাজের উপর ইহাঁদের কত দূর প্রভুত্ব এবং ইহাঁদের দ্বারা ইতিহাস কিরূপ পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের গুণবত্তা সাধারণতঃ শাস্ত্র বিদ্যায়। এই শাস্ত্র বিদ্যা সম্ভবতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দোষ হয় না,—লৌকিক ও পারলৌকিক ভেদে অর্থ বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বিবিধ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বাল্মীকির সাময়িক অর্থবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মকাণ্ড ভাগের যথাযথ আলোচনা প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবে করা হইয়াছে, এবং প্রদর্শিত হইয়াছে যে কর্ম্মকাণ্ড ক্রমেই জটিলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের রীতি নীতি বর্ণনের পূর্ব্বে জ্ঞানকাণ্ড কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় কাহারও অরুচিকর হইবে না। বিষয় অতি বৃহৎ, সঙ্কীর্ণ স্থানে সমাধা হওয়ার কথা নহে, সুতরাং যাহা কিছু হয়, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে রামায়ণে দুইরূপ মত দৃষ্ট হয়। একটি জাবালি কর্ত্তৃক রামকে প্রবোধ দেওয়ার ছলে (২)১০৮) নিরীশ্বর ভাব, অপরটি, যদিও বিশেষ রূপে বিবৃত নাই, বৈদান্তিক অর্থাৎ ঔপনিষদিক মত। জাবালি যেরূপ মত বিস্তার করিয়াছেন তাহা, ঐ সর্গের শেষ ভাগে "যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ" এই পদ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে উহা বুদ্ধমত। কিন্তু বুদ্ধদিগের মধ্যে সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও বৈভাষিক এই তিন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে উহার কোন সংস্রব নাই। মাধ্যমিকদিগের সহ মূল তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু মাধ্যমিকাচার জাবালির মতের ন্যায় কুৎসিত বিলাসপ্রিয়তা, পশুভাব ও নিকৃষ্টাচার যুক্ত নহে। জাবালির মতের অধিক ঘনিষ্ঠতা চার্ব্বাক দর্শনের সঙ্গে।(ক) এই সাধ্য সামাবলম্বনে সাধিত দর্শনের সারাংশ যেরূপ মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে সংগৃহীত করিয়াছেন, জাবালির মতের সহ তাহার বহুল ঐক্য। পূর্ব্বোক্ত শেষোক্তের আদর্শ বলিলে ক্ষতি হয় না। ফলতঃ জাবালির মত অতি আধুনিক ও পরে যোজিত ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও এই কথা প্রতিপোষণ করিয়া থাকেন।(১)

দ্বিতীয় মত বৈদান্তিক। আর্য্যগণের

(ক) এই প্রস্তাব লিখিত হইলে পর দেখিলাম যে বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনস্থ চার্ব্বাকদর্শনের সমালোচক এই প্রস্তাব লেখকের সহ এক মতস্থ।

[১] "Schlegel regrets that he did not exclude them all from his edition. These lines are manifestly spurious."—Griffith's Ramayana, Vol. II p. 440 এবং extracts from Schlegel, do. do. p. 498-499 দ্রষ্টব্য।

মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্ম্ম। শ্রুতি দুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন ঋষিদিগের দ্বারা গীত। ব্রাহ্মণ ভাগ বহু পরে রচিত। ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় মন্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধি প্রদানার্থে এবং বিবৃত করণ উদ্দেশে অঙ্কুর ধরিয়া ইতিহাসাদি কথন অর্থে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে এইরূপ কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি বর্ণিত হইয়া শেষভাগে জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে, সেই অংশকেই উপনিষদ্ বা বেদের অন্তভাগ বলিয়া বেদান্ত বলে। বেদশাখা সমূহ সেই সকল শাখার আদি শিক্ষকের নামানুসারে প্রায় নামিত, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদও তদ্রূপ। কিন্তু প্রতি বেদশাখাতেই যে নূতন নূতন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ ছিল এমন নহে। এক শাখার তা অন্য শাখাতেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্ষমূলরের মতে প্রত্যেক বেদশাখার নিমিত্ত এক এক উপনিষদ ছিল। তদুক্ত মুক্তিকা অনুসারে ১১৮০ বেদশাখা, (২) সুতরাং ঐ সংখ্যক উপনিষদও ছিল। কিন্তু এখন ১০৮ খানি মাত্র পাওয়া যায়। (৩) হিন্দুদিগের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। উহা যোগধর্ম্মের উৎস স্বরূপ। যোগধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, উহা উপনিষদের দুহিতা স্বরূপ, বিরুদ্ধমত অশ্রদ্ধেয়। এই নিমিত্তই জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরে রচিত হইয়াছে, প্রায় সকল রচয়িতাই আপন আপন মতের গৌরব রক্ষার্থে উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন। এমন কি নিরীশ্বর সাংখ্যও, যদি বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য গ্রাহ্য হয়, উপনিষদের দোহাই দিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ দোহাই দেওয়ার প্রথায় অনিষ্ট ঘটিতেও ত্রুটি হয় নাই। দুষ্ট বিদ্যাভিমানিগণের আপন আপন মত প্রতিপোষকতার নিমিত্ত অনেক জাল উপনিষদ্ সৃষ্ট হইয়াছে। (৪) সুতরাং উপনিষদও নির্ব্বিবাদে নাই। যাহাহউক বাল্মীকির সময়ে যোগধর্ম্ম কত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিল, তাহা বাল্মীকির দ্বারা উল্লিখিত বেদশাখা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আর যাহা যাহা তাঁহার পূর্ব্বের, সেই সকল হইতে যোগধর্ম্মের সারাংশ মূল প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে তত্তৎ ভাব কতদূর অনুসৃত বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইয়াছে এবং মূল বিষয়ের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ধারণ করে, তাহা প্রায় টীকাকারে অন্যান্য বিষয়ের সহ পার্শ্ববর্ত্তিভাবে প্রদর্শিত হইবে।

[২] বেদশাখার সংখ্যা নিরূপণ অন্যমতে "একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং। একশতধা আধ্বর্য্যবং। সহস্রধা সামবেদং। নবধা আথর্বণং।"—দুর্গাচার্য্যের নিরুক্তভাষ্য ১।২০।

[৩] Max Muller's Ans: Saas: Lit: p. 325.

[৪] Max Muller's Ans: Saas; Lil: p.

উপনিষদ্‌ সমূহের উদ্দেশ্য যদিও এক কিন্তু তাহাতে আরও নানা বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বনে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। সে সকলের সহিত এখানে সংস্রব রাখা অনাবশ্যক এবং তদুপযুক্ত স্থানও নাই। উদ্দেশ্য মাত্র নিম্ন মত কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যোগ ধর্ম্ম আলোচিত হইতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তাব্যক্ততা, জীবাত্মার সহ পরমাত্মার সম্বন্ধ, জীবাত্মার অবস্থান, মুক্ত্যুপায় এবং যোগ সাধনোপায়।

বৈদান্তিক কর্ম্মের মূল প্রস্থান "আত্মৈবেদং মগ্র আসীদেক এব" এবং লক্ষ্য "এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

সুকৃত স্বয়ম্ভূ এবং যাঁহাকে অপর কিছুতেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এবং যাঁহার দ্বারা অপর সকলই ব্যক্ত হইয়া থাকে, ও "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাং" এরূপ একমাত্র পরমেশ্বর আদিতে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় সকাম বা নিষ্কাম কোন পদার্থই ছিল না। এই নিত্য অবিনাশী জ্ঞানময় আত্মা বহুধা হইতে কামনা যুক্ত হইলেন। তজ্জন্য তপঃসাধন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হইল, অনন্তর ক্রমান্বয়ে আকাশ হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে অপ্‌, অপ্‌ হইতে ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে উদ্ভিদ্‌, উদ্ভিদ্‌ হইতে অন্ন; অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইল।(৫) সৃষ্টির পরিরক্ষকগণ সৃষ্টির মানসে কারণজল মধ্যে সৃষ্ট একটি নরাকার পুরুষকে গ্রহণ করিলেন, ইনি হিরণ্য গর্ভ। সেই পুরুষের শরীর উদ্ভিন্ন করিয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দিক্‌, উদ্ভিদ্‌, চন্দ্র, মৃত্যু এবং জল অর্থাৎ এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা নিচয়ের উদ্ভব হইল।(৬) ইহাঁরা মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া—যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়, শ্বাসেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, কেশাবলী, মনঃ, প্রাণবায়ু এবং উৎপাদিকা শক্তি

(৫) ছান্দোগ্যে [৬।২ ৩] ঈশ্বর বহুধা হইতে বাঞ্ছা করিলে প্রথমে তেজ সৃষ্টি হইল, তেজ হইতে জল, জল হইতে অন্ন; অন্ন হইতে স্বেদজ, অণ্ডজ, ও উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হইল। মুণ্ডকে [১।১।৮] অন্ন হইতে যথাক্রমে প্রাণ মন সত্যলোক কর্ম্ম এবং অমৃতত্ব উৎপাদিত হইল। এতৎ প্রাচীন উপনিষদ দ্বয়ে উল্লিখিত মতবৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়।

(৬) রামায়ণে ২।১১০।৩

"সর্ব্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্ম্মিতা।
ততঃ সমভবদ্‌ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্দ্দৈবতৈঃ সহ॥"

পুনশ্চ মনুতে [১।৬-৯] অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা সৃষ্টি করণেচ্ছুক হইয়া পঞ্চভূতাদির সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করায়, একটি অণ্ডের উৎপত্তি হইল। ঐ অণ্ডে ধাতা হিরণ্যগর্ভ জন্মপরিগ্রহ করিলেন।

এই সকলের অধিপতি ভাবে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর পরমাত্মা সৃষ্ট সমস্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রদত্ত যে স্বভাব তাহা ব্যক্ত করিলেন। এ নিমিত্ত সাকার নিরাকার, সৎ, অসৎ, বিদ্যা, অবিদ্যা, উভয়বিধ ভাবই তাঁহাতে আশ্রয় করিল।(৭) পরমাত্মার আপন ভাব যুক্ত অবস্থাকে পরমাত্মা, এবং জীবের চৈতন্য স্বরূপ পদার্থ, যাহা বৈদান্তিক মতে বিজ্ঞান কোষাশ্রয়ী পরমাত্মা স্বয়ং, তাহাকে জীবাত্মা বলিয়া কহিব। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে অভেদ. পূর্ব্বকথিত যিনি জীব শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের স্বভাব ব্যক্ত করিলেন, তিনিই জীবশরীরস্থ হইয়া পরমাত্মা রূপী জীবাত্মা পদ বাচ্য হইলেন। আকাশ যেমন ঘটাশ্রয় করিলেও, স্বভাব যুক্ত আকাশের সহ একই পদার্থ, পরমাত্মা তদ্বৎ অবিদ্যা আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা সংজ্ঞা ধারণ করিলেও উভয়ে একই বস্তু হয়েন।[৮] এবং যেমন সূর্য্য যে সকল বস্তুর উপর কর প্রসারিত করেন, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে, বা দর্শকের নেত্র দোষ অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন দোষ গুণ বিজ্ঞাপক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ মিথ্যা দৃষ্টি বশতঃ তত্তৎ ভাব তাঁহাতে আরোপিত হয়, কিন্তু সূর্য্য বস্তুতঃ সর্ব্বদাই আপন স্বভাবে রহিয়াছেন, জীবাত্মা তদ্বৎ কর্ম্মাশ্রয় অবিদ্যা প্রভাবে সুখ দুঃখ ময়, মোহযুক্ত এবং বিচালিত বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি সুখ

[৭] বেদান্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য মতে ঈশ্বর সত্য আর সমস্ত অসত্য অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা প্রপঞ্চ। অবিদ্যার শক্তি দ্বিবিধ বিক্ষেপশক্তি ও আবরণ শক্তি, এতদুভয় শক্তিযোগে জীবাত্মা অবিদ্যা আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরমাত্মার সহ জীবাত্মার একত্ব দর্শন দ্বারা অবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে পারিলে জীবাত্মা মোক্ষ দ্বারা আপন স্বভাবে লীন হইয়া থাকে। জরা মরণ সুখ দুঃখ পুনর্জ্জন্মাদি সমস্তই অবিদ্যাজনিত। পুনশ্চ মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়াং কল্পিতং জগৎ।" এবং স্বমায়া রচিতং বিশ্বং ইত্যাদি। অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহা সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে।—"নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনাবন্ধাযোগাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মে এই বিশ্ব যেরূপ নির্ভর করিয়া আছে তাহা অতি সুন্দরভাবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে চক্র ও নদীর রূপকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

[৮] এতদ্ভাবের বিস্তার ভগবদগীতায় ১৫।১৫ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি, পুনশ্চ ৬।২৯-৩১ "সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।" ইত্যাদি, পুনশ্চ ১৫।১৪ "অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণোপাণ সমাযুক্তঃ" ইত্যাদি। যোগ বাশিষ্ঠে ৩।৫-৬, "জগদ্ ভ্রমোঽভবং" ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত উত্তরগীতার প্রথম অধ্যায়ে "অহমেক মিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি। ভগবতী গীতাতেও এতৎ ভাবের ছায়া মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে। ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।" ইত্যাদি।

দুঃখ আদি সমুদয় হইতেই নির্লিপ্ত।[৯] সুখ দুঃখ আদি ভোগ পঞ্চীকৃত ভৌতিক প্রভবেরই হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহা অবিদ্যালীলা প্রপঞ্চ, সুতরাং ক্ষণিক। জীবাত্মা অবিদ্যা প্রভাবে আবদ্ধ বশতঃ যদিও গমনবিমুখ, তথাপি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, নৈকট্য এবং দূরত্ব তাঁহার নিকট উভয়ই সমান, তিনি অন্তরাকাশে থাকিয়াও অন্তর বাহির উভয় স্থানে অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী প্রভান্বিত, অশরীরী, শিরামস্তিষ্কবিহীন, নির্ম্মল ও পাপরহিত। [১০] নিত্য, সূক্ষ্ম, অবিনাশী, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, স্বয়ম্ভু, হন্তাও নহেন, হন্তব্যও নহেন। বাক্য, নেত্র, শ্রোত্র, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতির যিনি অতীত, এবং যাহা হইতে ঐ সকল ব্যক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং যিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য, অথবা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ পৃথিবীময় আপময়ো বায়ুময় আকাশ ময়স্তেজোময়োঽ তেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়ো ঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।"

অবিদ্যাবদ্ধ পরমাত্মার অন্তর, মনঃ, অহঙ্কার, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, ধৃতি, মতি, মনীষা, ভূতি, স্মৃতি, ক্রতু, অসু, ইচ্ছা ইত্যাদি পরিচায়ক হয়। পরমাত্মা এ সকল পরিচায়ক বিহীন নিরাকার। আত্মা জীবস্থ হইলে, জৈব যন্ত্রাবলী সহ সম্বন্ধে আত্মা রথী, শরীর রথ, সত্ত্ব সারথি, মন বল্‌গা, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, এবং উদ্দেশ্য পথ। আত্মার শারীরিক সম্বন্ধে অবস্থান এরূপ, অন্নকে অবলম্বন করিয়া প্রাণবায়ুর অবস্থান, প্রাণ বায়ু অবলম্বনে মনঃ, মন অবলম্বনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান অবলম্বনে জ্ঞান, জ্ঞান অবলম্বনে আনন্দ, সেই আনন্দ অবলম্বনে জীবাত্মার অবস্থান। এই জীবাত্মার জীবভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় ইন্দ্রিয় হইতে উদ্দেশ্য মহৎ, উদ্দেশ্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সত্ত্ব মহৎ, সত্ত্ব হইতে ব্যক্ত জীবাত্মা, তদূর্দ্ধে অব্যক্ত পরমাত্মা, উহা সীমা।(১১)

[৯] ভগবদ্গীতায় আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত ভাবযুক্ত, তাহা সাংখ্যের ছায়া অল্প আশ্রয় করিয়া বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সুন্দর এবং দ্রষ্টব্য। ১৩।২৯—৩৪ "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি। পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে" অয়মাত্মা সদামুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু। কিমস্য বন্ধনং।" ইত্যাদি।

(১০) ভগবদ্গীতায় ২।১৭-২০ " অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদি, পুনশ্চ ২৩।১৩-১৫ "সর্ব্বতঃ পানিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং" ইত্যাদি। সুন্দর সাদৃশ্য।

(১১) এরূপ উৎকর্ষতার পর্য্যায় কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য সহ ছান্দোগ্যে ৭।২-১৫ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা বাক্য হইতে মন মহৎ, মন হইতে সঙ্কল্প, সঙ্কল্প হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ক্ষমতা, ক্ষমতা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজঃ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে আশা, আশা

অন্নময় কোষমধ্যে মনোময় কোষ, তন্মধ্যে যথাক্রমে বিজ্ঞানময়, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষমধ্যে সূক্ষ্ম দেহযুক্ত জীবাত্মা। জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ. নবদ্বারপুরে শয়নশায়ী। ইহাঁর অবস্থা বা ভাব চারি প্রকার। প্রথমে বৈশ্বানর, ইনি শরীরস্থ হইয়া সকল জীবকে পরিচালনা করেন। ইহা জীবের জাগ্রতাবস্থা। এই সময়ে জীবাত্মা উনবিংশ ইন্দ্রিয়(১২) বিশিষ্ট হইয়া স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। (১৩) দ্বিতীয় তৈজস. উহা জীবের স্বপ্নাবস্থা, এই সময়ে উক্তরূপ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট পুরে আবদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রাজ্ঞ ইহা সুষুপ্তাবস্থা, ঐরূপ আবদ্ধ থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। চতুর্থ সর্ব্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। এই চতুর্ব্বিধ ভাব যথাক্রমে 'অ,' 'উ,' 'ম' এবং 'ওম্' দ্বারা সাধিত হয়।[১৪] বৈশ্বানর ভাবে জীবাত্মার অবস্থান দক্ষিণ নেত্রে, তৈজস ভাবে মনোমধ্যে। প্রাজ্ঞ ভাবে অন্তরাকাশে, —অন্তর, হইতে ১০১ নাড়ীর উৎপত্তি, প্রত্যেকে শতধাবিভক্ত, সেই প্রত্যেকের আবার ৭২০০ উপশাখা আছে, (১৫) সুতরাং সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা ৭২৭২,০০০,০০; উহার মধ্যে পরিচালিত বায়ু প্রবাহ, তাহা বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসারে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চ নামে নামিত। এই পঞ্চ বায়ু অবলম্বন করিয়া পঞ্চ অগ্নির অবস্থান, যথা, গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্যাগ্নি, ও আবসত্যাগ্নি। এ সকলের মধ্য দিয়া নাড়ী প্রধানা সুষুম্না (Coronal artery) অন্তরের উর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হইয়া, তালুস্থ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যস্থল অবলম্বন করিয়া এবং তালুস্থ মাংস খণ্ড ভেদ করিয়া করোটী নামক মস্তকাস্থির ভিতর দিয়া কেশমূলে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তদবলম্বনে জ্ঞান ও আনন্দময় স্বর্ণপ্রভ আত্মা অন্তরাকাশে পদ্মবৎ গৃহমধ্যে বাস করিতেছেন। ভূর্ভুব

হইতে প্রাণ, এই প্রাণকে যে সাধনা দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে সেই অতিবাদী। এরূপ ভবদ্গীতায় ৩।৪২ শরীর হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মনঃ, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে আত্মা। এরূপ তুলনায় বস্তু বিশেষে গুরুত্বভাব প্রদানরূপ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সময় ভেদে চিন্তাশক্তির উন্নত বা অবনত ভাব অনেক উপলব্ধি হইতে পারে।

(১২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত।

(১৩) স্থূল দৃষ্টিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যের সহ এ স্থল সহসা বিরোধী বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ দর্শনে তাহা হইবে না। মায়াজনিত সূক্ষ্ম দেহী জীবাত্মা এবম্ভূত ভাবে দৃষ্ট।

[১৪] অ+উ+ম্=ওম্ এতদ্ মাহাত্ম্য ও সাধনোপায় মাণ্ডুক্যে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমে দ্রষ্টব্য।

[১৫] ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তর গীতা ২য় অধ্যায়েতেও "দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি" ইত্যাদি।

অগ্নি বায়ু সকলেই তথায় বর্ত্তমান আছেন (১৬)

জীবাত্মা অবিদ্যা প্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। (১৭) অবিদ্যা মুক্ত হইলেই আত্মার মুক্তিসাধন হয়। এই মুক্তি সমান বায়ু অবলম্বী সপ্তশিখাময়ী (১৮) অগ্নিতে আহুতি দান বা বেদবিধানোক্ত অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা সাধিত হয় না।(১৯) ছান্দোগ্যে (৭।১।১-৩) নারদ সনৎকুমারের নিকট আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন যে চতুর্ব্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, বেদানাং বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ,

[১৬] পরবর্ত্তী গ্রন্থকলাপে এই ভাব এতদ্রূপে স্পষ্টীকৃত বা শাখা প্রশাখা সহ বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। দত্তাত্রেয় ষট্‌চক্রভেদে।

"মেরোর্ব্বাহ্য প্রদেশে শশিমিহিরশিরে
সব্য দক্ষে নিষণ্ণে,
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয় গুণময়ী চন্দ্র
সূর্য্যাগ্নিরূপা।
ধুস্তুর স্মের পুষ্প গ্রথিততম বপুস্কন্দ মধ্যা
চ্ছিরস্থা,
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্য-
মস্যা জ্বলন্তী॥

এবং "তন্মধ্যে পরমক্ষরঞ্চ মধুরং" ইত্যাদি।

উত্তর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে

"দীর্ঘাস্থি মূর্দ্ধি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি
কথ্যতে॥
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্ম নাড়ীতি
সূরিভিঃ।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী॥
সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতো-
মুখং।
তস্য মধ্যগতা সূর্য্য সোমাগ্নি পরমেশ্বরাঃ॥
ভূতলোকাঃ দিশঃ ক্ষেত্রং সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাঃ
শিলাঃ।
দ্বীপাশ্চ নিম্নগাবেদাঃ শাস্ত্রবিদ্যাকুলা-
ক্ষরাঃ॥
স্বরমন্ত্র পুরাণানি গুণাশ্চৈতানি সর্ব্বগাঃ।
বীজ জীবাত্মক স্তেষাং ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রাণ-
বায়বঃ।
সুষুম্নান্তর্গতং বিশ্বং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতি-
ষ্ঠিতং॥"
ইত্যাদি

(১৭) ভগবদ্গীতা অনুসারে জীবের পাপ পুণ্য কর্ম্ম সুখ দুঃখাদি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, উহা স্বভাব হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। ৫। ১৪-১৫

"নকর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি
প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং
বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি
জন্তবঃ॥"

(১৮) এই সপ্তশিখা কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, ও বিশ্বরূপা।

[১৯] এতদ্বিষয় মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "নমুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি" ইত্যাদি। অধ্যাত্ম রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে "সা তৈত্তিরীয় শ্রুতিরাহ সাদরং, ন্যাসং প্রশস্তাখিল কর্ম্মণাং স্ফুটং। এতাবদিত্যাহচ বাজিনাং শ্রুতি, জ্ঞানং বিমোক্ষায় নকর্ম্ম সাধনং।" ভগবদ্গীতায় ২।৪৫ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" এই গীতায় কথিত হইয়াছে যে মোহাবৃত জড়বুদ্ধিদিগের প্রবোধার্থে গুণাত্মক কর্ম্মভাগের সৃষ্টি।

কর্ম্মকাণ্ড, মন্ত্রভাগ, রাশি* দৈব,† নিধি,‡ বাকোবাকাম্ ও একায়নম্,§ দেববিদ্যা,‖ ব্রহ্মবিদ্যা,¶ ভূত বিদ্যা, * * ক্ষেত্রবিদ্যা, † † জ্যোতিষ্, সর্পবিদ্যা ‡ ‡ দেবজ্ঞানবিদ্যা,§ § প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে খেদযুক্ত হইতেছেন। জ্ঞান এবং অজ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান মোক্ষের কারণ, অজ্ঞান কর্ম্মভাগ আশ্রয় করিয়া থাকে। কর্ম্মভাগ উন্নত বা অবনত হইলে তদনুসারে উচ্চ নীচ লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্য বা পাপক্ষয়ে পুনর্ব্বার জীবের জন্ম পরিগ্রহ হইয়া থাকে। (২০) পুণ্য সঞ্চিত লোক ব্রহ্মলোক তুলনায় কতদূর স্থায়ী তাহা এবম্ভূত দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে।—দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় ইহলোকে বাস, স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পিতৃলোকে, জলেতে প্রতিবিম্বের ন্যায় গন্ধর্ব্ব লোকে, এবং সূর্য্যাতপ প্রতিভাসিত চিত্রফলকস্থ উজ্জ্বল মূর্ত্তির ন্যায় ব্রহ্মলোকে। কিন্তু ইহা বলিয়া কর্ম্মভাগ একেবারে পরিত্যাগ করা বিধি নহে। ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন গ্রহণের পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ড ও গৃহধর্ম্ম পালন ভূয়োভূয়ঃ বিধানিত হইয়াছে।(২১) প্রথমে

* Arithmetic and Algebra.
† Physics.
‡ Chronology.
§ Logic and Polity.
‖ Trehnology.
¶ Articulation, Cerimonials, and Prosody.
* * Science of spirits.
† † Archery.
‡ ‡ Science of Antidotes.
§ § Fine arts.

উপরে গৃহীত ইংরেজি নামগুলি বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুবাদিত।

[২০] পুনর্জন্ম কিরূপে হইয়া থাকে তাহা ছান্দোগ্যে ৫।১০ প্রদর্শিত হইয়াছে। —মনুষ্য কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক পিতৃলোক বা নিকৃষ্টলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, ভোগ শেষ হইলে, যদ্রূপ পর্য্যায়ক্রমে গন্তব্য স্থানে গমন করিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনে তদ্রূপ পর্য্যায়ের বিপরীত ভাবে নীত হইয়া আকাশে পতিত হয়। তথায় বায়ু সঙ্গে মিলিত হইয়া ধূমত্ব প্রাপ্ত হওত ছিন্ন মেঘের সহ মিশ্রিত হয়। অনন্তর ঘন মেঘের সহ লিপ্ত হইয়া জলধারা ক্রমে চাউল বা অপর কোন আহারীয় দ্রব্যে প্রবেশ করে। অনন্তর পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা নিকৃষ্ট জাতি বা অধম জীবজন্তু দ্বারা আহারিত হইয়া রেতরূপে পরিণত হয়। এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় যোগে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে নীত হইয়া থাকে। ভগবতী গীতাতেও উমা হিমালয়ের নিকট এতন্মর্ম্মে মানবজন্ম তত্ত্ব কহিয়াছেন। পুনশ্চ যোগবাশিষ্ঠে ১।৩৯ "ক্ষীণ পুণ্যে" ইত্যাদি, পুণ্যক্ষয়ে পুনর্জন্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, রামায়ণেও সর্ব্বত্র তদ্রূপ।

(২১) মনুর বিধি মতেও ৬।৩৬,৩৭ "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্" ইত্যাদি। আগে কর্ম্মকাণ্ড ও গৃহধর্ম্ম সমাধা করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে, নতুবা নরকে গমন হয়। অনন্তর ৬।৩৯-৪৮ "যো দত্ত্বা সর্ব্ব ভূতেভ্যঃ" ইত্যাদি, মোক্ষার্থী ব্যক্তির যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তৎপক্ষে বিধি দেওয়া হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে [১১] সর্গে [৩১,৩২] কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিলে কাক-

কর্ম্মের দ্বারা অসৎ পথ পরিত্যাগ করণ, জিতেন্দ্রিয় হওন, এবং বুদ্ধি বশীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানসাধন করিতে হইবে। অনন্তর প্রাপ্তজ্ঞান ব্রহ্মবিদ কামনারহিত হইয়া,—যে হেতু ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আর কোন বস্তুতে কামনা থাকে না—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক হইতে পারেন।(২২) অথবা নিষ্কাম হইয়া অর্থাৎ কার্য্যের ফলবাঞ্ছাশূন্য হইয়া এবং সফল নিষ্ফল এ উভয়েতেই সমান চিত্তপ্রসাদ যুক্ত হইয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যে রত থাকিতে পারেন।

নানা নাম ও আকার বিশিষ্ট নদী সমূহ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও সমুদ্রে পতিত হইলে যেমন আর তাহার পৃথকত্ব থাকে না, তদ্বৎ অবিদ্যাবদ্ধ আত্মা ও স্বভাবস্থ পরমাত্মায় সম্বন্ধ। একজন মায়াবন্ধনে কর্ম্মফল বশে পুনঃ পুনঃ মুহ্যমান্ এবং তন্নিমিত্ত হীনতা জনিত খেদবান্ হইতেছেন, অপর নির্লিপ্ত ভাবে সাক্ষ্য স্বরূপ তাহা দর্শন করিতেছেন। কিন্তু মুহ্যমান আত্মা যখন সেই সাক্ষ্য স্বরূপ আত্মার সহ আপনার একত্ব অবলোকনকরিতে সমর্থ হয়, তখন সেই আত্মা মোহমুক্ত হইয়া আপন স্বাভাবিকী শ্রীধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু কথিত হইয়াছে যে উহা কর্ম্মভাগ দ্বারা সাধিত হয় না। পরমাত্মা যখন বাঙ্মনোনেত্রকর্ণাদির অগোচর তখন তাহাদিগের সাহায্যে তিনি প্রাপ্তব্য হইতে পারেন না। কেবল যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে তাহারই দ্বারা তিনি দৃষ্ট, এবং প্রাপ্ত হইতে পারেন অর্থাৎ স্বীয়দেহস্থ আত্মার পরমাত্মা সহ অভেদত্ব দর্শিত হয়। যখন জীবাত্মা নিষ্কাম হইয়া কেবল পরমাত্মায় মনোনিবেশ করত আমিই অন্ন, আমিই অন্নের ভোক্তা, আমিই তাহার একীভূত কারণ, আমিই বিশ্বের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, দেবতাদিগের পূর্ব্ব হইতেও আমি অমৃতত্ব ভোগ করিতেছি, আমিই সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, আমিই "ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ" এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া, পরমাত্মা সহ আপনার একত্ব অবলোকন করিয়া থাকে, সেই আত্মাই মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মলোকে আনন্দধাম অধিকার করিয়া থাকে অর্থাৎ পরমানন্দময় ব্রহ্মে লীন হয়

তালীয় বং জীবের পরমাত্ম তত্ত্বে প্রবৃত্তি জন্মে। ভগবদ্গীতায় (৩।৪) কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করিবে।

(২২) ভগবদ্গীতায় ৫।৩ সন্ন্যাসীর স্বভাব এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,

"জ্ঞেয়ং স নিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি নাকাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।"

২।১৭,১৮ শ্লোকের যদিও কিঞ্চিৎ বিরোধী, তথাপি তৎপরে ও পূর্ব্বে জ্ঞানলাভ সত্বেও কর্ম্মের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে। ২।২৫ অজ্ঞানী যদ্রূপ কর্ম্মে রত থাকে, জ্ঞানীও তদ্রূপ লোকহিত, লোক সংগ্রহ এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে প্রবৃত্তি প্রদানার্থে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

বা আপন স্বভাবস্থ হয়। তখন শরীরী অবস্থায় যত দিন জগৎ বাস হয়, আর তীর্থাদির আবশ্যক থাকে না, সে সকলই তাহার শরীরে বর্ত্তমান।(২৩) তখন তাহার পক্ষে পিতাও নাই, মাতাও নাই, পৃথিবী, দেবতা, বেদ কেহই ভিন্ন ভাব ধরে না, চোর চোর নহে, ব্রহ্মহা ব্রহ্মহা নহে, চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, পাপ পুণ্য হইতে পৃথক্, যে হেতু তিনি তখন এই সকলের অতীত হয়েন, তিনি তখন পরমাত্মা আপন স্বভাবস্থ। (২৪) বেদান্ত ধর্ম্মের এই লব্ধ ফলই ছান্দোগ্যে পিতাকর্ত্তৃক পুত্রের নিকট উক্ত হইয়াছে "এতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

ব্রহ্মলোকের উচ্চতা ও ভাব বৃহৎ আরণ্যকে ৩।৬।১ গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গার্গী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য অন্তরীক্ষ, গন্ধর্ব, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দেব, ইন্দ্র, প্রজাপতি এই সকল লোকের ক্রমান্বয়ে অবলম্বন ও অবস্থান কথিত হইলে, পুনর্ব্বার ব্রহ্ম লোকের অবস্থান ও অবলম্বন কিরূপ তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভর্ৎসনা সহকারে কহিলেন যে এরূপ অযথা প্রশ্ন বিধি বহির্ভূত, এরূপ প্রশ্নে প্রশ্নকারিণীর মুণ্ড নিপাত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ ছান্দোগ্যে ৮।৪।১-২ ব্রহ্মলোকের ভাব অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অংশ বাবু রাজনারায়ণ বসুও আপন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ অংশ উদ্ধৃত করিব, কিন্তু আমার অপেক্ষা তাঁহার কৃত অনুবাদে অধিক মনোহারিত্ব বোধ হওয়ায় তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। "এই আত্মার সেতুর এ পারে দিন রাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ও পারে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতিও নাই দুষ্কৃতিও নাই, ইহা পুণ্য জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে, যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে সংসারে দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপ ও দোষে উপতাপী সে অনুতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিদিনের সমান আলোক ধারণ করে। এই ব্রহ্মলোক, ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।"

ব্রহ্মানন্দের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থে কথিত হইয়াছে যে ধনশালী অপেক্ষা শিক্ষিতের

---

[২৩] যতীন্দ্র ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই ভাব গ্রহণ করিয়াই বোধ হয় যতি পঞ্চকে কহিয়াছেন

"কাশী ক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী
ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণ ধ্যান-
যুক্ত প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽহয়ং তুরীয়ং সকল জন মনঃ সাক্ষি
ভূতান্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ-
মন্যৎ কিমস্তি।।"

(২৪) এই ভাবে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণ ষটকে

"নমৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতি ভেদাঃ।
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
নবন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য,
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।।"

আনন্দ শতগুণ, এইরূপে উত্তরোত্তর গন্ধর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত মনুষ্যের, দেবত্ব ভাব প্রাপ্ত গন্ধর্ব্বের, পিতৃলোকের, দেবলোকের, ইন্দ্রলোকের, বৃহস্পতির ও প্রজাপতির যথাক্রমে শতগুণ অতিক্রম করিয়া আনন্দের উৎকর্ষ। ব্রহ্মানন্দ এ সকলের অতীত ও পরিমাণবিহীন। ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

যোগসাধনের প্রণালী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২৫) এরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—যে গুহায় বায়ু, বৃক্ষ পল্লব ও জলের মনোহর শব্দ প্রবেশ করিয়া থাকে, যথা হইতে কোন কুদৃশ্য দৃষ্টি পথে পতিত না হয়, তথা সমভূমি স্থানে শিলাখণ্ড প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া যোগী অবস্থান পূর্ব্বক বক্ষঃ গ্রীবা ও শরীরে অপর ঊর্দ্ধাংশ উন্নত রাখিয়া মনঃ সংযম পূর্ব্বক জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, নাসিকাগ্রে প্রাণবায়ুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাগ্র চিত্ত হইবে এবং 'ওম্' শব্দ দ্বারা যোগ সাধন করিবে। যোগী যখন যোগে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করিবে, তখন সাংসারিক সুখ দুঃখ পরাজয় করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে। (২৬)

ইহা বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত যোগশাস্ত্র, বাল্মীকির সাময়িক এবং তৎপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত শ্রুতি গ্রন্থকলাপ হইতে সঙ্কলিত। উহা অদ্বৈতবাদ। সভ্যতার আদি প্রবর্ত্তক সাধারণতঃ ভারতীয় ও গ্রীসীয়দিগকে বলা গিয়া থাকে। উভয়েই মনুষ্যজাতিকে মনুষ্য পদে পদবিক্ষেপ কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে আবার আদি শিক্ষক ভারতীয়েরা। গ্রীসীয়দের মধ্যে যখন কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ অগ্নি, কেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের সমাবেশ আদি কারণ বলিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, যখন সত্যের অনুরোধে একজন জগদ্‌গুরু মহাজ্ঞানীকে বিষপানে দেহপাত করিতে হইতেছে, ভারতীয়েরা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই নির্ব্বিবাদে এবং পূজনীয়ভাবে মানবচিত্তের অতি উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা বহুল পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিয়া বিশ্রাম সুখাভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রচারিত সেই শ্রুতিগ্রন্থকলাপ এতদূর গাঢ়তা পরিপূর্ণ যে এ অল্পস্থানে তাহার শতাংশের একাংশ পরিচয় দিয়াছি বলিলেও ধৃষ্টতা বোধ হয়।(২৭)

(২৫) শ্বেতাশ্বতর অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।

(২৬)ব্রহ্মধ্যান সম্বন্ধে কি কি উপায় এবং সেই সেই উপায়ের কি কি বিঘ্ন তাহা বেদান্তসারের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চ যোগসাধন সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদে দ্রষ্টব্য।

(২৭) বেদান্তভাগের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে একজন বিখ্যাত বিজাতীয় পণ্ডিত এরূপ বলেন।—"There are passages in these works, unequalled in any language for grandur, boldness and simplicity." পুনশ্চ

"These are the relics of a better age."—Max Muller.

ভারতীয় শাস্ত্র যিনিই পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক কোন মনুষ্য বিশেষ নহে, প্রকৃতি মাতা স্বয়ং। জননী সন্তানকে স্বয়ং আপন ক্রোড়ে লালন পালন সময়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। বাল্যকালে তাহার অর্দ্ধস্ফুট অমৃতময় ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণসুখে ভাসিয়াছেন, যৌবনে যৌবনশ্রীসম্পন্ন ও উদ্ভিন্নজ্ঞানাঙ্কুর বদনে অর্দ্ধ জ্ঞান অর্দ্ধ চাপল্য উভয় মিশ্রিত মধুর বাক্য শুনিয়া স্নেহসাগরে ভাসিয়াছেন, অভাগিনী আশা করিয়াছিলেন সেই সন্তানকে তাহার প্রাচীনাবস্থায় সর্ব্বকৃতি দেখিয়া আপনার জন্মসার্থক করিবেন। কিন্তু অপরিণাম দর্শিনী জননীর সীমাতিরিক্ত উৎসাহে, অপরিণামদর্শী যুবা উন্নতি কামনায় পশ্চাদ্গত সকলকে আরও পশ্চাতে রাখিতে গিয়া শ্রমক্লিষ্টতায় কাতর হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, জননী অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। ঈশ্বর করুন সেই অশ্রু শীঘ্রই মোচন হয়।—আদিমকালে ভারতীয় আর্য্যেরা তাৎকালিকী চিত্তের অপ্রশস্ততা অনুসারে দর্শন মোহকর প্রাকৃতিক পদার্থ মালায় স্রষ্টার রূপ কল্পনা করিয়া ভক্তিমার্গ শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়কালে চিত্তের অপেক্ষাকৃত উন্মত্ত ভাবানুসারে উন্নততত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক চিত্তভৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। পুরাণ তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অতিশয়তার ক্ষণিক কুপরিণাম মাত্র। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরভক্তি এত প্রবল যে

"বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতঃ স্বর্গং কিংপুনস্তৎ পরায়ণঃ॥"

সেখানে যে কালে আরও উন্নত ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে ঈশ্বর ধর্ম্মবীজ মাত্র নিহিত করিয়াছেন, দেশকাল পাত্র ভেদে অনুরূপ ফলোৎপাদন হইয়া থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য যে যথায় চিন্তাশক্তি এতদূর উচ্চ গগনবিহারিণী, তথায় অদ্বৈতবাদ এবং আনুষঙ্গিক মায়াবাদ, পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব এবং তদানুষঙ্গিক উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট লোকের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল। যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপতঃ সম্বন্ধে যতদূর উৎকৃষ্টতত্ত্ব উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব তাহা প্রায় হইয়াছে, তথায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দেখিলে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না। ইহা বোধ হয় এরূপে উদ্ভূত।—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা মন্ত্রভাগ অতি পুরাতন। পরবর্ত্তী আর্য্যেরা জ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কারকালে যদিও বৈদিক স্বভাবোপাসনা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কালসহকারে তাঁহাদের এ সংস্কারও জন্মিয়া ছিল যে বেদ অপৌরুষেয়। সুতরাং তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্বসহ প্রাচীন বেদভাগের সামঞ্জস্য সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানালোচনায় উ-

দ্রেকে তাঁহারা ভৌতিক পদার্থ মাত্রের পরিবর্ত্তন ও ক্ষণিকতা অবলোকন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যে সমস্ত এরূপ তাহা কখন নিত্য পদার্থ হইতে পারে না, ভৌতিক পদার্থের স্থক্ষ্ম হইতে যতই স্থক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলেন ততই ঐ ভাব দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া আসিল। কিন্তু সেই অনিত্য পদার্থ নিচয়ের মধ্যে জীবাত্মা যদিও শরীর সহ দৃষ্টি পথ বহির্ভূত হইয়া থাকেন, তথাপি তাহাকে ক্ষণিক বলিতে সাহসী হইলেন না, যেহেতু বেদে জীবাত্মা অমৃতত্বময় বলিয়া কথিত। ঈশ্বরের কামনাজনিত স্থষ্ট বস্তু যদিও নিত্য নহে কিন্তু অমৃতত্বময় হইতে পারে, ইহা তাঁহারা না ধরিয়া, অমৃতত্ব অর্থে নিত্য ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন যেহেতু একাধারে অসীম এবং সসীমত্তা অসম্ভব বোধ করিয়া থাকিবেন। আত্মা নিত্য, জীব বহুসংখ্যক, স্থতরাং বহুসংখ্যকই নিত্য আত্মা, ঈশ্বর ব্যতীত যদি পৃথক্ পৃথক্ আত্মার এরূপ নিত্যতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে আরোপিত মহিমার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে, কিন্তু তাহা হইবার নহে, অতএব জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে একই পদার্থ। নিত্যবস্তু সম্বন্ধে এরূপ মীমাংসিত হইল বটে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান অনিত্য বস্তু কোথায় যাইবে, এবং বেদে যে পুনর্জন্ম তত্ত্ব ও ভিন্ন ভিন্ন লোকভোগ কথিত হইয়াছে তাহাও ত কখন মিথ্যা হইতে পারে না।—স্থতরাং অবিদ্যা বা মায়াতত্ত্ব, এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্ম প্রয়োজন হইল, ও তৎসঙ্গে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও আবশ্যকতা রক্ষিত হইল। আর্য্যেরা এরূপ উভয় কুল রক্ষা করিতে গিয়া কথিতরূপ ভোগশাস্ত্রের স্থষ্টি করিয়াছিলেন।

এই মায়াবাদ এবং অদ্বৈত তত্ত্বের বেদভাগের শাসন পরিত্যাগ করিলে, কেবল যুক্তি অনুসারী মায়াবাদ তত্ত্ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বুদ্ধ শাক্যসিংহ, যাঁহার যুক্তির উপর কেবল নির্ভর, বেদভাগ যাঁহার নিকট ঘৃণিত, বোধ হয়, মায়াবাদ শ্রুতি হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ মায়াবাদই বৌদ্ধ মত। কোন কোন পণ্ডিত বিশেষ, বিবেচনা করেন যে হিন্দুরা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের নিকট গ্রহণ করিয়াছেন, একথা তত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু বেদান্ত ভাগে বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে উহা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ ভাল কি মন্দ তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে, রামানুজ স্বামীর সহ এক বাক্যে বলি যে "নিত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতোঽসা বতীব শুদ্ধো জগদেক সাক্ষী। জীবস্ত নৈবংবিধ এব তস্মাদভেদ বৃক্ষোপরি বজ্রপাতঃ। ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি তং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠ।" অদ্বৈতবাদ পরবর্ত্তী দোষ বিশেষের হেতু বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং আদর্শ স্বরূপ ব্রজপুরে কৃষ্ণের যথেচ্ছা বিহার এবং আধুনিক গোঁসাইদিগের অত্যাচার প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বজীব কৃষ্ণময় বলিয়া সেই সেই কার্য্য

নির্দ্দোষ এবং ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া উদ্ধৃত ও গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের কর্দ্দমভাগ মাত্র যাহাদের আদর্শ এবং সমাজের অপকৃষ্ট অংশমাত্র যাহারা অবলোকন করিয়াছে, তাহারাই ঐরূপ দোষ সামাজিক সর্ব্ববস্তুতে আরোপ করিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদ হইতে অনেক দোষ উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্বীকার্য্য; আলোক এবং অন্ধকার পরস্পর বিরোধী হইলেও একাধারে থাকে, ও তাহার কখন অন্যথা হয় না; সেই অন্ধকার আপন নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া আলোকের অধিকৃত স্থান এবং ক্রমান্বয়ে তাহার মূলভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে কি না, যদি না করিয়া থাকে সে অন্ধকার অনিষ্ট জনক নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মমূল আশ্রয়ে পোপীয় ধর্ম্ম যদ্রূপ, এবং পোপদিগের মধ্যে ষষ্ঠ আলেকজণ্ডার যদ্রূপ, বৈদিক অদ্বৈতবাদের সহ কৃষ্ণের ব্রজ বিহারের বর্ণনভাগের নিকৃষ্ট অংশ ও আধুনিক গোঁসাইজীর সেই সম্বন্ধ। কৃষ্ণ প্রণয় ও ভক্তি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ভাবও যদৃচ্ছা দৃষ্টি করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদৃচ্ছা উল্লেখ যথা—

"তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ ক্ষীণপুণ্যচয়াসতী।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখ বিলীনাশেষ-
পাতকা ॥১৪
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্ম স্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপ-
কন্যকা ॥"১৫

বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩

পুনশ্চ মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩৪৬ অধ্যায়ে

"সমাহিতমনস্কাস্ত নিয়তাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
একান্তভাবোপগতা বাসুদেবং বিশন্তি-
তে ॥"

পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের দ্বারা অদ্বৈতবাদ যুক্তিসহকারে বারম্বার দূষিত হইলে, বেদান্ত ভাগ পরায়ণ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বাপর সংযোগ বিহীন করিয়া শ্রুতির খণ্ড শ্লোক সমূহ উদ্ধৃতপূর্ব্বক, শ্রুতির দ্বৈতমত প্রতিপাদন করিয়া, অদ্বৈতবাদিত্বার দোষ সেই অদ্বিতীয় এবং অসাধারণ ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের উপর আরোপ করিয়া থাকেন। ইহা কেবল শ্রুতির মান অন্যথাভাবে রক্ষার্থে হইয়াছে। পুরাণ বিশেষেও উক্তরূপ উপায়ে—যদিও শঙ্করের উপর দোষ চাপাইয়া না হউক—অদ্বৈতবাদকে দূষিয়াছে, যথা পদ্মে

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকং।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশ-
কারণম্॥"

শঙ্করাচার্য্য আরও নূতন নূতন যুক্তির দ্বারা অদ্বৈতবাদের সম্প্রসারণ করিয়াছেন মাত্র। শঙ্করের পর হইতেই বেদান্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সন্ন্যাসধর্ম্ম ভিন্ন গত্যান্তর নাই, এইরীতি, কিন্তু প্রাচীনকালে তাহা ছিল না। এ বিষয় পূর্ব্বেই একবার উক্ত হইয়াছে যে উহা সাধকের ইচ্ছাধীন ছিল। সন্ন্যাসভাবে ইচ্ছা কদাচিৎ কাহার হইত, এবং অধিকাংশ গৃহস্থ আশ্রমে থাকিতেন বা সময়কালে তৎকার্য্য অনুষ্ঠানে

বিমুখ ছিলেন না। রামায়ণে ১।৩৩ "ঊর্দ্ধ রেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ" ও, লঙ্কাসমুদিতা ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।" চূলী নামক জনৈক ব্রহ্মর্ষি সোমদা নামক গন্ধর্ব্ব কন্যা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ সেই প্রাচীন কালের যে কোন ব্রহ্মর্ষির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, সকলেই গৃহধর্ম্ম যুক্ত। ব্রহ্মর্ষিদিগের অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা রামায়ণ ও তদ্রূপ অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, যদি এরূপ প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থে কথিত না থাকিত তবে কাব্যে কাব্যাংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে। এ বিশ্বাস বোধ হয় এরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।—যোগশাস্ত্রের যেরূপ প্রকৃতি এবং সাধনের উপায় যেরূপ তাহাতে সিদ্ধ হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত, যাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত তাহা স্থূল বুদ্ধিতে অসাধারণ ও অলৌকিক, অসাধারণ ও অলৌকিক হইলেই তাহার তদ্বৎ ক্ষমতা আছে, এবং যে সিদ্ধ হইবে সে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু কেহ সিদ্ধও হয় নাই, বিশ্বাস্য বিষয়ও আকাশ-কুসুমবৎ রহিয়া গিয়াছে। যদি বা কেহ কোন ঘটনা ক্রমে সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইতেন, তপোবলক্ষয়রূপ পরিণাম হেতু তাঁহারা সেই অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন না, এইরূপ কল্পিত হেতু দ্বারা বিশ্বাস অচল থাকিত। বর্ত্তমান সন্ন্যাসী দিগের অলৌকিক ক্ষমতায় সাধারণের যেরূপ বিশ্বাস তাহা উপর্য্যুক্ত বাক্যের সহ তুলনা করিলেই প্রতীত হইবে। এ জগতে বিশ্বাস এইরূপ!—ইতি যোগ শাস্ত্র।

প্রস্তাব অসমাপ্ত।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রজনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হীরালাল, জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।" আমি বলিলাম "না।" হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে, যে তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ; আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ।

আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে।" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরবে রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষ রাত্রে, হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল "নাম—আসিয়াছি।"—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পরে, শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল "দে নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ।" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন, কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি! আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাঁহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম; রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও তোমার কাছে কোন উপকারও পাইতে নাই—রাত্র প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হী। দেখা পেলে ত? এ যে চড়া! চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণেই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে—কত দূরে, কোন দিকে কথা কহিতেছে তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন দিক্, কতদূরে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া, জলে নামিয়া সেই দিগে ছুটিলাম—ইচ্ছা নৌকা ধরিব। গলা জল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব। কাতর হইয়া বলিলাম, "বাবু আমার কি উপায় করিবে না? আমাকে কি এইখানে মরিতে হইবে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে অদ্য বিবাহ কর।" কাতরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি অন্ধ ভার্য্যা লইয়া কি করিবে?"

হীরালাল বলিল, "বাবুদিগের টাকা-

গুলি গনিয়া লইব। তার পরে, তোমায় পরিত্যাগ করিব। তখন তুমি অন্যকে ভজনা করিতে পারিবে; আমি কিছু বলিব না।”

আর সহ্য হইল না। তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম হীরালাল এই দিকে, এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া, কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিঃক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। “খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে!” বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক—সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল—সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য, অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে সে শাসাইতে লাগিল, যে আবার খবরের কাগজ করিয়া, আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে। আমি একটু ভীত হইলাম—কেন না আর্টিকেল কাহাকে বলে, তাহা তখন জানিতাম না; মনে করিলাম কোন পৈশাচিক মন্ত্র তন্ত্র হইবে, তাহার বলে আমি এই চরে মরিয়া, পচিয়া, পড়িয়া থাকিব—শৃগাল শকুনিতে আমাকে ভক্ষণ করিবে। এখন শুনিয়াছি, তাহা নহে; হীরালাল যে আশ্চর্য্য ভষায় তৎকালে গঙ্গা পবিত্র করিতেছিল, তাহারই অনুবাদ বিশেষকে আর্টিকেল বলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী, একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া, গঙ্গার কল কল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই। কেন আসিস্—কেন থাকিস্ কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্র বাবু, একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে, —যে নিয়মে জলবুদ্বুদে, ভাসে, হাসে, মিলায়, যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখ দুঃখময় মনুষ্য জীবন আরব্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া ঐ নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শিকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীট সকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক প্রাণত্যাগে! ধিক প্রণয়ে, ধিক মনুষ্য জীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না?

জীবন অসার—সুখনাই বলিয়া, অ-

সার, তাহা নহে। শিমুল গাছে শিমুল ফুলই ফুটিবে তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এইজন্য, যে দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছু নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না—সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল বৃক্ষ হইতে পারিবে কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ হইবে। পরের অন্তঃকরণ মধ্যে পরে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয়জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে, যে অন্ধ পুষ্পনারীর দুঃখ বুঝে? কে এমন জন্মিয়াছে যে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখ দুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ দুঃখ? হাঁ সুখও আছে। যখন চৈত্রমাসে, ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সৌরভি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীতব্যবসায়িনীর অট্টালিকাহইতে বাদ্যনিক্কণ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে?—যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল—জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুজি" বলিত, তখন, আমার মনে কত সুখ উছলিত তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ, যে আমার যে কি দুঃখ তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও, সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্য ভাষাতে তেমন কথা নাই—মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে যে, তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময়ে দেখিবে, যে দুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কি দুঃখ তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি? ইহা

কি সামান্য দুঃখ? সাধ করিয়া বলি জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না? এই ত কলনাদিনীগঙ্গাতরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি —আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন? এজীবন রাখিয়া কি হইবে? মরিব!

আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত, শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভাল বাসিলাম কেন? ভাল বাসিলাম তবে তাঁহার কাছে রহিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসার স্রোতে, অজ্ঞাত পথে ভাসিয়া চলিলাম? এসংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এসকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন পাপে আমি জন্মান্ধ?

দুই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব। গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভাল বাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল। অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল। আমি ডুবিলাম!

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত, আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

মরিলেই ভাল হইত। তাহার পরে, জীবন পাইয়া যে ভয়ানক কথা শুনিলাম, তাহা শুনার অপেক্ষা, মরাই ভাল ছিল। একদিন শুনিতে হইল, যে হীরালাল কলিকাতায় গিয়া শচীন্দ্রের সাক্ষাতে বলিয়াছিল যে আমি তাহার প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(শচীন্দ্র বক্তা)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিতের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শু-

নিলাম যে রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম—শপথ করিতে পারি সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই, কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া, বিবাহাশঙ্কায়, গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুটি আপত্তি; প্রথম, যে অন্ধ, সে কিপ্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া, মনে করি জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপিগূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম, যে রাত্র হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্র হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, যে হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী; কাণা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছু দিন পরে হীরালাল দেখাদিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?" সে বলিল "জানি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় সে?" সে বলিল, "জানিলে আমি বলিব কেন?" সে কিছু সন্ধান বলিল না, কিন্তু এক প্রকার বলিল, যে রজনী তাহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া, তাহার সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কি করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার দাদাকে বলিলাম। দাদা বলিলেন, "রাস্কালকে মার।" আমারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু আমার একটু সন্দেহ ছিল। আমার মধ্যে২ বোধ হইতেছিল, হীরালালের সকল কথাই মিথ্যা। কেবল বড়াই। হীরালালও ইঙ্গিতে ভিন্ন স্পষ্ট কিছু বলে নাই। আমি সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দে-

খিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষুঃ—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতা বশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলী পত্রের ন্যায় গৌর; গঠন, বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত; মুখকান্তি গম্ভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল, মৃদু, স্থির, এবং অন্ধতা বশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচ জ্ঞাপক; হাস্য, দুঃখময়। সচরাচর, এই স্থির প্রকৃতি সুন্দর শরীরে, সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্য্য পটু শিল্পকরের যত্ন নির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, যে এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। হীরালালের কিরূপ মন বলিতে পারি না, কিন্তু সে বিশ্বাস আমার আজিও আছে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখন পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না, কেন না সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে সে ইতর প্রকৃতিবিশিষ্টা নহে। ইতর লোক ভিন্ন, তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহ কর্ম্মের জন্য, যে ভার্য্যার অন্ধতা নিবন্ধন গৃহ কর্ম্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতরলোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টককাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের ন্যায়, এই রজনীর পুষ্প বিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মার দৌরাত্ম্য বড়, তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এ কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা

আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষ বর্ষিণী হইবে, বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহ্লার রাও হুল্কারের প্রপরাপ সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপ ভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী; আদরে সত্যভামা, এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে, হুঁকায় কলিকা আছে কি না বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চাম্‌চে পূরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালীর অনুসন্ধানে চার পাত্র মধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিকদানিতে টাকা রাখিয়া বাক্‌শের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না খবর লইবে, নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিহাইনের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে, ফুলোল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে, হৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, কাহাকে আদর করিয়া বাছা বলিতে শ্যালী না বলি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমত কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ও কে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা, এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

ভালবাসার অত্যাচার।

লোকের বিশ্বাস আছে, যে কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য শূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই, অত্যা-

চার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে; আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তাহাতে তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে, যে ভালবাসে সে, যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গল জনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমতাবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যে তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী এই জন্য, যে তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তা স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার: যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন। যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে, যে সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ইহা পারেন না বা করেন না। কেবল এক সমাজ, অপর প্রণয়ী, এই দুই জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন২ পূর্ব্ব পণ্ডিত ধত্নবান্ হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচার দক্ষতা, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত

আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে নাই। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথ কৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে, কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, বিশু দত্ত বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ; কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনি-কন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না, বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দু সমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ, নব বঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্ত্তব্য, যে কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাইহউক, মনুষ্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন করে। কালে, এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায়, সামাজিক অত্যাচার; এবং সকলাবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয় পীড়ন কাহারও অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে,

যে রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্ব্বক্ষণ, সকল কাজে আসিয়া হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহাই বলা যাইতে পারে। আর, অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিস্কৃতি নাই—কেন না ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাঁটার বাটি দেখিলে কখন২ লাল ফেলিয়া থাকেন বটে কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংস ভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজী পরলোক গোলোক প্রাপ্ত হইবে।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড় পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে, মনুষ্য জীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচার ও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজ বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্য জীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যে রূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তিপ্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেননা অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানের ও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষ বাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্য হৃদয় সাগরে অনন্ত ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতা শূন্য হয়, তবে তাহাই ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ, যে স্বার্থপরতা শূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে২ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেন্ না পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শন মাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র মুখ দর্শন সুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল; সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শন জনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শন জনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখ দর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্য দুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে, মাতা স্বার্থপর, কেন না আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ; প্রণয়ী, প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্ত সুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয় সুখের অভিলাষী এইজন্য লোকে এইরূপে স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতেই হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য, স্নেহ মনুষ্য হৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষলাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্য স্নেহ অদ্যাপিও পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য দাম্পত্য ব্যতীত, পরস্পর প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্র মুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয় জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে অস্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা, এই রূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায়, ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথাও বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন।

অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূল সূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়; দ্বিতীয়টি পর সম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পর সম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত, এই মহানীতি তত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিত নীতি এবং আত্ম আত্মসংস্কার নীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিত রতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতি শাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই, ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন, তাঁহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত, যে আমি কেবল আপন সুখের জন্য, হস্তক্ষেপণ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যত টুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না।

উদাহরণ স্বরূপ, দশরথ কৃত রাম নির্ব্বাসন, মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এ স্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়া ছিল। সত্য বটে পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা, স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ, সত্য পালনার্থ রামকে বন প্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্য পালনার্থ আত্ম প্রাণবিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রবিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশোকীর্ত্তন পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্য মাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ, দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদ্‌কে বিনা দোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেন না, সত্য নিত্য ধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর, যে যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক তাহাই কর্ত্তব্য; যাহা তাঁহার তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্ট কারক তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূল সূত্র

সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল, ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম সংস্কার নীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিয়া অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্য ভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে, যে সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্য পালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্য পালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতা শূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষা রূপ সার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশঃপ্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা দোষযুক্ত যে অনিষ্ট তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যত দিন না, সর্ব্বজনীন প্রেম স্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

অধঃপতন সঙ্গীত।

১

বাগানে যাবিরে ভাই? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন, সরোবর তীরে।
যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি, গোলাব মল্লিকা জাতি,
বিগোনিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে॥
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিরণে সাজি,
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকর লেখা তাহে, বিজলি চমকে॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরী গণে,
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি, আবেশে কাঁপিবে মাটী,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥
খিনিখিনিখিনিখিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
তাদ্রিম্ তাধ্রিম তেরে, গাওনা বাজনা।
চমকে চাহনি চারু ঝলকে গহনা॥

৩

ঘরে আছে পদ্মমুখী, কভু না করিল সুখী,
শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে?
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত,
একা বসি ভাল বাসা, ভাল লাগে কারে?
গৃহধর্ম্মে রাখে মন, হিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই।
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে?
ঢুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায় রাতে,
সুখের নিশান গাড় প্রমোদ ভবনে।
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ্ সুপ কারি কোর্ম্মা, করিবে বিচিত্র।
বাঙ্গালির দেহ রক্ত, ইহাতে করিও যত্ন
ইংরেজ পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র॥
গঠিত ইংরাজি ছাঁচে, আমার চরিত্র॥

৫

বন্দ মাতঃ সুরধুনি, কাগজে মহিমা শুনি
বোতল বাহিনী পুণ্যে, একশ নন্দিনি!
করি ঢক ঢক নাদ, পূরাও ভকত সাধ,
লোহিতবরণি বামা, তারেতে বন্দিনি!
প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কীরিটি শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে, যকৃত জননি!
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য
শয্যায় পতিত নাথ, পতিতপাবনি!
বাক্স বাহনে চল, ভজন ভজনি॥

৬

কিছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্ ভন্ চাকরি কাঁটালে।
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘুটি তুলি দেখিলে কাঙ্গালে॥
শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারী ফকিরে।
বল যত রোখ তত, বাঙ্গালি শরীরে॥

৭

পূর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার?
দেশের মঙ্গল চাও? কিসে তার ত্রুটি পাও?
লেক্চরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার॥

ইংরেজের নিন্দাকরি, আইনের দোষ ধরি,
সম্বাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায় ।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায় ?

৮

করেছি ডিউটিরকাজ, বাজাভাইপাকোয়াজ
কামিনি গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে ।
গেলাস পুরে দে মদে, দে দে আর আর দে,
দে দে এরে দে ওরে দে, ছড়ি দে সারঙ্গে ।
কোথায়ফুলেরমালা? আইস্‌দেনা? ভালজ্বালা।
"বংশীবাজায়চিকনকালা?" স্বরদাওসঙ্গে ।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে ।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রুভঙ্গে ॥

৯

যেভাবে দেশের হিত, নাবুঝি তাহার চিত্ত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে ।
নাজানি দেশবা কার ? দেশে কারউপকার?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে ?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশহিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী !
ঢাল মদ ! তামাক দে ! লাও ব্রাণ্ডি পানি ।

১০

মনুষ্যত্ব ? কাকেবলে? স্পিচদিই টৌনহলে,
লোক আসে দলেদলে, শুনে পায়প্রীত ।
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছি শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশহিত ?
ইংরেজিবাঙ্গালাফেঁদে, পলিটিক্‌সলিখিকেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে ।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালিদিই অষ্টেপৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে ?
নিপাত যাউক দেশ ! দেখি বসি ঘরে ॥

১১

হাঁ ! চামেলি ফুলিচম্পা ! মধুর অধরকম্পা !
হাম্বীর কেদার ছায়া, নট মহাসুর !
হুক্কা না তুরন্তবোলে ! সেরমেফুলনাডোলে !
পিয়ালা ভর দে মুঝে ! রঙ্‌ ভরপুর !
সুপ্‌চপ্‌ কটলেট্‌, আন বাবা প্লেট প্লেট,
কুক্‌ বেটা ফাষ্টরেট, যত পার খাও !
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমী নিয়ে,
জনমি বাঙ্গালি কুলে, সুখ করে যাও ।
পতিত পাবনি সুরে, পতিতে তরাও ॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয়সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে ?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে ?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে,
মুন্সেফি চাপ্রাশি কিম্বা ডিপুটিপিয়াদা ।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাস লয়ে,
খোষামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা !
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি,
মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জ্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাকি ?
কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাকি ?

১৩

ধর তবে গ্লাস আঁটি, অনন্ত বিষের বাটী
শুন তবলার চাটি, বাজে খন খন্‌ ।
নাচে বিবি নানাছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঁকার গর্জ্জন ॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,

অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ?
ধরিতে মনুষ্য দেহ, নাহি করে লাজ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপগুণ সব তার,
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ!
হা ধরণি কোন পাপে, কোন বিধাতার শাপে,
হেন পুত্রগণ গর্ভে, করিলে ধারণ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পারাবারে,
ছিল না কি জলরাশি? কে শোষিল নীরে?
আপনা ধ্বংসিতে রাগে, কতই শকতি লাগে,
নাহিকি শকতি তত, বাঙ্গালি শরীরে?
কেন আর জ্বলে আলো, বঙ্গের মন্দিরে?

১৫

মরিবে না? উঠ তবে, ভাই ভাই মিলি সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, অজেয়, অতুল!
ছাড়ি দেহ খেলা ধূলা; ভাঙ বাঁদাভাও গুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্ত্তকীর কুল।
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল, পুকুরের তলে
সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখসার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে,
যত দিন রবে দুঃখ, এ বঙ্গ মণ্ডলে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিত্তবিনোদ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। বর্দ্ধমান অর্য্যমা যন্ত্রে প্রোপ্রাইটর শ্রী হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৭৪ সাল। মূল্য ॥৵ দশআনা।

এই কাব্য খানি ভালও নহে, মন্দও নহে সুতরাং ইহার বিস্তৃত সমালোচন সম্ভব নহে। তবে পাঠ করিতে করিতে দুই পংক্তি পাওয়া গেল তাহাতে বাস্তবিক চিত্ত বিনোদ কোন কোন সময়ে হইতে পারে। যথা

গঙ্গাজল-বিসর্জ্জিত-শরমাৎসাস্বাদে প্রহৃষ্ট জম্বুকগণ হোকা হোকা নাদে।

কবি মধুসূদনের অনুকরণে সেনাগম বর্ণন করিয়াছেন; অনুকরণ প্রায়ই হাস্যরসোদ্দীপক হইয়া থাকে, নিম্নোদ্ধৃত অংশে সে রূপ হয় নাই, প্রশংসার কথা বটে।

সিন্ধুসহ দ্বন্দী বায়ু দ্বন্দ্ব আরম্ভিলে
ভৈরব কল্লোল নাদ উদ্ভবে যেমন,
তেমনি বিক্রান্ত সৈন্যকুল কোলাহলে,
ঘোরতর বাদ্যনাদে পুরিল কানন—
ভূমি, আচম্বিতে। যেন, সে নিনাদে মাতি
শব্দবাহ, উল্লঙ্ঘিয়া উঠিল আক্রোশে,
অন্তরীক্ষে, অভ্রপুঞ্জে দিতে রে গঞ্জনা।
রুষিয়া অম্বুদবৃন্দ, গম্ভীর নির্ঘোষে—
আবরিল নভঃস্থল, ভীষণ অশনি—
নাদে কম্পে বিশ্বস্তর। শঙ্কায় শশাঙ্ক
লুকাইল, তমোরাশি, গ্রাসিল কৌমুদী।

কোম্‌ত দর্শন।

কোম্‌ত দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় প্রধান প্রধান মতগুলি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কোম্‌ত কেবল দার্শনিক নহে, তিনি একজন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক। এই প্রবন্ধে আমরা তদীয় positive philosophy অর্থাৎ "প্রামাণিক দর্শনের" স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিব।

কোম্‌ত বলেন, যে, জগৎকার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্য সমাজে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়া থাকে; প্রথম, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছা মূলক; দ্বিতীয়, দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক; তৃতীয়, বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। সকল বিষয়ের জ্ঞানেরই উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে এই তিনটী সোপান আছে।

লোকে যখন প্রথমে বিশ্ব ব্যাপার বুঝিতে যায়, তখন প্রত্যেক কার্য্যের একটি একটি সচেতন ইচ্ছা বিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। আমাদিগের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইতে হইতেই আমরা জানিতে পারি যে আমরা যে সকল কার্য্য করি, সে সকল আমাদিগের সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতেই সমুদ্ভূত। এ নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় যেখানে যে কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানেই সচেতন ইচ্ছা বিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। এই কারণেই শিশুগণ গতিবিশিষ্ট বা কার্য্যকারী নির্জীব পদার্থদিগকে সজীব জ্ঞান করে। এই কারণেই প্রাচীনকালে মানবগণ প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহে, ক্ষুব্ধ সিন্ধুসলিলে, তিমির বিনাশী দিবাকরে, গৃহ কাননগ্রাসী অনল রাশিতে, বিদ্যুজ্জ্বালা শোভিত বজ্রগর্জ্জনে, দেবতা দেখিতেন।

এইরূপে পুরাকালে পুরাণবর্ণিত বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক বলা গিয়াছে; আর প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছা বিদ্যমান দৃষ্ট হইত বলিয়া, পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কালে কালে যত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, ততই লোকে জানিতে পারে যে পূর্ব্বে যে সকল পদার্থকে সচেতন বিবেচনা করিয়াছিল, চৈতন্যের পরিচায়ক লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই। তখন তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে কার্য্য সাধন হয় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া, স্থিরীকৃত হয় যে তাহাদিগের অন্তর্নিহিত

কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। এ প্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। ইচ্ছার চৈতন্যাংশ বাদ দিলে, কার্য্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কি থাকে? কিন্তু এতদ্দ্বারা কি কোন কার্য্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়? আদিমাবস্থায় লোকে ভাবে, অগ্নি দেবতা, আমাদিগের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তুনিচয় ধ্বংস করেন; দ্বিতীয়াবস্থায় লোকে কল্পনা করে যে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে তাহাতেই পদার্থ সকল দগ্ধ হয়। কিন্তু অগ্নিতে পদার্থ নিচয় দগ্ধ হয়, এতদতিরিক্ত কি জ্ঞান দাহিকাশক্তির নিকটে পাওয়া গেল? যখন পৌরাণিক মতে অনাস্থা জন্মিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভ হয়, তখন ঈদৃশ শক্তিসকল বহুল পরিমাণে কল্পিত হয় বলিয়া, জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপানের নাম দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তি মূলক রাখা হইয়াছে।

পরিণামে অনেক দেখিয়া শুনিয়া লোকে অবগত হয় যে সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এই রূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা কোন বিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কার্য্যসাধিকা শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই তখনই আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই। নিয়মই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য, এবং বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায়। এ নিমিত্ত জ্ঞানের চরম সোপানের নাম বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক, বা নিয়মমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

কোম্‌ত বলেন যে বিশ্বমণ্ডলের সকল বস্তুই নিয়মের অধীন। আকাশে যে ধূমকেতু কখন কখন দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয়, সকলই নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে থাকে, নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ বিরাজিত, মনুষ্য সমাজে যখন যে ঘটনা ঘটে, সকলই নিয়মের অধীন। উল্কা ছুটিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, পাখী উড়িতেছে, মৎস্য সন্তরণ করিতেছে, মানব সন্তান হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, গাইতেছে, সমাজ বিশেষের উদয়, উন্নতি বা বিলয় হইতেছে, সকলই নিয়মানুসারে। কিন্তু কোম্‌ত যদিও নিয়ম-ভক্ত, তথাপি তিনি অদৃষ্টবাদী নহেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি অদৃষ্টবাদ দোষ যে আরোপিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ যখন কোন প্রকার কার্য্য ইচ্ছার অধিকার হইতে নিয়মের অধিকারে আইসে, নিয়মের স্থৈর্য্য ইচ্ছার অস্থিরতার সহিত তুলনায় এত অবিচলিত লক্ষিত হয়, যে অদৃষ্টশাসনবৎ প্রতীয়মান হইবারই কথা। প্রথমে গগনের জ্যোতিষ্ক গণের গতি হইতে নৈসর্গিক নিয়মের যে প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেও এইরূপ ভ্রান্তি হইবারই

সম্ভাবনা; যে হেতু যত কেন ইচ্ছা করি না, আমরা তাহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহি। যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী অপরিবর্ত্তনীয়, তথাপি জ্যোতিষাধিকার-বহির্ভূত জগৎ কার্য্য সকল অনেক দূর পরিবর্ত্তনীয়। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিবিধ প্রকার জীব, এবং সামাজিক ঘটনা, কত দূর মনুষ্যের ক্ষমতাধীন, প্রতি দিনই দৃষ্ট হইতেছে।* যদিও নিয়মানুসারে সকলই ঘটে, তথাপি ইচ্ছানুসারে তাপ তড়িৎ প্রভৃতি কমাইয়া বাড়াইয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করিয়া, জীববিশেষকে কার্য্য বিশেষে নিয়োগ করিয়া, কোন রূপ সমাজ সংস্কার কার্য্যের সূচনা করিয়া অভিমতানুরূপ সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মানবগণ জগতে কত প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছে।

কোম্‌ত যদি ও বিবেচনা করেন যে জগৎ কার্য্য এবং তদীয় নিয়ম এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার অধিকার আমাদিগের নাই, যদিও তিনি বলেন জগতের মূলকারণ ও চরম লক্ষ্য অপরিজ্ঞেয়, তথাপি তিনি নাস্তিক নহেন। তাঁহার মতে নাস্তিকেরা অজ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত; তাহারা জগতের উৎপত্তি, জীবের উৎপত্তি, প্রভৃতি অনন্তুসন্ধেয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। তিনি কহেন যে, যদি নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত জগৎকার্য্য শৃংখলসমুৎপাদক গূঢ় কারণের তত্ত্বানুসন্ধান কর, তাহা হইলে তন্নিহিত বা তদ্বহিঃস্থ ইচ্ছাবিশেষ কল্পনা করা যেমন সঙ্গত এমন আর কিছুই নহে; কারণ এরূপ অনুমান দ্বারা আমাদিগের কার্য্যসম্ভবা ইচ্ছার সহিত তাহার সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। দার্শনিকশিক্ষাজনিত অহংকার না থাকিলে, কেহই এমন সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাইত না; এবং যত দিন না লোকে নির্ব্বিকল্পক সত্যানুসন্ধানের নিষ্ফলতা বুঝিয়াছিল, ততদিন এই ব্যাখ্যাতেই মনুষ্যবুদ্ধি সন্তুষ্ট ছিল। কোম্‌তের বিবেচনায় প্রকৃতির পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহ অনেক দোষ আছে; কিন্তু সচেতন ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এ অনুমানটি যেমন সঙ্গত, অচেতন যন্ত্রবাদ তেমন নহে। সুতরাং তিনি বলেন যে নাস্তিকেরা পৌরাণিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিহীন; কারণ তাহারা পৌরাণিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অথচ তদুপযোগী অনুসন্ধান প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছে।*

---

* See General view of Positivism translated from the French of Auguste Comte by J. H. Bridges, Pages 57 and 58.

*" If we insist upon penetrating the unattainable mystery of the essential Cause that produces phenomena, there is no hypothesis more satisfactory than that they proceed from Wills dwelling in them or outside them; an hypothesis which assimilates them to effect produced by the desires which exist within ourselves. Were it not

কোম্‌ত প্রকৃতির পদ্ধতিতে কিরূপে দোষারোপ করেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার চক্ষে যাহা দোষ বলিয়া লাগে, তাহাই কি প্রকৃত দোষ? বিজ্ঞানবিৎ ও বহুদর্শী হইয়া তিনি কি প্রকারে এরূপ অযৌক্তিক মত প্রচার করিলেন? আমরা জগতের একদেশ মাত্র দেখিতেছি, তদুপযোগী যাহা লক্ষিত না হয়, সমুদয় বিশ্বমণ্ডল সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্বের আবশ্যকতা নাই, আমরা কি সাহসে বলিব? যদি বলিতে যাই, তাহা হইলে কি আমরা ধরিয়া লই না যে আমরা সকল বস্তুর বা প্রাকৃতিক কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য জানি? যাহারা বিবেচনা করে যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কার্য্যে দোষারোপ করিয়া কি কোম্‌ত তাহাদিগের দলে পড়িতেছেন না?

জগতীস্থ সমস্ত ব্যাপারই যে নিয়মের অধীন, কোম্‌ত যদিও এ মতের প্রতিপোষক অনেক কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংস্থাপক নহেন। বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিৎ সমাজে এমতটী চলিয়া আসিতেছে; এবং বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক একটী নৈসর্গিক নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া ইহার এক একটী মূল; এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত্নে ইহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গালিলিও গতির নিয়ম, এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গগনমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণ নিয়ম শৃংখলে বদ্ধ। লাভইসর, ডেবি, ফ্যারাডে, ড্যালটন প্রভৃতির যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে যে পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত বিযুক্ত হয়। বিষা (Bichat), গল (Gall) প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে শারীরিক যন্ত্র নিচয়ের কার্য্য সকলও নিয়মের অধীন। অর্থশাস্ত্রবিৎ, নীতিশাস্ত্রবিৎ এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা সামাজিক ঘটনা সমূহের নিয়ম পর-

---

for the pride induced by metaphysical and scientific studies it would be inconceivable that any atheist ancient or modern should have believed that his vague hyphothesis on such a subject were preferable to this direct mode of explanation. And it was the only mode which really satisfied the reason, until men began to see the utter inanity and inutility of all search for absolute truth. The order of Nature is doubtless very imperfect in every respect; but its production is far more compatible with the hyphothesis of an Intelligent Will than with that of a blind mechanism. Persistent atheists therefore would seem to be the most illogical of theologists, because they occupy themselves with theological problems and yet reject the only appropriate method of handling them. General view of Positivism p. 50.

তত্ত্বজ্ঞ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই রূপে বিজ্ঞানবেত্তৃদলে এই সংস্কারটী দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত, নির্জ্জীব ধূলীকণা হইতে যুক্তিশালী মনুষ্য মনের চিন্তা পর্য্যন্ত, সমুদয় বিশ্ব ব্যাপারই নিয়মের অধীন।

আমরা জগৎ কার্য্য সম্বন্ধে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বন করি এমতটীও সম্পূর্ণ রূপে নূতন নহে। হিউম্ এবং তুর্গোর গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যায়। [See Hume's Natural History of Religion and Turgot's Sur les Progres successifs de l'esprit humain] কিন্তু কোম্‌ত যেরূপ নানা প্রকার ঘটনার ব্যাখ্যা এতদ্দ্বারা করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহই করেন নাই; এবং ইহার কীদৃশ বহুবিস্তীর্ণ প্রয়োগস্থল আছে, আর কেহই বিশদ রূপে বুঝিয়া ছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং সম্পূর্ণ রূপ নূতন না হউক কোম্‌ত যে ইহাকে অনেক নূতনত্ব দিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং এক প্রকার যে তিনি ইহার প্রকাশক নামের অধিকারী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পিথাগোরস্ এবং আর্য্যভট্ট যদিও পূর্ব্বকালে একথা কহিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্নিকস এতৎ সংক্রান্ত প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষিক মত সংস্থাপক রূপে পরিগণিত, তদ্রূপ জ্ঞানোন্নতি বিষয়ক সোপানত্রয়ের আভাস হিউম্ এবং তুর্গোর লিখিত প্রবন্ধে লক্ষিত হইলেও কোম্‌তকে উহার সংস্থাপক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জ্ঞানানুশীলনের প্রারম্ভ সময়ে সমুদায় বিজ্ঞান শাখার সমান অবস্থা ছিল; সর্ব্বত্রই পৌরাণিক ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইত। কিন্তু সমকালে সকল শাখা সমান উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কোনটা বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে, কোনটা দার্শনিক সোপানে; কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে। কোম্‌ত্ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। বিষয়ের জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা দার্শনিক, কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই আছে। এইরূপে দৃষ্ট হয় যে একই ব্যক্তির কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মত, কোন বিষয়ে দার্শনিক মত, এবং কোন বিষয়ে পৌরাণিক মত। জাতিভেদেও ভিন্ন ভিন্ন ফল লক্ষিত হয়। যে বিষয়ে জাতিবিশেষের বৈজ্ঞানিক মত, তদ্বিষয়েই জাত্যন্তরের দার্শনিক বা পৌরাণিক মত। এই প্রকারে সংসারে অনেক মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমে যেমন সকল বিষয়ে পৌরাণিক ব্যাখ্যা গৃহীত হইত বলিয়া লোকসমাজে ঐকমত্য ছিল, পরিশেষে কোম্‌তের বিবেচনায় বিজ্ঞান দ্বারা তদ্রূপ একতা সংস্থাপিত হইবে। যে সকল শাস্ত্র সম্যকরূপে বৈজ্ঞানিক

পদ পাইয়াছে, পণ্ডিত সমাজে তাহাদিগের সম্বন্ধে মতভেদ অত্যল্পই দেখা যায়; যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাও বিষয়ের জটিলতার ফল। ক্রমেই বিজ্ঞানের অধিকার বাড়িতেছে, এবং দর্শন ও পুরাণের অধিকার কমিতেছে। সুতরাং এরূপ আশা করা অন্যায় নহে, যে কালক্রমে বিজয়ী বিজ্ঞানের রাজ্য সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র ঐকমত্য বিধান করিবে।

ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সাধারণতঃ কোম্‌তের মতের সত্যতা অনেক দূর দেখা যায়। জ্ঞানবিভূষিত ইউরোপ খণ্ডে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; কিন্তু শারীরতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের অনেকাংশ দার্শনিক বা পৌরাণিক সোপানে রহিয়াছে। এতদ্দেশে কেহ চন্দ্র সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন, কেহ তাহাদিগকে জড় বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের শুভাশুভ ফল বিধায়িনী শক্তিতে প্রত্যয় স্থাপনা করেন, এবং কেহ বা তাহাদিগের আকার, গতি প্রভৃতি জানিয়াই সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষে জল প্রথমে বরুণ দেবের আবাস বলিয়া গণ্য হইত; পরে স্নেহশক্তি সম্পন্ন বলিয়া তাহার কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা হইত; এক্ষণে উদজান ও অম্লজানের সমষ্টি বলিয়া উহা শিক্ষিত সমাজে পরিগৃহীত। অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা ছিলেন, পরে দাহিকা শক্তিশালী বলিয়া দহননিপুণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে রাসায়নিক কার্য্য বিশেষের ফল বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু ভাল করিয়া কোম্‌তের মত বুঝিতে হইলে তদীয় বিজ্ঞান বিভাগের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি বলেন যে বিজ্ঞান সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ মুখ্য বা সামান্য এবং ২ গৌণ বা বিশেষ। সম্ভব স্থল মাত্রে খাটিবে, এরূপ নিয়মাবলীর আবিষ্কার করা মুখ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং এই সকল নিয়ম দ্বারা বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।* সুতরাং জানা যাইতেছে যে শারীরতত্ত্ব মুখ্য বিজ্ঞান, কিন্তু উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান; রসায়ন মুখ্য বিজ্ঞান, এবং খনিজবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান, ইত্যাদি। প্রত্যেক গৌণ বিজ্ঞানে অনেকগুলি মুখ্য বিজ্ঞানের সাহায্য লাগে। উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে কেবল শারীরতত্ত্ব জানিলে চলিবে না। উদ্ভিদ্ এবং জীবদেহে তা-

* "We must distinguish between the two classes of Natural science:—the abstract or general which have for their object the discovery of the laws which regulate phenomena in all concievable cases; and the concrete, particular, or descriptive, which are sometimes called Natural science in a restricted sense, whose function it is to apply these laws to the actual history of existing beings."—Positive Philosophy, freely translated and condensed by Harriet Martineau

পাদির কার্য্য বুঝিতে পদার্থতত্ত্ব, পুষ্টি সাধনাদি বুঝিতে রসায়ন, এবং বর্ত্তমান জীবোদ্ভিদ্‌গণের সংস্থান ও গুণ সকল বুঝিতে মনুষ্যপ্রভাব প্রকাশক সমাজতত্ত্ব জানা আবশ্যক। এইরূপ খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, রসায়ন, পদার্থ তত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব জানা চাই। পাথুরিয়া কয়লাও একটি খনিজপদার্থ, কিন্তু পদার্থতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব না জানিলে কে উহার প্রকৃতি এবং উপাদান প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারে?

মুখ্য বিজ্ঞানদিগকে আবার পরস্পরের সাপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কোম্‌ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমস্থান তিনি গণিতকে দিয়াছেন; কারণ ইহার বিষয় সংখ্যা, বিস্তৃতি ও গতি, এবং এ সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার মতে, জ্যোতিষ দ্বিতীয় স্থানের যোগ্য, কারণ ইহাতে গাণিতিকতত্ত্বাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মাত্র লইতে হয়। তৃতীয় স্থান পদার্থতত্ত্বকে প্রদত্ত হইয়াছে; যেহেতু উহাতে গণিতের সাহায্য আবশ্যক এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত গুরুত্বাতিরিক্ত তাপ, তাড়িত, শব্দ প্রভৃতির তত্ত্ব নির্ণীত হয়। চতুর্থ স্থানে রসায়ন সংস্থাপিত হইয়াছে; কেন না তাপতাড়িতাদির সহায়তায় পদার্থ সংযোগের নিয়মাবলী নিরূপণ করাই রসায়নের উদ্দেশ্য। পঞ্চম স্থানে শারীরতত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে; কারণ ইহাতে রাসায়নিক কার্য্যাতিরিক্ত অনেক দৈহিক ব্যাপারের মীমাংসা করিতে হয়। ষষ্ঠ স্থান সমাজতত্ত্বকে দেওয়া হইয়াছে; কারণ শারীরিকতত্ত্ব নিচয়কে মূল করিয়া সামাজিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করাই ইহার অভিপ্রায়। সপ্তম স্থানে নীতিতত্ত্ব রক্ষিত হইয়াছে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানশাখাগুলির পরস্পর সাপেক্ষতানুসারে শ্রেণীবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে যে, যাহার বিষয় যত জটিল তাহাই তত অন্য সাপেক্ষ, এবং যাহার বিষয় যত সরল তাহাই তত অন্যনিরপেক্ষ। গণিতের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা সরল; এবং গণিতই সর্ব্ব নিরপেক্ষ। নীতিতত্ত্বের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, এবং নীতিতত্ত্বই সর্ব্বসাপেক্ষ। অন্যান্য বিজ্ঞানশাখাগুলি জটিলতার তারতম্যানুরূপ অপরসাপেক্ষ।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, যে বিজ্ঞানশাখা যত দূর অন্য সাপেক্ষ তাহা তত বিলম্বে বৈজ্ঞানিক সোপানে আরোহণ করিবে। ইতিহাসও এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গণিতই সর্ব্বাগ্রে বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; তদনন্তর জ্যোতিষ; তার পর পদার্থতত্ত্ব; তৎপরে রসায়ন। শারীর তত্ত্বের কিয়দংশ মাত্র বৈজ্ঞানিক পদে উন্নত হইয়াছে; সমাজ তত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রায় সর্ব্বত্রই পৌরাণিক বা দার্শনিক সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। কাল সহ-

কারে বিজ্ঞানশাখা নিচয়ের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়।

কোম্‌ত মুখ্য বিজ্ঞানগুলিকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি দোষ দৃষ্ট হয়; প্রথম এই যে তিনি অন্যায় পূর্ব্বক জ্যোতিষকে মুখ্য বিজ্ঞানদলভুক্ত করিয়াছেন, দ্বিতীয় এই যে তিনি মনস্তত্ত্বকে অবিবেচনা পূর্ব্বক উক্তদলে স্থান দেন নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং যখন তিনি এই কারণে খনিজবিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, এবং প্রাণিবিদ্যাকে গৌণবিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তখন তিনি কি প্রকারে জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে গৌণ বিজ্ঞান না বলিবেন? বর্ত্তমান সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং তারকাপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করাই জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। যদি বল সম্ভব স্থল মাত্রে খাটে এরূপ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম নির্ণয়ও জ্যোতিষের কার্য্য, আমাদিগের বিবেচনায় এটি ভ্রম। গণিতের যে ভাগ দ্বারা গতির নিয়মাবলী নির্ণীত হয়, মাধ্যাকর্ষণ তাহারই আলোচ্য একটি বিষয় মাত্র।

আমাদিগের বোধ হয় যে সমাজ তত্ত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মনস্তত্ত্ব সংস্থাপন করা আবশ্যক। কেবল কতকগুলি শরীরীর সংযোগে সমাজ সংগঠিত হয় না। কাননে অসংখ্য তরুলতা একত্রে আছে; কিন্তু সেখানে আমরা সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। যেখানে আমরা মনের সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত উপলব্ধি করি, যেখানে অনেকের মন একত্রিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখি, সেখানেই কেবল আমরা সমাজ আছে বলিয়া থাকি। অতএব যে মন সমাজের মূলস্বরূপ, তদ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংগ্রহ না হইলে সমাজ তত্ত্বের ভিত্তি নির্ম্মাণই হয় না। সুতরাং সমাজ তত্ত্বের পূর্ব্বে মনস্তত্ত্ব সন্নিবেশ করা চাই। আবারও ভাবিয়া দেখ, শরীরী মাত্রেই মনবিশিষ্ট নহে। জন্ম, পুষ্টিসাধন, বংশবৃদ্ধি, মৃত্যু প্রভৃতি শরীরী সকলেরই আছে; কিন্তু অর্দ্ধেকের প্রায়, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জদলের কাহারও, মন নাই। সুতরাং শরীরী মাত্রের সাধারণ তত্ত্বগুলি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিষয় রাখিয়া মানসিকতত্ত্ব সমুদায় লইয়া একটি বিজ্ঞানশাখা সংস্থাপন করা উচিত। এতৎসম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। গণিত হইতে শারীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রের তথ্য নির্ণয়ার্থে আমরা কেবল বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ। মনস্তত্ত্বানুসন্ধানার্থে আমরা একটি নূতন যন্ত্র পাইতেছি; সেটি আমাদিগের অন্তরিন্দ্রিয়। কোম্‌ত বলেন যে আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই; কারণ যখনই আমরা কোন মানসিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে যাই তখনই তাহা বিলীন হইয়া যায়।

এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই, যখন আমরা প্রতিক্ষণে জানিতে পারিতেছি যে আমাদিগের মনে সুখ দুঃখ কি কোন রূপ চিন্তা উদিত হইতেছে, তখন আমাদিগের আপন আপন মানসিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণে আছে, তাহার সন্দেহ নাই। আর ইহাও কাহারও অবিদিত নহে যে স্মৃতি দ্বারা বিগত মানসিক অবস্থার জ্ঞান অনেক দূর লাভ করা যায়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য নির্ণয় বিষয়ে কোম্‌তের আপত্তি বিফল হইতেছে।

কোম্‌তের মতে, জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায় তিনটি; পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ বলে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় তত্ত্বটি বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্য দেশ কাল পাত্র ভেদে তদীয় পর্য্যালোচনাকে উপমা বলে। আমাদিগের বোধ হয় যে অন্তরিন্দ্রিয় গোচর বলিয়া আমাদিগের মানসিক ব্যাপারও পর্য্যবেক্ষণের বিষয়; এবং উপমাটি এক প্রকার কৌশল-প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা মাত্র। কোম্‌ত দেখাইয়াছেন যে বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব নিরূপণের উপায়বৃদ্ধি ঘটে। গণিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় কি না আমরা বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষে কেবল চক্ষু দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা চলে। শারীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এবং নীতিতত্ত্বে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা তিনটিরই অনেক স্থল ঘটে। কোম্‌ত যদি মনস্তত্ত্ব পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে আর একটি তত্ত্বনির্ণায়ক উপায়ের বিশেষ উল্লেখ করিতেন, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র।

সেকাল আর একাল।*

জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা দিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক, "বাইমেনা" জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও

* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকিযন্ত্রে।

মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্রমাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশু পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন্ মতাবলম্বী? বঙ্গদর্শনের পাঠকেরা জানেন, যে আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ব বাদী। এবং অনেক সময়েই বাঙ্গালির পশুত্বই সমর্থন করিয়াছি। বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব নব্য বাঙ্গালি চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জন,—এই সকল একত্র করিয়া, দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্যবাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরী মণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসনস্ সিলেক্সনস্, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে নব্য বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনি পশু-চরিত্র সাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকে বলি, যে আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংস ভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ডখাইতে বসিয়াছেন কেন?—গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদ পত্র রূপ, ভাণ্ডে সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবন ক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজ চাষার ফশলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া, কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে চোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থ শর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। এতগুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

আমরা নব্য বাঙ্গালির প্রতি এইরূপ প্রশংসা বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাকি—এবং রাজনারায়ণ বাবুও সেই পথের পথিক। আমরা যে বাস্তবিক বাঙ্গালিকে এতই অপদার্থ মনে করি ইহা বোধ হয় সকলে সত্য বিবেচনা করেন না। আত্মনিন্দায় দোষ নাই—উপকার আছে। আমরা বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির নিন্দা

করিতে অধিকারী—নিন্দার একটু অন্যায় আতিশয্য হইলেও লাভ আছে। আমাদিগের যে অবস্থা, তাহাতে আপনা আপনি ধন্যবাদ আরম্ভ করার অপেক্ষা অমঙ্গলকর আর কিছুই হইতে পারে না।

সত্য কথা এই যে আমরা বাঙ্গালির যত নিন্দা করি, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। আমরা যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করি, রাজনারায়ণ বাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থ। সে কালে আর এ কালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—একালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। একালের গুণ গুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।

রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে অনেক সময়ে আমাদিগের একমত, ইহা আমরা আত্মশ্লাঘার বিষয় মনে করি। অনেকস্থানে গুরুতর মত ভেদও আছে—কিন্তু উদ্দেশ্য একবলিয়া প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা হইল।

তবে একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে—বাঙ্গালির অনুচিকীর্ষা। তিনবৎসর ধরিয়া বাঙ্গালিকে গালি দিয়া আসিতেছি—একদিন একটা ভাল কথা বলিলে অপাত্রে পড়িবে না।

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ কি বাঙ্গালি সবলই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই—সে সকল কথা আজকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি, যে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণ সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিতজাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিলেন; প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক

ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোমক ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই; কেননা ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই, যে অনুকরণের ফল কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্সন, এইরূপ ক্ষুদ্র২ লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহিনা। বর্জ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদায় রোমক সাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশী উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শত্রুঘ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মাহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী; যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী, অপহৃতা আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা: উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে

সেই অগ্নি জলন্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাস ভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নী সহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র২ ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্য বিন্ধনে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতিবিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবী মধ্যে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেরেন্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, আন্তনৈনদিগের রাজধর্ম্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট্‌গণের স্থাপত্য কীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র, রোমক-ব্যবস্থা শাস্ত্রের অনুকরণ; ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী রোমকীয়ের অনুকরণ। কোথাও সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই সেনেট কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী কোথাও সেই ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এইরূপ ঘটে; প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড

এবিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে, এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয় গণ, অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন, যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতঃই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেই রূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ, সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐ রূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণ প্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর্য্যবংশ সম্ভূত; আর্য্য শোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গল প্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাশীদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর;—ইংরেজেরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, যে বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, এবং আমরাও এই অনুকরণ প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা ও ব্যঙ্গ করিয়া থাকি। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষ-

ভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণ বাবু যাহা২ বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যে খানে অনুকারী প্রতিভাশালী সে খানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্রের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি এক প্রকার হইত—মনে কর কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি শব্দ সকলের কর্ণজালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্রেই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং কাব্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

এই তত্বের অন্তর্গত একটি গুরুতর তত্ব আছে—স্বানুবর্ত্তিতার বিনাশ। স্বানুবর্ত্তিতা কি, তাহা বিস্তারিত বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা মিলের মূলগ্রন্থ পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ১৮৬,১৯৯ পৃষ্ঠাস্থিত প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মিল প্রণীত এই গ্রন্থ* ভবিষ্যতে মানব সমাজ শাস্ত্রের মূল স্বরূপ পরিণাম লাভ করিবার সম্ভাবনা; এবং আমাদিগের বিবেচনায় সমাজ নীতির সকল তত্বই তৎপ্রণীত নীতি সূত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষিত হওয়া উচিত। সেই নীতিসূত্রের সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সমকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতক গুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, এবং কতক গুলির প্রতি তাচ্ছীল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং এক জন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন২ কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন২ প্রকারের কার্য্য ভিন্ন২ প্রকৃতির লোকের

* On Liberty.

দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্র বৈচিত্র, কার্য্য বৈচিত্র, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণ প্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে, যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য, অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক, বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র হানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ঘটে না; সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন২ সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন২ সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, অধিকতর সভ্যজাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সেস্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয়, যে অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্রদোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন২ তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণ প্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থল ও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণ প্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণ প্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

স্থূল প্রশ্ন এই যে এক্ষণে বঙ্গসমাজে যেরূপ অনুকরণ প্রচলিত, ইহা যথাপরিমিত কি আত্যন্তিক? চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, চিন্তা করিয়া, একথার মীমাংসা করিবেন। রাজনারায়ণ বাবু চিন্তাশীল কিন্তু তিনি ততদূর চিন্তা করিয়া এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাই

নাই। অতএব তাঁহার কৃত মীমাংসা প্রতিবাদের অতীত বলিয়া আমরা এক্ষণে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি তিনি বা তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ নিরপেক্ষ, কুসংস্কারবর্জ্জিত, এবং চিন্তাভিনিবিষ্ট হইয়া এ তত্ত্বের আলোচনা করেন তবে সমাজের বিশেষ উপকার করিবেন সন্দেহ নাই। কথাটি রূপান্তরে এই, যে এ অনুকরণের এক্ষণে বহুবিধ মন্দ ফল দেখিতেছি, চরমে কি তাহার ফল ভাল দাঁড়াইবে না?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

[এই প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হইলে পর আমরা কোন কৃতবিদ্য লেখকের নিকট হইতে রাজনারায়ণ বাবুর পুস্তকের নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রাপ্ত হইলাম। লেখকের মতের সঙ্গে আমাদিগের নিজমতের সর্ব্বত্র ঐক্য নাই কিন্তু নব্য সম্প্রদায় আত্মপক্ষ সমর্থনে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহারা বলিতে অধিকারী; আমরা প্রবন্ধান্তরে অন্যপ্রকার গ্রন্থ-সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া, এই লেখকের মতগুলি অপ্রচারিত রাখিতে অধিকারী নহি। ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায়ের লোক, আপন২ মত বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিতে পারেন; ইহা বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকেও এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।]

বং সম্পাদক।

অহঙ্কার ও আত্মগৌরব মানব স্বভাব জনিত ধর্ম্ম। আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থা হইতে মহৎ জ্ঞান করা সম্যক্ প্রকারে দূষণীয় নয়। কারণ এই প্রকার জ্ঞান থাকিলে কুসংসর্গ ও নীচ প্রবৃত্তি হইতে অনেকাংশে জনসমাজকে বিরত রাখে। নচেৎ নিস্তেজ কাপুরুষ লোকের জলপ্রবাহের ন্যায় সর্ব্বদাই অধোগতি হয়। কিন্তু অবিমিশ্রগুণ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হইতেও কি না দুর্ঘটনা, মনস্তাপ ও যন্ত্রণাভার লোক সমাজকে বহন করিতে হইয়াছে। সকল বিষয়েই আধিক্য প্রবল হইলে তাহাতে গুণ না দর্শাইয়া বরং অনিষ্ট উৎপাদন হয়। 'সর্ব্ব মত্যন্ত গর্হিতং' এই যে কথাটি সকল সময়ে এবং সকল বিষয় আলোচনায় আমাদিগের হৃদয়ে স্থানদান করা উচিত। জীবনসাংঘাতিক হলাহলও অল্প পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কত প্রকার হিতসাধন করিতেছে।

"আমি মহৎ এবং তুমি আমা অপেক্ষা অধম" এই প্রকার আত্মগৌরব যুবক মণ্ডলীর মধ্যে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু 'আমরা মহৎ ও তোমরা অধম' এই প্রকার দৃষ্টান্ত বঙ্গ দেশের সামাজিক নিয়ম মধ্যে বিলক্ষণ প্রবল আছে। এই বিশ্বাসটি আমাদের দলাদলী ঘটনার মূলীভূত কারণ। যদ্যপি ভিন্ন২ দলস্থ লোকেরা নিজের মহত্ত্ব ও উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হইয়া অপরকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে এই বর্ত্তমান

জঘন্য ব্যাপার হইতে দেশের কি পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইত। এখন দলাদলী কেবল হিংসা ও কুপ্রবৃত্তির আলয় হইয়াছে। নিজের উন্নতিসাধন দূরে থাকুক এখন কি প্রকারে অন্যকে উন্নত অবস্থা হইতে অবতরণ করাইব এই আন্দোলন লইয়া দলপতি মহাশয়েরা ব্যতিব্যস্ত। হৃদয় বিষাক্ত ও কলুষিত হইলে, যত প্রকার নীচ প্রবৃত্তি তাহা হইতে উৎপত্তির সম্ভাবনা, তখন সকলই উত্তেজিত হইয়া ঐ পাপাচারকে আশ্রয় করে। এই প্রকার দলাদলী ঘটনাতে অনেক সুশিক্ষিত যুবকও অনুমোদন করেন ইহাই বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অবস্থাতে শোচনীয়।

ইংরাজী ভাষার পর্য্যালোচনায় আমাদিগের ভাবের অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আমরা অনেক বিষয় সভ্যতার নয়নে দৃষ্টি করি। সামাজিক দলাদলী ব্যতীত এখন আর একপ্রকার দলাদলীর উৎপত্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের এই বাঞ্ছা যে কে উন্নত ইহা স্থির করিবার জন্য আমরা যেন হীন প্রবৃত্তির আশ্রয় না লই। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে নিজের কিম্বা নিজদলের গৌরব করা এবং সেই গৌরব সম্বর্দ্ধন এবং প্রতিপালনার্থ চেষ্টিত হওয়া সামাজিক উন্নতির এক মূলীভূত উপায়।

উল্লিখিত বিষয়ের সমালোচনা বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'একাল আর সেকাল,' অভিধেয় পুস্তক পাঠে হৃদয়স্থ হইল। তিনি পূর্ব্বকালের সহিত একালের তুলনা করিয়া অধুনাতন যুবকগণের অধোগতি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যদ্যপি সত্য হয় তাহা হইলে কি বঙ্গদেশের সামান্য দুরবস্থা বলিতে হইবেক? এত যে ইংরাজী বিদ্যালাভের জন্য প্রয়াস এত রাজস্বব্যয় এত জীবন-হ্রাসকর নিশীথ অধ্যয়ন, সকল কি আমাদের অনিষ্টের কারণ? তাহা হইলে ইংরাজি চর্চ্চা যত শীঘ্র আমাদের দেশ হইতে অন্তর্ধান হয় ততই দেশের মঙ্গল। তবে কেন সভা সমবেত করিয়া উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার সুলভতাজন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হইয়াছিল? বিবেচনা দ্বারা সমালোচনা করিলে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার ভ্রমপ্রতীয়মান হইবেক। তিনি মানবস্বভাবসুলভ আত্মগৌরবে পতিত হইয়া সেকালের অবস্থা সকল সুচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছেন। বোধ হয় আমরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদির নিকট সেই স্বর্গযুগের গৌরব করিব। কিন্তু বাস্তবিক সময়প্রবাহের সহিত যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সকল অংশেই লক্ষিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বকালের এবং একালের লোকের সহিত চন্দ্র সূর্য্য প্রভেদ বলিলেও বলা যায়। সেকালের সরলতার দৃষ্টান্ত গুলি যাহা লিখিত হইয়াছে সে সরলতা কেবল মূর্খতার চিহ্ন।(১) পাঠকবর্গ

(১) ইহা যদি মূর্খতার চিহ্ন হয়, তবে ইউরোপীয় অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও মূর্খ ছিলেন। তাঁহাদিগের

মনে করুন যে যদি একালের কোন ব্রাহ্মণ নিজ প্রণয়িনীর সম্মুখে গলবস্ত্র দণ্ডায়মান হইয়া তুমি কে অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রশ্ন করেন এবং উদ্বেলিত ব্যঞ্জনে তৈল নিক্ষেপ দ্বারা তাহার উচ্ছ্বাসন নিবারণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন, তবে তাঁহাকে দ্বিপদবিশিষ্ট পশু ভিন্ন আর কি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? একালের লোক স্বার্থপর তাহার কারণ এই যে বুদ্ধির মার্জ্জনা দ্বারা সকলেই নিজ২ অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দিনান্ত পরিশ্রম করিয়া স্ব২ উপার্জ্জিত ধন দ্বারা আলস্য পরবশ নিষ্কর্ম্মা দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্বের উদর পোষণ কি প্রশংসনীয় কর্ম্ম? (২) পূর্ব্বকালে এক ধনী আত্মীয়ের বাড়ী কত নিষ্কর্ম্মা ভাগিনেয় এবং গৃহজামাতা নির্ব্বিঘ্নে দিনাতিপাত করিতেন। এখন সেই সকল রক্তশোষক জলৌকার সংখ্যা হ্রাস হওয়া কি সমাজের উন্নতির লক্ষণ নয়? (৩) যেব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের ভরণ পোষণে সমর্থ নয়, সে কেবল সমাজের ভারস্বরূপ, যত শীঘ্রই ঐসকল লোকের সংখ্যা হইতে বঙ্গমাতাকে উদ্ধার করা যায়, ততই তাঁহার উন্নতির সাধন।(৪)

পুরাকালের দান দাতব্যের বিষয় এবং একালের তাহার হ্রাসের নিমিত্ত আক্ষেপ করা হইয়াছে। যদ্যপি রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইতেন তবে তাঁহার আক্ষেপোক্তি নিতান্ত দূষণীয় হইত না।(৫) এই যে দুর্ভিক্ষ যাহার করাল গ্রাস হইতে আমরা অদ্যাপি সম্যক্ প্রকারে নিস্তার পাই নাই ইহা কি একবারে তাঁহার স্মরণপথ হইতে অন্তর্দ্ধান হইল? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোঁসাই বৈরাগী

জীবনচরিত অনুসন্ধান করিয়া, এরূপ উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যাহারা আপনার অধীত শাস্ত্রবিশেষকে একমাত্র চিন্তার বিষয় করিয়া তুলেন, তাঁহারা সামান্য সাংসারিক ব্যাপারে এইরূপ অমনোযোগী হয়েন। আমরা বিশেষ অবগত আছি, এরূপ দৃষ্টান্ত আধুনিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য নহে। বং সং।

(২) যে খাইতে না পায়, তাহাকে খাইতে দেওয়া প্রশংসনীয় নহে কিসে? ইহাতে অলসের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ধনক্ষতি হয় বটে। যিনি তাহা ভাবিয়া দরিদ্র আত্মীয় জনের আনুকূল্য করেন না, তাঁহার সমাজনীতিজ্ঞতার প্রশংসা করিব; কিন্তু মনুষ্যত্বের নহে। যিনি আনুকূল্য করেন, তিনি অজ্ঞানী হইলে হইতে পারেন, কিন্তু মানুষ বটে। বং সং।

(৩) বোধ হয় এটি ধনবৃদ্ধির ফল, ইংরেজি শিক্ষার নহে। বং সং।

(৪) প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি। তাঁহারা পরান্ন ভোজী ছিলেন। বং সং।

(৫) বঙ্গদর্শন সম্পাদক ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। তবে বোধ হয় তৎকৃত রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষসমর্থন দূষণীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবু না পারুন, নিতান্ত পক্ষে আমরা বলিতে পারি, "দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যঃ" বং সং।

ইত্যাদি ভিক্ষাবলম্বী মনুষ্যকে দাতব্য বিতরণে কুণ্ঠিত হওয়া কি দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন? যদ্যপি ইহা সত্য হয় তবে ভরসা করি উক্ত মহাত্মারা যেন পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশম্পাত দ্বারা আমাদের উৎসন্নে পাঠাইবেন না।

কেবল দুইটি বিষয়ে তিনি স্বমুখে উন্নতির চিহ্ন স্বীকার করিয়াছেন যথা উৎকোচ লওনে পরাঙ্মুখ হওয়া এবং স্বদেশপ্রিয়তা। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সকল গুলিকে দোষ বলিয়া স্বীকার করা যায় তথাপি শেষোক্ত দুইটি গুণ সকল দোষকে আচ্ছাদিত করে। দেশের উপর মমতা দেশের উন্নতির সোপান এবং উৎকোচপরাঙ্মুখ হওয়া সত্তার নিদর্শন। যদ্যপি এই দুইটি সমাজমধ্যে লক্ষিত হইয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে নৈরাশের কারণ কি? দুর্ভাগ্য বশতঃ মার্জ্জিত বুদ্ধির সহিত লোকের খলতারও বৃদ্ধি পায়। সভ্যতার সহিত অনেক দোষ সমাজকে আশ্রয় করে। তজ্জন্য কি সভ্যতাকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অনুকরণে ইচ্ছুক হইতে হয়?

যতই নিগূঢ় বিদ্যা সমালোচনার বৃদ্ধি হইবে ততই কুসংস্কার ও সামাজিক দোষের লয় হইবে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থা উপস্থিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত দোষ সকল লুপ্ত হওয়া আশা করা আকাশ পুষ্পের আশার ন্যায় অমূলক। তত্রাপি এতৎ সম্বন্ধেও অনেক উৎকর্ষসাধন হইয়াছে বলিতে হইবেক। পূর্ব্বের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানরহিত উন্মত্ত ডাক্তার এখন অতি বিরল! বলিতে কি 'ডাক্তার হইলেই মাতাল হয়' এই ভ্রমটি ক্রমে২ উচ্ছেদিত হইতেছে এবং বেশ্যাগমন, পক্ককেশ মৃত্যুপথগামী ঠাকুরদাদার মধ্যেই বিশেষ প্রবল। (৬) ধর্ম্ম সম্বন্ধে হ্রাস হওয়া যথার্থ শোচনীয় বটে কিন্তু এখনকার যুবক দলের মধ্যে পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রণয় অনেকেরই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য পথ পরিষ্কার করিতেছে। এই সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া যদ্যপি কেহ সমাজের উন্নতি বিবেচনা না করেন তবে তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী বলিতে হইবেক। অনেকে একালকে হিন্দুরাজদিগের স্বাধীনতার কালের সহিত তুলনা করেন। কিন্তু সে সময়ের সহস্র গুণবিভূষিত সামাজিক নিয়ম এখন কার সহস্র দোষবর্জ্জিত নিয়মাবলীর সহিত সমতুল করিতে গেলে তত্রাপি উন্নতি ভিন্ন অবনতি দৃষ্টিগোচর হয় না। (৭)

বিলাত হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত যুবকদল দুর্ভাগ্য বশতঃ সকল সমাজেরই

(৬) আমাদের বিবেচনায়, ইহা সত্য। বং সং।

(৭) যিনি পূর্ব্বতন হিন্দুরাজনীতি এবং হিন্দুসমাজের অবস্থা সবিশেষ অবগত আছেন, তিনি কখন একথা বলিবেন না। বং সং।

অপ্রিয়। সকল অপেক্ষা তাঁহারা উক্ত পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তার নিন্দাস্পদ হইয়াছেন। যাঁহাদের নিকট হইতে অধিক আশা ভরসা করা যায় সেই আশার নৈরাশ হইলে তাঁহাদের উপর বিশেষ বিদ্বেষ ভাব জন্মিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কাহার চরিত্র অপযশোভাজন? কেই বা তাঁহাদের মধ্যে মন্দ উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেই বা ক্ষমতা সত্ত্বেও দেশের অমঙ্গল প্রার্থনা করেন? যদ্যপি কেহ একটি দৃষ্টান্ত বাহির করিতে পারেন তবে অবশ্যই তাহার বাক্য গ্রাহ্য স্বীকার করি। যদ্যপি না পারেন তবে কেন অকারণ তাঁহাদের অপযশ করিয়া লৌকিকে ও পারত্রিকে পতিত হয়েন? তাঁহাদের দোষের মধ্যে এই যে তাঁহারা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাহেবদিগের মত বাস ও আহারাদি করেন। তাহাতে অন্যের ক্ষতি কি? আমরা অব্যর্থ এবং আমাদের মত সকল লোক হীনাবস্থায় দরিদ্র ও অপরিষ্কার অবস্থায় কালাতিপাত করুক এই ইচ্ছা কেবল স্বার্থপর কাপুরুষ ব্যক্তির হীনতা প্রচার করে। (৮)

(৮) কোট পেণ্টুলন এবং পিতলের কাঁটা চামচে অতি অল্প মূল্য। ইচ্ছা করিলে সকলেই সংগ্রহ করিতে পারে। রাগ সে জন্য নহে। তবে যিনি বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন, তাঁহাকে বাঙ্গালি বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না।

বং সং।

জাতিভেদ।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট)

গত সংখ্যার ৩৫২ পৃষ্ঠার পরে।

অর্থনীতিমতে

জাতিভেদের বিচার।

অতঃপর জাতিভেদ নিয়মে সমাজের ধনবৃদ্ধি কিরূপ হয় তাহার প্রতি অনুধাবন করা যাইবেক।

লোকে পৃথক্২ কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ কার্য্যপ্রণালীর নাম শ্রমবিভাগ। অর্থনীতিমতে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত ফললাভ হয়।

(১) যে ব্যক্তি যে ব্যবসাতে নিযুক্ত থাকে তাহাতে তাহার নিপুণতা বৃদ্ধি হয়।

(২) একব্যক্তি নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহারএককার্য্য ত্যাগ করিয়া

অন্য কার্য্য আরম্ভ করিতে কাল হরণ এবং তেজঃ ক্ষয় হয়। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ লোক নিযুক্ত থাকিলে, এই ক্ষতিদ্বয় নিবারিত হইতে পারে।

প্রথম ক্ষতি প্রসিদ্ধ কিন্তু দ্বিতীয়টির বিষয়ে এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে মনঃসংযোগ শ্রান্তির এক প্রধান হেতু। মন অল্পকালমধ্যে বহু চিন্তাতে ব্যাপৃত হইলে আমরা সাতিশয় পরিশ্রান্ত হই। নিরবচ্ছিন্ন একটী কার্য্যে ৪ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে যত আয়াস প্রয়োজন, ২ঘণ্টা করিয়া তুল্য মনঃসংযোগের সহিত দুটি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তদপেক্ষা অধিকতর শ্রান্তি হয়। এই জন্যে তেজঃক্ষয় নিবারণকে শ্রম বিভাগের একটি গুণস্বরূপ গণনা করা গেল।

(৩) ক্রমশঃ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে শ্রম সুলভ করিবার উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(৪) উল্লিখিত নিপুণতা হইতে ব্যবসার দ্রব্যক্ষয় নিবারিত হয়।

(৫) নানা প্রকারে শ্রম বিভক্ত হইলে নিকৃষ্ট শ্রমজীবিগণ পৃথক্ হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে নিযুক্ত হয়, তদ্দ্বারা ব্যবসার উন্নতি ও জনসমাজের লাভ হয়।

অতএব জাতিভেদ প্রথার দ্বারা এই সমস্ত উপকারই হইতেছে এবং শূদ্র বা মিশ্রবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসা পৃথক্ হইয়া সভ্যতার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সকলেই বুঝিবেন যে ইদানীন্তন যে সকল কার্য্য হইতেছে তাহার উপযোগী ব্যবসা ভাগ এতদ্দেশে অদ্যাপি হয় নাই। এক কর্ম্মকারের কার্য্য এখন বহুসংখ্যাতে বিভক্ত হইয়াছে। লৌহ উৎপন্ন, লৌহ ঢালাই ও লৌহ পেটাই এবং এইগুলির কত২ প্রকরণ হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রথামতে কুম্ভকার কখন নিজে মৃত্তিকাহরণে কালক্ষেপ করিবে না। এইরূপ সকল বিষয়েই এতদ্দেশীয় জাতিভেদ প্রথানুযায়ী শ্রমবিভাগ এবং অন্য দেশের কার্য্য প্রণালী মধ্যে এই মহাপ্রভেদ দৃষ্ট হইবেক যে এখানে সম্যক্‌রূপে শ্রম বিভক্ত হয় নাই।

আমরা স্থানে স্থানে নানা ব্যবসা হইতে বুদ্ধি সংগ্রহের কথা বলিয়াছি। উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক বচনে তাহার কোন প্রতিবাদ করা যায় নাই বরং তৃতীয় ফলের সহিত এতদ্দেশের অবস্থা তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কথার একটী নূতন প্রমাণ প্রকাশ হইবেক। সকলেই জানেন যে ইউরোপীয়েরা কল প্রয়োগে আমাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ কিন্তু এতদ্দেশে কলের কোন উন্নতি হয় না কেন? ইহার যত কারণ থাকুক তন্মধ্যে একটী এই যে কেহ ব্যবসান্তর হইতে বুদ্ধি সংগ্রহ করে না। ফলতঃ শ্রম বিভাগার্থ অন্য ব্যবসার মর্ম্ম এবং কৌশল জ্ঞাত হইয়া স্ব২ ব্যবসাতে তাহা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ নহে বরং নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর একটী কথা এই যে ব্যবসা পৃথক্ হইলে যত কলের বৃদ্ধি না হউক কলের

উন্নতিতে শ্রমবিভাগের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি জাতিভেদ নিয়মে কলবৃদ্ধির ব্যাঘাত হওয়া সত্য হয় তবে তদ্দ্বারা শ্রমবিভাগেরও প্রতিবন্ধকতা হইতেছে।

এসমস্তই সত্য বটে কিন্তু বংশানুক্রমে ব্যবসাপালনে লাভ কি?

এতদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন বক্তব্য এই যে যখন মনুষ্য প্রথমতঃ সমাজবদ্ধ হইয়াছিলেন, যখন সকলে জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে স্ব২ যত্নের প্রতি নির্ভর না করিয়া কেহ ভক্ষ্য সংগ্রহার্থে কেহ বা তদুপযোগী অস্ত্র নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে বংশানুক্রমে ব্যবসা গ্রহণ করাই তাবতের পক্ষে মঙ্গল জনক হইয়াছিল। সন্তান পিতা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া স্বভাবতঃ তাঁহারই অনুকরণ করিত। পিতাও আপন অর্জ্জিত পশুচর্ম্ম, শুষ্ক ফল মূলাদি অথবা নিতান্ত দুর্লভ অগ্নি এবং এক মাত্র আয়ুধ ধনুর্ব্বাণ স্নেহ বশতঃ সন্তানের হস্তেই সমর্পণ করিতেন এবং যিনি এই রূপে যে দ্রব্য পাইতেন তিনি তদুপযোগী ব্যবসাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। অর্থাৎ যখন টাকার সৃষ্টি হয় নাই তখন দায়াদগণ পূর্ব্বাধিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করিলেই কার্য্যের সুবিধা হইত।

কিন্তু এখন পিতৃত্যক্ত ব্যবসার সামগ্রী অবিক্রেয় বলিয়া পৈতৃক ব্যবসা প্রতিপালন করিতে হয় একথা কেহই বলিতে পারেন না। স্থূল কথা, আলস্য এবং ধারাবহন প্রকৃতিই ইহার মূল।

এস্থলে জাতিভেদ সংক্রান্ত কয়েকটী কথা বুঝিবার জন্য ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কারখানার কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তথায় লোকে পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য নহে। বাল্যকালে যাহার যেমন সাধ্য কিছুদিন পঠদ্দশাতে থাকিয়া সকলেই এক একটি বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকট আপ্রেণ্টিস হয়। নিতান্ত দরিদ্র হইলে সামান্য মজুরি করে কিন্তু তথায় এত বড় বড় কারখানা আছে যে একস্থানে প্রবেশ করিলে নানা প্রকার কার্য্য দেখিতে পায় সুতরাং বুদ্ধিমান্ হইলে সামান্য মজুর থাকিয়াও কোন একটী কার্য্য শিখিতে পারে। এবং কর্ত্তার অনুগ্রহভাজন হইলে এরূপ অবস্থা হইতেও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করে, কিন্তু এইসকল লোক কেবল পরের অধীনে কার্য্য করিয়া সাপ্তাহিক বেতনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা কেহই আপনাদিগের নির্ম্মিত পদার্থ বাজারে বিক্রয় করে না। তাহাদিগের এমন মূলধন নাই যে তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কোন গঠন প্রস্তুত করে। তদ্ভিন্ন বড় বড় কারখানা হইতে এত অল্প ব্যয়ে নানা সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে যে একজন মিস্ত্রি নিজের সঞ্চিত ধন লইয়া একাকী কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে জীবিকা লাভ

করিতে পারে না। সুতরাং মিস্ত্রিদিগের উন্নতির একমাত্র উপায় বেতনবৃদ্ধি। কারখানাতে বহুসংখ্যক লোকে কার্য্য করে। এক জনকে কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে মালিকের নিষ্কৃতি নাই, কেননা সকলকেই সেইরূপ বৃদ্ধি দিতে হয় এই হেতু মিস্ত্রিবর্গ ও কারখানার মালিকগণের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ড দেশে কৃষি কার্য্যও সর্ব্বতোভাবে এক২জন সামান্য প্রজার আয়ত্ত নহে। এখানে কৃষকেরা স্বহস্তেই কর্ষণ রোপণাদি করে এবং উৎপন্ন শস্য বিক্রয় পূর্ব্বক জমিদারের কর দেয় আর বঙ্গীয় জমিদারগণ গোমাস্তাদিগের উপর কর সংগ্রহের ভার দিয়া বসিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন শস্য ক্ষেত্র গুলি অতি ক্ষুদ্র। ২৫/ ৩০/ বিঘা অপেক্ষা বৃহৎ ক্ষেত্র প্রায় দেখা যায় না। আঢ্য প্রজা হইলে এই রূপ বহু ক্ষেত্র অধিকার করে। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা অন্যরূপ। তথায় ১০০০/ ১৫০০/ ২০০০/ বিঘা পরিমিত এক একটি ক্ষেত্র*। এক এক জন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভূম্যধিকারীর নিকট এইরূপ এক একটী ক্ষেত্র জমা লইয়া তাহাতে গোলাবাড়ী আদি নির্ম্মাণ করেন এবং ভূমি কর্ষণ ও বীজ রোপণ আদি কার্য্যের নিমিত্ত নানা বিধ কল ও বহুসংখ্যক মজুর নিযুক্ত করেন। নিজেও নিষ্কর্ম্মা থাকেন না, সে সকল বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এখানকার নীলকর সাহেবগণ ইংলণ্ডীয় কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কিন্তু এখানে মজুর না পাইলে ইঁহাদিগের কার্য্য চলে না।

ইংলণ্ডের মজুরদিগের মধ্যেও বৃত্তিভেদ আছে। কেঁহই বংশানুক্রমে এক একটি বৃত্তি সেবাতে বাধ্য নহে কিন্তু সকলেরই উপজীবিকা এক মাত্র বেতন। শস্যের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। সুতরাং ইংলণ্ডে কারখানার মিস্ত্রিগণ ও মালিক সমূহের মধ্যে যেরূপ, কৃষক এবং কৃষিকার্য্যের মজুরগণের মধ্যেও সেইরূপ বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে মহাবিবাদ হয়।

---

* আমরা এতদ্দেশের একটী ক্ষুদ্র সম্পত্তির চিঠা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম। তাহাতে ৪৫৭টী দাগের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্র /২॥ কাঠা এবং বৃহত্তম ক্ষেত্র ৩২॥৪॥ বত্রিশ বিঘা সাড়ে চৌদ্দকাঠা পরিমিত। সমস্ত গুলির গড়হিসাবে প্রতি ক্ষেত্রের পরিমাণ ৪॥১ চারিবিঘা এগার কাঠা মাত্র। ইংলণ্ডদেশস্থ ক্ষেত্রের পরিমাণ সম্প্রতি পুস্তকাভাবে লেখক নির্দ্দিষ্ট বলিতে পারিলেন না কিন্তু তথায় যে সকল প্রাচীন ভূস্বত্বাধিকারী শ্রমজীবীদিগের সম্পত্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে তাদৃশ কোন২ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন অদ্যাপি ওয়েষ্টমোরলণ্ড, ও কম্বর্লাণ্ড প্রদেশে আছে। এইরূপ এক একটী ক্ষেত্রের পরিমাণ এক স্থানে দেখা গেল ৩০/একর অর্থাৎ প্রায় ৯০/ বিঘা। এই সকল ক্ষুদ্র সম্পত্তি লোপ হইতেছে বলিয়া অর্থ নীতিবেত্তৃগণ আক্ষেপ করেন বটে। কিন্তু ইহা আমাদিগের দেশের ২০।২৫ টী ক্ষেত্রের তুল্য। অতএব তাঁহারা ক্ষুদ্র২ ক্ষেত্রের যে গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রের প্রতি বর্ত্তে না।

মজুর ও মিস্ত্রিগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সময়েং এক মতাবলম্বী হইয়া স্বং কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। এদিকে মহাজনের কারখানা বন্ধ থাকিলে নানা ক্ষতি, মূলধনের সুদ নোকসান হয়। অর্দ্ধ প্রস্তত দ্রব্যজাত ও অর্দ্ধ কর্ষিত ক্ষেত্র অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়া উঠে। এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে বসাইয়া বেতন দিতে হয়। সুতরাং অনেক সময়ে অগত্যা বেতন বৃদ্ধি স্বীকার অথবা কোন প্রকারে রফা করিতে হয়।

শ্রম জীবিগণ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই নিয়মে দলবদ্ধ হইয়া থাকে যে সকলেই সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎং অর্থদান এবং একবাক্যে মহাজনের সহিত বিসম্বাদ করিয়া বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেক। এতদর্থে দল ও যথাযোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের অনভিমতে কেহ কার্য্য করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত করে। এতাদৃশ সমাজচ্যুত ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় নিমন্ত্রণ বিবাহাদিতে নিগৃহিত হয় না। কিন্তু তাহার সহিত কোন মিস্ত্রি কি মজুর একত্র কার্য্য করেনা —সুতরাং মহাজনেরা অগত্যা তাহাকে পরিত্যাগকরেন এবং তাহার জীবিকা লাভ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। এই ভয়ে মজুরগণ বিবাদ করিতে যায়না, সমাজের অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় মজুরদিগের যেমন তেজ অধ্যবসায় ও কার্য্যক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয় তদ্রূপ তাহাদিগের দোষও আছে, মজুর সমাজ হইতে বিলক্ষণ দুর্ব্বলের পীড়নও হইয়া থাকে। উল্লিখিত চাঁদার দ্বারা শ্রমজীবীদিগের সমাজে যে ধনসঞ্চিত হয়, মহাজনের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে দরিদ্র মজুরগণ গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কিছুং পাইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ উদর পোষণ না হইলে সে স্বেচ্ছামত বেতন লইয়া কার্য্য করিতে পারে না সুতরাং তাহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবিগণ সম্পত্তিবিহীন এবং প্রতি সপ্তাহে কিছুং বেতন পায় বলিয়া বিস্তর অপব্যয় করে ও কাঁচা পয়সা হইতে ধনসঞ্চয় করিতে পারে না। বার্দ্ধক্য কি রোগগ্রস্ত বিধায় নিঃসহায় এবং অক্ষম হইলে তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। বাস্তবিক ইংলণ্ডে এই সকল কারণে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে নিঃস্ব ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদিগের অবস্থা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদিগের জাতিভেদ প্রথাতে এরূপ কোন অত্যাচার বা যন্ত্রণা নাই। শ্রম জীবী ও মহাজনের বিবাদ শ্রমকারীদিগের মধ্যে বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়ন অথবা নিঃসহায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

সম্প্রতি উল্লিখিত দুরবস্থা মোচনার্থ ইউরোপে এক নূতন ব্যবসা প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা অনুমান

করি যে তাহার সহিত জাতিভেদ প্রথার এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ঐ প্রণালীর স্থূল কথা এই যে শ্রমজীবিগণ মহাজনের অধীন কার্য্য না করিয়া বহুসংখ্যক লোক স্ব২ যৎসামান্য সঞ্চিত ধন একত্রিত করণান্তর আপনারাই মহাজন মিস্ত্রি ও মজুর হইয়া কার্য্য করে।

ইদানীন্তন অর্থশাস্ত্রবেত্তারা "কু অপরেটিভ" (co-operative) নামক এই কার্য্য প্রণালীর মহাসুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে এতদ্দ্বারা শ্রমজীবীদিগের দুই মহোপকার হয়। তাহাদিগের অর্জ্জিত সমস্ত ধন উহারা নিজেই লাভ করে এবং তাহা মহাজনের হস্তগত হইতে পায় না। আর তাহাদিগের ধনবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য মোচনের উপায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই প্রণালীতে শ্রমজীবিগণ স্ব২ কার্য্যে অধিকতর মনঃসংযোগ করে এবং তদ্ধেতু তাহাদিগের শ্রমোৎপন্ন কার্য্য অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর হয়।

কিন্তু একটী বিষয়ে আমরা অর্থনীতি পুস্তকাদিতে কোন উল্লেখ দেখি নাই। উল্লিখিত কুঅপরেটিভ কার্য্য প্রণালীর সার মর্ম্ম এই যে ধন ও শ্রম একই আধারে একত্রিত হইলে পরস্পরের বিসম্বাদ অপনীত হয়। কিন্তু ধন বংশানুক্রমে অধিকৃত হইয়া থাকে অতএব যদি শ্রম অর্থাৎ বৃত্তি ধনের অনুগামী হয় তবে ক্রমশঃ জাতিভেদ নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। মনে কর একদল মজুর প্রাগুক্ত প্রণালীতে একটী তুলার কারখানা স্থাপন করিল। উহারা ঐ কারখানার কার্য্য করিবেক। এবং উহাদিগের সন্ততিগণ পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ কারখানায় সেয়ার অধিকার করিলে তাহা রক্ষা করিবার জন্য পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেক। ইংলণ্ডবাসীদিগের প্রকৃতিগুণে অথবা তথায় ক্রয় বিক্রয়ের প্রাদুর্ভাবে কুঅপরেটিভ শ্রমজীবীদিগের, সেয়ার যদি বিক্রীত হইয়া এত ক্ষতি নিবারিত হয়, সেকথা এখন বলা যায় না। কিন্তু শ্রম ও ধন একাধারে একত্রিত হইলে জাতি উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। তথাচ একথা স্বীকার করিতে হইবেক যে ইংলণ্ডে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিলে তথাকার শ্রমজীবীদিগের এমত দুরবস্থা হইত না। কিন্তু তাহাদিগের এতাদৃশ দুর্দ্দশার একহেতু এই যে ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদিগের ভূমিসম্পত্তি নাই; এবং কারখানার ব্যাপার অন্যান্যদেশ অপেক্ষা বিস্তৃত। এতদ্দেশীয় ভূসম্পত্তিতে কৃষকদিগের যে কিঞ্চিৎ স্বত্ব আছে তাহাই উহাদিগের এক প্রধান রক্ষার স্থল। আর এই কারণ হইতেই বোধ হয় এক পক্ষে কৃষকগণের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগকরণ কঠিন এবং পক্ষান্তরে কারখানার উন্নতির প্রতি কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও হইতেছে।

অনেকে এতদ্দেশের জমিদারী বন্দোবস্ত ও জমিদারদিগকে বিস্তর দোষ দিয়া থাকেন কেননা এখানে জমিদারেরা ইং-

লণ্ডের কৃষকদিগের অর্থাৎ নীলকরসাহেবদিগের ন্যায় ভূমিসম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে যত্নবান্ হন না। কিন্তু ভূস্বত্ব বিভাগ হইলে বিস্তর অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রজাগণের কিছু স্বত্ব আছে বলিয়াই জমিদারেরা আপনাদিগের স্বত্ব ও ক্ষমতানুসারে অর্থব্যয় করিয়া লভ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন না। ফলতঃ তাঁহারা প্রজার সহিত শ্রম বিভাগ করিয়া কেবল করসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বে রাজাগণ যেরূপ আচরণ করিতেন জমিদারেরা তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।* যদি ইঁহারা তৎপরিবর্ত্তে নীলকরদিগের ন্যায় ব্যয় ভূষণ করিয়া ভূমির উন্নতি করিতেন তাহা হইলে অচিরাৎ কৃষিবর্গ ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবীদিগের ন্যায় নিঃস্ব হইয়া যাইত। কারণ কৃষিকর্ম্মে প্রজাগণ এখন কিয়ৎপরিমাণে ধনের মালিক ও সর্ব্বতোভাবে শ্রমের কর্ত্তা। কিন্তু তাহাদিগের হস্ত হইতে ধনব্যয়ের ভার জমিদার কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে লভ্যের ভাগও অল্প হইয়া যাইত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা ইংলণ্ডীয় শ্রমজীবীদিগের ন্যায় হইয়া উঠিত।

* এই বিষয়ে Baillie সাহেব কৃত The land tax of Iindia নামক পুস্তকের XXXVII পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাহাতে এতদ্বিষয়ে যে কল্পনা প্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। শ্রী যঃ।

আমরা জাতিভেদ প্রথাতে শ্রমবিভাগের কথা বলিয়াছি কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শ্রমের সমাহরণ না করিলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে চতুর্ব্বর্ণকে এক ব্রহ্মদেহে সমাহৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইদানীন্তন নানাবিধ কলের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকাশ হইবেক যে শ্রমসমাহরণ কি অদ্ভুত পদার্থ। উদাহরণ স্থলে বক্তব্য এই যে এক জন লোক এক উদ্দেশ্যে পৃথক্ রূপে নিযুক্ত থাকিয়া প্রত্যহ ১৫,৫০০ খানা তাসপ্রস্তুত করিয়া থাকে কিন্তু এই কার্য্য একক নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি দিনে ঊর্দ্ধসংখ্যা ২ খানা প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে শ্রমবিভাগ ও শ্রম সমাহরণ উভয়েরই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কেননা যেমন এইকার্য্য ত্রিশ জনের মধ্যে বিভক্ত হইয়া শ্রম লাঘব হইয়াছে সেইরূপ ঐ ত্রিশ জন একই উদ্দেশ্যে এবং পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত হওয়াতেই এই উপকার হইতেছে। জাতিভেদ রূমে শ্রমবিভাগের লক্ষণ এখনও দৃষ্ট হয় কিন্তু শ্রম সমাহরণের কথা যে শাস্ত্রকারদিগের মনে কখন উদয় হইয়াছিল তাহার বিষয় উল্লিখিত ব্রহ্ম দেহবিষয়ক রূপক ব্যতীত অন্য প্রমাণাভাব।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহার স্থলে ইহার সার কথার পুনরুক্তি করা যাইতেছে।

১। হিন্দুশাস্ত্রে জাতিভেদের আদি বিষয়ে নানা বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। এবং পা-

শ্চাত্যগণও বিবিধ কল্পনা করিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে এতদ্দেশীয় জাতিসমগ্রের আদিবৃত্তান্ত স্থির করা অসাধ্য।

২। অনন্তর অন্যান্য দেশেও জাতিভেদের কতিপয় লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার সারকথা এই যে অন্যত্র লোকে আমাদিগের ন্যায় সামাজিক প্রথা পরিবর্ত্তন করণের অধিকার ত্যাগ করে নাই।

৩। পরে,জাতিভেদ ও কৌলীন্য প্রথার তুলনা করিয়া উভয়েই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ বিষয়ক নিয়ম এবং তদ্ধেতুক কৌলীন্য প্রথাতে বহুবিবাহ ও বিবাহ সঙ্কট উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়া তুলনার দ্বারা এই কল্পনা করা গিয়াছে যে ঐ দুই দোষ নিবারণ করা, অনুলোম বিবাহ রহিত করিবার আংশিক উদ্দেশ্য ছিল।

৪। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জাতিভেদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা **বংশ** যথা আর্য্যবংশ, **জাতি** যথা ইংরেজ, ফরাসিজাতি এবং **বর্ণ** যথা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি এই রূপে উক্ত তিনটী শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছি। এবং ভাষাকেই জাতীয় ঐক্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করাগিয়াছে।

৫। পরে বিভর্লি সাহেবের লোক সংখ্যা রিপোর্টে কতকগুলি বর্ণকে পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য করাতে এবং সমগ্র বঙ্গভাষিগণের সংখ্যা না করা কারণে তাঁহার নিন্দা করাগিয়াছে।

৬। তদনন্তর কোন২ পুরাণ ও লোকাচার অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অমিশ্র শূদ্র বর্ণ এখন দেখাযায় না এবং বর্ত্তমান বর্ণসমূহের তারতম্য ভেদ বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বাক্য গ্রহণ করাগিয়াছে।

৭। পরিশেষে উক্ত পুরাণানুযায়ী ভিন্ন২ বর্ণের ও সমস্ত বঙ্গভাষিগণের আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া গিয়াছে।

৮। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতিভেদ প্রথার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রদর্শন করা গিয়াছে যে এতদ্দেশেও দেশাচার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং জাতিভেদের নিগূঢ় মর্ম্মের আলোচনা করিলে লোকে ক্রমশঃ কুপ্রথা পরিত্যাগ করিবেক এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

৯। সর্ব্ব শেষে প্রাণিতত্ত্ব মতে এবং ব্যবসা শিক্ষা ও সমাজ শাসনের নিমিত্তে জাতিভেদ প্রথা হইতে কোন২ উপকার হইয়া থাকে এবং ধনবৃদ্ধি বিষয়ে বৃত্তি বিভাগের গুণ ও জাতিভেদ হইতে শ্রমজীবীদিগের কোন২ দুরবস্থা নিবারণ হয়, এই সকল তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই কথা লক্ষিত হইয়াছে যে সভ্যতার আদিম অবস্থায় জাতিভেদ হইতে যতই মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া থাকুক বর্ত্তমান কালে কেবল ধারাবহন প্রকৃতি হইতে উক্ত প্রথা এতদ্দেশে রক্ষিত হইতেছে। অন্যত্র লোকে ঐ প্রকৃতির এতাদৃশ বশবর্ত্তী নহে এবং বাহুল্য পরিমাণে শ্রমশীল। এই জন্যই তাহাদিগের মধ্যে এই প্রথার অঙ্কুর থাকা

তেও তাহা প্রকৃষ্ট রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই।

পরিশেষে দুইটী কথার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক (১) জাতিভেদ মঙ্গল জনক নহে।(২) প্রকৃতি সহজে পরিবর্ত্তন হইবার নহে। অতএব জাতিভেদ নির্ম্মূল করিবার জন্য উৎসাহিত হইবার সময়ে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে এই উদ্যমে সহসা ফললাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মগণ এই চেষ্টাতে নিযুক্ত হইয়া কেবল তিনটী নূতন বর্ণ সংস্থাপন করিয়াছেন। জাতিভেদবিশিষ্ট সমাজের সহিত বিবাদ করিলে উভয় পক্ষেই ধারাবহন প্রকৃতি বরং বদ্ধমূল হইবেক। অতএব স্বানুবর্ত্তিতা অভাবে কেবল সংকল্প করিয়া আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু যদি কোন প্রথা দূরীকৃত করিলে জাতিভেদ অপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেই প্রথা বালিকা-বিবাহ।

উন্নতিপ্রিয় ব্রাহ্মগণও কেমন ধারাবহন প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন তাহা এই কথাতে ব্যক্ত হইবেক যে তাঁহারা বিস্তর যত্ন করিয়া বিবাহ বিষয়ে ন্যূন বয়সের এক আইন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদিগের এবং সকল সমাজসংস্কারকের স্থূল উদ্দেশ্য এই যে বিবাহ বিষয়ে লোকের যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু যেন ব্যভিচার বৃদ্ধি না ঘটে। শাস্ত্রকারেরা যে অভিসন্ধিতেই হউক, এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে এত বয়সের মধ্যে সকল কন্যার বিবাহ দিতেই হইবেক। ইহাতে স্বাধীনতার ব্যাঘাত হইয়াছিল, কারণ, কেহ বয়ঃক্রমের ঊর্দ্ধ সীমা অতিক্রম করিতে পারিতেন না এবং কন্যাগণ পিতা মাতার গলগ্রহ হইয়া উঠিলেন। অতএব এই নিষেধ মুক্ত করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মগণ ধারাবহন প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকারদিগের ঊর্দ্ধ সংখ্যার স্থলে একটী ন্যূন সংখ্যা প্রবর্ত্তন করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও প্রকারান্তরে স্বাধীনতার বিঘ্ন হয়। মানব মনের প্রকৃতিই এই রূপ যে একটীর স্থলে আর একটী প্রথা স্থাপন না করিলে যেন ফাঁক২ বোধ হয়। আমাদিগের সমাজ এখন শাস্ত্রীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন কন্যার বিবাহ না দিলে নয় এই সংস্কার বিনষ্ট হইলে অনেক উন্নতির সোপান হইবেক।

কন্যার বিবাহ দেওয়া কঠিন বলিয়া আমরা লোকমুখে অনেক আক্ষেপ শুনিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা আক্ষেপ করেন, বোধ হয়, তাঁহারা বিপরীত অবস্থার প্রতি সম্যক্ রূপে লক্ষ্য করেন না। পূর্ব্বে পুত্রসন্তানের সংখ্যাধিক্য জন্য অথবা কৌলীন্য মর্য্যাদা হেতুক কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক কন্যার বিবাহ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে পঞ্চম বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই অনেক কন্যার বিবাহ

হইত। গৌরীদান আদি সেই সময়ের কীর্ত্তি। এখনও ইতর বর্ণদিগের মধ্যে কন্যার সংখ্যা অল্প হইলে, এইরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ এক একটি কন্যার বিস্তর পণ এবং তাহারা অর্থলোলুপ জনক জননীর সম্বল বিশেষ। এস্থলে শ্রোত্রীয় ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগের কথা স্মরণ হইবেক। অতএব যাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থার নিন্দা করেন তাঁহারা কি এইরূপ প্রথার প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করেন? নতুবা, পাত্রের "পাস" সংখ্যা করিয়া পণ দিতে হয় বলিয়া এত কাতরোক্তি কেন?

ধারাবহন প্রকৃতির মূল কি? ইহা বিশ্লেষ কার্য্যে অক্ষমতা এবং দৈব বলে বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিশ্বাস ব্যক্তি বিশেষের উপরে স্থাপিত হইলে তাহা হইতে একপ্রকার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার উদয় হয়—তাহাতে কোন বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধানের বাসনা থাকে না, স্থূলং দুই একটী বিষয় উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত বিশ্বাস অনুসারেই লোকে বিবেচ্য বিষয়ের মর্ম্ম স্থির করে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানসহকারে আত্মসংযমেরদ্বারা আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় তাহাদিগের প্রকৃতি বিভিন্ন। মনুষ্য যে মনের জড়তা জন্য নূতন ভাবের অভ্যুদয় হেতুক ব্যক্তি বা উক্তি বিশেষের অনুসারী হয় তাহা নিতান্ত মূঢ়তার ফল। ইহাতেই লোকে নৃপতি গো ব্রাহ্মণকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন মনে করে।

আজ্ঞানুবর্ত্তী ব্যক্তি আজ্ঞাদাতা দেখিলেই তাহার অধীনতা স্বীকার করে। আজ্ঞাদাতৃগণও তুল্য প্রকৃতি সম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহাই বর্ণসমুচ্চয়ের পারম্পর্য্য বিধানের হেতু। অনন্তর শ্রমশীলতার উন্নতি সহকারে বৃত্তিভেদ এবং স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়ম ইহার উপরে আশ্রয় করিয়াছে।

দুর্ব্বল ব্যক্তি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে তাহার প্রকৃতিতে একপ্রকার কোমলতা উৎপন্ন হয়, তাহাতে লোক বলবানের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে কেবল ধারাবাহিক মতেই কার্য্য করে। তখন আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, মনুষ্য দেবতা অভাবে, লোকাচার অথবা শাস্ত্রোক্তির অনুগামী হয়। এবং যদি কোন প্রকারে এইভক্তি বিচলিত হইয়া যায়, অথচ পাত্রান্তরে স্থাপিত না হয় তাহা হইলে বুদ্ধি বিবেচনার নিয়ামক অভাবে এতাদৃশ লোকের চরিত্রে মহাবিকৃতি উপস্থিত হয়। এদেশীয় লোকেরা এখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এতদ্দেশস্থ প্রাচীন নিরীশ্বরবাদিগণ দৈবশক্তি বিশ্বাস করিতেন না এবং নৈয়ায়িক দিগকে বিশ্লেষ কার্য্যে অপটু বলা অসঙ্গত। বস্তুতঃ ইহারা অন্য হেতু বশতঃ ধারাবহনপ্রকৃতির অপনয়নে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরবাদী হউন বা নিরীশ্বরবাদী হউন, এতদ্দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সকলেই দুটী বিষয়ে ঐক্য ছিলেন। ১। জীবনের উদ্দেশ্য সুখাভাব।

সজ্ঞানে যে সুখলাভ হয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে বিচ্ছিন্ন করা অসাধ্য অতএব নির্ব্বাণস্বরূপ সুখই সর্ব্ব প্রধান। নির্ব্বাণ লাভের জন্য চিত্তচাঞ্চল্যজনক কার্য্য মাত্রই নিষিদ্ধ; ধারাবহন প্রভৃতি এই নিষেধের মহোপযোগী। সুতরাং জ্ঞানী মূর্খ উভয়েই ধারাবহন বিষয়ে এক মতাবলম্বী হইয়া ছিলেন।

ইহার মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ একথা স্বীকার করিলেও একথা প্রসিদ্ধ যে সুখ লাভ করিব মনে করিয়া যে কোন কার্য্য কর তাহাতে সুখ হয় না কিন্তু অন্য উদ্দেশে যে কার্য্যেই তদ্গত চিত্তে প্রবৃত্ত হও তাহাতেই সুখ লাভ হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্র বেত্তৃগণের প্রতিষ্ঠিত বৈরাগ্যের উপাসনাতে কোন আতিশয্য নাই। সংসারের উৎকৃষ্ট কার্য্যকে জীবনের উদ্দেশ্য গণ্য করিলেই উভয় দিক্ রক্ষা হয়। যথা কোমৎ বলেন উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা কার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ এবং প্রীতি সকল ক্রিয়ার নিয়ম হউক। শ্রীবঃ

কল্পতরু।*

গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর, আমরা কাব্যই বলিয়াই থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র। মনুষ্যচরিত্র ঘোরতর বৈচিত্র বিশিষ্ট। মনুষ্য, স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র বিশিষ্ট; এমন কেহ নাই, যে সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থবিস্মৃত পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎপরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্গুণের ভাগই অধিক, অসদ্গুণের ভাগ অল্প; সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি; যাহার সদ্গুণের ভাগ অল্প, অসদ্গুণের ভাগ অধিক তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্য চরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্য হৃদয় বিভক্ত।

কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য প্র-

* কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ক্যানিঙ লাইব্রেরি। ১২৮১।

থম শ্রেণীর গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতা যুক্ত। কিন্তু কোন২ কবি, এক একভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্যচরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটি যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্২ করিয়া শিখা কর্ত্তব্য, তেমনি মনুষ্য চরিত্রের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্যচরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিক্টর হ্যুগোর গদ্য কাব্যাবলী। যাঁহারা অসদ্ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্য লেখক। ইহাদিগের চূড়ামণি সব বণ্টিস্। ইহাদিগের গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য।

এই সম্প্রদায়ের কেবল দুইজন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত; প্রথম টেকচাঁদ ঠাকুর; দ্বিতীয় হুতোম পেঁচা লেখক। অদ্য সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি।

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঁঙ্গালার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্য পটুতায়, মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায় লিপিচাতুর্য্যে,ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখেকাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ, মধুর হাসি ছত্রে২ প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টি টুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্ব স্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লা গিরিতে" প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। "কল্পতরু" বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এগ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এগ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির

বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিভূত অথচ ভীরু, নির্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্র নাথকে দেখিবেন। যিনি শঠ, বঞ্চক, লুব্ধ, অপরিণামদর্শী, বাচাল, "চালাকদাস" দেখিতে চাহেন, তিনি রামদাসকে দেখিবেন। যে সকল বন্য জন্তুগণ অনতিপূর্ব্বকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালীনাথ ধরে, তাহারা জাজ্বল্যমান; এবং ধরপত্নী গৃহিণীর চূড়া। গবেশচন্দ্র নায়কের চূড়া। তাঁহার মত সুদক্ষ, অস্বার্থপর মনুষ্যরত্নের পরিচয়—পাঠক স্বয়ং লইবেন!

এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্য লেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্য্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ-আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্য্যই আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছুই নাই, যে আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট নহে।

মনুষ্যহৃদয়ের যে সকল সৎপ্রবৃত্তি, গ্রন্থকার তাহা গ্রন্থমধ্যে একবারে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মধুসূদন ভ্রাতৃবৎসল, এবং নিতান্ত নিরীহ,—তদ্ভিন্ন গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকার কাহারও কোন সদ্‌গুণ নাই। মনুষ্যহৃদয়ের সদ্‌গুণের পরিচয়ও লেখকের অভিপ্রেত নহে। যাহা তাঁহার অভিপ্রেত তাহাতে তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন বলিতে হইবে।

গল্পটি অতি সামান্য; সহজে বলিতে ছত্র দুই লাগে। আলালের ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা বৈচিত্র বিশিষ্ট। আর আলালের ঘরের দুলাল উচ্চনীতির আধার—ইহা সেরূপ নহে। আলালের ঘরের দুলালের উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরুর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ। আলালের ঘরের দুলালের লেখক মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনুষ্য চরিত্র দেখিয়া ঘৃণাযুক্ত। কল্পতরুর অপেক্ষা আলালের ঘরের দুলালের সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশয়তা আছে।

যে গ্রন্থের আমরা এত প্রশংসা করিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া লেখকের লিপিপ্রণালীর পরিচয় দিব। যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, গ্রন্থকার তাহাতে একটু বীভৎস রসের অন্যায় অবতারণা করিয়াছেন, এটি রুচির দোষ বটে। ভরসা করি অন্যান্যগুণে প্রীত হইয়া পাঠক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

"মধুসূদন খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ, এবং তাহার চুল কাফ্রির মত, এই অপরাধে নরেন্দ্রনাথ তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিতে পারিতেন না। এরূপ সহোদরকে বারংবার 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়' বলিয়া পত্র লিখিতে ঘৃণা হইত, এই হেতু প্রতিবার বন্ধের পর বাটী হইতে কলিকাতা যাইবার সময়, যত দিন থাকিতে হইবে অনুমান করিয়া, খরচের টাকা একবারে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

পাছে নরেন্দ্রের কোন কষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া মধুসূদনও যেমন করিয়া হউক সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

দুমাস আড়াই মাস অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বাটীতে নিজদেহের কুশল লিখিতেন। একবার, বহুকাল পত্র না পাইয়া মধুসূদন চিন্তাকুল হন, এবং পিসীর পরামর্শে নরেন্দ্রকে কলিকাতায় দেখিতে যান। নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে দুই দিবসের অধিক বাসায় থাকিতে দেন নাই, এবং বন্ধুবর্গের নিকট জ্যেষ্ঠকে বাটীর সরকার বলিয়া পরিচিত করেন, ইহা আমরা উত্তম রূপ জানি। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি জ্যেষ্ঠের প্রতি অনিবার্য্য ঘৃণাকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কি কি করিয়া অবশেষে কি রূপে সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে তদীয় শ্রীচরণ-দ্বয়কে কষ্ট দিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঘটনার বহুকাল, এমন কি ৪।৫ মাস পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথ বাটীর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হইল, পরীক্ষার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি নরেন্দ্র বাড়ী আসিলেন না। ক্রমে পৌষ মাঘ মাসও গেল। তখন মধুসূদনের মনে বড়ই ভাবনা হইল। পিসী গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন বিকালে কান্না ধরিলেন।

'একে পিসী, তায় বয়সে বড়,' সুতরাং শঙ্করী ঠাকুরাণীকে আমরা কখন নাম ধরিয়া ডাকিব না। পিসী অথবা পিসীমা বলিতে থাকিব। হে হৃদয়গ্রাহিপাঠক মহাশয়! যদি আপনার পিসী—আপনাদের 'পরমারাধ্য পরমপূজনীয়' পিতামহের চিরবিধবা কন্যা থাকেন, তবেই আমাদের ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; কিন্তু মধুসূদনের 'ভাই নরেন্দ্র' বাটী আইসে না। রাত্রি যায় দিন আইসে, কিন্তু পিসীমার 'নরেন' ঘরে আইসে না। দিন রাত্রির কেহ নাই, কাজেই তাহারা না চাইতে আইসে, না চাইতে যায়। আমাদের 'নরেনের' পিসী আছেন, সুতরাং তিনি কাঁদিয়াও নরেন্দ্রনাথকে পান না। পাইবেন কেমনে? ছেলের যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখন বাপ মায় পান না, তায়, পিসী কোন্ ছার?

মধুসূদন পিসীমার অনুরোধে তাঁহাদের গ্রামের গদিয়ান বাবুকে নরেন্দ্রনাথের সংবাদ জানিবার জন্য একখানি সজলনয়ন পত্র কলিকাতায় লিখিলেন। উত্তর আসিল যে অগ্রহায়ণ মাস অবধি গদিয়ান বাবু নরেন্দ্রনাথের কোন সমাচার পান নাই।

তখন বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পিসীমার নাকঝাড়াতে উঠান্ সর্ব্বদা সপ্ সপ্ করিতে লাগিল; ঘরের মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত পিসীমার চক্ষের জলে লোণা হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্তা পিসী সর্ব্বদাই নাক ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশিনী-

রাও তাঁহার বাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিল।

পিসী মধুসূদনকে কলিকাতায় নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে যাইবার জন্য বলিলেন। মধু একবার মাত্র কলিকাতায় গিয়াছিলেন; তখন গবেশ রায় সঙ্গে ছিল। এখন গবেশ বিদেশ গিয়াছেন; সুতরাং কলিকাতার গলির ভয়ে, বিনা গবেশ রায়ে, মধুসূদনের যাওয়া ঘটিল না।

একদিন রাত্রি-প্রভাতে পিসীমা ভারি-মুখভার করিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাজ সারা হইল, স্নানে যাইবার জন্য তেলের বাটি গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন; কিন্তু যাইতে পারিলেন না। পরচালায়, বামহস্ত ভূমিতে পাতিয়া, দুইপা ছড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের উত্তর পাড়ার একটী স্ত্রীলোক পরম্পরায় শুনিতে পাইল, যে মধুর পিসী কাঁদিতেছেন। ইহার একটু কবিকল্পনা ছিল; পাড়াগেঁয়ে অনেক স্ত্রীলোকেরই থাকে। 'ঘটকদের নরেন্দ্র কাল্ রেতে বাড়ী এসেছিল, সকাল বেলা তারে সাপে খেয়েছে, তাই তার পিসী কেঁদে গাঁ মাথায় করেছে' যাহাকে দেখে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঘটক-বাড়ী অভিমুখে চলিল। যখন পঁহুছিল, তখন বাড়ী লোকারণ্য; বোধ হয় যেন ব্রহ্মাণ্ডে আর স্ত্রীলোক নাই। সকলেই বলিতেছে 'অমন ছেলে হয় না, হবে না।' ইহারই মধ্যে কেহ আর এক জনের নিকট 'সুদের পয়সা কটা' চাহিতেছে। পিসীর দিকে যেই মুখ ফিরায়, অমনি তাহার চক্ষু ছলছল, কে যেন লঙ্কা বাটিয়া দেয়; যেই বিমুখ হয়, অমনি ভাবান্তর, যেন 'পিসীর' দুঃখের কথা তাহারা শুনেও নাই। কিন্তু পিসীমা এক-চিত্তে এক-ভাবে, বসিয়া কেবল চীৎকার করিতেছেন। রোদনের বিরাম নাই, বৈজাত্য নাই। অল্পবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক—সেও কাঁদিতে গিয়াছিল—ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল 'বেটী বসে কাঁদ্‌ছে, যেন আলকাৎরা মাখান বড় চরকা ঘুরছে।'

একটু একটু কাঁদিয়া যখন সকলেই একেএকে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন পিসীমা রোদনের বেগ কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন, দুটী একটী কথা কহিতে লাগিলেন।

'আহা বাছা আমার এত গুণের ছেলে! এমন ছেলে কি কারও হয়। ভাই মরেছে, সয়েছে। বলি, নরেন্দ্র বড় হবে, আমার সকল দুঃখ যাবে,—' পিসীমা নাক ঝাড়িলেন, একটী স্ত্রীলোকের গায় লাগিল, সে নাক তুলিয়া চলিয়া গেল। পিসীর কি দুঃখ, নরেন্দ্র হইতে কেমন করিয়াই বা সে দুঃখ মোচন হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিসী-লোকের জ্ঞান পিসীদেরই আছে, নরলোকের সম্ভবে না।

পিসী পুনশ্চ চীৎকার ধরিলেন; আবার কান্নার বেগ থামাইলেন, আবার

কথা আরম্ভ হইল। 'নরেন্ আমার পিসীমা বৈ পিসী বলে না, এমন ছেলে কোথায় পাব? আর কি এমন হবে? নরেন্ তুই এক বার দেখা দে, আবার যাস্। প্রাণ না বেরুলে যে মরণ হয় না। এখন আমি কোথায় যাই?'

নানা ছাঁদে বিনাইয়া পিসী কাঁদিতেছেন, কথা কহিতেছেন, আবার কাঁদিতেছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ কেহই কিছু জানিতে পারে না। অবশেষে এক জন বৃদ্ধা বলিল 'যা হয়েছে, তা ফের্‌বার নয়, এখন তোমার মধু বেঁচে থাকুক, আশীর্ব্বাদ কর। কপালে যা ছিল, হ'ল; কাঁদ্‌লে কি হবে। শুন্‌লে কবে? এ দারুণ কথা ব'ল্লে কে, কেমন ক'রেই বা ব'ল্লে?'

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন। 'ষাট্! ষাট্! বুড়ীর দাস আমার! তা কেন হবে? ছেলের খপর পাই নাই; তায় রেতে স্বপন দেখেছি, তাই বড় ভাবনা হয়েছে।'

নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় নাই, একথা তখন জানিতে পারিয়া দুইজন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। পিসী তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

'নিজের ভাল দেখিলে মন্দ হয়' তাহাতেই পিসীর এত শোক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রি-শেষে পিসী স্বপ্ন দেখেন যে মুলুকের ছোট লাট সাহেব মরেছে, তাতে লাটহস্তী ক্ষেপে বেড়ায়। পথে নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শুঁড়ের দ্বারা মস্তকে তুলিয়া লইয়া গিয়া লাটসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, তাহার পর নরেন্দ্রনাথ মেম বিবাহ করিয়াছে। তাহাতে পিসী মা বলিলেন 'জাত যা'ক তবুও বউ নিয়ে ঘরে এস' —নরেন্দ্রনাথ এল না। তখন পিসী নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিয়া আনিতে চাহিলেন। নরেন্দ্র হাত ছাড়াইয়া লইল।' অমনি পিসীর নিদ্রাভঙ্গ।

ইহাতেই পিসীর শঙ্কা, শঙ্কা হইতে দুঃখ, দুঃখ হইতে শোক, শোক হইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে গৃহকার্য্য সারা, গুণ্ গুণ্ স্বর হইতে পরিশেষে পা ছড়াইয়া চীৎকার ধ্বনিতে কান্না ও পাড়ার লোক জোটা।

অনেক প্রবোধে পিসীমার কান্নার 'ইতি' হইল। আমরাও পাঠক বর্গকে বিরাম দিবার জন্য পরিচ্ছেদের উপসংহার করিলাম।"

রজনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা। বড় একটা ধূলা কাদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম চন্দন কাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা, কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনেং বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে। বিমাতা বন্ধ্যা।

দেখিলাম পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিল। আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে বেদমন্ত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামি আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকটে গেলাম।

বলিলাম "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাতা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দি, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গলাই* রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন।

"কেন কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদ মন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এ টুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তবে পড়েন কেন?

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু দেখিলাম যে একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম,

"ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল,

তবে আপনি বেদগান করেন কেন?”

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে,এক—“ইহাতেই কোকিলের সুখ” —দ্বিতীয়, “স্ত্রী কোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।” কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম,

“গাইয়াই কোকিলের সুখ।”

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?

স। কোন্ কথা গুলি সুখকর—সামান্যা গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুনগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম। বলিলাম, “কোকিল গায়, কোকিলপত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠ স্বরের স্ফূর্ত্তি সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন?”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “আমার আপনার মনকে। মন, আত্মার অনুরাগী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।”

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক্ বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি, তাহাকেই মানিব। যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীরও মনের প্রভেদ কেন মানিব। যে কিছু কার্য্য করিতেছ সকলই শরীরের কার্য্য--কোন্‌টি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন, শরীরের ক্রিয়া* মাত্র।

স। ভাল, ভাল। তবে আর একটু এসো। বলনা কেন,যে শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র? শুনিয়াছি তোমরা পঞ্চভূত মাননা—তোমরা বহুভূতবাদী,তাই হউক; বলনা কেন যে ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীর রূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম

* Function of the Brain.

করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম; এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এসকল ভণ্ডামি কেন?"

স। কোনটা ভণ্ডামি?

আমি। এই নল চালা, হাত গণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতি পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে। ইহা মানি, যে হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে, যে ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নল চালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর, যে, যাহা ইংরেজেরা জানে তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্ষ বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিল, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া,তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—

স। কিন্তু কি?

আমি। কন্যা কই?

স। এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্যা কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভাল বাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে, যে তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভাল বাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি, কিন্তু যে তোমাকে এখন ভাল বাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক। তোমাকে কেহ ভাল বাসে? তুমি কি তাহাকে জান?

আমি। আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভাল বাসে, এমত আমি জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি!

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পুর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভাল বাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব। স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কল কল গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যে সৈকত ভূমি; তাহার প্রান্ত ভাগে অর্দ্ধ জলমগ্না—কে?

রজনী!

পরদিন প্রভাতে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?"

আমি। কাণা ফুল ওয়ালী।

স। কাণা?

আমি। জন্মান্ধ।

স। আশ্চর্য্য! কিন্তু সেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভাল বাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই দিবসেই আমার নিকট রজনীর পিতা রাজচন্দ্র, একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিল। আমি রাজচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"কি, রাজচন্দ্র সম্বাদ কি? তোমার কন্যার কোন সম্বাদ পাইয়াছ কি?"

রাজচন্দ্র বলিল, "মহাশয়, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি ইঁহার সঙ্গে কিছু কথা বার্ত্তা কহুন; আমি সেই জন্যই ইঁহাকে লইয়া আসিয়াছি। আপনি আমাদিগের মুরুব্বি; আপনার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিব না। বিশেষ আমি মূর্খ লোক।"

এই বলিয়া রাজচন্দ্র সঙ্গীকে দেখাইয়া দিল। তাঁহাকে ভদ্রলোক দেখিয়া বসিতে বলিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। রাজচন্দ্র বাহিরে গিয়া বসিল। কথোপকথন আরম্ভার্থ, জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রাজচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব্বে কি আপনার আলাপ ছিল?"

তিনি বলিলেন, "না। আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমর নাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর। আমি যে জন্য রাজচন্দ্রের কাছে আসিয়াছি, তাহা আপনার নিকট জানাইবার জন্য রাজচন্দ্র আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

এই বলিয়া অমরনাথ, আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড়২ চক্ষুঃ, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের একটু বাড়াবাড়ি; কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্‌টান শেষ হইলে, অমরনাথ, নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে যাহা, বাক্য এবং কার্য্যদ্বারা চিত্রিত হই-

য়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র, কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এসকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেসডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা, পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একেএকে তাহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ, কোমতের ত্রৈকালিক উন্নতি সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হকস্লীর কথা আসিল। হকস্লী হইতে ওয়েন, ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্বপাণ্ডিত্য স্রোতঃ আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্রের একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, কেন না সে নিরুদ্দেশ, আছে কি না সংশয়? যাই হৌক, তাহাকে পাওয়া গেলে যাইতেও পারে। আপনি তাহার সঙ্গে গোপালের সম্বন্ধ করিয়াছেন। যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে গোপালকেই দেওয়া কি এখনও আপনার মত?"

ইহার অভিসন্ধি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম,

"কি জানি। তাহাকে কি অবস্থায় কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহাতে গোপাল আর তাহাকে গ্রহণ করিবে কি না তাহা ত বলিতে পারি না।"

অমর। যদি গোপাল, সম্মতই থাকে?

আমি বলিলাম, "যদি তাহাকে পাওয়া যায়, বিবাহের কোন বিঘ্ন না থাকে, গোপালও অসম্মত না হয়—তবে গোপালকেই—"

আমার সেই স্বপ্নটি মনে পড়িল। আমি কি বলিয়া কথা শেষ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অমরনাথ বলিল, "যদি

আপনাদিগের মত হয়, তবে আমি রজনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। আমার এই কথা বলিতে আসা।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। রাজচন্দ্র আপনার অনভিমতে কিছু করিবেন না বলিয়া আপনার নিকট আনিয়াছে।"

অন্ধ ফুলওয়ালীর এরূপ বর, আমরা কেহ কখন স্বপ্নেও ভরসা করি নাই। যদি ঘটে, তবে রজনীর বড় সৌভাগ্য বটে। তাহার প্রতিবন্ধকতা করা আমার অকর্ত্তব্য। কিন্তু গুটি দুই তিন কথা মনে পড়িল। প্রথমতঃ গোপালকে কথা দেওয়া হইয়াছে। ধনাদির লোভে কি বাক্যলঙ্ঘনে পরামর্শ দিব? দ্বিতীয়তঃ এব্যক্তি অপরিচিত; তৃতীয়তঃ—দূর হৌক, তৃতীয়টি ছাড়িয়া দাও। আমার বোধ হইল, যখন রাজচন্দ্র আমার উপর ভার দিয়াছে, তখন কিছু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। আমি বলিলাম,

"এখন রজনীর কোন সন্ধানই নাই। যতদিন না তাহাকে পাওয়া যায় ততদিন এসকল কথার আন্দোলন বৃথা। এখন এসকল কথা থাক। তাহাকে পাওয়া গেলে, এ বিষয়ে মহাশয়ের সঙ্গে কথা বার্ত্তা হইবে।"

অমরনাথ বলিলেন, "আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হইলেই তাহাকে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।"

আমার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল—বলিলাম, "তবে কি আপনি তাহার কোন সন্ধান জানেন?"

অমর। না। কিন্তু সন্ধান করিতে পারি।

আমি। তাহা আমরাও করিতেছি। কই আমরা ত কোন উদ্দেশ পাইতেছি না?

অমর। আপনারা পাইবেন না—কিন্তু আমি পল্লীগ্রামে নানা স্থানে যাই। আমি অবশ্য সন্ধান পাইব।

কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যে এ ব্যক্তি নিশ্চিত রজনীর সন্ধান জানে, কিন্তু বলিতেছে না। আমি তখন স্থির করিলাম যে ইহার দ্বারা রজনীর পুনরুদ্দেশ করিব। তাহাকে বলিলাম,

"ভালই। আপনার ন্যায় সুপাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার সন্ধান করুন্। যদি সন্ধান পান, তবে আমাদিগকে সম্বাদ দিবেন। তাহাকে পাওয়া গেলে, আপনার সঙ্গে পুনর্ব্বার এবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে।"

অমরনাথ অতি চতুর। বলিলেন, "তবে বুঝিতেছি, যে তাহাকে পাওয়া গেলে পরে, আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার প্রতি আপনার আপত্তি নাই?"

আমি বলিলাম, "রজনী বয়ঃস্থা—বোধ হয়, তাহাকেও আমাদিগের একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইবে।

তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কি প্রকারে আপনাকে কথা দিব?”

অমরনাথ, হাসিয়া বলিল, “যখন গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, তখন কি রজনীর মত লইয়াছিলেন?”

এই প্রশ্নে আমার অপ্রতিভ হইবার কথা, কিন্তু সে ভাব আমার মনে আসিল না—আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।—তবে কি রজনীর সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছে? নহিলে রজনীর অনভিমতে যে গোপালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছিলাম, এ কথা জানিল কি প্রকারে? এই কি রজনীর জার? আবার মনে হইল, পাপিষ্ঠ হীরালালের কাছে এ একথা জানিয়া থাকিবে, অথবা ইহার পিতার কাছে কথা বাহির করিয়া লইয়া থাকিবে, অথবা অনুভবে বুঝিয়া থাকিবে। যাহা হউক, সবিশেষ জানিতে হইল। বলিলাম, “মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, মার্জ্জনা করিবেন ত?”

অমর। কি? আজ্ঞা করুন।

আমি। আপনি কি এই প্রথম সংসার করিবেন, না আর বিবাহ আছে?

অমর। এই প্রথম বিবাহ করিব।

আমি। আপনি দেখিতেছি ভদ্রসন্তান, বিদ্বান্, সুপুরুষ, সর্ব্বপ্রকারে সুজন, আপনার ন্যায় জামাতা, সকলেই আদর করিয়া গ্রহণ করে। আপনি মনে করিলে এই বঙ্গদেশের অতিপ্রধান ঘরে অতি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করিতে পারেন। আপনি দরিদ্র-কন্যা অন্ধ রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

অমর। দেখুন, আমি বালক নহি। যেখানে বিবাহ করিব, বালিকা বিবাহ করিতে হইবে। রজনীর ন্যায় বয়ঃস্থা কন্যা কোথায় পাইব?

আমি। আপনি কি রজনীকে দেখিয়াছেন?

অমর। দেখিয়াছি।

আমি। কিছু মনে করিবেন না—দায়ে পড়িয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। কোথায় দেখিলেন?

অমর। কলিকাতাতেই দেখিয়াছি, সে ফুল বেচে, অনেকদিন হইতে দেখি।

এইবার অমরনাথ ঠকিল। রজনী কোথাও ফুল বেচিত না, কেবল আমাদের বাড়ী ফুল লইয়া আসিত। অতএব অমরনাথ একটি মিথ্যা কথা বলিল। আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, যে সে রজনীর পলায়নের পর তাহাকে দেখিয়াছে। সে কথা কিছু বলিলাম না। কেবল বলিলাম,

“রজনী বয়ঃস্থা বটে, কিন্তু তাহার দুইটি গুরুতর দোষ আছে। আপনি ভদ্রলোক, হঠাৎ তাহাকে বিবাহ করিবেন, অতএব আমার সেগুলি দেখাইয়া দেওয়া উচিত। এক সে অতি সামান্য ইতর লোকের কন্যা—অতি দরিদ্র।”

অমর। ইতর ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু আমাদের স্বজাতীয়—তাহাতে দোষ

নাই। আর দারিদ্র্যের জন্য আসিয়া যায় না। রজনীর ধন না থাকে, আমার আছে, তাহাতে আমাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

আমি। সে জন্মান্ধ। অন্ধপত্নী লইয়া কি প্রকারে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন?

অমর। যে খেলে সে কাণা কড়িতেও খেলে। যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে জানে, সে কাণা স্ত্রী লইয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

আমি। আপনার সন্তানাদি অন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

অমর। কে বলিয়াছে? আমার দৌহিত্র পৌত্রাদির মধ্যে কেহ কেহ অন্ধ হইতে পারে বটে; না হইতেও পারে। আমি অত ভাবিয়া কাজ করিতে চাহি না। যাহা অনিশ্চিত, ঘটিলেও বহু কালে ঘটিবে, তাহার জন্য উপস্থিত কালে বিড়ম্বনা ভোগ করা, বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

আমি। আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিতে পারেন। তবে আমি যদি সাহায্য করিয়া আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে কলিকাতায় অনেক বয়ঃস্থা কন্যা পাওয়া যায়। বলেন ত আপনাকে তাঁহাদিগের রক্ষকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে পারি।

অমর নাথ, তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "যদি অত পীড়াপীড়ি করিলেন, তবে আমাকে অগত্যা সকল কথা বলিতে হইল। বাস্তবিক, সে কথা আমার আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু যে কথা ভদ্রলোকে মুখে আনিতে লজ্জা করে, তাহা যে এতক্ষণ বলিতে পারি নাই, সে জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না। যাহা বলিতেছি, ইহা কেবল আপনিই জানিলেন, আর কন্যাকর্ত্তাকে জানাইবেন, আর কাহাকেও বলিবার আবশ্যকতা হইবে না। কোন ভদ্র ঘরে, আমাকে কন্যা দিবে না। আমাদিগের বংশে একটি গুরুতর কলঙ্ক আছে। আমার খুল্লতাতের একটি কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এ জন্য ভদ্রপরিবারে, আমাকে কন্যা দিবেও না, আমিও সেরূপ সম্বন্ধ লজ্জাবশতঃ খুঁজি নাই। এ বয়স্ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ না হইবার কারণই এই। এ কথা আমার প্রথমেই বলা উচিত ছিল—কিন্তু আপনার কুলকলঙ্ক কে আপন মুখে সহসা ব্যক্ত করিতে পারে? বিশেষ আপনাদিগের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। ইহার পরে বলিব, ইচ্ছা ছিল। সে অপরাধ লইবেন না। বোধ করেন কি যে ইহাতে রজনীর পিতা কি কোন আপত্তি করিবেন?"

আমি সুতরাং নিরস্ত হইলাম। অমরনাথ সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিলেন। কেবল একটি কথা এখনও গোপন রহিল। রজনী কোথায়, অমরনাথ তাহা জানেন, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। তিনি যেরূপ সুচতুর, কথা তাঁহার

কাছে বাহির করিয়াও লওয়া যায় না। এদিকে গোপালকে বাক্যদত্ত আছি—অমরনাথকে কথা দিতে পারিতেছি না—না দিলে রজনীকে পাওয়া যায় না। বিষম সঙ্কটে পড়িয়া গোপালকে ডাকাইলাম।

গোপাল আসিল। অমর নাথের সাক্ষাতে, গোপালকে বলিলাম,

"রজনীকে ত পাওয়া গেল না—এখন কি কর্ত্তব্য?"

গোপাল বিরক্তভাবে বলিল, "কর্ত্তব্য আর কি?"

আমি বলিলাম, "যদি কেহ রীতিমত তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়, তবে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে।"

গোপাল। কে যাইবে?

আমি। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে তোমারই যাওয়া কর্ত্তব্য।

গোপাল পূর্ব্ববৎ বিরক্তির সহিত বলিল, "আমি যাইতে পারিব না।"

আমি। আমরা স্থির করিয়াছি, যে, যে রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া আসিবে,সে অপাত্র না হইলে, তাহার সঙ্গেই রজনীর বিবাহ দিব।

গোপাল। সেই ভাল। আর কাহাকে বলুন। আমি রজনীকে খুঁজিয়া আনিতে পারিব না—তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহি না। আমার পরিবার আছে।

এই বলিয়া গোপাল উঠিয়া গেল। অমরনাথ বলিলেন, "এখন আপনি সত্যচ্যুতির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন?"

আমি। অতএব আপনি রজনীর সন্ধান করিয়া তাহাকে আনুন।

অমর। তাহার পর আপনারা এ বিবাহে আর কোন আপত্তি করিবেন না?

সাত পাঁচ ভাবিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্নটি দুই চারিবার স্মরণ করিয়া, বলিলাম, "আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

অমরনাথ, সন্দিহান হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মনে করিল বুঝি, যে আমার অঙ্গীকার দ্ব্যর্থ। যাহা হউক, আর কিছু বলিতে পারিল না। "রজনীকে সন্ধান করিয়া লইয়া আসিব, নচেৎ আর আসিব না।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

অমরনাথ বাহির হইবামাত্র, আমি "বাদল" কে ডাকিলাম। বাদল একটি ভদ্রসন্তান—বাদলের দিনে জন্ম বলিয়া, সকলে তাহাকে বাদল বলে—কোন কর্ম্ম কাজ করে না—আমাদিগের বাড়ীতে থাকে—বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, এবং আমার নিতান্ত প্রিয়। বাদল আসিল। আমি বাদলকে বলিলাম,

"যে বাবুটি এই বাহির হইয়া যাইতেছেন উঁহাকে দেখিয়াছ?"

বাদল। দেখিয়াছি।

আমি। উহার পিছু পিছু যাও। ও যদি গাড়িতে আসিয়া থাকে, তবে আমার বগি এতক্ষণ তৈয়ার আছে, তাহা লইয়া

তুমি উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। আর যদি দেখ যে হাঁটিয়াই যাইতেছে, তুমিও সেই রূপে উহার পিছু পিছু যাইবে। কিন্তু দেখিও, ও যেন কিছুতেই না জানিতে পারে, যে তুমি উহার পিছু লইয়াছ।

বা। তার পর।

আমি। লোকটাকে, কোথায় থাকে, জানিয়া আসিবে।

বাদল তখনই ছুটিল।

ইহার পর রাজচন্দ্রকে বিদায় দিলাম বলিয়া দিলাম "এক্ষণে এ বিবাহে সম্মত হইও না। রজনীকে পাওয়া গেলে যাহা হয় হইবে।" রাজচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে গেল।

তাহার পর আমাদিগের একজন সরকার, নাম মার্কণ্ডদেব গাঙ্গুলি, তাহাকে সেই দিনের ট্রেনেই শান্তিপুর পাঠাইলাম। বলিয়া দিলাম যে "শান্তিপুরে অমরনাথ ঘোষ কেহ আছে কি না, যদি থাকে, তবে সে কে, কিরূপ বিষয়াপন্ন, কি চরিত্রের লোক, এবং এপর্য্যন্ত কেন তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহা সবিশেষ জানিয়া আসিবে। অতি সত্বরেই আসিবে।"

রাত্রি নয়টার সময়ে বাদল ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম যে "সম্বাদ কি?"

বাদল বলিল। বাবু গাড়ি করিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গাড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া দুই শত হাত তফাৎ পিছু পিছু গেলাম। চোর বাগানের মোড়ে তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ি বিদায় দিলেন। আমিও সেই খানে বগি হইতে নামিলাম। তিনি চোর বাগানের ভিতরে অতি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে, একটি উত্তম বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি সেই দ্বারের নিকট বসিলাম। দ্বার আর কেহ খুলিল না। এত-রাত্রি অবধি সেই জন্য বসিয়াছিলাম। কেহ দ্বারও খুলিল না—বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ পাইলাম না। প্রতিবাসী-দিগকে ছলক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সকলেই বলে, "কে এক বাবু বাড়ীতে থাকে বটে, আমরা বিশেষ জানিনা। আসে যায় দেখিতে পাই।" অগত্যা ফিরিয়া আসিয়াছি।

আমি বলিলাম, "কালি অতিভোরে আবার যাইও।"

বাদল পরদিন অতিপ্রত্যূষে আবার গেল। তখনই আবার ফিরিয়া আসিল বলিল,

"মহাশয়, পাখী পলাইয়াছে।"

"সে কি হে?"

"খাঁচা খালি।"

"সে কি?"

"আজ গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর দ্বার খোলা—বাড়ীতে কোথায় কেহ নাই। প্রতিবাসীরা কেহ কিছু বলিতে পারিলনা।"

দুই তিন দিনে মার্কণ্ড শান্তিপুর হইতে ফিরিল। সে বলিল, "অমরনাথ ঘোষের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি বাড়ী

নাই। তিনি অতি ধনাঢ্য, বড় ভদ্রলোক। তাঁহার একটি খুড়াত ভগিনী বাহির হইয়া যাওয়ায়, যোগ্য ঘরে তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনা নাই, বলিয়া তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহাদিগের কুলে সেই কলঙ্ক হওয়া অবধি তিনি বড় আর দেশে থাকেন না—প্রায় বিদেশে বিদেশেই ফিরেন।"

তাহারই দুই একদিন পরে ডাকে এক পত্র পাইলাম। পত্র এই।

"সবিনয় নিবেদন।

আমার পশ্চাতে লোক লাগাইয়াছেন কেন? আপনি ভদ্রলোক—আমিও তাই। ভদ্রোচিত ব্যবহারেরই প্রত্যাশা করি।

শ্রীঅমর নাথ ঘোষ।"

ডাকের মোহর—কলিকাতার

আমি মনে২ নিতান্ত লজ্জিত হইলাম।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারতে যবন। শ্রী কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা।

"ভারত মাতার" ন্যায়, এখানি রূপক। ইহাতে ভাল বলিতে পারি, এমত কিছুই দেখিলাম না।

বালা-বোধিনী। প্রথম ভাগ। শ্রীমধুসূদন সেন প্রণীত। ঢাকা

আমরা এ গ্রন্থের এই রূপ সমালোচনা করিব। ইহা দীর্ঘে তিন ইঞ্চি, প্রস্থে দুই ইঞ্চি। এবং উর্দ্ধে ১৫ পৃষ্ঠা। বোধ হয় লিলিপটের আমদানি--গলিবরের পকেটে আসিয়াছিল। গ্রন্থের ভিতরে, মাথা, মুণ্ড, ছাই, ভস্ম।

ভূগোলসার। অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ শ্রী নরেন্দ্র নাথ কোঙর সঙ্কলিত। কলিকাতা।

সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।

৩। **পদ্য পাঠাবলী।** প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীলোকনাথ গুহ প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

এই গ্রন্থদ্বয়, সমালোচনার অভিপ্রায়ে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে কি না, আমরা ঠিক্ জানিতে পারি নাই। যাহা হউক শিশু শিক্ষার্থ প্রণীত গ্রন্থ সম্বন্ধে সর্ব্বাচর আমাদিগের বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে না।

খাদ্য।

১ সংখ্যা।

সকলে রাত্রিদিন খাইবার জন্য ব্যস্ত। মনুষ্যের প্রধান কার্য্য আহারান্বেষণ। কিন্তু কি খাই? কেন খাই? কি খাওয়া উচিত? তাহা সকলেরই কিছু২ জানা কর্ত্তব্য।

সকলেই পরামর্শ দেন যাহা পুষ্টিকর, তাহাই খাইতে হয়। কিন্তু কোন্ সামগ্রী পুষ্টিকর? ইহার সচরাচর উত্তর এই, যাহাতে শরীর গড়ে, তাহাই পুষ্টিকর। কিন্তু শরীর কিসে গঠিত? তাহা কোন্ দ্রব্যেই বা পাওয়া যাইবে?

শারীরতত্ত্ববিদেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যে সুস্থ, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, মনুষ্যের শরীরে প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ,* জল। অতএব শরীর প্রধানতঃ জলে গঠিত, এবং খাদ্যপেয়র মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলেরই অধিক প্রয়োজন। যাহাতে শরীর গড়ে তাহাই যদি পুষ্টিকর হয়, তবে জলই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। বাস্তবিক, একথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাও নহে, তবে জলের অভাব কাহারও ঘটে না, বলিয়া কেহ কাহাকেও কখন জল খাইতে পরামর্শ দেয় না।

আর জল শরীর নির্ম্মাণকারী বলিয়া, ক্রমাগত গেলাস গেলাস জলপান করিতে হইবে, এমত নহে। যত জল খাইবে, তত শরীরের উপকার হইবে এমত নহে। শরীরের যে পরিমাণে জলের আবশ্যক, তাহার উপর বিন্দুমাত্র খাইলে, তাহা তখনই প্রস্রাবাদির দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে। না হইলে উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনিষ্ট ঘটিবে।

জলভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী সম্বন্ধেও এই রূপ। অন্যান্য সামগ্রী যাহা শরীরে আছে, তাহা জলের তুলনায় অতি অল্প পরিমাণে আছে; কিন্তু অল্প পরিমাণে থাকুক, আর অধিক পরিমাণে থাকুক সকলই তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। কোনটির অল্পতা ঘটিলে, শরীরের অনিষ্ট ঘটিবে; আধিক্য ঘটিলে, যতটুকু বেশী হইয়াছে, ততটুকু পরিত্যক্ত হইবে; না পরিত্যক্ত হইলে, অনিষ্ট ঘটিবে।

অতএব শারীরিক সামগ্রী সকলই তুল্যরূপে পুষ্টিকর। এমন খাদ্য খাইতে হইবে যে তাহাতে সকলই পাওয়া যায়।

দেখা যাউক, শরীরের গঠন সামগ্রী কি কি। অস্থি, রক্ত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, ত্বক্, প্রভৃতির সমষ্টির নাম শরীর। সকলগুলিতে জল আছে; অনেকগুলিতে জলের ভাগই অধিক।

জলভিন্ন শুষ্ক পদার্থ যাহা আছে, তাহা দ্বিবিধ: কতকগুলি জৈব, চেতন জীব বা উদ্ভিদেই প্রাপ্য, আর কতকগুলি অচে-

* ১৫৪ ভাগের মধ্যে ১১৬ ভাগ। *Quetelet.*

তন বা ধাতব পদার্থ। ধাতব পদার্থ পরিমাণে অতি অল্প।

জৈব পদার্থের মধ্যে একটি প্রধানের নাম, গ্লুটেন। ময়দা মাখিয়া, তাহা ক্রমে২ কচলাইয়া২ জলে ধৌত করিলে, যে আটার মত অবশিষ্ট ভাগ থাকে, তাহা গ্লুটেনের উদাহরণ। ছিন্ন মাংসের রক্ত উত্তম করিয়া ধৌত করিয়া ফেলিয়া, তাহা স্পিরিটে রাখিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, পূর্ব্বে তাহার ফিব্রিন নাম ব্যবহার হইত, এক্ষণে উহাকে মাস্কুলাইন বা মাংসিক বলা যায়। উহা ও গ্লুটেন একই পদার্থ বলা যাইতে পারে। শত ভাগ মাংসে, ৭৮ভাগ জল বা রক্ত, ১৯ ভাগ মাংসিক, এবং তিন ভাগ মেদ।

ডিম্বের যে অংশ শ্বেত, তাহাতে দুই ভাগ জল, অবশিষ্ট এক ভাগ কিঞ্চিৎ মেদ ভিন্ন যাহা থাকে তাহার আলবুমেন নাম দেওয়া যায়। গ্লুটেন মাংসিক, এবং এই আলবুমেন, বা আণ্ডিক, প্রায় একই পদার্থ। মাংস পিষিয়া রস বাহির করিয়া তাহা জ্বালদিয়া ফুটাইলে, এই আণ্ডিক উপরে ভাসিতে থাকে।

মেদ, বা চরবি, প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মাংসে যে ইহা আছে, তাহা কথিত হইয়াছে। শুষ্ক রক্তে ইহা শত-ভাগে তিন ভাগ আছে।— মস্তিষ্কের শ্বেতভাগে ২১ভাগ মেদ, এবং কপিশে ৬ভাগ মেদ। মনুষ্য শরীরে সর্ব্ব সমেত কতটুকু মেদ থাকে তাহা স্থির হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়, শুষ্কপদার্থের পঁচিশ ভা-গের একভাগ হইতে পারে।

ধাতব পদার্থ, অধিকাংশ, অস্থিতে আছে। ধাতব পদার্থ নাম সকল, বি-জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বোধগম্য নহে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রক্তে লৌহ, চুলে গন্ধক, এবং অন্যান্য স্থানে অন্যান্য সামগ্রী আছে।*

মস্যুর কোয়েটেলেটের পরীক্ষানুসারে যে মনুষ্য ৭৭ সের ওজনে, তাহার শরীরে ৫৮ সের জল। তাহা বাদে যে শুষ্ক-ভাগ ১৯ সের থাকে, তাহার মধ্যে—

মেদ		... ...	/৩
অস্থি	জৈবপদার্থ	...	/২ ১/৩
	অজৈব বা ধাতব		/৪ ২/৩
অবশিষ্ট —			
রক্ত, মাংস, ত্বক্		... ...	/৯
মোট			/১৯

* "The bones specially select and appropriate phosphate of lime, while the muscles take phosphate of magnesia and phosphate of potash. The cartilages build in soda, in preference to potash. The bones and teeth specially extract fluorine. Silica is almost monopolised by the hair, skin, and nails of man...Iron abound chiefly in the colouring matter of the blood (*hematin*), in the black pigment of the eye, and in the hair. Sulphur exists largelyin hair, and phosphorus or phosphoric acid in the brain." *Johnstone's Chemistry of Common Life*, vol. ii, p. 372.

শুষ্ক মাংসের শত ভাগে—

মাংসিক বা গ্লুটেন	৮৪ ভাগ
মেদ	৭ ,,
রক্ত এবং ধাতব লবণ	৯ ,,
	১০০

শুষ্ক রক্তের শতভাগের মধ্যে—

ফিব্রিন, আলবুমেন ইত্যাদি	৯২ ভাগ
মেদ, ও অল্প শর্করা	৩ ,,
ধাতব লবণাদি	৫ ,,
	১০০

অতএব শরীর গঠনের যে সকল সামগ্রী তন্মধ্যে প্রধান জল, তৎপরে গ্লুটেন, তৎপরে মেদ, এবং ধাতব পদার্থ।

শরীরের এই মূলধন। কথিত হইয়াছে যে ইহার কোনটির আধিক্য ঘটিলে, শরীরে তাহা গৃহীত হয় না, পরিত্যক্ত হয়। তবে নিত্য সঞ্চয়ের অর্থাৎ আহারে প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন, এই যে, অহরহ, পলকে পলকে, মুহুর্মুহুঃ, এই মূলধন ব্যয়িত হইতেছে। যাহা ব্যয়িত হইতেছে, তৎস্থলে নূতন সঞ্চয় না হইতে থাকিলে, অল্প কালে, মূলধন ফুরাইয়া যাইবে। মহাজন ফেইল হইবে।

দেখা যাউক, কি প্রকারে এই মূলধন মুহুর্মুহুঃ ব্যয়িত হইতেছে।

১ম। নিশ্বাস প্রশ্বাস। আমরা নিশ্বাসে বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনস্ত্যাগ করি। যাহা গ্রহণ করি, ঠিক তাহাই আর ফিরিয়া বাহির হয় না। উপযুক্ত মত পরীক্ষার দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়, যে ঐ বায়ুর গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১। সহজ বায়ু, যাহা আমরা নাসিকায় গ্রহণ করি, তাহা অম্লজান এবং যবক্ষারজানে মিশ্রিত। শতভাগ সহজ বায়ুতে ২১ভাগ অম্লজান থাকে। যাহা পরিত্যাগ করি, তাহা পরীক্ষার দ্বারা দেখিলে জানা যাইবে যে অম্লজানের ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ২১ভাগের স্থানে ১৬, ১৭, বা ১৮ভাগ মাত্র আছে। অনল্প ভাগ অম্লজান শরীরে গৃহীত হইয়াছে।

২। অম্লজানে, অঙ্গারজানে কার্ব্বনিক আসিড বা আঙ্গারিক অম্লের উৎপত্তি হয়। সহজ বায়ুতে ইহা পাঁচ হাজার ভাগে দুই ভাগ মাত্র থাকে। কিন্তু নিশ্বাসে যে বায়ু নির্গত হয় তাহাতে ১০০ভাগে ৩ভাগ থাকে অর্থাৎ ৫০০০ ভাগে ১৭৫ থাকে। অতএব নিশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা শরীরমধ্য হইতে আঙ্গারিক অম্ল নির্গত হইতেছে।

৩। ঐ রূপ নিশ্বাসের সহিত জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। আয়না বা পালিশ করা ধাতু পাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেই ইহা দেখা যায়।

এখন, যে বায়ু আমরা নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহার কয় ভাগ অম্লজান কোথায় গেল? আর এই আঙ্গারিক অম্ল, ও জল, কোথা হইতে আসিল?

জল, অম্লজান ও জলজানের রাসায়নিক সংযোগে জন্মে। অতএব দেখা যাই-

তেছে, নিশ্বাসে যে জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়াছে, তাহার সৃজনার্থ, গৃহীত অম্লজানের কিয়দংশ লাগিয়াছে। কিন্তু জলজান ত নিশ্বাসে গৃহীত হয় নাই। তাহা নহিলে জলও হয় নাই। অতএব ইহা শরীর হইতে আসিয়াছে।

আঙ্গারিক অম্ল, অঙ্গারজান ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে জন্মে। অতএব দেখা যাইতেছে যে গৃহীত বায়ুর অম্লজান কিয়ৎপরিমাণে এই আঙ্গারিক অম্লের সৃজনে লাগিয়াছে। কিন্তু অঙ্গারজান ত গৃহীত বায়ুতেছিল না। অতএব এই অঙ্গার জান শরীর মধ্য হইতে আসিয়াছে।

অতএব বায়ু নিশ্বাসদ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীর ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে জলজান ও অঙ্গারজান কাড়িয়া আনিয়াছে। দেখা যাউক, কিরূপে কোথা হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে।

মেদ, জলজান, অম্লজান, এবং অঙ্গারজানের সংযুক্ত ফল, যথা

অঙ্গারজান	৩৭	ভাগ
জলজান	৩৬	,,
অম্লজান	৫	,,

নিশ্বাসের অম্লজান, শ্বাসকোষে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া, সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ করে। তথায় মেদের জলজান, ও অঙ্গারজানের সঙ্গে মিশিয়া মেদকে জলে এবং আঙ্গারিক অম্লে পরিণত করে। এক পরমাণু মেদে ১০৫ পরমাণু অম্লজানের সংঘটনে মেদ বিনষ্ট হইবে—যথা—

মেদ ১ পরমাণুতে

অঙ্গারজান	৩৭
জলজান	৩৬
অম্লজান	৫

তাহাতে মিলিল

অম্লজান	১০৫

মোটে হইল

আঙ্গারজান	৩৭
জলজান	৩৬
অম্লজান	১০০

পরিবর্ত্তন হইয়া হইবে

অম্লজান	জলজান	অংজান	
৭৪	০	৩৭	=৩৭ আঃ অম্ল
৩৬	৩৬	০	=৩৬ জল
১১০	৩৬	৩৭	

অতএব শারীরিক ১ ভাগ মেদ ও নিশ্বাসগৃহীত শোণিতসঞ্চারী ১০৫ ভাগ অম্লজান, উভয়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তৎস্থানে ৩৬ ভাগ জল ও ৩৭ ভাগ আঙ্গারিক অম্ল নির্গত হয়। নিশ্বাসে গৃহীত বায়ুস্থ অম্লজান যদি শোণিত মধ্যে মেদ না পায়, তবে শরীরের অন্যান্য অংশ আক্রমণ করিয়া শরীরকে মেদশূন্য করিবে।

২য়। ঘর্ম্মাদি। যেমন নিশ্বাসে আমরা বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি, এমনি ত্বগের দ্বারাও গ্রহণ করি। চর্ম্মের সর্ব্বত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র২ সহজ দর্শনের অতীত ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র, এক একটি প্রণালীর মুখ। এবং সেই সকল ছিদ্রদিয়া আমরা বায়ুশোষণ করিতেছি।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, কোন সম্পূর্ণাকৃত পুরুষের গাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ এরূপ, সত্তর লক্ষ ছিদ্র আছে; এবং এই ছিদ্রগুলিন যে সকল প্রণালীর মুখ, তাহা সকল যোড়া দিলে, চৌদ্দ ক্রোশ দীর্ঘ হয়! শুনিয়া অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে আমরা আব্‌কারি মহল লুঠ করিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

এই সত্তর লক্ষ ছিদ্র দিয়া অনুদিন অবিশ্রান্ত বায়ুশোষণ হইতেছে। এবং নিশ্বাসগৃহীত বায়ুস্থ অম্লজান যেমন শরীরের মেদকে জল এবং আঙ্গারিক অম্ল করিয়া বাহির করিয়া দেয়, ত্বক্‌শোষিত বায়ুও সেইরূপ করে। ত্বকের অসংখ্য ছিদ্র দিয়া অনুদিন অবিশ্রান্ত জলীয় বাষ্প, আঙ্গারিক অম্ল, এবং অন্যান্য শারীরিক সামগ্রী নির্গত হইতেছে। ইহা শরীরের দ্বিতীয় ব্যয়। ইহাকে অজ্ঞাত ঘর্ম্ম বলা যায়।

৩য়। প্রস্রাবাদি। অহরহ শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বাংশই এই ক্ষয়ের অধীন। শারীরিক গতিমাত্র শারীরিক ক্ষয়ের কারণ। তুমি যদি অঙ্গুলিমাত্র সঞ্চালন করিলে, সেইসঞ্চালনে যে সকল মাংসপেশী, স্নায়ু, শিরা, অস্থি যাহা২ সঞ্চালিত হইল তাহাই অবস্থান্তরিত হয়; তাহারই কিয়দংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যেমন শিল্পকারের যন্ত্র সকল কার্য্য মাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; যেমন ছুতারের বাঁটালি যতবার কাষ্ঠে আহত হইবে, ততবার একটু ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এও সেইরূপ। সে ক্ষয়, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, নিশ্বাসাগত বায়ুস্থ অম্লজান যাহা শোনিতে আরোহণ করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, যাহার কিয়দংশে পরিত্যাজ্য জল ও আঙ্গারিক অম্ল জন্মে, তাহার আর একভাগ শারীরিক সামগ্রীর সহিত সংযুক্ত হয়। তৎকর্ম্মে প্রাস্রাবিক এবং প্রাস্রাবিক অম্ল নামক সামগ্রী জন্মে; তাহা শরীরের গঠনোপযোগী নহে; শরীর মধ্যে থাকিতে পায় না; তাহা প্রাস্রাবযোগে পরিত্যক্ত হয়। অম্লজান সংযোগে অন্যান্য পদার্থ, ঐরূপে সৃষ্ট হইয়া ঐরূপে পরিত্যক্ত হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে মনুষ্য এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নহে। সর্ব্বদা হয় চলিতেছে, নয় নড়িতেছে, নয় কথা কহিতেছে, নহে আরকিছু করিতেছে। যাহা করিতেছে, তাহাতেই চাঞ্চল্যের পরিমাণে শরীর ক্ষয় হইতেছে। যদি কেহ কিছু না করিয়া কেবল বসিয়া চিন্তা করে তাহাতেও মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য; তাহাতেও ক্ষয় আছে। যদি চিন্তাও না করিয়া নিদ্রা যায় তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই কেননা তখনও নিশ্বাস প্রশ্বাস, হৃদ্ঘাত রক্তবহন, জীরণ, প্রভৃতি কার্য্য চলিতে থাকে, তাহাতে কত অসংখ্য মাংসপেশী শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি খাটিতে থাকে। অতএব মনুষ্য শরীর, অহরহঃ অনন্ত চাঞ্চল্য বিশিষ্ট; অহরহ, মেদ, অস্থি, মাংস, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বাংশ অবাধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার ক্ষান্তি

নাই, নিবারণ করিবার উপায় নাই। শরীরের এই রূপ ব্যয়। জগতে এমত কেহ ব্যয়শৌণ্ড নাই, যে এরূপ নিরন্তর অবাধে, অনিবার্য্য হইয়া, আপন স্বত্ব ব্যয় করে।

যদি পুনঃসঞ্চয়ের উপায় না থাকিত তবে শরীরের এই ভয়ঙ্কর ব্যয়ে অল্প কালেই মূলধন ক্ষয় হইয়া শরীরের ধ্বংস হইত। এই পুনঃসঞ্চয়ের উপায় আহার।

আমরা দেখাইলাম শরীরের মূলধন কি, এবং তাহা কি প্রকারে ব্যয়িত হয়। সে ব্যয়িত ধনের স্থলে নূতন ধন সঞ্চয় করা, অথবা ব্যয় জন্য পৃথক্ ধন সঞ্চয় করা, আহারের উদ্দেশ্য। অতএব যাহা ব্যয় হয়, তাহাই আহার্য্য। যাহাতে ব্যয়িত সামগ্রী থাকে তাহাই খাদ্য। এক্ষণে আমরা পরসংখ্যায় দেখাইব, কোন্ সামগ্রীতে কি প্রকার আহার্য্য পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গীত।

১

কি!—
গাইব না—কেন?—অবশ্য গাইব।
গায় না কি কভু সুস্বর বিহীনে?
হরিষে, বিষাদে,—প্রণয়ে, বিরহে,—
শোকে, সুখে,—হায়! হলে উচ্ছ্বসিত
হৃদয় তাহার? ছুটিলে হায় রে!
মানব হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ?

২

আসিলে বরষা, সলিল প্রবাহে
হয় না কি শুষ্ক পর্ব্বত-বাহিনী,
কল কল্লোলিনী,—কূল বিপ্লাবিনী?
আসিলে বসন্ত, গোলাপের সনে
ফুঠে না কুফুল, কুসুম কাননে?
গায় না কি কাক কোকিলের সনে?

৩

হায় এই জড়, অজড়, জগতে,
কে বল নীরব? গাইছে সকল।
গর্জ্জিছে জলধি, মন্দ্রিছে জীমূত,
ডাকে পশু, গায় বিহঙ্গ নিকর।
আমি নর কেন নীরবে থাকিব?
গাইব না কেন?—অবশ্য গাইব।

৪

"গাও তুমি; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
রাসভ কণ্ঠের নির্ঘোষ তোমার;—"
বলিতেছ তুমি? শুনিও না তুমি
সঙ্গীত আমার। ডমরু নিনাদে,
নাচিবে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া;
পশিবে মণ্ডূক সভয়ে বিবরে

৫

মন্দ্রিলে জীমূত ; ঘোর গরজনে
গায় গিরি, নাচে গায় পারাবার ;
হাসে "বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ চকিত ;"
সে রণ সঙ্গীতে,—মরি হাসি পায়,—
তুলি অভিমানে উড়ায়ে পেখম,
নাচে সগরবে নির্ল্লজ্জ—শিখিনী !

৬

আজি বঙ্গ দেশ নির্ল্লজ্জশিখিনী,
তুমি এক ক্ষুদ্র চন্দ্রক তাহার ;
মুহূর্ত্ত ঝলসি দর্শক নয়ন,
যাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার ।
তব তরে নহে মম এ সঙ্গীত,
তব নাট্য শালা—ওই সুসজ্জিত !

৭

গাইছে রমণী, শুনিছে রমণী,
নাচিছে রমণী, দেখিছে রমণী,
রমণীর নৃত্য ; রমণীর গীত ;
রমণীর রাজ্য ; রমণী-শাসিত ;
বভ্রুবাহ পুরি, আজি বঙ্গদেশ !
মম এ সঙ্গীত বিড়ম্বনা শেষ ।

৮

যথায় আদর কোকিলা কণ্ঠের ;
অবশ পুরুষ দেয় করতালি
রমণী ব্যায়ামে,—জঘন্য খেমটায় ।
যথায় দাসত্ব শৃঙ্খল শিঞ্জিত ;
লক্ষ্ণৌ চেয়ে, লক্ষ্ণৌ টপ্পার আদর ;
তথা এ সঙ্গীত, মানি—হাস্যকর ।

৯

গর্জ্জেছিল এই সঙ্গীত আমার,
পাঞ্চজন্যে মহা কুরুক্ষেত্ররণে ;
শিঞ্জিনী শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্চনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে ।
সেই সঙ্গীতের হইয়াছে হায় !
শেষ তান লয় 'চিলন ওয়ালায়' ।

১০

আজি সেই বীর সমাধি ভবনে,
জাগিবে কি সেই সঙ্গীত আবার ?
এই রাশীকৃত শীতল অঙ্গারে,
এক কণা অগ্নি হইবে সঞ্চার ?
লোহে লোহে হয় অগ্নি উদ্গীরণ ;
লোহায়, অঙ্গারে, ?—ভস্মের নির্গম !

১১

ভস্মরাশি ময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর—সঙ্গীত আমার ?
কি আছে ভারতে গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর ?
বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি কন্দরে
শুনিবে সঙ্গীত ওই কেশরীরে ।

১২

গাইব তাহার তীব্র পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জ্জয় নখর,
গাইব তাহার গর্জ্জন ভীষণ ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য দশন,—
গাইব তাহার, রক্তিম লোচন ।

১৩

শুনিয়া সঙ্গীত, নাচিবে নির্জ্জীব
মহীরুহ চয় ভুজ আস্ফালিয়া ;
ঘামিবে পাষাণ ; গর্জ্জিবে জীমূত ;
বনে দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া।
গাবে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহা সিন্ধু—উত্তরিবে শেষে।

১৪

কিম্বা বসি সেই মহা সিন্ধু তীরে,
মহা অম্বু-সহ কণ্ঠ মিশাইয়া—
গাইব নির্ঘোষে সঙ্গীত আমার,
মহানন্দে, মহা সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
শুনিয়া সঙ্গীত ঘন গরজিয়া,
ঘন ঘন রাশি, আসিবে উড়িয়া !

১৫

ফাঠিবে জলদ ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
তীব্র অগ্নি বান,—বিদারি গগন !
মাতিবে জলধি; ছুটিবে তরঙ্গ—
বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ !
তখন আনন্দে করিয়া ঝঙ্কার,
রণ রঙ্গে কবি পাবে পুরস্কার।

শ্রীনঃ

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

বিবাহ বিধি ও বিবাদ বিষয়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

শূদ্র জাতি কেবল শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্যা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা কন্যা। ব্রাহ্মণ জাতি চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিজাতিগণ অগ্রে স্ববর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কামবশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে ক্রমে অসবর্ণা কন্যাও বিবাহ করিতে সমর্থ হইবেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাহ্মণ কন্যা তৎপরে ক্ষত্রিয়া তৎপরে বৈশ্যা ও অবশেষে শূদ্রা কন্যাকেও গ্রহণ করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর তিন বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রমে বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ নহেন। বৈশ্য জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহ করি-

বেন। অগ্রে বৈশ্যা পরে শূদ্রা ভার্য্যা স্বীকারে নিন্দনীয় হইবেন না। (১)

ব্রাহ্মণের শূদ্রা ভার্য্যায় নিষেধ না থাকিলেও শূদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদনে ও শূদ্রার সহবাসে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয় বলিয়া ইহাঁরা আপত্ কালেও কদাচ শূদ্রা ভার্য্যা স্বীকার করেন নাই। মোহবশতঃ যদি দ্বিজাতিগণ অপকৃষ্ট বর্ণের কন্যা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে সেই দ্বিজগণ ও তৎসন্ততি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। (২)

বিবাহ অষ্টবিধ। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ।(৩)

আট প্রকার বিবাহের লক্ষণ। যথা— যে বিবাহে দান কর্ত্তা স্বয়ং বরকে আহ্বান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহার বরণ পুরঃসর সবস্ত্রা ও সালঙ্কৃতা কন্যাদান করেন, সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ কহা যায়।(৪)

দৈব বিবাহ—অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক পুরোহিতকে যদি যজ্ঞ

---

(১) অ৩। ১৩। মনু অ৩। ১২। শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে। তেচ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাম্ প্রশস্তা দ্বারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যু ক্রমশোঽবরাঃ।

(২) শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং। জনয়িত্বা সুতং তস্য ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ১৭

অ৩। ১৪। ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ো রাপদ্যপি তিষ্ঠতোঃ। মনু কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ। কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ১৫

(৩) ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ২১

(৪) আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

যজ্ঞেতু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে। অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥২৮

একং গোমিথুনং দ্বেবা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ। কন্যাপ্রদানম্ বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ সউচ্যতে॥ ২৯

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচোঽনুভাষ্যচ। কন্যাপ্রদান মভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃস্মৃতঃ॥ ৩০

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ। কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যা দাসুরোধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩১

মনু ৩য় অধ্যায়।

আরম্ভের পূর্ব্বে গার্হস্থ ধর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত তদীয় করে সালঙ্কৃতা কন্যা দান করা যায় তাহা হইলে সেই বিবাহের নাম দৈব বিবাহ।

আর্ষবিবাহ।—ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন নিমিত্ত এক ধেনু একবৃষ অথবা গোমিথুন দ্বয় বরপক্ষ হইতে লইয়া যথা বিধানে সবস্ত্রা ও সালঙ্কৃতা কন্যা দান করার নাম আর্ষ।

প্রাজাপত্য বিবাহ।—এই বিবাহে কন্যাদাতা বরকে ও কন্যাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বলেন তোমরা উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর অদ্যাবধি তোমাদিগের দাম্পত্য চির সুখদায়ক হউক।

আসুর বিবাহ।—কন্যার পিত্রাদি এবং কন্যাকে যথাশক্তি পণ দিয়া বর আপনি যে স্থলে কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করে তথায় আসুর বিবাহ কহা যায়।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ।—বর ও কন্যা উভয়ে ইচ্ছানুসারে পরস্পর আত্মসমর্পন পূর্ব্বক যে বিবাহ করে তাহাকে গান্ধর্ব্ব বলা যায়।

রাক্ষস।—ইহাতে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। কন্যা হরণ কালে কন্যার পিতৃ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাদিও ঘটে তাহাতে কন্যাপক্ষেরা হত ও আহত হয়। কন্যাও হা তাতঃ হা মাতঃ বলিয়া রোদন করিয়া থাকে।

পৈশাচ।—এ অতি অপকৃষ্ট বিবাহ। সুষুপ্তা প্রমত্তা অথবা অনবধানশীলা কন্যাকে নির্জ্জনে পত্নীরূপে ব্যবহার করাকে পৈশাচ বলা যায়। (৫)

আর্য্যেরা অনিন্দিত বিবাহোৎপন্ন সন্তানকেই বংশধর জ্ঞান করিতেন। নিন্দিত বিবাহসম্ভব সন্তানকে বংশের অকীর্ত্তিকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের মতে পশ্চাদ্বর্ণিত পরিণয়গুলি নিন্দনীয়। তাঁহারা উদ্বাহবিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। (৬)

অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার বিপ্রজাতির পক্ষে ধর্ম্ম্য। ক্ষত্রিয় জাতির পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম ও দৈব ব্যতীত অবশিষ্ট চারিটী ধর্ম্ম্য। বৈশ্য ও শূদ্রের সম্বন্ধে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ এই তিনটী ধর্ম্মজনক বলিয়া ব্যবস্থাপিত আছে।

---

(৫) অ ৩। ৩২ — ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।

অ ৩। ৩৩ — হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

অ ৩। ৩৪ — সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

(৬) অ ৩। ২৩ মনু — ষড়ানু পূর্ব্বা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষসান্॥

পূর্ব্বকথিত বিবাহের মধ্যে আর্ষ বিবাহে বরপক্ষ হইতে গোমিথুন লইবার ব্যবস্থা থাকায় ও রাক্ষস বিবাহে বিবাদ বিষম্বাদ সহকারে কন্যাহরণ রূপ অপকার্য্যনিবন্ধন এবং পৈশাচ বিবাহে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নীচাশয়তার কার্য্য বিদ্যমান বশতঃ এই তিন প্রকার বিবাহ সকল জাতির পক্ষেই অকর্ত্তব্য ।

ক্ষত্রিয় জাতি রাজ্যশাসন করিতেন তাঁহাদিগের বাহুবল ছিল সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে কন্যাহরণ পূর্ব্বক বিবাহ করা অসম্ভব হইতনা এই নিমিত্ত রাক্ষস বিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে সুসঙ্গত ।

বৈশ্য জাতি বণিক্‌বৃত্তি করিত, শূদ্রজাতি সেবাতৎপর ছিল, বরপক্ষে অথবা কন্যাপক্ষে শুল্কদিয়া বিবাহ করা ইহাদিগের পক্ষে অকীর্ত্তিকর ছিল না। সুসাধ্য বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে উহাই প্রশস্ত । (৭)

আর্য্যজাতিরা কিরূপ পাত্রের কিরূপ কন্যার পাণিগ্রহণ সুলক্ষণ জ্ঞান করিতেন তাহা নির্ণয় করা যাউক ।

কন্যা ।

যে কন্যা রোগবিহীনা, যাহার অঙ্গবৈকল্য অথবা কোন অবয়বের ন্যূনাধিক্য নাই। যাহার অঙ্গ অধিক লোমে আচ্ছাদিত অথবা একেবারেই লোমশূন্য নহে, যাহার বাক্‌চাপল্য নাই, যাহার নয়নদ্বয় বিড়ালের নয়নতুল্য নহে এবং বর্ণ ও কেশ কটা বলিয়া প্রতীতি না হয় সেই কন্যাই সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত হয় ।

বিবাহ বিষয়ে আর্য্যজাতিদিগের বড় কড়াকড়ী। ইঁহারা কন্যাগ্রহণ সময়ে অত্যন্ত সাবধানতা দেখান। ইঁহাদিগের মতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও সদাচারসম্পন্ন নাহইলে তদীয় কন্যা পাণিগ্রহণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে। যাহাদিগের কন্যা বিবাহ কার্য্যে নিন্দিত, তন্মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী দশটী কুল অবশ্য পরিত্যজ্য বলিয়া পরিগণিত আছে।

১ম। যে বংশে ক্ষয়রোগ (অর্শ, রাজযক্ষ্মা, বহুমূত্র প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগ) অপস্মার (মৃগীনাড়া) শ্বিত্র (ধবল) কুষ্ঠ কুনখ অথবা কোন প্রকার পৈতৃক পীড়া সংক্রান্ত হইয়া থাকে কিম্বা উদরাময়াদি অলক্ষিত পীড়া আছে সে বংশের কন্যা কদাচ বিবাহ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

২য়। যে বংশের লোকেরা সৎক্রিয়া পরিশূন্য এবং প্রায়ই কোন ব্যক্তির ভাগ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের সংশ্রব হয় নাই সে কুলও প্রার্থনীয় নয়।

৩য়। নিষ্পুরুষ কুলও পরিত্যজ্য। তাহার কারণ এই যে বংশে কেবল মাত্র কন্যা জন্মে সে কুলের কন্যাগ্রহণ করিলে পুত্র সন্তান জন্মিবার তাদৃশ সম্ভাবনা

---

(৭) মনু অ ৩। ২৪ — চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান কবয়ো বিদুঃ। রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈব মাসুরং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ॥
অ ৩। ২৫ — পঞ্চানান্তু ত্রয়োধর্ম্ম্যাদ্বার ধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ। পৈশাচ শ্চাসুর শ্চৈব নকর্ত্তব্যো কদাচন॥

থাকে না। যদি বা পুত্র জন্মে অনেক সময়ে মাতামহগণ দৌহিত্রকে পুত্রিকা পুত্র করিতেন বলিয়া সহসা সকলে সে বিবাহকে প্রশস্ত মনে করিতেন না। (৮)

বিবাদ বিষয়।

অর্য্যজাতির শাসন প্রণালী অনুসারে বিবাদ অষ্টাদশ প্রকার।

ঋষিগণ ঐ অষ্টাদশ বিধ বিবাদের নিষ্পত্তি বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

যে বিবাদের নিষ্পত্তি বিষয়ে যে নিবন্ধকে প্রমাণ জ্ঞান করেন সে বিবাদ সেই নিবন্ধের যুক্তি অনুসারে বিবেচিত হয়। অষ্টাদশ বিবাদের নাম যথা। ঋণ গ্রহণ। নিঃক্ষেপ। অস্বামিবিক্রয়। সম্ভূয় সমুত্থান। দান প্রাদানিক। ভৃত্যাবেতনদানকাল শৈথিল্য। সম্বিদ্যাতিক্রম। ক্রয় বিক্রয়ানুশয়। স্বামিপাল বিবাদ। সীমা বিবাদ। বাক্‌পারুষ্য। দণ্ড পারুষ্য। স্তেয় বা চৌর্য্য। সাহস। (ডাকাতী) স্ত্রীসংগ্রহ। বিভাগ। দ্যূত। আহ্বয়।(৯)

১ম ঋণ গ্রহণ—ইহা আবার সাত প্রকারে বিভক্ত।

কোন্ ঋণ অবশ্য পরিশোধের যোগ্য। ২য় সুরাপায়ী বা উন্মত্ত কিম্বা বেশ্যাসক্ত পিতার কৃত ঋণ পুত্রের পরিশোধ্য নহে। ৩য় অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে পুত্র পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধের অযোগ্য। ৪র্থ প্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের অগোচরে পিতৃকৃত ঋণ পুত্রের দেয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। ৫ম প্রোষিত বা অনুদ্দিষ্ট পিতৃকৃত ঋণ বিং-

(৮) মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজা বিধন ধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬। ৩ অ
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দোরোম শার্শসং।
ক্ষয্যাময়া ব্যপস্মারি শ্বিত্রিকুষ্ঠি কুলানিচ॥ ৭ ৩অ
নোদ্বহেৎ কোপিনীম্ কন্যাম্ নাধিকাঙ্গীম্ ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং॥ ৮। ৩অ

(৯) অষ্টাদশ বিবাদ পদ।
প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবন্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥ ৩
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিঃক্ষেপোঽস্বামি বিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপ কর্ম্মচ॥ ৪
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ
ক্রয় বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামি পালয়োঃ॥ ৫
সীমাবিবাদ ধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ড বাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণ মেবচ॥ ৬
স্ত্রী পুংধর্ম্মোবিভাগশ্চ দ্যূত মাহ্বয় এবচ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহার স্থিতানিহ॥৭

মনু ৮

নারদ বচন—
ঋণংদেয় মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথাচ যৎ।
দানগ্রহণ ধর্ম্মাশ্চ তদৃনাদান মুচ্যতে
কুল্লুকভট্ট ধৃত মনু টীকা।

শতি বর্ষ পরে পুত্রের অবশ্য দেয় বলিয়া পরিগণিত।

৬। বৃদ্ধি (কুসীদ) দিবার প্রতিজ্ঞা থাকিলে সুদসহিত মূল ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য।

নিঃক্ষেপ—২

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণে যে আদান প্রদান হয় তাহার নাম নিঃক্ষেপ। ইহাও সাত প্রকার উহা যথাস্থানে দেখান যাইবে।

অস্বামি বিক্রয়—৩

যে বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই সেইব্যক্তি কৃত তদ্বস্তু বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয়। কহা যায়।

সম্ভূয় সমুথান—৪

ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

দত্তা প্রাদানিক—৫

প্রচলিত কথায় যাহাকে দত্তাপহার কহাযায়।

ভৃত্য বেতনাদান—৬

যথাকালে ভৃত্যদিগকে বেতন না দেওয়াকে ভৃত্য বেতনাদান কহাযায়।

সম্বিদ্ব্যতিক্রম—৭

কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যদি অমুক-দিন অথবা অমুক পণে এই কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত বা প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় অথবা পণকরে কিম্বা লেখ্য দেয় এবং যথাকালে উহা সম্পন্ন না করে তাহা হইলে তাহাকে সম্বিদ্ব্যতিক্রম বা চুক্তি ভঙ্গ কহা যায়।

ক্রয় বিক্রয়ানুশয়—৮

কোন বস্তু ক্রয় করিয়া তৎকালে বিক্রয় করিয়া যদি কোন ব্যক্তি পরিতাপ করে এবং বস্তুটী মূল্যবান্ বা প্রিয় বলিয়া ক্রেতার নিকট হইতে পূর্ব্বমূল্যে প্রতি-গ্রহ করিতে ইচ্ছা করে ও অকৃতার্থ হইলে অনুতাপ করে তবে এই অনুতাপকে ক্রয় বিক্রয়ানুশয় কহা যায়।

স্বামিপাল বিবাদ—৯

পশুপালক (রাখাল) ও পশুর অধিকারী (গৃহস্থের) সঙ্গে যে বিবাদ তাহার নাম স্বামিপাল বিবাদ বলা যায়।

সীমা বিবাদ।১০

ইহা সকল লোকেই জানেন।

বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য।—১১

কলহ (গালাগালি) কিম্বা মুখ বিকৃতাদির নাম বাক্পারুষ্য। কেশাকেশি চুলোচুলি মুষ্টামুষ্টি (কিলোকিলি) দণ্ডাদণ্ডি লাঠালাঠি প্রভৃতির নাম দণ্ডপারুষ্য।

স্তেয় (চৌর্য্য)—১২

চুরির নাম স্তেয়।

সাহস।১৩

বল পূর্ব্বক অন্যের ধন গ্রহণ অর্থাৎ ডাকাতি প্রভৃতি সাহসিক দস্যু কার্য্যকে সাহস কহা যায়।

স্ত্রীসংগ্রহ।—১৪

পরস্ত্রীতে রতি কামনায় যে সম্ভাষণ ও আকার ইঙ্গিতাদি দ্বারা অভিলাষাদি জ্ঞাপন ও দূতী প্রেষণাদিকে স্ত্রীসংগ্রহ কহা যায়।

স্ত্রী পুং ধর্ম্ম—১৫

দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের কর্ত্তব্য বোধে

যে সকল নিয়ম প্রতিপাল্য হয় তাহাকে স্ত্রী পুং ধর্ম্ম কহা যায়।

বিভাগ—১৬

সহোদরাদি অথবা অন্য দায়াদের সহিত পৈতৃক বৃত্ত অংশ করাকে বিভাগ বলা যায়।

দ্যূত।১৭

অক্ষক্রীড়াদিকে দ্যূত কহা যায়।

আহ্বয় ১৮

যেস্থলে ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর সহিত অপর ব্যক্তির শিক্ষিত পশু বা পক্ষীর যুদ্ধ হয় এবং ঐ সকল পশুপালকেরা ঐ উপলক্ষে কোন প্রকাশ্য প্রদর্শন স্থলে পশুপক্ষ্যাদির যুদ্ধ নৈপুণ্যের পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক উহাদিগের জয় পরাজয়কে আত্মকৃত জ্ঞান করে তথায় আহ্বয় কহাযায়।

হলসামগ্রীকথন।

বঙ্গদর্শনের পাঠকমাত্রেরই হল দেখা আছে। যদি না থাকে সেটি লেখকের দোষ নহে। যাঁহারা ধান্যবৃক্ষের গাছ চেনেন না তাঁহাদিগের নিমিত্ত বঙ্গদর্শনে হল (লাঙ্গলের ছবি) চিত্র দেওয়া যাইতে পারে না। যাঁহারা হল দেখিবার নিতান্ত অভিলাষী ও চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না তাঁহারা শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক মাঠে অথবা সুবিধা হইলে কলিকাতার জাদুঘরে যাইয়া দেখিতে পারেন। যিনি নিতান্ত অলস তিনি যেন সেকেলে শিশুবোধের ক=করাৎ খ=খরা গ=গোরু ঘ=ঘোড়া ঙ=লাঙ্গল চিত্র দেখেন তাহা হইলেই তাঁহার বুভুৎসা চরিতার্থ হইতে পারিবে।

আর্য্যজাতিরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ নাকরিয়াছেন এমন বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ। আমরা যাহাকে এক্ষণে অতি সামান্য মনে করি তাহার জন্য কোন চিন্তা করিয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণ সেই সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলার জন্য আপনাদিগের মস্তিষ্কক্ষয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেরূপ সহায়তা না পাইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না।

কিদুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয় দেখ দেখি পরাশর ঋষির সময়ে আমাদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতিজন্য যত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া ছিল অদ্য পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কোন অংশে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই বরং অনেকাংশে অপকর্ষ দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ কৃষকগণকে ও ক্ষেত্রস্বামীদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এক্ষণে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক পিতা যত দূর কৃষিকার্য্য জানে ও যত দূর পারগতা দেখায় পুত্র তদপেক্ষা ন্যূনতাব্যতীত আধিক্য দেখাইতে পারে না। কোন মেঘে কেমন জল, কোন বায়ুতে কিরূপ মেঘ উৎপন্ন হয় ঋষিগণ তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থছিলেন। বাহন লক্ষণ বুঝিতেন, গোশালার দোষ বুঝিতে পারিতেন, বীজের গুণাগুণ নির্দ্ধারণে সমর্থ ছিলেন, বপন ও রোপণ প্রকরণ উত্তম জানিতেন, মৃত্তিকাখনন ও সার দেওয়ার সময়ের রীতি

বিশেষ অবগত ছিলেন, কোন সময়ে জল-সেক ও কোন সময়ে জলাগমকরা আবশ্যক তৎসমস্তই পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে বিচার করিতে পারিতেন, ক্ষেত্রে জল রক্ষণ ও তাহাহইতে জলমোচন প্রকরণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। আমরা সভ্য, ভদ্র লোক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাকি; আমরা যদি কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে অন্যে আমাদিগকে বিদ্রুপ করিতে পারে সেইভয়ে ভদ্র আখ্যাধারী কেহই কৃষিবিষয়ে কোন সন্ধান লয়েন না। এমন কি ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে হইলে কি সামগ্রীর আবশ্যক হয় তাহাও অনেকে জানেন না। যে ভদ্রসন্তান ঐসকল বস্তুর নাম জানেন বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন হয়ত আমাদিগের পাঠকবর্গের কেহ কেহ তাহাকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া উপহাস করিবেন। বঙ্গদর্শনের এপ্রস্তাব উপহাসরসিক পাঠকের জন্য নহে। তাঁহাদিগের জন্য রসাল রসাল প্রবন্ধ আছে। তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বিষয় পাঠ করিতে পারেন।

সহৃদয় পাঠক তুমি দেখ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি চারিযুগ অতিক্রান্ত হইতে চলিল তথনও কৃষিকার্য্যের যাদৃশ অবস্থা ছিল অধুনাও তাহার বিন্দুবিসর্গও বৃদ্ধি হয় নাই।

পাঠক তুমি রাখালের নিকট কৃষাণের মুখে গাড়োয়ানের ঋষভস্বরে পাঁচনীর নাম শুনিয়াছ ও এক হস্ত পরিমিত একখানি পশুশাসন দণ্ড দেখিয়াছ। সংস্কৃতে উহার নাম পাচ্চনী। সুসভ্য ইংরাজ জাতি ইহাকে সংস্কৃত করিয়া রুল নাম দিয়াছেন এবং পুলিষের কনিষ্টবলের করে সমর্পণ করিয়াছেন। উহা তাঁহাদিগের শাসনদণ্ড।

পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত যে একখানি সাপলেজা তালকাষ্ঠ দলের সঙ্গে যোজিত থাকে তাহার নাম ঈশ (বাঙ্গালাভাষায় লাঙ্গলের ঈশ।)

লাঙ্গলে যোজিত বৃষভদ্বয়ের স্কন্ধে যে কাষ্ঠফলক সংস্থাপিত হয় তাহার নাম যুগ। সংস্কৃত কাব্যকারেরা যাহার সহিত প্রশস্ত বাহুর উপমা দিয়া থাকেন। ইহার নাম যোয়াল।

লাঙ্গলের মুড়া যাহাকে বলে সংস্কৃতে তাহারই নাম স্থানু।

যাহাকে মুট কহা যায় সেই বস্তুই নির্যোল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা যুগের ফলের সঙ্গে সমান হইবে।

যুগের পার্শ্বে যে যষ্টিদ্বারা বৃষদ্বয় পরিবদ্ধ থাকে তাহা আড়া বা খিল কহা যায় —সংস্কৃতে তাহার নাম অড্ড। শোয়াল বা সোয়াজী।

যাহাকে বিদা বলা যায় তাহার নাম বিদাকাঠী। ইহারই নাম শল্য।

আমরা যাহাকে বাঁশুই বা মৈ কহি তাহার খিলগুলিকে পাশিকা বলা যায়।(১০)

(১০) ঈশো যুগো হল স্থানু নির্যোল স্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শল্যশ্চ পাচ্চনীয় হলাষ্টকং॥

এই অষ্টবিধ দ্রব্য লইয়া পুরাকালে কৃষি কার্য্য হইত এখনও হইয়া থাকে।

পঞ্চহস্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চ বিতস্তিকঃ।
সার্দ্ধহস্তস্ত নির্য্যোলো যুগঃ কর্ণ সমানকঃ॥
নির্য্যোল পাশিকা চৈব অড্ডচল্ল স্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুল মানোহি শৌলো রগ্নি প্রমাণকঃ॥
সার্দ্ধদ্বাদশ মুষ্টির্ব্বা কার্য্যা বা নবমুষ্টিকা।
দৃঢ়া পাচ্চনিকা জ্ঞেয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা॥
আন্ধরো মণ্ডলাকারঃ স্মৃতঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ।
যোত্রং হস্তশ্চতুস্কঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চ করাত্মিকা॥
পঞ্চাঙ্গুলাধিকো হস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ।
অর্কস্য পত্র সদৃশী পশ্বিকার নবাঙ্গুলা॥
একবিংশতি শৈল্যাস্ত বিদ্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নবহস্তাতু মদিকা প্রশস্তা কৃষি কর্ম্মসু॥
ইয়ংহি হল সামগ্রী পরাশর মুনের্ম্মতা।
সুদৃঢ়া কর্ষকৈঃ কার্য্যা শুভদা সর্ব্বকর্ম্মণি॥
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্যচ।
বিঘ্নং পদে পদে কুর্য্যাৎ সর্ব্বকালে নসংশয়ঃ॥

তৎকালে পরস্পর শিক্ষা করিত এক্ষণে প্রায় সকলেই স্বয়ং সিদ্ধ। প্রমাণ প্রয়োজন আবশ্যক করে না, পূর্ব্বকালে পুতি পত্র ছিল এক্ষণে সেই পুরাণ তুলটের পুতি হইতে যাহা পাওয়া গেল তাই লিখিত হইল। ফালক পরিমাণ এক হাত পাঁচ অঙ্গুলি। উহার আকার আকন্দ পত্রের সদৃশ করা উচিত। চারি হস্ত পরিমিত যুগ করিবার নিয়ম। লাঙ্গলের মুড়া দেড় হাত।

নিজান (মুট) কণে পরিমাণ দ্বাদশ বা নবমুষ্টি। পশিকা বা বাগুঁয়ের খিল নয় অঙ্গুলের অধিক করা আবশ্যক ছিল না।

শল্য বিদা এক প্রদেশ ঊন এক হাত (মুটুম) হাত করা হইত।

রাস রজ্জু বৃষভের নাসিকা হইতে হল চালকের হস্ত পর্য্যন্ত শিথিল ভাবে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেক দিগে চারি হস্তের অধিক হইবে না। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা

বাঙ্গালার ইতিহাস।*

সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীন্‌লণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘু-

---

* প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত। মেস্‌র্স জে জি চাটুর্য্যা এণ্ড কোং কলিকাতা।

নাথ শিরোমণি, ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ পূরাণ মাত্র।

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম, "দৈব," অশুভের নাম, "দুর্দ্দৈব।" এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতারাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন; যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ, হয়, দেবতার আংশিক অবতার, নয়, দেবতানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে; মনুষ্য কোনকার্য্যেরই কর্ত্তা নহে অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব, ও দেবভক্তি, অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি; আমরা যদি হাইতুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি স্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য; অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এইজন্য গর্ব্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই।

অহঙ্কার, অনেকস্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি, বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃ পিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালি। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালি অতি অল্প। কি বাঙ্গালি কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃ-

ত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি, যে তদ্দ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টিভিক্ষা হউক কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালক শিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় নিত্য২ প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালক শিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। যাঁহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাঁহাদিগের জন্য, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া, আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।

প্রথম। কাম্বেল সাহেব যখন বাবাঙ্গালির প্রতি সদয় হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালিরা আসিয়া খণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক একদিন, বাঙ্গালিরা আর কিছুতে হউক না হউক, উপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালি কর্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালির উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি, ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রায় স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ উপনিবেশিকতা দেখান নাই।

দ্বিতীয়। বাঙ্গালি রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপাল দেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণ সেনের জয়স্তম্ভ বারানসী, প্রয়াগ, ওশ্রী-

ক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালিরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকালাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয় পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনা তটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে যবদ্বীপে, এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

তৃতীয়, সপ্তদশ পাঠানকর্ত্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনাকর্ত্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। "পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম নোয়াখালী, এবং ত্রিপুরা, আরাকান রাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল।" সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০, অশ্বারোহী এবং২০০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালির অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"* বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটে স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয়; তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসেএই শুনা যায়, যে পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসন কালে বাঙ্গালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয়, এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায় শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা, রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ত্তিতিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্য দেব; এই সময়েই রূপসনাতনের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী; এই সময়েই চৈতন্য দেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আর্বিভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালির মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল

* বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯ পৃষ্ঠা।

সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখন হয় নাই।

সেই সময়ের বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।

"লিখিত আছে যে হোসেন শাহার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণ পাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্য বিদ্যার আশ্চর্য্য রূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত।* দেশে অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। পাঠান রাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে বাঙ্গালার জমিদারেরা ...২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১, ১৫৮ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।"

পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে, আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে, ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত এক খানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দূরবস্থা প্রাপ্ত হইল সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালির মনে হয়, যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে,

* গৌড়ের ইষ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর, প্রভৃতি অনেক গুলি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল নগর অট্টালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। গৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্ম্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয়, যে কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল।

বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্ত তাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জমা মসজিদ্ সেকন্দরা, ফতেপুরসিকরি, বা বৈজয়ন্ত-তুল্য শাহা জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? যখন শুনি যে নাদের শাহা বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শতবৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে? কীর্ত্তির মধ্যে "আসল তুমার জমা।" কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত।

কালেজ রি-ইউনিয়ন।

[এই কবিতাটি কালেজ রি-ইউনিয়নে পঠিত হইয়াছিল।]

১ খেদ ২ নিন্দা ৩ আশা।

১

প্রভাত ফুটিল,
পূরব গগনে উথলি উঠিল
মনোরমশোভা কনকবরণ॥
তপন উঠিলে,
কেন দুখ দিলে?
জান ত, তরুণ বয়সে গিয়াছে ঘুচিয়ে
বঙ্গের শোভন;
যাই প্রকাশিল,
অমনি নিবিল
প্রফুল্ল প্রভাতে জলদে যেমন
সোনার লিখন॥

দেখাবার হীরা লয়েছে কাড়িয়ে,
তপন—কেন তুমি এলে আলোক জ্বালিয়ে?
দেখাবার "দ্বারি"* লয়েছে কাড়িয়ে,
আজ—কেন তুমি এলে আলোক জ্বালিয়ে?
আলোক জ্বালিলে দেখাবে কাহারে
এত আড়ম্বর দেখাতে আঁধারে!
গৌরব তোমার
জগতে কে আর,
সমান হীরার করে পরচার,
হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে জ্যোতির কথায়,
যতনে আদরে জ্যোতির লেখায়?
তপন—তোমার আদেশে তোমার শাসনে,
ধরিয়ে মাথায় কাযের বোঝায়
পালে পালে প্রাণী ইতি উতি ধায়;
তুমি প্রতিনিধি জগতগুরুর,
তুমিহে তপন কাযের ঠাকুর;
গৌরবে বসিয়ে প্রতাপে শাসিয়ে,
অলস জগত নিয়ত চালাও,
প্রাণিকুল তুমি বসিয়ে খাটাও;
তোমার শাসনে
চকিত নয়নে
অলস শয়ন ত্যজে জীবগণ;
তোমার কৃপায়
জগত হাঁসায়
আঁধার অসুখ কোথায় পলায়;
হইয়ে দয়াল, তবু জাগাইলে,
আগুন জ্বালিলে, হৃদয় দহিলে,
নিঠুর হইয়ে;
নিশার শিশিরে ছিলত নিবিয়ে!

* দ্বারিকানাথ মিত্র।

মধুময় "মধু"* গিয়াছে উপিয়ে,
বঙ্গীয় মধুপ কি লবে খুঁজিয়ে?
কেন তুমি এলে আলোক লইয়ে?
আলোক জ্বালিলে দেখাবে কাহারে
এত আড়ম্বর দেখাতে আঁধারে!

২

জ্ঞানের জোনাকি এমে বিএ গণ
বঙ্গের আঁধার করে প্রকাশন॥
বঙ্গে অন্ধকার তাই এত মান
ঝকমক করে রাজার উদ্যান॥
তুমি হে—মোহনে ভুলিয়ে দুর্জ্জন 'গরবে'
ভাব সাধুসখা, চিরদিন রবে;
সেযে—সুখের কোকিল, সুখের বসন্তে,
মনোমত গায় কুমন যোগায়,
হিমে শীতে দুখে ছাড়িয়ে পলায়॥
মোহে—বল আপনার কি আছে তোমার
মিছে ধনী ভাণ,
জলে কলযান,
ঘড়ি বুট ছড়ি, মোহন ফিটান,
কলের বাদন,
ধনীর সকলি অপরের ধন;
পরের গৌরব করহে ধারণ,
তপন কিরণে জলদে রঞ্জন,
ডুবিলে তপন লুকাবে শোভন॥
তুমিহে—রাজপথধূলি,
যেদিকে পবন সেদিকে গমন
পবনের সনে পরশ গগন,
ছাড়িলে, তোমার ভূতলে পতন॥

* মধুসূদন দত্ত।

বিলাতী পরবে,
ভবনে পরাও আলোক ভূষণ
নাচিয়ে বেড়াও যোগাইতে মন;
পালিত বানর করে নরতন
আপন হরষে নাচে কি কখন?
কুহরে মুরলী নানারূপ তান
কভু বা ক্রন্দন কভু হর্ষগান,
তানহে যেমন
বাঁশীর হরষ বাঁশীর ক্রন্দন;
তোষামোদ করি
পরের মুখের হইয়ে বাঁশরী
হেঁসে কেঁদে তুমি কাটাও জীবন॥
সত্য বটে হায়!
দাসত্ব কলঙ্কে সব শোভা পায়;
তথাপি কভু কি
অশীতল জলে অভিরুচি যায়
শীতের তৃষায়?
জ্বরের তৃষায় বল কে কোথায় উষ্ণ জল চায়?

কত—উলঙ্গ অসভ্য উঠিল মাথায়
জ্ঞানে মানে বলে ধনে একতায়;
আর্য্য তনয় চরণে লুটায়,
গরব হিংসায় ভারত ডুবায়;
সুরভিবিহীন নির্ম্মধু 'মোচায়'
যেন স্বর্ণময় সুমধুর ফল!
যোজনসুরভি কাঁটালি চাঁপায়
ফলপরিণামে কুরস গরল!
পড়ে—উথলি সীমায় দুগধ যেমতি
অভিমান পাপে ভসমে চুলায়,
উঠিয়ে চূড়ায় গৌরবী তেমতি
অভিমানমদে পড়েছে ধূলায়॥

গরব তেজিয়ে
শৈশব স্মরিয়ে
একত্রে মিলন,
একি অঘটন!
বুঝি—নব অনুরাগে মিলেছ এবার
দিবসের শেষে থাকিবেনা আর
লঘু কাঠে আগুন কতক্ষণ রহে
ফুৎকারে জাগিয়ে লোহিত হইয়ে?
রক্তিম বরণ
প্রবাল বদন
যেমনি দেখায়, ভসম পড়িয়ে
অমনি লুকায়॥

৩

কোথায় সেদিন! ভগন ভারত
প্রেমের মিলনে হবে একাকার,
যেন জলকণা পুঞ্জে পুঞ্জ মিলি
সাজিবে বিক্রমে জলধি অপার।
দীন হীন কণা! শত শত যার,
ক্ষীণ লূতাজালে থাকেত বন্ধনে!
হেন দীনযোগে ভীষণ সাগর;
তাহার প্রতাপ বিদিত ভুবনে
যবে প্রভঞ্জন খেপায় গরবে,
যখন সাগর সমরে পাগল;
সেই ত সলিল বিনীত দুর্ব্বল,
পরশে রমণী কমল কোমল!
ঐ দেখ এখন ভৈরব নটন!
বিশাল ধরিত্রী কাঁপে থর থর,
মহীবক্ষ হতে আনিছে ছিনিয়ে
প্রাসাদ কানন শিখরী নগর;
আকাশের পাখী আনিছে কাড়িয়ে,

কাহার শকতি সম্মুখে দাঁড়ায়,
পবনের মেঘ আনিতে ছিঁড়িয়ে,
তুঙ্গ আরোহণে জলদে শাসায়॥
সমর উল্লাসে নাচে ঘোর নাটে
উত্তাল তরঙ্গে যবে রত্নাকর,
বিয়োগী বিদেশী সাগর সলিল
নাচে কি কখন ঘটের ভিতর?
হবেকিসেদিন?--মিলিবেভারততুলিবেনিনাদ
'জয় জগদীশ প্রেমের আধার'
সরব শরীরে কাঁপিবে পবন,
ছুটিবে নিনাদ বায়ু সিন্ধু পার॥

এত কহিলাম কেহত শুনেনা
কনক কুসুমে ভ্রমরা ভুলে না,
রজত কুমুদে মধুপ বসে না,
মোমের কমলে দ্বিরেফ উড়ে না॥
অথবা—কুরসিক মদকের রস বঁধু
বরটী—চাহে নাক নিরমল ফুলমধু॥

শ্রীকৃষ্ণ—

রজনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্থূল কথা ছাড়িয়া, আত্মপরিচয় কিছু দিতে হইল। আমার নাম শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, আমার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামসদয় মিত্র; পিতামহের নাম ৺বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম ৺ কেবলরাম মিত্র। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে—আমার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর নামক গ্রামে। আমার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব-ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিযা আমাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

পিতামহের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। পিতামহ মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর, প্রাণপাত করিয়া পিতামহের কার্য্য করিতেন, নিজে কখন ধনসঞ্চয় করিতেন না। পিতামহ তাঁহার এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতেন; এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। আমার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয় উভয় পক্ষেরই কিছু২ দোষ ছিল; কিন্তু আমি একজনের পুত্র অপরের পৌত্র; কি প্রকারে পিতৃ পিতামহের দোষ নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইব? অতএব সে সকল কথা অব্যক্ত রহিল।

একদা আমার পিতার সঙ্গে মনোহর

দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস, পিতামহকে বলিলেন, যে পিতা তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। মনোহর, আমার পিতামহের কাছে যাহা বলিলেন, তাহাও আমি লিখিতে পারিব না। অপমানের কথা পিতামহকে বলিয়া, মনোহর পিতামহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। পিতামহ, মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

পিতামহ, আমার পিতার প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং আমার পিতার উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। পিতামহ অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, পিতাও সকল কথা নিঃশব্দে সহ্য করিলেন না।

কষ্টকর কথা সবিস্তারে লিখিতে পারি না। পিতা পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল, যে পিতামহ, পুত্রকে গৃহবহিস্কৃত করিয়া দিলেন। পিতাও গৃহত্যাগ করিয়া, শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইবেন না। পিতামহ রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবেন না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রাম সদয়ের পুত্র পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

পিতা গৃহত্যাগ করিয়া মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। মাতার কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে পিতা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য, পিতাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত তাহা হইলে বোধ হয়, পিতামহ সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া, বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমান প্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে, আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোন সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছীল্য বশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া পিতামহও তাঁহাকে আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না; উইলও অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমত কালে হঠাৎ পিতামহের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

পিতা মহা শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যথা কর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেকদিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগর

গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে, মনোহর দাসের কোন সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল, যে পিতামহের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সম্বাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, পিতামহ তাহার অনেক সন্ধান করিলেন। কিছুতেই কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি পিতামহের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া, যাহা পিতামহ কর্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল, যে মনোহর ভবানী নগর হইতে পলাইয়া কিছু কাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাসকরেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায়, নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাহার আর উত্তরাধিকারী নাই।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন। তখন পিতামহের ভূসম্পত্তি আমাদিগের দুই ভ্রাতার হইল; এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আমাদিগের এখন আর কিছু নাই; পিতা যাহা বাণিজ্যে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বাণিজ্যেই ক্ষয় হইয়াছে। এই ভূসম্পত্তি আমাদিগের জীবনাবলম্বন।

এ সকল পরিচয় এখানে দিলাম কেন? আমরা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইতেছি বলিয়া। এক্ষণে বিষ্ণুরাম বাবু সম্বাদ দিয়াছেন যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কে উত্তরাধিকারী তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলিলেন না। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যে মনোহরদাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিষ আসিল কোথা হইতে?"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ

দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়।”

আমি। তা ত জানি। কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পর মরিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ে অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হোক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই?

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এতদিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকেআত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি, যে তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, “যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোকে উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি।”

“আছে।” বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, “এবিষয়ে যে২ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি”

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস; এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম **রজনী**।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ যাহা দেখিলাম তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতে ছিলাম।

আমি বিষ্ণুরামকে রজনীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, যে বলিতে তাঁহার প্রতি নিষেধ আছে। প্রথমে মনে করিলাম যে বিষ্ণুরাম বাবু আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে তিনি আপন কর্ত্তব্যই সাধন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম, যে, যে অধিকারিণী সে নিরুদ্দেশ;

সে জীবিতা আছে কিনা, নিশ্চিত না বুঝিলে কাহাকেও বিষয় ছাড়িয়া দিব না।

ইহার উত্তর বিষ্ণুরাম বাবুর নিকট পাইলাম না। উত্তরে উকীল গ্রাওলি এণ্ড বুলসক সাহেবদিগের নিকট পাইলাম। তাঁহারা লিখিলেন, যে রজনী আদালতে হাজির হইতে প্রস্তুত; আমাকে কেন দেখা দিবে?

আমি বুঝিলাম, যে রজনীর প্রদত্ত এ উত্তর নহে। আমি তখন রজনীর পিতা রাজচন্দ্র দাসকে ডাকিতে পাঠাইলাম। পিতাকে রজনী কি বলিয়া দেখা না দিবে?

যে লোক রাজচন্দ্রকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, রাজচন্দ্র তাহার পূর্ব্বগৃহে নাই। বাড়ী বেচিয়া সপরিবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

মহা গোলযোগ বোধ হইতে লাগিল। আমার সকল সন্দেহ সেই মধুরভাষী বিদ্যাবিশারদ অমরনাথ ঘোষের উপর গিয়া বর্ত্তিল। রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতার এই কি কারণ? সেই কি রাজচন্দ্র দাসকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে? এতদিনে তাহাকে সম্মত করিয়া রজনীকে বিবাহ করে নাই ত?

রজনীকে অমরনাথ বিবাহ করিয়াছে কি না, এই সন্দেহভঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন নিরুপায় হইয়া, রজনীর উকীলদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই পরামর্শ স্থির করিলাম।

একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, যে তুমি এসকল বিষয়ে উকীলের সাহায্য না লইয়া কোন প্রসঙ্গ করিও না। যাইতে হয়, ত একজন উকীল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমার একজন আত্মীয়, রাজকৃষ্ণ গুপ্ত, এটর্ণি ছিলেন। রাজকৃষ্ণ সোজা লোক নহে, কিন্তু আমার নিকট বড় বিশ্বাসী। আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলাম।

গ্রাওলি বুলসক দিগের কর্ম্মকর্ত্তা বুলসক সাহেব। তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল। রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, যে তিনি আমার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন। পরে বলিলেন যে এ মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইবে কি না এক্ষণে বলা যায় না। রজনী দাসীর সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎ হইলে, বোধ হয় অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

বুলসক বলিলেন, "কেন, আপনারা কি রফা করিতে ইচ্ছুক।"

রাজকৃষ্ণ বলিলেন, "আমরা রজনীকে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করি না। এবং রজনী জীবিতা কি না তাহাও জানি না। তবে রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে গোল মিটিতে পারে।"

বুলসক। আমি তাঁহার উকীল;

গোল মিটাইবার কথা আমার সাক্ষাতে বলিতে পারেন।

রাজকৃষ্ণ। আপনি উকীল, ঘটক নহেন; আপনাকে বলিয়া কি হইবে? আপনার মোয়াক্কেল কুমারী, আমার মোয়াক্কেলের গৃহশূন্য; আমার মোয়াক্কেল আপনার মোয়াক্কেলকে বিবাহ করিয়া গোল মিটাইতে চাহেন।

ব্লডসক হাসিয়া উঠিল; আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমার সেই স্বপ্নও মনে পড়িল।

ব্লডসক বলিলেন, "আপনাদের হিন্দুর মেয়ের কয়টা স্বামী হইতে পারে?"

রাজ। কেন?

ব্লডসক। আমার মোয়াক্কেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

রাজ। কার সঙ্গে, অমরনাথ ঘোষের সঙ্গে? সে কথা মিথ্যা।

ব্লডসক হাসিল, বলিল "এ মোকর্দ্দমায় সে তর্ক উঠিবে না; স্থতরাং সে বিবাহ মিথ্যা সত্যের বিচারে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে অমরনাথ জীবিত থাকিতে, আপনার মোয়াক্কেল বিবাহের দ্বারা মোকর্দ্দমা মিটাইবার সম্ভাবনা নাই। অমরনাথ মরিলে বাবু বিধবা বিবাহ করিতে পারেন।"

আমার সহ্য হইল না। আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

কার্য্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণের প্রতি বড় রাগ করিলাম।

গৃহে আসিয়া পুনর্ব্বার বাদলচন্দ্রকে স্মরণ করিলাম। অনুমানে বুঝিয়াছিলাম, রজনীর মোকর্দ্দমার কাণ্ডটা, অমরনাথ সকলই করিতেছে। বিষ্ণুরাম বাবু যে প্রমাণাদির কথা বলিয়াছিলেন, সে প্রমাণ উত্তম বটে কিন্তু অমরনাথের জন্য আমার সর্ব্বত্র সংশয় হইতেছিল। অমরনাথের নিগূঢ় সন্ধান লওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতে লাগিল। অমরনাথও সেই একবার দেখা দিয়া কেবল লুকাইয়া বেড়াইতেছে।

আমি তখন, বাদলকে বলিলাম যে, যে অমরনাথ ঘোষের সন্ধানে তুমি চোর বাগানে গিয়াছিলে, সেই অমরনাথের সন্ধানে তোমাকে আবার যাইতে হইবে। সে বোধ হয় গ্রাণ্ডলি ব্লডসকের আপিসে মধ্যেং আসিয়া থাকে। সেইখানে সন্ধান করিতে হইবে।

বাদল, ছাতি ঘাড়ে করিয়া, গ্রাণ্ডলি ব্লডসকের বাড়ীতে কেরাণিগিরির উমেদারিতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। চাকরি সহজে হয় না; স্থতরাং বাদলও আর তাঁহাদের আপিস ছাড়া নহে। প্রথমং অমরনাথের দেখা পাইল না; শেষ একদিন দেখিল, সেই বাবু উহাদিগের আপিসে প্রবেশ করিলেন।

বাদল তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাঁহার গাড়িয়ানের সঙ্গে ছলে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া বাসার ঠিকানা জানিয়া লইল। গাড়িয়ান বাসা জানে না। তবে সে ইহাই বলিল যে আহিরীটোলার

মোড়ে তাহাকে নামাইয়া দিতে হইবে, ইহাই চুক্তি আছে।

বাদল অগ্রসর পদব্রজে গিয়া ঐ মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই ঘণ্টা পরে বাবু আসিয়া সেখানে নামিলেন। বাদল, অলক্ষ্য থাকিয়া তাঁহার পশ্চাতে গিয়া, তাঁহার বাসা দেখিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে আমি বাদলকে সঙ্গে করিয়া সেই ভবনে গেলাম। প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে দেখা হইল। সে নমস্কার করিল। আমি তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিলাম,

"এখানে কোথা হইতে?"

রাজ। আজ্ঞা এ আমার জামাতার বাড়ী।

আমি। তোমার জামাই কে? রজনীর স্বামী না কি?

রাজ। আজ্ঞা।

আমি। তবে রজনীকে পাওয়া গিয়াছে?

রাজ। আজ্ঞা।

আমি। কোথায় পাওয়া গেল?

রাজ। আমি এইখানে আসিয়াই দেখিলাম।

আমি। রজনী পলাইয়া ছিল কেন, কিছু শুনিয়াছ?

রাজ। আজ্ঞা, মেয়ে মানুষ, সতীনের ঘর করিতে চাহে না।

আমি। এখন বিবাহ দিয়াছ কাহার সঙ্গে?

রাজ। আজ্ঞা, সেই অমরনাথ বাবুর সঙ্গে।

আমি। যদি সেই পাত্রে তোমার কন্যা দেওয়া অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলে কেন?

"ভদ্রতার জন্য।"

এ উত্তর রাজচন্দ্র দিল না; পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, অমরনাথ।

অমরনাথ আমার হস্তধারণপূর্ব্বক সাদরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিন্তু বোধ হয় উভয়েই জানিতে পারিলাম, যে দুইজনে পরস্পরের পরম শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছি।

ভারত মহিমা।

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানব সমাজের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত সন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ। আমরা জানি যে বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ যিহুদী দেশ হইতে ধর্ম্ম, রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীশের নিকট হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন

লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞানের মূল; বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হইয়াই জ্যোতিষের এত উন্নতি। তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এই নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই রসায়ন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য জনপদে যে সংখ্যালিখন প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এল্ ফিন্ ষ্টোন সাহেব তৎ কৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন, যে পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যা লিখন প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি।(১) ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এসিয়াটিক রিসার্চ্চের দ্বাদশ খণ্ডে একজন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, "বাহাউল্দিন দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা ভারতবাসীদিগকে বলেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এজন্য বলা ভাল যে সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।" (২)

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন; বীজগণিতের Algebra নামটী আরবী "আল্জিবর" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ

(১) The Hindus are distinguished in Arithmetic by the acknowledged invention of the decimal notation" ...p. 142. *Elphistone's History of India, Cowell's Edition.*

(২) "Bahauldin ascribes the invention of the numeral figures in the decimal scale to the *Indians.* As the proof commonly given of the *Indians* being the inventors of these figures is only an extract from the preface of a book of Arabic poems, it may be as well to mention that all the *Arabic* and Persian books of arithmetic ascribe the invention to the *Indians.*"—p. 184. Vol. XII. *Asiatic Researches.*

শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালী দেশায় একব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন।(৩) আরবেরা যে বীজগনিতের স্রষ্টা নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দু এবং গ্রীক জাতির ছাত্র। তাহাদিগের নূতন আবিষ্ক্রিয়া কিছুই দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি, এবং গ্রীসদেশে দিওফান্তস নামক বীজগনিতকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি আরব দেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন, তিনি যে ভারতবাসী দিগের শিষ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন, "মহম্মদ বেন মুসা আরব দিগের মধ্যে প্রথম বীজগণিত প্রকাশ করেন বলিয়া পরিচিত। তিনিই আল্ মান্ সুরের রাজত্ব কালে আল্মামুনের সন্তোষার্থে একখানি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি হিন্দুদিগের গণনা-তালিকা সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক গণনা-তালিকা প্রস্তত করেন; এবং তিনি ভারতবর্ষীয় সংক্ষিপ্ত গণনা প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন।"(৪) যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু দিগের নিকটে পদে পদে ঋণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা করে নাই, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোলব্রুক সাহেবও এইরূপ বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, "গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে বীজগণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকটে ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা এই যে তাহারা হিন্দু দিগের নিকট সংখ্যাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে হিন্দুদিগের বীজগণিতও পাইয়াছিল, ইহা যেরূপ সম্ভব,

(৩) "Leonardo of Pisa first introduced Algebra into Europe; he learned it at Bugia, in Barbary, where his father was a scribe in the customhouse by appointment from Pisa; his book is dated A. D. 1202—" *Cowell's note to Elphintone's History of India* p. 145.

(৪) "Muhammed Ben Musa Ali Khuwarezmi is recognized among the Arabians as the first who made Algebra known to them, He is the same, who abridged, for the gratification of Almamun, an astronomical work taken from the Indian system in the preceding age, under Almansur. He framed tables likewise, grounded on those of the Hindus; which he professed to correct. And he studied and communicated to his countrymen the Indian compendious method of computation." *Colebrooke's Dissertation prefixed to his translations from Sanscrit Algebra.*

যে গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছেন,একথা সেরূপ সম্ভব নহে।"(৫)

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্‌মানস্থরের রাজত্বকালে প্রথম আরবগণিতবেত্তা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়।(৬) ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহ মিহিরের মৃত্যু; এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম।(৭) স্থতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষীয় গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় গণিতপ্রাপ্তির পরে শত বর্ষাধিক কাল পর্য্যন্তও তাঁহারা গ্রীকগণিতের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না,এবং প্রায় দুই শতাব্দী গত হইলে পর দিওফান্তসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলেন।(৮) অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশেরই শিষ্য,তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রেগরী আবুল ফরাজ নামক একজন আর্ম্মাণী খৃষ্টান লেখক বলেন যে রোমক সম্রাট্ জুলিয়ানের সময়ে দিওফান্তস্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।(৯) একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ দিওফান্তসের প্রাদুর্ভাব কাল; স্থতরাং তিনি আর্য্যভট্টেরও শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্টও ভারতবর্ষের

(৫) "Priority seems then decisive in favor of both Greeks and Hindus against any pretensions on the part of the Arabians who in fact, however, prefer none as inventors of Algebra. They were avowed borrowers in science; and by their own unvaried acknowledgment, from the Hindus they learnt the science of numbers. That they also received the Hindu Algebra, is much more probable than that the same mathematician who studied the Indian arithmetic and taught it to his Arabian brethren, should have hit upon Algebra unaided by any hint or suggestion of the Indian Analysis."—*Colebrooke's* Dissertation.

(৬) "The first Arabian mathematician translated a Hindu book in the reign of the Khalif Almansur, A. D. 773." *Cowell's note to Elphinstone's India* p. 145.

(৭) See a paper by the late Dr. Bhau Daji in the Journal of the Royal Asiatic Society. New Series Vol. I.

(৮) "The Arabs became acquainted with the Indian astronomy and numerical science, before they had any knowledge of the writings of the Grecian astronomers and mathematicians; and it was not until after more than one century, and nearly two, that they had the benefit of an interpretation of Diophantus, whether version or paraphrase, executed by Muhammad Abulwafa Al Buzjane." p. XXI *Colebrooke's Dissertation.*

(৯) See page VI & XX *Colebrooke's Dissertation.*

প্রথম গণিত বেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে দিওফান্তসের ছাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে প্রকার বীজগণিতের জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা যে কেবল দিওফান্তসের অপেক্ষা অনেক অধিক এরূপ নহে; দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইত না।(১০) এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। দিওফান্তস্ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম বা গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায় না; এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটী শব্দ নাই।(১১) গ্রীস্ দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে সন্দেহ হয় যে দিওফান্তস্ বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চ্চের দ্বাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, "১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেলি নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে তিনি এবং রোমের একজন উপদেশক দিওফান্তসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের বারম্বার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে আরব দিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন।"(১২) অতএব ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রাসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় Chemistry বা রসায়ন Alchemy হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু Alchemy (আলকিমী) নামটী আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে আরব দিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও

(১০) See Cowell's Elphinstone p. 143.

(১১) "We know of no Greek writer on Algebra, but Diophantus; neither he, nor any known author, of any age or of any country, has spoken directly or indirectly, of any other *Greek* writer on Algebra in any branch whatever; the Greek has not even a term to designate the science."—p. 163 Vol. XII *Asiatic Researches.*

(১২) "In 1579 Bombelli published a treatise of Algebra, in which he says, that he and a lecturer at Rome, whom he names, had translated part of Diophantus, adding, "that they had found that in the said work the *Indian* authors are often cited; by which they learnt that the science was known among the *Indians* before the Arabians had it." p. 161 Vol. XII Asiatic Researches.

সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকালমধ্যে চরক এবং সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়; এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ হারনাল রসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিল।(১৩) হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এল ফিন্ষ্টোন সাহেবের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল যাবক্ষারিক অম্ল, ও লাবণিক অম্ল; তাম্র, লৌহ, সীসক, রাং, এবং দস্তার অম্লজানজ; ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন।(১৪) এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন; এবং এ নামটী কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওশানসী লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে;—"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা সস্তায় সোডা হরিতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক, এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ, যে সময়ে ইউরোপে অল্পব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্ত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।"(১৫)

(১৩) "The earliest medical writes extant are Charaka and Susruta. These authors were translated into Arabic, and probably soon after that nation turned its attention to literature. The Arab writers openly acknowledge their obligations to the medical writers of India.... It helps to fix the date of their becoming known to the Arabs, to find that two Hindus, named Manka and Saleh, were physicians to Harun al Rashid in the eighth century."...*Cowell's Elphinstone* p. 159.

(১৪) "They knew how to prepare sulphuric acid, nitric acid, and muriatic acid; the oxides of copper iron, lead......,tin and zinc; the sulphuret of iron, copper, mercury antimony, and arsenic; the sulphate of copper, zinc, and iron, and carbonates of lead and iron." Ibid p. 159.

(১৫) "By the assistance of this acid we prepare almost all the others; for instance, the nitric, muriatic, tartaric, citric &c. We owe to it the cheapest mode of obtaining artificial soda, chlorine, and its bleaching compounds. It is essential to the purposes of the dyer, and to it we are indebted for many of the best remedies we can command—of which calomel, corrosive sublimate, sulphate of quinine, the ethers &c may be cited as examples. In fact, from the time that sulphuric acid was

এক্ষণে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপখণ্ডে যে প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইতেছে, তাহারও উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কুমারিল্ল ভট্ট লিখিয়াছেন,

"প্রজাপতি স্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। সচারুণোদয় বেলায়ামুষস্যদ্যন্নভ্যেতি সা তদাগমনা দেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ সংযোগবদুপচারঃ। সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্ব নিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যা শব্দ বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মক জরণ হেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যভিচারাৎ।"

অর্থাৎ

"প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। উষার সহিত তাঁহার তেজঃসংযোগ ঘটে, এ জন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে।"

first prepared at a cheap price in Europe, may be dated the commencement of her greatness in allchemical manufactures." O, Shaughnessy's Manual of Chemistry p. 102

যে ভট্ট মোক্ষমূলর ইউরোপে দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যার পথ খুলিয়াছেন, তিনিই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থে উপরিধৃত সংস্কৃত পংক্তি কতিপয় প্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছেন;(১৬) এবং উহা হইতেই যে তিনি দেবতত্ত্বের সৌরব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ণ সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী বর্ণমালা আছে। চীন দেশীয়, ফিনিসীয়, এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বৎ, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগ-

(১৬) Ancient Sanscrit Literature by Professor Max Muller.

মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজ-ভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা,স্নেহ-ময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ পথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টিরোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লো-কের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম;" মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক কাহা-কেও কষ্ট দিবে না,সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদ-ভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া, তুষারমণ্ডিত মেঘভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ, শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল। পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্যজাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত ক-রিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্ম প্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফা-রিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিতসাধন ব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধ-দেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বৌদ্ধদেব প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন। পরে য়ীহুদিদেশীয় ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি নরজাতিপর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বৌদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদ্বারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধশিষ্যগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শত্রুপ্রদত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু অস্ত্রদ্বারা, শারীরিক

বিক্রমদ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন; পাষানময় গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, তাহাতে লোকের মঙ্গলসাধনার্থে যেপ্রকার যত্ন এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতিদিগকেও লজ্জা পাইতে হয়, সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন; কিন্তু যে কেহ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভূভাগে বুদ্ধদেবপ্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্পদিন হইল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য, গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং জাপানবাসিগণ মহোৎসাহসহকারে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়াখণ্ডের পুনর্জ্জীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোন রূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালি। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তাহাদিগের পূজা হইয়া থাকে; এবং তথায় যে কবিভাষা প্রচলিত তাহাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে যীহুদী, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্য সমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে কার্পাস শিল্পজাতের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে ঋগ্বেদ প্রায় খৃষ্টজন্মের পঞ্চদশশতবৎসর পূর্ব্বে লিখিত, তাহাতেও তন্তুস্থিত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল।(১৭) এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক

(১৭) "India is according to our knowledge, the accredited birth place of cotton manufacture. In

রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসী দিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যজনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যান্‌চেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত, ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটা ফোটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্মসার্থক জ্ঞান করেন। যেদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি, সেইদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারতসন্তানগণ ভারতের পূর্ব্বমহিমা স্মরণপূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?

one of the hymns of the Rigveda said to have been written fifteen centuries before our era, reference is made to *cotton in the loom* there, at which early date therefore it must have acquired some considerable footing."—Vol. XVII Journal of the Royal Asiatic Society.

বৃত্রসংহার।*

১ম সংখ্যা।

হেম বাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষ গুণ নির্ব্বাচন সাধ্য নহে; অর্দ্ধনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না;

* বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

অঙ্গমাত্র দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন, যে বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবেনা। এরূপ কাব্য সর্ব্বদা জন্মে না।

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফূরিত করিয়াছেন। পাতালে, বৃত্রজিত, নির্ব্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়মে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পড়িবে। হেম বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যে "বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃতভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা-দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।" হেম বাবু, মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড়ধূম্রল ঘোর" সেই পাতাল পুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ঙ্কর—

চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন:
ঝটিকার পূর্ব্বে যেন ঘন ঘনচ্ছাস
বহে যুড়ি চারি দিক আলোড়ি সাগর।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া, পুনর্ব্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবমুখে সন্নিবেশিত বাক্যগুলিতে একটি অর্থ আছে; বোধ করি, সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই; উদাহরণ স্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।

"ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?"

এই সর্গে অনেকস্থানে আশ্চর্য্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে।

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তিনি কুমেরু শিখরে নিয়তির আরাধনা করিতে ছিলেন। অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দন বনে বৃত্র মহিষী ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত পবনের মাধুর্য্যের ন্যায় একটি মাধুর্য্য আছে—কিসের সে মাধুর্য্য, পবন মাধুর্য্যের ন্যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধিশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ পূরে না—শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃত্রাসুর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মহিষী নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে২ ইহা মনে থাকে না, মর্ত্তভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ বলিয়া কখন২ ভ্রম হয়।

তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্ব্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।

অন্যান্য দেবতা পাতালবাসী, কিন্তু কাম ও রতি, স্বর্গ ছাড়িতে পারে নাই—তাহারা বৃত্র এবং মহিষীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। নহিলে অসুরলব্ধ স্বর্গের প্রকৃতি ভ্রংশ হয়! দূরদর্শী কবি এটুকু ভুলেন নাই। বৃত্রের আজ্ঞানুসারে, কাম শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী, এক দেবী মাত্র সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতলে নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন। বৃত্র সভারূঢ় হইয়া, আদেশ করিলেন, যে ভীষণ নামে পরাক্রান্ত অসুর তাঁহাকে আনয়ন জন্য প্রেরিত হউক। প্রথমে কৌশল, কৌশলে না পারে বলে আনিবে। এদিকে সূর্য্যাদি

দেবগণ মন্ত্রণানুসারে, স্বর্গ নিরোধ করিতে আসিতে ছিলেন। বৃত্র সেই সম্বাদ পাইলেন। বৃত্রাসুর সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না,—তখন প্রধান রক্ষক, যে রূপ লক্ষণ দেখিয়া দেবাগমন অনুমান করিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল। সে কয় পংক্তি অমূল্য রত্ন।

কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ;
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতি নহে সে আকার;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতি যে প্রকার;
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়;
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার;
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"

বৃত্রাসুরের সন্দেহভঞ্জন হইল, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

পরে চতুর্থ সর্গে, নৈমিবারণ্যে সুরেশ্বরী শচী, সখীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। স্বর্গচ্যুতিদুঃখ সখীর কাছে বলিতেছেন। সে সখী, অন্য কেহ নহে—বিদ্যুৎ। বৃত্রনাশের জন্য বজ্র সৃষ্টি হয়—বজ্রের অগ্রে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া কবি, পাঠকদিগের নিকট কৈফিয়ত দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে,যে কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তাঁহার মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে—যে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িবে, তাহারা অধিকাংশই আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালি—এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মূর্খ সমালোচকেরা ইহা সমালোচনা করিবে। সুতরাং মূর্খ সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া কথাটি বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এ বিনয়ের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এ সময়ে ভবভূতির গর্ব্বোক্তি মনে পড়িল। যে এই মনোমোহিনী বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রশংসা না করিবে, সে তাঁহার এই মহাকাব্য পড়িবার যোগ্য নহে। যে গ্রন্থ পড়িবার যোগ্য নহে, তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

হেম বাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী, সুসঙ্গতা, এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিতা। আমরা বলিতে পারিনা, কবির কি অভিপ্রায়, কিন্তু আমাদিগের এমন একটু ভরসা আছে যে বজ্র সৃষ্ট হইলে, কাব্যমধ্যে সুন্দরী চঞ্চলা এবং মহাবীর বজ্রের পরিণয় দেখিতে পাইব—চিরপ্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ—বাহ্য প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ, বাঙ্গালার কবির গানে গীত হইবে। আমাদিগের এ সাধ কি পূরিবে?

চঞ্চলার নিকটে শচীর বিলাপ, অতি

মধুর, অতি সকরুণ। ঐন্দ্রিলার বাক্যে যে মানুষিকতা দোষ লক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে সে দোষ নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে দেবীর যোগ্য। বোধ হয় এই প্রভেদ, কবির অভিপ্রেত। দেব দৈত্যে প্রভেদ অবশ্য রক্ষণীয়। তথাপি দৈত্যের দৈত্যত্ব থাকা আবশ্যক। অন্যত্র তাহা আছে। এই শচী বিলাপ হইতে, উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছু ক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
হায় এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতিনিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ!
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ!
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখিরে সকলি হেথা স্থূল!
নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল!
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা
নরলোকে সহিয়া এ দুখ॥

এই কাব্যে হেম বাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন—অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ, এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচীবিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি।

কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে!
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে!
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে!

কামদেব, প্রভুর আজ্ঞায় শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামদেব শচীর নিকট নিতান্ত বিশ্বাস ঘাতক নহেন। শচী ধরিবার ব্যবস্থা শুনিয়া ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যে সম্বাদ দিতে আসিলেন। তখন কবি, অকস্মাৎ প্রথম শ্রেণীর নাটককারের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। স্বদল ত্যাগী অসুরদাস কামদেবকে দেখিয়া দেবীদ্বয় ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। চপলার ব্যঙ্গ তৎস্বভাবানুযায়ী, স্পষ্ট২, উগ্র, তপ্ত, এবং চাপল্যব্যঞ্জক যথা—

শুনি নাকি মাল্যকার হৈয়ে এবে আছ, মার!
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?

নিজকরে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্যমনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি
বেড়াইতে মনোহর বেশে।
ত্যক্তকরি বারেবারে, সর্ব্বলোকে সবাকারে
শুন কাম এই তার শেষে॥

শচীর ব্যঙ্গও শচীর যোগ্য, গম্ভীর এবং গূঢ়ার্থ। যথা—

শচীকহে চপলারে, "গঞ্জনা দিওনা মারে.
সুখে আছে সুখে থাক কাম,
এপীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পূরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্বঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেইজন॥
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন।
প্রত্যুয়, কৌশলকিবা, আমারে শিখায়েদিবা
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়;
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময়?"

কন্দর্পের উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচীপ্রতি কয়।—
"সুখদুখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় সে ত্রিভুবনে
যুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা
না পাইব গিয়া অন্যস্থান॥
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চিরআশা
সুখ দুখ মনের খনিতে॥"

কন্দর্প বৃত্রকৃত শচীহরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন। শুনিয়া শচী প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া, পরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া তপঃস্থিত ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন।

পরে পঞ্চমসর্গে জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চপলা ইন্দ্রাণীকে বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে বা ব্রহ্মালয়ে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যিনি ইন্দ্রপত্নী সুরেশ্বরী তিনি বৈকুণ্ঠেও পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন চপলা ছদ্মবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। শচীর উত্তর পাঠে সকলেরই আনন্দ জন্মিবে।

"শুনলো চপলা।
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা॥
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর(ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয়!

ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন।

দেখিয়া চপলার বড় আনন্দ হইল। চপলা তখন সেই মূর্ত্তির শোভনোপযোগী মায়াবন সৃষ্টি করিলেন।

মোহিনী-মোহকর মহীরুহ-রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝরঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরয অরধ, অরধ শশিশোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;—
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

পরে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মাতা পুত্রে অনেক সস্নেহ এবং সকরুণ কথোপকথন হইল, এবং জয়ন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিলেন। এদিকে চপলা নন্দনতুল্য বনবিকাশ করিয়া আনন্দে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দূতসহ ভীষণ সেই স্থলে উপস্থিত। তাহারা মর্ত্ত্যে নন্দন শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইল। চপলাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। পরে যাহা ঘটিল তাহা গ্রন্থকারের মুখে শুনিতে হইবে—

চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন আকার।
বল আগে, কার দূত পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব!"
ভাবিল ভীষণ, তবে হবে এই শচী
নিবারিতে ক্লেশ মর্ত্তে আছে স্বর্গ রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল!
শিখাব উত্তম রূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত।"

শিব! বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর
"চিনেছি,চিনেছি--ভ্রান্তিনাহিঅতঃপর—
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা "—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা;
"থাক্ মেনে, আর কেন দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয়;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা!
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ,ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"

চপলা অকুতোভয়ে দৈত্যদ্বয়কে শচী সমীপে লইয়া গেলেন। দৈত্যদ্বয় সেই প্রশান্ত গম্ভীর তেজোময় আকার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময়ে জয়ন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আসিয়া ভীষণের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে। দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধ বর্ণনা বাঙ্গালাভাষায় অতুল্য; মেঘনাদ বধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য। উদ্ধৃত করিতেছি।

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল,
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;
রাত্রিদিবা যেনশূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুত-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ স্বর্গ-বহির্দ্দেশে ;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

বিরক্ত হইয়া দৈত্যপতি যোদ্ধৃবর্গকে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবদত্ত ত্রিশূল আনিতে আজ্ঞা দিলেন। দেখিয়া বৃত্রপুত্র যুবা বীর রুদ্রপীড় তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

বীরের স্বর্গই যশঃ যশ(ই) সে জীবন।
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

বৃত্রের উত্তরে যে বীরবাক্য আছে তাহাও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া!

"অনন্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখময় ;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ ;—

"কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!

"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত ;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখে চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হয় কত কাল!
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পূরাইতে সাধ।

"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর!

এমত সময়ে দূত আসিয়া ভীষণের বধ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তখন রুষ্টদৈত্য-পতি পুত্রকে শচী আনয়নে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী নিষেধ করিল। স্বর্গদ্বারে দেবগণ যুদ্ধ করিতেছে; কুমার কিপ্রকারে সে ব্যূহভেদ করিয়া গমন করিবেন? নির্গমন করিলেই বা কিপ্রকারে আবার পুরী প্রবেশ করিবেন? বৃত্র পুত্রের সঙ্গে শত যোদ্ধা ও তাঁহার হস্তে শিব-ত্রিশূল দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিল শূল না থাকিলে পুরী রক্ষা শঙ্কট হইবে; তখন—

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র, হে এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় ত্রিশূল লইল না। শত যোদ্ধা লইয়া শচীহরণে চলিল। এবং প্রতারণা দ্বারা দেবসৈন্য হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মর্ত্যে গমন করিল।

আমরা ছয় সর্গের বৃত্তান্ত লিখিলাম। আর চারি সর্গ বাকি আছে।

আগামী সংখ্যায় তৎসালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

(সম্পাদকীয় উক্তি)

বহুসংখ্যক গ্রন্থ আমাদিগের নিকট অসমালোচিত রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণও ব্যস্ত হইয়াছেন। কেন সেসকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, তাহা যে বুঝে না, তাহাকে বুঝান দায়। বুঝাইতেও আমরা বাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিছু বুঝাইলেও ক্ষতি নাই। প্রথম, স্থানাভাব। বঙ্গদর্শনের আকার ক্ষুদ্র; অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশের পরে প্রায় স্থান থাকে না। দ্বিতীয় অনবকাশ। আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শনলেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। "বৃত্রসংহার" বা "কল্পতরু" বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা, যে তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন, যদি তোমাদিগের এ অবকাশ বা ধৈর্য্য নাই, তবে এ কাজে ব্রতী হইয়াছিলে কেন? ইহাতে আমাদিগের এই উত্তর, যে আমরা বিশেষ না জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না। বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব।

আমাদের স্থূল বক্তব্য এই যে আমাদের নিকট যে সকল গ্রন্থ এক্ষণে অসমালোচিত আছে বা যাহা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে না। কোন২ গ্রন্থের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব প্রথানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব।

কমলাকান্তের দপ্তর।

একটি গীত।

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটী গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো"

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?"

কমলাকান্ত—"বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে—

এসোএসো বঁধু এসো—আধ আঁচরেবসো—

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল,

আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমাধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মানিক নও
যে হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা কোরে কাঁদি॥"

মিলত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহমন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবি শ্রীমদ্ভাগবতকারের সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেই খানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

এসো এসো বঁধু এসো—

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিজন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য

হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত-হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয় কামনা। মনুষ্য হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি সকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তি সকলের উদ্দেশ্য "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য—জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া, হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্ব কর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ, উপগ্রহকে ডাকিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো!" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে —"এসো এসো বঁধু এসো" জড়পিণ্ড সকল, গ্রহ, উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি, পুরুষকে ডাকিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে!

আধ আঁচরে বসো।

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। তোমার দুঃখ, তোমার কুশ কণ্টকাদি আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য, তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কলকাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজিও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞানবস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহ জীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত স্ফুটিত মধ্যাহ্ন পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ; কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি, যে কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলে সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি রাক্ষস আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। কোন কারিগর অভিসন্ধি করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যদি কারিগরের কারিগরি থাকে, তবে কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না কেন না দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহেনা—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মনে হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে।

অনেক দিবসে, মনের মানসে তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে।

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে

পারি যে আমি দুই দিন, দুই মাস, বা দুই বৎসর দুঃখ ভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্ন শূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে আমি অনন্ত কাল দুঃখ ভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থল পাইত না—এতদিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, একথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবন যাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখিজন দিবস গণিয়া থাকে। দিবসগণনা দুঃখ বিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে সে দিবস গণেনা; দিবসগণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি অফলন্ত বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ এক ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ইপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের কি মিলিবে না?

মণি নও মাণিকও নও, যে হার করে্য গলে পরি—

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত! যদি রূপের শরীরের প্রয়োজন ছিল তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও, যে হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি

মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পাইলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!

আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ

প্রথমে আহ্বান "এসো এসো বঁধু এসো" পরে আদর "আধ আঁচরে বসো" পরে ভোগ "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগ কালীন পূর্ব্ব দুঃখ স্মৃতি—"অনেক দিবসে মনের মানসে তোমাধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

মণি নও মাণিক নও, যে হার করে
গলে পরি।

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ।

সম্পূর্ণ, অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এসুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ একস্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া,ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এসুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই--কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন,তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি। আর কাতরোক্তি কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতিব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।

এই কথা সুখ দুঃখের সীমা রেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে,যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল কিন্তু চাহিব কোন দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন চরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বঙ্গাধিকার করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে বঙ্গলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধনবহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে,যবনভয়ে ভীতা সেই বঙ্গলক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্ষাফলক

উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অৰ্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শংখ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে, দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্য বীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশে মেঘ ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে, ক্রমে২ সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতলজলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই বঙ্গলক্ষ্মী কোথায় গেলেন—

যখন বন্ধনশালাতে যাই,
তুয়া মাতা গুণ গাই,
কাব্যের ছলনা করি কাঁদি।

জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত।*

ন্যায়দর্শনের সঙ্গে বাঙ্গালি মাত্রেরই একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ আমাদিগকে বলে, যে তোমরা এত বড়াই কর, কিন্তু কোন বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৃথিবীবাসী অন্যান্য জাতির অপেক্ষা গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে, আমরা আর কিছু বলিতে পারি বা না পারি, ন্যায়শাস্ত্রের

* ন্যায় পদার্থ তত্ত্ব। বাঙ্গালা দর্শন। শ্রীহরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত। কলিকাতা। গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

উল্লেখ করিতে পারি। ইহাই বাঙ্গালিদিগের জাতীয় গৌরব। ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে—ততই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে—স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থাশাস্ত্রে,—ঐশ্বর্য্যে, বাহুবলে—একদিন ভারতভূমি, ভূমণ্ডলে রাজ্ঞী স্বরূপা ছিলেন। কিন্তু সে গৌরবে বঙ্গদেশের অংশ মগধ কান্যকুব্জাদির ন্যায় নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যমপ্রকার—জয়দেব গোস্বামী ইহার চূড়া। মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বঙ্গীয় নহে। যে স্থাপত্য জন্য ফর্গুসন সাহেব ভারতবর্ষীয়গণকে ভূমণ্ডলে অতুল্য বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশে তাহা প্রচুরতর। যে সংগীতের জন্য সেদিন আলদিস্ সাহেব, ভারতবর্ষকে পৃথিবীশ্বরী বলিয়াছেন, তাহার চালনা বঙ্গদেশে চিরকালই সামান্য প্রকার। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি কেহই বাঙ্গালি নহে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালিরা অদ্বিতীয়। উদয়নাচার্য্য বোধ হয়, বাঙ্গালি। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, গদাধর তর্কালঙ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্গালি। গৌতম, কণাদ, কোন্ দেশবাসী তাহা নিশ্চিত করিবার কোন উপায় নাই—কিন্তু পরবর্ত্তী প্রধান নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালি। নবদ্বীপে, ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ মার্জ্জিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া ছিল, এরূপ ভারতবর্ষের আর কোথাও হয় নাই। নবদ্বীপে, বাঙ্গালির প্রধান কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তির জন্মভূমি। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যুদয়, নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়—নবদ্বীপে বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর—কৃষ্ণচন্দ্রীয় সাহিত্যও নবদ্বীপের নামে খ্যাত—আর, নবদ্বীপেই সপ্তদশ পাঠান কৃত বঙ্গবিজয়!

অদ্যাপিও ভারতবর্ষে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকদিগের বিশেষ খ্যাতি। যাহা আমাদিগের জাতীয় গৌরব, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করা, বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের দ্বারা, সে পথ অত্যন্ত সুগম হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন কিসের নাম? এ কথার উত্তর দিতে হইলে, প্রথম বুঝিতে হয়, ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে। প্রথমে বুঝিতে হইবে, যে ইউরোপে যে অর্থে "ফিলোসফি" শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচার বিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞান বিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামা-

ন্তর বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহাভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষে,—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য—ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।

জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স লাভ, ইহা ইউরোপীয় দিগের পক্ষে নূতন কথা বটে,এবং এদেশে প্রচলিত "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি প্রবাদের বিপরীত। জ্ঞানবাদীদিগের বিরোধী ভক্তিবাদীও যে এদেশে ছিলেন না, এমত নহে। প্রধান ভক্তি সূত্রকার শাণ্ডিল্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্য দেব।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্ব্বদা মনুষ্য সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র—যখন তুমি সমরজয়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ—প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্য্য মতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্তদুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপিও ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে হইবে—আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়,আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবন রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল—ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই, যে প্রকৃতি অজেয়—যতদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।

সেই জ্ঞান কি? আকাশ-কুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না আকাশ কি তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি

তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে।

প্রমা জ্ঞানের বিষয় কি, তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি পরিষ্কার। কিন্তু জ্ঞানের মূল কি, তাহা সমালোচিত হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে, সেই তত্ত্বটি লইয়া ইদানীং অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। অতএব আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতক গুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রানজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব, তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্ব্বিষয় জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে২ দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন ঐরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই,

(১) গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

অথচ ঐরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্য শরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্যজ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে যূথিকা পুষ্প আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে, আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি, অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ লোকের নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, যে তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার না, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্য্য দর্শন শাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাস যোগ্য তাহার উপদেশ,

—আর্য্য মতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাগাদি কোন২ আর্য্য দার্শনিক, ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমান বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তিবিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে, সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাস যোগ্য কে নহে। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমানের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ, যে মনু অভ্রান্ত ঋষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু অলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেস্নেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্ত বাক্য মাত্র গ্রাহ্য, ইহা আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা। এই রূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মত মাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্ব-

তন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অনুমিতির প্রকার ভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য, সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, এবং অনুমাই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকা ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, যে গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র২ জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, যে দর্শনশাস্ত্র, দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্য বুদ্ধি! যাহা এত কালে হ্যুম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে—দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে আমরা এমন বলিতেছি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায়, নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, যে তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা দুইটি সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন "প্রত্যক্ষের দ্বারা। আমরা যত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন, যে "জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমানান্তরাল রেখা হয় নাই,

বা হইবে না, যে তাহা টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য;—কস্মিন কালে কোথাও এমত দুইটি সমানান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?"

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন, যে যেখানে বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্ব্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্ব্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। আমাদিগের ব্রাহ্মেরা ইহাকে সহজ জ্ঞান বলেন।

পাঠক আবার দেখিবেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি, যে যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক বর্ত্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে খও এখানে আছে, কেন না আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি যেখানে কারণ থাকে সেই খানেই তাহার কার্য্য থাকে। সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য, কেন না আমরা যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই খানে সেই খানে

দেখিয়াছি মিল হয় নাই, অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কাযেই আমরা জানিতেছি যে যখন যেখানে দুইটি সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেই থানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

শেষ মত, হর্বর্টস্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে এই প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি এমত নহে—তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসূত শিশুও সংস্কার বিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান।

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন, যে ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (২)

আমরা শ্রীযুক্ত হরিকিশোর তর্ক বাগীশ মহাশয়ের পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি, এস্থলে তাঁহার গ্রন্থের যথাযোগ্য প্রশংসা না করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে পারি না। যিনি অস্মদ্দেশীয় ন্যায় দর্শন অল্পায়াসে অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত এই গ্রন্থ যত্নে অধ্যয়ন করিবেন। আমরা ন্যায়শাস্ত্রের এরূপ সরল ব্যাখ্যা বাঙ্গালা বা ইংরেজিভাষায় আর দেখি নাই। যে, যে তত্ত্বে পারদর্শী না হয়, সে কখন তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে পারে না। তর্কবাগীশ মহাশয়, এই দর্শন শাস্ত্রের যে সম্যক্ পারদর্শী,এই গ্রন্থ তাহার পরিচয়। তাঁহার প্রশংসার্থ ইহাও বক্তব্য, যে তিনি কেবল, বিতণ্ডাকারী চতুষ্পাঠীগতবুদ্ধি প্রাচীন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত নহেন। উত্তমরূপে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক অবগত আছেন, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িক দিগের ন্যায় তাহাতে আস্থাশূন্য নহেন। অনেক স্থানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং প্রাচ্য দর্শনে সামঞ্জস্য করিতে যত্ন করিয়াছেন। ন্যায় শাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ অধিকার বিজ্ঞানে সেরূপ না থাকায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। না হউক, তথাপি তাঁহার গ্রন্থ, অনেক বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় তুলনাশূন্য। তিনি জ্ঞানী, কুসংস্কারবর্জ্জিত,এবং লিপিকুশল। এবং সাহস করিয়া আধুনিক অসারগ্রাহী পাঠকদিগের সম্মুখে ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারও প্রশংসা এবং বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।

---

(২) অনেকে কোমতের "Positive Philosophy" নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে "Empirical Philosophy" বলে অর্থাৎ লক, হ্যুম, মিল, ওবেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।

সমাজবিজ্ঞান।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন বর্ত্তমান কালের প্রধান লক্ষণ কি, আমরা বলিব বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তার। ব্রহ্মাণ্ডের সকল কাণ্ডেই এক্ষণে বিজ্ঞান হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সমস্ত বস্তু অতি ক্ষুদ্র বলিয়া চক্ষুর অগোচর, বিজ্ঞান অণুবীক্ষণযোগে আপনার আয়ত্ত করিতেছে। যেসকল পদার্থ অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া অলক্ষ্য বা দুর্লক্ষ্য, বিজ্ঞান দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা আপনার শাসনাধীনে আনিতেছে। এইরূপে ভূমণ্ডল ও আকাশ হইতে দেবতা তাড়াইয়া সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান আপনার রাজ্য বাড়াইতেছে। পূর্ব্বে যে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের বিশৃঙ্খল ব্যাপারে ইন্দ্র ও বায়ুর প্রভাব অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ লক্ষিত হইত, তাপতাড়িতের দুটী কথা বলিয়া বিজ্ঞান তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে যে ধূমকেতু দেবক্রোধ চিহ্ন স্বরূপ গগন মণ্ডলে উদিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অমঙ্গল বর্ষণ করিত, বিজ্ঞান মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু দিয়া তাহাকে সূর্য্যের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে রুদ্রমূর্ত্তি সর্ব্বভুক্ হুতাশন দৃষ্ট হইতেন, সেখানে বিজ্ঞান রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ প্রদর্শন করিতেছে। পূর্ব্বে যে প্রাণ রূপ স্বতন্ত্র পদার্থ জীবোদ্ভিদ্ সমূহের শরীরে থাকিয়া তথাকার কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিত, বিজ্ঞান তাহাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার অধিষ্ঠান ভূমিতে নৈসর্গিক নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে। এমন কি, কিরূপে বর্ত্তমান জগতের ও জীবপুঞ্জের উৎপত্তি হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহাও দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। কি প্রকারে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ধূমকেতুগণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, কি প্রকারে জলস্থল পর্ব্বত নদী প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কি প্রকারে ভূমণ্ডলে নানাবিধ জীবের উদয়, বিলয় বা বিস্তার ঘটিয়াছে, বিজ্ঞান যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত। এই বৃহৎ ব্রতের অনুষ্ঠানকরিতে গিয়া বিজ্ঞান ঐশীশক্তির সাহায্য চাহে না, সৃষ্টির কল্পনা করে না, কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালীর কথা বলে। এই কার্য্য প্রণালীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিজ্ঞান বিদ্যুৎকে দূত করিয়াছে, অগ্নিকে রথের অশ্ব করিয়াছে, সমুদ্রকে গমনাগমনের পথ করিয়াছে, এবং বায়ুকে প্রয়োজনানুসারে বাহন করিয়া থাকে।

কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া বিজ্ঞান জগন্মণ্ডলে সর্ব্বত্রই নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিতেছে; এক্ষণে মনুষ্যসমাজকেও ছাড়িতেছে না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে মানবজাতিও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে গ্রথিত, মানবজাতিও নিয়মের অধীন। যেমন চরণতলস্থ ধূলিকণা হইতে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জপর্য্যন্ত জড়পদার্থ সকল নিয়মের অধীন, তেমনই বিজ্ঞানবেত্ত-

গণের মতে তরুলতার অঙ্কুর হইতে মনুষ্য মনের মহোচ্চতম চিন্তা পর্য্যন্ত প্রাণিমণ্ডলস্থ সমস্ত ব্যাপারই নিয়মের অধীন। কিন্তু ইহার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, আমরা ত আপনাদিগকে এপ্রকার আবদ্ধ বিবেচনা করি না ; আমাদিগের অনুভব ও বিশ্বাস এই যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আমাদিগের কার্য্যে এই রূপ বিশ্বাসই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। যখন আমরা কোন মন্দ কর্ম্ম করি, তজ্জন্য আমাদের চিত্তে অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমরা অবশ্যই ভাবি যে উক্ত কর্ম্মকরা না করা উভয়ই আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল; ইচ্ছাপূর্ব্বক অবৈধ আচরণ করিয়াছি বলিয়াই মনস্তাপ জন্মে। যদি আমরা বুঝিতাম যে, যে কার্য্য করিয়াছি, তদ্বিরুদ্ধে ধাবিত হইবার শক্তি আমাদিগের ছিল না, তাহা হইলে আমাদিগের ঈদৃশ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত না। বাস্তবিক যখন আমাদিগের স্বাধীনতা থাকে না, যদি আমাদিগেরদ্বারা কেহ একটী অন্যায় কার্য্যও করাইয়া লয়, আমরা তজ্জন্য বিশেষ কোন মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করি না। যদি ডাকাইতে কাহাকে বাঁধিয়া অন্য একজনের উপরে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া সন্তপ্তচিত্ত হয়, এরূপ বোধ হয় না। আর সৎকর্ম্ম করিলে আমরা যে আত্মপ্রসাদ পাই, অসৎপথে যাইবার ক্ষমতা আমাদিগের ছিল, এপ্রকার প্রত্যয় না থাকিলে তাহা কখনই জন্মিত না। অন্য লোককে যখন আমরা তাহাদিগের কার্য্যজন্য নিন্দা বা প্রশংসা, পুরস্কার বা তিরস্কার, করি, তখন ও আমরা তাহাকে স্বাধীন জ্ঞান করি ; কারণ বিপরীত ব্যবহার তৎপক্ষে সম্ভব না হইলে তাহার প্রতি দোষ বা গুণের আরোপ নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। যখন আমরা কোন অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকি, তখনও আমরা বিবেচনা করি যে সে অন্যরূপ কার্য্য করিতে পারিত, কোন অনিবার্য্যশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহার এপ্রকার আন্তরিক বল ছিল যে সে অসৎবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্মার্গানুগামী হইতে পারিত।

এই আপত্তিগুলির সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে গুটিকতক কথা বলিব। অনুভব দ্বারা আমরা আপন আপন বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা জানিতে পারি। আমাদিগের মনে কি প্রকার সুখ, দুঃখ, বাসনা ইচ্ছা বা জ্ঞান এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে, আমরা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু কোন প্রকার মানসিক শক্তি অনুভবের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয়। আমাদিগের মনে যে সকল ভাব উদিত হয়, তন্মধ্যে এক এক জাতীয় ভাবদিগকে এক একটি শক্তির কার্য্য বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং যদি আমাদিগের কার্য্যনিয়ন্ত্রী স্বাধীনতাশক্তি থাকে, তাহা অনুভবসিদ্ধ না হইয়া অনুমানসিদ্ধ হইবে। অনুমান অবলম্বন

করিয়াই, আমাদিগের কোন প্রকার ক্ষমতা আছে না আছে, তদ্বিষয়ের বিশ্বাস জন্মে। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদিগের যে স্বাধীনতায় বিশ্বাস আছে, সে কিরূপ স্বাধীনতা। সাধ্যরিয়মান্তর্গত যখন আমাদিগের যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পাইলেই আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি। যদি কেহ আমাদিগকে ধরিয়া, বাঁধিয়া, বা আবদ্ধ করিয়া রাখে, যদি ইচ্ছামত আমরা বিচরণ করিতে না পারি, যদি ইচ্ছানুসারে লিখিতে, পড়িতে, বলিতে বা অন্য কোন রূপ কার্য্য করিতে না পাই, তাহা হইলে আর আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি না। ইহাতেই স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে যখন কোন বাহ্যশক্তিতে আমাদিগকে ইচ্ছানুসারে চলিতে দেয় না, তখনই আমরা আপনাদিগকে পরাধীন ভাবি; আর যখন আমরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পাই, তখনই আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করি। আমরা স্বাধীন একথা বলিবার সময়ে, আমাদিগের ইচ্ছার কোন কারণ নাই, ইহা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে হয়ত ইহার অন্তরে এই ভাবটি আছে, আমরা কোন অনিবার্য্য বাহ্যশক্তির বশীভূত হইয়া ইচ্ছাটিও করি না, স্বীয় প্রকৃতি অনুসারেই করিয়া থাকি। স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্বপ্রকৃতি সাপেক্ষতা, স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা।

অসৎকর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি কেন হয় তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। কি করা ভাল, কি করা মন্দ, প্রত্যেক ব্যক্তিই একপ্রকার স্থির করিয়া রাখে। কিন্তু সময়ে সময়ে কোন কোন বাসনা প্রবল হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান ঢাকিয়া ফেলে। তখন অন্যায় কার্য্য সহজেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন আন্তরিক ঝটিকা থামিয়া যায়, তখন স্থির বুদ্ধির আলোকে উক্ত কার্য্যের মলিনত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তখন উচ্চলক্ষ্যচ্যুত ও নীচপথগামী বলিয়া আপনার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে। নিজের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা হইলে মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবারই কথা।

আমরা যে সকল লোকের কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগের নিন্দা বা প্রশংসা, দণ্ড বা পুরস্কার, করি, ইহা হইতে তাহাদিগের ইচ্ছা কার্য্যকারণনিয়মের অধীন নহে এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। মনে কর যদি পৃথিবীতে এমন একজাতীয় জীব থাকিত, যাহারা অনিবার্য্যবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমাগতই আমাদিগের উপকার করিত ও অপকার করা কাহাকে বলে বুঝিত না; তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে দেবতা তুল্য ভক্তি করিতাম না? আর যদি কোন এক জাতীয় জীব স্বকার্য্যের ফলাফল বোধশূন্য হইয়া নিয়তই আমাদিগের অপকার করিত, তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে সর্প ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বধ করিতে প্রস্তুত হইতাম না? বাস্তবিক বোধ হয়, নিন্দা প্রশংসা,

দণ্ড পুরস্কার, এসকলের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি ; ১ আত্মরক্ষা ২ সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন। যে ব্যক্তি আমাদিগের অনিষ্টসম্পাদনে নিযুক্ত, সে ব্যক্তি কলের ন্যায় বোধ শূন্য হইলেও আমরা তাহাকে দণ্ড দিতে পারি। এই কারণেই আমরা উন্মত্তদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত জ্ঞান করি। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, পুরস্কার দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও অসৎপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়। এ বিশ্বাস সমূলক হইলে, নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা মানবচিত্তের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং মনুষ্যকে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিতে হইতেছে।

মনুষ্য কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন, ইহা পদেং আমরা অনুমান করি। যখন আমরা বলি অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অমুক ব্যক্তি পারে না; তখন আমাদিগের মনোগত ভাব কি? তখন কি আমরা ইহাই ধরিয়া লই না যে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যই তাহার চরিত্র ও অবস্থার সমবেত ফল? হাজার টাকা উৎকোচ পাইলে অর্থলোভী ও ন্যায়পর এ উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ কার্য্য করিবে, আমরা কি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বলিয়া দিতে পারি না? যদি গণনা ঠিক না হয়, তাহা হইলে কি আমরা বুঝি না যে চরিত্র ভাল করিয়া না জানাই আমাদিগের বিফল হইবার কারণ? আমরা কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া চলি। কাহারও নিকটে অনুনয় বিনয় করি। কাহারও কাছে তর্জ্জন গর্জ্জন করি। কাহাকে তাহার স্বার্থের কথা বলি। কাহারে বা ধর্ম্মভয় দেখাই। কাহারও যশোলিপ্সা প্রজ্জ্বলিত করি, কাহারও আত্মগরিমার বিনোদন করি। এইরূপে আমরা ব্যবহারে দেখাইতেছি যে, লোকের কার্য্য অবস্থা সংযোগে স্বভাবোৎপন্ন ফল, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

জর্ম্মন দিগকে অনেকে চিন্তামগ্ন বলিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে অপারগ জ্ঞান করিত। অনেকে ভাবিত তাহারা দর্শন ও কাব্যরসে চিরদিন ডুবিয়া থাকিবে; কিন্তু পৃথিবীতে কখনও সমরকুশল ও মন্ত্রণাতৎপর পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। এক্ষণে তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া লোকের এ প্রকার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কার্য্য কারণ নিয়মের ব্যভিচার হইতেছে না। ইহাতে দেখাইতেছে যে পূর্ব্বে অনেক লোকে জর্ম্মনদিগের প্রকৃতি ভাল করিয়া অবগত হইতে পারে নাই।

মনুষ্যসমাজ যে নিয়মের অধীন তাহার একটি সুন্দর প্রমাণ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এক্ষণে অনেক প্রকার ঘটনার বিশেষ বিশেষ তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, যে সকল কার্য্যে লোকের বিশেষ স্বাধীনতা অনু-

মিত হইয়া থাকে, তাহাতেও নিয়ম আছে। কোন্ দেশে বৎসরে কত বিবাহ, কত নরহত্যা, কত চিঠিলেখা হইবে, এসকল এক প্রকার স্থির আছে। এমন কি,কত লোকে চিঠির শিরোনামায় মোকাম লিখিতে ভুলিবে, তাহাও অবধারিত করিয়া বলা যায়। বাস্তবিক সামাজিক অবস্থা যতদিন একরূপ থাকে ততদিন গড় পড়তায় ফল একরূপ হইবে,ইহা একপ্রকার স্বতঃ সিদ্ধ।

মনুষ্যের ইচ্ছা কারণ সূত্রে বদ্ধ, ইহা বলিলে যদি কেহ দুঃখিত হন, কি করিব? জনমনোমোহন চিত্র অপেক্ষা সত্য আমাদিগের প্রিয়বস্তু। কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের মহত্ত্ব বাড়াইতে গিয়া, আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা ভাবেন যে অকারণে মনুষ্য যাহা তাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। লোকের সৎ বা অসৎ অভিপ্রায় দেখিয়াই আমরা তাহাদিগকে প্রশংসা বা নিন্দা করি। অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী ইচ্ছার কারণ স্পষ্টই উক্ত অভিপ্রায়। সুতরাং সে ইচ্ছা কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ। যে ইচ্ছার কারণ নাই, তাহাকে কিরূপে অসৎ বা সৎ বলিয়া তাহার নিন্দা বা প্রশংসা করিবে?

মনুষ্যসমাজ যদিও নিয়মের অধীন, তথাপি তাহা কতদূর বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথবর্ত্তী, ইহা অনেকে বুঝেন না। অনেকে মনে করেন, আমি, তুমি, বা অপর কোন ব্যক্তি সারাজীবন কথন্ কি কাজ করিব, বিজ্ঞান কালে বলিতে পারিবে। এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যদি একখানি কাচপাত্র প্রস্তরের উপরে সবলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে কাচপাত্রটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, পদার্থতত্ত্ব বলিতে পারে; কিন্তু কোন্ খণ্ড কোথায় কিরূপ বেগে যাইয়া পড়িবে ইহা বলা বিজ্ঞানের সাধ্য নহে। সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই চারিটী কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের জীবনগতি নির্ণয় করা বিজ্ঞানের ক্ষমতাতীত।

যে জ্যোতিষে বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাতে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বহু কাল পূর্ব্বে হইতে সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ বা গ্রহবিশেষের অবস্থান গণনা করিতে সক্ষম, এমন কি যাহাতে বিজ্ঞান না দেখিয়া অনুমান বলে বলিতে পারিয়াছে গগনের অমুক স্থানে অনুসন্ধান কর একটী নূতন গ্রহ পাইবে, সেই জ্যোতিষেও বিজ্ঞান ঠিক ঠিক ফল নির্ণয় করিতে পারে না। গ্রহদিগের কক্ষগুলি ঠিক কেপ্‌লার (Kepler) নির্দ্দিষ্ট বৃত্তাভাস পথ নহে; অপর গ্রহসমুদায়ের আকর্ষণে প্রত্যেক গ্রহের কক্ষ শুদ্ধ বৃত্তাভাস আকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাস্তবিক জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা পরস্পর আকর্ষণকারী তিনটী পদার্থের প্রকৃত অবস্থানও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে

আমরা নিরূপণ করিতে অশক্ত। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, বিষয়ের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বনির্ণয়ের কত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। মনুষ্যসমাজ একে ত অসংখ্যব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি আবার বিবিধ বাসনার বশবর্ত্তী। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন তিনটী পদার্থের কক্ষ কয়টী ঠিক ঠিক নিরূপণ করা যখন অসাধ্য ব্যাপার, তখন বহুবিধবাসনাজড়িত বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের গতি স্থির করা সহজ কাণ্ড নহে। বিশেষতঃ দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে মনুষ্যের কতরূপ প্রকৃতিভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার উপর আবার ভাবিতে হয় যে, মানবজাতি প্রায় লক্ষ বৎসর ভূমণ্ডলের অধিবাসী; অথচ আমরা কেবল দুই তিন হাজার বৎসরের কোন কোন দেশের ইতিহাস মাত্র জানি। সাগরকূলের দুই একটী ঢেউ দেখিয়া কেহ অকূল জলধির বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তাহার যে দশা হয়, সমুদয় মানবজাতিসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে আমাদিগের প্রায় সেইরূপ দশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। যদি আমরা পুরাণবর্ণিত ঋষিগণের ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ হইতাম, তাহা হইলেও একপ্রকার নিস্তার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কলিকালের লোক। সামান্য বুদ্ধিরূপ ভেলা অবলম্বন করিয়া আমাদিকে অনন্ত অম্বুনিধি অতিক্রম নিমিত্ত অগ্রসর হইতে হয়।

পদার্থভেদে তন্নির্ম্মিত স্তূপের আকার ভেদ ঘটে। গোলক, ইষ্টক, বা বালুকা, রাশীকৃত করিয়া সাজাও, স্তূপগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহাদিগের গঠনবন্ধনও বিভিন্নরূপ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে। এই সামান্য উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে সমষ্টির প্রকৃতি উপাদানসাপেক্ষ। মানবসমাজও এই নিয়মের অধীন। মনুষ্যের স্বভাব দেখিয়াই মানবসমাজের ভাবগতি নির্ণেয়।

যখন কোন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বল প্রয়োগ করা যায়, তখন হয় তাহা স্থির হইয়া থাকিবে, নয় তাহার গতি হইবে। পণ্ডিতেরা এনিমিত্ত বলবিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; ১ স্থিতি বিজ্ঞান, ২ গতি বিজ্ঞান। স্থিতি বিজ্ঞানে স্থিতির, এবং গতিবিজ্ঞানে গতির, নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। সমাজতত্ত্ববিদ্গণ এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞান ও সামাজিক গতিবিজ্ঞান নামক সমাজবিজ্ঞানের দুইটী শাখা কল্পনা করিয়াছেন। সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞানে সমাজস্থিতির, এবং সামাজিক গতি বিজ্ঞানে সামাজিক উন্নতির নিয়মাবলী নিরূপিত হয়।

সমাজস্থিতির নিয়মাবলী নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা মানবসমাজকে শরীরের সহিত তুলনা করেন। শরীরের সমুদায় অংশগুলি পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে যেমন স্নায়ুমণ্ডল আছে, তেমনই সমাজে শাসনকর্ত্তা চাই। ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক যন্ত্র দ্বারা

যেমন শরীর রক্ষণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হয়, তেমনই সমাজরক্ষার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ি-লোক সমাজে থাকা আবশ্যক। যেমন শরীরের একঅঙ্গে বেদনা লাগিলে সমুদায় শরীরের ক্লেশবোধ হয়, তেমনই সমাজের কাহার ও দুঃখ হইলে অন্যের সহানুভূতি চাই। ' যেমন শরীরস্থ এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গের সহায়তা হয়, তেমনই সমাজের এক ব্যক্তি বা একবিভাগ দ্বারা অপর ব্যক্তি বা অপর বিভাগের সাহায্য হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক যে যে স্থলে সমাজ ক্ষমতাশালী ও সুখী দেখা যায়, সে সে স্থলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধেয় শাসন প্রণালী আছে, সেখানে প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ী লোক আছে, এবং সেখানে পরস্পরের সাহায্য করা ও পরস্পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। যদিও শরীরের সহিত সমাজের এত সাদৃশ্য, তথাপি উভয়ের মধ্যে একটী গুরুতর বিভেদ আছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই চৈতন্যবিশিষ্ট জীব, কিন্তু শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ তদ্রূপ নহে। সুতরাং সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সচ্ছন্দতাসম্পাদনই সমাজরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলের সচ্ছন্দতাসম্পাদনই শরীররক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে শাসনকর্ত্তৃগণ সমাজশরীরের স্নায়ুমণ্ডল স্বরূপ হইলেও রাজার সুখাপেক্ষা প্রজাদিগের সুখের দিকে দৃষ্টি রাখাই রাজ্যশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজের উপাদানভূত ব্যক্তিগণ সচেতন হওয়াতে আর একটী বিশেষ ফল এই হইয়াছে যে শারীরিক কার্য্যাপেক্ষা সামাজিক কার্য্য অধিক পরিমাণে জ্ঞান ও ইচ্ছার অনুবর্ত্তী।

মনুষ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, উহা ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; প্রথম জ্ঞানের উন্নতি, দ্বিতীয় নীতির উন্নতি, তৃতীয় বাহ্য জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি। যখন আমরা কোন জাতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলি, তখন হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে নূতন কথা অনেক জানিয়াছে, নয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সৎকার্য্যশালী হইয়াছে, অথবা তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা জড় পদার্থ সকল আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া তদ্দ্বারা সামাজিক সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিয়াছে, এইরূপ কোন একটি বা দুই তিনটির প্রতি লক্ষ্য করি। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অপর দুই প্রকার উন্নতি জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ। জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারিলেই আমরা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। যত দিন না লোকে জানিত বিদ্যুৎ কি পদার্থ, ততদিন তাহাকে ইচ্ছানুসারে আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে নাই; কিন্তু এক্ষণে তাহার আবির্ভাবের নিয়ম অবগত হইয়া আমরা তার সংযোগে তদ্দ্বারা দূরে সং-

বাদ প্রেরণ করিতেছি। অগ্নিকে প্রথমে লোকে দেবতা বলিয়া ভয় করিত, পরে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়া তদ্দ্বারা মানব জাতি কত কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অগ্নি অন্ন ব্যঞ্জন পাক করে। অগ্নি শীতকালে তাপ দিয়া থাকে। অগ্নি অন্ধকার হরণ করিয়া নিশাকালে আমাদিগের কত সাহায্য করে। অগ্নি মৃণ্ময় পাত্র ও ইষ্টক পুড়াইয়া আমাদিগের কত উপকার করে। অগ্নি জলকে বাষ্প করিয়া কলের নৌকা ও কলের গাড়ী চালায়। আবার দেখ, বায়ুর গতি অবগত হইয়া তৎসাহায্যে মনুষ্য সমুদ্র পথে জাহাজ চালাইতেছে। এইরূপ পদে পদে দৃষ্ট হইবে যে জ্ঞানই নরজাতির কর্ত্তৃত্বের মূল এবং বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি না হইলে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। নৈতিক উন্নতি বিশ্বাস-পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ। কিন্তু নূতন কিছু না জানিলে লোকের বিশ্বাস পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং নৈতিক উন্নতিও জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ।

যদি জ্ঞানোন্নতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতির নিয়মই সামাজিক উন্নতির প্রধান নিয়ম হইবে; এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করে, সেই গুলি সামাজিক উন্নতিরও সহায় হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত অগোস্ত কোম্‌ত বলেন যে জ্ঞানোন্নতির তিনটি সোপান আছে ১ পৌরাণিক ২ দার্শনিক ৩ বৈজ্ঞানিক; আর যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়। অদ্যাপি ইহার অতিরিক্ত উচ্চ কথা আর কেহই বলিতে পারেন নাই, এবং ইহার সাহায্যে কোম্‌ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কোম্‌তদর্শন" নামক প্রবন্ধে একবার কোম্‌তের জ্ঞানোন্নতিবিষয়ক মতের আলোচনা করা গিয়াছে; তজ্জন্য এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক লিখিত হইল না।

প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক কারণে বোধ হয় জ্ঞানোন্নতির অনেক সহায়তা করিয়াছিল। যে যে স্থলে ভূমির উর্ব্বরতা গুণে লোকে অল্প পরিশ্রমে আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা জন্য অবসর পাইত, সেই সেই স্থলে পূর্ব্বকালে বহুল পরিমাণে সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয়। মিসরের নীলনদ তীরে, তুরস্কের ইউফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রিস্‌ নদীর কূলে, ভারতবর্ষে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে, হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদী বিভূষিত চীনদেশে, প্রাচীন সময়েই সভ্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছিল।

সময়ে সময়ে কোন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াও জ্ঞানোন্নতির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বুদ্ধ বা খৃষ্ট না জন্মিলে লোকের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরও কতকাল লাগিত, কে বলিতে পারে? যদি গালিলিও বা নিউটন না জন্মিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উন্নতি অল্পকালমধ্যে এত হইত কি না সন্দেহ।

কেহ কেহ বলেন যে মহাপুরুষেরা উচ্চ পর্ব্বত চূড়া স্বরূপ, উদয়োন্মুখ জ্ঞান স্ব্র্য্যের আলোক তাহাদিগের মস্তকে আগে লাগিয়া উপত্যকা প্রদেশে প্রতি ফলিত হয়, এই মাত্র। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা না আবির্ভূত হইলেও উপত্যকা প্রদেশ জ্ঞানরশ্মিদ্বারা আপনাআপনি অনতিবিলম্বেই আলোকিত হইত। ইহাতে আমরা সায় দিতে পারি না। সত্য বটে কোন একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাহার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি বড় লোকে যত গুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম, বহুসংখ্যক সামান্য লোকে বহুকাল না খাটিলে ততগুলি আবিষ্কার করিতে পারে না; এবং কোন একটি মহত্তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে মনের যেরূপ মহত্ত্ব আবশ্যক, তাহা কখনও সামান্য লোকের হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, যে প্রণালীতে জ্ঞানের উন্নতি হইবে যদিও তাহার অন্যথা হইতে পারে না, তথাপি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব দ্বারা উন্নতির বেগের তারতম্য সংঘটিত হয়।

শাসনকর্ত্তৃগণ পুরস্কার বা দণ্ডদ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারেন। সুতরাং সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগকে এক হাত গণিয়া চলি। যাঁহারা রাজনিয়ম দ্বারা জর্ম্মনির উন্নতি ও স্পেনের অবনতি সন্দর্শন করিয়াছেন, আমরা আশা করি যে তাঁহারা আমাদিগের সহিত একমত হইবেন।

বৃত্রসংহার।

২য় সংখ্যা।

কাব্যনায়ক ইন্দ্র, এই প্রথম, সপ্তম সর্গে, দৃশ্যমান হইতেছেন। কোন২ মহাকাব্যে আদ্যোপান্ত নায়ক প্রায় আমাদিগের দৃষ্টির অতীত হয়েন না,—সে শ্রেণীর মহাকাব্যের প্রধান উদাহরণ রামায়ণ। আবার কোন২ মহাকাব্যে নায়ক, তাদৃশ সর্ব্বদা দর্শনীয় নহেন; কার্য্য কালেই দেখা দেন। সংসারের এক একটি কার্য্য বহুজনের বহুতর উদ্যোগের ফল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকে বহুতর উদ্যোগ করে, শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্রিত করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফল ফলান। কাব্যকার সেই ক্ষুদ্র২ লোকের ক্ষুদ্র২ আয়োজন প্রথমে দেখাইয়া, শক্তিধরের শক্তিতে তৎসমুদায়ের পরিণাম দেখান। এই জন্য শ্রেণী বিশেষের মহাকাব্যে নায়ক কেবল ফলোৎপত্তি কালেই পরিদৃশ্যমান হয়েন। ইলিয়দের প্রথম সর্গের

পর, আট সর্গে আর আকিলিসের দেখা নাই; এবং বৃত্রসংহারে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত ইন্দ্রের দেখা নাই। ফলে যে একাদশ সর্গ এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাতে ইন্দ্রকে আমরা অধিকক্ষণ দেখি না।

কুমেরুশিখরে ইন্দ্র তপস্যায় নিযুক্ত। কিন্তু সে তপস্যা ব্রহ্মাদি পৌরাণিক দেবতার আরাধনা নহে। তিনি নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। নিয়তি হেম বাবুর সৃষ্টি। সত্য বটে, গ্রীসীয় দেবতাদিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আছেন, কিন্তু হেম বাবুর নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতি। হেম বাবুর এই সৃষ্টি অত্যন্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নিয়তি অস্মদ্দেশীয় পুরাণেতিহাসে নাম প্রাপ্ত নহেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই ঐশী শক্তির অতীত আর একটি শক্তির অধীন দেখা যায়। যাঁহারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, তাঁহারাও সর্ব্বশক্তিমান্ বা ইচ্ছাময় নহেন। তাঁহাদিগকেও উদ্যোগ করিয়া কার্য্যসিদ্ধ করিতে হয়, এবং সময়ে সময়ে বিফলযত্ন হইতে হয়। দশবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে পৃথিবীর ভার মোচন, বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাদেব সমুদ্রমন্থন করাইয়াও বিষভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাদিগের ত কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার বিফলতা থাকিলেই সুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণাদির এই সুখ দুঃখ কোন শক্তিতে? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেম বাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন। সে দেহও অতি ভয়ঙ্কর—

পাষাণের মূর্ত্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।
মাধুর্য্য কি স্নেহ কিম্বা অনুকম্পা-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র; নিয়ত দর্শন
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।

অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট কভু।

যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তির এই মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটি কৌতূহল ব্যাপার দেখাইব—বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্ন লিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন,

"পূর্ব্বে সে নিরখি যেথা ক্ষোণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিভূষিত,
লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া!

"গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ দেহ।

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে, হয়েছে প্রকাশ;
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে!

আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য, পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিন খানি অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখন২ প্রতীয়মান হয়, এবং লিয়রে বা হামলেতে কখন২ আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। প্রাকৃতবিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেম বাবু তাহা উপরিধৃত কয় চরণে দেখাইয়াছেন। ইহার আর একটি উদাহরণ আমরা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিব।

নিয়তির দর্শন পাইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিনে, কি উপায়ে বৃত্র নিধন হইবে। নিয়তি তাঁহাকে শিবপুরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র, দেবদূত স্বপ্নের দ্বারা এ সম্বাদ, স্বর্গদ্বারে সমবেত দেবগণ নিকেতনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাস ধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম সর্গ, আদ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ন্যায় কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। আমরা সর্গটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে পারি না, কিন্তু সমুদায় উদ্ধৃত না করিলেও, ইহার রাশি রাশি সৌন্দর্য্য, ইহার চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না—নিদাঘ কালীন পুষ্প-বৃক্ষের ন্যায় ইহা আদ্যোপান্ত সুপ্রফুল্ল কবিতাপুষ্পে মণ্ডিত।

ইন্দুবালার প্রকৃতি অতি মনোমোহিনী।

মাধুরী লহরী, অঙ্গেতে যেমন,
উছলি উছলি চলে।

রতি নিকটে বসিয়া ফুল গাঁথিতে ছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া রতি বলিলেন—তুমি বীরপত্নী, তোমার এত ভয় কেন? তখন—

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে!
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে;
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি॥

"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন্ পুষ্প তুলে ;
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার,
তুলি এই সারসন ;
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ ॥'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ !
অতিপ্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি !
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিল আমার গায় !
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ,
প্রিয়কর কতদিন
না পরশে ইহা ; সমর রঙ্গেতে
রত তিনি অনুদিন ॥
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার,
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম !
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম !"

এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। "আমিও রমণী, রমণীও শচী" ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শতপৃষ্ঠা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

শচীকে ধরিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, শ্বাশুড়ীর উপর ইন্দুবালার রাগও বড় মধুর।

ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানবমহিষী,
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?

রতির মুখে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা বলিতেছে,

আমারে লইয়া, কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী' পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;

শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ॥

ইন্দুবালা মর্ত্যলোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, দেব্যবূহভেদ করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। তখন ইন্দুবালার স্মরণ পড়িল যে তাঁহার স্বামীকেও যুদ্ধ করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। ইন্দুবালা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। আমরা সে ভাগ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলতা তাহাতে অতি সুন্দর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সরলতাই, ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী শক্তির মূল। কবির চিত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য, যে, যে সরলতা তিনি ইন্দুবালার চরিত্রের মূল স্বরূপ করিয়াছেন, সে সরলতা আর কোন নায়িকার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেন নাই। শচীতে, চঞ্চলায়, বা ঐন্দ্রিলায় সে সরলতা নাই। এইরূপে তিনি চরিত্র সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

ইন্দুবালাকে রতি শান্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহাতে অপূর্ব্ব কবিত্ব। সেই সরলতার সঙ্গে কবি অতি গুরুতর গাম্ভীর্য্যের সূত্র জড়াইয়া দিতেছেন;—ইন্দুবালার চরিত্রে সৌন্দর্য্য তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে,

"পারিনা সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা!
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির!
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী!
কত পিতা পুত্রহীন!
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ!
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে!"

কুলশত্রু দেবতার জন্য এই কাতরতা—"কত দেবতনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে!" এই চারিটি শব্দে হেম বাবু রমণী চরিত্রের সরলতা, মাধুর্য্য, ও মহত্ত্বের সীমা দেখাইয়াছেন।

তখন রতি বলিতেছে,

"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন!
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন?"

তখন পতি নিন্দায় ইন্দুবালা গর্জ্জিয়া উঠিয়া রতিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল,

শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয় ॥

যাব শচীপাশে,　　　করিব শুশ্রূষা,
　　যাতে সাধ দিব আনি।
মহিষী-কিঙ্করী　　　হইতে দিব না,
　　কহিনু নিশ্চিত বাণী॥
মন্মথ-রমণি,　　　নাহি কর খেদ,
　　যাহ ফিরে নিজ বাস;
পতির এ দোষ　　　যাহে ভুলে শচী
　　পাইব সদা প্রয়াস॥
ভেবেছিনু আর　　　গাঁথিবনা ফুল,
　　থাকিবে অমনি ঢালা,
এবে গুটাইয়া,　　　আরও সুযতনে
　　গাঁথিয়া রাখিব মালা;
যবে শচী ল'য়ে　　　ফিরিবেন পতি
　　পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে　　　মনের আহ্লাদে
　　মুছায়ে চক্ষুর জলে॥
পতির মালিন্য　　　নারী না ঢাকিলে,
　　কে ঢাকিবে তবে আর,"

তখন রতি যে কয়টি কথা বলিতেছে, তাহা মর্ম্ম বিদারক,

এ দুঃখ তাহার　　　করিবে মোচন,
　　দিয়া তারে পুষ্প-হার?
ফুলের রজ্জুতে　　　করিলে বন্ধন
　　বেদনা নাহি কি তার?
আর কেন চাও　　　ফুটাতে অঙ্কুর
　　চরণে দলিয়া আগে!
দানব-নন্দিনি,　　　জান না সে তুমি,
　　দুঃখীরে পুজিলে লাগে!
মৃগেন্দ্রী আসিছে　　　আপন আলয়ে
　　শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায়!
রতির কপালে　　　এও সে ঘটিল,
　　দেখিতে হইল হায়!"

এই বলিয়া রতি কাঁদিতে২ গেল। ইন্দুবালাও কাঁদিতে লাগিল,

পড়ে বিন্দু বিন্দু　　　কুসুমের স্রজে,
　　ইন্দুবালা গাঁথে ফুল;
ভাবিয়া পতিরে,　　　ভাবি যুদ্ধভয়,
　　চিন্তাতে হৈয়ে আকুল॥
কুরঙ্গী যেমন　　　শুনিয়া গহনে
　　মৃগয়ীর দূররব,
চকিত চঞ্চল,　　　প্রতি পলে পলে
　　মৃত্যু করে অনুভব;
সেইরূপ ভয়ে　　　চমকি চমকি
　　গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে,　　　ইন্দুবালা রামা
　　রুদ্রপীড় ভাবনায়॥

নবম সর্গ বীররসপ্রধান। বাত্যা-মথিত সাগরবৎ এই সর্গ, অবিশ্রান্ত ভীম গর্জ্জন করিতেছে। নৈমিষে জয়ন্ত সঙ্গে শচী কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে রুদ্রপীড় আসিল,

হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি- আতঙ্ক;
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

কিঞ্চিৎ কাল প্রাচীন প্রথানুসারে বাক্‌-যুদ্ধের পর, রুদ্রপীড় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কোন্‌ যোদ্ধার সঙ্গে জয়ন্ত

যুদ্ধে ইচ্ছুক। তখন জয়ন্ত শত অসুরকে এক কালীন যুদ্ধে অহ্বান করিলেন। হেম বাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায়, কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি। জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার যুদ্ধবর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
দ্রুঘণ, মূষল, শল্য,
প্রক্ষ্বেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী-শার্দ্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী-উপর॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল!
অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল॥

ধরাতল টল টল,
নদীকূল কল কল
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ
কিম্বা ক্ষিপ্তগ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসী॥
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস॥
কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা;

নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব॥
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।

* *

তখন সূর্য্যাস্ত দেখিয়া এবং নবতি যোদ্ধা হত দেখিয়া রুদ্রপীড়, বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। উভয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রে শচী ও চপলা বিশ্রামশীল জয়ন্তকে দেখিয়া যে কথোপকথন করিলেন, তাহা অতি সুমধুর। প্রভাতে জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ কামনা করিলেন। শচী অন্তরে অমঙ্গল সূচনা দেখিয়া, জয়ন্তকে অন্যদেবের স্মরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বীরধর্ম্মাশ্রিত জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না,একাই যুদ্ধে গেলেন। এইসকল বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত কথিত হইয়াছে।

অর্দ্ধ দিবা যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচ জন দানব বধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রুদ্রপীড় তাঁহাকে ঘোরতর আঘাত করিল।

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিজুলি হার
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন!
বিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্র-রশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন!
শিরীষ-কুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্ত মিশায় যেমন!

শচী আসিয়া পুত্রদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তরমূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন।

দেখিয়া, রুদ্রপীড়, শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কিন্তু নিকন্ধর নামে এক পামর অনুচর সঙ্গে ছিল; শচীহরণজন্য তাহাকে অনুমতি করিলেন। নিকন্ধর শচীর কেশ ধরিয়া তুলিল—

হায় মতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর!

দৈত্যগণ, স্তম্ভিতা শচীকে কেশে ধরিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল। স্বর্গদ্বারে শংখধ্বনি শুনিয়া, শচীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন শচী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে

লাগিলেন; সেই রোদন মর্ম্মভেদী তূর্য্য-ধ্বনিবৎ। শুনিয়া ত্রিলোকের জীব কাঁদিল। এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়া দেখিলেন দেবগণ সমরে পরাভূত হইয়াছেন;

রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

সর্গ শেষে একটি চমৎকার ছত্র আছে। শচী দেহ, অসুর, বৃত্রসভাতলে আনিল। দেখিয়া, দৈত্যপতি,

চমকি সম্ভ্রমে উঠি যেন দাঁড়াইল।

দশম সর্গারম্ভে ইন্দ্র কৈলাস পুরে যাইতেছেন। আমরা কৈলাসযাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিব—পাঠকেরা, তজ্জন্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, এমন বিশ্বাস আছে।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতি-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্যচারিধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করিয়া গগন।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো উর্দ্ধ শূন্যদেশে, অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু বেষ্টিয়া ভাস্করে।

সে সকলে রাখি দূরে কান্তি মনোহর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া অরুণে,
সপ্ত কলানিধি সঙ্গে গ্রহ শনৈশ্চর!

দেখিলা সে কত শশী, কত গ্রহ হেন,
ব্যোমমার্গে ভ্রমে সদা ফুটিয়া ফুটিয়া,
উজ্জ্বল কিরণ মালা জড়ায়ে অঙ্গেতে,
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে শূন্য করি আনন্দিত।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
উর্দ্ধ উর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি
সুদূর নক্ষত্রতুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
নিম্নদেশে ছাড়ি চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর।

অদৃশ্য হইল শেষে—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণ-শূন্য প্রশস্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে অন্তরীক্ষ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে, পূরি চতুর্দ্দিক,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তি ছায়ার আকারে।
বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিদ্যমান সে গগনে দেখিলা বাসব—

ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত-শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অষ্ট, প্রশান্ত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি!

তথা শঙ্কর এবং উমা, অতি গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের জল্পনায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এমত সময়ে ইন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া, পার্ব্বতী তাঁহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ইন্দ্রও সকল কথা বলিলেন। এমত সময়ে সহসা শিবের জটা কম্পিত হইল; ইন্দ্রের হস্ত হইতে কার্ম্মুক স্খলিত হইল; গৌরীর চক্ষুহইতে অশ্রুবিন্দু পড়িল। শচীর ক্রন্দন কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শুনিয়া ইন্দ্র দ্রুতবেগে স্বর্গাভিমুখে ছুটিতে ছিলেন। শিব, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া, শঙ্করকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সেই মহাতেজোময় দৃপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। মহাদেবও তখন বৃত্রের অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া, সহসা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পার্ব্বতী ঈশানকে শান্ত করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে দধীচির আলয়ে যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে বজ্রসৃষ্টি হইবে।

একাদশ সর্গের আরম্ভে স্বর্গপুরে দৈত্যজয়োৎসব। শচীকে দেখিতে দৈত্যপুরবধূ ছুটিতেছে—তদ্বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকের কালিদাস কৃত, বর দেখিতে নাগরীদিগের গমন বর্ণনা স্মরণ হইবে।

এদিগে বৃত্র, বৃত্রপুত্র একত্র মিলিত হইলে উভয়ে আপনাপন যুদ্ধ সম্বাদ কহিতে লাগিলেন—বৃত্র সগর্ব্বে, রুদ্রপীড় বিনীতভাবে। তৎপরে ঐন্দ্রিলা শচীর আনয়ন সম্বাদে প্রীত হইয়া পুত্রকে তাহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর রূপের অনেক প্রশংসা করিলেন। পুত্রমুখে শচীর রূপের কীর্ত্তন শুনিয়া ঐন্দ্রিলার আর সহ্য হইল না। তিনি স্বামীকে আদেশ করিলেন যে তখনই শচীকে আনাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হউক।

"অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"

কৈলাসে পার্ব্বতী এই কথা শুনিয়া মহাদেবকে জানাইলেন। তখন মহাকালের ক্রোধাগ্নি জলিয়া উঠিল। তৎফলে—

সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধুনিত;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয়;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে;

টল্‌মল টল্‌মল ত্রিদশ আলয়;
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়;
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরুশিখর
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর!
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ;
রুদ্রপীড় অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল.
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল॥

এই খানে অদৃষ্টের বিষময় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্য যে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেম বাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি।

খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যের উপাখ্যান ভাগ, নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র, এবং কাব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কাব্যের বিশেষ২ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমরা আর কিছুই করি নাই। আমরা যে পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তুলিতে সক্ষম হইতাম না; গ্রন্থকার যে অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

গ্রন্থকারের ছন্দঃসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এবিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে২ ছন্দঃ পরিবর্ত্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেম বাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃসম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেম বাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেশী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, "কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যে রূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।" কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্যের তাদৃশ ঔৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। আধু-

নিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেম বাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার কাব্য যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতেনিমজ্জতীত্যাদি। আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি, এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে হেম বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

খাদ্য।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

আমরা দেখাইয়াছি যে নিশ্বাসগত শোণিতসঞ্চারী অম্লজান, শোণিতমধ্যে মেদ না পাইলে শরীর ভাঙ্গিয়া শারীরিক সামগ্রী নষ্ট করে। কিন্তু মেদ ব্যতীত অন্য এক সামগ্রী আছে, যে শোণিত মধ্যে তাহা পাইলে, অম্লজান তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়; তত মেদের প্রয়োজন করে না।

ময়দা ধৌত করিলে যে অংশে গ্লুটেন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ময়দা ধুইলে যে জল দুগ্ধের ন্যায় গড়াইয়া যায়, তাহাতে ময়দার যে অংশ আছে, তাহাকে ইংরেজিতে স্টার্চ বলে। ঐ স্টার্চের নির্ম্মাণ জলজান, অম্লজান, ও অঙ্গারজানে হইয়া থাকে; জলজানে ও অম্লজানে জল হয়, অতএব জলে ও অঙ্গারজানে স্টার্চের নির্ম্মাণ বলা যাইতে পারে। তাহার সঙ্গে শোণিতস্থ অম্লজানের সংযোগে এই হয় যে অম্লজানে ও অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্লের উৎপত্তি হয়; এবং জল পৃথক্ হইয়া যায়। ঐ জল ও আঙ্গারিক অম্ল নিশ্বাসাদির দ্বারা বিনির্গত হয়।

স্টার্চের যে রূপ নির্ম্মাণ, শর্করারও সেইরূপ; বস্তুতঃ স্টার্চ্চ মুখ মধ্যে লালা সংযোগে শর্করায় পরিণত হয়, এবং শর্করা রূপেই শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করে। এবং শোণিতমধ্যে শর্করা থাকিলে, অম্লজানের সংযোগে সেইরূপ জল ও আঙ্গারিক অম্লের উৎপত্তি হয়।

অতএব খাদ্যের মধ্যে স্টার্চ্চ শর্করা বা মেদ থাকা প্রয়োজন; কেন না তদ্দ্বারা নিশ্বাসাগত অম্লজানকর্ত্তৃক শরীর ধ্বংস নিবারণ হয়। কিন্তু স্টার্চ্চ বা

শর্করা শরীর গঠনে লাগে না, অতএব উহার আতিশয্য নিষ্প্রয়োজনীয়। উহা গৃহীত হইয়া কর্ম্ম সমাধান্তে পরিত্যক্ত হয়। শরীর গঠনে মেদের প্রয়োজন, উহা যে সর্ব্বত্র শারীরিক সামগ্রী, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, মাংসাদির রক্ষাজন্য, গ্লুটেনযুক্ত খাদ্য, এবং শরীরের অন্যান্য অংশের প্রয়োজনানুসারে ধাতব লবণাদি অন্যান্য সামগ্রী চাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন খাদ্যে কি আছে। আমাদিগের প্রধান খাদ্য চাউল। চাউলে স্টার্চ অত্যন্ত অধিক আছে, কিন্তু গ্লুটেন অতি অল্প। যদি খাদ্যের সামগ্রী বিশেষকে পুষ্টিকর বলিতে হয়, তবে যাহাতে অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে, তাহাকেই পুষ্টিকর বলিতে হয়, কেন না গ্লুটেনেই মাংস গঠিত হয়, এবং মাংসেই বল। এবং দেখান গিয়াছে যে জল ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রীর অপেক্ষা শরীরগঠন পক্ষে অধিক গ্লুটেনের প্রয়োজন। অতএব গ্লুটেনের অল্পতাহেতু চাউলকে পুষ্টিকর খাদ্য বলাযায় না।

যেমন চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য, আয়র্লণ্ডে আলুত দ্রূপ। আলু ও চাউলের ন্যায় অল্প গ্লুটেন সংযুক্ত। চাউলে গ্লুটেন সাতভাগ মাত্র, গোল আলুতে ৮ কি ৯ ভাগ মাত্র।

অনেক কাফ্রি জাতির কদলীই প্রধান খাদ্য। কদলী চাউল ও গোল আলুর অপেক্ষাও অসার। উহাতে গ্লুটেন শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক নহে। (এই জন্য কি কলা খাওয়া একটা গালাগালি?)

এই তিন সামগ্রীতে স্টার্চ বা শর্করা প্রচুর পরিমাণে আছে, অতএব তাহাতে নিশ্বাসের দ্বারা শরীরের যে ধ্বংস তাহা উত্তরূপে নিবারিত হয়। কিন্তু মাংসাদির যে ভাগ শ্রমজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার পুনর্গঠন জন্য যে পরিমাণে গ্লুটেন প্রয়োজন, তাহা অনেক চাউল বা অনেক আলু বা অনেক কদলী না খাইলে পাওয়া যায় না। কোন২ লেখক বলেন যে চাউলের অসারতা হেতু হিন্দু প্রভৃতি তণ্ডুল ভোজী জাতি অধিক পরিমাণে ভাত খায়, এজন্য তাহাদিগের উদরে অধিক আহারের স্থান আবশ্যক বলিয়া ক্রমে তাহারা স্থূলোদর হইয়া পড়ে। একথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না।

অনেক জাতির প্রধান খাদ্য গম। ভারতবর্ষের যে সকল জাতি বলিষ্ঠ, তাহারা গম খাইয়া থাকে। ময়দায় চাউলের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে। উত্তম ময়দায় শতভাগে—

জল	১৬ ভাগ
গ্লুটেন	১০ ,,
মেদ	২ ,,
স্টার্চ প্রভৃতি	৭২ ,,

অতএব চাউল অপেক্ষা গোধূম যে সারবান্ খাদ্য তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

মাংস আরও পুষ্টিকারক। কোন মাংসে —হিন্দুয়ানি রক্ষার্থ আমরা তাহার নাম করিবনা—শতভাগে—

জল ও রক্ত	৭৮
মাংসিক বা গ্লুটেন	১৯
মেদ	৩
স্টার্চ প্রভৃতি	'০
	১০০

কিন্তু যে সকল পশু গৃহপালিত, এবং যাহা সচরাচর ভুক্ত হয়, তাহাতে মেদের পরিমাণ আরও অধিক।

যদি জল বাদ দেওয়া যায় তবে অবশিষ্ট ভাগকে শত ভাগ করিলে, গৃহপালিত মেষাদির মাংসে পাওয়া যায়—

মাংসিক	৬৩	ভাগ
মেদ	৩০	,,
রক্ত এবং ধাতব লবণ	৭	,,
	১০০	

মাংসে যেমন অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে, তেমন একেবারে স্টার্চ নাই। অতএব কেবল মাংসাহারে শরীর রক্ষা হইতে পারে না। তবে অধিক পরিমাণে মেদ থাকাতে, স্টার্চের কার্য্য তদ্দ্বারা কতক সিদ্ধ হয়। পালিত মেষাদির ন্যায় কুক্কুটে সচরাচর, অধিক মেদ থাকে না। হরিণ মাংসে অল্প মেদ, শূকরে অধিক। মৎস্যও মাংস বিশেষ। পশু মাংসাপেক্ষা তাহাতে মেদ অল্প; সুতরাং মাংসিক অধিক। আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস যে পশু মাংসই পুষ্টিকর মৎস্যের কোন গুণ নাই, কিন্তু একথার কোন বিশেষ প্রমাণ আমরা দেখি নাই।*

আমরা যতগুলি দ্রব্যের কথা বলিয়াছি, তাহার একটি সামগ্রী এমত নহে, যে কেবল সেই সামগ্রী মাত্র আহার করিয়া মনুষ্য অধিক কাল স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে। সকল গুলিতে কোন না কোন দ্রব্যের অল্পতা আছে। গোধূমাদিতে গ্লুটেনের অল্পতা, এবং মাংসে স্টার্চের বা মেদের অল্পতা। কেবল দুগ্ধই মনুষ্য খাদ্যের মধ্যে একা জীবন রক্ষায় সমর্থ। ইহাতে গ্লুটেন এবং শর্করা এবং মেদ তিনই আবশ্যকীয় পরিমাণে আছে। দুগ্ধে "কেসিন" নামে একটি সামগ্রী আছে, তাহাই গ্লুটেনের স্থানীয়। কাঁচা গোরুর দুগ্ধে শত ভাগে—

জল	৮৭
কেসীন	৪॥০
মেদ বা নবনীত	৩
শর্করা	৪৸০
ধাতব	৸০
	১০০

কাঁচা দুধ কেহ খায় না। জ্বাল দিলে জল কমিয়া যায়, সুতরাং কেসীনাদির অপেক্ষাকৃত আধিক্য হয়। শুষ্ক ক্ষীরের শত ভাগে—

* কেহ কেহ বলেন যে মৎস্য অপত্যবর্দ্ধক। এই জন্য কি বঙ্গদেশে এত লোক?

কেসীন	৩৪৮৴০
নবনীত (মেদ)	২৩৮৴০
শর্করা	৩৭
ধাতব	৪॥০
	১০০

মনুষ্যদুগ্ধ, প্রায় গোদুগ্ধের ন্যায়—

জল	৮৯
কেসীন	৪
নবনীত	২॥৵০
শর্করা	৪।৵০
ধাতব লবণ	৵০

কেসীন বা পুষ্টিকর সামগ্রী মনুষ্য দুগ্ধাপেক্ষা গোদুগ্ধে অধিক; গোদুগ্ধাপেক্ষা ছাগদুগ্ধে অধিক। এই জন্য মনুষ্য শিশু সূতিকাগারে জল মিশাইয়া না খাইলে গোদুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারে না। এবং এই জন্য ছাগদুগ্ধ দৌর্ব্বল্যের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বহুকাল ধরিয়া দুইটি সম্প্রদায়ে মনুষ্যখাদ্য লইয়া বিবাদ করিতেছেন। এক সম্প্রদায় বলেন যে মাংসই পুষ্টিকর, অতএব মনুষ্যের মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। আর এক সম্প্রদায় বলেন, যে উদ্ভিদ্ পদার্থ, ফল মূল শস্য, মাংসাপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর, অতএব মাংস খাইবার প্রয়োজন নাই, উদ্ভিদ্ই মনুষ্যের খাদ্য। কতকগুলি ভ্রান্তি নিবন্ধনই এরূপ বিবাদ উত্থাপিত হওয়া সম্ভবে। আসল কথা এই যে অনেক উদ্ভিজ্জাতীয় খাদ্য মাংসাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু তাই বলিয়া যে উদ্ভিদ্ মাত্রই মাংসাপেক্ষা নিকৃষ্ট এমত নহে। অনেক গুলি যে মাংসের তুল্য, এবং কেহ২ মাংসাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব মাংস ব্যতীত শরীর প্রতিপোষণ অসম্ভব নহে; কিন্তু অসম্ভব নহে বলিয়াও মাংস অখাদ্য নহে।

মটর, সীম, মসুরী, ছোলা, মাসকলাই, অড়হর প্রভৃতি দাল, মাংসের ন্যায় বা মাংসাপেক্ষা পুষ্টিকর। এই সকলে শতকরা ২০ হইতে ২৪ ভাগ গ্লুটেন পাওয়া যায়। মেদ দুই ভাগ মাত্র। কথিত আছে যে একসের শুষ্ক ছোলায় যত প্রাণরক্ষক ও পুষ্টিকর সামগ্রী আছে, অন্য কোন প্রকার মনুষ্যখাদ্যের একসেরে তত পাওয়া যায় না। বাঁধা কপির ন্যায় অধিক পরিমাণে গ্লুটেন কোন খাদ্যেই নাই। ইহার শত ভাগে ৩৫ ভাগ গ্লুটেন। পিয়াঁজও অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পুষ্টিকারিতায় ইহা ছোলার তুল্য—ইহার শত ভাগের মধ্যে ২৫, ৩০ ভাগ গ্লুটেন।

যাহাতে অধিক গ্লুটেন আছে তাহাই আমরা পুষ্টিকারক বলিয়াছি, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে কেবল গ্লুটেন সংগ্রহ মাত্র, আহারের উদ্দেশ্য নহে। স্টার্চ, মেদ, ধাতবাদি সকলই আহার্য্য মধ্যে যথা পরিমাণে থাকা আবশ্যক। যাহাতে অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, অথচ গ্লুটেন অধিক থাকে, তাহাই ভাল, এবং তাহাকেই আমরা পুষ্টিকর বলিয়াছি। গ্লুটেনের আধিক্যও অনিষ্ট

কারক। যে সকল সামগ্রীতে গ্লুটেন অধিক, তাহা প্রায় মলবদ্ধ করে; এবং মেদসাহায্যব্যতীত সুজীর্ণ হয় না। এজন্য তাহা ঘৃতাদি মেদযুক্ত সামগ্রীর সহিত পাক করিয়া খাইতে হয়। বস্তুতঃ পাকের রীতি, এবং নানাবিধ সামগ্রী একত্রিত করিয়া আহার করার রীতি, মনুষ্যের পরমোপকারী। এক খাদ্যে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু নানাগুণবিশিষ্ট নানাজাতীয় আহার্য্য একত্রে আহার করায় সে অভাবের মোচন হয়। গোধূমে মেদ অল্প, এজন্য আমরা ময়দা ঘৃতে ভাজিয়া লুচি করিয়া, অথবা রোটি করিয়া, তাহাতে ঘৃত মাখিয়া খাই। ইউরোপীয়েরাও রোটিতে মাখন দিয়া খায়। এই জন্য ছোলা, অড়হরাদির দাল, এবং মৎস্যাদি, যাহাতে অল্প মেদ, তাহাতে তৈল বা ঘৃত দিয়া না রাঁধিলে জীর্ণ হয় না।

অনেকেই এই কথা বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও কখন২ বলিয়াছি, যে তণ্ডুলভোজী বাঙ্গালির আহার অত্যন্ত অসার। বাঙ্গালি গোধূম এবং মাংস খায় না বলিয়াই বাঙ্গালির বলহীনতা এবং অস্বাস্থ্য, ইহা অনেকের বিশ্বাস। তণ্ডুল অসার বটে, কিন্তু বাঙ্গালি কেবল ভাত খায় না। ভাতের সঙ্গে, মৎস্য, দাল, সীম, কপি, প্রভৃতি শাক এবং ঘৃত ও দুগ্ধ খাইয়া থাকে। মৎস্য, দাল, এবং অনেক তরকারিতে বরং মাংসাপেক্ষাও অধিক পরিমাণে গ্লুটেন আছে। সুতরাং মাংসভোজনের যে ফল তাহা তদ্ভোজনে অবশ্যই ঘটে। দুগ্ধও পুষ্টিকর খাদ্য। ঘৃত ও দুগ্ধ হইতে সমুচিত পরিমাণে মেদ পাই—বরং তাহার কিছু আতিশয্যই ঘটিয়া থাকে। অতএব বাঙ্গালির আহার যে অসার, এবং মাংসাহার না করাতেই যে আমাদের এ দশা, একথা সত্য নহে। তবে ইহা সত্য বটে, যে এইরূপ মিশ্রিত আহার সম্পন্ন ব্যক্তিরাই করিয়া থাকেন। কৃষকাদি দরিদ্র শ্রমজীবীরা কেবল দাল ভাত খায়। কিন্তু দাল যদি যথেষ্ট পরিমাণে খায়, তাহা হইলেই গ্লুটেনের অভাব মোচন হইল। যাহাদের কপালে তাহাও ঘটে না—যাহারা কেবল লুণ ভাত খায়, তাহাদিগের আহার অস্বাস্থ্যকর বটে। এমন লোকও বঙ্গদেশে অনেক আছে—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

এইরূপে সকল জাতিই নানাবিধ আহার্য্য মিশাইয়া, একের দ্বারা অন্যের দোষ খণ্ডন করিয়া খায়। আয়র্লণ্ডীয়েরা গোল আলুর উপর নির্ভর করে, কিন্তু চাউলের ন্যায় গোল আলুতেও গ্লুটেন অল্প। তাহারা সেজন্য গোল আলুর সঙ্গে কপি মিশায়। কপিতে অনেক গ্লুটেন আছে, তাহা বলা হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, যে শরীরের অধিকাংশ জল। নিশ্বাসাদিতে নির্গত হয়,—জল। এজন্য শরীর মধ্যে জলের বিশেষ প্রয়োজন। আমরাও সর্ব্বদা জলপান করিয়া থাকি, এবং অন্যান্য

আহার্য্যের সঙ্গেও জল পাই। কিন্তু জলের আরও প্রয়োজন আছে। শুষ্ক পদার্থ আমরা জীর্ণ করিতে পারি না; উদরমধ্যে যাহা কঠিন থাকে তাহা শরীরে গৃহীত হয় না। আমরা যাহা খাই, তাহাই জলযুক্ত; দুগ্ধাদি এবং অধিকাংশ ফলমূলের স্বাভাবিকাবস্থাতেই অনেক জল থাকে; যাহাতে না থাকে, তাহা আমরা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লই, বা জল মাখিয়া তরল করিয়া লই।

যেমন জল, গ্লুটেন, মেদ ও ষ্টার্চের প্রয়োজন, খাদ্যমধ্যে তদ্রূপ আরও কতকগুলি সামগ্রীর অল্পপরিমাণে প্রয়োজন আছে। উদাহরণ স্বরূপ লবণের কথা উল্লেখ করিব।

যে কেহ রক্তের স্বাদ জানে, সেই জানে যে রক্ত লবণাক্ত। বস্তুতঃ শোণিতে লবণ আছে। রক্তের পক্ষে ঐ লবণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন লবণে সোডা আছে। সোডা পিত্তে আছে। পিত্ত জীরণ কার্য্যে নিতান্ত আবশ্যক। লবণ প্রত্যহ অজ্ঞাত ঘর্ম্মে এবং প্রস্রাবে মুহুর্মুহু নির্গত হইয়া যাইতেছে। তাহার পুনঃসঞ্চার সেই জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য সলবণ খাদ্য খাইতে হয়। উপকথায় পড়া যায় যে বন্যজাতীয়েরা লবণ খাইতে জানে না, বাস্তবিক সে কথা প্রকৃত নহে। লবণ ব্যতীত মনুষ্যের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। এবং মনুষ্যকে কিছু কাল লবণ খাইতে না দিলে পীড়িত হইয়া মরিয়া যায়। এমনও কথিত আছে, যে ইউরোপে পূর্ব্বকালে লবণশূন্য খাদ্য খাওয়াইয়া বধ রূপ একটি ভয়ঙ্কর দণ্ড প্রচলিত ছিল। যে ব্যক্তির প্রতি এই দণ্ড ব্যবহৃত হইত, তাহার শরীর গলিত হইয়া কীটে সমাচ্ছন্ন হইত—এইরূপে সে প্রাণত্যাগ করিত। পশুদিগকে লবণপ্রিয় দেখা যায়। পশুগণ লবণাম্বু পান করিতে গিয়া থাকে—অথবা লবণোৎপাদক ভূমি লেহন করে। পালিত পশুদিগকে লবণ দিলে সহর্ষে আহার করে। ঘোড়ার দানাতেও লবণ মিশাইয়া দিতে হয়।

আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে জল যত নির্ম্মল হইবে, ততই শরীরের পক্ষে উপকারী, কথাটি সকল সময়ে সত্য নহে। ধাতব নির্ঝরিণীর জল গৈরিক মিশ্রিত; এজন্য সে সকল জল ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহার শোণিতে লৌহের অভাব আছে, লৌহমিশ্রিত নির্ঝরিণীর জলে তাহার পীড়ার শান্তি হইবে। চা খড়ি প্রভৃতি চূণসংযুক্ত স্তর হইতে যে সকল জল আইসে, তাহা পান করিলে উদরে যে চূণ যায়, তাহাতে অম্লের দমন হয়। যাহার সে জল পান করা অভ্যাস, সে যদি সহসা স্বাস্থ্য বাতিকগ্রস্ত হইয়া সে জল ছাঁকিয়া খাইতে আরম্ভ করে, তবে তাহার অজীর্ণ এবং অম্লরোগের সম্ভাবনা। আয়র্লণ্ডের ভূমিতলে চূণক প্রস্তরের স্তর আছে বলিয়া তথাকার জলে এইরূপ চূণ থাকে। গোল আলুতে চূণ নাই; এজন্য আয়র্ল-

ণ্ডের খাদ্য পেয়মধ্যে সুসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। গোধূমে চূণ আছে; গোধূম যদি আয়র্ল-ণ্ডের সাধারণের খাদ্য হইত, তাহা হইলে চূণের আধিক্য পীড়াকর হইত। এইরূপ অনেক সময়ে জনসমাজের খাদ্য অন্যান্য বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও দেশোপ-যোগী হইয়া থাকে।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে সম্প্রতি ওয়েষ্টমিনিষ্টর রিবিউতে "মনুষ্যের সর্ব্বো-ৎকৃষ্ট খাদ্য" ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপ্রবন্ধ লেখ-কের মতে, উদ্ভিদ্‌ই উৎকৃষ্ট খাদ্য, এবং তাহা মাংসাপেক্ষা পুষ্টিকর। প্রবন্ধটি ভ্রান্তিপরিপূর্ণ, এবং এ প্রদেশে কেহ কেহ সেই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ইচ্ছা ছিল, যে তাহার প্রতিবাদ করি। কিন্তু স্থানাভাবে এবার কিছু বলা হইল না। অবকাশ হয় ত বারান্তরে বলিব।

পূর্ব্বরাগ।

১

বঁধুরে হেরিব বলে যমুনা পুলিনে লো
নিতি নিতি কত আসি যাই।
মত্ত বারণ সম, হিয়ে মুঝ মাতল,
অবিরল হেরিতে কানাই॥
নটবর নাগর, রূপ গুণ সাগর,
জারল বিরহ হুতাসে।
করলহি পাগর, রজনী উজাগর,
ডাগর প্রেম পিয়াসে॥

২

সজনি লো আজু এ ঘোর পরমাদ।
অমূল সে নিধি হম, যতনে ন পায়লু
দারুণ বিধিসে বিবাদ॥
দরশ পাই নিতি, সরস পরশ সুখ,
ভরসে হৃদয় ভেল ভোর।
মরমে মরম কথা, কহই না পারই,
রমণী পরাণ কঠোর॥

৩

সই লো পীরিতি সে বিষম বেয়াধি।
যে জন আছিল পর, সেই সে আপন ভেল,
আপন অব ভেল বাদী॥
সহচরী গণ মেলি, করত রভস কেলি,
বাওত গাওত তানে।
নাহি শুনি নাহি হেরি, আপন পাশরি,
শ্যামর বাঁশরী গানে॥

৪

সই লো কত সহে পাপ পরাণ।
পিককুল কলরব, প্রেম মহা মহোৎসব,
মধুপ করত মধু পান॥
মৃদুল পবন বহে, বিরহিহৃদয় দহে,
চকোর চুম্বিত শশী হাসে।
নিকুঞ্জে কুসুম ভাতি, পারিজাত যুতি জাতি,
কুমুদিনী সরসে উল্লাসে॥
সখিরে, যামুন তীরে শ্যাম বিলাসে।

রজ।

রজনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমর নাথ মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন—যেন আমি তাঁহার পরম সুহৃদ্—যেন কাহারও মনে কোন মালিন্য নাই—কোন দিকে কোন গোলযোগের কথা উপস্থিত হয় নাই। আমিও সেইরূপ করিতে লাগিলাম। আপনারা কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন, যে আমি অমর নাথের সঙ্গে বিবাদ বচসা করিতে বা তাহাকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, তবে আপনারা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিবাদ বচসা করিলে কোন্ উপকার হইবে? আর অনুরোধেই বা কে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে? আমার সে সকল অভিপ্রায় ছিল না। যে অভিপ্রায়ে এত সন্ধান করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা গোপন করিয়া, আমিও মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি ধূর্ত্তের সঙ্গে কার্য্য, ইহা স্মরণ রাখিলাম। কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার সিদ্ধ হইল না।

কথোপকথন মধ্যে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া আমি বলিলাম,

"আপনার সঙ্গে কথোপকথনে বড়ই প্রীতি পাই। এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে চলিল—ভরসা করি, তাহাতে সম্প্রীতির স্থানে বৈরিতা উপস্থিত হইবে না।"

আমার বোধ ছিল, অমরনাথ, মিষ্টভাষী শঠের মত মধুমাখা মিথ্যা কথায় উত্তর দিবেন। কিন্তু অমরনাথ তাহা না করিয়া স্পষ্ট কথাই বলিলেন—যাহা বলিলেন, তাহা সত্যবাদী, বুদ্ধিমান্, উদারচরিতের কথা। বলিলেন,

"কি প্রকারে সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবনা? আপনাদিগের অবশ্য এরূপ ধারণা আছে যে আমি একটা মিথ্যা কাণ্ড উপস্থিত করিয়া আপনাদিগের সম্পত্তি অপহরণ করিতেছি; এ ধারণা না থাকিলে মোকদ্দমার প্রয়োজন হইবে কেন? যদি আপনার এরূপ বিশ্বাস থাকে, তবে আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন কি প্রকারে? আর আমি যদি বিবেচনা করি, যে আপনারা আমার যথার্থ প্রাপ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া অনর্থক আদালতে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তবে আমিই বা আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমান্ হইব কি প্রকারে?"

আমি বলিলাম, "যে দিন আমার মনে বিশ্বাস হইবে, যে রজনীর সম্পত্তি আমরা ভোগ করিতেছি সেই দিন আমি সে সম্পত্তি পরিত্যাগ করিব।"

অমর। তবে আপনার সে বিশ্বাস এখনও হয় নাই?

আমি। কিসে হইবে?

অমর। আমাদিগের যে প্রমাণাদি

আছে, তাহা বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে দেখিয়া থাকিবেন।

আমি। প্রমাণের একটি ইয়াদদাস্ত দেখিয়াছি; দলিলগুলি দেখি নাই।

অমর। দলিল গুলি আমার কাছে আছে। যদি আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই; মোকদ্দামার দায় হইতে উদ্ধার পাই, তবে যত্ন করিয়া আপনাকে দলিল গুলি দেখাইতে হইতেছে। এখন দেখিবেন কি?

এরূপ সরল ব্যবহার আমি অমরনাথের নিকট প্রত্যাশা করি নাই। বলিলাম, "অবশ্য দেখিব।"

অমরনাথ একটি বাক্স আনিয়া, তাহা হইতে দলিলের তাড়া বাহির করিলেন। তাড়া খুলিতে২ বলিলেন,

"বোধ হয় যে, হরেকৃষ্ণ দাসের যদি কন্যা বর্ত্তমান থাকে, তবে সে যে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারিণী, তদ্বিষয়ে আপনার সংশয় নাই?"

আমি বলিলাম, "আইন অনুসারে সে উত্তরাধিকারিণী কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না, কেন না আমি আইনজ্ঞ নহি। কিন্তু আইন অনুসারে হউক, বা না হউক, আমার নিকট ধর্ম্মতঃ সে আমার পিতামহের বিষয় পাইতে পারে বটে।"

অমরনাথ, সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যে "এরূপ ভদ্র লোকের সহিত আমাকে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার?"

এই বলিয়া অমরনাথ একটি "জাবেতা নকল" আমার হাতে দিলেন। সেই নকল, একটি সাক্ষের জোবানবন্দীর।

আমি পড়িয়া দেখিলাম, যে জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালাচুরির মোকদ্দামায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে, পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহরদাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মনোহরদাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না?"

আমি। বোধ হইতেছে।

অমর। যদি সংশয় থাকে তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, অমরনাথ বলিলেন, "দেখুন কতদিনের জোবানবন্দী?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশবৎসরের।

অমরনাথ বলিলেন, "ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয়?"

আমি। উনিশবৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

অমর। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন?

আমি। প্রায় কুড়ি।

অমর। পড়িয়া যাউন; হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম, যে একস্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোনার বালা দিলে কি প্রকারে?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরিব কিন্তু আমার ভাই মনোহরদাস দশটাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোনার গহনা গুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কারাদি দিয়াছে?"

উত্তর—না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার খরচ দেয়?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোনার গহনা দিবার কারণ কি?

উত্তর—আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ। সেজন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া, আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয় এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনা গুলি দিয়াছিলেন।

জন্মান্ধ! তবে যে সে এই রজনী তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

অমরনাথ বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম, যে উহাও ঐ কথিত বালাচুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। এই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্রদাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

অমরনাথ বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্রদাস সেই রাজচন্দ্রদাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

অমরনাথ আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন; সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়া, অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব!

অমরনাথকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। আপনি নালিশ করিবেন না। বিষয় রজনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র। আর একটি ভিক্ষা আছে।"

অমরনাথ বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।" আমি বলিলাম, "আমাদিগের হিন্দু সমাজের এমত রীতি নহে যে ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তবে রজনীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধে সেরূপ নহে। রজনীকে আমাদিগের পরিবারস্থা বলিলেও হয়। অতএব আমি যদি তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহি, তবে আপনি বিস্মিত হইবেন না।"

"কিছু মাত্র না—বরং এখনই সাক্ষাৎ করুন," এই বলিয়া অমর নাথ আমাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এবং রজনীকে আমার কাছে ডাকিয়া দিয়া বিশ্বাস বা ভদ্রতা দেখাইবার জন্য স্বয়ং কক্ষান্তরে গেলেন।

আমি রজনীর কাছে বিষয় ভিক্ষা লইতে আসি নাই—তাহার অপেক্ষা দারিদ্র্য বা অনশনে মৃত্যুও ভাল। কিন্তু রজনী কি বলে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল ছিল। রজনী আমার বিমাতার কাছে অনেক বিষয়ে উপকৃতা। ইতর লোকে অসময়ের উপকার সময়ে মনে রাখে না। কিন্তু আমার স্থির বিবেচনা ছিল, রজনীর স্বভাব সেরূপ ইতর নহে। তজ্জন্য রজনী যদি বিষয় লইতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিব, যে কুণ্ঠিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আরও ইচ্ছা ছিল, কেনই বা সে পলাইয়াছিল, অমর নাথের সঙ্গে কি প্রকারেই বা বিবাহ ঘটিল, যদি জানিতে পারি, তাহাও জানিব। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হই নাই, যে এসকল কথা এসময়ে এ স্থানে জিজ্ঞাসা করা অকর্ত্তব্য। শেষ কথা, আর একটি পরীক্ষা—কিন্তু সেটি মনে স্থান দিতে পারিলাম না—কেন না এখন রজনীর বিবাহ হইয়াছে। যাহা হউক নিতান্ত কৌতূহলপরায়ণ হইয়াই আমি রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম।

রজনী আসিয়া কিছু বলিল না,—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম,

"আমি শচীন্দ্র। একটা কথার জন্য আসিয়াছি।"

রজনী মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

আমি বলিলাম, "তুমি নাকি আমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া বিষয় কাড়িয়া লইতেছ?"

রজনী বলিল, "বিষয় আমার।"

হরি বোল!

বিষয় রজনীর হউক, কিন্তু রজনী যে আমার মুখের উপর একথা বলিবে, এমত কখন আমি মনে করি নাই। পুনরপি বলিলাম,

"বিষয় আমার পিতামহের—তুমি আমার পিতামহের কে?"

রজনী বলিল, "কেহ নই। তবে আইনমতে আমি পাই।"

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিব, ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, তবে, এখন রজনীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম,

"আইনমতে পাইলেই কি লইবে?"

রজনী বলিল, "আমি বিষয় লইব।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম, "তুমি এমন রাক্ষসী তাহা জানিতাম না।"

এই বলিয়া আমি বাহিরে যাইব বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলাম। তখন রজনী ছিন্ন কদলীতরুবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল —তাহার কণ্ঠনির্গত চীৎকার আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল—এরূপ কাতর, এরূপ সকরুণ চীৎকার আমি কখন শুনি নাই। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম রজনী মূর্চ্ছিতা।

নিকটস্থ পাত্রে জল ছিল তাহা রজনীর মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম, এবং বস্ত্রের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলাম। কাহাকেও ডাকিলাম না। দেখিতে লাগিলাম, বাত্যাপতিত বৃষ্টিজলসিক্ত প্রস্তর পুত্তলীর ন্যায় রজনী পড়িয়া রহিয়াছে।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রজনী অতি কষ্টে, রুদ্ধ স্বরে বলিল, "আপনি এখান হইতে যান। কোন কালে যদি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাই, তবে আসিবেন, দুই একটা কথা বলিবার আছে। এখন কেন আসিয়াছেন?"

আমি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলাম।

নানা কথা।

[বঙ্গদর্শনে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘ প্রবন্ধ নিয়ত পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ আমরা "নানা কথার" সন্নিবেশ আরম্ভ করিলাম]

এই বৎসরের এক সংখ্যক কর্ণহিল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া ছিল, তাহার শিরোনাম, "সূর্য্য বুদ্বুদ মাত্র।" অর্থ এই যে যেমন জলবুদ্বুদের বাহিরের আবরণ, অতি সূক্ষ্ম জলীয় ত্বক্, এবং

ভিতরে বায়ু, সূর্য্যের তদ্রূপ বাহিরে দ্রবীভূত জলবৎ পদার্থের সূক্ষ্ম আবরণ এবং ভিতরে বায়বীয় পদার্থ। তবে, সূর্য্যের আবরণ জলের নহে, দ্রবীভূত লৌহাদি ধাতব পদার্থের। যিনি এই আশ্চর্য্য তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহ করিতে চাহেন, তিনি গত অক্‌টোবর মাসের কর্ণহিল পাঠ করিবেন। এমতটি বিখ্যাত আমেরিক জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেবের।

আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসক ক্লার্ক সাহেব বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যে তাঁহারা মাসে তিন সপ্তাহ মাত্র কার্য্য করিয়া, সময় বিশেষে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করেন। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি জানিয়াই দিবসত্রয় কার্য্য বিরতির বিধান করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগের মধ্যেও ঐরূপ নিয়ম আছে। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যে ইউরোপীয় দিগের অজ্ঞাত অতি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল অবগত ছিলেন, তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। আজি কালি দুই এক জন শারীরতত্ত্ববিৎ বলিতেছেন যে মৎস্য ভোজনে রিপুবিশেষ অত্যন্ত বলবান্ হয়, কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, যে, যেখানে হিন্দু বিধবারা আর বিবাহ করিতে পারিবেনা—সে খানে মৎস্য তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

ফর্ম্মোসা উপদ্বীপের কিয়দংশে চীনেরা বাস করে, অপরাংশে অসভ্য অধিবাসীরা থাকে। অসভ্য দিগের মধ্যে কতকগুলি কৌতুকাবহ রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই পুরোহিত। চত্বারিংশৎ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, স্বামী যদি স্ত্রীর সাক্ষাৎ লাভে ইচ্ছুক হয়েন, তবে চুরি করিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইবে। যদি কেহ জানিতে পারে যে ঊনচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়স্ক শিশু স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে তবে বড় প্রমাদ। স্ত্রীলোক যদি সপ্তত্রিংশৎ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করে, তবে আইন অনুসারে শিশুটিকে বধ করিতে হয়। অনেকে বলিতে পারেন, যে এই দুইটি আইনই বঙ্গদেশে চলিলে নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে না।

এই অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বৈদ্য নাই। চিকিৎসা একটি মাত্র আছে। কাহারও রোগ হইলে তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া আড়ায় লটকাইয়া দিতে হয়—তার পরে ফাঁসি কাটিয়া দিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মরিল ত রোগ চিকিৎসার অতীত বলিয়া সপ্রমাণ হইল। বাঁচিল ত চিকিৎসার মহিমা! আমাদিগের ডাক্তারগণ পড়িয়া যেন হাস্য করেন না। ভাবিয়া দেখিলে, সকল চিকিৎসাই এইরূপ।

অনেকে জানেন যে সেঁকোবিষ—ডাক্তার দিগের "আর্সেনিক" নানা রোগের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে আর একটি উপকার আছে, এতদ্দেশে তাহা সকলে জানেন না। উহা

শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উহাতে শুষ্ক শরীর পূর্ণ হয়, ত্বক্ কোমল এবং চাকচিক্য বিশিষ্ট, এবং বর্ণ উজ্জ্বল ও মাধুর্য্য বিশিষ্ট হয়। অষ্ট্রীয়ার কোন২ স্থানে এই কারণে অনেক লোক নিত্য বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। এবং অনেক যুবতী, নায়কেব মনোহরণার্থ, বিষভোজন আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে প্রথা ছিল, যে যে হতভাগিনী প্রণয়ে নিরাশ হইত, সেই বিষভোজন করিত; অষ্ট্রীয়ার এই প্রদেশে যে যুবতী প্রণয়ের আশা রাখে, সেই বিষ ভোজন করে। অন্য দেশেব কবিগণ বলেন, যোষিদ্‌বর্গের অধরে সুধা, এবং নয়নে বিষ, অষ্ট্রীয়ার তাহাদের নয়নেও বিষ এবং অধরেও বিষ। তাহার উপর তাঁহাদের দাঁতে বিষ নাই ত?

অক্টোবর মাসের ফ্রেজরে, "Dangerous glory of India" নামে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা ভারতবর্ষে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। লেথকের উদ্দেশ্য তিনটি কথা বলা, প্রথম, ইংরেজ বিচারক কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে সুবিচার হয় না ও হইতে পারে না; সর্ব্বত্র দেশী বিচারকের প্রয়োজন। দ্বিতীয় ভারতবর্ষে, বাজে ইংরেজগণ ভয়ানক অত্যাচারী; তাহারা অত্যাচার করিলে দণ্ড পায় না, কেবল খালাষ পাইয়া থাকে। তৃতীয়, দেশী লোকগণকে উচ্চ পদস্থ না করিলে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য দৃঢ়মূল হইতে পারে না। দেশীয়েরা যে ইংরেজদিগের সঙ্গে উচ্চপদে তুল্যরূপে অধিকারী তাহা পুনঃ২ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা কখন কার্য্যে পরিণত হইল না। লেখক বলেন যে রোম রাজ্যে প্লিবিয়ন গণ রাজকীয় পদ সকলে আপনাদিগেব অধিকার পেট্রিসিয়নদিগের তুল্য বলিয়া আইনে বিধিবদ্ধ করাইয়াও, তাহা কার্য্যে পরিণত করাইতে পারে নাই; ইহাতে তাহারা অগত্যা নিয়ম করাইল যে রাজকীয় কর্ম্মচাবীদিগের মধ্যে এতগুলি, প্লিবিয়ন হইতেই হইবে। সেইরূপ ভাবতবর্ষেও নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যে উচ্চ রাজকীয় কর্ম্মচাবীদিগের মধ্যেও বার আনা দেশী লোক হইতেই হইবে। এরূপ নিয়ম না করিলে, ইংরেজেরা লোভ সম্বরণ করিয়া দেশীলোককে কিছু দিবেন না।

কোন২ দেশে লোকে মৃত্তিকা ভোজন করে। ঔষধ স্বরূপ, বা কখন সক করিয়া একটু খায়, এমত নহে; রীতিমত আহার করে। আমেরিকায় অটোমাক্ জাতীয়েরা বর্ষাকালে মৃত্তিকা খাইয়াই জীবন ধারণ করে। শারীরতত্ত্ববিদেরা সেই মৃত্তিকার মধ্যে শরীরপোষক কোন দ্রব্য পায়েন নাই। অতএব কেন যে তাহাতে জীবন রক্ষা হয় বলিতে পারেন না। অনাহারেও অনেকে জীবন রক্ষা করে, এমন গল্প আছে। বিজ্ঞানের কপালে কি আছে, বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

(পরিবারগত অবস্থা, বিবাহবিষয়ক আচার, শাসনপ্রণালী, চিত্র নৈপুণ্য ও অন্নশব্দের ব্যাখ্যাগত বিভেদ।)

পরিবার বর্গের সহিত, বিবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

১৭৯—১৮৫। ৪অধ্যায় মনু।

পাঠক, আজি আমরা সভ্য হইয়াছি। সহোদরের সঙ্গে একত্র বাস করিতে সম্মত নহি। নিজ নিজ পুত্র কলত্র দিগকে বসন ভূষণে পরিশোভিত করিয়া যাদৃশ সুখানুভব করি সচরাচর ভ্রাতৃভার্য্যাকে তাদৃশ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিতে আন্তরিক অভিলাষ রাখি না—নিরুপায় ভগিনী ও তদীয় পরিজনদিগকে গলগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি কত কটুবাক্য ও কত ভর্ৎসনা করিতে থাকি, এবং স্থল বিশেষে কোন কোন ব্যক্তিও সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপা স্নেহময়ী জননীকেও পিতার পরিবার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হন।

এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি আমাদিগের পূর্ব্বতন আর্য্যসন্তানগণ কেমন ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। উপরি কথিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা যে পরম ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের মতদ্বৈধ ছিল না। তাঁহারা ইহাদিগকে এতাদৃশ আন্তরিক ভাল বাসিতেন যে ইহাদিগের সঙ্গে বিবাদেও আপনাদিগের অনিষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত পরকালে নরক দর্শনের ভয়ে ভীত থাকিতেন। সেই ভয়টী ছিল বলিয়াই আমাদিগের পরিবারগত এত স্নেহ। পরিবার দিগের সঙ্গে বিবাদে সম্মত নহি, ইহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিতে পারিলে পরম সুখ জ্ঞান করি। যেস্থলে পরিবারগণ ক্লেশনিবন্ধন অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথায় অচিরে সে কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, বৈদ্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, মাতা পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, ভ্রাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতি স্নেহের পাত্রগণ ও ভৃত্যবর্গের সহিত প্রকৃত জ্ঞানী আর্য্য সন্তানগণ কদাচ নিষ্কারণে বিবাদ করিতেন না। ইহাঁরা জানিতেন যে ইহাদিগের সহিত বিবাদ না করিয়া যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহাদিগের মত খণ্ডন পূর্ব্বক

নিরস্ত করিতে পারিলে জগজ্জয়ী হওয়া যায় এইটী ইহাদিগের স্থিরতর সংস্কার। (১)

ইহারা মনে করেন আচার্য্যকে স্বকীয় মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিলে ব্রহ্মলোক জয় করা যায়। সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পিতাকে অনুরক্ত করিতে পারিলে প্রাজাপত্য লোক জয় করা হয়। ইন্দ্রলোক জয়াভিলাষী হইলে অতিথির প্রতি সদয় হওয়া উচিত। দেবলোক দর্শন বাসনা থাকিলে গুরু পুরোহিতাদির সম্মান ব্যতিক্রম না করাই কর্ত্তব্য। ভ্রাতা জায়া ও ভগিনী প্রভৃতি পরিবার বর্গকে অনুরক্ত রাখিতে পারিলে অপ্সর লোকাধিকারের ফলভাগী হওয়া যায়। সখার সঙ্গে সখ্য চিরস্থায়ী রাখিতে পারিলে বৈশ্য দেবের সহিত সালোক্যপ্রাপ্তি বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। রসাতলের প্রভুত্ব লাভ করিতে বাসনা করিলে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিগণের সঙ্গে বিবাদ না করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই মর্ত্ত্য ভূমিতে চিরসুখী হইতে ইচ্ছা করিলে মাতৃ এবং মাতুলের সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে তাঁহাদিগের সেবা, শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মাইতে পারিলেই ইহলোকে সুখভাগী ও জয়ী বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়, (২)

নির্দ্ধন, বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তিদিগকে সদয় ভাবে তাহাদিগের বাঞ্ছা পরিপূরণপূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে তাহাদিগের সহিত কাল হরণ করিতে পারিলেই দ্যুলোক জয়ের ফলপ্রাপ্তি হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সদৃশ মান্য ও পূজ্য। ভার্য্যা ও পুত্র স্বকীয় শরীর হইতে ভিন্ন নহে। পত্নী পতির দেহের অর্দ্ধাঙ্গ, পুত্র আত্মা স্বরূপ। কন্যা প্রভৃতি সন্ততিবর্গ স্বীয় দেহের অন্যান্য অবয়ব। অনুজীবী, সেবক ও দাসবর্গ ছায়া স্বরূপ। ইহাদিগের সহিত বিবদমান হইয়া তিরস্কার করিলে ইহারা মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে অবমাননা সহ্য করে বটে কিন্তু তদ্দ্বারা কুলনষ্ট হয়।

---

(১) মনু ৪র্থ অঃ

ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈ
র্মাতুলাতিথি সংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈ
র্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১৭৯

মাতাপিতৃভ্যাং যামিভি
র্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ
বিবাদং ন সমাচরেৎ॥ ১৮০

(২)

১৮১ এতৈ র্বিবাদং সন্ত্যজ্য
সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জিতৈশ্চ জয়তি
সর্ব্বান্ লোকানিমান্ গৃহী॥

১৮২ আচার্য্যো ব্রহ্মলোকেশঃ
প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশো
দেব লোক স্যচর্ত্বিজঃ॥

১৮৩ যাময়োঽপ্সরসাং লোকে
বৈশ্ব দেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনো হ্যপাং লোকে
পৃথিব্যাং মাতৃ মাতুলৌ॥

১৮৪ আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া
বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা
ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ॥

এজন্য মুনিগণ ইহাদিগকে সর্ব্বদা বস্ত্রালঙ্কারে সুখে রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। (৩)

আর্য্য সন্তানগণ কেবল যে স্বীয় ভার্য্যাকে ভরণ পোষণ করিয়া ভর্ত্তা শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিলেই যে ইহ সংসারে কৃতার্থম্মন্য হইতেন তাহা কদাচ জ্ঞান করা যায় না। কি পতি কি পিতা কি ভ্রাতা কি দেবর ইহাদিগের মধ্যে যিনিই সংসারের শান্তি কামনা করেন তিনিই অবশ্য নিজের বিভব অনুসারে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় স্ত্রী ও পরিজনদিগকে উত্তমরূপ অন্নাচ্ছাদন ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিবেন।(৪)

ইহাদিগের মতে যে পরিবারের স্ত্রী পরিজন সর্ব্বদা সম্প্রীতির সহিত কাল হরণ করে সে কুলে দেবতাগণ পরিতুষ্ট থাকেন। স্ত্রীজাতি বসন ভূষণাদি দ্বারা বিভূষিত হইলেই সন্তোষ লাভ করে, যে পরিবার মধ্যে স্ত্রী জাতিরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত না হয় সে কুলের স্ত্রীজনেরা সর্ব্বদা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শোক করে। তাহাদিগের ক্ষোভ নিবন্ধন পরিবার মধ্যে অনিষ্টবীজ রোপিত হয়। সেই অপ্রীতি জনক বিচ্ছেদ বীজ বদ্ধমূল হইলেই সুখময় সংসার তরু নিষ্ফল ও সংসারী ব্যক্তির ক্রিয়া পণ্ড হয় এবং অতি শীঘ্র বংশলোপ হইয়া আইসে, পরিজনদিগের সম্প্রীতি দ্বারা বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ভগিনী, পুত্রবধূ, পত্নী, কন্যা প্রভৃতির অভিশাপ দ্বারা কুলের ধ্বংস হয়। যে কুলে ভার্য্যা ও ভর্ত্তার প্রণয় না থাকে সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর আন্তরিক প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয় তথায় কুলদেবতা পরিতুষ্ট থাকেন তন্নিবন্ধন সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। (৫)

৫৫—৬০—৩য় মনু

(৩) ৫৫ পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ
পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ
বহুকল্যাণমিপ্সুভিঃ॥

৫৬ যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে
সর্ব্বাস্তত্রাফলক্রিয়াঃ॥

৫৭ শোচন্তি জাময়ো যত্র
বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
নশোচন্তিতু যত্রৈতা
বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

(৪) ৫৮ জাময়ো যানি গেহানি
শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব
বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

৫৯ তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা
ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈ র্নরৈর্নিত্যং
সৎকারেষুৎসবেষুচ॥

(৫) মনু অঃ ৩ ৬০ সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা
ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং
কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

বঙ্গদর্শনের পাঠকগণের প্রায় অনেকেই আর্য্য জাতির বিবাহ দর্শন করিয়াছেন। বৈবাহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে অন্যান্য ইতিকর্ত্তব্যতা যাহা আছে তাহার সকলগুলি সর্ব্ব জাতির পক্ষে সমান রূপে ব্যবহৃত হয় না। যে গুলি সচরাচর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহারই কতকগুলি অদ্য লিখিত হইল। বিচারকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ঐ গুলি কি জন্য কৌলিক আচারের অনুশাসনে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেদীপ্যমান আছে। বোধ হয় ইহাতে অবশ্য কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই জন্যই এতকাল ঐ গুলিই আর্য্য সমাজে সমান আদরে আচরিত হইয়া আসিতেছে।

আর্য্য জাতির সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যেই হরিদ্রামার্জ্জন করা চিরপ্রথা ইহা সকলেই জানেন। বিবাহেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন লক্ষিত হইবে। বিবাহের প্রাক্কালে বর ও কন্যার হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয় তাহার নাম কৌতুক সূত্র। ঐ সূত্র দ্বারা বর ও কন্যাকে অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়, কৌলিক আচার ব্যবহার পরে দেখান যাইবে। এক্ষণে ইহাই যুক্তিদ্বারা ও শাস্ত্রের বচন দ্বারা প্রমাণ করা যাউক যে কি জন্য পরস্পর হস্তধারণ করে ও কি জন্য উভয়ের উত্তরীয় বস্ত্র বন্ধন দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হয়।

এক্ষণে আমরা যত বিবাহ দেখিতে পাই তৎসমস্তই সবর্ণাবিবাহ সুতরাং বিবাহের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাণিগ্রহণই দেখিতে পাই। বস্ত্রের দশা (ছিলা) গ্রহণও তৎসঙ্গে সঙ্গেই থাকে, এবং মাল্যবদলরূপ পরস্পরের অনুরাগ ও শুভ দৃষ্টিও দেখিতে পাই। অপর কয়েকটী বিষয় অসবর্ণাবিবাহ নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে।

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইতেন তৎকালে ঐ কন্যা বরের ধৃত শরের (বাণের) প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিণী, উক্ত ব্রাহ্মণ রূপ বরের করগ্রহণ যোগ্যা নহে। অর্থাৎ তদীয় পিতৃকুল বরের সমকক্ষ নহে তাহাই দেখান হয়।

বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বরে অভিলাষী হইলে সেই কন্যা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বরের করস্পর্শাধিকারিণী হয় না। বিবাহকালে উক্ত জাতি দ্বয়ের বরের হস্তস্থিত পাচনী গোতাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত।(৬)

বিচার মার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহাই স্পষ্ট লক্ষিত হয় যে, যে স্থলে সবর্ণা বিবাহ হয় তথায় পরস্পর পাণি

(৬) পাণিগ্রহণসংস্কারঃ
সবর্ণাস্থূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো
বিধি কদ্বাহ কর্ম্মণি॥ ৪৩
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ
প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা
শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥ ৪৪
মনু অঃ ৩

গ্রহণ করা শাস্ত্র সিদ্ধ তদনুসারে বরের বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কন্যার দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিগৃহীত হয়। যাবৎ বিবাহ কার্য্য সমাধা না হয় তাবৎকাল উভয়ের করে উভয়ের কর সংলগ্ন থাকে, এবং উভয়ের উত্তরীয় বস্ত্র প্রান্তের গ্রন্থি দ্বারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে। স্বজাতীয়া ও সমান বর্ণা কন্যা গ্রহণ স্থলে ঋষিগণ বস্ত্রের দশা (ছিলা) গ্রহণ বিধান করেন নাই। যে স্থলে শূদ্রকন্যা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষের গলে মাল্য দান অভিলাষ করেন তথায় বরের করগ্রহণের ব্যবস্থা (পাণি) পীড়ন লিখেন নাই। অর্থাৎ ঐ কন্যার পিতৃকুল বরের নিকট করস্পর্শ যোগ্য নহেন। ঐ কন্যা পাণিগ্রহণ মন্ত্র দ্বারা বরের কুলে পরিগৃহীত হইলে সেই কন্যা পাণিপীড়ন যোগ্য হয়। গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সিদ্ধি স্থলেই মাল্য বদলের ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদিগের সমাজে অগ্রে মাল্যবদল তৎপরে শুভদৃষ্টি তৎপরে বস্ত্রের প্রান্তে২ বন্ধন তৎপরে পাণিপীড়ন দেখা যায়।

ব্যবহার বিষয়।

পাঠক, তুমি মনে করিয়াছ অর্য্যজাতির বিচারকেরা কিরূপ অভিযোগে কিরূপ ব্যবহার অনুসারে সময় ক্ষেপণ করিতেন তাহার ব্যবস্থা গুলি সুশৃঙ্খলা বদ্ধ ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে, সর্ব্ব বিষয়েরই সুনিয়ম ও সুরীতি ছিল।

চুরি ডাকাতি পারদারিক কার্য্য নরহত্যা ও মৃত্যু বিষয়ে অভিচারাদি অসদ্ব্যবহার গোধনের অনিষ্ট সম্বন্ধে কুলস্ত্রীর অপবাদ বিষয়ে এবং পরপরিবাদ স্থলে সময়ক্ষেপ করিবার বিধি নাই এবংবিধ কার্য্য জন্য সাহসিক কার্য্যের বিবাদ স্থলে সদ্য বিচার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। শান্তি কার্য্যের বিবাদ স্থলে উপযুক্ত রূপে সময় দেওয়ার রীতি আছে, তবে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যঘটিত সমস্ত বিবাদ স্থলেই যে অভিযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার নিষ্পত্তি হয় তাহা নহে। কার্য্যের লাঘব গৌরব ব্যক্তিবিশেষের পীড়া, ক্ষতি ও বৃদ্ধির তারতম্য বিবেচনায় নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমও ঘটে, অভিযোগ গুলি ধারাবাহিক সংখ্যা গণনায় তাহাদিগের নামলিখন স্থলে সংখ্যাপাত হয়। তুল্য বিষয় ও বিবাদ স্থলে ধারাবাহিক কালানুসারে বিচার কার্য্য নিষ্পত্তি হয়।(৭) পূর্ব্বে অভিযোগের পূর্ব্বপক্ষ সাক্ষী

বৃহস্পতি সং

(৭) সাহস স্তেয় পারুষ্যে গোভিশাপাত্যয়ে স্ত্রিয়াং।
বিবাদয়েৎ সদ্যএব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ॥

বৃহস্পতি সং

সদ্যঃ কৃতেষু কার্য্যেষু সদ্য এব বিবাদয়েৎ।
কালাতীতেষু বা কালং দদ্যাৎ প্রত্যর্থিনে প্রভুঃ॥

ব্যাবহারতত্ত্বধৃত নারদ সংহিতার বচন।

পক্ষস্য ব্যাপকং সার মসন্দিগ্ধ মনাকুলং।
অব্যাখ্যাগম্যমিত্যেতত্তদুত্তরং তদ্বিদো বিদুঃ॥

মধ্যে, লেখ্য প্রভৃতির কতক অংশ লিখিত হইয়া এক্ষণে অভিযোগের উত্তর পক্ষ অবতারণা করা গেল। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ব২ খণ্ডে "পক্ষ" বিষয় দেখান গিয়াছে তাহার সহিত মিলন কর।

অভিযোগের উত্তর শব্দে কি বুঝায়—যে বাক্য পূর্ব্বপক্ষকে নিরাস করিতে সমর্থ প্রকৃত বিষয়োপযোগী ও বিষয়ান্তরে সংক্রান্ত না হয়, যে বাক্য অসন্দিগ্ধ বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মে পূর্ব্বাপর বাক্যের কোন প্রকারে বাধক না হয় নিরাকুল এবং সকলের বোধ গম্য হয় তাহাকেই পণ্ডিতেরা উত্তর শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কোন২ ঋষির মতে যদ্দ্বারা বাদ বাক্য খণ্ডন করা যায়, তাহারই নাম উত্তর। কোন কোন ঋষির মতে প্রতিপক্ষের বাক্যমাত্রকে উত্তর স্থলে গৃহীত হয়,

উত্তর চতুর্ব্বিধ—মিথ্যা, সম্প্রতিপত্তি, প্রত্যবস্কন্দন এবং প্রাঙ্ন্যায়।

বাদীর অভিযোগে যে সাধ্য লিখিত থাকে প্রতিবাদী যদি তাহার অপহ্নব করে তাহা হইলে ঐ উত্তরকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায়, যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহার নাম সত্যোত্তর। স্বীকার বাক্যে কোন কোন স্থলে উত্তর গুলিতে আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা থাকে। বিচারক গণের নিকট মিথ্যাবাক্য প্রধানতঃ সাধ্য নির্দ্দেশাদি দ্বারা ধৃত হয়।

মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্ন্যায় শ্চোত্তরা প্রোক্তা শ্চত্বারো শাস্ত্র বেদিভিঃ॥
অভিযুক্তোঽভিযোগস্য যদি কুর্য্যাদপহ্নবম্।
মিথ্যাতত্ত্ব বিজানীয়াদুত্তরংব্যবহারতঃ॥
শ্রুত্বাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তং প্রতিপদ্যতে।
সাতু তং প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ শাস্ত্রবিদ্ভিরুদাহৃতাঃ॥
অর্থিনাভিহিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তং তথা।
প্রপদ্য কারণং ব্রুয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ॥

বৃহস্পতি বচন। ব্যবহার তত্ত্ব।

আচারে নাবসন্নোঽপি পুনর্লেখয়তে যদি।
সোঽভিধেয়ো জিতঃ পূর্ব্বং প্রাঙ্ন্যায় স্তস উচ্যতে॥

লৌকিক ব্যবহার।

আর্য্য জাতিরা খাদ্যবস্তু মাত্রকেই অন্ন শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তণ্ডুলে অন্নশব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া থাকেন। আমান্ন শব্দে অপক্ক তণ্ডুলকে নির্দ্দেশ করেন, পক্ক তণ্ডুলে সিদ্ধান্নের ব্যবহার দেখা যায়, অন্ন শব্দে সামান্যাকারে এই মাত্র অর্থ প্রাপ্তি হইতেছে—কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির যাচ্ঞানিবৃত্তি মানসে জাতি বিশেষের প্রদত্ত অন্নের অর্থ কোথাও এমন সঙ্কোচ এবং কোন স্থলে তাহার এরূপ প্রশংসাপরব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ জাতির ভিক্ষা বিষয়ে ইচ্ছার নিবৃত্তিব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষেত্রস্বামিগণ নিঃশেষ রূপে ধান্যাদি

সংগ্রহ পুরঃসর ক্ষেত্রত্যাগ করিলে তথায় স্থানেং যে দুই একটি ধান্যাদি পতিত থাকে তাহার সংগ্রহের নাম উঞ্ছবৃত্তি। পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে যে সকল শস্য পতিত থাকে কেবল তাহার অগ্রভাগ মাত্র গ্রহণের নাম শিলবৃত্তি। প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহা উপস্থিত হয় তাহার নাম অমৃত। যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর নাম মৃত। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজহস্তে কর্ষণলব্ধ বস্তুর নাম প্রমৃত।

ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রথমে শিলোঞ্ছবৃত্তি রূপে জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলে অযাচিত লব্ধ বস্তু দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দূষ্য নহে ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া যাচঞ্জালব্ধ বস্তুর নিন্দা করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষেত্র কর্ষণ নিন্দিত হয়। ঐ দুইটি বৃত্তি এককালে প্রতিসিদ্ধ করা হইল।

যদিও যতি ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে ভিক্ষা নিন্দনীয় নহে তথাপি স্বয়ং যাচ্ঞা অপকর্ষ বৃত্তির মধ্যে গণ্য। ইহাদিগের মতে ব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণদিগকে যাচ্ঞা না করিতে যে আমান্ন দেয় তাহার নাম অমৃত। ক্ষত্রিয়গণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণমাত্রকে যে সমস্ত অযাচিত আম তণ্ডুলাদি দেন তাহার নাম পায়স অর্থাৎ ঐ তণ্ডুলাদি ক্ষীর সদৃশ। ঐবস্তু ভক্ষণে শারীরিক ও মানসিক বীর্য্যাধান হইতে পারে। বৈশ্যদত্ত অযাচিত আম তণ্ডুলের তাদৃশ প্রশংসা বা অপ্রশংসা নাই। উহা প্রকৃত খাদ্য বস্তু রূপেই গণ্য হয়। ইহার গ্রহণ ও ভক্ষণে মনঃসংকুচিত বা পাপস্পর্শ হয় না। শূদ্রদত্ত আমান্ন শোণিত সদৃশ অপবিত্র অর্থাৎ ঐ তণ্ডুলাদি ভক্ষণে শরীর ও মনে পাপ স্পর্শ করে ও আত্মা সঙ্কুচিত হয়।

সামান্যতঃ এই মাত্র ব্যবস্থা দেখা যায় যে, শূদ্রের প্রদত্ত অপক্ক বস্তু মাত্র অন্ন শব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে। শূদ্রকর্তৃক পক্ক দ্রব্যগুলি উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এই হেতু বশতঃ শূদ্রের দত্ত বস্তু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সামান্যাকারে নিষেধ দেখা যায়,তবে স্থলবিশেষে কালবিশেষে কোনং ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত প্রদান স্বীকারে পূর্ব্বকালে দোষ ছিল না। অধুনা কলিকালের প্রারম্ভে কতিপয় স্থলব্যতীত নিষেধ দেখা যায়।

গৃহী ব্যক্তিবর্গ অতিথি সৎকারাদি পিতৃ যজ্ঞের বিধান বাসনায় সচ্ছূদ্রের প্রদত্ত ভিক্ষা অযাচিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন।

যে শূদ্র বিশুদ্ধ বংশসম্ভূত দ্বিজভক্ত হবিষ্যাশী এবং বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ করে তাহাকেই পরাশর মুনি সচ্ছূদ্র শব্দে পরিগণিত করিয়াছেন। (৮)

পরাশর সংহিতা ৪র্থ অধ্যায়

(৮)ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং। ৫। মনু অঃ ৪।
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃস্মৃতং।
বৈশ্যস্যত্বন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতং॥৩।
আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্ট মুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্বঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জয়েৎ॥৪।

খাদ্য ও দ্রান গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা ক্রমশঃ দেখান যাইবে।

চিত্রনৈপুণ্য।

পাঠক তুমি বিলাতীয় চিত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ। তুমি মনেকর আর্য্যজাতি এ বিষয়ে মনসংযোগ করেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি সে প্রকার জ্ঞান করেন তাঁহার সেটী ভ্রম। অবনীমণ্ডলে যত জাতি আছেন তন্মধ্যে ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ মনস্তত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে অদ্বিতীয় পথ প্রদর্শক ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। ঐ মনস্তত্ত্বে আত্মার বিচার আছে। আত্মার উপমান স্থলে চিত্রের চারি প্রকার অবস্থা অবতারণা করা হইয়াছে। যে বিষয়টী আপামর সাধারণের বোধগম্য হয় তাহারই সহিত জ্ঞানকাণ্ডের উপমা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ পথ পরিস্কৃত করা গিয়া থাকে। উপমান ও উপমেয়ে পরস্পর সমান অবস্থায় না থাকিলে তুলনা সুসিদ্ধ হয় না। ভারতীয় চিত্র নৈপুণ্যের এতাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে আত্মার অবস্থাভেদ বুঝাইবার জন্য চিত্রের অবস্থাগত ভেদের সহিত আত্মার অবস্থান্তর সাদৃশ্য দেওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের চিত্র বিষয়ে নৈপুণ্য ছিল কিন্তু সাধারণতঃ চিত্র কর্ম্মের বাহুল্য বা প্রশংসা ছিল না। তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমাকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য কৃত পঞ্চদশী দেখ চিত্র বিষয়ক অবস্থান্তর দেখিতে পাইবে। (৯)

অমাদেব পাঠকবর্গের কেহ কেহ কহিতে পারেন সে অবস্থাগত সচরাচর সাধাবণ চিত্রকর দিগের জ্ঞান ছিল না। চিত্রকবদিগের জ্ঞান ছিল্ল কি না সেটী পবে বিচার্য্য। অগ্রে ইহাই প্রদশন করা উচিত যে চিত্রকার্য্যে সকলেরই উৎসাহ ছিল, নৈপুণ্য ছিল, অনেকেই উচ্ছা পূর্ব্বক অভ্যাস করিত। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তবে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির গ্রন্থ দেখ, তাহাদিগের সময়েও কারুকার্য্যের ও চিত্র

কর্ণ[illegible]ক্ষাং নিরাকুর্য্যা দ্যাদিকুর্য্যাদবৃন্তকঃ।
সচ্ছুদ্রাণাং গৃহে কুর্ব্বন্ন তদ্দোষেন লিপ্যতে ॥৫।
বিশুদ্ধাত্ম সম্ভূতো নিবৃত্তো মদ্যমাংসতঃ।
দ্বিজভক্তো [illegible]ত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৬।

(৯) যথা চিত্র পটে দৃষ্ট মবস্থানাং চতুষ্টয়ং।
তৎপরমাত্মনি বিজ্ঞেয়স্তথাবস্থা চতুষ্টয়ং ॥
যথাধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্ত র্যামি সূত্রাণি বিবাট্ চাত্মা- তথের্য্যতে।।
স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃস্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃস্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণ পূরণাৎ ॥
স্বতশ্চিদন্তর্যামীতু মায়াবী সূক্ষ্ম সৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূল সৃষ্টৈষ বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥
বেদান্ত দর্শন পঞ্চদশী তত্ত্ব

নৈপুণ্যের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইবে।

শ্রীহর্ষ অতি প্রাচীন, খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে।* তাঁহার রত্নাবলীতে সাগরিকা কর্ত্তৃক বৎসরাজের চিত্র দেখ। যদি বল রাজকন্যার পক্ষে চিত্রশিক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি সামান্য স্ত্রীলোকে ও সামান্য মনুষ্য মাত্রের নৈপুণ্য দেখা যায় তবে ঐ বিষয়ের বাহুল্য প্রচার ও সকলেরই ঐ বিষয়ের রসাস্বাদ গ্রহণের সামর্থ ছিল ইহা এক প্রকার স্বীকার করিতে হয়।

সাগরিকাকৃত রাজার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সাগরিকার সখী সুসঙ্গতা নাম্নী দাসী ঐ ছবির বাম ভাগে সাগরিকার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে। উহা দেখিয়া রাজা মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।(১০)

মহাকবি কালিদাসও খৃষ্টের জন্মের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই অভিজ্ঞান শকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের কৃত চিত্রনৈপুণ্যের বিষয় পাঠ কর দেখিবে তৎকাল পর্য্যন্তও চিত্র কর্ম্মের সারগ্রাহিতা ছিল। কবিরাও চিত্রের ভাল মন্দ অবস্থা বর্ণন করিতে সক্ষম ছিলেন। (১১)

---

* কি প্রকারে?—সং

(১০) সুসঙ্গতা—উপবিশ্য ফলকং গৃহীত্বা দৃষ্ট্বা চ।

সহি কো এসো তুএ আলিহিদো।

সাগরিকা—পউত্তমহুসবো ভঅবং অণঙ্গো।

সুসঙ্গতা। সস্মিতং। অহোদে ণিউণত্তনং কিং। উন সুউণং বিঅ চিত্তং পড়িভাদি, তা অহংপি আলিহিঅ রই সনাহংকরিস্সং।

বর্ত্তিকাং গৃহীত্বা নাট্যেন রতিব্যপদেশেন সাগরিকামালিখতি।

সাগরিকা—বিলোক্য সক্রোধং। সহি সুসঙ্গদে, কীস, তুএ অহংএথ আলিহিদা।

সুসঃ—বিহস্য। অহি, কি অআরণে কু-

পসি জাদিসো, তুএ কামদেবো আলিহিদো তাদিসী মএ রই আলিহিদেত্তি, তা অন্যহা সংভাবিণি কিতুএ এদিনা আলোবিদেণ, কহেহি সর্ব্বং বুত্তন্তং।

* * * *

রাজা ফলকং নির্বর্ণ্য।

কৃচ্ছ্রা দূরু যুগং ব্যতীত্য, সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে

মধ্যেহস্যা স্ত্রিবলী তরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।

মৎদৃষ্টি স্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ

সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥

রত্নাবলী দ্বিতীয়োঙ্ক।

(১১) মিশ্রকেশী—অম্মো এষা রাএসিনো বত্তিআলেহা নিউণদা জাণে পিয়সহী সে অগ্গদো বট্টদিত্তি।

\+ \+ \+ \+

রাজা তথাহি—

অস্যাস্তুঙ্গমিবস্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা

দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি

অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধ প্রভাবাচ্চিরং

মহাকবি ভবভূতিও কালিদাসের সমকক্ষ কবি, তিনি তাঁহার সীতাকে যে চিত্রপট প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে চিত্রের অসাধারণ নৈপুণ্য আছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির কৌমার কৈশোর ও যৌবনাদিভেদে নানা অবস্থা ও নানাবিধ রূপ ঘটিয়াছে। এক খানি চিত্র পটে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবিধ অবস্থাগত চিত্র কেমন বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রের বর্ণন দ্বারা অবস্থান্তর পর্য্যন্ত কেমন স্মরণ করাইয়া দিতেছে, অধিক প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যকতা নাই একটি দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। (১২)

লক্ষ্মণ কহিলেন এই অযোধ্যার প্রতিকৃতি। রাম অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সখেদে কহিলেন ভাই সমুদায় স্মরণ হইতেছে। পিতা যে সময়ে জীবিত ছিলেন আমরা প্রথম বয়সে নূতন দার পরিগ্রহ করিয়াছি, জননী বর্গ আমাদিগকে সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপূর্ব্বক আমাদিগের চিত্তবিনোদনে পরম প্রীতি লাভ করিতেছেন। আমাদিগের সে সকল অমৃতায়মান ও পরমানন্দের

প্রেম্নামন্মুখ মীষদীক্ষতইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্॥

* * * *

বিদূ—ভো তিন্নিআ আইদিও দীসন্তি, সব্বাও জ্জেব্ব দংসণীআও, তা কদমা এথ তত্থভোদী সউন্তলা।

* * * *

রাজা—ত্বংতাবৎ কতমাং তর্কয়সি।

বিদূ—নির্ব্বণ্য। তক্কেমি জা এষা সিঢিল কেস বন্ধণুব্বন্ত কুসুমেন কেসহথেন বন্ধস্সেএবিন্দুণা বঅণেণ বিসেসদো ণমিদ সাহাহিং বাহুলদাহিং উস্সসিদ নীবিণা বসনেন অ ঈসী পরিস্সন্তা বিঅ অবি সে অ সিন্নিদ্ধ দর পল্লব রাল চূঅ রুক্‌খস্স পাস্সে আলিহিদা এসা তথ ভোদী সউন্তলা ইদরাও সহিওত্তি।

রাজা—নিপুণো ভবান্ অস্ত্যত্র মমাপি ভাবচিহ্নং

স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশাদ্রেখা প্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনা।
অশ্রু চ কপোলপতিতং লক্ষ্যমিদং বর্ণকোচ্ছ্বাসাৎ॥

অভিজ্ঞান শকুন্তলা। ষষ্ঠোঙ্ক।

---

(১২) রামঃ সাক্ষেপং, বৎস বহুতরং দ্রষ্টব্য মন্যতোদর্শয়।

সীতা। সস্নেহ বহুমানং নির্ব্বর্ণ্য। সুষ্ঠু সোহসি অজউত্ত, এদিনা বিনয় মাহপ্পেন।

লক্ষ্মণঃ—এতে বয়মযোধ্যাং প্রাপ্তাঃ।

রামঃ—সাস্রং। স্মরামি হন্ত স্মরামি।

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তেহি নো দিবসা গতাঃ॥

ইয়মপি তদা জানকী।

প্রতনু বিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহর কুন্তলৈ
র্দশন মুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখং।
ললিত ললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈর কৃত্রিম বিভ্রমৈ
রকৃত মধুরৈ রম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ॥

উত্তর রামচরিত। প্রথমোঙ্ক।

দিন একেবারে গত হইয়াছে। তেমন সুখকর দিন আর আসিবে না।

সহৃদয় পাঠকগণ অপর চিত্রগুলি নিজে পাঠ করিয়া দেখ। বুঝিতে পারিবে।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

রজনী।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(অমরনাথ বক্তা।)

এতদিনের যত্ন সফল হইল—মিত্রদিগের অতুল সম্পত্তির আমি অধীশ্বর হইলাম। শচীন্দ্র এবং তাহার অগ্রজ অনর্থক মোকদ্দমা করিল না—বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি, শচীন্দ্র ডাক্তারি করিয়া দুই একটাকা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার ভাই কেরানিগিরির উমেদারিতে ফিরিতেছে। দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই—কিন্তু আমি কি করিব? ন্যায্য সম্পত্তি কি সেই অনুরোধে ছাড়িয়া দিব? টাকায় যদি পৃথিবীতে প্রয়োজন না থাকিত, ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু তথাপি আমি শচীন্দ্রকে কিছু দিতে চাহিয়াছিলাম—সে লইল না। কোন্ ভদ্র লোকে লইত?

সম্পত্তি হস্তগত হইলে, রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "এসম্পত্তি আমার স্থিরতর হইয়াছে বটে?"

আমি বলিলাম, "তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এখন ইহা দান বিক্রয় করিতে পারি?"

আমার মুখ শুকাইল—বলিলাম, "কেন, কাহাকে দান বিক্রয় করিবে?"

আমার কণ্ঠস্বরে ভয় বুঝিতে পারিয়া রজনী হাসিল, বলিল, "ভয় নাই আর কাহাকেও নহে। আপনাকেই দান করিব। ইহা আপনার পরিশ্রমে পাইয়াছি, আমার নামে না থাকিয়া, আপনার নামে থাকে, ইহা আমার সাধ।"

মনে মনে আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। রজনীর সম্মতি পাইয়া আমি উকীলের বাড়ী গেলাম—লেখা পড়া করাইলাম। রজনী তাহা রেজিষ্টরী করিয়া দিল। এ কথা এক্ষণে গোপন রাখিলাম।

সম্পত্তির উপর যক্ষের মত আঁটিয়া বসিয়া বড় মানুষি করিব একবার ইচ্ছা হইল। বড় মানুষির সুখ যাহা তাহা বিলক্ষণ জানিতাম, তবে এ গুঁড়ী সোনার

বেনের সাধ আমার মনে উদয় হইল কেন? ইহার কারণ কলি কাতা শুঁড়ী সোনার বেনের সমাজ; এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের চরিত্রেও একটু২ বেনেগিরি আছে—এখানে একটু বড় মানুষি না করিলে কেহ গ্রাহ্য করে না। এখানে গণ্য হইতে গেলে, হয় হুজুগ তুলিতে হইবে, নহে রাজপ্রসাদ পাইতে হইবে, নহে গলা বাজি করিতে হইবে, নয় বড় মানুষি করিতে হইবে। হুজুগ আমার এসে না—রাজপ্রসাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই; গলাবাজি ভাল লাগে না; সুতরাং বড় মানুষিই অবলম্বন করিলাম আর বোধ হইল রজনী চির দরিদ্রা—বড় মানুষি তাহার ভাল লাগিতে পারে—অতএব রজনীর জন্য সে ইচ্ছা হইল। বড় দেখিয়া বাড়ী কিনিলাম। গৃহ-সজ্জায় দাস দাসীতে তাহা পরিপূর্ণ করিলাম—স্বর্ণ রৌপ্য যেখানে যাহা প্রয়োজন, মুক্তহস্তে ছড়াইলাম। বাছিয়া বাছিয়া গাড়ি আনিলাম—বাছিয়া২ ঘোড়া তাহাতে যুড়িলাম—শেষ সাধ,—রজনীকে রত্নালঙ্কারে সাজাইব।

হায়—কাহাকে সাজাইব? সে ত কিছু দেখিতে পাইবে না। কাহার জন্য এ গৃহ সাজাইলাম—সে ত কিছু দেখিতে পাইল না!

রজনীকে অলঙ্কারের কথা বলিলাম। রজনী হাসিল। বলিল, "কালি বলিব?"

"কেন, আজ?"

রজনী বলিল, "আজ একবার লবঙ্গ-লতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

আমি বিস্মিত হইলাম—রুষ্টও হইলাম। আগে রাগের কথা বলিলাম,

"আজিও সে তোমার কাছে ঠাকুরাণী কিসে?"

রজনী। আমি তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি, সম্ভ্রম টুকু না কাড়িলেও চলে।

আমি। তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে কেন?

রজনী। প্রয়োজন আছে। পশ্চাৎ বলিব।

আমি। আমি আগে শুনিব।

রজনী। জেদ করিবেন না।

সুতরাং জেদ করিলাম না। বলিলাম, "তুমি তাহার কাছে না গিয়া, সে তোমার কাছে আসিলে হয় না।"

রজ। সে আসিবে কেন?

আমি জানিতাম—লবঙ্গলতা আসিলেও আসিতে পারে। ভিতরে কিছু গুপ্ত কথা ছিল। রজনী তাহা জানিত না। বলিলাম, "ডাকিলে আসিতে পারে।"

রজ। আমি তাঁহার বিষয় কাড়িয়া লইয়া এমন কি বড় লোক হইয়াছি যে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইব?

আমি বলিলাম, "সে কথা নহে। আচ্ছা, তুমি দেখ, আমি নিজে তাহাকে ডাকিতে যাই। না আসে তখন তুমি যাইও।"

আমি স্বয়ং রামসদয় মিত্রের বাড়ী গেলাম। রামসদয় আমাকে দেখিয়া

অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না। শচীন্দ্র চক্ষুলজ্জা বশতঃ আমার নিকটে আসিয়া বসিল। তাহাকে বলিলাম, "আমার পরিবার কোন বিশেষ কথা আপনার বিমাতার নিকট বলিতে চাহেন। আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ জন্য আমার পরিবার এখানে আসিবেন, না আপনার বিমাতা আমাদিগের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করা বৃথা। রজনীর এ পরিচিত স্থান—তিনি অনায়াসেই এখানে আসিতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "সত্য। তথাপি আপনার একবার জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতি হইবে না।"

"অনর্থক কষ্ট দিলেন।" বলিয়া শচীন্দ্র অনুরোধ রক্ষার্থ একবার অন্তঃপুরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার পিতা সম্মত হইলে, বিমাতাই যাইবেন।"

রামসদয় যে আপত্তি করিবেন, তাহা আমি একবার ভ্রমেও মনে স্থান দিলাম না। বৃদ্ধ স্বামী কোন্ কালে, যুবতী ভার্য্যার ইচ্ছায় অসম্মত হইয়াছে? আমি নিঃশঙ্কচিত্তে গিয়া রজনীকে বলিলাম যে "লবঙ্গলতা আসিবে।" রজনী একটু বিস্মিতা হইল।

পরদিন প্রাতে লবঙ্গলতা আসিল। রজনী নীচে হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল। আমি তখন অন্তঃপুরে। রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল,—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে ছিল না। লবঙ্গলতা, হাসিতে উছলিয়া পড়িতে ছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্ত লতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল!

আমি অবাক্ হইয়া, নিষ্পন্দ শরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম! ললিত লবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্রে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, চারিদিকে তাহারই ঐশ্বর্য্য—লবঙ্গের কাছে হইতে অপহৃত ঐশ্বর্য্য, দেখিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি! অথচ আমি জানি লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম—লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরেই প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাকারিণী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায়, রজনীকে বলিল—"রজনি—তুই এখন আর কোথাও যা! তোর স্বামীর সঙ্গে আমার গোপনে কিছু

কথা আছে। ভয় নাই? তোর স্বামী সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।” রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিত লবঙ্গলতা, ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুময় হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিস্মৃত দেখে নাই। আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারও ললিত লবঙ্গলতা—এবারও ললিত লবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, “আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ? তোমার নূতন ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।”

আমি বলিলাম, “তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না। পারিলে কখন আমাকে বিষয় দিয়া, এখন স্বহস্তে বাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইতে না।”

রজনী, উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, “হায়! হায়! ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে মনে করেছ? সতীনকে বাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে, কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচ টা বাঁধুনী রাখিতে পারি।”

ঠিক এই কথাটি শুনিবার জন্যই আমি ললিত লবঙ্গলতার আসার জন্য এত যত্ন করিয়াছিলাম। বলিলাম, “বিষয় রজনীর; আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে। যাহার বিষয় সে ভোগ করিতে থাকিবে।”

লবঙ্গ। তুমি কস্মিন্ কালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। স্বামীকে রক্ষার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয় টা তোমায় ঘুষ দিবে?

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এতদিন সে ঘুষ চাও নাই কেন?

লবঙ্গ। তোমার মত ছোট লোকে তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন?

আমার যেটি প্রধান ভয় ছিল, এই কথায় তাহা দূর হইল। লবঙ্গ সম্পত্তি উদ্ধারের লোভে আমার অনিষ্ট করিবে না। আমি লবঙ্গের ভয়েই প্রথম২ লুকাইয়া বেড়াইয়াছি; পরে তাহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া আর একখানা ভাবিয়াছিলাম—এখন বুঝিলাম সেটা ভ্রান্তি। তথাপি যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা জানিলাম। কিন্তু সকল জানিতে পারি নাই। বলিলাম,

“তুমি যদি এমন না হবে, তবে, আমার সে মরণ কুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যদি আমার এত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে, না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।”

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল—কি

সুন্দর ভ্রূভঙ্গী! বলিল, "আমি কি ঠক! স্বামীর নামে স্ত্রীর কাছে ঠকাম করিবার জন্য কি আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি? তবে ইহা বলিতে পারি, যদি তুমি রজনীকে বিবাহ করিবার অগ্রে আমি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিতাম যে তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহা হইলে আমি কখন এ বিবাহ হইতে দিতাম না। এখন বিবাহ হইয়াছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক,আমি ঘর ভাঙ্গিয়া রজনীকে কাতর করিব না।"

হঠাৎ এক সন্দেহ—এক আহ্লাদ মনে উদয় হইল—যাহা আগে ভাবিয়াছিলাম, তাই বা? নহিলে লবঙ্গলতা আসিল কেন? বলিলাম,

"যদি আমার সে সন্দেহ থাকিবে, তবে যত্ন করিয়া তোমাকে লইয়া আসিব কেন?"

লবঙ্গ আমার অপেক্ষাও ধূর্ত্ত, বলিল, "তুমি সে জন্য আমাকে আন নাই। তুমি কেবল ইহাই জানিতে চাও, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব কি না?"

আমি বলিলাম, "যদি তাই মনে করিয়া আনিয়া থাকি, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

ললি। কি বুঝিলে?

আমি বলিলাম, "তুমি ভাঙ্গিয়া না বলিলে আমি বুঝি আমার সাধ্য কি?"

ললি। কেন না শচীন্দ্রের মত কাঁচা ছেলে পাও নাই। (আমি মনে২ একটু হাসিলাম, কেন না, শচীন্দ্র বিমাতার অপেক্ষা বয়সে বড়) লবঙ্গ বলিতে লাগিল আমি ভাঙ্গিয়াই বলিব। তুমি আমাদের কোন অন্যায় অনিষ্ট কর নাই—ন্যায় মতেই আমরা বিষয় হারাইয়াছি—এজন্য তোমাকে কিছু বলি নাই। রজনীকে বিবাহ করিয়াছ, তাহাতেও কিছু বলিব না —কেননা বিবাহ কিছুতেই ফিরিবে না। কিন্তু দেখিও—আর কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে যদি তোমাকে প্রবৃত্ত দেখিব —তবে আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। একথাই বলিতে আমি আসিয়াছি। এখন রজনীর কাছে চলিলাম। ইচ্ছা হয়, সঙ্গে এসো।

এই বলিয়া, লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

হাসিয়া বলিল, "তবে আমি রজনীর কাছে যাই।"

"যাও।"

ললিত লবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, "শুন, তোমার ভার্য্যা কি বলিতেছে! তোমার

সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না, বা তাহার উত্তর দিব না।”

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “কি ?”

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, “বল। তোমার স্বামী আসিয়াছেন—এখন উত্তর দিব।”

রজনী সকাতরে বলিল, “আমি যদি কখন আপনার দ্বারে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করি, তবে আমাকে আশ্রয় দিবেন কি না ? না অপরাধিনী বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন ?”

লবঙ্গলতা বলিল, “তোমার যেদিন ইচ্ছা সেইদিন আসিও। আমার গৃহ, তোমার গৃহ। আমার যতদিন অন্ন যুটিবে, তোমারও ততদিন যুটিবে।”

এই বলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া, ললিত লবঙ্গলতা, সোপান অবতরণ পূর্ব্বক শিবিকারোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ললিত লবঙ্গলতা চলিয়াগেলে পর, আমি রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

“লবঙ্গ তোমাকে কি বলিয়াছে ?”

রজনী। যাহা আপনি শুনিলেন, তাহাই।

আমি বলিলাম, “আমার কথা কিছু?”

রজ। কিছু না।

আমি। তুমি তাহাকে কি বলিয়াছ ?

রজ। আপনি যাহা শুনিলেন, তাই।

আমি। আমার কথা কিছু?

রজ। কিছু না।

আমি। আমি যাহা শুনিলাম, তাহাই কেন বলিতেছিলে ? কিজন্য তুমি তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিতেছিলে ? এই জন্য কি তুমি লবঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলে ?

রজ। এই জন্যই। যে বিষয় বিভব আপনার উদ্দেশ্য তাহা আমি আপনাকে লিখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে আমাতে আপনার আর প্রয়োজন নাই। আমাকে ত্যাগ করুন !

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। “সে কি রজনি ? এ কথা কেন বলিতেছ ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ?”

রজ। যেখানে আশ্রয় পাইব।

আমি বলিলাম, “আমি কি অপরাধ করিয়াছি ? কিসে আমার উপর রাগ করিলে ?”

রজ। আপনার উপর রাগ কিছুই নহে—এবং এ শরীর ধারণে কখন আপনার উপর রাগ করিতে পারিব না। তবে আপনার অনুরোধে, অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। যাহারা বাল্যাবধি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছি। যাহারা রাজা ছিল, আমার চক্রে তাহারা পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য এ সকলও আমার কর্ত্তব্য হইয়াছিল—আপনার কথায় তাহা করিয়াছি। আপনি সে ধনের অধিকারী হইবেন বলিয়া এ

দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিব না। যাহাদিগের বিষয় কাড়িয়া লইয়াছি, তাহাদিগের দাসীত্ব করিয়া কালযাপন করিব।

বুঝিলাম। বলিলাম, "এ সম্পত্তি কাহার? তোমার নহে?"

রজনী। আমার হইলেও আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।

আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম—নিতান্ত ভীত হইলাম। যদি রজনী এখন আমার গৃহত্যাগ করিয়া মিত্র গোষ্ঠীর আশ্রয় গ্রহণ, করে, তবে লোকে মনে করিবে রজনীর ইচ্ছা ছিল না, আমিই অর্থের লোভে রজনীকে হস্তগত করিয়া কুচক্রে মিত্রদিগকে এই বিপদগ্রস্ত করিয়াছি। লোকে অন্যায় মনে করিবে না, কিন্তু লোকের এরূপ মনে করা আমার পক্ষে ভাল নহে। আমার বিষয় কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না বটে, কিন্তু কুলোক বলিয়া সমাজে পরিচিত হওয়া মঙ্গলের কথা নহে। কুলোক বলিয়া যে পরিচিত তাহার কোন ইষ্ট সিদ্ধ হয় না—সমাজে তাহার সকলেই শত্রুতা করে। রজনী বিষয় আমাকে দিয়া স্বয়ং ভিখারিণী হইয়া পরাশ্রয়ে গেলে আমি সমাজে অর্থলুব্ধ কুচক্রী হইয়া দাঁড়াইব। আমার সম্ভ্রম যাইবে। আমার সম্ভ্রম সর্ব্বস্ব। অতএব রজনীকে যাইতে দেওয়া হইবে না।

আমি বলিলাম, "তুমি যদি আমাকে প্রবঞ্চনা করিবে জানিতাম, তাহা হইলে তোমার বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিতাম না। এখন কি তাহার এই প্রতিফল?"

রজ। ঐ কথাটি বলিবেন না। আপনি আমার জন্য বিষয়ের উদ্ধার করেন নাই। নিজের জন্য করিয়াছেন। আমি আপনাকে অনেকবার নিষেধ করিয়াছি। আপনি শুনেন নাই। আপনার ইহাতে নিতান্ত সুখ বুঝিয়া আমি সুতরাং আপনার প্রতিকূলতাচরণ করি নাই—কেন না আপনার কাছে আমি বড় ঋণে বাঁধা আছি। এখন আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি, এখন আমাকে ছাড়িয়া দিউন।

আমি। কেমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে? লোকে কি বলিবে? আমি যে তোমার স্বামী!

রজনী। কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—বিষয় আপনার হইয়াছে—এখন আর লোককে প্রবঞ্চনা করিব কেন? আপনি আমার স্বামী নহেন, পৃথক্ হইবার বিচিত্রতা কি?

মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এ কথাও রজনী প্রকাশ করিবে! রজনীকে বুঝাইয়া বলিলাম,

"দেখ রজনি, কয় মাস স্ত্রীপুরুষ পরিচয়ে একত্রে বাস করিতেছি। এখন তুমি যদি বল তুমি আমার স্ত্রী নহ, কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে?"

রজনী বলিল, "যখন আমি বলিব, যে মিত্রদিগের বিষয় নিজ হস্তগত করিবার জন্য অমরনাথ বাবু আমার স্বামী সাজিয়াছিলেন, তখন সকলেই আমার

কথায় বিশ্বাস করিবে। কেন না মন্দ কথাটা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে—বুঝাইতে হয় না।"

আমি বলিলাম, "যদি তাহা বুঝ, তবে আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ। তুমি আমার অন্তঃপুরে আমার স্ত্রী পরিচয়ে এতদিন বাস করিয়াছ, তবে এখন যদি বল যে তোমার বিবাহ হয় নাই, তবে লোকে মনে করিবে, তুমি কুলটার মতই আমার ঘরে ছিলে।"

লজ্জায়, দুঃখে, ক্রোধে রজনীর মুখ নীলবর্ণ হইল। রজনী কাঁদিতে লাগিল, পরিশেষে কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "যাহার অন্য উপায় নাই, তাহার এক উপায় আছে। সে মরিতে পারে। যে অন্ধ, সে যদি মরিবার অন্য কোন উপায় না পায়, তবে অনাহারেও মরিতে পারে। আমি স্ত্রীজাতি, সহজে আত্মহত্যা করিতে পারি।"

তখন আমিও সকাতরে বলিলাম, "রজনি, তোমার চক্ষু নাই, আমার আঘাত চিহ্ন গুলি তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। নহিলে সেগুলি দেখাইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতাম, "যাহার জন্য এই সকল আঘাত শরীরে ধরিয়াছি তাহার কাছে আমার কি এই পুরস্কার হইল।"

রজনী আরও কঠিন হইল। বলিল, "তাহার পুরস্কার, মিত্রদিগের জমীদারী। আপনি আমার জন্য শরীরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সে উপকারের প্রতিশোধ কিছুতেই হইতে পারে না বটে, কিন্তু আমার যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছি। আপনাকে আমার বিষয় দিয়াছি। আপনি পুরুষ, আপনি মহৎ কার্য্য করিতে পারেন; আমি স্ত্রীজাতি, সামান্য কার্য্যই পারি; তাই, আপনার মহৎ কাজে আমার সামান্য কাজে শোধ হইল মনে করুন। এইরূপে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব বলিয়াই এতদিন আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। শচীন্দ্র বাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।"

"শচীন্দ্র বাবুকেও রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।" কথাটি বলিবার সময় রজনীর কথা একটু বিকৃত হইল—কথাটিতে অপ্রতিভের চিহ্ন ছিল—তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—আমার ভাল লাগিল না—মর্ম্ম বুঝিবার জন্য বলিলাম,

"কেন, যে এতদিন বঞ্চনা করিয়া তোমার ধনে বড় মানুষি করিয়াছে, তাহাকে রূঢ় কথা বলিতে ক্ষতি কি?"

রজ। 'জানিয়া কেহ আমায় বঞ্চনা করে নাই—বরং তাঁহারা আমার উপকার করিতেন। কিন্তু সে কথায় এখন কাজ কি? আপনি আমাকে বিদায় দিন।

আমি বুঝিলাম, যে রজনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরসংকল্প। যে একবার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, সে আর একবার পারে। মিথ্যা বাগ্‌জাল ত্যাগ করিয়া বলিলাম,

"যদি আমার সংসর্গ ত্যাগ করাই তোমার স্থির হইয়াছে, তবে মিত্রদিগের

আশ্রয়েই যাইতে হইবে কেন? আর কি স্থান নাই?"

সকাতরে রজনী বলিল, "কোথায় স্থান?"

আমি। কেন তোমার পিতার সঙ্গে যাও না?

রজনী। তিনিও আপনার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ—আপনার বখরাদার। তিনি সুখ সম্পদ্ ছাড়িয়া যাইবেন না।

আমি। আমি তোমাকে স্বতন্ত্র বাড়ী কিনিয়া দিতেছি।

রজনী। আপনার টাকার ভাগ লইয়া আমি সুখ কিনিব না।

আমি। আমার সকল টাকা মিত্র দিগের বিষয়ের উপস্বত্ব নহে। আমার নিজের বিষয় আছে। তাহার উপস্বত্বও যথেষ্ট। তাহা হইতে তোমার উপায় করিব।

রজনী। তাহা হইতেও আমি কিছু লইব না। সে কেবল ডান হাত বাঁহাত মাত্র।

আমি। আমি তোমাকে বিষয়ের ভাগ দিতে চাহিতেছি না। শান্তিপুরে আমার পৈতৃক বাড়ীতে তোমাকে পাঠাইতেছি। সেখানে আমার পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অনেক অনাথা গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছে। তুমি সেইখানে তাহাদিগের মত থাকিবে। তুমি কে, কি বৃত্তান্ত কেহ জানিবে না।

রজনী সম্মতা হইল।

কিন্তু সেই সময়ে লবঙ্গলতার শাসন বাক্য মনে পড়িল। মনে২ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি কি রজনীর কোন ক্ষতি করিতেছি? না সে যাহা চায় তাহাই করিতেছি?

কৃষ্ণ চরিত্র।*

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানস বিকাশের সমালোচনায় কথিত হইয়াছে, যে যেমন অন্যান্য, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে, ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা, এবং গৃহসুখনিরতির ফল। অদ্য সেই কথা স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব।

* প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। চুঁচুড়া—সাধারণী যন্ত্র।

বিদ্যাপতি, এবং তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী; অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন, অপবিত্র, অরুচিকর, এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ—অতি কদর্য্য পাপের আধার। বিশেষ এসকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমদ্ভাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতেও কি তাই? চারিজন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক প্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য। কাব্যেং প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবি মাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সে গুলি তাঁহাদিগের জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীনকবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেই গুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র আছে। সে গুলি তাঁহাদিগের নিজগুণ।

অতএব, কাব্যবৈচিত্রের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারি জন কবি কর্ত্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা।

বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারত-কার বা শ্রীমদ্ভাগবতকারের জাতীয়তা জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা; তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণ চরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই অনুসন্ধান করিব।

মহাভারত কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। নিরূপিত হওয়াও অতি কঠিন। মূলগ্রন্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত বলিয়া প্রচলিত, তাহার সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে। যেমন একজন, একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গেলে, তাঁহার পরপুরুষেরা তাহাতে কেহ একটি নূতন কুঠারি, কেহ বা একটি নূতন বারেণ্ডা, কেহ বা একটি নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, মহাভারতেরও তাহাই ঘটিয়াছে। মূলগ্রন্থের ভিতর পরবর্ত্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি কবিতা কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পর্ব্বাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু সরিতের জলে পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুল কলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্ ভাগ আদি গ্রন্থের অংশ, কোন্ ভাগ আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্ব্বত্র নিরূপণ করা অসাধ্য। অতএব আদি গ্রন্থের বয়ঃক্রম নিরূপণ অসাধ্য। তবে উহা যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বগামী ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই অস্বীকার করিবেন না। যদি অন্য প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পথে।

অতএব প্রথম মহাভারত। মহাভারত খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও অনুভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষীয় দিগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা তৃতীয়াবস্থা ইহাতে পরিচিত হইয়াছে। তখন দ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই। যখন স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী তীরে, নবাগত আর্য্য বংশ, সরল গ্রাম্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, দস্যুভয়ে আকাশ ভাস্কর, মরুতাদি ভৌতিক শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সুখজ্ঞান করিয়া আর্য্য জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীয়াবস্থাও নাই। যখন, আর্য্যগণ সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বহু যুদ্ধে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, দস্যু জয়ে প্রবৃত্ত, সে ত্রেতা আর নাই। যখন আর্য্যগণ, বাহুবলে বহুদেশ অধিকৃত করিয়া, শিল্পাদির উন্নতি করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিয়া, কাশী অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই। যখন, আর্য্যহৃদয়ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাই। এক্ষণে দস্যু জাতি বিজিত, পদানত,

দেশপ্রান্তবাসী শূদ্র, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে। যে হলাহল বৃক্ষের ফলে, দুই সহস্র বৎসর পরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ে সাহাবুদ্দিনের করতলস্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের কার্য্য মহাভারত।(১)

এরূপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসার চিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান; এক সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতি বিশারদ মন্ত্রী। এক মল্টকে, দ্বিতীয় বিস্মার্ক; এক গারিবল্‌দি, দ্বিতীয় কাবুর; মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অর্জ্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।

এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার সূচনাও নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য্য—সেই জন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড় শক্তি বাহুবল ইহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইহার বল। যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থি রজ্জু ইহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্ব্বকর্ত্তা। ইহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা, তেমনই ধৈর্য্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত; যে ধনু ধরিতে জানে সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই। তিনি মানসিক শক্তি মূর্ত্তিমান্, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাঁহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি, স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করিবেন, সেই পক্ষের সম্পূর্ণ রক্ষা সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র২

(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কতিপয় শতাব্দীকে এখানে "যুগ" বলা যাইতেছে।

খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডেং এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্রং রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্রং পরস্পর বিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত, এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন। শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অস্ত্রধারণে, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া, ভারত রাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন।

এইরূপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্ম্মা দূরদর্শী রাজনীতি বিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশ মাত্র নাই—গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই।

এদিকে দর্শন শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা করিয়া আর মার্জ্জিতবুদ্ধি আর্য্যগণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা দেখিলেন, যে যে সকল ভিন্নং নৈসর্গিক শক্তিকে তাঁহারা পৃথক্‌ং দেব কল্পনা করিয়া পূজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্নং বিকাশ মাত্র। জগৎ কর্ত্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তখন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ লইয়া মহা-গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই। কেহ বলিলেন ঈশ্বর এই জড় জগৎ হইতে পৃথক্, কেহ বলিলেন এই জড় জগৎই ঈশ্বর। তখন, নানা জনের নানা মতে, লোকের মন অস্থির হইয়া উঠিল; কোন্ মতে বিশ্বাস করিবে? কাহার পূজা করিবে? কোন্ পদার্থে ভক্তি করিবে? দেব ভক্তির জীবন নিশ্চয়তা—অনিশ্চয়তা জন্মিলে ভক্তি নষ্ট হয়। পুনঃং আন্দোলনে ভক্তিমূল ছিন্ন হইয়া গেল। অর্দ্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্ম্ম মহাশঙ্কটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণ চরিত্র প্রণীত হইল।

আচার্য্য টিণ্ডল একস্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃষ্ট কবি, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকতা এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। একব্যক্তি নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ঋগ্বেদের ঋষিগণ হইতে রাজকৃষ্ণবাবু পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দার্শনিক কবিগণ আপনা দিগকে ঈশ্বর নিরূপণে সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমদ্ভাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমণ্ডলে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে যদি কেহ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্য সিংহ ও শ্রীমদ্ভাগবতকার হইয়াছেন।

দার্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত, পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর। সাংখ্যকার, মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, আত্মা এবং জড়জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক—তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান। কথাটি অতি নিগূঢ়,—বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ। ইহা প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের শেষ সীমা। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা বহুকষ্টে এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়া ছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুঃপার্শ্বে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কথাটীর স্থূল মর্ম্ম যাহা তাহা সাংখ্যদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক্ত, স্ফাটিকপাত্রে জবা পুষ্পের প্রতিবিম্বের ন্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি।

এই সকল দুরূহ তত্ত্ব দার্শনিকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহাকেই জন সাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্ম্মে জীবন সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর, ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া,প্রকৃতি স্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি, বাল্য লীলায় তাহা দেখাইলেন; এবং তদুভয়ে যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি।

জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কৃষ্ণ চরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আর্য্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্ম্মের বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্য্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়

পরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জ্জিত চিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত্ত এবং গৃহ সুখবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্ত্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীত গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি; শব্দ ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকল গুলি বাছিয়া বাছিয়া, চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে, যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকল গুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহা গৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণ-চরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষাতপ্ত আর্য্য পাঠককে শীতল করিতেছে।

তার পর, বঙ্গদেশ যবন হস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নাম মাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবন শাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল, যে জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবন বলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ, ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাদিগের পূর্ব্বগামী,—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেব প্রণীত চিত্র খানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নূতন রঙ্ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোর বয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগ তৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম্ম লুপ্ত, বিধর্ম্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবে মাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসবিকাশের সমালোচনা উপলক্ষে বিদ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ সবিস্তারে দেখাইয়াছি; সেই সকল কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে, কেবল ইহাই বক্তব্য, যে সাময়িক প্রভেদ, এই

প্রভেদের একটি কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব কৃত ধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ের, এবং রঘুনাথ কৃত দর্শনের নবাভ্যুদয়ের পূর্ব্বসূচনা হইতেছিল; বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাভ্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি।

আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ মিত্র "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" প্রকাশ করিতেছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে কেবল বিদ্যাপতিরই কয়েকটী গীত প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কবিদিগের রচনা এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যায়, তাহাতে এত ভেল মিশান, যে খাঁটি মাল বাছিয়া লইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অক্ষয় বাবু ও সারদা বাবু উৎকৃষ্ট গীত সকল বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্যাপতির রচনা পাঠ পক্ষে সাধারণ পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই যে তাঁহার ভাষা আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে— সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়। প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনয়ন করিতেছেন। যে কার্য্যে ইঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরুতর, সুকঠিন, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইঁহারা সে কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই কৃতবিদ্য এবং অক্ষয় বাবু সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুমার্জ্জিত, এবং তিনি বিদ্যাপতির কাব্যের মর্ম্মজ্ঞ। দুরূহ শব্দ সকলের ইঁহারা যে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি। ভরসা করি, পাঠক সমাজ ইঁহাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবেন।

বিষধর।*

অনেকেই জানেন যে বিখ্যাত ডাক্তার ফেরার ভারতবর্ষীয় বিষধর সর্প সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার সহকারীদিগের অনুসন্ধানে যে সকল তত্ত্ব নিরুপিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু অনেকেই সবিশেষ অবগত নহেন। আমাদিগের ঘরে দ্বারে, পথে, মাঠে, সর্ব্বত্রই সকলেরই সর্পের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য তাহাদিগের পরিচয় কিছু কিছু জানিয়া রাখেন। এজন্য সর্ব্বশ্রেণীর পাঠ্য বঙ্গদর্শনে, আমরা সে সকল কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

সর্পাঘাতে কেহ মরিলে সচরাচর পুলিষে সম্বাদ হয়। ডাক্তার ফেরার বঙ্গীয় প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ লইয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে এক বৎসরে কত লোক সর্পাঘাতে মরে। বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি সম্বাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেবল বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, মধ্যভারত, রাজপুতানা, এব্যং ব্রিটিষ ব্রহ্ম হইতে সম্বাদ পাইয়াছিলেন। এই কয় প্রদেশে ১৮৬৯ সালে ১১, ৪১৬ জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ার সম্বাদ পুলিষে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে এই গুলির মধ্যে সকলেই যে সর্পাঘাতে মরিয়াছিল, এমত না হইতে পারে। অনেক খুন সর্পাঘাত বলিয়া পাচার হয়। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে অধিকাংশ সর্পাঘাতে মৃত্যুর সম্বাদই হয় না। যদি ইহা বলা যায়, যে কথিত কয় প্রদেশে ঐ বৎসরে বিংশতি সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যে বিপদে পাঁচ বৎসরে এক লক্ষ লোক, মরিয়া যায়, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা সামান্য বিপদ্ নহে। জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে সকল বিপদেরই প্রতিকার হইয়া থাকে; অতএব সর্পতত্ত্ব সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইলে এ বিপদেরও শান্তির সম্ভাবনা। এজন্য ভারতবর্ষে সর্পতত্ত্ব যতই সমালোচিত হয়, ততই মঙ্গল।

প্রথমে জানা কর্ত্তব্য, বিষধর সর্প কোন গুলি। যাহারা বিষধর নহে, তাহাদের দংশনে স্বভাবতঃ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাপে কামড়াইয়াছে জানিতে পারিলে, দংশক বিষধর হউক বা না হউক, ভয়েই অনেকের প্রাণ বাহির হয়। ভয়, শারীরিক ব্যাধির অত্যন্ত বৃদ্ধিকারক। যে খানে বিষে মরিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে ভয়েই

* *The Thanatophidia of India.* J. Fayrer. London. 1872.
Report on Indian and Austra lian Snake poisoning. Calcutta 1874.

অনেকেই মরিতে পারে। ইহার একটী উদাহরণ ফেরার সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

একদিবস প্রাতে হাসপাতালে গিয়া, ডাক্তার ফেরার শুনিলেন যে একটি লোক রাত্রে সর্পদষ্ট হইয়া হাসপাতালে আনীত হইয়াছে; এবং সে অত্যন্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার গিয়া দেখিলেন যে লোকটি বস্তুতঃ অত্যন্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে; তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই; এবং সে অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহার আত্মীয় স্বজন বলিল যে রাত্রে কুটীর মধ্যে প্রবেশ কালে তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছিল; তাহাতে সে বিশেষ ভীত হইয়াছিল; এবং অল্পকালেই অচেতন হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই হাসপাতালে আনীত হইয়াছিল। সকলেই বিবেচনা করিতেছিল যে সে ব্যক্তি এখনই মরিবে—উহার আর জীবনের আশা নাই। রোগীরও সেই বিশ্বাস। ডাক্তার ফেরার জিজ্ঞাসা করিলেন সাপটি কি প্রকার? রোগীর সঙ্গিবর্গ বলিল যে ধরিয়া বোতলে পুরিয়া আনিয়াছি, দেখুন। ডাক্তার দেখিয়া চিনিলেন যে উহা নির্ব্বিষজাতীয় সর্প। রোগী এবং তাহার আত্মীয়গণ প্রথমে একথা বিশ্বাস করিল না—ক্রমে বিশ্বাস করিল। তখন রোগীর শরীর হইতে শীঘ্র আপনি বিষ নামিতে লাগিল আসন্ন মৃত্যু লক্ষণ সকল ক্রমে দূর হইতে লাগিল—এবং অল্পকাল মধ্যে বিনাচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া রোগী হাসপাতাল হইতে চলিয়া গেল।

অতএব দংশক বিষধর কি না, তাহা না জানিয়া অনর্থক ভীত হওয়া অকর্ত্তব্য। ডাক্তার ফেরার বলেন, এতদ্দেশীয় সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউটিয়া, শংখচূড় (অহিরাজ), শাঁখিনী, বোড়া, কোন২ জাতীয় চিতি (Bungarus cœruleus) ইহারাই বিষধর এবং সাংঘাতিক। আরও কতকগুলি বিষধর সর্পের তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের দেশী নামের আমরা ঠিকানা করিতে পারি নাই। ফলে আমাদিগের এমন বোধ হইয়াছে যে দুই একটি সুপরিচিত বিষধরের নাম মাত্রও তিনি উল্লেখ করেন নাই। এবং ইহাও বিবেচ্য যে অনেকগুলি সর্প যাহা বিষধর বলিয়া পরিচিত, তাহা বস্তুতঃ বিষধর নহে। যেখানে মহাভারতেই তক্ষক বিষধর সর্পের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরীক্ষিতের নিধনে কবিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল, সেখানে তৎপাঠক এবং শ্রোতৃবর্গের যে তদ্রূপ অনেক ভ্রম থাকিবে তাহার বৈচিত্র কি? তক্ষক বিষধরও নহে, সর্পও নহে। আমরা এমনও দুই একটি অধ্যাপক দেখিয়াছি যে তাঁহাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে যে উচ্চিঙড়ার কামড়ে মানুষ মরে।

ডাক্তার ফেরার স্বয়ং অন্যান্য মান্য চিকিৎসক গণের সাক্ষাতে সর্প বিষ সম্বন্ধে বহু শত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এবং তাঁহার সূচনানুসারে, তিনি এতদ্দেশ পরিত্যাগ করিলেপর,

একটি কমিশ্যন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারাও বহুসংখ্যক পরীক্ষা অতি সাবধানে করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায় একটি কথা নিশ্চিতরূপে স্থির হইয়াছে, যে ভারতবর্ষীয় বিষধরের দংশনে জীবন রক্ষা করে, এমত ঔষধি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

এতদ্দেশে অনেকে অনেক পাতা লতা, মূল, বীজ, ফল, ইত্যাদিকে সর্পবিষের উৎকৃষ্ট ঔষধি বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং প্রয়োগ করিয়াও থাকেন। তন্মধ্যে অনেক গুলি পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। সকলই তুল্যরূপে নিষ্ফল হইয়াছে—বিষধরে প্রকৃত রূপে দংশন করিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

অষ্ট্রেলীয়ার বিষধরের বিষের উপর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার হালফোর্ড এই মত প্রচার করেন, যে ত্বকে ছিদ্র করিয়া রক্তমধ্যে আমোনিয়ার পিচকারী দিলে বিষধর দংশনে প্রাণ রক্ষা হয়। এদেশেও অনেকের বিশ্বাস যে আমোনিয়া সর্পদংশনে মহৌষধ। স্বয়ং ফেরার সাহেবও সর্পদংশনে আমোনিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু কমিশ্যনেরেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে আমোনিয়া উপকার করা দূরে থাকুক, বরং বিষের সহায়তা করে। এবং আমোনিয়া প্রয়োগ না করিলে যত কালে রোগীর মৃত্যু হইত, আমোনিয়া প্রয়োগ করিলে তদপেক্ষা অল্প কালেই মৃত্যু হয়।

সর্পবিষ রক্তে মিশিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পর তাহা অজ্ঞাত ঘর্ম্ম প্রস্রাবাদি ক্রিয়ায় শরীর হইতে নির্গত হইতে থাকে। ডাক্তার ফেরার এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে যতক্ষণে সমুদায় বিষ এইরূপে স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা শরীর হইতে নিঃশেষ হইয়া নির্গত হইতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে পারিলেই রোগী বাঁচিতে পারে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হয় কি প্রকারে? তৎপূর্ব্বেই যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহার এক উপায় আছে—স্বাভাবিক শ্বাসরুদ্ধ হইলেও যন্ত্রের দ্বারা শ্বাসকোষে বায়ুপ্রেরিত হইতে পারে। যদি তদুপায়ে এতাবৎ কাল জীবন রক্ষিত হয়, যে ততক্ষণে বিষ স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা নাই। এবিষয়ের পরীক্ষা জন্যই উক্ত কমিশ্যন নিযুক্ত হয়। কমিশ্যনেরা বহুতর পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে ইহাও নিষ্ফল। রোগী ইহাতে কিছুক্ষণ বাঁচে বটে কিন্তু শেষে মরে। কিছুতেই জীবন রক্ষা হয় না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে যদি বিষধরের দংশনে কোন মতেই প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না, ইহাই স্থির, তবে কখনও কখনও বাঁচিতে দেখা যায় কি প্রকারে? এই কথাটি বুঝা বড় প্রয়োজনীয় বটে।

প্রথমতঃ অনেক সময়েই দেখা যায় যে

দষ্ট ব্যক্তি সাপে কামড়াইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং অল্প-কাল মধ্যে ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিল। সকলে দেখিল হাঁ ঠিক বটে, এই ত দাঁতের দাগ—রক্তও পড়িয়াছে—পাড়ার লোকে চারিপাশে ঘেরিয়া বসিয়া অনবরত চিমটি কাটিতে আরম্ভ করিল—"বলি লাগে?" রোগীর তখন ভয়ে, লাগা না লাগা সমান—কখন বলে "লাগে" কখন বলে "লাগে না।" যদি একবার বলিল লাগে না, তবে অমনি বিজ্ঞ প্রতিবাসিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে "জাতি-সাপে কামড়াইয়াছে।" যেমন এই সিদ্ধান্ত হইল—অমনি রোগী ঢুলিয়া পড়িল। তখন ওঝাগণ দলে দলে আসিয়া ঝাড় ফুক আরম্ভ করিল—চড় চাপড়ের প্রতিধ্বনিতে বাড়ী ফাটিতে লাগিল—নয় ত কেহ কোন বিখ্যাত ঔষধি বাটিয়া কিছু রোগীকে খাওয়াইলেন, কিছু ক্ষতমুখে লেপিয়া দিলেন। রোগী আরোগ্য পাইল—চিকিৎসকের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

এস্থলে প্রথমে জিজ্ঞাস্য কামড়াইয়াছিল কিসে? সকলেরই অনুভব বিষধর সর্প, কিন্তু কেহ কি দেখিয়াছে? হয় ত, আদৌ সাপে কামড়ায় নাই—বিছা বা কোন নির্ব্বিষ জন্তু—রোগী কেবল শীতল স্পর্শে অনুভব করিয়াছিল যে সাপ, এবং সকলেই সেই কথা বিনানুসন্ধানে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। হয় ত রোগী বা অন্য কেহ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, সর্প বটে, দংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি সর্প? সেটা অন্ধকারে বড় ঠিক হয় নাই। অনুভব, যে যেখানে কামড়াইয়াছে সেখানে বিষধর হইবে, নহিলে জাঁক বাঁধে কই? কিন্তু হয় ত দংশনকারী বস্তুতঃ কোন নিরীহ নির্ব্বিষ জাতীয় ভুজঙ্গ। ভয়েই রোগী ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, চিকিৎসা না করিলেও ভাল হইত। ওঝার কপালে ছিল, তাহার জয় জয়কার রটিল।

দ্বিতীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে অনেক সময়ে বিষধরে দংশন করিলেও দংশিত ব্যক্তি রক্ষা পায়। ইহা পুনঃ২ ঘটিয়াছে; অনেকে দেখিয়াছেন যে, যে সর্প দংশন করিল, সে স্পষ্টই বিষধর জাতীয়। বরং দংশনকারী ধৃত বা হত হইয়া দগ্ধ হইয়াছে। সেস্থলে কোন সন্দেহ থাকে না, যে দংশনকারী বিষধর সর্প, অথচ দষ্ট ব্যক্তি কখন২ এমত অবস্থায় রক্ষা পায়। তাহার কারণ আছে।

বিষধর যখন দংশন করে, তখন তাহাদের বিষদন্ত শরীরমধ্যে রোপণ করিয়া বিষ ঢালিয়া দেয়। যদি কোন কারণে দংশন করিয়াও, বিষদন্ত দংশিতের মাংসে রোপণ করিতে না পারে ও বিষক্ষেপ করিতে না পারে, তবে জীবননাশের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, যে বিষধরে দংশন করিলেই বিষদন্ত মাংসে রোপিত হয় না, বা বিষ বিক্ষিপ্ত হয় না। বিষধর

গণের বিষদন্ত কখনও আপনা হইতে পড়িয়া যায়, বা কোন কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। আবার দন্ত উদ্গত হইবার পূর্ব্বে যদি কাহাকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন বিষধর দংশন করে, তবে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। "তুবড়ী ওয়ালা" দিগের অনুগ্রহে বিষদন্ত হীন বিষধরের অভাব নাই; তাহাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া অনেকে অনেক সময়ে মনে করেন, যে বিষজয়ী হইয়াছি। ইহার একটি উদাহরণ ফেরার সাহেবের গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। উদ্ধৃত করি, আমাদিগের এত স্থান নাই। কিন্তু বিষদন্ত থাকিলেও সকল সময়ে তাহা দংশিতের শরীর মধ্যে রোপিত হয় না; এমনও অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে বিষধর সর্প দংশন করিয়া রক্তপাত করিয়াছে, তথাপি বিষ ঢালিতে পারে নাই, বা ঢালে নাই। সে সকল স্থানে মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই; এবং সে সকল স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিলেও রোগী বাঁচিবে, না করিলেও বাঁচিবে।

পরীক্ষার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে সর্পবিষ রক্তমধ্যে প্রবেশ করিলেই জীবের জীবন ধ্বংস হইবে, এমত নহে। অতি অল্পপরিমাণে বিষ প্রবেশ করিলে মৃত্যু ঘটে না; কখন২ "বিষ ধরার" লক্ষণ সকলই, অল্প বিষেও জন্মে বটে, কিন্তু কখন কখন কোন বিকারই দেখা যায় না। সর্প কমিশ্যনরেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে আধগ্রেণ পরিমিত গোক্ষুরার বিষেও ছোট২ কুক্কুরগণ মরিয়াছে, কিন্তু $\frac{১}{৪}$ গ্রেন বিষে একটি বড় কুক্কুর বাঁচিয়া ছিল—আর দুইটি, ছোট বড়, মরিল। $\frac{১}{৮}$ গ্রেন বিষে একটি ছোট কুক্কুর মরিল। $\frac{১}{১০}$ গ্রেন বিষে একটি ছোট কুক্কুর মরিল—দুইটি বড় কুক্কুর বাঁচিল। $\frac{১}{১২}$ গ্রেনে তিনটি কুক্কুরই বাঁচিল। ইত্যাদি।*

বিষধরগণ দংশন কালে কাহাকেও দয়া করিয়া, অল্প বিষ ঢালে না। কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগের ভাণ্ডার খালি থাকে। যে সর্প পুনঃ২ দংশন করিয়া বিষ ব্যয় করিয়াছে, ব্যয়শৌণ্ডের ন্যায় তাহারও ভাণ্ডার খালি। যে অনেক দিন অনাহারে আছে, বা যে রুগ্ন বা নিস্তেজ, তাহারও বিষভাণ্ডার অপূর্ণ। এরূপ অবস্থাপন্ন বিষধরে দংশন করিলে প্রায়ই অল্পমাত্র বিষ দষ্টের শরীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। এ সকল স্থলে মৃত্যুর অল্প সম্ভাবনা, এবং যে ভাল হইবার, সে চিকিৎসা না করিলেও ভাল হইবে। তবে অনেকের উপর ঝাড়ফুক এবং ঔষধ প্রযুক্ত হয়, এবং স্বাভাবিক প্রতিকারের গৌরব মন্ত্র বা ঔষধের উপর বর্ত্তে।

তৃতীয়তঃ এমত আশ্চর্য্য কখন২ ঘটিয়াছে, যে তেজস্বী বিষধর সম্পূর্ণরূপে বিষ

* ডাক্তারগণ ওজন করা বিষ ত্বকে ছিদ্র করিয়া পিচকারি দিয়াছিলেন। এমত নহে যে বিষধরগণ ওজন করিয়া বিষ ঢালিয়া দংশন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

দাঁত ফুটাইয়া, রক্তপাত করিয়াছে—সুতরাং বিবেচনা করিতে হয় যে মনের সাধে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তথাপি প্রাণনাশ হয় নাই। ডাক্তার ফেরারের গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় এরূপ একটি উদাহরণ আছে (৫সংখ্যক পরীক্ষা দেখ।)

অতএব বিষধরে দংশন করিলেই যে রোগী মরিবে, ইহা নিশ্চিত নহে। অবস্থানুসারে বাঁচিতে পারে। কিন্তু যে বাঁচিবার, সে বিনা চিকিৎসাতেও বাঁচিবে—ঔষধাদিতে কোন উপকার নাই। ডাক্তার ফেরারও এক প্রকার চিকিৎসার উপদেশ দিয়াছেন, এবং তাহা ধারা বদ্ধ ও অনুবাদিত হইয়া, থানায় থানায় জারি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বকৃত এবং কমিশ্যন কৃত পরীক্ষা সকলের ফল অবগত হইয়া, সে চিকিৎসার উপকারিতার বিষয় আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। তিনি ক্ষতের উপর দৃঢ় বন্ধন করিয়া, ক্ষতমুখ পোড়াইয়া দিবার উপদেশ দেন, কিন্তু তাঁহারই কৃত পরীক্ষা সকলের দ্বারা জানা যায়, যে যেরূপ দৃঢ় বন্ধনে শরীরে বিষের প্রবেশ একেবারে নিবারিত হইতে পারে, তাহা অতি কঠিন, প্রায় অসাধ্য। তবে একটি চিকিৎসা আছে—তাহা ফলদায়ক বটে, কিন্তু ইহাদিগের আবিষ্ক্রিয়া বলিয়া স্বীকারের প্রয়োজন নাই—সার্দ্ধেক সহস্র বৎসর হইল "অঙ্গুলীবোরগক্ষতা" ইতিবাক্যে কালিদাস তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দংশন মাত্র যদি দষ্ট অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর বড় শঙ্কা নাই। কিন্তু কয়জনে তাহা পারে?

চিকিৎসা প্রণালী যেমন হউক, ফেরার সাহেবের একটি উপদেশ নিতান্ত গ্রাহ্য। যতক্ষণ ভরসা থাকে, ততক্ষণ রোগীকে ভরসা দিবে। বিষধর সর্পে দংশন করিয়াছে কি না, ইহা অনেক সময়েই অনিশ্চিত থাকে; বিষধরে দংশন করিলেও দংশন সাংঘাতিক তাহা অনিশ্চিত থাকে; যতক্ষণ এ সকল অনিশ্চিত, ততক্ষণ বাঁচিবার ভরসা আছে। কিন্তু অনেক সময়ে ভরসা হারাইয়াই, রোগী ঢুলিয়া পড়ে। সেইটি হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এতদ্দেশে প্রথা আছে, যে রোগী "ঢুলিয়া পড়িতেছে" দেখিয়া, তাহাকে চড় চাপড় মারিয়া বা চিমটি কাটিয়া, বা হাঁটাইয়া সচেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। ফেরার সাহেব বলেন যে যখন কেবল ভয়েই রোগী নির্জীব অচেতন হইয়া পড়িতেছে, তখন এ প্রথা মন্দ নহে, কিন্তু যেখানে বিষধরে কঠিন দংশন করিয়াছে, সেখানে এ প্রথার চিকিৎসায় কেবল অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। সর্পবিষে যে মৃত্যু হয়, তাহার কারণ বিষ, স্নায়বীয় বল অপহৃত করিতে থাকে। যেখানে বিষে স্নায়বীয় বল অপহৃত করিতেছে, সেখানে প্রাগুক্ত শারীরিক কার্য্য সকলের দ্বারা সেই বল অপব্যয় করা অবিধেয়। তিনি বলেন, এমত অবস্থায়, রোগী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, বা শয়ন করে, বা নিদ্রা যায়, ইহা ভাল।

বিষধর সর্প সম্বন্ধে পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত আর দুই একটি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া, আমরা ক্ষান্ত হইব।

বিষধর দংশনে সকল জীবই মরে—কাহারও রক্ষা নাই। পক্ষিগণ বড় শীঘ্র মরে। যে জীব যত ক্ষুদ্র, তাহার উপর বিষের অধিকার তত অধিক। কিন্তু সর্ব্বত্র এ কথা খাটে না—বিড়াল অপেক্ষা কুক্কুর শীঘ্র মরে। বিড়ালের পক্ষে সর্পবিষ তত তীব্রঘাতী নহে; তথাপি বিড়ালেরও রক্ষা নাই; শীঘ্র হৌক, বিলম্বে হৌক বিড়ালও মরে।

অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে, সর্পবিষে বেজির কিছু হয় না। ইহা সকলেই দেখিয়াছে, যে বিষধরে ও বেজিতে যুদ্ধ হইতেছে; সর্প, বেজিকে পুনঃ২ দংশন করিয়া রক্তপাত করিতেছে, তথাপি বেজির কিছু হইতেছে না। কিন্তু ইহার কারণ এই যে, বেজির কৌশলে হৌক, আর যে কারণেই হৌক, সেই সকল দংশনে প্রকৃতরূপে বিষ, ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করে না। পরীক্ষকেরা ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিষধরে বেজিকে প্রকৃত প্রস্তাবে দংশন করিলে, বেজিরও রক্ষা নাই।

সর্প বিষে সকল সর্পেরও রক্ষা নাই। বিষধরের দংশনে, নির্ব্বিষ সর্পগণ মরিয়া যায়। তীব্র বিষযুক্ত সর্পের দংশনে, অন্য বিষধরগণ মরিয়া যায়। গোক্ষুরা কেউটিয়ার দংশনে শাঁখিনী প্রভৃতি বাঁচে না।

কেবল যে স্বয়ং তীব্র বিষধর, সেই তীব্র বিষধরের দংশনে বাঁচিবে। গোক্ষুরা কেউটিয়া বোড়ার দংশনে গোক্ষুরা কেউটিয়া বোড়া প্রায় বাঁচে, কখন২ মরে। আপনার দংশনে কোন বিষধর মরে না। কাঁকড়া বিছা আপনাআপনি দংশন করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে।

তীব্রঘাতী বিষধরের সর্পবিষে কিছু না হউক, তাহারা অন্যান্য বিষে মরে। কার্ব্বোলিক আসিডে, ইহাদিগের শীঘ্র মৃত্যু হয়।

ডাক্তার ফেরার বলেন, যে, পরীক্ষা কালে তিনি দেখিয়াছেন যে, গোক্ষুরা কেউটিয়া প্রভৃতি সর্প সহজে দংশন করিতে চাহে না। বোধ হয় বঙ্গদেশীয় সর্প, সাহেব দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। নহিলে কেউটিয়া যে "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ" সার করিয়া বসিয়া আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

ভাই ভাই।

(সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া)

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবার,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার,
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার,
ভাই ভাই সবে, কাঁদরে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর,
এক শোকে বয়, নয়নের নীর,
এক অপমানে সবে নত শির,
এক শিকলেতে বাঁধা সবাই ॥

২

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছিছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।
কোমল করেতে ধর কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল সমীর, কোমল যামিনী
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ।

৩

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার!
"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষাদাও! ভিক্ষা দাও!" সার
দেহি দেহি দেহি বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য, রাখ তবু প্রাণ,
ছি ছি ছি ছি ছি ছি! ছি! ছি! ছি!

৪

কার উপকার করেছ সংসারে?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয়?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল?
কোন্ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
অরণ্য, অরণ্য, অরণ্যময় ॥

৫

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট?
কে খুলিল আজি মনের কপাট?
পড়াইব আজি এ দুঃখের পাঠ,
শুন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নামে,
যুরোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি বলে,
শুন ছিছি রব, হিমালয় তলে,
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে,
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে ॥

৬

কি কাজ বহিয়া এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে?
চল সবে মরি পশিয়া জলে।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাশরি,
লুকাই এ নাম, সাগর তলে ॥

৭

নহে উঠ সবে মহা ঘোর রবে
ভাই ভাই রবে, ভাই ভাই সবে
মুছ এ কলঙ্ক, পুরাও এ ভবে
বাঙ্গালির যশে, বাঙ্গালি নামে
য়ুরোপে মার্কিনে যেন ধন্য বলে,
যেন ধন্য বলে, হিমালয় তলে,
সমুদ্রের জলে, মণ্ডলে মণ্ডলে,
স্বদেশে বিদেশে নগরে গ্রামে॥

৮

স্বদেশে বিদেশে নগরে বা গ্রামে
জয় জয় বল বাঙ্গালির নামে
গাও জয় গীত বঙ্গ মহাধামে
জয় জয় জয় বঙ্গের জয়।
যেখানেতে ধর্ম্ম জয় সেই খানে,
যেখানেতে ঐক্য জয় সেই খানে,
মিল ভ্রাতৃভাবে বঙ্গের সন্তানে,
বল জয় জয়, বঙ্গের জয়॥

কমলাকান্তের দপ্তর।

বিড়াল।

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জলিতেছিল—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছিল। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিত লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম, যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটর্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম, যে ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ, অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া, ভাল করিয়া দেখিলাম, যে ওয়েলিংটন নহে। একটী ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জার সুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এজগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে, বলিতেছিলেন "মেও।" বলিতে পারি না,

বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জ্জার মনে২ হাসিয়া, আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায়ও ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে, যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতি মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া, যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া, হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম, যে বিড়াল বলিতেছে "মার পিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এসংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয় এত দিনে একথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরমধর্ম্মের ফলভাগী। আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার

প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়!

"দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি! খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাহারা বড়২ সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোরের অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরীর মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে, মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটা খানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কিপ্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর,—ছি! ছি!

"দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটা খানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতীভার্য্যার সহোদর, বংশজের নিকট কুলীন জামাতা, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং

তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গূল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।' আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না, যে ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া, একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম, যে "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, যে "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দেও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিনদিবস উপবাস করি-

বেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি সচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিনদিন উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নশীবাবুর ভাণ্ডার ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞলোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীর ভাবে উপদেশ প্রদানারম্ভ করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম, যে "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এসকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর; প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষা ভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল "আফিঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্ত পাদ্রির বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মহিষমর্দ্দিনী।

১

মৃদুল মৃদুল মধুর নিক্বণে
বাজিছে বাজনা শৈলেশভবনে;
নাচিছে নর্ত্তকী, ঢালিয়া সঘনে
তান মান লয়ে গীতের ধারা;
বিকচ-কমল-মালিকা-রঞ্জিত
হাসে গিরিপুর গন্ধে আমোদিত;
সকলেরি চিত পুলকে পুরিত,
উদিত নগেন্দ্র নয়নতারা।

২

সিংহপৃষ্ঠে কন্যা মহিষমর্দ্দিনী,
দশভুজা গৌরী বিশ্ববিনোদিনী,
শরতে উষায় উজলি মেদিনী,
উদিতা পার্ব্বতী পর্ব্বত ধামে;
বেড়ি চারিদিকে করে স্তুতিধ্বনি,
গম্ভীর সঙ্গীতে পূরিয়া ধরণী,
উল্লাসে বসিয়া, উৎসাহে ভাসিয়া,
হৃদয় ভরিয়া, ভকত দামে।

৩

"কে জানে তোমার অপার মহিমা?
কে কবে তোমার শকতির সীমা?
সর্ব্বভূতে তুমি শক্তি স্বরূপিণী,
তব লীলা খেলা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী,
তোমাতে জগৎ জীবিত রয়।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড খরতর কর,
প্রবল প্রতাপ বায়ু ভয়ঙ্কর,
তরঙ্গসঙ্কুল সাগর ভীষণ,
দিগ্দগ্ধকারী ক্রুদ্ধ হুতাশন,
তব বল বিনা কিছুই নয়।

৪

"রবি শশী তারা অনল ঊষার
আলোকে নিয়ত প্রকাশ তোমার;
কস্তুরী কুসুম সৌরভ সকল
বিস্তারে জগতে তব পরিমাণ,
মৃদুল মলয়ানিল হিল্লোলে;
বিহঙ্গ কূজনে, বীণা যন্ত্রতারে,
দেবনর কণ্ঠে, খেলে অনিবারে
তোমার মধুর স্তবের লহরী;
কাননবল্লরী, নর্ত্তকী, সুন্দরী,
তোমার লাবণ্যে আনন্দে দোলে।

৫

"দশদিকে দশ কর প্রসারিয়া
সকল ব্রহ্মাণ্ড রেখেছ ধরিয়া,
সকলে রক্ষিছ, সকলে পালিছ,
সকল প্রদেশে করুণা ঢালিছ,
সঙ্কটহারিণী, ত্রিলোকতারিণী,
বরাভয়দাত্রী, দুর্গতিনাশিনী,
জগদ্ধাত্রী তুমি, জগতজননী,
তোমার প্রসাদে বিপদে জয়।

৬

"তুমি যার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর,
লক্ষ্মী সরস্বতী আসিয়া সত্বর
বিরাজেন সুখে তাহার আলয়ে;
দেবসিদ্ধি দাতা প্রফুল্ল হৃদয়ে
করেন সফল মানস তার;
সুরসেনাপতি সাজান তাহারে
বিপত্তি বিজয় সাহসের হারে;
দূরে যায় তার দুঃখের ভার।

৭

"বিপুলবিক্রম হর্য্যক্ষ বাহনে
যবে মা যেথানে উর হৃষ্টমনে,
আরণ্য মহিষ সম ভয়ঙ্কর
সুখ সংহারক সঙ্কট নিকর
তোমার প্রতাপে বিনয় পায়;
যথা ঊষাদেবী হরি আরোহণে
উঠিলে সতেজে পূরব গগনে,
সৌন্দর্য্য বিলোপী চেতনা বিনাশী
ভয়প্রদ নৈশ অন্ধকার রাশি
ভীষণ শমন সদনে যায়।

৮

"দুর্জ্জয়দানবে যবে দেবদলে
মহেশের বরে মহোল্লাসে দলে,
সর্ব্বদেবতার তেজ সম্মিলনে
মূর্ত্তিমতী তোমা দেখিয়া নয়নে
বিস্ময়ে সহসা দৈত্যারিগণ;
রূপের আলোকে জগত ভাতিল,
মস্তক উঠিয়া আকাশে ঠেকিল,
রবি শশী বহ্নি সমান উজ্জ্বল
তিনটী নয়ন করে ঝলমল,
ফুটে পদতলে কমল বন।

৯

"নিজ অস্ত্রদিয়া দেবতা সকলে
পূজিল তোমার চরণ কমলে;
হুঙ্কারি মা তুমি সংগ্রামে পশিলে,
দেবের বিপক্ষ দানবে নাশিলে,
অট্ট অট্ট হাসে পূরি আকাশ;
বৃন্দারক বৃন্দ আনন্দে মাতিল,
অমরের জয় বাজনা বাজিল,
বিদ্যাধরী গীতে গগন ছাইল,
তব পদে নতি করিতে ধাইল
দেব দেবী যত করি উল্লাস।

১০

"প্রকৃতিরূপিণী তুমি হৈমবতী,
সকলের অঙ্গে তোমার শকতি,
কিবা জীবোদ্ভিদ, কি দেব মানব,
জগতে তোমার অবতার সব,
সকলের তুমি চরম গতি।
ভকতি যাহার আছে তব পদে
নিয়ত তাহারে তার মা বিপদে;
সারদে, বরদে, সুখদে, শুভদে,
থাকে যেন রাঙ্গা চরণে মতি।

১১

"তুমি আদ্যাশক্তি জ্যোতিঃস্বরূপিণী,
কৌশলপ্লাবিত বিশ্বপ্রকাশিনী,
অব্যক্ত অসীম তিমির ভাঙ্গিয়া,
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত করি দিয়া,
প্রকাশ করেছ লীলা তোমার।
কি জন্য করেছ কে বলিতে পারে?
আমরা সকলে ঘুরি অন্ধকারে;
যখন যা কিছু বুঝিবারে চাই,
কূলস্থল তার দেখিতে না পাই;
খুলিদাও দেবি জ্ঞানের দ্বার।"

সংগীত সমালোচনা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রাচীন মতে স্বর গ্রামকে শ্রুতিনামে যে২২টী ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা যায়, সেই বিভাগ কি প্রকার, তাহা "সংগীত সার" গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায়, ওশেষে অতিরিক্ত পত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়াছে, এবং প্রাচীন মতের সহিতও ঐক্য হয় নাই। গ্রামের ষড়্জাদি সপ্তস্বরও যে ঐ ২২ টীর সাতটি শ্রুতি, গ্রন্থলেখকের তাহা অনুধাবন হয় নাই। এতদ্দেশীয় সংগীত বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণের প্রায়ই একরূপ স্বভাব দেখা যায়, যে, তাঁহারা সংগীত বিষয়ে একবার যাহা বলিয়া ফেলেন, তাহা স্পষ্ট ভ্রমপূর্ণ হইলেও, তাহা স্বীকার করেন না। প্রত্যুতঃ তাহাই বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। শ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত মত যিনি একবার লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমার ন্যায় একজন সামান্য লোকের কথাতেই, তাঁহার ঐ মত সহসা পরিবর্ত্তন নাও করিতে পারেন,

এবং ঐ মতই যে অভ্রান্ত, ইহা বজায় করিবার নিমিত্ত অনেক তর্কও উপস্থিত করিতে পারেন। অতএব উহা খণ্ডনার্থ আমি যুক্তি ওশাস্ত্রপ্রমাণ উভয়ই দিতেছি। তিনি ঐ শ্রুতি বিষয়ক প্রাচীন শাস্ত্রীয় শ্লোক সমূহের স্বরূপার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নার্থ করিয়াই ঐ গোল বাধাইয়াছেন।

"চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুত-
য়ো মতাঃ।
ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারে-
নিষাদকে ॥"

গ্রন্থকার বলেন সংগীত রত্নাকর নামক গ্রন্থে ঐরূপ লিখা আছে। কিন্তু ঐবচনের এইরূপ অর্থ হয়, যে ষড়্জ ও ঋষভের মধ্যে চারি শ্রুতি, ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে তিন, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে দুই শ্রুতি ইত্যাদি? কখনই নহে, উহার প্রকৃত অর্থ এই ষড়্জস্থানে চারি শ্রুতি ঋষভ স্থানে তিন, গান্ধার স্থানে দুই ইত্যাদি। অর্থাৎ গ্রামকে যে প্রধান সাত ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহাদের কোন্ কোন্‌টিতে শ্রুতি নামক ২২ সূক্ষ্মতম বিভাগের কতটি পড়ে, অথবা ঐ সাত ভাগের এক একটি আরও কিরূপ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হয়, তাহাই ঐ শ্লোকে বর্ণিত আছে। গ্রামের প্রথম শ্রুতিতে যে ধ্বনি, সেই ষড়্জ; তাহার পর ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ, শ্রুতি ক্রমে অল্প অল্প উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে ৫ম শ্রুতি সেইটী ঋষভ; তৎপরে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রুতি পরপর উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে অষ্টম শ্রুতি, সেই গান্ধার; তৎপরে ৯ম শ্রুতি একটু উচ্চ, তাহার পর একটু উচ্চ যে দশম শ্রুতি সেইটি মধ্যম, ইত্যাদি। পাঠক! এইরূপে বিভাগ করিয়া দেখুন, ২২ শ্রুতি মিলে কি না। সংগীত সার গ্রন্থে যেরূপ শ্রুতি বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহাতে ২২+৭এ ২৯টী সূক্ষ্ম বিভাগ পাইবেন।

"চতুঃশ্রুতি স্ত্রিশ্রুতিশ্চ, দ্বিশ্রুতিশ্চ
চতুঃশ্রুতিঃ।
চতুঃশ্রুতিস্ত্রিশ্রুতিশ্চ, দ্বিশ্রুতিশ্চেতি
তাঃ ক্রমাৎ ॥

গ্রন্থকার "সংগীত রত্নাবলী" হইতে ঐ শ্লোকের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমি যেরূপ শ্রুতির বিভাগ দেখাইলাম, তাহাতেই আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, গ্রামের সাতটি প্রধান বিভাগ ঐ প্রকারে আরও বিভক্ত হইয়া, সাকল্যে গ্রামের ২২টি সূক্ষ্ম বিভাগ হয়। ঐ ২২টী বিভাগ পরস্পর সমান না হউক, সমানের অনেক নিকট। কিন্তু সমালোচিত গ্রন্থে যেরূপ বিভাগ দেখান হইয়াছে, তাহা অতিশয় অসমান। তদনুসারে ১ম শ্রুতি হইতে ২য় শ্রুতি, ২য় হইতে ৩য়, কিম্বা ৩য় হইতে ৪র্থ শ্রুতি যতদূর, চতুর্থ হইতে পঞ্চম শ্রুতির দূরতা তাহার দ্বিগুণেরও অধিক। প্রত্যেক স্বরের নিকট শ্রুতির অন্তর ঐরূপ বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রুতিগুলি মধ্যে মধ্যে ঐরূপ লাফাইয়া যে প্রায় সমভাবে একটির পর একটি চড়িয়া যায়, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক তাহার প্রমাণ; যথা—

এতেতু ধ্বনিভেদাঃ স্যুঃ শ্রবণাৎ শ্রুতি
সংজ্ঞিতাঃ।
উচ্চোচ্চ ভাবমাপন্না দ্বিগুণাদুত্তরোত্তরং॥
সংগীত রত্নাবলী।

সাতটি প্রধান স্বরও অর্থাৎ সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি ইহারাও যে ২২শ্রুতির মধ্যে সাতটী শ্রুতি, ইহাই যে প্রাচীন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত, উক্তবচনের প্রথম পংক্তিতে তাহা অতিশয় স্পষ্ট রহিয়াছে। আরও এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। "ততঃ সপ্তদ্বয়া শুদ্ধা বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী" সংগীত দর্পণের ঐ বচনটীর অর্থ যদি এই হয়, যে গ্রামের মধ্যে সাতটী শুদ্ধ (স্বাভাবিক) স্বর আছে, এবং বারটী বিকৃত অর্থাৎ অচল-স্বারিক (*Chromatic*) স্বর আছে। তাহা হইলে ঐ বারটী বিকৃত স্বরের মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি শুদ্ধ স্বরও আছে কি না? অবশ্যই আছে। আরও এক প্রমাণ দিই। প্রস্তাবিত গ্রন্থেরই ২পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যেমন আকাশে পক্ষী উড়িয়া যাইলে, এবং জলে মৎস্য গমন করিলে, সেই সঞ্চরণমার্গের কোন দাগ পড়ে না, তদ্রূপ শ্রুতিগুলি ধ্বনিত হইলে শুনা যায় মাত্র, তাহার কোন দাগ পড়ে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, শ্রুতিরই কি কেবল ঐ প্রকৃতি? অন্য ধ্বনির কি তাহা নাই? সা, রি, গ, ম, প্রভৃতি সাতটি প্রধান স্বরের কেহ ধ্বনিত হইলে, তাহার কি কোন দাগ পড়ে, যে তজ্জন্য তাহা শ্রুতি হইতে ভিন্ন হইবে? কখনই নহে। ধ্বনি মাত্রেরই শ্রুতি ব্যতীত কোনই চিহ্ন লক্ষিত হয় না। নিম্নোদ্ধৃত বচনটী দেখুন, তাহাতে ঐ বিষয় কেমন স্পষ্ট রহিয়াছে,—

"এতেতু ধ্বনিভেদাঃ স্যুঃ শ্রবণাৎ
শ্রুতিসংজ্ঞিতাঃ।"

অর্থাৎ কেবল শুনাই যায়, এই হেতু বিভিন্ন ধ্বনির শ্রুতিসংজ্ঞা হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে, পাঠকও বোধ হয় জানেন, যে, বিপক্ষ পক্ষের নিরাশার্থ কলিকাতাস্থ বঙ্গসংগীত বিদ্যালয় সংক্রান্ত সংগীতাধ্যাপক দিগের শ্রুতির তর্কই মহাবলস্বরূপ। কিন্তু দেখুন, তাঁহাদের মূলেই শ্রুতির সংস্কারেই কেমন মহা ভ্রম রহিয়াছে। প্রস্তাবিত গ্রন্থের কর্ত্তারা বলিতে পারেন যে, তাঁহারা শ্রুতিসম্বন্ধীয় শ্লোক সমূহের যে রূপ অর্থ করিয়াছেন, ব্যাকরণের কোন্ সূত্রদ্বারা সেই অর্থের ভুল প্রমাণ হইল? প্রতিবাদ করিবার তাঁহাদিগের এই এক উত্তম পন্থা রহিয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণের তর্ক করিতে আমার শক্তি নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কল্পতরুস্বরূপ, যে যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। শুনিয়াছি, অনেক বড় বড় বৈয়াকরণিক সংগীত সারের সহায় আছেন, অতএব ব্যাকরণ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিলে, এখনই তর্কের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। এই গ্রন্থের পদে পদে সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশেরই এরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা

গ্রন্থকর্ত্তাদিগের স্বকপোলকল্পিত মতের আশানুরূপ পরিপোষণ হয়। ক্রমে আরও দৃষ্টান্ত দেখাইব। শ্রুতিসম্বন্ধে অনেকানেক গুরুতর আবশ্যকীয় কথা বলিতে এখন বাকি রহিল, রাগ রাগিণীর সমালোচনায়, তাহা আবার উত্থাপন করিয়া শেষ করিব।

সংগীতসার গ্রন্থের ৮ পৃঃ সপ্তক প্রকরণে দেখিবেন লিখা আছে, "মনুষ্য দেহে স্বাভাবিক তিন সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না;" "ঐ তিন সপ্তকের তিনটী আশ্রয় স্থল আছে, নাভি, বক্ষঃ, এবং মস্তক;" "নাভি হইতে যে সপ্তস্বর উচ্চারিত হয় তাহাকে উদারা বলা যায়, অর্থাৎ খাদ স্বর সমূহ।" এই একটি বৃহৎ প্রাচীন ভ্রম। নাভি হইতে কি কখন কণ্ঠস্বর নির্গত হয়? উদরাময়ের পীড়া হইলে নাভির নিকট গড় গড় শব্দ শুনা যায়, এতদ্ভিন্ন সাংগীতিক ধ্বনি উৎপাদনের কোন কল বল নাভির মধ্যে নাই। অতিশয় খাদ অর্থাৎ গম্ভীর স্বর উচ্চারণ কালীন, একটি যে ঘর ঘর শব্দ শুনা যায়, লোকে তাহার যথার্থ কারণ না পাইয়া, বলে যে, ঐ শব্দ নাভির। এই কুসংস্কার অজ্ঞতার ফল। প্রাচীন শাস্ত্রে ঐমত লিখা আছে বলিয়া, এপর্য্যন্ত কেহ তাহার দোষাদোষের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। ঐটী পদার্থতত্ত্বের প্রসঙ্গ। আধুনিক শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত গ্রন্থদ্বারা উহারমীমাংসা হইবে না। খাদ মধ্য উচ্চ, সকল স্বরই কণ্ঠহইতে উৎপন্ন হয়। গলদেশে অন্ননলী (Esophagus) ও শ্বাস নলী (Trachea) নামক দুইটী নলী আছে। অন্ননলী দিয়া খাদ্য উদরস্থ হয়, এবং শ্বাসনলী দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, ও স্বর নির্গত হয়। ঐ শ্বাসনলীর উপরিভাগেই ধ্বনির জন্ম, সেই স্থানের নাম কণ্ঠ (Larynx)। স্থিতিস্থাপক হেতু শ্বাস নলীকে ফুলান ও কুঞ্চিত করা যায়। ফুলাইলে ছিদ্র বৃহৎ হয়, তখন আওআজ দিলে, তাহা হইতে গম্ভীর স্বর নির্গত হয়। কুঞ্চিত করিলে ছিদ্র সূক্ষ্ম হয়, সুতরাং তখন তাহা হইতে তীক্ষ্ণ স্বর বাহির হয়। নাভি হইতে যে খাদ স্বর নির্গত হয় না, তাহা পরীক্ষার্থ এক শাদা সিধা উপায় বলিয়া দিই। খাদ স্বর উচ্চারণ কালীন নাভিস্থলে হাত দিয়া সবলে ধরিয়া দেখিবেন, খাদ স্বর বন্ধ হইয়া যায় কি না। ধ্বন্যুৎপাদক পদার্থের বিকৃতি জন্মাইলে, কখনই পূর্ব্বমত স্বাভাবিক স্বর উৎপন্ন হয় না।

প্রস্তাবিত গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় "স্বরগ্রাম" শব্দের চমৎকার অর্থ দেখিবেন। লিখা আছে "যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঋষভাদি ষট্ স্বরের বোধ হয় তাহাকে স্বর গ্রাম কহে।" যাহার অবলম্বনে রি, গম প্রভৃতি বুঝা যায়, তাহাকে খরজ (ষড়্জ) কহে। গ্রাম কি প্রকারে হইল? এক খরজ হইতে অন্য উচ্চ কিম্বা নিম্ন খরজ পর্য্যন্ত স্বরের যে বিস্তৃতি, তাহাকেই "স্বরগ্রাম" কহে। শাদা কথায় সাত

স্বরের সমষ্টিকেও গ্রাম কহা যায়। গ্রন্থকার এক খরজ হইতে অন্য অব্যবহিত উচ্চ বা নিম্ন খরজ পর্য্যন্ত গ্রাম বলিতে চাহেন না। তাঁহার মতে সা হইতে নি পর্য্যন্তই একটি পূর্ণগ্রাম হয়, ইহা তিনি ৮৫ পৃষ্ঠার টীকায় প্রকাশ করিয়া এক বৃহৎ তর্ক করিয়াছেন, টীকাকার বলেন যে, সংগীতে যখন সাত স্বরের অধিক নাই, তখন আটস্বর পরিমিত যে দুই খরজ তাহা এক গ্রামের ভিতর ধরা হইতে পারে না; অষ্টম স্বরটী অন্যগ্রামের, সুতরাং এক সপ্তকেই এক পূর্ণ স্বরগ্রাম হয়। এইরূপ কহিয়া ইউরোপীয়েরা যে 'অক্টেভ' শব্দ গ্রামের তুল্যার্থে ব্যবহার করেন, তাহারও দোষ ধরিয়াছেন; এবং তাহার প্রমাণার্থ বলেন যে, অক্টেভ শব্দের অর্থ আট, অতএব এক অক্টেভ পরিমিত স্বর বলিলে সা রি গ ম প ধ নি সা বুঝায়, কিন্তু দুই অক্টেভ বলিলে ইউরোপীয়েরা ১৬টী স্বর না লইয়া কেন যে এক সা হইতে তাহার দ্বিতীয় উচ্চ সা পর্য্যন্ত ১৫টী স্বর গ্রহণ করেন, ইহার কোন কারণই নাই। এইরূপ যে কূট তর্ক করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মহা ভ্রম রহিয়াছে। অক্টেভ শব্দের অর্থে অষ্টম, আট নহে। ইহা না জানাতেই, ঐ ফল হইয়াছে। সা—এর অষ্টম সা, রি—এর অষ্টম রি, গ—এর অষ্টম গ, এইরূপই হইয়া থাকে, অতএব সা—এর দুই অষ্টম উচ্চ যে স্বর সেও সা; সে আর রি হইতে পারে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত প্রথা ইউরোপে যে অকারণে চলিতেছে, তাহার প্রমাণার্থ টীকাকার বার্নি, টার্টিনি, মার্কস প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সংগীত গ্রন্থকারের নাম লইয়াছেন। ইহাতে সাধারণকে ঘোর প্রতারণা করা হইয়াছে। ঐ সকল লোকের কৃত গ্রন্থ সমূহ অতি বিস্তীর্ণ, প্রাচীন, ও বহুমূল্য; তাহা অন্য কোন বাঙ্গালির গৃহে আছে কি না, সন্দেহ; থাকিলেও ইউরোপীয় সংগীতের পুস্তক কে পড়িবে? তৎসম্বন্ধে যাহা লেখা যাইবে, তাহার সত্যাসত্য সহসা ধরা পড়িবে না, হয় এই অনুমানে এত অলীক লিখিতে সাহস হইয়া থাকিবে; না হয়, ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। যে সে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না। বিশেষ ঐ সকল গ্রন্থ অতিশয় বৈজ্ঞানিক। টীকাকার ইহাও লিখিয়াছেন ইউরোপীয় সংগীতাধ্যাপক মার্কস সাহেব সাত স্বরেই এক পূর্ণ স্বর গ্রাম বলেন। কিন্তু তাঁহার কৃত "Universal school of music" নামক গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠার ও ১২ পৃষ্ঠার চতুর্থ প্যারেগ্রাফে যাহা লিখা আছে যদি কেহ তাহা দেখেন, তবে সত্য মিথ্যা জানিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থের ১২পৃঃ ৪ প্যারাতে লিখা আছে, সাত ডিগরিতে এক গ্রাম হয়। এই ডিগরির (*Degree*) অর্থ টীকাকার বোধ হয় বুঝেন নাই। তিনি সাত ডিগরির অর্থ সাত স্বর বুঝিয়াছেন,

তজ্জন্যই ঐ প্রমাদ ঘটিয়াছে। ডিগরির অর্থ পরিমাণ বিশেষ। সংগীতে সেই পরিমাণকে ধাপ, ঘাট, বা পর্দ্দা কহা যায়। মার্কস সাহেব ইহাই কহিয়াছেন যে, কোন স্বর হইতে সাত ধাপ উঠিলে এক গ্রাম পূর্ণ হয়। কেবল কোন একটী স্বর ধরুন; যেন সা, উচ্চারণ করিলে এক ডিগরি উঠা হয় না। সা—এর পর রি বলিলে এক ডিগরি উঠা হয়, গ উচ্চারণ করিলে দুই ডিগরি, ম তিন ডিগরি ইত্যাদি, এই প্রকার সাত ডিগরি উঠিলে অষ্টম স্বর ২য়, সা পর্য্যন্ত উঠা হয় কি না, পাঠক দেখুন। সপ্তক শব্দের অর্থ যদি এরূপ হইত যে, অষ্টম স্বর ২য় সা—এর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্বরের সমষ্টিকে সপ্তক কহে, তাহা হইলে এক সপ্তকেই এক গ্রাম হইত। কিন্তু সপ্তক বলিলে সা হইতে নি পর্য্যন্ত বুঝায়। নি স্বর গ্রামের শেষ সীমা হইতে পারে না, কারণ তাহা সা—এর অব্যবহিত নীচে নহে। মধ্যে কোন প্রধান স্বর ব্যবধান না থাক, দুই একটী শ্রুতিও আছে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, সা হইতে রি—এর কিম্বা রি হইতে গ—এর কিম্বা গ হইতে ম—এর যেমন এক একটা অন্তর ব্যবধান আছে, অর্থাৎ সা হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উঠিলে, তবে রি পাওয়া যায়, সেই রূপ নি হইতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চড়িলে অষ্টমস্বর, উচ্চ সা পাওয়া যায়। অতএব কাহাকেও এক গ্রাম স্বর উচ্চারণ করিতে কহিলে, সে যদি সা—এ আরম্ভ করিয়া নি—এ শেষ করে, তাহা হইলে নি হইতে উচ্চ সা—এর যে কত খানি ব্যবধান তাহা সে দেখাইল কই? আর ঐ কার্য্যটী কোন্ গ্রামের অধীন? সা হইতে আরম্ভ করিয়া নি—এ সমাপ্ত করিলে মনে একটু অপেক্ষা থাকিয়া যায় কিন্তু উচ্চ সা—এ শেষ করিলে কেমন যেন বিশ্রাম পাওয়া যায়, ইহা কে না স্বীকার করিবে? অতএব প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে সপ্তক শব্দই যে গ্রাম শব্দের তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা অতি অসঙ্গত। ঐ ভ্রমের বশে গ্রন্থকার গ্রাম সাধনের উদাহরণ সমূহে সা হইতে নি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। কণ্ঠে এইরূপ সাধনে ছাত্রেরা অনর্থক ক্লেশ পাইবে সন্দেহ নাই। মনে করুন, এক বালককে স্বর গ্রাম শিখ বলিয়া অনুলোমে সা হইতে নি পর্য্যন্ত উঠিতে এবং বিলোমে নি হইতে সা—এ নামিতে শিখাইলাম। সে নি হইতে উচ্চ সা—এ আপনি উঠিতে পারিবে? কখনই নহে, কারণ নি হইতে কতখানি চড়িলে উচ্চ সা হয় তাহা তাহাকে দেখান হয় নাই। সেটী নূতন করিয়া দেখাইলে, সে সাধন প্রথম গ্রামের না দ্বিতীয় গ্রামের? কোন স্বর হইতে তাহার অষ্টম স্বর পর্য্যন্ত গ্রাম সাধাইলে কোন গোলই থাকে না। এই রূপ নিয়মে এক গ্রাম শিখাইলে অসংখ্য গ্রাম শিক্ষার কার্য্য হয়। আর এইরূপ সাধ-

নাই সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার কাহার পরামর্শে ইউরোপীয় সংগীতের উপর ঠেস দিয়া গায়ের জোরে সা হইতে নি পর্য্যন্ত গ্রাম সাধাইতে চাহেন? কারণ সংস্কৃত গ্রন্থে ইউরোপীয় 'অক্টেভ' শব্দের তুল্যার্থ শব্দ নাই।

৮ পৃষ্ঠার নীচে এরূপ লিখা আছে, যে আড়াই সপ্তক পাইবার নিমিত্ত বীণাদি যন্ত্রের নায়কী অর্থাৎ ১ম তারকে মধ্যম স্বরে বাঁধা যায়,। প—এ বাঁধিলে, আড়াই সপ্তকের অধিক হয়, এবং গ—এ বাঁধিলে তাহার কম হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আড়াই সপ্তকই যে পাইতে হইবে ইহার কারণ কি? আমাদের সংগীতে আড়াই সপ্তকেরই প্রয়োজন। এই গ্রন্থেই লেখা আছে যে, হিন্দু সংগীতে তিন সপ্তক পরিমিত স্বর ব্যবহৃত হয়, অতএব আড়াই সপ্তক পাইবার নিমিত্তই যে নায়কী তারকে ম—স্বরে বাঁধা যায়, তাহা নয়। তারের সংকর্ষণ (*Tlnsion*) সহ্য করিবার শক্তি বিবেচনাতেই ম—স্বরে বাঁধার প্রথা হইয়াছে। প—এ বাঁধিয়া বাজাইলে কখন তার রক্ষা হয় না, ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাই যথার্থ কারণ। নতুবা আড়াই সপ্তকের অধিক প্রাপ্তিতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যদি বল, কিছু নামাইয়া বাঁধিলে তার ছিড়িবে না, কিন্তু তাহাতে তারের সংকর্ষণ ঢিল হওয়াতে তার ভৎভৎ করে, ধ্বনি উত্তম শুনায় না। যদি বল মিহি তার ব্যবহার করিলে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও, ধ্বনি অতি ক্ষীণ হইয়া ভাল শুনায় না।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

(এই প্রবন্ধটি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি, ইহার প্রথমাংশ হারাইয়া ফেলিয়াছি, বিবেচনায়, ইহা এপর্য্যন্ত পত্রস্থ করি নাই। ইহা অন্য কোন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহাও জানি না। লেখককৃত বিচার, ভাল কি মন্দ তাহাও জানি না, কেন না বিচার্য্য বিষয়ে সম্পাদক সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে একস্থানের ভাষা রূঢ় বলিয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে।) বং সং

নানা কথা।

আধুনিক ভারতবর্ষে, যিনি কায়ক্লেশে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সমাপ্ত করিতে পারিলেন, তিনি শ্রমশীলতার আদর্শস্বরূপ সমাজে পরিচিত হইয়া উঠেন। অথচ, স্কট, সৌদি প্রভৃতি ইংরেজি লেখকেরা কত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। জেম্‌স একা প্রায় আশী খানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুই এক জন নাটককারের কথার উল্লেখ করিব—তাহা আরও বিস্ময়-

জনক। হেউড নামক ইংরাজি নাটককার দুই শত কুড়ি খানা নাটক স্বয়ং বা অন্যের সাহায্যে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হার্দি নামক ফরাসীর তুলনায় হেউডও অলসের মধ্যে গণ্য। তিনি ৩৭ বৎসরের মধ্যে আট শত নাটক প্রণয়ন করেন! বৎসরে প্রায় বাইশ খানি!

এদিকে ভারতবর্ষে হাহাকার পড়িয়াছে যে, বিজ্ঞানের সমাদর নাই; কাব্যেই লোকের মন নিবিষ্ট। ও দিকে বিলাতে হাহাকার পড়িয়াছে যে, বিলাতে কাব্যের সমাদর নাই—বিজ্ঞানেরই বড় আদর। কাব্যালোচনা, মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা মিল প্রভৃতির নিকট অনেক শুনা গিয়াছে। এক্ষণে কাব্যে আদরাভাবের একটী নূতন কুফল কোন প্রবন্ধ বিশেষ ফেজরে দেখা গেল। পার্লিমেণ্টের বাগ্মিগণের বর্ণনা কালে লেখক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে এক্ষণে যে উচ্চশ্রেণীর কবি কেহ নাই, তাহার কারণ ইংলণ্ডে কাব্যের অনুশীলন সেরূপ নাই। যদি কেহ বলেন যে, ইংলণ্ডে যে এখন পূর্ব্বের মত বীরত্ব নাই, তাহারও কারণ কাব্যে অল্পাদর, আমরা সে কথাও অসঙ্গত মনে করিব না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ দেশে একদল নব্য মূর্খ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে ক্ষণিক মনোরঞ্জন ভিন্ন, কাব্যে আর কোন উপকার নাই, এবং বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা অনুশীলনের যোগ্য নহে। যদি এই মূর্খদিগের বিজ্ঞানে কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অধিক আদর কর্ত্তব্য বটে, কেননা বিজ্ঞান কিছুই নাই, কাব্যের তাদৃশ অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, কাব্যে হতাদর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আর বাঙ্গালি কাব্যকারদিগের জ্বালায় কাব্য সকলেরই অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও স্বীকার করি।

গত ডিসেম্বর মাসের মুখুর্য্যার পত্রে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে বিঘ্ন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন? যিনি পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহাকে পাঠ করিতে বলি। লেখকের সঙ্গে বাঙ্গালির অনেক স্থানে মতভেদের সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা হইলেও প্রস্তাবটিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে না কেন, তদ্বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু আমরা বলি, একটা কথা বলিলেই, যথোচিত হয়। ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের এক মাত্র বিঘ্ন—"হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।" খ্রীষ্টধর্ম্মে এমন কি আছে যে তাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই? তবে কেন হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্য সমাজ পরিত্যাগ করিবে? পাদরি সাহেবেরা হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝেন না, বলিয়া এত মাথা কুটিয়া মরেন। যে দিন বুঝিবেন সেই দিন আসামে গিয়া চার চাস আরম্ভ করিবেন।

আমরা "মুখুয্যার পত্রের" গোঁড়া এবং পত্রস্থ প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া বড় সুখী হইয়া থাকি। কিন্তু ঐ ডিসেম্বর মাসে "Administration of Justice in Bengal" নামক প্রবন্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ইহা কোন দেশীয় বিচারক প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যদি সে কথা সত্য হয়, তবে ইহা আমাদের দেশীয় বিচারকদিগের লজ্জার কথা বটে। বিচক্ষণ সম্পাদক কি ইহার ইংরেজিটুকুও সংশোধন করিতে অবকাশ পান নাই? যদি তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত পত্রেও এরূপ ইংরেজি প্রবেশ করে, তবে বাঙ্গালি "বাবু ইংরেজির" জন্য গালি খাইবে না কেন?

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

চতুর্থ খণ্ড।

১২৮২ শাল।

কাঁটালপাড়া;

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩, টাকা।

ডাকমাশুল সমেত ৩॥০ টাকা।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড।] বৈশাখ ১২৮২। [১ম সংখ্যা।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা।

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা।

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়লরক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনী গণের ম্লানীভূত রূপ লাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ পথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদংবপু রাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈ রুদ্যানলতা বন
লতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard,—
and many a time
The harmony of their tongues
hath into bondage

Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I liked several women;
——————but you, O you
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর সরল, বিশুদ্ধ রমণী-প্রকৃতি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়,নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই, কেননা তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা, বল্কল পরিধান করিয়া, ক্ষুদ্র কলসী হস্তে,আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণা-বিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণ কারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব-মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমন কালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রু-মুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন; তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সে রূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord! how it looks about! Believe me Sir,
It carries a brave form;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে,যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine,for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে

ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন্ ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন,—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যে রূপ হইত, ঠিক সেই রূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয় লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব, তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানেনা, অতএব তাহার প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন না তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া, পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোপি নয়নে যৎ
প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং
বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়
মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণ মহো! কামঃ
স্বতাং পশ্যতি॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাধিয়া যায়,

পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন কালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man I e'er saw; the first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?" —"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল, সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটিয়া, ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower—I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চঃ

Hence bashful cunning!
—And prompt me, plain and holy innocence.
I am your wife, if you will marry me.
—If not, I die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, যে মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূলগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়-সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্র মাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন, যে "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর," মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্য সমীপে

ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি —একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্মরিঅ এদস্ম হথত্তংসিণো মিণাল বলঅস্ম কদে পড়িণিবুত্তস্মি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিণীত্ব আছে,যথা দুষ্মন্তের মুখে

"নহু কমলস্ত মধুকরঃ সন্তুষ্যাতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা,"অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" —এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দ্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ; কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয় "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ —দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা,তখন শকুন্তলা

পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে, যে শকুন্তলা ঠিক্ মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা চরিত্রের আর একভাগ বুঝিতে বাঁকি আছে। দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সেভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া কেননা উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছিলেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

গাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি
পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কং এব্ব চরিএ কিং ভণদু একং একস্স॥

তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেসদিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর প্রগাঢ়তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার স্বশরীরে সর্গারোহণ পথ রোধ করিয়াছিলেন তিনি এতত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেসদিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেননা দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামীকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেননা মনুষ্যপ্রকৃতিতে যেসকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেসদিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল। শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুইটি চরিত্র যে

পরস্পর তুলনীয়া হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া, কেননা উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী, এবং সতী, ত যে সে। আজ কাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকা মাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভোঃ" শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া, দেসদিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরীয়সী। স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুম্হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ
লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি
মহিলাও॥

এ রাগ, এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেসদিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেসদিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন।" ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও, পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন

Alas, Iago!
What shall I do to win my lord
again?
Good friend, go to him; for, by
this light of heaven
I know not how I lost him; here
I kneel;—

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথ শয্যাশায়িনী সুপ্তা

সুন্দরীর সম্মুখে, "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন্!" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণ ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য,এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেসদিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম!" তখনও দেসদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়াএবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে, কেন না ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপাকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োদ্ধত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি ব্যাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুরনীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেসদিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্য কাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে এমত নহে—তন্মধ্যে অনেক গুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড্—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য,নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা,সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেন

না এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেন না ভারতীয় আলঙ্কারিক দিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ,এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে দেস্‌দিমোনার চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা জীবন্ত, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোপি পরুষাক্ষরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্তইব বেপতে সকলইব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদংগতে।

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা, ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী—অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

সমালোচন সমাপনান্তে আমরা যদি একবার বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বতন বন্ধু ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয়কে স্মরণ করি, ভরসা করি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। প্রাগুক্ত আচার্য্যের মত এই যে, এই সাদৃশ্য দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী; এবং ইংরেজিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এবং মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনার অনুকরণ করিয়াই শকুন্তলা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কমলাকান্তের দপ্তর।

১৪ সংখ্যা।

মশক।

আ রাম! বড় বিরক্তই করিল যে! এই ঘরের কোণের মশা গুলা, আর এই সংসারের, কোণের মশা গুলা। আজি কোথা মনে করিলাম, যে একটু মাত্রা চড়াইয়া একবার Freedom এবং Free-will (অদৃষ্ট ও পৌরুষের) তর্কটা মীমাংসা করিব, না কোথা হইতে দুই কাহন ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রার নেশাটা একবারে নির্মাত্র করিল!

সংসারের ক্ষুদ্র মশক গুলা আরও বিরক্তকর। কোন একটি বিষয় কার্য্যের একটু সূত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কর্দ্দম অন্ধকার হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। মৃদু গুণ্ গুণ্, মৃদু গুণ গুণ্, ক্রমে দংশন ও শোণিতশোষণ।

পুঁথিতে পড়িলাম, যে অতি অপরিষ্কার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপীর অপূর্ব্ব পয়োরাশির আস্বাদ ও আঘ্রাণের কথা তখন আমার স্মরণ হইল। হিন্দুধর্ম্মের কল্যাণে ও আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে, সেই উদক এক গণ্ডুষ আমি উদরস্থ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হইল। মনে হইল সেই জ্ঞানবাপীর এক গণ্ডুষ জল আনিয়া এই জীব তত্ত্বের রহস্য পরীক্ষা করিব। কিন্তু জ্ঞানবাপী কাশীধামে,—আর আমি অজ্ঞান পাপী নশীধামে। সুতরাং সে জল আমার অতীব দুষ্প্রাপ্য। তখন মনে হইল, যে বোধ হয় কালা পাহাড়ের ভয়ে বিশ্বেশ্বর সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জল ঐরূপ সমল ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। মানবই হউন আর দেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ ছুটিবে কেন? সেই পথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বায়ু দূষিত হইবে, গন্ধ দুর্গন্ধ হইবে, ও জল পঙ্কিল হইবে। তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; যে পথে নবদ্বীপ হইতে লাক্ষ্মণেয় পলায়ন করেন তাহাই আমার বঙ্গের জ্ঞানবাপী, সেই জল হইলেই আমার জীবতত্ত্বের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহার ত চিহ্ন দেখি না। সেই পথ থাকিলে আমি সেইখানে একটী মেলা বসাইতাম। নব্য বঙ্গ সন্তানগণকে একবার সেই ধূলা মাখাইয়া দিয়া বলিতাম, "যাও বাছা, শ্রীক্ষেত্রে যাও, যে পথে তোমার ধার্ম্মিক রাজা গমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও।" তা—তাহারও কোন চিহ্ন নাই! বিশ্বেশ্বরের পথের জল আনিতে আমি যাইতে পারিলাম না, বঙ্গেশ্বরের পথের সন্ধান নাই। তবে এখন প্রসন্নর গোশালায় আশ্রয় লইতে হইল। স্বয়ং কমলাকান্ত অনেক বার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। সেই জলেও কার্য্য হইতে

পারে। অমনি আমার চিরেতার শিশিটি ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। প্রসন্ন আসিলে বলিলাম, 'প্রসন্ন! তুমি সে দিন তোমার সেই পাড়া বেড়ান পঞ্চরসের সেই যে এক গণ্ডুষ দিয়াছিলে, মনেআছে ত?' প্রসন্ন যেনএকটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'ঠাকুর মহাশয় আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, যে আমার সে দুধ আপনাদের ঠাকুর দেবতাদের জন্য নহে। আপনার কি মন হইল, কিছুতেই ছাড়িলেন না তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিয়াছিলাম।' প্রসন্নকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি সেজন্য তোমাকে অনুযোগ করিতেছি না; তুমি যে জল দিয়া সেই পঞ্চরস প্রস্তুত কর, তাহা আমাকে এই শিশিটির এক শিশি দিতে হইবে।" প্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ঠাকুর মহাশয়! 'আমরা কি দুধে জল দি?' আমি বলিলাম 'তা যাই হৌক সেই জল একটু দিতে হইবে।' আমি শুনিয়াছিলাম, (বোধ হয় দেখিয়াও থাকিব) প্রসন্নর গোশালার নিভৃত কোণে মৃৎপাত্রে জল থাকিত, যাহারা দূর জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে দুধে বড়ি খাওয়াইবার জন্য সুলভ মূল্যে নির্জ্জল দুগ্ধ লইত, প্রসন্ন তাহাদিগকে সেই গোশালার বাহিরে দাঁড় করাইয়া গাভী দোহন করিত। গোশালায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না। তাহা হইলে কাঁচা গাই চমকিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল। শিশিটি আমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম। সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট তাহার মধ্যে অনবরত উল্টিয়া পাল্টিয়া খেলা করিতে লাগিল। তল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, ঊর্দ্ধ হইতে তলে নামিতেছে; উঠিবার সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময়ও তেমনিই ক্রীড়া। ক্ষুদ্র জীবের উত্থান পতন জ্ঞান নাই। সূক্ষ্ম সূত্র কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল। আমি বসিয়া থাকি।

ক্রমে সেই সূত্রগুলি স্ফীত হইতে লাগিল। একদিক কিছু স্থূলতর হইল। তখন সেই দিক মুখ বলিলে বলা যায়। পূর্ব্বে সূত্রকীটগুলি নিমেষ কাল স্থির থাকিতে পারে নাই; এখন, বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। দুই একদিন পরে একটি মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল; কচিৎ কিঞ্চিৎ চেতনা যুক্ত বোধ হয়; কখনও বা একেবারে জড়বৎ। আমার শয্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পর দিন উঠিয়া দেখি, একটি মশক শিশি মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর জলোপরি একটি ক্ষুদ্র কীটনির্ম্মোক ভাসিতেছে। একটি, দুটি, তিন চারিটি করিয়া ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমার বিজ্ঞানপরীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। একদিন নশীবাবুর গৃহিণীর স্বহস্তপ্রস্তুতীকৃত পায়স পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ করিলাম। সুন্দর উদর পূর্ত্তি না হইলে মানবের উদারতা হয় না। সেদিন সন্ধ্যার পর উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গগুলিকে বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে দিলাম। শিশিটি সরকারদের ছাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, চূর্ণীকৃত হইয়াগেল। জীবরহস্যোদ্ভেদ হইল। এই রূপে জন্ম যে জীবের, সেই

জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশা দূর করিয়া আমাকে লেখকের আসনে বসাইল। একেই বলে মানব অহঙ্কার। But man is the Lord of Creation.—but না—yet!*

বাস্তবিক মনুষ্যের অই অহঙ্কারের কথাটি মনে হইলে এত মশার কামড়েও হাস্য পায়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকলমে কলমবন্দী করিলেন, যে, "ব্যাসস্তু নারায়ণঃ স্বয়ং।" "ইংলণ্ডের অন্ধকবি লিখিয়াছেন, যে,—

"গদ্যে পদ্যে অচেষ্টিত সাধন সাধিব।"

আমাদের বাঙ্গালির সাহিত্য বিপাক বিপত্তে মধুসূদন শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন, যে,

——————রচিব মধুচক্র
গৌড়জনগণ যাহে আনন্দে করিবে
পান, সুধা নিরবধি;———

মানবাবতার মহাপ্রভু হর্শেল লিখিলেন, যে, 'মানব—সৃষ্টির মহাপ্রভু।' আমি কমলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি! এ সকল কি হাস্যকর নহে? সত্যসত্যই কি মনুষ্য সৃষ্টিকাণ্ডে একেশ্বর প্রভু? এই যে, ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র প্রাণী আশীবিষ বিষে তাড়িত গতিতে শমনসদনে রপ্তানি হইতেছে, yet man is the Lord of Creation! এই যে কোথাও একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের দৌরাত্ম্য হইলে অমনি শত শত ভগ্ন পাইক সাপ্তাহিক পত্রে পোলিশের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে,—yet man is the Lord of Creation! এই যে, বীডন সাহেবের বেলবিডিয়র বাসে চিত্র প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটি শার্দ্দূলের পিঞ্জরদ্বার অবদ্ধ ছিল বলিয়া শত শত শ্বেত পুরুষ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইলেন, বিবিদের ত কথাই নাই! yet man is the Lord of Creation! যে মানব বাত্যবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য অনবরত গুহা রচনা করিতেছে, কীট পতঙ্গ বিনাশের জন্য দিবারাত্রি যন্ত্র সৃষ্টি করিতেছে, তাহার এরূপ আত্মগরিমা ভাল দেখায় না। সাগরের জলবুদ্‌বুদ্‌ সাগর শাসক নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায় না। ভীষণ মারীভয়ে, গ্রাম, নগর, দেশ অঞ্চল নির্ম্মানব হইতেছে, তবু বলিবে মানব সৃষ্টির একেশ্বর! ব্যোম দেবের নিশ্বাস প্রশ্বাসে চীন হইতে পীরু উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তবু বলিবে মানব বিশ্বসংসারের একেশ্বর! দেবী ধরণীর হৃদয়াবর্ত্তভরে, উদ্গীরিত বহ্নি রাশি জীব কাকলি পরিপূরিত জনপদ জলন্ত কবরে প্রোথিত করিতেছে, তবু কি বলিতে হইবে—যে মানব বিশ্বরাজ্যের রাজা! আর এই মৃদু মধুর তারস্বরানুকরণ কারী অণুপতঙ্গে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,—তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে আমি ও আমার সজাতিগণ প্রকৃত ধরাধিপ! এ অনৃত বাদে কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বেশ্বর বলিলেই যদি এই দুর্বৃত্তগণ দূরীভূত

* শুনিয়াছি এই ইংরেজি কথা কয়টিতে ব্যাকরণের তর্ক আছে। দুইটি ইংরেজি অব্যয়ের তর্ক আছে। অব্যয় লইয়া এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাকান্তের মত নব্যয় পারে, ভব্যয় পারে না। বাতুল জ্ঞানবাপীর জল আনিয়া মশা করিতে যায়। সেই জল স্পর্শ করিলেই যে জীব মুক্ত হয় তাহা জানে না। আর নবদ্বীপের শ্রীমহাপ্রভুর মেলার যে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত বুঝিতেই পারিলাম না।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশাবিষয়িনী গাথা প্রকটন না করিয়া, কমলাকান্তের স্তব রচনা করিতাম। কিন্তু এই দুর্বৃত্তগণ হর্শেলের ন্যায়শাস্ত্রের বলবত্তা বুঝিতে পারে না। অতএব আজি আমি বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিব। বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ 'গালাগালি।' বড় ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি দিবে, সমান সমানে গালাগালি চলিবে, ইহার নাম Argument বা যুক্তি। আমি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আজি কলির মশামেধ যজ্ঞে এই পূর্ণাহুতি প্রদান করিলাম।

রে কীটপ্রসূত ক্ষুদ্র পতঙ্গ! অভিমানী মানবের তুই চির শত্রু; কমলাকান্তকে আর জ্বালাতন করিস্ না। কমলাকান্ত সন্ন্যাসী, অভিমানের সঙ্গে ইহার চিরশত্রুতা। দূর হ রে! পতঙ্গ মশক। আর দূর হ রে! মানব মশক।

ক্ষুদ্রকীট তোর গুণ্ গুণ্ মধুর সমালোচন, তোর অকারণ পৃষ্ঠ দংশন, নীরবে শোণিতশোষণ—আর আমার সহ্য হয় না। তামস-প্রিয়! তুই অদ্য হইতে আর আলোকে দেখা দিস্ না। কোণ-প্রিয়! সমাজে যেন তোকে আর দেখিতে না হয়। সন্ধ্যাগোদি! দিনদেবের রাজত্বকালে তুই আর কদাপি নির্গত হইস্ না। কর্দ্দমে, জঙ্গলে, বনে, পূতিগন্ধে, পয়োনালীতে তোর জন্ম—অন্ধকারে, নিভৃত লূতানিকেতনে, শয়নতলে, তোর আবাস—পৃষ্ঠ দংশনে আর শোণিত শোষণে তোর আমোদ—পক্ষ হেলনে, পক্ষকম্পনে মৃদু গুণ্ গুণ্ রব, তোর তোষামোদ গান। কিন্তু কে তোর এ রবে মোহিত হইবে? যে হয়, সে হউক, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কখন মোহিত হইবে না। তোরা আমাকে জ্বালাতন করিয়াছিস্। অল্পপ্রাণ পতঙ্গ! ক্ষীণ জীব! তুই প্রভাকরের প্রভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হস্, শীত সঞ্চারে পলায়ন করিস্, সমীরণের ঈষদ্বেগে কোথায় চালিত হস্, তাহার স্থিরতা নাই, দেবানন্দ সুগন্ধ সর্জ্জরস ধূমে তোর বংশধ্বংস হয়, রে কীটসা কীট পতঙ্গাধম, অদ্য হইতে তোকে যেন আর সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়! আর অদ্য হইতে যেন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে সামান্য মশা বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভীষণ মহাদপ্তরে মসীবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ না করিতে হয়। মশা মারিতে নিত্য কামান পাতিলে লোকে বলিবে

কাপুরুষ—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রজনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামসদয় মিত্রের সঙ্গে ললিতলবঙ্গলতার সম্বন্ধ হইবার আগে আমার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ হইয়াছিল। ললিতলবঙ্গলতার পিত্রালয়, ভবানীনগরের অনতিদূর কালিকাপুর গ্রামে। কালিকাপুরে, আমার এক পিসীর বাড়ী ছিল। পিসীকর্ত্তৃক এই সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের কথা বার্ত্তা অবধারিত হইয়াছিল— কিন্তু এমত সময়ে আমাদিগের সেই কুলকলঙ্ক কন্যা কর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে রামসদয় মিত্র আসিয়া ললিতলবঙ্গলতাকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে আমি ললিতলবঙ্গলতাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে২ যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও

দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে২ লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে "ক" য়ে করাত, "খ" য়ে খরা, শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই —এসৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীতশৈশব, অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন ভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা, —বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ, এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে যে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে যৌবনের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

যাহা হউক, এই সময়ে লবঙ্গলতা লাভে নিরাশ হওয়ায় আমি বড় ক্ষুব্ধ হইলাম—বৃদ্ধ ধনকলস রামসদয়ের উপর এমন জাতক্রোধ হইলাম যে, অনেক সময়েই তাহার লম্বোদরমধ্যে ছুরিকা প্রবেশের অভিলাষ হইত। তাহার পর আর আমি বিবাহ করিতে পাইলাম না—সকল রাগ টুকু রামসদয়ের উপর বর্ত্তিল। সে কথা আমি আর কখন ভুলিলাম না।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব, কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কেন বল দেখি? আমি ক্রূর, খল, দ্বেষক, মন্দ—যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল—আমি সব, স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম, কেন বল দেখি? কেন আমি, আমার সেই জন্ম ভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বানে দুঃখ রাক্ষসকে বধ করিলাম না? আমার কি দুঃখ? আমার কেহ নাই? কাজ কি কেহতে? কে কার? কার কে? জীবনের নদী কি একা পার হওয়া যায় না? কে বারণ করে? কত টুকু পাড়ি? কিসের সহায়? সহায়ে কি হইবে? একা আসি-

যাছি, একা যাইব, একা থাকিবনা কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টা সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কাথায়?

তবে কেন, সেই নিশীথ কালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হৌক! কেন গরল খাইলাম না—কেন জলে ডুবিলাম না, কেন গলায় ছুরি দিয়া মরিলাম না! আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে—আমি মনের কথা বলি বলি, অথচ বলিতে পারিতেছি না। এক দিন নিশীথ কালে--এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম—জ্বালা নিবিল না।

আবার ফিরিলাম কেন? সংসারের বন্ধন দুশ্ছেদ্য কেন? কিছুতেই এ বাঁধন কাটা যায় না কেন? আমি কার, কে আমার? তবে আমি আবার ফিরিয়া লোকালয়ে আসিলাম কেন? লোকালয়ের জন্য আমি এত কাতর কেন? লোক আমার কে? আমি লোকের কে? কে আমায় ভাল বাসে? কে আমার জন্য কাতর? কে আমার জন্য, এক দিনের সুখ অল্প করিয়া ভোগ করে? কে আমার জন্য এক দিনের আমোদ বন্ধ করে? সুখের সময় কে আমাকে ভাবে? এমন কে লোকালয়ে আছে? তবে আমি লোকের জন্য কাতর কেন? আমি কাহার সুখ বাড়াইব,—কে আমার সুখ বাড়াইবে? আমি কাহার দুঃখ নিবারণ করিব—কে আমার দুঃখ নিবারণ করিবে? এমন কি পৃথিবীতে আমার কেহ নাই? না, এই অনন্ত অসীম, সাগর নগ নগর দেশ প্রদেশ প্রান্তর কানন মণ্ডিত, বিশাল, দুশ্চিন্ত্য জগতে আমার এমন কেহ নাই। কেহ নাই! কেহই নাই! ভাবিয়া, ভাবিয়া, ভাবিয়া, খুঁজিয়া, খুঁজিয়া, দেখিলাম এমন কেহ নাই। তবে ভাবি কেন? কেন ভাবি, তাই ভাবি।

তবে, এ সংসারের মায়া বড়ই দুশ্ছেদনীয়া। অথবা মন বড়ই অবশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। হরেকৃষ্ণদাসের নিবাস যে গ্রামে, ইঁহারও নিবাস সেই গ্রামে। সে কথা আমি জানিতাম না। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন কালে

পুলিষের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিষের অত্যাচার ঘটিত অনেক গুলিন গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই।

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি শিশু কন্যা ছিল। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতক গুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভ বশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কার গুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটিবাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল, যে হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারগা মহাশয়, তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ায়েশ থাকে, হজুরে হাজির হইবে।' তখন, আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল, যে গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি? ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কার গুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদ পদ্মে ঢালিয়া দিলাম; তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

"বলা বাহুল্য যে দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন, যে 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।"'

যখন রামসদয়ের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হয়, তখন রামসদয়ের বাপের উইলের কথা সবিশেষ শুনিয়াছিলাম। হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম এবং জানিতাম যে কথিত লাওয়ারেশা রিপোর্টের নকল দৃষ্টি করিয়াই বিষ্ণুরাম বাবু বিষয় রামসদয়ের পুত্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

"ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?"

গোবিন্দ কান্ত বাবু বলিলেন, "হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির বাড়ী কোথা?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায়। কিন্তু কোন স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম। লবঙ্গলতা অপহরণের প্রতিশোধ করিব।

অনেক দিন কলিকাতায় রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধান করিলাম। কোন সন্ধান পাইলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রামপর্য্যটনে গিয়াছিলাম। একস্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারিদিগে বৃক্ষরাজি; ঘনবিন্যস্ত, কোমল শ্যাম, পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ক, কোথাও সুপক্ক ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক জন বিকট মূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবা মাত্র বুঝিলাম পুরুষ অতি নীচ জাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ২ তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্কাল হইতে দা খানি টানিয়া লইলা দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই-নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুমি এই সময়ে পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল,—কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।

দেখিলাম, সে বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম যে দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে

এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল—আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেই খানে রহিল।

বহুদিনে, বহুকষ্টে, আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। ক্রমে যুবতীর পরিচয় পাইলাম। তাহার নাম রজনী—পিতার নাম রাজচন্দ্র দাস। আমি যে রাজচন্দ্র দাসের সন্ধান করিতেছিলাম এ সেই রাজচন্দ্র নহে ত?

রজনীর নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া লইলাম। ঠিকানা বলিতে রজনী নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাকে অদেয় তাহার কিছুই ছিল না, কেন না আমি প্রায় আপনার প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলাম।

রজনী আপাততঃ সেইখানেই রহিল। আমি রাজচন্দ্র দাসের অনুসন্ধানে কলিকাতায় গেলাম। তাহার সঙ্গে কথোপকথনে জানিলাম যে, রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বটে।

তখন আমি রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম। এক নিভৃত গৃহে তাহাকে স্থাপিত করিলাম। সে আমার কাছে স্বীকৃতা হইল, যে সে গৃহ হইতে বাহির হইবে না! বা কাহাকেও দেখা দিবে না। তৎপরে আমি প্রমাণ সংগ্রহে যাত্রা করিলাম। পুনরপি গোবিন্দ কান্ত বাবুর কাছে গেলাম। বালার মোকদ্দামার সন্ধান তাঁহারই কাছে প্রাপ্ত হই। সে মোকদ্দামা বর্দ্ধমানে হয়। তাঁহার সাহায্যে অন্যান্য প্রমাণও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম। বিস্তারে প্রয়োজন নাই।

এখন মোকদ্দামা করিলে, রজনী যে বিষয় পাইবে তাহা নিশ্চিত বুঝিলাম। আমার অভিপ্রায়, রজনীকে বিবাহ করি। কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী, আমার জন্য প্রাণ দানেও সম্মতা, তথাপি বিবাহ করিতে সম্মতা হইল না। ভাবগতিকে বুঝিলাম যে আমি যদি পীড়াপীড়ি করি, তবে আত্মহত্যা করিবে।

কিন্তু যদি আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইল, তবে তাহার বিষয়োদ্ধারে আমার ইষ্ট কি? আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, যে বিষয়োদ্ধারেও রজনী নিতান্ত অসম্মতা। পরিশেষে, আমার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইল—তাহার উদ্ধারার্থে

আমি যে আহত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার অনুরোধে সম্মত হইল। বিষয়োদ্ধারের পর বিবাহ করিবে, এমত ভরসাও পাইলাম। এবং ইহাও স্বীকার করিল যে, যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন সে আমার গৃহে, আমার পত্নীপরিচয়ে থাকিবে। বহুকষ্টে এ সকল কথা তাহাকে স্বীকার করাইলাম। আমাকেও স্বীকার করিতে হইল, যে যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন আমি তাহাকে পরস্ত্রী বিবেচনা করিব।

কেবল আমার ঋণ পরিশোধার্থ রজনী এতদূর স্বীকার করিয়াছিল। তাহার পরে সে কি প্রকারে যে ফাঁকি দিল, তাহা বলিয়াছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রজনীর শান্তিপুরে যাইবার কথা রাজচন্দ্রদাসকে কাজে কাজেই বলিতে হইল। শুনিয়া রাজচন্দ্র বলিল যে, তবে আমি আর কি সম্বন্ধে এখানে থাকি? আমাকেও বিদায় দিন্।

অগত্যা তাহাও স্বীকার করিতে হইল। রাজচন্দ্রকে একটি বাড়ী কিনিয়া দিলাম। কিছু২ মাসিক দিতে স্বীকৃত হইলাম। রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নূতন বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। রজনীকেও সেইখানে লইয়া যাইবার জন্য সে অনেক যত্ন করিল, কিন্তু কিছুতেই রজনী সম্মতা হইল না। সে শান্তিপুরে গেল।

আমি তখন একা—একা কি করিলাম? এই কণ্টকময় জীবনারণ্যে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিলাম। আপাততঃ কলিকাতাতেই রহিলাম। দেখিব, লোকালয়ে কি সুখ। লোকের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম। লোকও আমার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। অনেক লোক আমার বশীভূত হইতে লাগিল। কাহাকে কথায় বশ করিলাম, শুধু মিষ্ট কথায়, কাহাকে আলাপে; কাহাকে অর্থের দ্বারা বশ, করিলাম,—অর্থাৎ কাহাকে অল্প২ নগদ দিলাম, কাহাকে ঋণের আশায় রাখিলাম। কাহাকেও ঋণ দিলাম না—কর্জ্জ লইলেই শত্রু হয়। কাহাকে কেবল পরামর্শ দিয়া বাধ্য করিলাম—কাহারেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া আরও বাধিত করিলাম। কাহারও পীড়ার সময়ে আত্মীয়তা করিয়া আত্মীয় করিয়া তুলিলাম,—কাহারও সুখের দিনে সুখ বাড়াইয়া দিয়া অনুগত করিয়া লইলাম। কাহারও বক্তৃতা লিখিয়া দিলাম—লোকের কাছে প্রকাশ করিলাম না;—কাহারও সুখ্যাতি সম্বাদপত্রে লিখিয়া তাহাকে ক্রীতদাস করিলাম—কাহারও শত্রুনিন্দা লিখিয়া আরও আপ্যায়িত করিলাম। কাহারও কাছে মিষ্ট গল্প করিয়া বন্ধু করিয়া লইলাম—কাহার অমিষ্ট গল্প নীরবে কাণ পাতিয়া শুনিয়া তাহাকে প্রেমডোরে বাঁধিলাম। কাহাকে হাস্য পরিহাসে প্রীত করিলাম; কাহারও রসশূন্য পরিহাসে হাসিয়া কিনিয়া রাখি-

লাম। কেহ আমাকে ধার্ম্মিক ভাবিয়া ভাল বাসিল—কেহ আমাকে তাহার আপনার মত অধার্ম্মিক বলিয়া ভাল বাসিল। কেহ কোন জ্ঞাতি বা অন্য শত্রুর নিন্দা করিতে ভাল বাসিত, আমি বিনা আপত্তিতে তৎকৃত জ্ঞাতিনিন্দা শুনিতাম;—কেহ আপনার কুচরিত্রা পত্নীর, বা কুপুত্রের, বা ততোধিক নিন্দার্হ কোন প্রেমাস্পদীভূত বা প্রেমাস্পদীভূতার সুখ্যাতি করিতে ভাল বাসিত, তাহাও কাণ পাতিয়া শুনিতাম; উভয়েরই প্রিয় হইলাম। পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খের কাছে কতক গুলা গ্রন্থের নাম করিয়া পূজ্য হইলাম—যথার্থ পণ্ডিতদিগের সারগর্ভ বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে যত্ন করিয়া তাঁহাদিগেরও শ্রদ্ধা লাভ করিলাম। অনেকেই শুধু আমার গাড়ি জুড়ি বাড়ী দেখিয়া গোলাম হইল। কেহ বা সে সকলের নিন্দা করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য ইঙ্গিতে জানাইতেন, আমি সে নিন্দা প্রকারতঃ স্বীকার করিতাম—সুতরাং তাঁহাদিগেরও আমি প্রিয় হইলাম। কেহ কেবল আমার গাড়ি ঘোড়াতে চড়িয়াই বাধ্য! অল্পদিন মধ্যেই শুনিতে পাইলাম যে, অমরনাথ ঘোষ কলিকাতায় একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক—সকলেরই প্রিয়! অল্পকালমধ্যে দেখিলাম আত্মীয় লোকের জ্বালায় আমার স্নানাহারেরও অবকাশ নাই।

কাহারও কিছু কাড়িয়া লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড় লোক হইব—এরূপ কোন অভিসন্ধিতে আমি এজাল পাতিলাম না। আমি যাহা হই—আমাকে, যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়া থাক, তবে ভুলিয়াছ। রজনীর সম্পত্তি, আমি বঞ্চনা করিয়া লই নাই—সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে দিয়াছে—যে দিন চাহিবে সেই দিন প্রত্যর্পণ করিতে রাজি আছি। শচীন্দ্রের সম্পত্তি ন্যায়ানুসারে রজনীর—তাহাতেও কাহাকে প্রবঞ্চনা করিনাই। এখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করিব, সে অভিপ্রায় রাখিতাম না।

তবে কেন এ জালবিস্তার? কেবল লোকালয়ে কিসুখ তাহা দেখিব, এই কামনায়। তাহা দেখিলাম; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এবিষয় সংগ্রহ করিলাম? রজনী ইহা পুনর্গ্রহণ করুক—লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করুক।

ঋতুবর্ণন।*

কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন, ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময় কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনা কব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক্ তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য কেবল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর,তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া,যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎ-

* ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র।

কর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক্ তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই —কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র, ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটী উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণ বাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ, উৎকৃষ্ট রূপে আত্মকার্য্য সম্পন্ন করে, যথা,

ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোরতর,
চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অতিভয়ঙ্কর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই—তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দ্দক নাই। পরে হেম বাবুর বিদ্যুৎ দেখ,

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি
ক্ষণ প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাবে,
বেগে দীপ্ত গিরি কায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাবে॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতা প্রাপ্ত;—

কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে
ঘটাকরি লহরে লহরে ॥

এক্ষণে গঙ্গাচরণ বাবু প্রণীত দুই একটি "আলোকচিত্র," পাঠককে উপহার দিব। দেখিবেন আলোকচিত্র ঠিক উঠিয়াছে। নিদাঘ কালের গৃহ দাহ বর্ণনা করিতেছেন,

বায়ু সঙ্গ চালি অঙ্গ দেখ অগ্নি রোষিছে,
শুষ্ক ঘাস, রজ্জু, বাঁশ শক্তি তার পোষিছে;
দীপ্ত কায় মত্ততায় ভীম মূর্ত্তি খেলিছে;
রশ্মিভাগ রক্তরাগ পল্লিমাঝ মেলিছে;
গেহচাল, বৃক্ষডাল, দাহি বহ্নি মাতিছে;
শূন্যপুরি ভূরি ভূরি বিস্ফুলিঙ্গ ভাতিছে;
ধূমরাশি ভাসি ভাসি উর্দ্ধদেশ যাইছে;
ভস্মভার অন্ধকার অন্তরীক্ষ ছাইছে;
উচ্চরোল সোরগোল তাপতেজ বাড়িছে;
বংশরাজি বোম বাজি তুল্য শব্দ ছাড়িছে;
ধেনুপাল আলথাল উর্দ্ধ ফুক্ক চাহিছে;
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গাহিছে;
"বারিআন" "চালটান," লোকপুঞ্জ হাঁকিছে;
দীনতায় কাতরায় দেবতায় ডাকিছে;
দূর্ব্বা, ধান, বস্ত্র, পান, অগ্নিমাঝ ডালিছে;
বাষ্পবারি কুম্ভবারি একতায় ঢালিছে;
আর্ত্তনাদি তৈজসাদি আঙ্গিনায় নাড়িছে;
কেহ কেহ বাস গেহ ভাঙ্গি ভূমি পাড়িছে;
মুক্ত কেশ, ছিন্ন বেশ, দৌড়াদৌড়ি ধাইছে;
তপ্তঅঙ্গ, চিত্তভঙ্গ, পানবারি চাইছে;
গেল বাস, সর্ব্বনাশ, বালবৃদ্ধ কাঁদিছে;
একি দায়! চোর তায় চৌর্য্যবৃত্তি সাধিছে;
বহ্নিজাল পণ্যশাল ঘেরি দেখ লাগিছে;
মাস, মুগ, তৈল, পূগ, খাদ্য আর রাগিছে;
গেল ঠাট, পুঁজিপাট, মুদি মুণ্ড কুটিছে;
হায় হায়! মৃত্তিকায় দেহপাতি লুটিছে;
নষ্টদেশ, অর্থশেষ নাহি কার থাকিছে;
ছারখার ভস্মভার দগ্ধধাম ঢাকিছে;
গ্রামখণ্ড লণ্ডভণ্ড অগ্নিচণ্ড নামিছে;
দাহিবার নাহি আর ধিকি ধিকি থামিছে;

নিম্নোদ্ধৃত কয় ছত্রে বাত্যার পর প্রকৃতির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

দেখি গিয়া পরদিন, জনপদ শোভা হীন,
লণ্ডভণ্ড মানব বসতি;
দুরাচার প্রভঞ্জন দৌরাত্ম্যের নিদর্শন
গেছে রেখে, শোচনীয় অতি;
কতশত তরুবর মূলসহ কলেবর
মৃত্তিকায় করেছে বিস্তার;
আর নাহি তুলি কায়া, পথিকেরে দিবেছায়া,
ফল ফুলে তুষিবে না আর।
তাহাদের অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি,
আছে পড়ে এথানে সেখানে;
কত বৃক্ষ কাণ্ড সার, নাহি শাখা অলঙ্কার,
স্থাণু হয়ে আছে স্থানে স্থানে।
নরবাস আলথাল, গৃহ হতে কত চাল
দূরে গিয়া, শুয়েছে ভূতলে;
অনেক ইটের গেহ ত্যজেছে প্রাচীন দেহ,
অঙ্গহীন হয়েছে সকলে।
পথে চলা কষ্ট অতি, ডালে চালে রোধগতি,
স্থানে স্থানে সেতুর নিপাত;

বিনষ্ট বাজার হাট, ভেঙেছে দোকান পাট,
হানে মুদী শিরে করাঘাত।
মাঠে ঘাটে, জলে ঝড়ে, মরে মরে আছেপড়ে
ধেনু মেষ মহিষ বিস্তর;
কত নর ভাগ্য দোষে পড়িয়া ঝঞ্চার রোষে
গেছে চলে শমনের ঘর।
ভাসে শব নদীনীরে, কত বা লেগেছে তীরে,
কত দ্রব্য স্রোতে ভেসে যায়,
উলটিয়া কত তরী ভাসিছে সলিলোপরি,
ভেঙে কত রয়েছে চড়ায়।
বিদলিত কত কুঞ্জ, ছিন্ন ভিন্ন লতা পুঞ্জ,
বিহঙ্গের নাহি কণ্ঠকল,
নর নারী হতজ্ঞান, হয়ে অতি ম্রিয়মাণ,
ফেলিতেছে নয়নের জল।

আমরা যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম, উভয়েই শোধনশূন্য উৎকৃষ্ট বর্ণনার উদাহরণ। গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব (Crabbe) কে মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনা কাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভাত বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলকজনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে ঊষা উপনীত,
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।

মোহিনী মাধুরী করি দরশন
প্রণয় প্রয়াসে আপনি তপন
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে,
অপরূপ রুচি মানস রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল;
প্রফুল্ল আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে;
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে
কাচসম স্বচ্ছ সরসীর কোলে
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিদাঘ হইতে। এই ঋতুবর্ণনে ছয় ঋতুর বর্ণনা নাই—আপাততঃ বসন্ত এবং নিদাঘই প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বসন্ত হইতে নিদাঘ সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট এবং

এতদুভয় যে ভিন্ন২ সময়ের রচনা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। নিদাঘের উৎকর্ষ হেতু আমরা নিদাঘ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি যে গঙ্গাচরণ বাবু এই ঋতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না—না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষ গুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।

পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঋতুবর্ণনের কোন২ অংশ বাদ দিলে ভাল হয়। উদাহরণ— ইক্ষুরস বর্ণনা ইত্যাদি।

অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া
করে কৃষী গুড় অপরূপ।
কিবা মিষ্ট তার তার না হয় তুলনা তার
থাক নর দেবতা লোলুপ॥
গুড় হতে ভারে ভার হয় চিনি চমৎকার
সুধা সম যার আস্বাদন।
ভোগ সুখ বাড়ে তায় নানা দেশে লয়ে যায়
বণিকেরা বাণিজ্য কারণ॥
এই যে ভারতবর্ষে নভো হতে বর্ষে বর্ষে
বর্ষে বারি বারিধরগণ।
সেই জলে যত চাষী উৎপাদিয়া শস্যরাশি
করে দেশ লক্ষ্মী নিকেতন॥
যত ধনী মহাজন বাঁধে গোলা অগণন
পূরে তায় খন্দ নানা মত।
প্রতুল ঐশ্বর্য্য হয় সতত স্বাধীন রয়
কত লোক হয় অনুগত॥

গঙ্গাচরণ বাবুর পদ্যের গঠন দেখিয়া বোধ হয়, তিনি রহস্যকাব্যে সফল হইতে পারেন। ঋতুবর্ণনে রহস্যের কোন উদ্যোগ দেখিনাই—কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে কি হয়, বলা যায় না।

মিল, ডার্বিন, এবং হিন্দুধর্ম্ম।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্২ মূর্ত্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত।

বেদ অনুসন্ধান করিলে এরূপ বিশ্বাসের কিছু অঙ্কুর পাওয়া যাইতে পারে। দর্শনে যে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসের কোন নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া যায় কি?

জানষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটাই সারবান্। জগতের নির্ম্মাণ কৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্ব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন, যে এই নির্ম্মাণ কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয় তবে উপরি কথিত নির্ম্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কাল বিলম্বের প্রয়োজন। কালবিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব, ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ একটী তত্ত্ব গ্রহণ করা যাউক। জগৎ নিত্য না সৃষ্ট? জগতের আদি আছে না আদি নাই? যদি বল আদি আছে, সে আদির প্রমাণ কি? কিছু না। তবে আদির প্রমাণাভাবে, জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ। যদি বল আদি নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? এখানে প্রমাণাভাবে জগতের সাদিত্ব বা সৃষ্টতা সিদ্ধ। অতএব জগৎ সাদি এবং অনাদি—সৃষ্ট এবং অসৃষ্ট—উভয়ই প্রমাণ হইয়া উঠে। অস্তিত্বের প্রমাণাভাব অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে।

অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ শূন্য যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রমাণ বিরুদ্ধ বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এই রূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণ থাক্ বা না থাক্ ঈশ্বর

স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এস্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি বিশিষ্ট—এই জগতের নির্ম্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাতে কেবল জানি, যে সেই, জগৎকারণ অজ্ঞেয়। হর্বটস্পেন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।* তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগন্নির্ম্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষ রূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশূন্য—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময়।

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেই খানেই তাঁহার শক্তি যে অনন্ত নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেননা যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দেশ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়ম মত চলিত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

এ কথার দুই একটা উত্তর আছে কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অনুসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে

* The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—*First Principles.* p. 108.

প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে! কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণ ভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পূঁজ হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে, যে এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর, যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহে, তাহার কারণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগর পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘ্নের জন্য সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ম্মাতা মাত্র, তিনি যে স্রষ্টা এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাঁহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্ম্মাণ প্রণালী হইতে কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্ম্মাণ দেখিয়া তুমি কুম্ভকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্ভকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন কেবল নির্ম্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব্ব হইতেছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেব

ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, একথা বলা বিচার সঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশী শক্তির সীমা নির্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে, যে তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহু কৌশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্য সকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নির্ম্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈতধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে এক জন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত "প্রকৃতি তত্ত্ব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখ ভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য্য মাত্রই কেবল দুঃখ মোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল বলেন—

"যদি এমন হয়, যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাঁহারা

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

"Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush on the road. ......In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's every day performances. Killing, the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives; and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed to be allotted to human life,

মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মতবৈপরীত্য শূন্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায়

nature does also this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, violent or insidious in which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with stones, like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes, them with cold, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations, and has hundreds of other hideous deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst; upon those who are engaged in the highest and worthiest enterpries, and often as the direct consequence of the noblest acts; and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonness. In the clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live; and nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district; a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a larger scale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those of Carrier; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias......Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence.—*Mill on Nature*. p. p. 28-31.

এমত বুঝায় না, যে মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে মনুষ্যের ধর্ম্মই তাঁহার অভিপ্রেত; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্ম্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্ত্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টি প্রণালী, লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্ম্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভালমন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতি যুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ, ইহলোকে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয়, যে ইহ জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্বিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার যেমন কর্ম্ম তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই † বহুলোকে সর্ব্ব প্রকার পাপাসক্ত হয়; তাহাদিগের পিতৃ মাতৃ দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে, এরূপ হয়;—তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্ম প্রচারক বা দার্শনিক দিগের ধর্ম্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসন প্রণালী দয়াবান্ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।" ‡

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা ব-

† খ্রীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

‡ *Mill on Nature.* p. p. 37-38

লিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায়, যে এই জগতের নির্ম্মাতা বা পালন কর্ত্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল, এরূপ মত, ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good *cannot* at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religious explanations of the order of nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account."*

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্ত্তা, এবং সংহারকর্ত্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি এক জন পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নির্ম্মাণ কৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন্ন করিয়াছেন, নির্ম্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্ম্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায় বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব উদ্ভিদ্ বায়ু বারি মৃৎপ্রস্তরাদি, সকলই সেই রূপে নির্ম্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্ম্মাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাকে বলাযায়, ঈদৃশ নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণু সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত তাহা নির্ম্মিত কি না—নির্ম্মাতার হস্তপ্রসূত কিনা—তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কিনা, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এই টুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্ম্মাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, নির্ম্মাতা এবং পালন

* *Mill on Nature*...p. p. 38-39.

বা রক্ষাকর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে, কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায়, যে জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্ম্মাণ, বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা ইহাও সিদ্ধ।

তবে, পালনকর্ত্তা চৈতন্য সংহারকর্ত্তা চৈতন্য পৃথক্, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই, যে যিনি পালনকর্ত্তা, তাঁহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, একথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা, ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" পরিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে, যে, যে পরিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল—কিন্তু পৃথিবী সঙ্কীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব, অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ অণ্ডমধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, যে তদ্দারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে,

কিম্বা অন্য প্রকারে জীবন রক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বহুজাতীয়, এরূপ চতুষ্পদ আছে, যে তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে, যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহারা নিম্নস্থ শাখাও থাইবে তদপেক্ষা উর্দ্ধস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্ব্বনিম্নস্থ শাখা সকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্কন্ধরাই আহার পাইবে—হ্রস্বস্কন্ধরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘস্কন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে রক্ষিত হইল। হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ একটি সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র২ বীজ জন্মে; একটি ক্ষুদ্র কীট, কত শত২ অণ্ড প্রসব করে। যদি সেই বীজ, বা সেই অণ্ড, সকল গুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই এক বৃক্ষেই, বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটি অণ্ড প্রসব করে, (ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে ষোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট হইবে তাহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসরে মনুষ্য সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র এই রূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষ্যও নহে কিন্তু ডার্বিন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে অতি ন্যূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসরমধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে।*

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কতগুলি বার্ত্তাকু—পরে ভাবুন বার্ত্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে।

* *Origin of Spicies*—6th *Edition.* p. 51.

তাহা হইলে একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে,যেখানে বার্ষিক দুইটি বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর২ প্রতি বৃক্ষের সহস্র২ বার্ত্তাকু বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্ত্তাকু বৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্ত্তাকুর স্থান হয়?

চেতন সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত তাহা এত প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে স্রষ্টা ও পাতা এক, একথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্ পাতা পৃথক্ একথা বলাই সঙ্গত?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীব ধ্বংসেরজন্য একজন সংহার কর্ত্তা কল্পনা করিয়াছ। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্য্য —যত সৃষ্টি হয় তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহার কর্ত্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে, এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই।

ইহার ও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায়, যে এজগতে অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীবসৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময় —জীবসৃজন প্রণালী অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি২ প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাঁহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্য প্রণীত একথা আর বলিতে পারিবে না, কেন না অদূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে, বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদর্শী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালন কর্ত্তা,

অপরিমিত জীব সৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে। এজন্য পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে, যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকার করিলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে, যে স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত; চৈতন্য নিষ্ফল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাঁহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং সৃষ্টি হইলেই তাঁহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল—রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিষ্ফলতা নাই।

অতএব, স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্ত্তা, পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য এমত বিবেচনা করা, অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এই স্রষ্টা পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে এই ত্রিদেবের উপাসনা এই রূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এই রূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি হইতে। বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়া ছিল, জন সাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে উহার সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি তাহাই আমরা দেখাইলাম।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না, যে তদ্দ্বারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই, যে জগতের নির্ম্মাণ কৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্ম্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলকেই নির্ম্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি। নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা

সংহার কর্ত্তা, এবং পৃথক্২ স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্ম্মাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই, যে সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে২ নিয়মের ফলে সৃজন, সেই২ নিয়মের ফলে পালন, সেই২ নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণ বিরুদ্ধ নহে, বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতক গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু এক জন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিলকৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে।

পঞ্চম, অনেকের বোধ হইবে যে এ সকল কথায় আমরা উপধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। কিন্তু প্রচলিত একেশ্বরবাদ যে উপধর্ম্ম নহে একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের বিবেচনায় ত্রিদেবোপসনাও উপধর্ম্ম, প্রচলিত একেশ্বরবাদও উপধর্ম্ম, এবং নাস্তিকতাও উপধর্ম্ম। হইতে পারে একোপাসনাই প্রকৃত ধর্ম্ম,—আমরা সে কথা অপ্রমাণ করিতে পারি না। আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই সন্ধান করিয়াছি; এবং বিজ্ঞান ত্রিদেবের অপেক্ষা সর্ব্বশক্তিমান্ একেশ্বরে অধিক আদর করেন না ইহা দেখাইয়াছি। তবে যদি কেহ বলেন যে বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিব না, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

ষষ্ঠ। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ সংস্কারে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনরুজ্জীবন অধিক সহজ, বিজ্ঞানসঙ্গত, এবং লোকানুমত হয় কি না?

সপ্তম। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে তদ্দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারেন, যে ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এ কথা আমরা বলি নাই, তাহা অভিপ্রেতও নহে। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। জগতের নির্ম্মাতা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে২ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মা স্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি। আমরা ত্রিদেবের উপাসক নহি।

সুখচর।

যথা রম্য মরুদ্বীপ মরু ভূমি মাঝে
জুড়ায় পথিক আঁখি শ্যামল শোভায়,
এ স্মৃতি নয়ন পথে তুমিও তেমনি,
সুখধাম সুখচর—সতত সুন্দর!
তব সেই সরোবর—কুসুম কানন—
বিশাল রসাল রাজী—চির দিন তরে
কে যেন রোপেছে আনি হৃদয়ে আমার!
যখনি সংসার তাপে জ্বলে এ অন্তর
ফিরাই কাতর আঁখি জুড়াইতে জ্বালা,
অমনি নয়নে ভাসে সেই সব শোভা;
সমীরণ আন্দোলিত কুসুম, পল্লব,
সরসী শীতল বারি, তৃণ সুশ্যামল।
বহুদিন হল আজি,—এখনো তেমনি,—
নারিব ভুলিতে তোমা থাকিতে জীবন!
আর কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময়?
জানি না অদৃষ্টে মম লিখেছে কি বিধি!
আর কি ভ্রমিব আমি সে ফুল্ল হৃদয়ে
মধুর বিজন স্থানে—বৃক্ষাবলিমাঝে?
মরি কি সুখের দিন গিয়াছে চলিয়া!
স্মৃতি মাত্র রেখে গেছে ভুবিতে হৃদয়!
মধুর বসন্ত নিশি—প্রভাত মধুর—
মধুর ঘুমের ঘোরে পশিত শ্রবণে
অস্ফুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি-লহরী,
বাতায়ন সন্নিহিত শাখা দল হতে
মাঝে মাঝে সকরুণ "বউ কথা কও"—
"বউ কথা কও" রবে ব্যথিত হৃদয়—
ভাবিতাম এত কিরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা—
এত যদি বাজে প্রাণে তবে কি কারণ—
মিছা দোষে—মিছা ভ্রমে—মানেতে মজিয়ে
প্রিয়জনে প্রিয়জন দেয় এ যাতনা?
শুনিতাম সুখে শুয়ে এ সকল রব
নীরব সময়ে সেই; প্রভাত সমীর—

গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ নির্জ্জন পুলিনে—
'অবিরাম সেই ধ্বনি স্বপনের মত'
মিশায়ে মধুর ভাবে স্বচ্ছ স্ফটিকের
দুল্যমান ঝালরের ঠুন্ ঠুন্ রবে,
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে;—
আবার ঘুমের ঘোরে মুদিতাম আঁখি।

ক্রমে দিক্ পরিষ্কার;—বিহঙ্গ কূজন,
গ্রামবাসি-কোলাহল, বাড়িতে লাগিল;
মাঝে মাঝে যাত্রী তরে নাবিক চীৎকার
শুনাযায় মুহু র্মুহু জাহ্নবী উপরে।—
এইরূপে পোহাইত সুখদ যামিনী।

উষার কোমল বিভা শোভিলে গগনে
যেতাম প্রফুল্ল মনে ভাগীরথী কূলে
দেখিতে তরঙ্গ-রঙ্গ প্রভাত সমীরে—
প্রকৃতির চারু শোভা ভুঞ্জিতে বিরলে।

ক্রমেতে উঠিত রবি কিরণ বিস্তারি,—
কষিত কাঞ্চন যেন সোহাগে গলায়ে
ঢালিত গগন গায় পূর্ব্বদিক্ ব্যাপি,
নির্ম্মল সরসী জলে—শ্যামল পাতায়
সুবর্ণ বারির ছটা দিত ছড়াইয়া;
অবশেষে তটিনীর তরঙ্গ নিকরে
অযুত তপন-রশ্মি পড়িত আসিয়া—
সেই সে সুবর্ণ রাগে হইয়া জড়িত
অসংখ্য লহরী মালা ঝিক্ মিক্ করি
নাচিতে লাগিত রঙ্গে জাহ্নবী-হৃদয়ে।
ক্রমে সেই রবিকর হইলে প্রখর,
পশিতাম হৃষ্ট মনে আপন মন্দিরে।
পুরাতন বাটী সেই তটিনী-পুলিনে,
তিন দিকে লতা পাতা কুসুম উদ্যান,
পশ্চিমে সরিৎগঙ্গা—সোপান উপরে
লৌহময় দ্বার তায় প্রবেশিতে পুরে।—
রম্য স্থান—রম্য বাটী—রম্য সে তটিনী,
জীবন স্বপনমত বহি যায় হেথা!

মধ্যাহ্ন-মিহির-করে ধরণী যখন
জ্বলন্ত অনল রূপ করিত ধারণ,
নীরব বিহঙ্গ যত,—কেবল কোথাও
অমঙ্গলরূপী সেই কালান্ত-বাহন
বায়সের কা! কা! রব—তৃষিত চাতক
সকাতর মৃদুস্বর সুদূর হইতে
অবিরত প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে,;
জুড়াতে নিদাঘ জ্বালা বসিতাম গিয়া
বিশাল-রসাল-মূলে নির্জ্জন কাননে।
পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর—তাহার পুলিনে
সুশ্যামল তৃণদল দুলিছে বাতাসে—
দুলিছে পল্লব-কুল—লাগিছে অঙ্গেতে
শীতল দক্ষিণ-বায়ু ঝুর্ ঝুর্ করি—
নীরবে ঝরিছে পাতা—ধরিছে ধরণী—
জগত জীবের মাতা—যতনে অঙ্কেতে।
মর্ মর্ পত্র শব্দে—শীতল ছায়ায়,
মুদি আঁখি দেখিতাম কতই স্বপন—
কতই কোমল ভাব উঠিত এমনে—
কেমনে-কাহারে-আমি কহিব প্রকাশি—
বুঝিবে বা কেবা। জ্বলিলে সংসারতাপে,
হৃদয় জ্বালায় যদি যাই কার কাছে—
প্রিয়জন, প্রিয়বন্ধু, প্রিয় সহবাসে
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে সে জ্বালা আমার!
শুদ্ধ মা তোমার শান্ত শ্যামল মূরতি
দেখিলে নয়নে মোর জুড়ায় জীবন!
আর কিছু এসংসারে ভাল নাহি লাগে!

বৃক্ষ-অন্তরালে ক্রমে নামিলে তপন,
ব্যাপিলে সুখদ ছায়া ধরণী অঙ্গেতে,
উঠিতাম তথা হতে। সরসী উত্তরে
আছে এক তীর্থরম্য, পূর্ব্ব পাশে তার
একটি বকুল গাছ,—দেখিতে সুন্দর,
নিবিড় পাতায় ঢাকা, নবীন বয়স,
অসংখ্য বকুল ফল রাঙ্গা রাঙ্গা তায়;
নীল, পীত, নানাবর্ণ ক্ষুদ্র পাখী কত
রাঙ্গা ফল লোভে আসি বকুল শাখায়
বসিয়া মনের সুখে গায় নিরন্তর!
এই তরুতলে আসি বসিয়া তখন,
শীতল সলিল মাখা মন্দ সমীরণ
সেবিতাম মন সুখে সোপান উপরে,
দেখিতাম স্বচ্ছ জলে মৎস্যদের ক্রীড়া,
মৎস্যরঙ্ক-মৎস্যধরা—আরো শোভা কত
মধুর শীতল ভাব উপজিত মনে।

পরে বেলা ঝিক্ মিক্ করিয়া আসিলে
ত্যজি সে বকুল তরু, ত্যজি সরোবর
যেতাম জাহ্নবী কূলে মনের আনন্দে
দেখিতে তপন অস্ত তরঙ্গিণী পারে,
দ্বাদশ মন্দির পাছে, অপূর্ব্ব সে দৃশ্য!
প্রাচীন দেউল সেই, কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণ—
সম্মুখে দ্বাদশ ক্ষুদ্র পাদপ সুন্দর;
দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গা বহিছে নিম্নেতে!
পবিত্র তটিনী বারি—মোক্ষদা মহীতে!
পশ্চাতে বৃক্ষের শ্রেণী সুদূর বিস্তৃত।
দেখেছে যে এক বার এই রম্য স্থানে
রবি অস্ত শোভা, নারিবে ভুলিতে কভু।
এক দিন সূর্য্য অস্ত দেখিবার আশে
গেলেম গঙ্গার কূলে, দেখিনু গগনে
নাহিক তপন; শুদ্ধ নীল মেঘ যত
নিবিড় ব্যাপিয়া নভে বহ্নি প্রান্ত প্রায়;
আগ্নেয় নক্ষত্র এক দেখিনু সহসা
ফুটিয়া নীরদ চাঁদ জ্বলিতে লাগিল;
বিস্ময় হইনু হেরি সে দৃশ্য গগনে!
ক্রমশঃ বাড়িল তারা বোধ হ'ল যেন
অগ্নিময় রাজ্য এক আছে মেঘ পাছে।
তপন মণ্ডল শেষে হইল বাহির!
চারিদিকে নীল মেঘ, সে মেঘের গায়
সুদীর্ঘ সুবর্ণ ছটা পড়েছে আসিয়া।
ক্রমে নীল তল হতেগোলাপরঞ্জিত
বিচিত্র গগন গায় নামিল তপন,
সুবর্ণের চাপ্ যেন—মধ্যদেশ তার
বিভক্ত শ্যামল মেঘে, দৃশ্য মনোহর!
অবশেষে তাম্র বর্ণ ধরিয়া তপন
ডুবিল মন্দির পাছে দেখিতে দেখিতে।

দিবা অবসান। ক্রমে আইল যামিনী;
পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায় পশিল,
সন্ধ্যার উজ্জ্বল মণি শোভিল গগনে;
নৌকায় জ্বলিল দীপ সহস্র আলোক
ভাতিল বিমল জলে জাহ্নবী হৃদয়ে,
শান্ত ভাব ধরি মহী লভিল বিরাম।
হইলে চাঁদনী রাতি, উঠিত যখন
রজতের চাপ সম বৃক্ষ অন্তরালে
ভুবন মোহন সেই সুধাংশু সুন্দর,
হাসিত কুসুম কুল—হাসিত কানন,
হাসিত জাহ্নবী দেবী—হাসিত গগন,
কুসুম স্তবকমাঝে পশিয়া দুজনে
আমি ও আমার প্রিয়া—তুলিতাম কত
মল্লিকা, মালতী, যূথি, সুগন্ধী কুসুম;

সেই সে ফুলের দল একত্র মিশায়ে
মনোহর মালা প্রিয়া গাঁথিত যতনে,
দেখিতাম কাছে বসি কিবা চন্দ্রালোকে
বিমল চন্দ্রিকা মাখা ফুল দল পাশে
প্রেয়সীর মুখচন্দ্র হয়েছে মধুর!
অনিমিষ মুখপানে থাকিতাম চাহি।
অবশেষে সেই মালা দিতাম পরায়ে
দুজনে দুজন- গলে প্রেমের সোহাগে,
হাত ধরা ধরি করি পশিতাম গৃহে।
যথা সেই স্তম্ভ প্রান্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার,
মর্ম্মর খচিত তল প্রকোষ্ঠ সুন্দর,
বসিতাম গিয়া তথা। সম্মুখে জাহ্নবী,
অবিরাম বীচিরব পশিছে শ্রবণে,
হু হু করি সমীরণ বহিছে তথায়,
উদাস করিছে মন—এসংসার হতে
কোথা যেন অন্তরিত করিয়া রাখিছে।
প্রহরান্তে পশিতাম শয়ন মন্দিরে,
লভিতে সুখদনিদ্রা সুখদ শয্যায়,
দেখিতাম চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল সে গৃহ
নিদ্রিত গৃহস্থ সব—নীরব জগত;
কেবল কখন সুদূর বাজনা শব্দ,
কভু বংশীধ্বনি, কভু নাবিক সঙ্গীত
নিথর আকাশ তলে তুলিছে তরঙ্গ,
মধুর বসন্ত-বায়ু বহিছে মধুর;
অবশেষে নিদ্রাবেশে মুদিয়া নয়ন
সুখের স্বপনস্রোতে যেতাম ভাসিয়া।

কভু বা সন্ধ্যার আগে পশিয়া কাননে
বসিতাম শীলাতলে ভাগীরথী তীরে।
কহিত আমারে প্রিয়া "দেখ কেবা আগে
দেখিবারে পায় তারা একটী আকাশে।"
একদৃষ্টে দুইজনে আকাশের পানে
একটী তারার আশে থাকিতাম চেয়ে,
দেখিলে একটী তারা প্রেয়সী আমার
করতালি দিয়া উঠি সদর্পে কহিত,
"দেখেছি আগেতে তারা ওই যে আকাশে!"
এই মত কত দিন যাপিনু তথায়।
আর কি সুখের দিন আসিবে ফিরিয়া?
না এ জন্মের মত গিয়াছে চলিয়া?

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

দেবতত্ত্ব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগতে সজীব নির্জীব দুই প্রকার পদার্থ আছে। সুতরাং বিশ্বকারণসম্বন্ধে কোন রূপ কল্পনা করিতে হইলে, হয় জড়জগৎ নতুবা প্রাণিমণ্ডলী এ দুয়ের মধ্যে একটিকে অবলম্বনভূমি করিতে হয়। জড়জগতের তিমিরহারী আলোকপ্রকাশে এবং প্রাণিমণ্ডলীর জীবোৎপত্তি ব্যাপারে যেরূপ সৃষ্টির ভাব লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এ নিমিত্ত এই দুইটী ঘটনা লইয়াই প্রাচীন কালে যথাক্রমে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুই প্রকার উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বেদ, পারস্যের জেন্দাবেস্তা, এবং গ্রীসের ইলিয়ড্ ও ওডিসি, পাঠ করিয়া জানা যায় যে প্রাচীন আর্য্যেরা দেবোপাসক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে কাল্ডীয়, আসিরীয়, মৈসরীয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পার্থিব অগ্নি, অন্তরীক্ষ বিহারী অশনিধারী ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশবাসী দিবাকর, বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন; এবং অন্য সকল দেবতা তাঁহাদিগেরই রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌর প্রকৃতিসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এবার শিবের বিষয়ে কয়েকটী কথা বিশেষ করিয়া বলিতে চাই।

বেদে শিব নামে কোন দেবতা দেখা যায় না; কিন্তু মঙ্গলকর অর্থে শিবশব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। যখন শিবের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, যখন তিনি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে রুদ্র বলে। বেদের অনেক স্থলে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় রুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই। তিনি কখন সূর্য্যরূপী, হেমবর্ণ, রথারূঢ়, ও ধনুঃশরধারী; কখন বায়ুভাবাপন্ন, মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশায়ী; কখন অগ্নিমূর্ত্তি, কপর্দ্দী, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ, বিলোহিত, হিরণ্যপাণি ইত্যাদি। বোধ হয় যেখানে উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা ক্রোধ দৃষ্ট হইত, সেখানেই আদৌ রুদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইত। বায়ু ও অগ্নির কোপ সচরাচরই লক্ষিত হয়। সুতরাং বায়ু ও অগ্নি হইতেই রুদ্রের অনেক নাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকায় সহস্র সহস্র গৃহ বৃক্ষ প্রভৃতি সহসা বিনষ্ট হয়, এবং পর্ব্বতশিখরেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়; সুতরাং রুদ্র যে মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশ বলিয়া উক্ত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা অগ্নি শিখার আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে কপর্দ্দী অর্থাৎ জটাধারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নাম কিরূপ সুসঙ্গত। রুদ্রের অষ্টমূর্ত্তি। এই অষ্টমূর্ত্তি সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"অভূদ্বেয়ম্ প্রতিষ্ঠেতি। তদ্ভূমিরভবৎ। তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যভবৎ। তস্যামস্যাম্ প্রতিষ্ঠায়াম্ ভূতানি ভূতানাঞ্চ পতিঃ সংবৎসরায়াদিক্ষন্ত। ভূতানাম্ পতির্গৃহপতিরাসীদুষাঃ পত্নী। তদ্যানি তানি ভূতানি ঋতবস্তে। অথ যঃ স ভূতানাম্ পতি সম্বৎসরঃ সঃ। অথ যা সা উষা পত্নী ঔষসী সা। তানি ইমানি ভূতানি চ ভূতানাঞ্চ পতিঃ সম্বৎসর উষসি রেতোঽসিঞ্চন্। স সম্বৎসরে কুমারোঽ

জায়ত। সোঽরোদীৎ। তাম্ প্রজাপতিরব্রবীৎ "কুমার কিং রোদিসি যচ্ছ্রমাৎ তপসোঽধিজাতোঽসীতি।" সোঽব্রবীৎ 'অনপহতপাপ্মা বাস্মি অহিতনামা নাম মে দেহী' তি। তস্মাৎ পুত্রস্য জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাপ্মানমেবাস্য তদপহন্ত্যপি দ্বিতীয়মপি তৃতীয়মভিপূর্ব্বমেবাস্য তৎপাপ্মানমপহন্তি। তমব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ অগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাৎ রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ সর্ব্বোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদাপস্তদ্রূপমভবন্নাপোবৈ সর্ব্বোঽদ্ভ্যোহি ইদম্ সর্ব্বম্ জায়তে। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ পশুপতিরসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ ওষধয়স্তদ্রূপ মভবন্নোষধয়ো বৈ পশুপতি স্তস্মাদ্যদা পশব ওষধি র্লভন্তেঽথ পতিয়ন্তি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ উগ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ বায়ু স্তদ্রূপমভবৎ বায়ুর্বৌগ্রস্তস্মাৎ যদা বলবদ্বাতি উগ্রো বাতি ইত্যাহুঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীদশনি রসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদ্বিদ্যুৎ তদ্রূপ মভবৎ বিদ্যুদ্বা অশনি স্তস্মাদ্যম্ বিদ্যুদ্ হন্ত্যশনিরবধীদিতি আহুঃ। সোঽব্রবীজ্জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ভবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ পর্জ্জন্যস্তদ্রূপ মভবৎ পর্জ্জন্যো বৈভবঃ। পর্জ্জন্যাৎ হীদম্ সর্ব্বম্ ভবতি। সোব্রবীৎ জ্যায়ান বা অসতোস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ মহাদেবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোচ্চন্দ্রমাস্তদ্রূপ মভবৎ প্রজাপতি র্বৈ চন্দ্রমা প্রজাপতি র্বৈ মহান্ দেবঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ঈশানোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ আদিত্যস্তদ্রূপমভবৎ আদিত্যো বা ঈশান আদিত্যোহি অস্য সর্ব্বস্য ঈষ্টে। সোঽব্রবীৎ এতাবান্বাস্মি মা মেতঃপরোনামধেতি। তান্যেতান্যষ্টাবগ্নি রূপানি কুমারো নবমঃ।"

অর্থাৎ

"এই অধিষ্ঠান ছিল। তাহা ভূমি হইল। তাহা বিস্তৃত করা হইলে পৃথিবী হইল। এই অধিষ্ঠানে ভূত সকল ও ভূত সকলের পতি সম্বৎসর দীক্ষিত হইলেন। ভূতদিগের পতি গৃহপতি ছিলেন, উষা পত্নী। এই যে ভূত সকল তাহারাই ঋতু; এই যে ভূত সকলের পতি সে সম্বৎসর। আর এই যে পত্নী উষা সে ঔষসী। এই ভূত সকলও তাহাদিগের পতি সম্বৎসর উষাতে বীজক্ষেপ করিলেন। সম্বৎসরে কুমার জন্মিল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন, "কুমার কেন কাঁদিতেছ? অনেক শ্রমে ও তপস্যায় তোমার জন্ম।" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই, আমার নাম নাই, আমাকে নাম

দাও।" এই নিমিত্ত পুত্র জন্মিলে তাহার নামকরণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপনাশ হয়; এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাম দিবে; ইহাতেও পাপনাশ হয়। প্রজাপতি কুমারকে বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র হউক।" তাহার যখন এই নামকরণ হইল, অগ্নি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ অগ্নিই রুদ্র, রোদন করিয়াছিল, বলিয়া রুদ্র। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি সর্ব্ব হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, জল তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ জলই সর্ব্ব, জল হইতে এ সকল জন্মিয়াছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি পশুপতি হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, ওষধি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ ওষধিই পশুপতি; এই নিমিত্ত পশুরা ওষধি পাইলে পরাক্রান্ত হয়। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি উগ্র হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, বায়ু তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বায়ুই উগ্র, এই নিমিত্ত যখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে, লোকে বলে যে উগ্র বহিতেছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি অশনি হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, বিদ্যুৎ তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বিদ্যুৎই অশনি, এই নিমিত্ত যে বিদ্যুতের আঘাতে মরে, লোকে বলে অশনির (অর্থাৎ বজ্রের) আঘাতে মরিয়াছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ভব হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, পর্জ্জন্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ পর্জ্জন্যই ভব, পর্জ্জন্য হইতেই সকল হয়। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি মহাদেব হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, চন্দ্রমা তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ প্রজাপতিই চন্দ্রমা, প্রজাপতিই মহাদেব। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ঈশান হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, আদিত্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ আদিত্যই ঈশান, আদিত্যই এসকল শাসন করিতেছেন। সে বলিল, "আমি এত হইয়াছি; আমাকে আর নাম দিও না।" অগ্নির এই আটটী মূর্ত্তি, কুমার নবম।"

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যে উপাখ্যানটী উদ্ধৃত হইল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, রুদ্রের রূপে অগ্নিরই প্রবলতা, কিন্তু তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিরও স্থান আছে। প্রাচীন কালে যে সকল দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, সকলই সময়ে সময়ে

ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। সূর্য্য কখন কখন দেশ দগ্ধ করিতেন। বায়ু সময়ে সময়ে বৃক্ষ উন্মুলিত, গৃহ ভগ্ন ও নৌকা জলমগ্ন করিতেন। অগ্নি কখন কখন লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিতেন। অশনির আঘাতে সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ যাইত। প্রবল জলপ্লাবনে কখন কখন জনপদ সকল বিনষ্ট হইত। ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিতে কখন কখন বিলক্ষণ অপকার করিত। মনোহর চন্দ্রমাও সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত হইয়া ভয়বিস্তার করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক দেবতারই কখন কখন উগ্রভাব লক্ষিত হইত। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্রই রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলের উগ্রতার সমষ্টি লইয়া রুদ্রের বিরাট মূর্ত্তি বিরাজমান হইল। ইহাতে কালে কালে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি কেন না তাঁহার নিকটে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে? কি প্রকারে বৈদিক দেবতাদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়, স্থির করা সহজ নয়; কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, সমুদায় প্রাচীন দেবতার উগ্রভাব লইয়া শিবের এবং সৌম্যভাব লইয়া বিষ্ণুর সৃষ্টি, এবং এই কারণে লোকে ক্রমে অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে। হয় ভয় নয় ভালবাসা এই দুইটার মধ্যে কোন একটার বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ লোকে অতিমানুষিক শক্তির উপাসনা করিতে যায়। ইহার মধ্যে একটী হইতে শৈবধর্ম্মের, এবং অপরটী হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের শিব কেবল বৈদিক রুদ্র নহেন। তিনি লিঙ্গমূর্ত্তিতে পূজিত। অথচ বৈদিক ঋষিদিগের কোন উপাস্য দেবতাই লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত নহেন, এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অতি প্রাচীন কালে অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিদিগের নিকট হইতে আর্য্যেরা এপ্রকার শিব পূজা পদ্ধতি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেক দূর সম্ভব। শৈব উপাসনা যে অনার্য্যভাবাপন্ন, নিম্নে তদ্বিষয়ের কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

(১) বেদে লিঙ্গোপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ আছে। ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে,

"স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপিগুঋ্তংনঃ।"

অর্থাৎ "ইন্দ্র শত্রুদিগকে শাসন করুন যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদিগের যজ্ঞের নিকট না আসিতে পারে।" ইহাতে বোধ হয়, যে, যে দস্যুগণ আর্য্য ঋষিদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন করিত, তাহারা লিঙ্গোপাসক ছিল। রামায়ণের অনেকস্থানে বর্ণিত আছে যে রাক্ষসেরা যজ্ঞ কালে মুনিদিগের প্রতি অনেক উৎপাত করিত। রাক্ষসেরা যে আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী স্বতন্ত্রধর্ম্মাক্রান্ত অনার্য্য জাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং উত্তরকাল-

বর্ত্তী বর্ণনা দ্বারা বৈদিক শ্লোকার্থের সমর্থনই হইতেছে।

(২) স্মৃতিতে ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা নিষিদ্ধ দেখা যায়। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে লিখিত আছে,

শূদ্রাদীনাস্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়া প্রযত্নতঃ॥
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তদব্রহ্মণ্যবিষয় মেব মাহ প্রজাপতিঃ॥
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষূচ গীয়তে।
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং নেতরেষাং
তদুচ্যতে॥

অর্থাৎ

শূদ্রাদিদিগের যত্নপূর্ব্বক রুদ্রাদি অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পুরাণে ও স্মৃতিতে যেখানে রুদ্রার্চ্চনার কথা আছে, তাহা ব্রাহ্মণের জন্য নহে, প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণে রুদ্রার্চ্চনা ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের জন্য উক্ত হইয়াছে, অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য নহে।

(৩) রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে রাক্ষস ও দৈত্যগণ মহাদেবের ভক্ত বলিয়া বর্ণিত, এবং মহাদেবকেও অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্ট হয়।

(৪) ইতিহাস পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞভঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় শিব পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ পাইতেন না, অনেক মারামারির পরে তিনি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন। রামায়ণে প্রথমে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। হরধনু সম্বন্ধে জনক বলিতেছেন,

"দক্ষযজ্ঞ বধে পূর্ব্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বস্য ত্রিদশান্ রুদ্রঃ সলীল মিদমব্রবীৎ॥
যস্মাদ্ ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত
মে সুরাঃ।
বরাঙ্গাণি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বা॥
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রাসাদয়ন্ত দেবেশম্ তেষাং প্রীতো
ঽভবদ্ ভবঃ॥
প্রীতশ্চাপি দদৌ তেষাং তান্যঙ্গানি
মহৌজসাং।
ধনুষা যানি যান্যসন্ শাতিতানি মহাত্মনা॥
তদেতদ্ দেব দেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ।
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তং অস্মাকম্ পূর্ব্বকে
বিভো॥

অর্থাৎ

"পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নাশ কালে বীর্য্যবান্ রুদ্র ধনুরাকর্ষণ করিয়া দেবতাদিগকে পরাজয় করত উপহাস করিয়া এই বলিয়া ছিলেন, "দেবগণ, আমি ভাগার্থী হইলেও তোমরা আমাকে ভাগ দাও নাই; আমি ধনু দ্বারা তোমাদিগের মহার্হ বরাঙ্গ সকল কর্ত্তন করি।" অনন্তর, হে মুনিপুঙ্গব, দেবতা সকল বিমনা হইয়া মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি প্রীত হইলেন। মহাদেব ধনু দ্বারা মহাতেজসম্পন্ন দেবতাদিগের যাহার যে অঙ্গ কাটিয়াছিলেন, প্রীত হইয়া প্রদান করিলেন। এই সেই ধনুরত্ন, মহাদেব ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে ন্যস্ত করেন।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে

যে অন্য দেবগণকে রথারোহণে দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া উমা পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনিও কেন যাইতেছেন না। মহাদেব উত্তর করিলেন,

"সুরৈরেব মহাভাগে পূর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতং।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ॥
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ॥

অর্থাৎ

" হে মহাভাগে, দেবতাদিগের প্রাচীন অনুষ্ঠান এই যে কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। হে বরবর্ণিনি, পূর্ব্ব পদ্ধতি নির্দ্ধারিত মার্গানুসারে ধর্ম্মতঃই দেবতারা আমাকে যজ্ঞের ভাগ দেয় না।"

(৫) শিবের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করা যায় না। বহ্বৃচ গৃহ্য পরিশিষ্টে লিখিত আছে,

অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রাম শিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বোযাতি পবিত্রতাং॥

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিবনৈবেদ্য গ্রহণীয় নহে। শালগ্রাম শিলাস্পর্শে সকল পবিত্র হয়।"

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে,

অভক্ষ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদ্‌ভবেৎ সদা॥

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিব নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য। শালগ্রামশিলা-যোগে তাহা সদা পবিত্র হয়।"

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র শিবভক্ত কোন এক ব্যক্তির রচিত। তাহাতে মহাদেবকে জিজ্ঞাসিত হইতেছে,

দুর্ল্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতং॥

"হে কৃপানিধে, তোমার নির্ম্মাল্য ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ। তবে, হে পরমেশ, তব নির্ম্মাল্য দূষিত কেন?"

মহাদেব উত্তর করিলেন যে তাঁহার কণ্ঠে বিষ আছে বলিয়া লোকে তাঁহার নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করে না। উত্তরটি ঠিক হউক আর না হউক, মহাদেবের নৈবেদ্য যে গ্রহণ করা যায় না ইহা শিবভক্তেরাও স্বীকার করেন।

(৬) চণ্ডাল চর্ম্মকার প্রভৃতি অতি হেয় জাতিও স্বহস্তে শিবপূজা করিতে পারে। কিন্তু দ্বিজসহায়তা ব্যতিরেকে অন্য দেবতার পূজা হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে শিবপূজাপদ্ধতি অনার্য্য-ভাবাপন্ন, এবং তন্নিমিত্তই অনার্য্য বংশ সম্ভূত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ আপনা আপনি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিতে ও নৈবেদ্যাদি দিতে অধিকারী। আর বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৭) পুরাণাদিতে শিবের যে প্রকার মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, তাহা সভ্য আর্য্যজাতিদিগের কল্পিত বলিয়া প্রতীত হয় না। গলায় হাড়ের মালা, অঙ্গে ভস্ম মাখা, মস্তকে সর্প, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা দিগম্বর, সঙ্গে ভূত প্রেত, সিদ্ধি ও ধূতুরা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিকৃতাকার; উপাস্য দেবতার ঈদৃশ রূপ আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তা সমুদ্ভূত না হইয়া অসভ্য দস্যুদি-গের কল্পনার ফল হইবারই সম্ভাবনা।

কি প্রকারে অনার্য্য মহাদেব বৈদিক রুদ্রের সহিত এক বলিয়া গণ্য হইল, স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু অনুমান হয় যে স্বভাবসাদৃশ্য এরূপ একতার প্রতিপাদক হইয়াছিল। অনার্য্য মহাদেব এবং বৈদিক রুদ্র, উভয়েই ভীম মূর্ত্তি, উভয়েই উগ্রপ্রকৃতি। আর সাঁওতালদিগের উপাস্য গিরিদেব ও প্রাচীন অনার্য্য মহাদেব যদি একই দেবতা বলিয়া ধরা যায়, রুদ্রের গিরিশ নাম দ্বারাও একতা সংস্থাপনের একটি উপায় লক্ষিত হয়। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমি জয় করিয়া অনেক দস্যু প্রজা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যখন উক্ত প্রজারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে দাসরূপে স্থান পাইল, তখন ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক বিবাদের পরে প্রজাদিগের প্রীতি লাভ দ্বারা রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনায় দ্বিজগণ এতদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের পরমপূজনীয় মহাদেবকে রুদ্র মূর্ত্তি বলিয়া উপাস্য দেবতা দলভুক্ত করিয়া লন, এপ্রকার কল্পনা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অপেক্ষা শিব কেন বড় হইয়া উঠেন, তাহার আর একটি কারণ বুঝা যায়। অনার্য্য ভারতবাসীদিগের সংখ্যা আর্য্যদিগের অপেক্ষা অধিক; সুতরাং অনার্য্য জাতিগণ হিন্দু সমাজ ভুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের নিকটে শিবের সমাদরাধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। একে ত রুদ্র সর্ব্বত্র স্বীয় ক্রোধ-প্রজ্জ্বলিত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র চন্দ্র রবি বহ্নি অপেক্ষা আপনার প্রতাপ বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ভারতীয় লিঙ্গোপাসকদল তাঁহাকেই তাহাদিগের মহেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, রুদ্রের ক্ষমতা কেন না অনিবার্য্য ও বহুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জড়জগৎ ও জীবমণ্ডলী এই দুইটি হইতে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুইটি উপাসনা পদ্ধতির উৎপত্তি। এই দুই প্রকার উপাসনার সংযোগে শৈব উপাসনা সংগঠিত, সুতরাং ভারতবর্ষে যে শিবপূজা বহুকাল প্রবল রহিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কোন্ সময়ে আর্য্য ঋষিগণে লিঙ্গোপাসনার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ ও বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদে যে লিঙ্গোপাসনার আভাস আছে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। সুতরাং বৌদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বে যে শিব শক্তির সমাদরের সূচনা হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে।

শিব যে অনেক দেবতার সমষ্টি শিবানীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালী ও করালী এই দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম।* পার্ব্বতী, হৈমবতী, গিরিজা, এসকল গিরিশায়ী বায়ুপত্নীর নাম। গৌরী নামটি সূর্য্যজায়া উষা হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, শক্তি, এসকল নাম লিঙ্গোপাসনা হইতে সমূৎপন্ন তাহার সন্দেহ নাই।†

---

*কালী করালী মনোজবাচ সুলোহিতা যাচ সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপীচ দেবী লেলায়মানা দহনস্য জিহ্বাঃ।

মুণ্ডক উপনিষদের টীকা

† এই প্রবন্ধ, এবং "মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম্ম" শির্ষক প্রবন্ধ যে ভিন্ন২ লেখক প্রণীত, ইহা বুদ্ধিমান্‌কে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য।

বং সং।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ।

বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্যকলাপ বৈদিক ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহার অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেন না বেদ ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড,—সমাজশত্রু। বৈদিক আচার ব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য২ পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দুরপরাহত। সাধারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এসময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতিদুর্ল্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য্য কলাপ অনুষ্ঠানে আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের এক মাত্র কর্ত্তা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই পথে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং ভারত সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্য সিংহ উদয় হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁর প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডীয় নবোত্তর শততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

> যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ
> স্তথাগতং নাস্তিক মত্র বিদ্ধি।
> তস্মাদ্ধিয়ঃ শক্যতম প্রজানাং
> ন নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥

অর্থাৎ যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে,

অতএব যাহাকে বেদবহিস্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ু, কল্কি পুরাণে গণেশ শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্য বুদ্ধ। ইহাঁর পূর্ব্বে ৫৫ বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্য সিংহ "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" মর্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বসুভপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক যথা ললিত বিস্তারে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

জ্ঞান প্রবভং হত তম সুপ্রভাকরং শুভ
পদং শুভ বিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্ত কায়ং শুভ শান্ত মানসং মুনিং
সমাশ্লিষ্যন্ত শাক্যসিংহম্।
জ্ঞানোদধিং শুদ্ধ মহানুভাবং ধর্ম্মেশ্বরং
সর্ব্ববিদং মুনীশম্ ইত্যাদি ॥

অভিধান মধ্যে শাক্য সিংহের নামান্তর যথা—খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুন্নি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী; মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী সুত; গৌতম। হেমচন্দ্র তাঁহার এই কয়েকটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেন্দু, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমানেয় মায়াসুত, শুদ্ধোদন সুত।

অমর কোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা "শুদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্য সিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। "শাক্য বংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষে (শেগুন) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐ ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত। আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন, যথা "শাক্য বংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি —শাকো বৃক্ষ বিশেষঃ তত্রভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যোঃ পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষাকু বংশীয়া গৌতমবংশজকপিল মুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যো উচ্যতে তদুক্ত "শাক বৃক্ষ প্রতি-

* রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

চ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষাকু বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতিশ্রুতাঃ।” শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্য সিংহ প্রকৃত ইক্ষাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গৌতম বংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িত ভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু* নগরেব রাজা ছিলেন। আর্ষ অভিধানে লিখিত আছে শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন যথা “শুদ্ধোদন যতো ভুংক্তে ন্যায়বান্ শুদ্ধমোদনম্।” ললিত বিস্তারে লিখিত আছে শাক্য সিংহ জম্বু দ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দ্দোষ জানিয়াছিলেন—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে, প্রদোতন কুল, মথুরা, হস্তিনায়,পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন— “পাণ্ডব কুলপ্রসূতৈঃ কৌরব বংশোহতি ব্যাকুলী কৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি ভীম সেনো বায়োঃ—ইত্যাদি—” একুলের দোষ হইল যে পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এই রূপ সকল বংশেই দোষ, কেবল মাত্র শাক্য বংশ নির্দ্দোষ।

শাক্য কপিল বস্তু নগরে বসন্ত কালে শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়া দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বোধিসত্ব যে কালে তুষিত পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, সেই সময় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যথা—

“হিম রজত নিভশ্চ ষড়্বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদরং মুপগতো গজো প্রধানো ললিত গতি দৃঢ় বজ্রগাত্র সন্ধিঃ।” অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্ত যুক্ত, মনোজ্ঞকর, সুরক্ত শীর্ষদেশ, একটী গজ মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন,তাহা বর্ণন করা যায় না “নচ মম সুখ জাতু এবরূপং দৃষ্টমপিশ্রুতং নাপি চানুভূতম্।” ভাবিলেন একি! কখন আমার এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণ করি নাই। নিদ্রা ভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্ন বিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণক দিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার

* নেপাল দেশের পর্ব্বত সন্নিকটে।

সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈব বাণী হইল যথা—“তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।” অর্থাৎ হে নৃপতি তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব তুষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন, বলিয়া এই মায়া দেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন। মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল যথা—তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না—হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশ হইয়াছিল—শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল বাদ্য যন্ত্র ছিল তাহা সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, তাহার এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে।

উরোপীয় পণ্ডিত গণের মতে শাক্য সিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়া দেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগ্নী দ্বারা অতি যত্নের সহিত প্রতি পালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্র মুখ নিরীক্ষণে দিন২ আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্য অচির কাল মধ্যে বহু-বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে একদণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে২ তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসারে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, যে “যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথা গতোভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ, উত নাভি নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তীচ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্ন সমন্বাগতঃ” (১২ অধ্যায় ললিত বিস্তর)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং আর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

রাজা শুদ্ধোদন কন্যার অন্বেষণ করিবার আদেশ মাত্র শতশত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্য সিংহ মনে২ বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে ধ্যেয় সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহাতে আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জল মধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে কদাচিৎ থাকিয়াও বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব২ বোধিসত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে ভার্য্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক। ইহার মূল "বিদিতং ময়ানন্ত কাম দোষাঃ শরণ সর্ব্ববাস শোক দুঃখমূলা ভয়ঙ্কর বিষপত্র সন্নিকাসা জ্বলননিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ, কামগুণে নমেস্তি চ্ছন্দং রাগো নচাহং শোভে স্ত্র্যাগার মধ্যে যোন্বহমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীম্ ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্ত ইতি।"

"সঙ্কীর্ণ পঙ্কি পতুমানি বিবৃদ্ধিমেন্তি,
আকীর্ণ রাজ্ঞু জলমধ্যে লভাতি পূজাম্,
যদি বোধিসত্ব পরিবার বলং লভন্তে,
তদসত্ব কোটি নিযুতান্যমৃতে বিনেন্তি॥
যেচাপি পূর্ব্বক অভূষিদ্বিদু বোধিসত্বাঃ,
সর্ব্বেভি ভার্য্যাস্থত দর্শিতিইস্ত্রীগারাঃ
নচ রাগ রক্ত নচ ধ্যান সুখেভিভ্রষ্টা
হন্তানু শিক্ষয়ি অহংপিগুণেষু তেষাং।
(১২ অঃ)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ। যস্যা এতে গুণাঃসন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও।

রাজা শুদ্ধোদন, নিজনগরে প্রচার করিলেন,

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিত গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না; গুণ, সত্য, ও ধর্ম্মেই কুমারের মন, ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন। "অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য

দুহিতা শাক্য কন্যা সা দাসী শত পরিবৃতা” ইত্যাদি

কিছুকাল দম্পতি অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শাক্য সিংহ সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতেন।

“সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা নচ
শাশ্বতাপি, ন কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা,
বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা ॥

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসারের সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা এক বারও চিন্তা করি না। সারথি! রথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য একদিবস শাক্য সিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজন পরিত্যক্ত বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃক্ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কর যোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, “হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের এতাদৃক্ হীন অবস্থা হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এই রূপ তৃতীয় বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, যৌবন গর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য

ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনাশ হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এই স্থান চিরসুখের হইত।" তাহার পর মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে২ নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্ত মূর্ত্তি, রোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দ চিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয় এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমত জীবনকেও ধিক্—হায়!

ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন॥
ধিগ্জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গে॥

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি, মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ* জন্য একমাত্র দুঃখ স্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে। এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্তব্য। যথা।

যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
স্তথাপিচ মহদ্দুঃখংপঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুন র্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥

* দুখংসংসারিণঃ স্কন্ধাস্তেচপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেবচ। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং রূপ এই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহাই সাংসারিক আত্মার দুঃখ হেতু।

এই রূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজল নেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন যথা

"ইচ্ছামি দেব জ্বর মহনমাক্রমেয়া।'
শুভ্রবর্ণ যৌবন স্থিতোভবি নিত্য কালং॥'
আরোগ্য প্রাপ্তু ভবিনোচ ভবেতব্যাধি।'
রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যুঃ॥

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন; "হে পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

এক গভীর রজনীযোগে শাক্য সিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করত অনোমানদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে† আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ৬ বর্ষকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহা প্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমেই তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধিদ্রুম মূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

৫৮৮ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া বারানসীতে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ

† বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর পূর্ব্বাংশে বদরীকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী।

বিম্বসরের প্রযত্নে রাজগৃহে বক্তৃতা কালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কালান্তক বিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন২ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শাক্য সিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভি-ব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি শ্রাবস্তীতে* বাস করেন; তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি কপিল বস্তুতে গমন ক-রিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্য বংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই রূপ ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশী নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্য বর্গকে ধর্ম্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞা-সা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপ-স্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু কালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল; কিন্তু অর্হতগণ পৃথি-বীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোক-বেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত ক-রিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংশ হইয়া ভস্মাবশিষ্ট রহিল। ভিক্ষুগণ সেই ভস্ম-রাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ

* শ্রাবস্তী ইহা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অবস্থিত। এই নগর এত প্রাচীন যে ইহার উল্লেখ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়।

পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে২ নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র২ অস্থি খণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই ৮স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অষ্টস্তূপ নির্ম্মিত হইল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ২ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐসকল মন্দির বিশেষ২ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্য দেবের ন্যায় তাঁহার মত শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক মৃত্যু অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত স্থবির ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আনন্দকে কহিয়াছিলেন যে, "আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য"। এতদ্‌বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন। এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণি শিখর মূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এসময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপের ক্রমেই হতাদর হইতে লগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই বন্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈরনির্য্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডাশোক বলিত। তৎপরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর

বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইহাঁকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারিবৎসরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহাঁর করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।" অসংখ্য প্রচারকেরা ইহাঁর অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে২ নগরে২ এবং পুরস্ত্রীবর্গের নিকটও ধর্ম্মপ্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে খ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে। ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলী, গুজরাটে গির্ণারে শিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দ গিরি অঙ্গে, অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। এই সকল লিপি আলোচনায় উরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়োকস্, টলেমী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত বর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোক-পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃপূঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্য দিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

" ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি। উৎপাদাদ্বা তথাগতানাং মনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং, ধর্ম্মিতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতা ইতি—অথ পুনরয়ং প্রতীত্য সমুৎ পাদোদ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ, যদিদং বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ পত্রং পত্রাৎ কাণ্ডং কাণ্ডা-

ম্নালং নালাদ্গর্ভো গর্ভাচ্ছুকং শূকাৎ পুষ্পং পুষ্পাৎ ফলমিতি; অসতি বীজেঽঙ্কুরো ন ভবতি যাবদসতি পুষ্পে ফলন্নভবতি,সতিতু বীজেঽঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলমিতি তত্রবীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানং অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানমহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুষ্পেনাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিতি, তস্মাৎ সত্যপি চৈতন্যে বীজাদীনামসত্যপি চান্যোন্যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি কার্য্য কারণ ভাব নিয়মোদৃশ্যতে, ইত্যুক্তো হেতূপনিবন্ধঃ। প্রত্যয়োপনিবন্ধঃপ্রতীত্য সমুৎপাদস্য উচ্যতে প্রত্যয়ো হেতূনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণীতি তেষাময়মানানাং ভাবঃ প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ। ষণ্ণাং ধাতুনাং সমবায়ং বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে, তত্র পৃথিবী ধাতু বীজস্য সংগ্রহে কৃত্যং করোতি, যথাঙ্কুরঃ কঠিনোভবতি, অপ্ধাতু বীজং স্নেহয়তি, তেজো ধাতুর্বীজং পরিপাচয়তি, বায়ু ধাতু বীজমভিনির্হরতি যতোঽঙ্কুরো বীজান্নির্গচ্ছতি। আকাশ ধাতু বীজস্যাবরণং কৃত্যং করোতি রূপ ধাতুরপি বীজস্য পরিণামং করোতি, তদেতেষাং অবিকৃতানাং ধাতুনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরো জায়তে নান্যথা। তত্র পৃথিবী ধাতো নৈর্বং ভবত্যহং বীজস্য পরিণামং করোমীতি; অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রত্যয়ৈ নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি, হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্যা প্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতি প্রত্যয়ং জরা মরণাদীতি অবিদ্যাচেন্নাভবিষ্যং নৈবং অঙ্কুরো অজনিষ্যন্ত এবং জরা মরণাদয় উদপৎস্যন্ত যাবজ্জাতিশ্চেন্নাভবিষ্য ন্নৈবং তত্রাবিদ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি সংস্কারাণামপি নৈবং ভবতি বয়মবিদ্যয়া নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবত্যহং জরা মরণাদ্যভি নির্ব্বর্ত্তয়ামীতি জরামরণাদীনামপি নৈবং ভবতি বয়ং জাত্যা অভি নির্ব্বর্ত্তিতা ইতি অথচ সৎস্ববিদ্যাদিষু স্বয়মচেতনেষু চেতনানন্তরানধিষ্ঠিতেষ্বপি সংস্কারাদীনামুপৎত্তি বীজাদিষ্বিব সৎস্বচেতনেষু চেতনান্তরাপধিষ্ঠিতেষ্বপাঙ্কুরাদীনাং, ইদং প্রতীত্য প্রাপ্যোদ মুৎপদ্যন্ত ইতি। এতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ—চেতনাধিষ্ঠানস্যানুপলব্ধে। সোয়মাধ্যাত্মিকস্য প্রতীত সমুদায়স্য হেতূপনিবন্ধঃ। অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ পৃথিব্যপ্তেজো বায্বাকাশ বিজ্ঞান ধাতুনাং সমবায়াদ্ভবতি কায়ঃ। তত্রকায়স্য পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিন্যমভি নির্ব্বর্ত্তয়তি অপ্ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ং তেজো ধাতুঃ কায়স্য শিত্ত পীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাতুঃ কায়স্য শ্বাস প্রশ্বাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়স্য শুশিরভাবং করোতি যাশ্চ নামরূপাঙ্কুরমভিনির্ব্বর্ত্তয়তি পঞ্চ বিজ্ঞানার্থ সংযুক্তং সাস্রবঞ্চ মনোবিজ্ঞানং

সোঽয়মুচ্যতে বিজ্ঞান ধাতুঃ। যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদি ধাতবো ভবন্ত্য বিকলাস্তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াস্তবতি কায়স্যোৎপত্তিঃ তত্র পৃথিব্যাদি ধাতূনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি কায়স্যাপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহমেভিপ্রত্যয়ৈরভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি—অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুভ্যোঽচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যোঽঙ্কুরস্যেব কায়স্যোৎপত্তিঃ; সোঽয়ং প্রতীত্য সমুৎপাদো দৃষ্টব্যান্নান্যথয়িতব্যঃ। তত্রৈতেষ্বেব ষট্স্বু ধাতুষু মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখ সংজ্ঞা, সত্যসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা মাতৃ দুহিতৃ সংজ্ঞা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা। সেয়মবিদ্যাঽস্য সংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণং তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কার রাগদ্বেষ মোহাবিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে—বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং বিজ্ঞানশ্চত্বারোরূপিণঃ, উপাদানস্কন্ধা স্তন্নাম, তান্যুপাদায় রূপমভিনির্বর্ত্ততে। তদেকত্বমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরূপ্যতে। শরীরস্যৈব কলল বুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপ সম্মিশ্রিতা, তানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্য মেতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি—"ইত্যাদি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই; ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব ঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতুপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতুপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতুভাব থাকে, যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ দ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদি কার্য্য দ্রব্যে সমবায় ছিল। এই হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিক কার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপত্তি বিষয়ে (ঘট পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে) এই রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ত্ত, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতুপনিবন্ধ বলাযায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি।

অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল,সকলেরই এইরূপ জানিবা; অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্যকারণ ভাবের ব্যঘাত নাই। বরং কার্য্যকারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর কার্য্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাব পক্ষেও (কারণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে) সেইরূপ। পৃথিবী ধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু, (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে) এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগ বিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু সংগ্রাহ কার্য্য করে (যে কার্য্য দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে) জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে বীজের উচ্ছূনতা জন্মে) তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীজাংশ অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে) বায়ুধাতু অভিনির্হার করে, (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহিস্কৃত হয়) আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজমধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে, (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুর দৃশ্যমান হয়) এইরূপ ষড়্ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর কার্য্যে আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্য প্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে (বাহ্যস্থ কার্য্য সমূহ মধ্যে) ও রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনই আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্য সমুৎপাদেরও পূর্ব্ব প্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু হেতুমদ্ভাব, আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ, ও বিজ্ঞান,এই ষড়্বিধ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও অন্য চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্ম লাভ দৃষ্ট হয়। এই অধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষেও সেইরূপ; পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি। পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জল ধাতু স্নেহিত

করে। তেজো ধাতু ভুক্তান্ন পানাদি পরিপাক করে, বায়ু ধাতু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশ ধাতু ছিদ্র-ভাব জন্মায়। বিজ্ঞান ধাতু, নাম রূপা-দির কারণ। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক; এই ষড় ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হই-লেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবী ধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচে-তন হইলেও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অন্যথা করিবার পথও নাই।*

উক্ত ধাতু ষট্‌কের সমবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্‌গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যব হার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। উহাকে অনর্থ শতসন্তার সংসার বলে; এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু আকার ধারী বিজ্ঞানবিষয়। বস্ত্বাকার বিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপ বিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নাম প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা(অনুভব শক্তি)বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) জন্ম গ্রহণ করে।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ লক্ষণ এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী* বাক্যং
লোকে ভগবতো লোক নাথাদারভ্য
কেবলম্।

যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বান চেহিতান্। সাগসেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে। বোধিং স্বস্থৈব নেষ্যন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহা-রা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করি-বার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "বোধিসত্ত্বস্ত পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—" এবং বুদ্ধদেবকে

*এতাবতা এই বলা হইল যে জগ-তের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই।

* কৃত্যাদেবী বৌদ্ধানাং অভিচারোৎ-পন্না ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

তাহারা "জরা, মরণবিঘাতী ভিষগ্বর ই বোদ্দগতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য, বৌদ্ধমাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ ২ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্য সিংহ স্বয়ং হস্তী, মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়; এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করে নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বাভাবিকবাদী; তাহারা বলে, স্বভাব সৃষ্টি হয় নাই! চিরকাল এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টলর, ব্যুক্নর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্‌গণের এই মত, অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্য সিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা জীবহিংসা করিও না, চুরী করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে এই ৫ টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ কবিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থপাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক ২ বার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন "কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ন ভোজনম্। সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ।

অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমুহাবস্থান, ও রক্তাম্বর এই কয়েকটি বৌদ্ধ দিগের যতি ধর্ম্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে "অনিত্য দুঃখম্ অনাত্য" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্ব কালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্গমমধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্ন লিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে যথা—খুদক পাঠ।

"নম তসভাগবত অর্হত সম সমবুদ্ধসঃ

বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
"দ্যুতম্পি বুদ্ধম শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
দ্যুতম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দ্যুতম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
শরণ্যতম্।"

বৌদ্ধ আচার্য্য প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের কোন২ বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ গণ দ্বারা আবুলফজল বহু অনুসন্ধানে এক খানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত—অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক, তথাগত গু-

* সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। ৺ জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদ।

হ্যক, ললিত বিস্তর, স্বর্ণ প্রভাস। বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ যথা—প্রজ্ঞা পারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধ-পদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র, বিনয় সূত্র, মহান্য সূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতক মালা, চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজ্‌সন্ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ" সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি ওস্থানে নাম মাত্র বোধক কি তাহার শাস্ত্রপ্রস্থান বোধক স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রস্থানবোধক, গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের নাম ভিন্ন, ঐসকল শব্দ তৎসদৃশ কি না, বলাযায় না।

যাহাহউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধিচিত্ত বিবরণ গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তি এই রূপ বলেন যথা

"দেশনা লোকনাথানাংসত্বাশয় বশানুগাঃ।
বিদ্যান্তে বহুধা লোকে উপায়ৈ র্বহুভিঃ
পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তান ভেদেন ক্কচিচ্চোভয়
লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতা দ্বয়
লক্ষণা॥

লোক নাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ন২ মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্য গণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা সারিপুত্র, আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয়

তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রণীত অধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে,তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম,উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপলাণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার, তথা পালি ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে। আমরা পাঠক বর্গকে উক্ত প্রস্তাবে পালিভাষার মূল গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় উপহার দিব।

শ্রীরাম দাস সেন।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

সপ্তম প্রস্তাব।

বৈশ্যবর্গ—কৃষি এবং বাণিজ্য।

ব্রাহ্মণ ও রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের আনুষঙ্গিক বিষয় সমস্ত যথাসম্ভব বিবৃত করিয়া এক্ষণে বৈশ্যবর্গ এবং তদানুষঙ্গিক বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বৈশ্যেরা আর্য্যসন্তান, আর্য্য সম্প্রদায়ের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, বেদে অধিকারযুক্ত এবং আর্য্যসন্তান হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট যে যে মান মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব পাওয়া যায় ইহারাও সেই সকলের অধিকারী। এই কথাগুলি আমি রামায়ণের অনুসরণ করিয়া বলিতেছি না, আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীর অনুসরণ করিয়া বলিতেছি, এবং এ নিয়ম, এ রীতি যখন পরবর্ত্তী সময়েও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে উহা রামায়ণেরও সাময়িক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিরোরত্ন ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষা দ্বারা, এবং রাজন্যবর্গ রাজ্যপালন, দেশরক্ষা,

শান্তিস্থাপন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা সামাজিক কল্যাণের যথাসম্ভব অংশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভার হইতে মুক্ত হইতেন। বৈশ্যেরা সেই সামাজিক কল্যাণের কোন অংশ কি পরিমাণে সাধনের ভার যুক্ত ছিলেন তাহা বিবেচ্য। মনু চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি নির্দ্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে কহিয়াছেন,

"ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য
সেবনং ॥
১১ অঃ ২২৬।

ব্রাহ্মণের তপ জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপ রক্ষণ, বৈশ্যের তপ বার্ত্তাশাস্ত্র এবং শূদ্রের তপ সেবন।—(১)

বৈশ্যেরা বাল্মীকির সময়ে সমাজের জন্য কখন বা কৃষিকার্য্যসাধন ও পশুপালন, কখন বা তাহার তত্ত্বাবধারণ এবং সাধারণতঃ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। বিশেষ বিদ্যা ও গুণবত্তা দেখাইতে পারিলে, কখন কখন বা রাজমন্ত্রিত্বেও অভিষিক্ত হইতে পারিতেন। এবং মনুর গ্রন্থের সহ রামায়ণের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তবে ইহাদিগের সামাজিক মর্য্যাদা, গার্হস্থ ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার মনুপ্রোক্তমত অবিকল না হউক প্রায় তদ্রূপ ইহা জ্ঞাতব্য।

এস্থানে একটি বিষয় বিবেচ্য। পূর্ব্বগত প্রস্তাব সকলের মধ্যে একাধিক স্থলে, মনুর বিধানিত নিয়ম মালা রামায়ণোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করণে এবং সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছে এবং হইবে। কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ কি না? বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত সমালোচক দিগের মধ্যে এই এক নূতন সৌখিনত্বের উদয় হইয়াছে যে, আদিমকালীয় আর্য্যগণ জগৎস্থ পূর্ব্বাপর সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা যে কোনরূপে হউক প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং তাহা সমর্থনার্থে প্রমাণ স্থলে ইস্তক আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইত ভবভূতিপ্রণীত উত্তররামচরিত এবং শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধচরিত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে, যেন ঐ সকলই এক সময়ের গ্রন্থ, এবং একই সময়ের চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। এরূপ লেখক এবং সমালোচক দিগের বিবেচনা করা উচিত যে, যুগপরিবর্ত্তনে রীতি নীতির ভুয়ঃপরিবর্ত্তন হইয়া থাকে;—একযুগের এমন অনেক বিষয় যাহা সুকাজ বলিয়া আদৃত ও গৃহীত হয়, যুগপরিবর্ত্তনে তাহাই আবার অকর্ত্তব্য বোধে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এতদ্রূপ যুগ হইতে যুগান্তরের পরিবর্ত্তন সাধারণ বা অগণনীয় নহে। অতএব

(১) বৈশ্য নামের ব্যুৎপত্তি এরূপ "বিশ্ to enter (fields &c) ক্বিপ affix and ষ্যঞ্ added"—Wilson. ইহার দ্বারা বৈশ্যবৃত্তি বিশেষরূপে জ্ঞাপিত হইতেছে।

যে সময়ের বিষয় আলোচনা করা যায়, তাহার প্রমাণস্থলীয় মূল ভাগে সেই সময়েরই প্রমাণ বচনাবলী প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ। বাল্মীকির সময় সমালোচনায় সেই নিয়মই পূর্ব্বাপর নিরপেক্ষ ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। মনু প্রভৃতি যে যে গ্রন্থাবলীর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহ মূল প্রস্তাবের যথাসম্ভব অন্তরতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পরস্পরের মধ্যে অন্তরতা রাখার চেষ্টা সত্বেও, মনুপ্রোক্ত বচন ও বিধান অধিক পরিমাণে এবং অধিক ঘনিষ্টতার সহিত গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে মনুর সঙ্গে রামায়ণের কি সম্বন্ধ। রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে যৎকালে বিনাপরাধে শত্রুতা করার নিমিত্ত বালি রামকে ভৎর্সনা করিতেছে, তখন রাম নিম্নমত বাক্যে বালির পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করিতেছেন।

"শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্র
বৎসলৌ।
গৃহিতৌ ধর্ম্মকুশলৈ স্তথা তচ্চরিতং
ময়া॥"

এখন দেখা যাইতেছে যে মনুর নাম রামায়ণের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত যে তাহা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। ফলতঃ মনুর নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তে উক্ত। কিন্তু রাম এখানে যে মনুর কথা কহিতেছেন, তিনি স্মৃতিকর্ত্তা মনু, এবং রাম রাজধর্ম্মপালনার্থে তাঁহার অনুগামী। রামের আপন মুখ হইতে উক্ত হওয়ায় সেই স্মৃতি তাঁহার অর্থাৎ বাল্মীকির পূর্ব্বে প্রণীত। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুকে স্মৃতিকারক বলিয়া উল্লেখ ব্যতীত বহুস্থলে মনুসংহিতা স্থিত বিধানমালা সহ বাল্মীকির সাময়িক ব্যবহারের অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি ও করিব। এসকলের দ্বারা কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে মনু সংহিতা সে সময়েরও সমাজ পরিচালক ছিল? তৎপক্ষে উপরি উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যাহা হউক এতদ্বিষয় প্রবন্ধশেষে বাল্মীকির কাল নির্ণয়ে সবিস্তারে বিবেচ্য। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই মনুসংহিতা বাল্মীকির পূর্ব্বের, সমসাময়িক বা পরবর্ত্তীই হউক, কিন্তু তাহাতে প্রোক্তরূপ ব্যবহার বাল্মীকির সময়ে যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কারণেই মনুসংহিতা এই প্রবন্ধে এত বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈশ্যবর্গের সহ কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধ একটি প্রধান সম্বন্ধ। যে দেশে সপ্তসিন্ধু এবং গঙ্গাদেবী দুহিতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী হইয়াছেন, যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম ও প্রভব, সে দেশে

যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য এবং সময়োচিত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র। আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক তত্বময় ঋগ্‌বেদে ভূয়োভূয়ঃ কৃষি কার্য্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং "কিনাশ" শব্দে নামিত কৃষক ও "কুল্যা" শব্দে জল প্রণালীরও অস্তিত্ব সূচনা হইয়াছে। (২) তদ্ব্যতীত কৃত্রিম জল প্রণালীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [৩] বহুস্থানে ধান [৪] এবং যবের [৫] নাম উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের এক স্থানে কথিত আছে "ব্রীহিম্ অত্তং যবম্ অত্তং অথো মাসম্ অথো তিলম—"[৬] ১৪০-২।৬ ইত্যাদি।

(২) ঋগ্বেদ ১০-৩৪-১৩, ১০-১১৭-৭, ১০-৪৩-৭ ইত্যাদি।

(৩) "যাঃ আপো দিব্যাঃ উত বা শ্রবন্তি খনিত্রিমাঃ উত বা যাঃ স্বয়ং জাঃ।" এই স্থান সম্বন্ধে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন "from this it is not unreasonable lands under cultivation may have been practised"—Muir.

(৪) ঋগ্বেদ ৩-৩৫-৩, ৬ ২৯-৪ ইত্যাদি।

(৫) ঋগ্বেদ ১-৬৬-৩ যব সম্বন্ধে Messrs Böhtlink and Roth বলেন, যব অর্থে বৈদিক সময়ের উৎপন্ন সকল প্রকার শস্যকেই বুঝাইত। এস্থল মুর সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশ হইতে সঙ্কলিত হইল।

(৬) Muirs Sanscrit test নামক পুস্তক হইতে গৃহীত বচন।

এই সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে বৈদিক সময়ে কৃষি কার্য্যের যথেষ্টই উন্নতি সাধন হইয়াছিল, এবং নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরা হইতে আর্য্যেরা বহুরত্ন দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এক্ষণে বাল্মীকির সাময়িক কৃষিকার্য্যের অবস্থা দেখা যাউক। এই সময়ে দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সময়ের ন্যায়, এখানেও কৃষির অস্তিত্ব, কৃষিপ্রণালী বা তথাবিধ বিষয়ের নিমিত্ত রামায়ণ হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র এবং কিয়দংশে হাস্যজনক। বাল্মীকির সাময়িক সমাজের ন্যায় অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে কৃষিকার্য্য রাজনিয়মে কতদূর রক্ষিত, কৃষিজীবীরা কিরূপ ব্যবহৃত, এবং কৃষিকার্য্য কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাই দেখা আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হয়। এই প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাব হইতে, দ্বিতীয় কাণ্ডের ১০০ সর্গের অংশ বিশেষের অনুবাদ এস্থলে গ্রহণ করিলাম। তথায় রামের অন্বেষণে ভরত চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, স্বদেশ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ক প্রশ্ন মধ্যে রামকর্ত্তৃক ভরত ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতেছেন "সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর; যথা নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রব শূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে?

এবং উহারা স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে? ইষ্ট-সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক?" (৭) এইটি কৃষকদিগের পক্ষে যেমন অনুকূলবাক্য, এমনটি রামায়ণের অন্যত্রে দুর্লভ। কিন্তু এটি খাটি বাল্মীকির মুখ নিঃসৃত বাক্য বলিয়া সন্দেহহীন হওয়া যায় না, বা তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারা যায় না, তৎপক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে।(৮) পুনশ্চ রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে সপ্তষষ্ঠি সর্গে রাজশাসনের শিথিলতায় কৃষিকার্য্যের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গে রামের বনবাস এবং ভরতের রাজ্য-প্রাপ্ততা হেতু কৃষিজীবী ও পশুপালকগণ যথেষ্ট পরিমাণে আশ্রয় পাইবে না বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলের দ্বারা অনুমিত হয় যে, রাজশাসনের শিথিলতা বা রাজা অকর্ম্মণ্য অথবা অল্পাশয় হইলে, কৃষিজীবীর উপর অত্যাচারীর অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইত। সে যাহাহউক, সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, দেশে যখন "রামরাজ্য" প্রবর্ত্তিত হইত, তখন ত কৃষির প্রতি তৎকালোচিত বুদ্ধি অনুরূপ যত্ন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হইতই; তদ্ব্যতীত অন্য সময়েও যথাযথ হইতে ত্রুটি হইত না। রাজারা স্বয়ং আত্মহিসাবে লোকদ্বারা পশুপাল রক্ষা এবং কৃষিকার্য্য করাইতে ত্রুটি করিতেন না। মনুসংহিতায় দৃষ্ট হইবে যে, সকল শ্রেণীর আর্য্যেরাই কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব মমতা করিতেন, এবং তাহার উন্নতিসাধন পক্ষে যত্নপরায়ণ ছিলেন। ইহার আদরও এতদূর ছিল যে, আবশ্যক মতে ব্রাহ্মণেও লাঙ্গল ধরিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামায়ণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে,

"তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নামবৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তি র্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাল লাঙ্গলী॥
২।৩২।২৯

এখন জিজ্ঞাস্য, যেন কৃষি কার্য্য আদৃত বা সুরক্ষিত হইল, কিন্তু কৃষিজীবী কি সর্ব্বদা তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে এবং ধনশালী হইতে পারিত? বোধ হয় সর্ব্বস্থানে নহে। তাহা হইলে সাধারণ প্রজাবর্গের অসম্পন্ন অবস্থা লক্ষিত হয় কেন? কৃষিকার্য্যের প্রতি উর্দ্ধ হইতে আদর, যত্ন, এবং সুরক্ষণ সংযোজন হইলেই যদি কৃষিজীবী আপন পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিত, তবে নীলকরের প্রজার এ দুর্দশা কেন? নীলকরেরা ত নীলের চাসের

(৭) এস্থানের মূলাংশ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। যাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হইবে ২।১০০।৪৪-৪৮ এবং রামানুজের টীকা দেখিবেন।

(৮) বঙ্গদর্শন ৩ সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠা টীকা দেখ।

উপর কম আদর, কম যত্ন, কম রক্ষণ করে না।

কৃষি এবং কৃষিজীবীর অবস্থা অন্য প্রকারে দেখা যাউক। রামায়ণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ দেখা যাইবে যে তখন ভারতবর্ষে বহুধনের সমাগম হইয়াছে। স্ফাটিক গবাক্ষ (৯) যুক্ত ইন্দ্রভবন তুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান মালা, রথ শিবিকা প্রভৃতি যান, মণি মাণিকের ছড়া ছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য সকল, ইহাদের ভূয় উল্লেখে কে না অনুমান করিবে যে রামায়ণের সময়ে উত্তর ভারত অত্যন্ত ধনশালী হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া অভ্রান্ত ভাবে গ্রহণ করিতে না পারাযায়, তবে মনুসংহিতা দেখ, বাল্মীকিবর্ণিত সমাজের ন্যায় অনুরূপ উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, এবং ইহা কিয়দংশে রামায়ণের সময়ের উপর বর্ত্তিতে পারে। আবার বৈদেশিক ইতিহাস আলোচনা দ্বারা জানা যাইবে যে আসিরীয়া দেশীয় রাণী শমিরমা [যাহার প্রদুর্ভাব কাল বাল্মীকির সময় হইতে অল্পই এদিক ওদিক,] অন্যান্য দেশ জয় করিয়া ভারতের গৌরব এবং ধনশালিত্ব শ্রবণে ভারতজয়ে অগ্রসর হয়েন। ঐরূপ বাল্মীকির অনতি দীর্ঘকাল পরবর্ত্তী দরায়ুস একমাত্র সপ্তসিন্ধুর কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্লিক প্রভৃতি ঘৃণাস্পদ এবং হীনজাতি দ্বারা অধিকাংশ অধিবেশিত হইলেও এত ধনশালী ছিল, যে তথা হইতে বাৎসরিক কর ৩৬০ ট্যালেণ্ট অর্থাৎ ১০০৮০০০ টাকা আদায় হইত। (১০) হিরোডোটসের পরবর্ত্তী টিসিয়স সপ্তসিন্ধুবিষয়ক বর্ণনায় কহিয়াছেন যে তাঁহার জ্ঞাতসারে যত দেশ আছে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশ সে সকল অপেক্ষা স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্যযুক্ত এবং ধনশালী। যখন একমাত্র পঞ্জাবের অংশবিশেষ সম্বন্ধে ধনবত্তার এত গৌরব, তখন সর্ব্বগরিমার স্থল অনুগঙ্গ মধ্যদেশ যে আরও ধনশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং শমিরমার সাময়িক ও হিরোডোটস এবং টিসীয়স কর্ত্তৃক বর্ণিত ধনশালিতার পূর্ব্বসম্বন্ধ স্বচ্ছন্দে রামায়ণের সময়ের সহিত যোজনা করিতে পারা যায়।

(৯) রামায়ণ ৪র্থ কাণ্ড ১সর্গ ৩৮ শ্লোক। ইউরোপ ভূমে প্লিনির সময়ের অব্যবহিত পরে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়।

(১০) Hero: III 94. হিরোডোটসের মতে (Hero: III 98) ভারতবর্ষ অতি পূর্ব্বতম দেশ। তৎপরে মরুস্থান। ইহাতে বোধ হয় দরায়ুসের রাজ্য হিরোডোটস যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পঞ্জাবের অংশ মাত্র। উপরোক্ত মরুস্থান বোধ হয় পঞ্জাব হইতে আরম্ভ রাজপুতানার মরুস্থান। তাহার পর (III 10) পঞ্জাবের অর্থাৎ কথিত দেশের দক্ষিণে লোকের বাস এবং তাহারা দরায়ুসের অধীন নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে দরায়ুসের ভারতীয় রাজ্যের বিস্তার কত সঙ্কীর্ণ ছিল।

দেশ এরূপ ধনশালী হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্য। বাণিজ্যের পূর্ব্বগামী সচরাচর শিল্প অথবা তদভাবে কৃষি, কিন্তু কৃষি উভয়েরই পূর্ব্বগামী। সুতরাং কৃষির শ্রীবৃদ্ধির উপর পূর্ব্বকথিত সর্ব্বপ্রকার ধনশালিতা প্রধানতঃ নির্ভর করে। স্মরণ থাকে যেন এ নিয়ম উর্ব্বর ভূমি যুক্ত প্রদেশের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে। একসমাজ যতগুলি লোকদ্বারা সঙ্ঘটিত, তাহার যে অংশ কৃষক, কৃষিদ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ হইয়াও যদি সমাজস্থ অবশিষ্টলোকের পোষণার্থে কৃষিজাত দ্রব্য উদ্বর্ত্ত থাকে, তবেই তদ্দ্বারা সমাজ রক্ষা এবং ভাবী ধনশালিতার উপায় বৃদ্ধি হয়। এই সময়ে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু সম্বন্ধে সামান্য শিল্পের উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু কৃষি কার্য্যের ন্যায় লাভযুক্ত না হওয়ায়, শিল্পীরা বহুপরিশ্রমে কৃষিকরণোপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিলেই, কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটে অবিকল এই অবস্থা গিয়াছে, এবং এখনও অনেক পরিমাণে চলিতেছে। এতদ্দ্বারা সমাজ পোষণোপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াও যখন অনেক অধিক থাকে, তখন সেই সকল শিল্পও বাণিজ্যার্থে, বা তন্নিমিত্ত অপরাপর দ্রব্য উৎপন্নে এবং তাহাও তদ্রূপ নিয়োগ হেতু, নিয়োজিত হয়, এবং তদ্দ্বারা দেশ ধনশালী হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণানুসারে ভারতের ঐশ্বর্য্য গণনা করিলে, ইহা অবশ্যই অনুমেয় যে তৎকালে ভারতের কৃষিকার্য্য সময়োচিত বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে, যে দেশে যত খাদ্যের উৎপত্তি হয়, সে দেশে কেবল উপস্থিত জীবন সমূহের পোষণার্থে উপযুক্তাংশ মাত্র রাখিলে, অপরাংশ হয় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে, নতুবা সে সুখ স্বচ্ছন্দতার খর্ব্বতা সাধনে রাজ্যে লোক বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বৈদিক সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বাল্মীকির সময়ে সেরূপ লোকবৃদ্ধির আধিক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্যালথস যে হারে যত দিনে লোক বৃদ্ধির নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন, সে নিয়মানুসারে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্মীকির সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ লোকে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমস্ত স্থান যেমন আর্য্যরাজভুক্ত হইয়াছে, তেমন সমস্ত স্থান লোকসঙ্কুল হয় নাই। ভরতকে আনয়নার্থে দূত যে পথে কেকয় রাজভবনে গিয়াছিল, এবং ভরত যে পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই নিবিড় ও দুরতিক্রম্য জঙ্গলে পূর্ণ। আবার যমুনার দক্ষিণ তীর হইতেই নিবিড় বনের সঞ্চার। গৃহদ্বারস্থিত অন্ধরাজভবনে গমন কালীন, দশরথকে এমত জঙ্গল জনশূন্য স্থান দিয়া যাইতে হইয়াছিল, যে কর্ণেল টড তাহাতে মোহযুক্ত হইয়া ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া অঙ্গকে তিব্বত বা আভা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র জনক ভবনে গমন কালীন কতই জনশূন্য স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন। এখন দেখ, সেই সকল স্থানে এতই লোকের আধিক্য হইয়াছে, যে তাহাদের জন্য আজি কালি অন্যত্রে উপনিবেশ স্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বাল্মীকির সময়ের লোক সংখ্যা কত অল্প। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে জীবনোপায় বৃদ্ধির সঙ্গে বাল্মীকির সময়ে অনুরূপ লোক বৃদ্ধি না হইয়া বিলাস বৃদ্ধি হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাই। বলিতে কি যেরূপ অপরিমিত, সুশৃঙ্খল বিলাস, এবং স্বচ্ছন্দতা তৎকালে দেখা যায়, সে সময় বিবেচনা করিলে, তাহা আশ্চর্য্য জনক। কিন্তু এ বিলাস, এ ধন, এ স্বচ্ছন্দতা কোথায় প্রবাহিত হইত?—ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে; কিন্তু ধনী দেশশুদ্ধ লোক নহে। বিশ্বব্যাপিনী রোমরাজ্য যেমন দুই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোৎপাদন করিত, ভারতেও তেমনি তাৎকালিকী ঐশ্বর্য্য কয়েক পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কাঙ্গালের দশা সব কালেই সমান। রাজকর ষষ্ঠাংশ, (১১) অতএব যেখানে ৬টাকার দ্রব্য উপার্জন করিয়া একটাকা রাজাকে দিতে হইবে, সেখানে তাহাদের স্বচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোথায়? এতদ্ব্যতীত অন্য কোন রূপ কর, যুদ্ধব্যয় এবং মহাজনের দেনাও সম্ভবতঃ ছিল, তাহার পর রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার, বা প্রজার অবশিষ্টাংশ ধন রক্ষায় অমনোযোগিতা, প্রজার নির্ধনতার অপর কারণ। এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় বিশেষ রূপেই প্রবল ছিল। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষক আপন আবশ্যকীয় ব্যতীত কিছু বেশি ধন উপার্জন করিলেই, তাহা ভয় প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত। একাধিকস্থলে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধস্তাজিরাণিচ।
উপাত্ত ধন ধন্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ ॥"

রাম বনে যাইতেছেন, বলিয়া দুর্ভাগ্যেরা আশঙ্কা করিতেছে যে, যে ধন ভূগর্ভে প্রোথিত আছে তাহা পর্য্যন্তও অপরাপর ধন ধান্য সহ কেকয়ী পুত্রের রাজত্বকালে অপহৃত হইবে। এখানে কেকয়ীর চরিত্র দৃষ্টে কেকয়ী পুত্রের গুণ অবধারণ করিয়াই তাহারা এত আশঙ্কা যুক্ত হইতেছে। ভাল রাজার আমলে, মাটিতে পুঁতিলেও বা কিছু রক্ষা হইত, এবার তাহাও হইবে না। যেখানে ধন প্রথমতঃ পূর্ব্ব প্রদর্শিত কারণে সঞ্চিত হওয়াই কঠিন, দ্বিতীয়তঃ যদি বা হইল, তাহা প্রকাশ রাখাই দায়, সেখানে নিম্নশ্রেণীর স্বচ্ছন্দতা বা ঐশ্বর্য্য সম্ভবেনা। তাহাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করিয়া থাকে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অপর শ্রেণীর লোক, যাহারা সামান্য শিল্প

(১১) বঙ্গদর্শন (৩) খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বারা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং অপর লাভজনক কাজে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত না, তাহাদেরই সম্ভবতঃ হীনাবস্থায় থাকার কথা। কিন্তু কথিত আছে যে, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য তিনই বৈশ্যের হাতে, তবে কেন কৃষিজীবী বা পশুপালকের দশা তদ্রূপ হইত। এস্থলে উত্তর করি যে, কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এ তিনই, এক ব্যক্তি সব সময়ে স্বহস্তে করিতে পারে না। যদিওবা কাহার ঐ তিন বিষয়ে একীভূত বিষয় ছিল, প্রথমতঃ তাহার কথা স্বতন্ত্র, ঐশ্বর্য্যে তাহাকে ঐ তিন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ অপর লোক দ্বারা সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করাইত। এমন স্থলে যাহারা স্বহস্তে কাজ করিত, এবং কৃষি দ্বারাই দিনান্তে যাহার অন্ন, তাহাদেরই অবস্থাকল্পে উপরে সমস্ত কথিত হইল। স্বাধীন কৃষক হইলেও, তাহার সঙ্গে একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর লাভালাভের তারতম্য দেখ। একজন কৃষিজীবী ৬টাকার ধানউপার্জ্জন করিয়া রাজাকে এক টাকা দিবে, আর একজন বণিক ৫০টাকার সুবর্ণ উপার্জ্জন করিয়া সেই এক টাকা দিবে। এই তারতম্য হেতু, ইহাও জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে আদম স্মিথ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত মুদ্রার মূল্যাবধারণ তত্ত্ব তৎকালে এবং মনুর সময়ে আর্য্যদিগের নিকট সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত ছিল। সামান্য শিল্প বা তথাবিধ ব্যবসায়ীদিগের অবস্থাও কৃষিজীবিগণ হইতে উন্নত ছিল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্যকাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতাকুসুমের বাসন্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুলআনন্দানিল হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। যখন অমৃতময় স্বর লহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমন বার্ত্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি, তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্রপর্য্যন্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের

জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। আমরা যাহা বলিব, হয়ত তাহাতে অনেকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেকের চিরসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। একাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা ঐকমত্য রাখিতে পারিব না।

বিদ্যাপতি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে ইহা জানা আছে যে তিনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন, এবং তিনি শিব সিংহ নামক রাজা ও লছিমা নাম্নী রাজ্ঞীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আর রূপনারায়ণ নামে তাঁহার একজন বন্ধু ছিল। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের লেখা হইতে এসকল কথা সংগ্রহ করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহা প্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ মধ্যখণ্ড।

চৈতন্য চরিতামৃতের এই এবং অন্যান্য কয়েকটী স্থল পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে চৈতন্য দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। ভাল বাসিবারই কথা। চৈতন্য যেমন কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনই কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রীতির উৎস বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা বেগবতী নদী হইয়াছে, প্রেমের পাগল গৌরচন্দ্র কেননা তাহার রস পান করিতে উৎসুক হইবেন? নরহরিদাস লিখিয়াছেন,

জয় বিদ্যাপতি কবিকুল চন্দ।
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগত ব্যাপি রহু বিশদ চরিত॥
লছিমা গুণহি উপজে বহুরঙ্গ।
বিলসয়ে রূপনারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গৌর কিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহরি ভণ অরু কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥

পুনশ্চ,

বিদ্যাপতি কবি ভূপ।
অগণিত গুণ জন রঞ্জন, ভণব কি সুখময়
পিরীতি মূরতি রসকূপ॥
শিশু সময়াবধি অধিক পরাক্রম
বিরচল দেবচরিত বহু ভাঁতি।
কোই করল উপদেশ পরম রস উলসিত
তাহে নিরত রহু মাতি॥

শ্রীশিব সিংহ নৃপতি লছিমা প্রিয় অতুল
বিমল যশ বিদিত হি ভেল।
শ্যামর গৌরী কেলিমলি সংপুট
যতনে উঘাতি ভুবন ধনি কেল ॥
মরি মরি যাক গীত নব অমিয়
পিবি পিবি জীবই সে রসিকচকোর।
নর হরি তাক পরশ নাহি পাওল
বুঝব কি ওরস মরুমতি মোর ॥

বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,

জয় জয় দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর,
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত ॥
যবহু যে ভাব উদয় দুহুঁ অন্তরে,
তব গায়হি দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি ॥
আছিল গোপতে, যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সোরস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীত, জগতচিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে ॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদসঞ্চয়ে,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখসার, হার সব রসিকহি,
কণ্ঠহি কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া।
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সে আনন্দরস, জগভরি বরিখল,
সুখময় বিদ্যাপতি রসমেহা ॥
যত যত রসপদ কয়লহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি, শ্রবণপর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে ॥
সোরস শুনি নাগর বরনারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পু বিথারি ॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, বহইতে আনমন,
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥

আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দৃষ্টে এই কয়েকটী কথা জানা যাইতেছে, (১) বিদ্যাপতির রচিত গীত শ্রবণে অনেক ভক্তের হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছে; (২) চৈতন্য সর্ব্বদাই ঐ সকল গীত শুনিতেন; (৩) শিবসিংহ নৃপতি ও লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির সদ্ভাব ছিল; (৪) রূপনারায়ণের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক, বিদ্যাপতির লিখিত কবিতা হইতে তাঁহার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

কোথাও এরূপ,

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ, রূপনারায়ণ।
লছিমা দেবী পরমাণ॥

কুত্র এ প্রকার,

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন সব যুবতী
ইহ রসকূপ যে জান।
রাজা শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

কোন স্থলে ঈদৃশ,

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধা রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,
একাদশ অবতারা॥

কুত্র বা এবম্বিধ,

রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥

কোথাও এপ্রকার,

বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনারায়ণ সাখি॥

এইরূপ বিদ্যাপতি লিখিত অনেক কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা শিব সিংহ, লছিমা দেবী ও রূপনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামক একখানি গদ্য পুস্তক আছে; উহার প্রারম্ভ এই প্রকার, "অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি। সুর সমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেব সিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিব সিংহ রাজা তিনি জয়যুক্ত হউন।

"অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকের দিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এবং কামকলা কৌতুকাবিশিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্ত শ্রীশিব সিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন যে রসজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মল বুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা নীতিবোধানুরোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষ পরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।"

এইরূপ বাঙ্গালা গদ্যে কবি বিদ্যাপতি পুরুষ পরীক্ষা রচনা করিয়াছেন, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু এটী ভ্রম। ভ্রম বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছেন, অথচ কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আমরা কেন ভ্রম

বলিতেছি, নিম্নে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি,

(১) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত বাঙ্গলা পুরুষপরীক্ষা আছে। পুস্তক খানি এক্ষণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রহিয়াছে। ঐপুস্তকের উপরে লিখিত আছে,

"শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা॥ শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।"

(২) ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ইতিহাস (Annals of the College of Fort William) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে হরপ্রসাদ রায় মূল সংস্কৃত হইতে পুরুষ পরীক্ষা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৌন্সিলের অভিপ্রেতানুসারে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে শ্রীরামপুর মিসিনরী যন্ত্রে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।*

(৩) আমরা সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে যে পূর্ব্বপ্রদত্ত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা সূচনা অনুবাদিত, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ

"ব্রহ্মাপি যাং নৌতি নুতঃ সুরেণ
যামর্চ্চিতোপ্যর্চ্চয়তীন্দুমৌলিঃ।
যাংধ্যায়তি ধ্যানগতোপিবিষ্ণু
স্তমাদিশক্তিং শিরসা প্রপদ্যে॥

* In a "Catalogue of Literary works, the publication of which has been encouraged by Government at the recommendation of the council of the college of Fort William, since the period of disputation, held in 1814," we find the following:—

"পুরুষ পরীক্ষা Pooroosah Pureekha or the Test of man, a work containing the moral doctsines of the Hindus, translated into the Bengalee Language, from the Sanskrit, by Huruprasad, a Pundit attached to the College of Fort William, for the use of the Bengalee class. It is a delineation of eminence of character, in many situations of human life, and consists of forty-eight stories, illustrative thereof. Some of these discribe men eminent for moral virtue; others, men eminent for heroic or daring actions; others are represented as examples of high qalifications; and others, of extraordinary folly or wisdom, virtue or vice.—The whole forming an useful miscellany of Eastern manners and opinions."

p. 474. Annals of the College of Fort William.

In Appendix—No. II of the same work, giving a "Catalogue of Oriental and other works, which have been published under the patronage of the College of Fort William, since its Institution, in 1800," we find the following:

"পুরুষ পরীক্ষা Pooroosha Pureekha, translated from the original Sanscrit, by Huruprusuda Raya. Serampore, printed at the Mission Press, 8vo. 1815."

বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো
বিদ্যাবতামাদিবিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহক্ষিতিপালসূনু
র্জ্জীয়াচ্চিরং শ্রীশিব সিংহ দেবঃ॥

"শিশূনাংসিদ্ধ্যর্থং নয় পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুক
ষুষাম্।
নিদেশান্নিঃশঙ্কং সপদি শিবসিংহ
ক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতি
কবিঃ॥

নয়ানুরোধেন গুণেন বাপি
কথারসস্যাপি কুতূহলেন।
বুধোপি বৈদগ্ধ্যবিশুদ্ধচেতাঃ
প্রবন্ধমাকর্ণয়তাং ন কিম্মে॥
পুরুষাঃ পরিচীয়ন্তে যুক্তেরস্যাঃ পরীক্ষয়া।
তৎপুরুষপরীক্ষায়াং কথা সর্ব্বজনপ্রিয়া॥"

পুরুষপরীক্ষা লেখক বিদ্যাপতি রাজা শিব সিংহের আশ্রিত; গীত রচয়িতা বিদ্যাপতিও রাজা শিব সিংহের আশ্রিত। সুতরাং পুরুষপরীক্ষা লেখক ও গীত রচয়িতা একই ব্যক্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অন্ততঃ যতক্ষণ অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তি সিদ্ধ; কারণ বিভিন্ন পাত্রস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা উভয়ের নামের ঐক্য হওয়া অতীব অসম্ভব। পুরুষপরীক্ষা হইতে রাজা শিব সিংহের একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তিনি রাজা দেব সিংহের পুত্র।

বিদ্যাপতি কবি চণ্ডীদাসের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। উভয়ের গুণের কথা শুনিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন।" উভয়ের মিলন সম্বন্ধে চারিটী কবিতা আছে; তন্মধ্যে আমরা দুইটী উদ্ধৃত করিলাম; একটী রূপনারায়ণের, অপরটী বিদ্যাপতির রচিত।

(১)

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারই,
চলল দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গাওত,
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল,
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম, শ্রবণে তহি জানল,
রূপনারায়ণ গোই॥

(২)

সময় বসন্ত, যামদিন মাঝহি
বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল,
পুলকে কলেবর গীর॥
দুহুঁজন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥

ধৈরজ ধরি দুহুঁ, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রস কি ?
রসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত,
রস হইতে রসিক কহি ?
রসিকা হইতে, রসিক কিয়ে হোয়ত,
রসিক হৈতে রসিকা ?
রতি হৈতে প্রেম,প্রেম হৈতে রতি কিয়ে,
কাহে মানব অধিকা ?
পুছত চণ্ডীদাস কবি রঞ্জনে,
শুনত রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান ॥

আমরা যে দুইটী গীত উদ্ধৃত করিলাম না, তন্মধ্যে একটীর ভণিতা এইরূপ,

রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি, দুহুঁক করু বর্ণন,
তছু পদ কমলভৃঙ্গ।

সুতরাং এটীর রচয়িতা চারিজন, রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ; এবং এই চারি জনই বিদ্যাপতির মিত্র হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বীরভূমস্থ নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছিল। অতএব বিদ্যাপতির বাসস্থান বীরভূম জেলা হইতে অতিদূরবর্ত্তীছিল না, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে।

এস্থলে আর একটী কথার বিচার করা আবশুক হইতেছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই এক সময়ের লোক; চণ্ডীদাসের লেখার সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙ্গালার অল্পই প্রভেদ, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির ভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উভয়ের রচনা প্রণালীগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েরই দুইটী করিয়া কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম ও দ্বিতীয়টী চণ্ডীদাসের,এবং তৃতীয় ও চতুর্থটী বিদ্যাপতির।

(১)

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি ॥
একদিট করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

(২)

ধিক রহ জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে ॥
এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল ॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাবনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাসে বলে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি সেই ধরই পরাণ।

(৩)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে ধনী দেকে পড়ি গেল॥
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার
কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘার॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
বৈরজ ধরহ মিলায়ব আন।

(৪)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

যদিও চণ্ডীদাসের কোন কোন গীতে হিন্দির আধিক্য লক্ষিত হয়, এবং বিদ্যাপতির নামবিশিষ্ট কোন কোন কবিতা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত, তথাপি সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের লেখা বাঙ্গালা ও বিদ্যাপতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। এরূপ হইবার কারণ কি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন যে বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দি হইতে পৃথগ্‌ভূত হয় নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনাপদ্ধতি দেখিলে এ বিশ্বাস কাহারও মনে স্থান পাইতে পারে না। চণ্ডীদাসের শব্দ বাঙ্গালা, চণ্ডীদাসের ছন্দ বাঙ্গালা। বিদ্যাপতির শব্দ হিন্দি, বিদ্যাপতির ছন্দ হিন্দি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি ব্রজভাষার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতায় হিন্দির আধিক্য; চণ্ডীদাস তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়াই অনেক ব্রজবুলি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন, তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে

চৈতন্যের পরেও, এমন কি এখন পর্য্যন্ত, বঙ্গীয় কবিরা উক্ত প্রকার হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে আর একটী কথা ভাবিতে হয়। বিদ্যাপতির গীতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়াই পরবর্ত্তী কবিরা হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা কবিতা বা কবির উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতিকেই হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতৃভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত, তিনি যে তাঁহার অধিকাংশ গীতগুলিকে ছন্দে ও শব্দে হিন্দিভাবাপন্ন করিতে যাইতেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। আদি কবিরা স্বদেশীয় দিগের বোধগম্য করিয়াই গীত রচনা করেন; তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ পরবর্ত্তী-কালের বা দূরতর প্রদেশের কোন কোন লেখক তাঁহাদিগের রচনা প্রণালী সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ হইলেও বিশেষ পাঠক শ্রেণীর জন্য অনুকরণ করিতে পারেন। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় ভাষা যে প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি সে প্রদেশের অধিবাসী হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি বীরভূম জেলায় চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন। আমরা দেখাইয়াছি যে চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙ্গালা। অতএব বীরভূম হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে গমন করিলে বিদ্যাপতির বাসস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। "খেলত," "ভেল," "কহব," "মাতল," "শ্রবণক," ইত্যাদি পদ প্রয়োগ দেখিয়াও বোধ হয় বিদ্যাপতি ভাগলপুর বা পাটনা বিভাগের লোক।

এপর্য্যন্ত বিদ্যাপতির বিষয়ে আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে এই কয়েকটী কথা পাওয়া যাইতেছে; (১) তিনি চৈতন্যের পূর্ব্বে ও চণ্ডীদাসের সময়ে শিবসিংহ নামক কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত রাজার মহিষীর নাম লছিমা ও পিতার নাম দেব সিংহ ছিল; (২) রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যাপতির মিত্র ছিল; (৩) বিদ্যাপতি অনেক পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা রচনা করেন; (৪) তিনি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বিদ্যাপতির বাসস্থল মিথিলায় ছিল।

মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে; সে সকল গীতে শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর নামোল্লেখ আছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম —

অরুণ পূরব দিশ, বহল সগর নিশ,
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি,
মুনল মুখ অরবিন্দা॥

কমল বদন, কুবলয় দুই লোচন,
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর, কুসুম তুঅ সিরজল,
কিঅ দঈ হৃদয় পথাণে॥
অসকতি কর, কঙ্কণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরিসম গরুঅ, মান নহি মুঞ্চসি,
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥
অব গুণ পরিহরি, হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥

আর একটী গীতের ভণিতা এইরূপ
ভণই বিদ্যাপতি, সুনু ব্রজ যৌবতি,
ইথিক লক্ষ্মী সমানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, লছিমাদেই
বিরমাণে॥

অপর একটী কবিতার ভণিতা এবম্বিধ,
ভণই বিদ্যাপতি, শুন ব্রজ নারি।
ধৈরজ ধরয়কু মিলত মুরারি॥

মিথিলায় পঞ্জীনামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনারম্ভ হয়; উহাতে লিখিত আছে,

শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতেঃ ভূপার্ক
তুল্যেজনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জী
প্রবন্ধঃ কৃতঃ॥

অর্থাৎ "১২৪৮ শাকে হরিসিংহ দেব নৃপতির সময়ে দ্বিজগণকৃত পঞ্জীপ্রবন্ধের জন্ম হয়।"

এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য, এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলামহীপতি শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে, এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণবংশীয়; লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী; রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, এবং তিনি ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

শিবসিংহ নৃপতি সুগওনা নামক গ্রামে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই গ্রামে তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া বাস করিতেছে। তৎখানিত বিস্তৃত অতি গভীর রাজপুষ্করিণী নামে অনেক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের সদৃশ বৃহৎ জলাশয় দেশান্তরে প্রায় দেখা যায় না। মিথিলায় এই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,

"পোখরি রজোখরি অরু সভ্ পোখরা।
রাজা শিবসিংহ অরু সভ্ ছোকরা॥"

অর্থাৎ "রাজখানিত পুষ্করিণীই প্রকৃত পুষ্করিণী, আর সকল ডোবা; শিবসিংহই প্রকৃত রাজা, আর সকল সামান্য লোক।"

রাজা শিবসিংহ ও কবি বিদ্যাপতি

সম্বন্ধে মিথিলায় একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। কথিত আছে যে রাজা শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য দিল্লীশ্বর ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যাপতি এই সংবাদ শুনিয়া রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে গমন করেন। যাইয়া দিল্লীপতিকে বলেন, আমি অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া দিল্লীশ্বর পরীক্ষার্থে তাঁহাকে কাষ্ঠপেটকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাঙ্গণাকে স্নান করাইয়া নিজ নিজ ভবনে পাঠান, এবং কবিকে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক যমুনাতীরবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাপতি নাকি ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দপ্রসাদে, উহা অদৃষ্ট হইলেও, দৃষ্টবৎ মৈথিল ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন,

কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে॥
চিকুর গরল জলধারে।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি অন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥
জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাসে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুণমতি পুনমতি পাবে॥

বিদ্যাপতির এই গীতটী বাঙ্গালা দেশেও চলিত আছে; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন গল্প কাহারও মুখে শুনা যায় না, এবং এদেশে ইহার যেরূপ আকার হইয়াছে নিম্নে প্রদত্ত হইল:

কামিনী করয়ে সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনি এক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥*

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বিদ্যাপতির অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া, দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন এবং কবিকে বীসপী নামক বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিলেন। এই কারণে হউক বা না হউক, বিদ্যাপতি যে গ্রাম দান পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদ্বংশীয়েরা অদ্যাপি উক্ত গ্রাম ভোগ করিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা দিল্লীপতিদত্ত দানপত্র অদ্যাপি দেখাইয়া থাকেন। রাজা শিবসিংহ নিজভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি দত্ত দানপত্র দৃঢ় করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দানপত্র দেন;

* প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ। ১৫ পৃষ্ঠা।

তাহা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

অব্দে লক্ষ্মণ সেন ভূপতি মিতে বহ্নিগ্রহ দ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে শুভতিথৌপক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাস্সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহ বিবর্দ্ধবাহুপুলকঃ সভায় মধ্যে সভম্॥
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বীসপীনামানমাসী মতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী
বীর শ্রীশিবসিংহ দেবনৃপতিগ্র্রামং দদৌ শাসনম্॥

অর্থাৎ

"২৯৩ লক্ষ্মণ সেন ভূপতির অব্দে শ্রাবন মাসে শুভতিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনস্বরূপ প্রদান করিলেন।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিব সিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ ব্যবহৃত। বাঙ্গালার সেন রাজারা যে, মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা তদ্বিষয়ের সামান্য প্রমাণ নহে। মিথিলা হইতে আমরা আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি কবি ৩৪৯ লক্ষ্মণসেনাব্দে মৈথিলাক্ষরে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া দুইবার লক্ষ্মণ সেনের অব্দের উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হয়, যে এক্ষণে ত্রিহুতে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ প্রচলিত আছে কি না। অনুসন্ধান দ্বারা পরে আমরা অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিত সমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের অব্দ চলিতেছে। উহার চিহ্ন "লসং।" মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে উহার বৎসর পরিবর্ত্তন ঘটে। এক্ষণে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খ্রীষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল হইতেছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা খৃঃ অঃ ১১০০ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব সময় ধরিয়াছেন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাঁহার মতেরই সমর্থন হইতেছে।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে। যদি শেষোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমিদান

পত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়? ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্যকালে প্রদত্ত। শিবসিংহ অনেক আয়াস সাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে সেই কার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬১ বৎসর। সুতরাং রাজা হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শিবসিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিস্ময়কর নহে। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমি দান পত্র পাইলেও রাজা শিবসিংহের রাজ্যাভিষেকের পরে বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, পুরুষপরীক্ষার মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে জানা যায়। আর বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৩৭৯ শকাব্দে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। বিদ্যাপতি আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী ভক্তবৎসলা, এমন সময়ে আমার নিকটে তিনি আসিবেন না কেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভাগীরথী ত্রিধারা হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া বিদ্যাপতি সানন্দে সেই খানেই শরীর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিতা প্রদেশে একটী শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শিবলিঙ্গ ও নদীচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে স্থান এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ, সেস্থান ভাগীরথীর উত্তর কূলস্থ বাজিতপুর নগরের উত্তরভাগে বাঢ় নামক নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন, সে শিবসিংহ নারায়ণ নামক সামান্য দ্বিজকুল সম্ভূত। তাঁহার পূর্ণনাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" তাঁহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহারাজ ভবেশ্বর, পিতৃব্য হরসিংহদেব। হরসিংহের চারিপুত্র, দর্পনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ নরসিংহ, জীবন নারায়ণ পদাঙ্কিত রত্নসিংহ, বিজয়নারায়ণ পদাঙ্কিত রঘুসিংহ, ও বীরনারায়ণ পদাঙ্কিত ভানুসিংহ। মহারাজ শিবসিংহের তিন মহিষী ছিল, পদ্মাবতী দেবী, লখিমা দেবী, ও বিশ্বাস দেবী; রাজার মৃত্যুর পরে ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথা আছে। অনন্তর নরসিংহদেব রাজা হন,

তাঁহার পরে তৎপুত্র হৃদয় নারায়ণ পদাঙ্কিত ধীরসিংহ ও হরিনারায়ণ পদাঙ্কিত ভৈরবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর রূপনারায়ণের রাজত্ব। এই সকল বৃত্তান্ত মিথিলার পঞ্জী প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত; এবং এতদ্দ্বারা রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ ও শিরসিংহ নামক বিদ্যাপতির তিনজন মিত্রের ও লখিমা দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। রূপনারায়ণ নামটী অনেক স্থলেই শিবসিংহের বিশেষণ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

আমরা বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা পাই নাই। কিন্তু মিথিলায় আমরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার উপসংহারে যে কয়েকটী শ্লোক আছে, বাঙ্গালা পুরুষ পরীক্ষায় তাহার অনুবাদ নাই। এখানে সে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল;

ভুক্ত্বা রাজ্যসুখং বিজিত্য হরিতো হত্বা-
রিপূন্ সংগরে।
হুত্বাচৈব হুতাশনং মখবিধৌ ভৃত্বা ধনৈ-
রর্থিনঃ॥
বাগ্বত্যাঃ ভবসিংহদেব নৃপতি স্ত্যক্ত্বা শি-
বাগ্রে বপুঃ।
পূতো যস্য পিতামহঃ স্বরগমদ্দারদ্বয়াল
ঙ্কৃতঃ॥
সংকুরীপুর সরোবর কর্ত্তা হেমহস্তী রথ-
দান বিদগ্ধঃ।
ভাতি যস্য জনকো রণজেতা দেব সিংহ-
নৃপতি র্গুণরাশিঃ॥
যো গৌড়েশ্বর গর্জ্জনে খররণে ক্ষৌণীষু
লব্ধ্বা যশঃ।
দিক্কান্তাচয়কুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্য দামা-
স্পদম্॥
তস্য শ্রীশিবসিংহ নৃপতে র্বিজ্ঞপ্রিয়স্যা-
জ্ঞয়া।
গ্রন্থং (অস্পষ্ট) নীতি বিষয়ে বিদ্যাপতি-
র্ব্যাতনোৎ॥

অর্থাৎ

"রাজ্য সুখভোগ করিয়া, দশদিক্ জয় করিয়া, যুদ্ধে রিপুদিগকে নিহত করিয়া, যজ্ঞ বিধিমন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিয়া, ধনদ্বারা অর্থীদিগকে তুষ্ট করিয়া, যাঁহার পিতামহ ভবসিংহ দেব নৃপতি বাগ্বতী নদীতীরে মহাদেবের অগ্রে শরীর পরিত্যাগ করিয়া পূত ও দারদ্বয় ভূষিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সংকুরীপুরের সরোবর কর্ত্তা হেম হস্তী রথ দান তৎপর রণজয়ী গুণরাশি দেবসিংহ নৃপতি যাঁহার জনক ছিলেন; যিনি গৌড়পতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যশোলাভদ্বারা দিক্ কান্তাচয়ের কুন্তলে কুন্দদাম দিয়াছেন; সেই বিজ্ঞপ্রিয় শিবসিংহ নৃপতির আজ্ঞায় নীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করিলেন।"

মৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষা ব্যতীত বিদ্যাপতি রচিত অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে; যথা "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" "দানবাক্যা-

বলী," বিবাদসার," "গয়াপত্তন," ইত্যাদি। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রারম্ভ এই প্রকারঃ—

"অভিবাঞ্ছিত সিদ্ধ্যর্থং বন্দিতো যঃ সুরৈরপি।
সর্ব্ববিঘ্নচ্ছিদে তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ।।১।
ভক্ত্যানম্রসুরেন্দ্রমৌলি মুকুট প্রাগ্‌ভারতারস্ফুরন্
মাণিক্যদ্যুতিপুঞ্জরঞ্জিত পদদ্বন্দারবিন্দশ্রিয়ঃ।
দেব্যাস্তৎক্ষণদৈত্যদর্পদলনা সচ্চিৎ প্রহৃষ্টামর
স্বারাজ্যপ্রতিভূতবিস্ফুকরণা গুর্ব্বীরদৃক্ পাতু বঃ॥ ২।
অস্তিশ্রীনরসিংহদেব মিথিলা ভূমণ্ডলাখণ্ডলো
ভূভৃন্মৌলি কিরীট রত্ননিকর প্রত্যর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ঃ।
আপূর্ব্বাপরদক্ষিণোত্তরগিরি প্রাপ্তার্থি বাঞ্ছাধিক
স্বর্ণক্ষৌণিমণি প্রদান বিজিত শ্রীকর্ণকল্পক্রমঃ॥ ৩।
বিশ্বখ্যাতনয়স্তদীয়তনয়ঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ
সংগ্রামাঙ্গণলব্ধবৈরিবিজয়ঃ কীর্ত্ত্যাপ্তলোকত্রয়ঃ।
মর্য্যাদানিলয়ঃ প্রকামনিলয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়ঃ
শ্রীমদ্ভূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘক্রিয়ঃ॥ ৪।
শৌর্য্যাবর্জ্জিত পঞ্চগৌড় ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা
নেকোত্তুঙ্গতরঙ্গ সঙ্গিত সিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্ভৈরব সিংহদেব নৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়
ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ডকীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥ ৫।
দেবীভক্তি পরায়ণঃ শ্রতিমুখ প্রারব্ধপারায়ণঃ
সংগ্রামে রিপুরাজ কংসদলন প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ।
বিশ্বেষাংহিত কাম্যয়া নৃপবরোহনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসব পদ্ধতিংস তনুতে দৃষ্ট্বা নিবন্ধস্থিতিম্॥ ৬।

এই কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে রাজকুমার রূপনারায়ণের আদেশে বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন। ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ, ও রূপনারায়ণ নামক নরসিংহ দেবের পুত্রত্রয় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; রূপনারায়ণ কংস নামক কোন রাজাকে পরাজয় করেন; এবং ভৈরবসিংহ গৌড়ের রাজার সহিত যুদ্ধে জয়ী হন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি তাঁহার নিকটে ভূমি দানপত্র প্রাপ্ত হন। দান প্রাপ্তিকালে কবি

খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন হইবার সম্ভাবনা নহে। অতএব শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণকালে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্ব সময়েও কবি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্বকাল ৩।।০ বৎসর; তৎপরে মহারাণী পদ্মাবতী ১।।০ বৎসর, লখিমা দেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাস দেবী ১২ বৎসর রাজত্ব করেন; তদন্তর নরসিংহ দেব রাজা হন। সুতরাং নরসিংহ দেবের রাজত্বারম্ভ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স প্রায় ৯২ বৎসর হইবার কথা। অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কবি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা সারা জীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। সে দিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি সতেজ ছিল।

পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৩ শকাব্দ মধ্যে লিখিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত। নরসিংহ দেব ১৩৯৫ শকে সিংহাসনারোহণ করিয়া ৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সুতরাং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু গ্রন্থখানি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বমধ্যে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,

"অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকৃতা মহার্ণব ধৃতেন দেবীপুরাণেন পশুঘাত বলিদানয়োঃ পৃথক্ ফলমভিহিতং। যথা,
দেবীংধ্যাত্বা পূজয়িত্বা অর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীবুচ।
ঘাতয়ন্তি পশূন্ ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ।।
বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূত বিনাশনং।
তেযান্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পন্ত শাঙ্করং।।"

দুর্গোৎসবতত্ত্ব।

জ্যোতিস্তত্ত্বে "একাক্ষীন্দ্র শকাব্দকে" পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত তত্ত্ব ১৪২১ শকে লিখিত। দুর্গোৎসবতত্ত্ব যদিই বা পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহাহইলেও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী যে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদিগের প্রায় বক্তব্য শেষ হইল। তিনি যে মৈথিল কবি, তদ্বিষয়ের প্রমাণার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের

ভনিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগ দখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতিলিখিত পুরুষ পরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতি রচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশ প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গণাগণের স্নান বিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল প্রমাণ সত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

কিন্তু বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালি বলা অন্যায় নহে। বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও, বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজ্যস্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবের নিকটে পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

মিথিলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান স্থান। এখানেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া

রাজর্ষি জনকের নিকটে উপস্থিত হন। এখানেই ন্যায়মত প্রবর্ত্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার পক্ষিলস্বামী প্রাদুর্ভূত হন। এখান হইতেই ন্যায় শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, ও চৈতন্যদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিভা প্রদীপ্ত করেন; আর এখানে আসিয়া পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া শারদ চন্দ্রিকা বিনিন্দিত নির্ম্মলবুদ্ধি শিরোমণি ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপকে ভারত শিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিদ্যাপতির সরস কবিতা নহে, আরও অনেক কারণে বাঙ্গালা মিথিলার নিকটে ঋণী।

উপসংহারকালে আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান মৈথিল রাজবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাপতির জীবন চরিত সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির বিষয়ে অনেক কথা জানা দুঃসাধ্য হইত।

নিদ্রিত প্রণয়।

(রূপক)

হিমালয়ের কোন নিরালয় প্রদেশে একজন তেজস্বী তপস্বী বাস করিতেন, সেই মহাপুরুষ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, এবং তিনি কতকালই বা এ নির্জ্জন বিজনস্থানে বাস করিতেছেন, এই সকল বিষয় কেহই বিশেষ জানিত না। কেহ কেহ বলিত যে তাঁহার বয়ঃক্রম শতবৎসরের বড় অধিক হইবে না। কেহ কেহ বলিত যে সৃষ্টির সমকালেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করেন। কেহ বলিত যে তিনি ত্রেতাযুগে অযোধ্যাধিপতি যোধপ্রধান অশেষ যশোধাম শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন এবং দ্বাপরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উপরোধে দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বাসা সহকারে যুধিষ্ঠির কুটীরে অতিথি হয়েন।

এইরূপে নানা জনে নানা কথা কহিত। দিগ্‌দিগন্তর হইতে মানবগণ তদীয় পাদযুগল পূজনার্থ আগমন করিত এবং জীবন মরণ সম্বন্ধে সতত তদীয় উপদেশ গ্রহণ করিত। রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণার্থ দূরদেশ হইতে নরপালগণ আগমন করিতেন, জ্ঞানীরাও

পরমার্থ বিষয়ে এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন। মহর্ষি সকলকে সাদর সদুত্তর প্রদান করিতেন; তদীয় অতীব গভীর নীতিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশকলাপ সংসারস্থ জনগণ হৃদয়ে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত।

একদা বাসন্তীয় প্রভাত সময়ে যখন নবোদিত দিনকর স্বীয় কর দ্বারা হিমাকরের তুঙ্গ-তুহিন-শিখর-নিকর পাতিত করিতেছিলেন, যৎকালে সুশীতল পরিমলসঙ্কুল নির্ম্মল মলয়ানিল হিমালয় নিলয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছিল, যখন বিমানবিহারী বিহঙ্গমবর্গের বিনোদ কলরবে তপোবন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যখন পার্ব্বতীয় বন্য কুসুম সৌরভ দিগ্বিদিক পরিব্যাপ্ত হইতেছিল,—তখন যোগিরাজ এক পবিত্র লতামণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী শিলাতলে উপবেশন করত এক মনে মুদ্রিতনয়নে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন। তৎকালে তদীয় শুভ্র মূর্ত্তি, গম্ভীরাকৃতি, এবং অচল প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি ভবদেব কৈলাস ভূধরে মহাযোগে মগ্ন আছেন।

এদিকে ক্রমে ক্রমে কতিপয় যাত্রী নানা জনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত ভক্তিভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষণকাল পরে মহর্ষি নয়নোন্মীলন করিলেন, এবং সকলকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন—"বৎসগণ! তোমাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন কর আমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ করিতেছি।"

অনন্তর প্রথমতঃ এক কামিনী মুনি চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"মহর্ষে! মদীয় স্বামী বহুদূরস্থিত কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নৃপতি। তদীয় প্রগাঢ় প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া আমিই তাঁহাকে মদীয় পিতৃসিংহাসনে স্থানদান করিয়াছিলাম; বহু দিবসাবধি আমি তাঁহার একান্ত প্রণয়িনী ছিলাম কিন্তু দেখুন কি আক্ষেপের বিষয় তিনি আর আমাকে প্রণয়নয়নে নিরীক্ষণ করেন না; অধিক কি কহিব তিনি আমাকে সামান্য মহিলার ন্যায় অবহেলা করেন; অতএব প্রভো! কি উপায় অবলম্বনে তাঁহার প্রণয় আমি পুনরুদ্দীপন করিতে পারি, এবিষয়ে আপনি সৎপরামর্শ প্রদান করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্যক্ শিষ্টাচারসহকারে মুনিবর সন্নিধানে এই প্রকারে আবেদন করিল।

"ঋষিরাজ! যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়কুলে এ অভাগার জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে। এক অসাধারণ রূপলাবণ্যশালিনী কামিনীর প্রণয়ে আমি মুগ্ধ হওয়াতে সে কিছুকাল পরে আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহার সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া তদীয় প্রণয়লাভার্থ বহুল তুমুলবিঘ্নসঙ্কুল রণস্থলে বিজয়লাভপূর্ব্বক স্বীয় যশোরশ্মিতে পৃথিবীতল প্রদীপ্ত করিয়াছি। কিন্তু হায়!

অদ্যাপি আমি তদীয় প্রণয়রত্ন সম্পূর্ণ লাভ করণে কৃতকার্য্য হই নাই; এক্ষণে সেই কামিনী মৎপ্রতি অনুরাগিণী নহে।”

এইরূপে ক্ষত্রিয়নন্দন আত্মবেদন ঋষি সমক্ষে নিবেদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল, “তাপসবর, মদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত আকর্ণন করিলেন, এক্ষণে কি প্রকারে আমি তাহার হৃদয়ে প্রণয়াগ্নি পুনঃ প্রজ্বালন করি এবিষয়ে আমাকে সুপরামর্শ প্রদান করুন।”

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিজ্ঞাপন সমাপ্ত হইবা মাত্র তৃতীয় ব্যক্তি অতিমাত্র ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “আমি বিপুল সম্পত্তির অধিপতি, এক্ষণে ভ্রাতৃপ্রণয় অপনয় শোকে একান্ত প্রপীড়িত। আমি আমার একমাত্র সহোদরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সমুদায় ঐশ্বর্য্য রাজকার্য্য তাহার সহিত সমানাংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলাম অধিক কি কহিব আমি সংসারস্থ যাবতীয় সুখ তদীয় সুখান্বেষণে বিসর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণে সে আমার পূর্ণ প্রীতি প্রতিশোধ প্রদানে একান্ত পরাঙ্মুখ, ঋষিরাজ! ভ্রাতৃপ্রীতি প্রাপণার্থ আমি এক্ষণে কি করি?”

অনন্তর চতুর্থ যাত্রী নিবেদন করিল, “মুনিকুলতিলক, আমি স্বয়ং একজন কবি, মদীয় প্রণয় জনৈক মানবে পর্য্যবসিত হয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞ এবং সাধুরাই আমার প্রণয়পাত্র এবং সেই সকলের চিত্ত বিনোদনার্থ আমি আমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব সংগীতাবলীতে নিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু ইহা কি সামান্য খেদের বিষয়, যে আমি যাঁহাদের জন্য ঈদৃশ বিষদৃশ যত্নশীল তাঁহারা আমার বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেন না। মহর্ষে! এক্ষণে তাহাদের নিদ্রিত প্রণয় জাগরিত করণার্থ কি কর্ত্তব্য, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।”

অনন্তর এক সৌম্যমূর্ত্তি ধীরপ্রকৃতি পুরুষ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিজ্ঞাপন করিল, “আর্য্য, আমি একজন বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু বিদ্যাপথের পথিক। গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূরিত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত নিয়ম কৌশল নির্ণয় করিয়াছি, পৃথিবীর অন্তরস্থ অন্ত্র উদ্ভেদ করিয়া যে সমস্ত মহামূল্য পদার্থপুঞ্জের অস্তিত্ব অবধারিত করিয়াছি, তরুলতা ওষধিপুঞ্জের পরীক্ষানন্তর যে সমস্ত উত্তমোত্তম ঔষধরাশি গবেষিত করিয়াছি, সে সমুদায়ই আমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু কৃতঘ্ন মানবগণ, আমার কথা কর্ণকুহরে স্থান দান করে না,—ফলতঃ তাহারা আমাকে অবহেলা করে, সাধারণ প্রণয় আহরণার্থ এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?”

অনন্তর এক অবলা অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞাপন করিল। “পিতঃ! আমার কিঞ্চিন্মাত্রও মাহাত্ম্য, জ্ঞান, ধন, ঐশ্বর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই; আমি এক সামান্যা, সুদীনা, সহায়হীনা, সরলপ্রাণা কুমারী মাত্র হইয়াও, কি ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্, কি

হীনবল অজ্ঞান, আমি সকলের প্রতি সমভাবে সম্যক্ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বলিতে কি, আমি তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তাহাদের মৎ-প্রতি অণুমাত্রও অনুরাগ বা স্নেহ নাই এবং সেই জন্যই আমি আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে পারি না, অতএব হে তাপসশ্রেষ্ঠ! এঅধীনীর প্রতি কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক কি প্রকারে এ অবলা তাহাদের প্রণয়পাত্রী হইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনি সৎপরামর্শ প্রদান করুন।”

অনন্তর এক শান্তশীলা যোষিৎ অগ্রসর হওত ক্ষিতিন্যস্তজানু হইয়া ধীর বিনয় বচনে একান্ত মনে আবেদন করিল। “হে ঋষিপ্রবর! মদীয় শোক অম্বুধির অবধি নাই। আমি একজন সামান্য মহিলা এবং একমাত্র সন্তানের জননী। পুত্রমুখ দর্শনাবধি আমার অপত্যস্নেহ অতি প্রবল। সত্য বটে আমি আমার অঙ্কধন সেই নন্দনকে রাজসিংহাসন, কি মান সম্ভ্রম, কি ভূমি সম্পত্তি, কি বিপুল জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার হৃদয় কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অমূল্যরত্নস্বরূপ মাতৃস্নেহ প্রদান করিয়াছি, হায় ঋষিরাজ, কি ক্ষোভের বিষয় দেখুন, তথাপিও তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির লেশমাত্রের উদয় হয় নাই। এক্ষণে কি প্রকারে তাহার অন্তঃকরণে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা মহাশয় বলিয়া দিউন।”

এইরূপে স্বীয় স্বীয় আবেদন সমাপনান্তে এই সপ্ত সংখ্যক অভিযোজক যথাস্থানে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষিও ক্ষণকাল গম্ভীর তুষ্ণীম্ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

তাহাদের এতৎসমস্ত বিনয় বিজ্ঞাপন বচনবিন্যাসে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। দিনমণি শীতশীর্ণ অচলবাসীদিগের উপর হিমানির দুঃসহ প্রপীড়ন নিবারণ মানসে যেন স্বীয় প্রখরতর কর বিকীরণ কারণে তাহাদিগের শিরোপরি ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। শৈত্য এবং অন্ধকার উভয়ে এক শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বন্ধুত্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একত্রে নিভৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা অচল গুহাটি আলোকময় হইল। বোধ হইল যেন একটি অগ্নিময় কুজ্ঝটিকায় উহার অন্তর্দ্দেশ পরিপূরিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সকলে এই কুজ্ঝটিকা মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে বোধ হইল যেন আকাশপথে অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন এক যুবা পুরুষ নবীন নীরদে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; তপোধন ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অবলোকন করত অভিযোজকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। “দেখ, প্রণয় কি ঘোরতর সুষুপ্তিতে অভিভূত রহিয়াছে। এ মহীমণ্ডলে তদীয় নিদ্রাভঙ্গ করণে কাহার

ক্ষমতা নাই।” এই বাক্য বলিবা মাত্র সম্মুখস্থ ধূমাবলীর অভ্যন্তর হইতে কতিপয় সুন্দর মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া প্রণয়ের শয্যা সন্নিকর্ষে সমাগমন পূর্ব্বক কেহ বা চুম্বন প্রদান দ্বারা, কেহ বা অশ্রুবারি বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জাগরিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা অন্তরে দুঃখরাশি থাকিতেও কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে কেহ বা মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া হস্তঘর্ষণ করিতে করিতে কেহ বা ক্ষিতিন্যস্ত জানু হইয়া কেহ বা রাজ্যসিংহাসন, কেহ সুপ্রচুর স্বর্ণ ও হীরকাবলী, কেহ সম্ভ্রমপতাকা, কেহ যশোমালা প্রদানানন্তর কাতর স্বরে কহিতে লাগিল। “হে প্রণয়! আর কতকাল নিদ্রা যাইবে? শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর।” প্রণয় তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, এবং তাহাদের প্রদত্ত ধনে, সস্নেহ চুম্বনে এবং অশ্রুজীবনে কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ না হইয়া অগাধে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত মূর্ত্তি যাত্রিগণের নয়নপথ হইতে অপসারিত হইয়া গেল। অবিলম্বে জনৈক পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ কলেবর পুরুষ, সৎকারোপযোগী বসনে বসান, ধূমগর্ত্ত হইতে বহির্গত হইলেন। নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রণয়ের পালঙ্কপার্শ্বে সমাগত হইলেন। মেঘের ঘনঘটায় ধরণী অঙ্গে যেরূপ কালিমা পড়ে, তাঁহার আগমনে প্রণয়ের স্বর্ণকান্তি সেইরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিল। চীৎকার করিয়া প্রণয় উঠিয়া বসিলেন, এবং যাহারা তদীয় নিদ্রাভঙ্গনার্থ এতকাল বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে হৃদয়ে গ্রহণার্থ করপ্রসারণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যে পথে গিয়াছে সে পথ হইতে কেহ কখন ফিরে নাই; কেহই আসিল না। তখন উদ্বুদ্ধ প্রণয় রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যোগিবর যাত্রীদিগের প্রতি স্বীয় উজ্জ্বল গম্ভীর কটাক্ষ ক্ষেপণ করিলেন। ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোমাদিগের হৃদয়বেদনা-শান্তিসাধনার্থ আমার এই মাত্র মহৌষধ—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ,—মৃত্যুচ্ছায়া স্বীয় শরীরে পতিত না হইলে নিদ্রিত প্রণয় উদ্বুদ্ধ হয় না।”

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় এই সময়ে কাহার কাহার হাত দিয়া সম্পন্ন হইত তাহা বিবেচ্য। রামায়ণের বহুস্থানে বহুবিধ ব্যবসায়ী ও শিল্পীর নাম উল্লেখ আছে, সেই সকল এই সংকীর্ণ স্থানে উদ্ধৃত হইতে পারে না। তবে এক স্থলে যথায় বহুতর শিল্পী ও ব্যবসায়ীর নাম একত্রে আছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োশিতিতম সর্গে ভরত যৎকালে রামের অনুসরণে সসৈন্যে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, তৎকালে নিম্নলিখিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল।

"মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ॥১২
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
দন্তকারাঃ সূপকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ॥১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোষোদকা বৈদ্যা ধূপিকা শৌণ্ডিকাস্তথাঃ॥১৪
রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষ মহত্তরাঃ।
শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্ত্তকাস্তথা॥"১৫

মণিকার, সূত্রকর্ম্মবিশেষজ্ঞ (তন্তুবায়-রামানুজ,) কুম্ভকার, শস্ত্রোপজীবী (শস্ত্র নির্ম্মাণোপজীবিনঃ—রা,) মায়ূরক (ময়ূ পিচ্ছৈঃ ছত্রাদিব্যঞ্জনকারিণঃ—রা,) ক্রাকচিক (করপত্রং তেন জীবন্তি তে ক্রাকচিকাঃ—রা, করাতি), বেধকা (মণিমুক্তাদিবেধককর্ত্তারঃ—রা,) দন্তকারঃ (গজদন্তাদিভিঃ সমুদ্রকাদিকর্ত্তারঃ—রা,) গন্ধোপজীবী (গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়িকাঃ—রা,) সুবর্ণকার, কম্বল কার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক, (ধূপবিক্রিয়য়া জীবিনঃ—রা,) শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায় (সূচ্যা সীবনকর্ত্তারঃ—রা, দর্জি,) সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে,) শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভিঃ বাইজি এবং ভেড়ো,) কৈবর্ত্ত।

এই উদ্ধৃত অংশ দ্বারা একবারে তিনটি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায় বহুবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায় এবং লাভের আকরস্থান রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া, যখন লাভের সর্ব্বপ্রকার আশার ধ্বংসস্থল চিত্রকূটের জঙ্গলে রাজাজ্ঞায় শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা গমনে বাধ্য হইয়াছে, তখন ইহা অনুমেয় যে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের কার্য্যপথে স্বাধীনতা স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইত না। সুতরাং তদ্রূপ বাধাজনিত তদ্বিষয়ের অনুগামী যে অমঙ্গল ও মান্দ্যতা,

তাহাও অবশ্য ঘটিত। এই সকল শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগামী, বা অনুগমনে বেতনভোগী হইলে একথা খাটিত না, কিন্তু ভরতের আজ্ঞা হইল যে, সেই সেই বণিক্ অনুগমন করিবে।

"যে চ তত্রাপরে সর্ব্বে সম্মতা যে চ
নৈগমাঃ।"

—"তত্র নগরে সম্মতাঃ প্রসিদ্ধাঃ নৈগমা বণিজঃ।"

রামানুজ।

কোন্ প্রসিদ্ধ বণিক্ এ কর্ম্মভোগে সহজে যাইতে স্বীকৃত হয়, অথবা স্ব ইচ্ছায় হইলে আবার রাজাজ্ঞা কেন? পুনশ্চ রাম যৎকালে বনগমন করিতে উদ্যত হয়েন, তখন রামের রক্ষা এবং সুখার্থে দশরথ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিয়া কহিতেছেন, বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করুক।

"———বণিজশ্চ মহাধনাঃ।
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসা-
রিতাঃ।"

—"প্রসারিতাঃ—সুপ্রসারিতাপণাঃ।"

—রামানুজ।(১২)

কেবল ইহা হইয়াই ক্ষান্ত নহে। মনুর বিধানানুসারে ধরিলে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আবার রাজার জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া খাটিয়া দিতে হইত। মনু, সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন,

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চান্যো-
পজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্মং মাসি মাসি
মহীপতিঃ॥"

তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদেই অনুমিত হইতেছে যে বেদাধিকারী বৈশ্যের দ্বারা ঐ সমস্তই সম্পন্ন হইত না। ভিন্ন ভিন্ন সঙ্করজাতি দ্বারা ব্যবসায় বা

(১২) বণিক্দিগের উপর এরূপ বা তথাবিধ দৌরাত্ম্য প্রাচীনকালে প্রায় সকল দেশেই কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যমকালে এমন কি আধুনিককালেও কম ছিল না। সভ্যদেশ ইংলণ্ডেও এলিজিবেথের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বণিক্দিগের উপর তত না হউক বিদেশীয় বণিক্দিগের উপর অপরিমিত অত্যাচার হইত। ১৬৪০ খৃঃ অঃ রাজবিপ্লবের পর হইতেই কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় উভয় প্রকার বণিক্দিগের উপর অত্যাচার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রজা দ্বারা বিনা পুরস্কারে নিয়মিতকালে রাজার ব্যাগার খাটার কিয়দ্ভাবে অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল। রাজপথ মেরামত রাখা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ফিলিপ এবং মেরির অষ্টবিংশতি রাজঘোষে এরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, যে রাজপথ যে পরিসরের মধ্য দিয়া গমন করিবে, সেই পরিসরস্থ লোকেরা সেই রাজপথ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত বৎসরে চারিদিন কাজ করিতে বাধ্য। ঐরূপ স্কট্লণ্ডে ১৬৬৯ খৃঃ অঃ পার্লিয়ামেণ্টেতে যে আইন হয়, তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরের মধ্যে ছয় দিন কার্য্য করিতে বাধ্য।

শিল্প বিশেষ সম্পাদিত হইত,—এস্থলে সেই সকল সঙ্করজাতির নাম পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। বাল্মীকির বহুপূর্ব্ব হইতে সঙ্করজাতির উৎপত্তি। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ধরিলে, বাল্মীকি ত্রেতাযুগের এবং বেণরাজা সত্যযুগের। কথিত আছে যে সেই বেণ রাজার রাজত্বকালে রাজশাসনের শিথিলতায় প্রজাবর্গ কামবশে যথেচ্ছা অভিগমন করিলে বহুবিধ সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে যে সকল অপেক্ষাকৃত হীনকার্য্য আর্য্যেরা স্বহস্তে বা শূদ্রের সাহায্যে করিতেন, যে দিন সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইল, সেই দিন হইতে সেই সকল কার্য্যের ভার তাহাদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া, অন্য বিষয়ে চিত্ত পরিচালন করিতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক সঙ্করবর্ণের আভিজাত্য বিবেচনায়, তাহাদের উপর উচ্চ বা নীচ ব্যবসায় আরোপিত হইল। তাহাই হিন্দু সমাজে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ বন্দোবস্ত তত্তদ্ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ব্যতীত সুসম্পাদিত হয় নাই। বাল্মীকির সময়ে এই বিস্তৃতির আরও বিস্তার। এই নিমিত্তই বহুবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকল যে বৈশ্য হইতে ভিন্নতর বর্ণের হস্তে বাল্মীকির সময়ে দেখা যাইতেছে; তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। বৈশ্যেরা এসময়ে সাধারণতঃ সেই সকল জাতির শ্রমজাত দ্রব্য লইয়া উচ্চতম বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়। এই সময়ের চিত্র এরূপ দেখা গেল, আবার আর্য্যজাতির আদিম সমাজের চিত্র দেখ। ঋগ্বেদের একজন কবি আত্মপরিচয় দিয়া কহিতেছেন যে, তাঁহার পিতা বৈদ্য, তিনি কবি, তাঁহার মাতা শস্যপেষণকারিণী।

"কারুর অহম্ তাতো ভিষগ্ উপল-
প্রক্ষিণীননা।"
৯-১১২-৩।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতি বিভাগের কথার উল্লেখ নাই। তথায়ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিটি মাত্র জাতির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। অনেকের মতে পুরুষ সূক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক।(১৩) একারণে অনেকে অনুমান করেন যে, প্রাচীনতম বৈদিক সময়ে জাতিভেদ ছিল না। তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, সেই বেদের যে সকল সূক্ত প্রাচীন বলিয়া গ্রাহ্য, সেই সকলেই তক্ষা অর্থাৎ ছুতার, বৈদ্য, কামার, পাখীমারা, রথ নির্ম্মাণের কৌশল ও ব্যবসায় বর্ণন দৃষ্টে তাহার নির্ম্মায়ক, তন্তু এবং ওতু ও বয়ন শব্দের উল্লেখে তাঁতির কার্য্য, কৃষি, ক্ষৌরকার্য্য, রসারসি, চর্ম্ম, এবং জল বা সুরাবহনার্থে মসক বা ভিস্তির ("ছতি") উল্লেখ (১৪) হেতু তত্তব্যবসায়ীর ও

(১৩) Max Muller's Aus: Saus: lit pp. 570.

(১৪) Muirs Sanscrit texts vol V. তথা হইতে ব্যবসাদারের এই তালিকা গৃহীত হইল।

কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এসকল ব্যবসায়ী বা কাহারা ও এসকল কার্য্য কাহারাই বা করিত। আর্য্যেরা মুখে বেদসূক্ত রচনা এবং হাতে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যে যে বিষয়ের বৈষম্যতা বৈদিক সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, বাল্মীকির সময়ে তাহা অতি প্রবল।

পূর্ব্বালোচিত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্পের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, তৎকালে দেশমধ্যে অন্তর্বাণিজ্য বিশেষরূপে প্রবাহিত হইত। এস্থলে আর এক বিষয় বিবেচ্য। অন্তর্বাণিজ্যই হউক, আর বহির্বাণিজ্যই হউক, তাহার সুবিধার নিমিত্ত দেশমধ্যে আপাততঃ এই কয় বিষয়ের আবশ্যক—রাজপথ, খাল, ঋণ দানাদান এবং ব্যাঙ্ক।

রাজপথ সম্বন্ধে পূর্ব্বগত এক প্রস্তাবে যথাযথ কথিত হইয়াছে, এবং একরূপ দেখান হইয়াছে, যে, রাজপথ যাহা ছিল, তাহা ভালরূপই ছিল, কিন্তু অধিক সংখ্যক ছিল না। তাহা সে সময় বিবেচনা করিলে না থাকারই সম্ভব। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেই বা আমাদের কতই রাজপথ ছিল। যাহাহউক রাজপথের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাজপথ নির্ম্মাণদক্ষ কর্ম্মকরগণেরও অস্তিত্ব যখন অবলোকিত হয়, এবং সেই কার্য্যই তাহাদের বৃত্তিস্বরূপ দেখা যায়, তখন কি এরূপ অনুমান করায় দোষ আছে যে, যে স্থান দিয়া লোকের গতিবিধি সর্ব্বদা হইত, এবং বাণিজ্য কার্য্য নিরন্তর প্রবাহিত হইত, সেই সেই স্থানে প্রশস্ত রাজপথের অভাব ছিল না? ভরত যখন রামের অনুসরণে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন তখন সৈন্য চলাচলের নিমিত্ত পরিসর রাজপথনির্ম্মাণ হেতু নিম্নলিখিত মত কর্ম্মকারগণ নিয়োজিত হইয়াছিল।

"অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্মবিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥
কর্ম্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথাবার্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ॥
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে॥"
২।৮০

ভূমি প্রদেশজ্ঞ, সূত্রকর্ম্মকার [শিবিরাদি নির্ম্মাণে সূত্র গ্রহণকুশল,] খনক, যন্ত্রক, [জল প্রবাহাদি যন্ত্রণসমর্থ,] স্থপতি [রথাদি কর্ত্তার,] যন্ত্রকোবিদ [ক্ষেপণী আদি [যন্ত্রকরণকুশল,] মার্গিণ [বনমার্গ রক্ষায় নিযুক্ত,] বৃক্ষতক্ষক [মার্গাবরোধক বৃক্ষছেত্তার,] সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার।

অনন্তর ইহারা ভরতের নিমিত্ত কিরূপ রাজপথ প্রস্তুত করিল, তাহার প্রক্রিয়া নিম্নে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদৃষ্টে তৎকালে পথাদি নির্ম্মাণ প্রণালী বহুলাংশে অনুমিত হইবে।—"অনন্তর সূত্রকর্ম্ম পর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ

খনক, অবরোধক, স্থপতি, বার্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, ও পথ পরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্যক লোক হর্ষভাবে নির্গত হইলে, পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গ রাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরুলতা গুল্ম স্থানু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যেস্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থানে সমতল ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ, সেতুবন্ধন কেহ কর্কর চূর্ণ, (১৫) এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থে মৃৎ পাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই হ্রস্ব প্রবাহ সকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই, তথায় বেদি পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল।"(১৬)

মার্গিন নামক কর্ম্মচারীর অস্তিত্ব হেতু ইহাও বোধ হয় যে, রাজপথের মধ্যে আশঙ্কাযুক্ত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, রক্ষণে যত সমর্থ হউক বা না হউক, কিন্তু নিযুক্ত হইত। আমাদেরও নিযুক্ত হওয়া টুকুই জানিবার প্রয়োজন। যে সকল রাজপথ রাজধানী বা সহরের ভিতরে, সে সকলে নিয়মিতভাবে জলসিঞ্চন হইত। এবং উৎসবকালে আলোকে আলোকিত হইত। অন্য সময়ে আলো-

(১৫) ইহার দ্বারা নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে রাজপথ সকল কাঁকরাদি দ্বারা পাকা (metalled) করা হইত। ইহা অবশ্যই আমাদের প্রাচীন কালের পক্ষে গৌরবের কথা। পাশ্চাত্য ভূভাগের ইতিবৃত্ত দেখিলে পাকা রাস্তার প্রথম উল্লেখ শমিরমার রাজত্বকালে দেখা যায়। তৎপরে থিবস এবং কার্থাজিনীয় নাগরিকেরা পাকা পথ প্রস্তুত আরম্ভ করিয়াছিল। রোমনগরে ৫৬০ খৃঃ পূঃ আপিয়স ক্লডিয়সের দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান হয়। বর্ত্তমান সভ্যতম ইউরোপ ভূভাগে ৮৫০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে নাগরিক রাস্তা সমস্ত পাকা করা হয় নাই, ঐ শকে স্পেনদেশীয় চতুর্থখলিফা দ্বিতীয় আবদুল রহমানের আজ্ঞাক্রমে কর্ডোবানগরের রাস্তা দিয়া ইহার প্রথম আরম্ভ হয়। পারিস নগর তদভাবে এমন ধূলা ও জঞ্জালময় ছিল যে তন্নিমিত্ত উহার পূর্ব্ব নাম লুটিটিয়া (Lutetia) পরিবর্ত্তন হইয়া পারিস হয়। তথায় ১১৮৪ খৃঃ অঃ দ্বিতীয় ফিলিপ প্রথমে পাকা রাস্তার অনুষ্ঠান করেন। লণ্ডননগরে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার অনুষ্ঠান হয় নাই। জর্ম্মানীতে ইহার প্রথম সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই তুলনে আমাদের পিতৃপুরুষদিগের কার্য্যশৃঙ্খলা ও উদ্ভাবনীশক্তি অবধারণ কর।

(১৬) অযোধ্যাকাণ্ডে ৮০ সর্গ। এস্থলে পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ গৃহীত হইল। বাহুল্যভয়ে মূলাংশ উদ্ধৃত হইল না।

কিত হইত না তাহা নিম্নলিখিত কথার ভাবে বোধ হইতেছে। রামের যৎকালে রাজ্যাভিষেকের কথা হয়, তখন উৎসব হেতু, এবং রাম যদি রাত্রিকালে নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়েন, এজন্য স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়া পথে আলোক দিবার নিমিত্ত তাহাতে দীপাবলী সজ্জিত হইল।

"প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমন শঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাং স্তথা চক্রুরনুরথ্যাস্থ
সর্ব্বশঃ॥"(১৭)
২।৬।১৮

পথ সকল সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হইত। মনুসংহিতায় যে যে ব্যক্তি রাজপথে মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি যে কোনরূপে পথ অপরিস্কার করিত, তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত (মনু ৯।২৮২-২৮৩)। কিন্তু সচরাচর পথ পরিস্কার রাখার নিমিত্ত দণ্ডবিধি দ্বারা বা অন্য কোনরূপে বাধ্য করা হয় নাই। "পথ সংস্কার" শব্দের ভূয় উল্লেখ হেতু পথ মেরামত প্রথার বহুলতা জ্ঞাপিত হয়। এ পথসংস্কারের নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত কি না, তাহা নিরূপণ হয় না। হইতে পারে যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্ব কথিত রাজনিয়ম অনুসারে মাসে মাসে রাজার জন্য কিছু কিছু করিয়া কাজ করিতে হইত, তাহাদেরই মধ্যে কার্য্যক্ষম এবং তদুপযুক্ত জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা এই পথসংস্কার ও পূর্ব্বোক্ত পথ পরিস্কার কার্য্য সমাধা করা হইত।(১৮)

(১৭) নৈমিত্তিক আলোদানের অভাব হেতু অন্যের সহ তুলনা করিলে আর্য্যগণ নিন্দনীয় হইবেন না। পুরাকালে প্রায় সর্ব্বদেশেই কেবল উৎসবাদি আনন্দ কার্য্যে মাত্র পথে আলোক প্রদানের প্রথা অবলোকিত হয়। বেক্‌মান সাহেবের কহত মত জানা যায় যে, হিরোডোটসের সাময়িক মিসরীয়েরা বাল্মীকির সময়ের ন্যায় উৎসবে মাত্র এই প্রথার অনুসরণ করিত। য়িহুদিরা Festum encoeniorum নামক পর্ব্বকালে অষ্টরাত্রি প্রতি গৃহের সম্মুখে দীপ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিত। স্কাইলসের বাক্যানুসারে ইহা ব্যক্ত যে গ্রীকেরা উৎসবাদিতে কেবল ঐ প্রথাবলম্বী ছিল। রোমনগরে ক্যাটিলিনের ষড়যন্ত্র ভেদ হইলে কিকিরোর গৃহাগমনকালীন নগরবাসীরা আনন্দে নগর আলোকিত করিয়াছিল। ইত্যাদি। কিন্তু ধারাবাহিক রূপে পথে আলোক প্রদানের প্রথা পুরাকালে এবং খ্রীষ্টের পরেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত কোথাও লক্ষিত হয় না। ইহার প্রথম সৃষ্টি পারিস নগরে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ নগর দস্যুদল দ্বারা এতদূর উত্যক্ত হয় যে, অধিবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া রাত্রি নয়টার পর হইতে সমস্ত রাত্রি নগর দীপাবলী দ্বারা আলোকিত রাখিত। এ নিমিত্ত ১৫২৪ খৃঃ অঃ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়, সেই আজ্ঞা সময়ে সময়ে [১৫২৬, ১৫৫৩ খৃঃ অঃ ইত্যাদি।] লোকের স্মরণার্থে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়। এইরূপে নিত্য আলোকদানের প্রথা পারিস নগরে প্রথম সৃষ্টি হয়।

(১৮) পাশ্চাত্য ভূমির অধুনিক সভ্যতা গর্ব্বিতজাতির ব্যবহারসহ এখানে তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ফ্রান্সরাজ্যে ১৩৭২ খৃঃ অঃ এবং স্কটলণ্ডে ১৭৫০ খৃঃ অব্দ

উত্তর ভারতবর্ষ যেরূপ নদীমাতৃক দেশ তাহাতে খালের আবশ্যক ছিল না। তথাপি "কৃত্রিম সরিৎ" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতন্নিমিত্ত যদি কোন আর্য্য সন্তান এই বলিয়া অহঙ্কার করিতে চাহেন যে, যে খাল কাটা প্রথা ১৭৫৫ খৃঃ অঃ সাঙ্কিক্রুক খাল কাটা দিয়া ইংলণ্ডে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, আর্য্যেরা বহু প্রাচীন কালেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আপাততঃ কোন আপত্তি নাই। ব্যাঙ্কের প্রথা ছিল কি না তাহা জানি না। ছয় কাণ্ড রামায়ণে তদ্ভাবের কোন আভাষ নাই। তবে ঋণ দানাদানের প্রথা যখন ঋগ্বেদেই (১০-৩৪-১০) লক্ষিত হয়, তখন বাল্মীকির সময়ে যে ইহার বহু প্রচলন, তাহা বলা বাহুল্য। বহুলোক একত্র হইয়া ভাগে বাণিজ্য করণ প্রণালীর উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাই না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার জন্মকালীন ইহার প্রচলন অবলোকিত হয়। যথা

"সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্ম-
কুর্ব্বতাং।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বাসম্বিদা
কৃতৌ॥"
ব্যবহার কাণ্ডে।

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বাল্মীকির সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। এখানে প্রায়ই অন্ধকারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ বাণিজ্য সম্বন্ধে "বণিজো দূরগামিনঃ" ইহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক অসংখ্য বার উক্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকের সেই পারিমাণে উল্লেখ পাওয়া না যাউক, কিন্তু পাওয়া যায়।

"উদিচ্যাশ্চ প্রতীচাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ
কেবলাঃ।
কোট্যাপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্ত তে॥"
২।৮২।৮

—উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ,

পর্য্যন্ত গৃহস্থগণকে আপন গৃহের ময়লা গৃহের সম্মুখস্থ পথে নিক্ষেপ করিবার বাধা ছিল না। সুতরাং অপরিষ্কারকের দণ্ড ছিল না। কিন্তু যে অংশ দিয়া পথ গিয়াছে সেখানকার সকলকে আত্মব্যয়ে বা কায়িক পরিশ্রমে সেই পথ সর্ব্বদা পরিস্কার রাখিতে হইত। ১২৮৫ খৃঃ অঃ ফিলিপের রাজত্বকালে যে আইন জারি হয়, তদনুসারে যাহার বাড়ীর কাছ দিয়া যে পথ গিয়াছে, তাহাকে সেই পথ মেরামত করিতে হইবে। ইহাতে লোকের অমনোযোগবশতঃ ১৩৮৮ খৃঃ অঃ এই আইনসহ দণ্ডবিধি পর্য্যন্ত যোজিত হয়। ১৬০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চেরা এই রাজদৌরাত্ম্যভোগ করিয়া আসিয়া ছিল। বার্লিন নগরে ১৫৭১ খৃঃ অঃ এক আইন হয়, তদনুসারে, যে যে বাজার ঘাটে অধিক ধূলা মাটি জমিবে, সেই সেই বাজার ঘাটে যিনি যিনি গতায়াত করিবেন, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ধূলা মাটির ভার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে হইবে। কেমন, এর তুলনায় গরিব ব্রাহ্মণদের বিধি কি রকম?

দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করুক।

এখানে দেখা যাইতেছে যে বহুদূর-গামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও আছে। জলপথে গমন কেবল বাল্মীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১-১১৬, ১-২৫,৭-৮৮ "নাব সামুদ্রিয়" বাক্যের উল্লেখে অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু এখন কথা এই যে এ সমুদ্র গমন আর্য্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যের গমনাগমন করিতে দেখিয়া গান করিতেন। তাই বা কি করিয়া বলি, মনুতে ভূয়ো ভূয়ঃ সমুদ্রগামীর কথার উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত

"———সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ।

* * *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনিষিণঃ॥"

পূর্ব্বকালীন সমুদ্র যাত্রা প্রথা সূচনা করিয়া কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা সমুদ্রে গমন করিতেন। কিন্তু আবার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্য্যাবাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দ্দেশ এই করা হইয়াছে যে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ যেখানে যেখানে বিচরণ করে তাহাই যাজ্ঞিক দেশ, তাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন, অন্যত্রে কদাপি নহে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমনে এবং বাসে সমর্থ। (১৯) এ কথা সম্ভবতঃ বাল্মীকির সময়েও খাটে। আবার বল্মীকির পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছু মাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherja (সম্ভবতঃ শর্ম্মনাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীক ভূমে গমনান্তর, ম্লেচ্ছদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জ্ঞানে, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আথেন্স নগরে অগ্নি প্রবেশ করেন। ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজাণ্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada নগরে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মভীরু ভারতে, স্বদেশ পরিত্যাগ এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন যখন এমন দূষণীয়, তখন কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে ইহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণ পূর্ব্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশ বাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন। সমুদ্র যাত্রা যেন কোন মতে হইল, কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে ত সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছুদিন থাকিতে হইবে। সে সময়ের জলপথে গতিবিধি

(১৯) Hero: vii 65, 86. &c গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমধ্যে ভারতীয় পদাতি ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জ্ঞাত নহি, হইতে পারে ভারতস্থ পার্ব্বতীয় বা তদ্রূপ অপরাপর কোন নিকৃষ্ট জাতি হইবে।

থাকিলেও তাহা উন্নতভাবের ছিল না সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে সে কিছুদিন, নেহাত কিছুদিন নহে। যদি এ কিছুদিনে দোষ না পড়ে, তবে কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল? যদি বলা যায় শূদ্রেরা যদৃচ্ছা গমনে সক্ষম, সুতরাং তাহাদের দ্বারা বিদেশ বানিজ্য সমাধা হইত, কিন্তু তাহা হইলে শূদ্রেরা সমাজে এত হীন ও নির্ধন হইবার কারণ কি? এই সকল কারণে বোধ হয় যে আর্য্যেরা সমুদ্র যাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ভারতেরই অধিবেশিত উপকূলভাগে এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেন পরবর্ত্তী আর্য্যেরা স্বধর্ম্ম বিনাশ ভয়ে সহসা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু বৈদিক সময়ে ত সে বাধা ছিল না; ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সময়ে বৈদিক আর্য্যেরা সভ্যতা পদবীতে পদার্পণ করিয়া বিলাস কলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সময়ে সমস্ত মেদিনী ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতিরা যদিও কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আয়ত্তাতীত দূরবর্ত্তী ছিল। অতএব বোধ হয় বৈদিক আর্য্যদেরও জলপথ, স্থলপথে অপরিচিত ও অগম্য, কেবল জলপথে পরিচিত ও গম্য, এমন সকল ভারতস্থ দেশেই গমনাগমন হইত।

আদিমকালীয় দক্ষ সমুদ্রগামী জাতি ফিনিসীয়দিগের ভারতে গতিবিধি ছিল কি না তাহা জ্ঞাত নহি। যদি বা ছিল, তাহা না থাকারই মধ্যে, নতুবা আরব ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র অনাবিষ্কৃতের ন্যায় থাকিত না। এবং সিন্ধুনদ হইতে মিসর পর্য্যন্ত সমুদ্র পথ আবিষ্কারার্থে সাইলাক্স দরায়ুস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেন না। আবার দেখা যায় যে, ১৩০ পূঃ খৃঃ টলিমি এবারগিটিসের রাজত্বকালীন এক্ষদস ভারত এবং মিসরদেশের মধ্যস্থ সমুদ্র পার হওয়াতে, অলৌকিক কার্য্যসাধনের ন্যায় "ধন্য-ধন্য" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতেও এ সমুদ্র পার হওয়া আর আশ্চর্য্যজনক ছিল না, তখন ইহা সাধারণ কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহ বাল্মীকির সময়ের ন্যায় প্রাচীনকালে ভারতের জলপথে বাণিজ্য বহুলতা না থাকিলেও, পাশ্চাত্য ভূভাগের দূরতর দেশ পর্য্যন্ত ভারতের ধনবত্তার গৌরব ধ্বনিত হইত, এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই এরূপ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইত, যাহার জন্ম কেবল ভারতবর্ষ বলিলেই হয়, এবং সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ষই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। ইহা কিরূপে সম্ভবে। ভারতের বিদেশ গমন যথাযথ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীক্‌দিগেরও সে প্রাচীনকালে, তদ্বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। হোমরের

সময়ে লিবিয়া এবং মিসরদেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল। ইটালী একবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ হেসিয়ডের গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ ভয়াবহ এবং জাহাজ গঠনপ্রণালী যেরূপ কুৎসিত অনুমিত হয়, [২০] তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে কি স্থলপথে কি জলপথে গমনাগমন অতি সংকীর্ণই বলিতে হইবে। তথাপি সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। এস্থানে বলা উচিত যে, সেই সেই দ্রব্য ফিনিসীয় বণিকৃদিগের দ্বারা তদ্দেশে নীত হইত। যাহা হউক ঐরূপ পুরাতন বাইবেলে অবাধ্যায় অনুসারে অফির দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রুদেশে আমদানি হইত, তাহার অবস্থাগত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমূলর বিবেচনা করেন যে সে সকল ভারতজাত দ্রব্য এবং অফির সৌবীরদেশের নামের অপভ্রংশ মাত্র।(২১) বাইবেল গ্রন্থের আর একস্থলে(২২) টায়রনগরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনে তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাস বস্ত্র, এবং নানাবিধ স্থচের কাজ যুক্ত পট্টবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহার সকলেই যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এমন নহে, কিন্তু সে সমস্তই যে ভারতবর্ষস্থ বা তন্নিকটস্থ অন্যান্য পূর্ব্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে বোধ হয় সন্দেহ নাই, এবং সে সন্দেহ না থাকিলেই ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অপরিমিত সন্দেহ স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্ব্বকাল হইতে আমেরিকায় আবিষ্কার কাল পর্য্যন্ত কেবল ভারতবর্ষ হইতেই যে আর সর্ব্বত্রে নীত হইত, তৎপক্ষে অল্পই সন্দেহ আছে,(২৩) এবং বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, তথায়ও এ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

[২০] Grotes Greece I 491.
[২১] Max Muller's same of Language I 708,
(২২) Greek : XXVII.

[২৩] নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্মান বলেন যে অতি প্রাচীনকাল হইতে আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত। এবং উত্তমাশা (cape of Good-Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে, উহা ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহ, পারস্য উপসাগর দিয়া স্থলপথে ব্যাবিলন বা আরবদেশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত, এবং তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইত। নীলের জন্মভূমি এবং বাণিজ্য বিষয়ে উক্ত অধ্যাপক বলেন" The proper country of this production is India ; that is to say, Gudseherat or Gutscherad, and Cambaye or Cambaya, from which it seems to have been brought to Europe since the earlist periods. It is found mentioned, from time to time, in every century ; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name ; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interup-

টায়র নগরে নীত অন্যান্য দ্রব্য সমূহের পক্ষে পণ্ডিতবর বিনসেণ্ট কহেন, যে এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিল্পজাত পট্ট বস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে সেই সকল বস্তু ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, কামেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত, সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত না। ইউফ্রেটিস তীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প কৌশল বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না। ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে ডিডন ও ইডুমিয়া নগর হইয়া আরব দেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্যস্রোতের মূলস্থান ভারতবর্ষ। অপরঞ্চ পুরাতন বাইবেলের কোনস্থানে স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই। বাইবেলের জ্ঞাতসারে ইউফ্রেটিস নদীই পৃথিবীর পূর্ব্বতম দেশের সীমা এবং তদ্রূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বাইবেলেই আবার পূর্ব্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত বণিক্‌দিগের গতায়াতের পথের

---

tion "পুনশ্চ" I shall now prove what I have already asserted, that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India."—Johnston's translation of Beckmann's history of inventions and discoveries. Vol. II 260, 260. এখানে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয়ের পরস্থ এবং অল্প অংশে পূর্ব্বস্থ, সে সকল প্রায়ই অকাট্য। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ যত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেক্‌মান সাহেব তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন সে মত অখণ্ডনীয়, এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সফল হইবেন, খণ্ডনে তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং ভারত উহার উৎপত্তি স্থান সমূহের মধ্যে যে নিতান্তই প্রধান, নীলের আমদানী রপ্তানির বর্ত্তমান সাময়িক তালিকাতেও সে কথা সমর্থন করিবে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson's Cycloperdia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সভ্যতম দেশের নীলের খরচ এইরূপ দেওয়া আছে।

বৃটনদ্বীপে	১১৫০০ বাক্স।
ফ্রান্স	৮০০০ ঐ
জর্ম্মানি এবং ইউরোপের অপরাপর সমস্ত দেশ	১৩৫০০ ঐ
পারস্য	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেডষ্টেট	২০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশ	২০০০ ঐ
সমুদয়ে	৪৩৫০০ ঐ

ইহার মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মান্দ্রাজ, ও গোয়াটিমালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ উৎপন্ন ও রপ্তানি হইয়া থাকে। Page 385. Art: Indigo.

উল্লেখ আছে।(২৪) আমি বিবেচনা করি যে এই পথ নিঃসন্দেহই বহুপূর্ব্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ বাল্মীকির বহুপূর্ব্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব ইহা বাল্মীকির সময়ের উপরেও বর্ত্তে।

প্রাচীন কালীয় স্থলীয় বাণিজ্য কার্য্য আলোচনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে দূর ব্যাবধানস্থিত দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করেনা, এবং হয়ত কেহ কাহাকে চিনেও না, অথবা একে অপরের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতি সমূহের দ্বারা হস্তহইতে হস্তান্তরে ব্যবসার দ্রব্য নীত হইয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইত। এরূপ হওয়ার কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে। বোধ হয় ইহাও এক প্রধান কারণ যন্নিমিত্ত প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীক্‌ভূমে যদিও ভারতীয় দ্রব্যের বিস্তার দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতীয় লোকের দেখা নাই, ঐরূপ আবার ভারতেও তাহাদের নাম কেহ শুনিয়াছে কেহ বা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী পহ্লব বা পারস্যবাসীদিগের ভারতে সমাগমের যথেষ্ট উল্লেখ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন পারস্যবাসী ম্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয় পহ্লবজাতিরাই ভারবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্যের মধ্যস্থলীয়।

ভারতীয়েরা যদিও ম্লেচ্ছদেশে গমনবিমুখ ছিলেন, তথাপি ম্লেচ্ছদিগের ভারতে আগমনের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সুন্দররূপে প্রবাহিত হইত। তাহাতে ধনবৃদ্ধি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, তবে স্বয়ং কৃতী হইলে যতদূর হইবার সম্ভব তাহা অবশ্যই হইবে না। আডাম স্মিথ বলেন যে যখন স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ দ্রব্য প্রেরণ এবং গ্রহণে স্বয়ং কৃতী না হইতে পারা যায়, সেস্থলে দেশজাত বস্তু সকলের অযথা ভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্নে বিদেশ নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভব আছে, এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে এই নিয়ম হেতু প্রাচীনকাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্য বিমুখ হইলেও বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে এই কারণেই উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে কি এই অবস্থাই আবহমান কাল চলিবে?

ইতি সপ্তম প্রস্তাব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২৪] এই স্থানের "Murray's History of India" নামক পুস্তকে অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্ব্বক এস্থানে সঙ্কলিত হইল।

বংশ রক্ষা।

একদা কোন্ উৎসব স্থলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্রিত হন। গৃহস্থের পরিবারবর্গ সকলেই অতিশয় ব্যস্ত, কেহ এক দণ্ডকাল কোথাও বসিয়া থাকিতে পারেন না। কেবল এক জন অর্দ্ধপ্রাচীনা আভ্যন্তরিক ভার বৃদ্ধি বশতঃ মন্থরগতি হইয়া বড় কিছু করিতে পারিতে ছিলেন না। ইত্যবস্থায় তাঁহাকে পরিহাস করিবার যোগ্য যুবতীগণ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের বদনজ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তদুপলক্ষে গৃহমধ্যে যেন অপর একটী উৎসব উপস্থিত হইল। প্রৌঢ়া বিপদ্ বুঝিয়া আপন কর্ম্মক্ষমতা প্রদর্শনার্থ কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন যে অল্প কাল মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নিরুপায় হইয়া দুইচারিটী সমবয়স্কার নিকট আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, "ভাই ছুঁড়ি গুলার জন্যে জ্বালাতন হইয়াছি।" তাঁহারা গম্ভীরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, কথাতে, বিলক্ষণ সহৃদয়তা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "তাইত ওদের রঙ্গ দেখে আর বাঁচি না।" কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওগো ওতে কিছু মনে করো না এ সকল ভাগ্যি থাক্‌লেই ঘটে।" আর একজন বলিলেন, "তা ভাই এতে তোমার দোষ কি, এ সকল ভগবানের ইচ্ছা; তা তুমি কেন দুঃখ করিতেছ?" তখন এই কথা শুনিয়া আর এক সুন্দরী মৃদু মধুর বচনে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভাই যদি সত্য কথা বলিতে হয়,—তা সব দোষটা ভগবানের নয়,—একটু২ ওঁরও ছিল!" এই কথাতে মহা হাসি পড়িয়া গেল ইত্যাদি।

নিষ্ঠুরতা কদাচই আদরণীয় নহে। যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মন কখন অবিচলিত থাকে না, থাকিলেও দোষের বিষয় হয়। লোকে ভগবানের নাম করিয়া অনেক দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু সমাজের ভদ্র মণ্ডলী বিচক্ষণ হইলে এতাদৃশ দোষ কখনই আবৃত থাকে না। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি আচরণ প্রায় প্রকাশ্যরূপে আলোচিত হয় না এই জন্য অনেক দুর্বৃত্ত দুরাচার জনসমাজে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারে নচেৎ তাহারা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিত না।

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি তাহার সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে পাঠকবর্গের নিকট আমাদিগের শীলতার ত্রুটী হইতে পারে কিন্তু ইহার সার কথা গুলি প্রচার করা এত আবশ্যক হইয়াছে যে এখন চক্ষু লজ্জা ত্যাগে আর দোষ নাই। বঙ্গ-

দর্শন বালক বালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত লিখিত হয় না সুতরাং শৈশব পাঠকদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রবন্ধ সন্তানদিগের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিচার করিবেন।

শাস্ত্রে লেখা আছে যে, পুৎ নামে এক নরক আছে, তাহা হইতে যিনি ত্রাণ করেন তাঁহার নাম পুত্র। শাস্ত্রের কথা কে শুনে; বেদাধ্যয়ন, দয়া দাক্ষিণ্য এ সকল বিষয়ে শাস্ত্র কেবল হিজিবিজি বলিয়া গণ্য কিন্তু বংশরক্ষার বেলা শাস্ত্রের দোহাই দিতে কেহই ছাড়েন না। তাতে আবার ছাপার অক্ষরে ইংরাজি হরফে লেখা আছে live and multiply তখন আর কে পায়? বাঙ্গালিরা বংশ বৃদ্ধিতে যেমন পটু এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিধবা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমনিই রক্ষা নাই আর বাড়া বাড়ি কেন?

আমাদিগের সমাজে বংশ বৃদ্ধি লইয়া কতই আনন্দ! হাতে খড়ির আড়ম্বরটা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। উপনয়ন কেবল ঐতিহাসিক ব্যাপার মাত্র, বলিলেই হয়। কিন্তু ঘেটেঁড়া পূজা, ষষ্ঠী পূজা, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পুনর্ব্বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ ইত্যাদি গণ্ডা২ উৎসব কেবল বংশবৃদ্ধি লইয়াই হইয়া থাকে। বংশধরেরা কাজ করেন কি? ফের বংশ বাড়াইতে নিযুক্ত হন। আহা! কি সুন্দর! ঠিক যেন প্রবাল কীট পালে২ আসিতেছে যাইতেছে আর সমুদ্রে চড়া পড়িতেছে। প্রবালের মূল্য আছে, এবং প্রবাল কীটগণ যে সকল দ্বীপ উৎপাদন করে, তাহা ক্রমশঃ লোকের আবাস হয়। কিন্তু বঙ্গীয় কীটগণ আবির্ভূত হইয়া অনেকেই কেবল পিতৃলোকের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগের পথ করিয়া দেন।

আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে যাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই তাহারাই, স্বয়ং বিবাহ করিতে কিম্বা পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে যারপর নাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি কে? না একজন বংশজ ব্রাহ্মণ, অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারেন না—সর্ব্বনাশ উপস্থিত বংশলোপ হইবার উপক্রম। উনি কে? না শত্রুমুখে ছাই দিয়ে গুটি আষ্টেক জন্ম দিয়াছেন; কতক আছে কতক গিয়াছে; যারা আছে তাদের জন্য বিব্রত, বস্ত্র দিবার সংগতি নাই, সোনার চাঁদেরা দিগম্বরমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধূষরিত কলেবরে রাজপথ সুশোভিত করিতেছেন; গৃহিণী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন; কর্ত্তা দোকানে বসিয়া কলিকাতে ফু দিচ্ছেন আর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে তাহার তত্ত্ব লইতেছেন। আর একজন বলিতেছেন, "ভিক্ষাই আমাদের ব্যবসা—কি দিবি তা দে, না দিবি তো তোকে নির্ব্বংশ করব।" কেহ বলিতেছেন, "গ্রামে একটু সম্ভ্রম আছে, লোকটা জনটা চেনে, তা ছোট কাজ করি কেমন করে, দশজন বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়াই সংসার চালাচ্চি

তা ভগবানের ইচ্ছা।” সন্তানের অভাব নাই—জন্ম দিচ্ছেন আর বড় লোকের দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন আমি কন্যা-ভার গ্রস্ত। এমন বংশ কি না রাখিলেই নয়?

বাঙ্গালিদিগের ন্যায় নির্ব্বোধ জাতি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত লোক সকল যে সুখে আছে, তাহা নহে; নির্দয় স্নেহহীন, তাহাও নহে কিন্তু মহাপুরুষেরা এক ভগবানের উপর মাদার দিয়া বসিয়া আছেন আর বৎসরান্তে এক একটী কাঙ্গালি বৃদ্ধি করিতেছেন। একবার ভুলেও ভাবেন না যে সন্তানোৎপাদন বন্ধ হইলে অনেক দুঃখ দূর হইবে।

কুষ্ঠরোগী অস্পর্শীয়; কিন্তু সে কখনই গুপ্তভাবে লোকের নিকট আইসে না; লোকালয় ত্যাগ করিতে পারে না বটে, কিন্তু সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিরা তাহাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতে পারে সুতরাং তাঁহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার উপায় আছে। পৃথিবীতে দস্যুভয় যথেষ্টই আছে। সেই জন্য যথাযোগ্যরূপে রাজদণ্ড নিয়োজিত হইয়াছে এবং লোকে স্ব২ যত্নেও আপনাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু যেসকল দুরদৃষ্ট সন্তান ঔরসজাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কিম্বা দারিদ্রভার ধারণ পূর্ব্বক জগতে জন্মগ্রহন করে তাহাদিগের যন্ত্রণার হেতু কে? তাহাদিগের কষ্টের শান্তি নাই কিন্তু কষ্টদাতৃগণ কি দণ্ডের পাত্র নহে? দণ্ডের পাত্র হইলে কি দণ্ড পাইবে না?

পৃথিবীতে পরের ক্ষতি করিলে দণ্ড হইয়া থাকে কিন্তু যাহার বুদ্ধির দোষে বা রিপুসম্বরণের ক্রটীতে সমস্ত সন্ততিগণকে আজন্মকাল রুগ্নশরীরে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয় তাহার দণ্ড হয় না। নিষ্ঠুরতা আদরণীয় নহে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার সীমা নাই তথাচ ভদ্রমণ্ডলী এতাদৃশ লোকের সমাদর করিয়া থাকেন।

ভগবান্, গ্রহ, অদৃষ্ট ইহাদিগের কথা যতই বল জন্মদাতার দোষ স্খলন কিছুতেই হয় না—যাঁহারা সংসারমধ্যে পদে২ ঐশীশক্তির কার্য্য দেখিতে পান তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীপুরুষ আত্মসম্বরণ করিলে বংশ বৃদ্ধি জনিত যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে আত্মসম্বরণও ঈশ্বরাধীন সুতরাং মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না। কিন্তু এদেশের কেহ কখন কি বংশবৃদ্ধি নিবারণের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন? যাঁহারা জানেন না তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক যে ইউরোপের কোন২ স্থানে অতি হীন শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরাও পুত্রোৎপাদনের পূর্ব্বে আপনাদিগের সংস্থানের প্রতি বিশিষ্টরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। অনেকে তিনটী সন্তান হইলে আর স্ত্রী সহবাস করে না। যাহারা তিনটীকেও ভরণপোষণ করিতে না পারে তাহাদের বিবাহই হয় না।

লোকের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায় যে বংশরক্ষা না হইলে নাম লোপ হইবে। আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি নাম

লোপের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমি হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—আমার বংশ না থাকিলে কি আর কোন হরিশ, চাদর স্কন্ধে করিয়া বেড়াইবেন? না হরিশের নাম করিয়া আর কেহ কি পিণ্ডং গয়াং গচ্ছ, বলিবে না? পৃথিবীতে অনেক হরিশ হইয়াছে আবার হবে। তাহাদের ঢের২ বংশ। হরিশের নাম করিয়া অনেকেই পিণ্ড দিবে; তবে আমি হরিশ হতভাগ্য পিণ্ড খাইতে পারিব না এই বড় দুঃখ।

কিন্তু পিণ্ডের কথা ত কেহই বলে না —নাম লোপ হইবে এই আশঙ্কাই প্রবল। সন্তান থাকিলে নাম রক্ষা হইবে। সে কেমন? অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত,বেটারা কালে ভদ্রে কোন একটা বুড়োর সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসিত হইলে একবার২ আমার নাম করিবে। হয় ত হরিশ বলিতে গবেশ বলিয়া বসিবে আর শ্রাদ্ধের সময়ে "যথা নাম" বলিয়া সারিবে কিন্তু তাহার পরে আর কোন্—আমার নাম করিবে? অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতাকে কি বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তাহা যখন জানি না তখন আর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি। যাহা হউক মনে করিলাম যে ৫ পুরুষে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ না কেহ একবার২ নাম উচ্চারণ করিবে। আর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত আর একটী সুখভোগ করিতে হইবেক।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্যাস বাল্মীকির নাম কে কতবার করিয়া থাকে? তা এই সকল সুখের জন্য কি কতকগুলি কাঙ্গালি রাখিয়া যাইতে হইবেক?

বংশ রক্ষার নিমিত্ত অনেকগুলি উপায় হইয়াছে। এক, শাস্ত্রের বচন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইত্যাদি। দুই, কন্যার বিবাহ না দিলে নয়। শুদ্ধ তাই নয় বিবাহের পূর্ব্বে যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে পিতা মাসে২ তাহার ভ্রূণহত্যা পাতকে পতিত হবেন। (৪) রজস্বলা নারীর গর্ভাধানের কোন প্রকার বিঘ্ন না হয় তদুপলক্ষে ভূরি২ নিয়ম হইয়াছে। ইহাতেও পিতৃপুরুষ মহাশয়দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কিজানি যদি পুত্রই বা বৈরাগ্য অবলম্বন করে এই জন্য তাহার বিবাহের ভারও পিতৃহস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আরও আছে। (৬) অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, ভাগ্যক্রমে যদি বা ঘরের লক্ষ্মী বড় একটি আশীর্ব্বাদ করেন না, সন্তানের জ্বালা সহিতে হয় না, কিন্তু মাঠাকুরুণ বড়ই উৎকণ্ঠিত, পুনরায় বিবাহ না করিলে নয়। তিনিও শাস্ত্রের দোহাই দেন। শাস্ত্রের কথা শুনিলে, যতদিন পুত্রের মুখ না দেখিব, ততদিন যত খুসী বিবাহ করিতে পারি; এমন মজার শাস্ত্র কি আর কখন জন্মিবে?

সম্প্রতি একটি কণ্টক উপস্থিত হইতেছে। এখন "পাসওয়ালা" পাত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভার। আর পাসের মূল্য দেওয়াও কঠিন সুতরাং অনেক স্থলে কন্যাকাল থাকিতে২ বিবাহ দেওয়া ঘটে না; যদি এইরূপ আর কিছু

দিন চলে, তবে হয় ত ক্রমশঃ অবিবাহিত কন্যার বয়স আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে এবং পরিশেষে বংশবৃদ্ধির কিছু২ ব্যাঘাত ঘটিবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুন্সী প্যারীলাল আর হিন্দুপেট্রিয়ট তাহার প্রতিকার চেষ্টায় বিলক্ষণ যত্নবান্ হইয়াছেন। তবে আর বংশবৃদ্ধির ভাবনা কি ?

নব্যসম্প্রদায় আবার একটি নূতন ধূয়া ধরিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপাতে পুতুলখেলার মত বিয়ে আর কেহ মুখে আনিতে পারেন না কিন্তু চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাইবে? এখনকার কথা এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে পুত্রগণ দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। বহুকাল পূর্ব্বে পুরুষেরা অনেকেই পরিবার বাটীতে রাখিয়া বিদেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে যাইতেন সুতরাং অনেকস্থলে বয়ঃক্রম অধিক না হইলে, সন্তান হইত না। পিতা মাতার শরীর পরিপুষ্ট হইয়া সন্তান হইলে পুত্র সবল হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তৎকালে বিদেশবাসী পুরুষদিগের চরিত্রের দোষ ছিল। ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত সুশিক্ষিত যুবকগণ আপনাদিগের চাকুরির স্থানে পরিবার লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। এবং জিতেন্দ্রিয়তার একশেষ করিয়া ফেলিলেন। তদবধি বংশবৃদ্ধির অনেক সদুপায় হইয়াছে কেবল দুর্ভাগ্য বশতঃ সন্তানগুলি কিছু রুগ্ন হইয়া থাকে এবং গৃহস্থের প্রথম সন্তান প্রায়ই বিনষ্ট হয়। বাবুরা আপনাদিগের কীর্ত্তিধ্বজা অনেক উচ্চে তুলিয়াছেন এখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের ধর্ম্মরক্ষা হওয়া ভার। এঁরাও বাপের বেটা, বেয়াল্লিশকর্ম্মা। পূর্ব্বে বাবা বলেছেন "বাবা বিয়ে দিয়েছেন আমার কি?" এখন ছেলে বলেন বাবা কেন আঠার বছর বয়সে আমার জন্ম দিয়াছিলেন? ছেলের বাবা ভেবে২ সারা হলেন; তাঁর বাবা বিয়ে দিয়েই যত সর্ব্বনাশ করেছেন। তা চুলোয় যাক, এখনকার উপায় কি?—কাজেই ছেলেটীর বিবাহ দিতে হয়েছে। খুব বাহাদুর! এগ্‌জামিনের সময়ে মালসথের পেপরে ৯৯ মার্ক পেয়েছিলেন; এখানেও তার ফল হাতে হাতে!

মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।*

মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া বাহ্য জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি অগ্নিকে পূজা করা দূরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক করিয়া তুলিয়াছেন; তাহাকে দিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, প্রয়োজন মত আলোক

* Buckles' works, Mahaffy's Lectures on Primitive civilizations, Smith's History of Greece &c.

জ্বালান, কল ঘূরান, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পর্য্যন্ত টানান। তাঁহার কৌশলে বায়ুও বশীভূত হইয়াছে। বায়ু এখন পেষণ যন্ত্র (১), জলযান ও ব্যোমযান চালাইতে নিযুক্ত। এদিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য্য পাইয়াছেন (২), এবং ইন্দ্রের প্রিয় বিদ্যুৎ মানব সন্তানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিয়া বেড়াইতেছেন (৩)। বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে সলিলসিঞ্চনের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্য আবশ্যক শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় তিনি পর্ব্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন, (৪) কোথাও সমুদ্র তাড়াইয়া বাসস্থান করিতেছেন, (৫) কোথাও শুষ্কস্থলে সাগর করিতেছেন (৬), কোথাও জলের নীচে রাস্তা করিতেছেন। (৭) উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সম্বলিত ভীষণ সিন্ধু সভ্য নরজাতির যাতায়াতের বর্ত্ম হইয়াছে। কি সূর্য্যসন্তপ্ত উষ্ণমণ্ডল, কি তুষারাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ব্বত্রই বাসগৃহ, পরিধেয়, আহার সামগ্রী, ও বাতাতপ নিয়মিত করিয়া মনুষ্য সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল বিস্তীর্ণ ঘন বিজন কানন ভূমিতে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে সকলও বিলুপ্ত হইতেছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পশু সকল মানবের দাস হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোনরূপে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলও অনেক পরিমাণে মানুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন ততই বাহ্য পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া জগতের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ চলিতেছে; আরও বহুকাল চলিবে। কিন্তু ক্রমে মনুষ্যের জয়লাভ ও অধিকার-বৃদ্ধি হইলেও বাহ্য জগৎ মানবজীবনের ঘটনাস্রোত বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মানবেতিহাসে বহির্জ্জগতের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব।

ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, যে দেশ বিশেষের অবস্থান, তথাকার শীতোষ্ণতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও সাধারণ খাদ্যের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ বাহ্য কারণগুলিও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহা সেখানকার ভূমি ও শীতো-

(১) Wind Mill
(২) Photograph.
(৩) Electric Telegraph.
(৪) Mont Cenis Tunnel
(৫) Holland
(৬) Suez Canal
(৭) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels.

ষ্ণতা সাপেক্ষ। শীতোষ্ণতাও দেশের অবস্থান সাপেক্ষ। আমরা প্রথমে শীতোষ্ণতার কার্য্য প্রদর্শন করিব।

শীতে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার কারণ আছে। শারীরিক কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত মনুষ্যশরীরে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থাকা আবশ্যক। কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর তাপদ্বারা দৈহিক তাপের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ক্রমাগত শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ কমিয়া যায়, এবং ক্রমাগত উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়।(৮) এই জন্য শীতপ্রধানপ্রদেশে লোকে শরীরের নিয়মিত তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কারণ যে কোন প্রকার শরীরসঞ্চালন দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম করা কষ্টকর বোধ হয়। সুতরাং শীতোষ্ণতার তারতম্যানুসারে নিতান্ত সামান্য ফল ফলিতেছে না। শীতে মনুষ্যকে পরিশ্রমপ্রিয় করে; গ্রীষ্মে মনুষ্যকে অলস করে। শীতে মনুষ্যকে ক্রমাগত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মনুষ্যকে বিশ্রাম অন্বেষণ করিতে শিখায়। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কর, এই কথার সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে। ইউরোপখণ্ডের সহিত এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রদেশ সকলের তুলনা কর। ইউরোপ পরিশ্রমের আকর, আফ্রিকা ও এসিয়া আলস্যের আবাসভূমি। লোকের পারলৌকিক বাঞ্ছাতেও বাহ্যজগতের ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদিগের মোক্ষ নির্ব্বাণ বা লয়। ইউরোপের মোক্ষ অনন্ত উন্নতি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতল প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশের লোক শক্ত ও পরিশ্রমপ্রিয়। ইহারও কারণ সহজে বুঝা যায়। সমতল প্রদেশাপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল উচ্চ বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল; সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমপ্রিয় ও তন্নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইবার কথা। মিড্ (৯) ও পারসিকদিগের যদিও ভাষা ও ধর্ম্ম এক ছিল, তথাপি সমতলপ্রদেশবাসী মিডেরা পরিশেষে পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসী পারসিকদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি ? বাঙ্গালির সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের অধিবাসীদিগের তুলনা কর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এখান অপেক্ষা তথায় অধিক কাল শীত থাকে। এখানকার লোক অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিশ্রমপ্রিয়। মহারাষ্ট্র পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সে-

(৮) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 429.

(৯) Medes

খানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত সাহসী ও পরিশ্রমী।(১০)

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। শরীরে অধিক উত্তাপ লাগিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে বাষ্পাকারে দেহ হইতে নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ তাপও বহির্গত হয়। যদি চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা হইলে দেহ হইতে বাষ্পনির্গমনের বাধা জন্মে, সুতরাং তাপ নির্গমনেরও প্রতিবন্ধকতা হয়।(১১) এই কারণে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে যত তাপ সহ্য করা যায়, সজল ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে তত তাপ সহ্য করা যায় না।(১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে সজল ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা যেরূপ অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট প্রদেশ বাসীরা সেরূপ নহে।

ভূমির উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে উত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই সকল দেশের ভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা; যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব আছে, অথবা যেখানে এই দুইটীর প্রয়োজনানুরূপ মিলন সংঘটিত হয় নাই, সেখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা। এই কারণেই সপ্তসিন্ধু, অনুগঙ্গ প্রদেশ, নীলনদের তীর, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদী সন্নিহিত স্থান, উর্ব্বরতাজন্য প্রসিদ্ধ। এই কারণেই তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ও হিমমণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সকল উর্ব্বরতা বিষয়ে নিকৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা তাপবৃদ্ধিকারী দ্রব্য অধিক খাইতে ভাল বাসিবে না; সুতরাং মাংস অপেক্ষা ফল মূলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকে তাপ বৃদ্ধিকারী তৈলাক্ত অর্থাৎ বসাযুক্ত মাংস আহার করিতে অনুরাগ প্রকাশ করিবে। যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ করে, সে সকলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে। এতদ্দেশবাসীদিগের সহিত ইউরোপ খণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এসকল কথার সত্যতা প্রতীত হইবে। আবার মনে কর, যে উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত সুতরাং উর্ব্বরা, সেখানে অল্প পরিশ্রমেই আবশ্যক আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইবে। এই কারণেও অল্প পরিশ্রমই লোকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ও তাহাদিগের আলস্য বৃদ্ধি হইবে। শীতপ্রধান প্রদেশে ভূমির গুণে ভক্ষণীয় উদ্ভিদ্ সকল যে কেবল অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইবে,

(১০) The inhabitants of the dry-countries in the north, which in winter are cold, are comparatively manly and active. The Mahrattas inhabiting a mountainous and unfertile region, are hardy and laborious" Elphinstone's History of India.

(১১) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 444.

(১২) Ibid p. 432.

এরূপ নহে; অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়া মৃগয়াপ্রিয় হইবে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে। যদি কোন উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত না হয়, সে দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইবে না; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রম ও যত্নসহকারে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্পজন্মা দেশে লব্ধ খাদ্য অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে। সুতরাং অধিবাসীরা শক্ত ও সবল হইবার কথা। ইহার দৃষ্টান্তস্থল আরব দেশ। আরব উষ্ণ দেশ বটে, কিন্তু সেখানে বড় জলকষ্ট। সেথানে বৃহৎ নদ, নদী, হ্রদ নাই। সুতরাং সেখানে উর্ব্বরা ভূমি প্রায় নাই। এজন্য ভক্ষ্য সংগ্রহ নিমিত্ত আরবদিগকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী। আরবের বায়ু শুষ্ক; ইহা অন্য প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাতে সজল বায়ুবিশিষ্ট উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় আরবে শ্রমকাতরতা সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। স্থানমাহাত্ম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাহারা এক সময়ে সিন্ধুনদ হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, ভারতমহাসাগর হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগপর্য্যন্ত, মুসলমান জয় পতাকা উড্‌ডীন করিয়াছিল। যেরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে কখন কখন বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে সামান্য কারণে কোন দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, মহম্মদের আদেশে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে সেই শক্তি একবার স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্লাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল। পারসিক সাম্রাজ্য ও পূর্ব্বরোমক সাম্রাজ্য তাহার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এসিয়ার পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তর খণ্ড, ইউরোপের স্পেন ও পর্ত্তুগাল, অল্পদিনেই আরবদিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই আরবের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নিশিখা বা ধূম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য; কিন্তু আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, অনুগঙ্গ প্রদেশ, সপ্তসিন্ধু ইত্যাদি। আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মিসরদেশ দিয়া নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয়তীরেই কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত উপত্যকা। পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বালুকারাশি দৃষ্ট হইবে। মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় না। কেবল বর্ষাকালে

নীল নদের জল বৃদ্ধি পাইয়া উপত্যকা প্রদেশ প্লাবিত করে, তাহাতেই ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা পায়। আষাঢ়মাস হইতে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির সময়, এই সময়ে প্রায় ১৩। ১৪ হাত জল বাড়ে। অনন্তর জল কমিতে থাকে, এবং প্রায় চারিমাসে নদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। বর্ষার জল হইতে যে পলল পড়ে, তাহাতেই প্লাবিত ভূমি উর্ব্বরা হয়; এবং জল সরিতে সরিতেই মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। নীলনদ মিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উত্তর সীমাপর্য্যন্ত যাইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং নীলনদের উপত্যকা সঙ্কীর্ণ হইলেও অতিদীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন। জলপথে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা। বৎসরের মধ্যে আটমাস উত্তর দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে, ইহাতে পালভরে স্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া যায়। স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করাও সহজ। জল বায়ু সর্ব্বত্রই সমান। ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ঘটনার উৎপাতও প্রায় নাই, পীরামিড প্রভৃতির রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। নদের জলপ্লাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বন্য জন্তুর দৌরাত্ম্য নাই। মিসরের পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি, পূর্ব্বে লোহিতসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার অসভ্য জনপদসকল। সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় মিসরবাসীদিগের অধিক ছিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর, এই সকল কারণে প্রাচীনকালে দেশের কিরূপ অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ষান্তে কৃষিকার্য্য করিবার যেরূপ সুবিধা হইত, তাহাতে সাধারণতঃ লোকে কৃষিজীবী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ জলপ্লাবনে ক্ষেত্র সকল যেরূপ একাকার হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভূমি নির্ণয় নিমিত্ত ভূমিপরিমাণ করিতে জানা আবশ্যক হইত। তৃতীয়তঃ কোন্ সময়ে নীলনদের জল বাড়িতে ও কোন সময়ে কমিতে আরম্ভ হয়, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সকলের আবির্ভাব, তিরোভাব বা অবস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইত। এই সকল কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষিবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চারম্ভ হইয়াছিল, এবং দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, সমুদায় দেশটী একই উপত্যকা; মধ্যে কোন মরুভূমি, পর্ব্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নাই; সর্ব্বত্র গমনাগমনেরও সুবিধা ছিল। সুতরাং সমুদায় দেশটী একই রাজ্য হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই ঘটিয়াছিল। পলল পড়িয়া ভূমি যেপ্রকার উর্ব্বরা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হইত। একারণে

অনেক লোকে আহারান্বেষণ কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুরাতন সভ্যতার উৎপত্তি; ইহা হইতেই খ্রীষ্ট জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের মহিমা প্রকাশ। আর দেশের চতুর্দ্দিক্ যে ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণদ্বারা আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে নাই; বিশেষতঃ উপত্যকার সমুদায় অধিবাসিগণ একই রাজার অধীন থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। একস্থল হইতে অন্যস্থলে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে সর্ব্বত্রই লোকের শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল। ইহা দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীসে আথেন্স, স্পার্টা, আর্কেডিয়া, বিওসিয়া, থেসালী, ইপাইরস্ প্রভৃতি স্থান সকলের সভ্যতার তারতম্য ছিল; কিন্তু এসকল স্থান পরস্পর যত দূরবর্ত্তী, তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী প্রদেশের মিসর বাসীদিগের মধ্যে সভ্যতাসম্বন্ধে কোন বিভেদ দৃষ্ট হইত না। নীল নদের উপত্যকা যেরূপ শস্যশালিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু জন্য মিসরবাসীদিগের অন্যদেশের অপেক্ষা রাখিতে হইত না। এজন্য তাহারা বহির্বাণিজ্য করিতে বা বিদেশে যাইতে ভাল বাসিত না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উদ্ভিদ্‌ভোজী হয়। মিসর এ বিষয়ের একটী প্রমাণ। কিন্তু মিসরের ন্যায় যেখানে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর একটি ফল ফলে। একে ত গ্রীষ্ম বলিয়া বস্ত্রের জন্য লোকের বিশেষ ভাবনা করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাদ্য অনায়াসে লভ্য হইলে শ্রমজীবী লোকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে চিন্তিত হয় না। এইরূপে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িলে তাহাদিগের বেতনের হার কমে; সুতরাং তাহারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে পারে। এদিকে বহুসংখ্যক লোকের শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়া ধনীদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। এইরূপে একদিকে যেমন শ্রমজীবীরা নিঃস্ব হইতে থাকে, তেমনই অপরদিকে কতকগুলি লোকের অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। অর্থবলে শেষোক্ত দলের অত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসন ভার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে; এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতার ইতিহাস লেখক বাকল সাহেব বিবেচনা করেন যে, এইরূপেই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং মিসরের যাজক ও সৈনিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেখানে সাধারণ লোকে এপ্রকার নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন,

সেখানে শূদ্রদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবে, এবং রাজা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্চশ্রেণীর অনুগত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষে ও মিসরে রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন, কেবল তাঁহার ব্রাহ্মণ বা যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত।

নীলনদের উপত্যকা যেরূপ উর্ব্বরা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রায় সেইরূপ। মিসরের ন্যায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়; কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে আর্ম্মাণদেশের পর্ব্বতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদীদ্বয় পূরিয়া যায়, ও জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতার কারণ। সামান্য শ্রমেই সেখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই নিমিত্তই অতি প্রাচীনকালে তত্রত্য ব্যাবিলন রাজ্য সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নদীদ্বয় রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিখাস্বরূপ ছিল; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র; উত্তরে পার্ব্বত্য আর্ম্মাণদেশ। সুতরাং স্বদেশ রক্ষা কার্য্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্ত্তমানকালে পীরামিড প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড কোন মন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারিশত হস্তাধিক উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং ইষ্টক নির্ম্মিত সৌধ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলনদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যথেষ্ট প্রস্তর পাওয়া যাইত, সুতরাং তন্নির্ম্মিত মিসরের কীর্ত্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাখনন করিয়া ব্যাবিলন রাজ্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কার্য্যের উদ্ধার হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিন্ন আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন উর্ব্বরা ভূমি নাই; এবং অতি প্রাচীন কালে মিসর ভিন্ন আর কোথাও স্বতঃ সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। এসিয়াখণ্ডে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে, তাতারে চক্ষুস নদকূলে, এবং চীনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো সন্নিহিত প্রদেশে, বিস্তীর্ণ উর্ব্বরভূমি ছিল। সুতরাং পুরাকালে চক্ষুস নদকূলে আর্য্য সভ্যতার উদয়; এবং ভারতবর্ষে ও চীনেও বিলক্ষণ সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্ব্বতশ্রেণী, এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমালা; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়া সভ্যতা বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল। আর এদেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত এত অধিক জন্মিত, যে এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে তত প্রয়াসী হন নাই। উত্তর দিক্ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্ দিয়া চীন আক্রমণ করিবার

সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুকালপর্য্যন্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতিনীতি অধিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা আবশ্যক যে কোন একটি অনুষ্ঠান বহুবিস্তীর্ণস্থানব্যাপী হইলে বহুকালস্থায়ী হয়; এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবাসীরাই স্বদেশে ভোগ্যবস্তু পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিদেশের সহিত অধিক সংস্রব রাখেন নাই; সুতরাং অপর দিক্ হইতে কোন পরিবর্ত্তন স্রোত আসিয়া তাঁহাদিগকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত। উহার বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য উভয়ই অল্প। এক পার্শ্বে উচ্চ লিবেনন পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র। সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন পর্ব্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। সুতরাং মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা নির্ম্মাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রসদ্বীপ ও নীলনদের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে বিচিত্র নহে। এই রূপে ক্রমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহারা সাইপ্রসদ্বীপ হইতে তাম্র ও মিসর হইতে শস্যাদির বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন পর্ব্বতেও অনেক বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, বোধ হয়। ব্যাবিলন ও মিসর প্রাচীনকালে যে রূপ সভ্য হইয়াছিল, এক রাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত অপর রাজ্যে লইয়া গেলে বিলক্ষণ ব্যবসায় চলিবার কথা। অবস্থানগুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ফিনিসিয়ার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা বণিজ্ দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ নিমিত্তও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস, ক্রিট, গ্রীস, আফ্রিকা, ও স্পেন, প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ্ন ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। মিসরে চিত্রসদৃশ (১৩) একপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ব্যাবিলনে শরমুখসদৃশ (১৪) আর এক প্রকার বর্ণমালা ছিল। ফিনিসিয়াবাসীরা সংক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও সরল বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। গ্রীক্ ও য়ীহুদিরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত হন, এবং বর্ত্তমান ইউরো-

(১৩) Hieroglyphics
(১৪) Cuniform writings

পীয় সভ্যজাতি ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ ও মুসলমান ও য়ীহুদীরা অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত ফিনিসিয়ার বর্ণমালাই ব্যবহার করিতেছেন। ফিনিসিয়াবাসীরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে কার্থেজই উত্তরকালে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউরোপের অভিমুখে চল। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল গ্রীসদেশ। গ্রীস হইতেই ইউরোপের অন্যান্য জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাকাব্যে হোমর তাঁহাদিগের আদর্শ, গীতিকাব্যে পিণ্ডার, নাটকে সফক্লিস ও ইস্কিলস। হেরোডোটস ইতিহাস রচনার পথদর্শক। সক্রেটিস ও প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক। আরিষ্টটল বৈজ্ঞানিক প্রণালী সংস্থাপক। ইউক্লিড জ্যামিতির, আর্কিমিডিস পদার্থবিদ্যার, হিপার্কস ও টলেমি জ্যোতিষের, এবং হিপক্রেটিস ভৈষজবিদ্যার, দীক্ষাগুরু। ফিডিয়াস স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, এবং এপিলিস চিত্রকর দলের উন্নতিপথ প্রদর্শক। এক্ষণে দেখা যাউক বাহ্যজগতের প্রভাবে গ্রীসে কিরূপ ফল ফলিয়াছে।

গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। দেখিবে গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মধ্যবর্ত্তী সাগরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী যে সমুদ্রপথে একটি দেখিতে দেখিতে প্রায় আর একটিতে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্রীসের নিকট হইতে দ্বীপাবলীর আরম্ভ; এবং সাগর মধ্যে যেখানে চাহিবে, সেখান হইতেই কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে; এবং এক বন্দর হইতে অল্পদূরে অন্য বন্দর লক্ষিত হইবে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসের অধিবাসীরা যে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে ভাল বাসিবে, এবং বাসযোগ্য দ্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনর তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। এস্থলে অর্ণবযানে পর্য্যটন করিবার আর একটি সুবিধা ছিল। হেলেস্পণ্ট হইতে ক্রিট দ্বীপ পর্য্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্যবায়ু বহিত।

গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। তাহাদিগের দ্বারা অল্পস্থল মধ্যেই অনেক প্রকার জল বায়ু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আথেন্সে অনেক যত্ন না করিলে দক্ষিণ প্রদেশের সুখাদ্য ফল সকল জন্মে না। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ দিকে চল। আর্গোলিসের উপকূলে কমলা ও কলম্ব লেবুর বিচিত্র উদ্যান দৃষ্ট হইবে। সেস্থলহইতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে এমন স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, যেখানে দ্রাক্ষালতাও বাঁচে না। এদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসিনি প্রদেশে খর্জ্জুর পর্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিকটে নিকটে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায়, পরস্পর

বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মধ্যে থাকায়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থল-পথে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, কুত্র বা অসম্ভব। আটিকা ও বিওসিয়ার মধ্যে পর্ব্বত, এবং এতদুভয় থেসালী হইতে চারি পাঁচ হাজার হাত উচ্চ শৈলমালা দ্বারা বিভক্ত, উক্ত শৈলমালা-মধ্যে বিখ্যাত গিরিসংকট থর্ম্মাপলী। করিন্থ যোজক দিয়া দক্ষিণস্থ উপদ্বীপ যাইতেও পাহাড় বাধে; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থল পথে যাওয়া অপেক্ষা জল পথে গমন অনেক সহজ। গ্রীসদেশের অঙ্গে সমুদ্র সর্ব্বত্র এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, সকল স্থান হইতেই উহা নিকটবর্ত্তী। এই প্রকার নানা কারণে, সাগরপর্য্যটন প্রবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ঈদৃশ অনুমান করা অন্যায় নহে। উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বে যাদৃশ উপনিবেশাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এই রূপে তাহার সূত্রপাত হয়।

গ্রীসের পূর্ব্বপার্শ্বে যেরূপ বন্দর ছিল, ও যেরূপ গমনাগমনের ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা ছিল, পশ্চিমপার্শ্বে সেরূপ ছিল না। পশ্চিমপার্শ্বের উপকূল দুরারোহ ও তথাকার বায়ু অসুখকর। সুতরাং পশ্চিম পার্শ্বে রোম ও আথেন্স উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেও, তাহা পূর্ব্বপার্শ্বের ন্যায় সভ্য হইতে পারে নাই। আথেন্স যে আটিকা প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্য জন্মিত না; সুতরাং আথেন্সবাসীরা খাদ্য সংগ্রহ-জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সে খানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণেই বোধ হয় আথেন্স-বাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই।

গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও উচ্চ শৈল; কোথাও নদীপ্রবাহিত, কোথাও জল পাওয়া দুষ্কর। আটিকা প্রদেশে উত্তম উত্তম বন্দর, পরিষ্কার বায়ু, কিন্তু শস্যের অভাব। বিওসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্ব্বরাভূমি, যথেষ্ট শস্য; কিন্তু মৃত্তিকা সলিলসিক্ত ও বায়ু কুজ্-ঝটিকাবিশিষ্ট। আরও পশ্চিমে চল। দেখিবে দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ, মেষ চরায় ও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করে। দক্ষিণের উপদ্বীপে ও বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। এই প্রকার প্রদেশভেদে অবস্থাভেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মনুষ্যচরিত্রের ভেদ ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম, ভাষা, ও রীতিনীতির বহুপরিমাণ এ-কতা সত্ত্বেও গ্রীক চরিত্রে যে বৈচিত্র দৃষ্ট হয় এইরূপ দৈশিক বৈচিত্রই বোধ হয় তাহার একটি প্রধান কারণ।

পর্ব্বত দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা ইহার কয়েকটী ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ গ্রীস কখনই এক সাম্রাজ্য হইতে পারিল না, এবং এনিমিত্ত অগ্রে মাসিডনের ও পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্পদিনেই রাজারা সমুদায় প্রজামণ্ডলীর পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাজাদিগের দেবত্বে বা অসাধারণ শক্তিতে লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হয়। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্র রাজপদ উঠিয়া যায়, এবং প্রদেশের অবস্থাভেদে সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ দেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, স্থানভেদে ভাষাভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে আথেন্সে একপ্রকার ভাষা, স্পার্টায় আর একপ্রকার, থিব্‌সে অপর আর এক প্রকার। আবার যে প্রদেশের ভাষায় যে বিষয় প্রথমে আলোচিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও সেই প্রদেশের ভাষায় সেই বিষয়ের আলোচনা করাই রীতি ছিল। এইরূপে মহাকাব্য সকল দুর্ব্বোধ্য হইলেও হোমরের ভাষায় রচিত হইত। আথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত গীতগুলি আথেন্সের পরমশত্রু স্পার্টার ভাষায় গ্রথিত হইত। এমন কি যখন স্পার্টাবাসীরা আটিকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, তখনও এরীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমাদিগের দেশের কবিরা যখন কৃষ্ণ বিষয়ক গীতরচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহারা গ্রীকদিগের পথাবলম্বী হন।

যে সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রধাবিত তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদ উৎপন্ন করে, উত্তর দক্ষিণে ধাবিত পর্ব্বতগুলি সেরূপ নহে। হিমাচল তিব্বত হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতেছে। হিন্দুকুশ আফগানস্থান হইতে তুর্কিস্থান পৃথক্ করিতেছে। আল্পস্ পর্ব্বত ইতালীকে ইউরোপের অপরভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। পীরেনিস্ ফ্রান্স ও স্পেন দেশ বিভিন্ন রাখিতেছে। ইউরাল পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে রুশিয়া। আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেই একই ইতালী রাজ্য। রকি ও আণ্ডিস পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় নাই। এইরূপ হইবার একটী কারণ বোধ হয় এই, যে পূর্ব্ব পশ্চিম প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা যে প্রকার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশের শীতাতপভেদ ঘটে, উত্তর দক্ষিণ প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্থ অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের নিম্নদেশ আক্রমণ দ্বারা জয়লাভ করিবার কথা কোন কোন স্থানে শুনা

যায়। কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্ব্বতপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্যদিগের আক্রমণে এদেশে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতির এইরূপ দশা হইয়াছে।

জঙ্গলে সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে। অরণ্য কাটিয়া কৃষিকার্য্যের অধিকার-বৃদ্ধি, সভ্যতা বিস্তৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ইউরোপখণ্ডে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসর্গিক কারণে বা মনুষ্যের প্রভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশের কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স, ও ইংলণ্ড, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। জঙ্গলের অধিবাসীরা প্রায়ই অসভ্য, এই কারণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসভ্য বুঝায়। যখন কোন দেশ বিজিত ও উপনিবেশিত হয়, তখন পরাভূত জাতি অনেকস্থলে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। এই নিমিত্ত কানন প্রদেশ অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসস্থল হয়। আমেরিকা ও সাইবিরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে জঙ্গলিয়া হইয়া যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ লোকে বিবেচনা করেন যে, মর্ম্মণদিগের বহুবিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে অনুকৃত।

যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রকায়, কদাকার, ও নির্ব্বোধ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শালবনের মেচিরা, সিংহলের বৃহদরণ্যের বেদেগণ, মাডাগাস্কার দ্বীপের জোলাহিরা, ফ্লোরিডা উপদ্বীপের নিবিড় কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ। যেস্থানে বহুদূরব্যাপী কানন থাকে, সে স্থানের ভূমি এত সলিলসিক্ত হয়, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহাই বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ।

বাহ্যজগতের অবস্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটিয়াছে, আমরা দেখাইলাম। কিন্তু কেহই যেন মনে করেন না যে, কেবল দৈশিক সংস্থান দ্বারা, কেবল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহিঃপদার্থ দ্বারা ইতিহাসের ঘটনামালার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক জাতির অন্তর্হিত শক্তিও এস্থলে গণনীয়। নীলনদের তীরে কাফ্রিরা থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস করিয়া বলিবে? আর্য্যেরা যদি ভারতবর্ষে না আসিতেন, তাহাহইলে কি এদেশে বাল্মীকি বা কালিদাসের ন্যায় কবি, গোতম বা কপিলের ন্যায় দার্শনিক, এবং আর্য্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিতবেত্তা জন্মিত? যদি বাহ্যবস্তু হইতেই সমুদয় হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তর্হিত হইল কেন? দেশের

ভাব প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু অধিবাসীদিগের ভাব অন্য প্রকার হইয়াছে কেন? আর্য্যজাতি ইউরোপখণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তথায় অন্য জাতীয় লোকে বাস করিত; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্নপ্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র। যীহুদীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে চিনা যায়। গ্রীনলণ্ডে যাও, আমেরিকায় যাও, আফ্রিকায় যাও, অস্ট্রেলিয়ায় যাও; ইংরেজ সর্ব্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে কাফ্রি চিত্রিত আছে, এখনও তাহার মূর্ত্তি বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আবার দেখ যে বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, ও সাহিত্যে আর্য্যজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে নাই। এবং সৈমজাতি হইতেই যীহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটী একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা; এবং যে কোন অবস্থায় যে জাতিকে রাখনা কেন, সহসা তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

কিরূপে নিগ্রো, মোগল, মালয়, আর্য্য, সৈম, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণামবাদী ওয়ালেস্ সাহেব বিবেচনা করেন যে আদৌ বাহ্যাবস্থার ভেদই এরূপ জাতিভেদ উৎপন্ন হইবার কারণ। যখন মনুষ্যেরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, যখন তাহাদিগের কোনরূপ পরিধেয় ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা পাক করিতে বা নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তখন তাহারা যে দেশে যাইত অন্যজীবের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সে দেশের স্বভাবানুবর্ত্তী হইত। সে দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহ্য করিত। সে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে আতপতাপে পুড়িত। সেখানে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহার করিত। এই রূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসস্থলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু প্রাচীন কালে যাহা হইয়া থাকুক, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মনুষ্যের প্রভাব বাড়িতেছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবাসীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উপর সভ্যতাবৃদ্ধির নির্ভর করিতেছে। যে জাতি যে পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইতেছে ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইতেছে। কালে বোধ হয় মনুষ্যের প্রভুত্ব এত বহুবিস্তীর্ণ হইবে, যে ভূমণ্ডলে মানবের অপ্রয়োজনীয় জীবোদ্ভিদ্ কিছুই থাকিবে না, এবং প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এত দূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে, যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

শৈশব সহচরী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিপদে আরম্ভ।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র, ভাগীরথীর তীরস্থিত বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল; মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে নদীর হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইতেছিল; নদীর উভয় পার্শ্বে মনুষ্য বা মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন অথবা অন্য কোন শব্দ ছিল না, কেবল মাত্র সমীরণ সঞ্চালিত নদীতীরস্থ বৃহৎ বৃক্ষদিগের শন শন শব্দ, আর অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথীর অনন্ত সাগর সম্ভাষণে গমনের কলকল রব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জলযান, কোন বৃহৎ শ্বেতপক্ষীর ন্যায় শ্বেতপক্ষ বিস্তৃত করিয়া নাচিতে নাচিতে ভাগীরথীর বিশালবক্ষে বিচরণ করিতেছিল। জলোচ্ছ্বাসে যেমন ভাগীরথীর বারিরাশি উছলিতে ছিল, পিতৃ মাতৃ সম্ভাষণাকাঙ্ক্ষা সুখ রজনীকান্তের হৃদয়ে তেমত উছলিতে ছিল। অনেক দিবসের পর রজনী বাটী যাইতে ছিলেন; রজনী একাগ্রমনে তাঁহার জননীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন। সেই স্নেহ, সেই যত্ন, সেই ব্যাকুলতা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি বাটী পঁহুছিবামাত্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার জননী কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কখন কখন তাঁহার বয়স্যবর্গ, কখন বাল্যক্রীড়ার স্থান স্মরণ করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনান্ধকার আম্র কানন, তন্মধ্যস্থিতপদ্মপুকুর নামে সরোবর, যাহাতে গ্রাম্যকুলকামিনীগণ অনুক্ষণ আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া পদ্মবনে পদ্ম পুষ্পের সহিত মিশিয়া থাকে এবং যে পুকুরে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আপনি ডুবিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে ছিলেন। আবার কখন কখন মনে হইতে লাগিল, তাঁহার বিবাহ হইবে। কাহার সহিত বিবাহ হইবে—শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃকন্যার সহিত?—কুমুদিনী? সে ত বাল্যকালে বিধবা হইয়াছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায় কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ উদাসীন হইয়াছেন। সুবর্ণপুরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করে কাহার সাধ্য? ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে? বোধ হয় আছে। নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে অনন্যমনে নদীর পূর্ব্বতীর দৃষ্টি করিতেছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। অতিদূরে বনমধ্যে নদীকূলোপরি রাজহংসের ন্যায় একটি ধবল পদার্থ

দেখিয়া জানিলেন যে, নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কেন না ঐ রাজহংসের ন্যায় ধবল পদার্থ তাঁহার গ্রামের একটি ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট মাত্র; এবং উহা বসুন্ধরার ঘাট বলিয়া খ্যাত। রজনী অধীর হইয়া দাঁড়িদিগের জোরে দাঁড় টানিতে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসে এবং বিস্তৃত পালসংযোগে নৌকা তর তর বেগে ছুটিতেছিল, হঠাৎ মাঝিরা পাল নামাইল। রজনী কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, পশ্চিমে বড় মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘ সমুদায় গগনে ব্যাপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল অল্পকাল মধ্যেই ঘোররবে প্রবল ঝটিকা উঠিল। ভাগীরথীর প্রশান্ত হৃদয় দুরন্ত হইয়া উঠিল, রজনীকান্তের নৌকায় বিষম কোলাহল উঠিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকা জলমগ্ন হইল। রজনী সাঁতার জানিতেন দুরন্ত বেগবান্ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কিছু দূর আসিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্ত পদাদি শিথিল হইয়া আসিল, তথাচ কূল অতি নিকটে বিবেচনা করিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। ক্রমে অবসন্ন হইয়া অচেতন হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আর একপ্রকার বিপদ।

রজনীকান্ত অচেতন হইয়া জলমগ্ন হন নাই, অনুকূল বায়ু দ্বারায় তাড়িত হইয়া কূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন তখন রাত্রি হইয়াছে; ঝড় বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। সে প্রকার ঝড়ের হুঙ্কার শব্দ নাই, সে প্রকার নদীর তরঙ্গ নাই, সে প্রকার নদীর শব্দ নাই, সে প্রকার প্রকৃতির সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি নাই, তাহার পরিবর্ত্তে শান্ত এবং সুশীতলমূর্ত্তি হইয়াছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নিবিড় নীলাকাশে সপ্তমীর চন্দ্র অসংখ্য তারার সহিত বিরাজ করিতেছে; নিম্নে অনন্ত দেশব্যাপিনী বিশাল হৃদয়া জাহ্নবী নিঃশব্দে রজনীকান্তের চরণ ধৌত করিয়া ছুটিতেছে। নদীতীর জনহীন, শব্দহীন; কেবল মাত্র রজনীকান্ত মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।

রজনীর জ্ঞান লাভ মাত্রেই বোধ হইল যে তিনি নদীতীরে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মস্তক কঠিন মৃত্তিকায় রক্ষিত নহে, অথচ কোমল উপাধানেও নহে। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন এক লাবণ্যময়ী যুবতী অর্দ্ধ জলে অর্দ্ধ স্থলে বসিয়া সেই বিজন তটিনী কূলে তাহার উরূপরে রজনীর মস্তক রাখিয়া আলুলায়িত আদ্র কেশরাশি দ্বারায় ঝড় বৃষ্টি হইতে রজনীর দেহ রক্ষা করিতেছিল। রজনী স্বপ্ন মনে ব তাহার মুদিত করিলেন, কিন্তু মধ্যে২ স্ফুলন। গোলা তাঁহার পাদমূলে আঘাত রগ্রতা চিঃ ভ্রম দূর হইল, আবার চক্ষু টী পঁহছিঃ করিলেন কিন্তু পরিষ্কাররূপে জননী পাইলেন না। যুবতীর মুখ-

কুঞ্চিত বিপুল কেশরাশি-মধ্যে লুক্কায়িত। সেই কেশরাশির শেষাগ্রভাগ রজনীকান্তের বাহুদ্বয়, বক্ষ, মুখমণ্ডল আবরণ করিতেছে; যুবতী মধ্যে২ সেই সুগন্ধযুক্ত কেশগুচ্ছ সকল রজনীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা স্থানান্তরিত করিতেছে। রজনী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তিনি যে অলকাগুচ্ছের অন্তরাল হইতে তাঁহার প্রতি ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা দেখিলেন। রজনী বিংশতি বৎসর বয়স্ক। এ বয়সে কে সেই সপ্তমী চন্দ্রালোক বিধৃত কলকলনাদী তরঙ্গিণীর তীরোপরি নিবিড় কেশরাশি-মধ্যেলুক্কায়িত অপ্সরা-নিন্দিত সুন্দরীর ঊরূপরে মস্তক রাখিয়া, তাহার কেশরাশি বক্ষে করিয়া মোহিত না হয়? রজনী আত্ম বিস্মৃত হইলেন, নিজ-বিপদ্ ভুলিয়াগেলেন, স্বাভাবিক বল পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

অনন্তর যুবতী চকিত নেত্রে মস্তক নত করিয়া রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল। যুবতীর অলকাগুচ্ছ রজনীর গণ্ডদেশে পড়িল। রমনী দেখিলেন যে, রজনী চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছেন, অমনি সলজ্জে অঞ্চল টানিয়া মস্তক এবং পৃষ্ঠ আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সেই চেষ্টাতে অলক্ষ্যে রজনীকান্তের মস্তক তাহার ঊরু হইতে ভূমে পতিত হইল। অমনি যুবতী আপনার মস্তক আবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন, এবং দুই হস্তে তাহার মস্তক ধারণ করিয়া অতি দয়ার্দ্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আহা!" তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?" রজনীকান্ত সেই স্বর শুনিলেন; যেমন কোন পুষ্পের সুগন্ধ ঘ্রাণে অথবা কোন সঙ্গীত শ্রবণে কখন২ মনুষ্য হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হয়, এই রমণীকণ্ঠ-স্বর শুনিয়া রজনীর সেইরূপ হইল। রজনী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, যুবতী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে কি?"

রজনীকান্ত উত্তর করিলেন, "না— আপনি কি মুখুয্যেদের—?" তখন রমণী আত্মস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিয়া সলজ্জে মৃদু২ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, যে রজনী প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন বসন্তপবনসঞ্চালিত মেঘবৎ আস্তে২ চলিলেন। রজনীও উঠিলেন; দুই একবার পদস্খলিত হইল, তথাপি চলিলেন; সম্মুখে একটি বাঁধাঘাট দেখিলেন, এবং চিনিলেন, যে তাঁহার নিজ গ্রামের বসুন্ধরার ঘাট। অতি ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে আসিলেন। কিন্তু রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পরিচয় লাভার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; এই আর একরূপ বিপদ্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদ্ নানা প্রকার।

পূর্ব্বকথিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে একাকী দাঁড়াইয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন। সম্মুখে জাহ্নবীর অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুরাশি, তদুপরি বণিক্‌দিগের বৃহৎ বৃহৎ তরণী শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া অতি দূর হইতে উড্ডীন,শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কিন্তু রজনী সে সকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অতি দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী শ্বেতপাল বিস্তৃত করিয়া তর তর বেগে আসিতেছিল, তিনি তাহাই অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইলে তাঁহার জলমগ্ন বৃত্তান্ত সুখস্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। কাল মেঘ তাঁহার মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গের গর্জ্জন তাঁহার মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার সেই বিপদে পড়িতে ইচ্ছা জন্মিল। আবার সেই সুন্দরীর ঊরূপরে মস্তক রাখিতে বাসনা হইল। এই যে নৌকা তরতর বেগে আসিতেছে ইহাতে আরোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ কাল মেঘ উঠিবে, সেইরূপ প্রচণ্ড ঝড় উঠিবে, শেষ নৌকা জলমগ্ন হইবে, পুনরায় রমণীকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু রজনীর আশা নিষ্ফল হইল; নৌকা নক্ষত্রবেগে বসুন্ধরার ঘাট উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল। রজনী নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তৎপরে পশ্চাতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া মস্তক ফিরাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক একটি যুবা তাঁহার দিকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। যুবক তাঁহার বাল্যসহচর নাম মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ রজনীকে কলিকাতার নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া কেবল "হাঁ" এবং "না" উত্তর করিতে লাগিলেন। রজনীর এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী, প্রায় দুই মাস হইল আমি যখন তোমায় কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম তখন তুমি সদানন্দ ছিলে, এখন ঈদৃশ ভাবান্তর কেন? তোমার বাটী আসাতে কোথায় আনন্দ বৃদ্ধি হইবে—না উহা হ্রাস হইল? ইহার কারণ একমাত্র আমার অনুভব হইতেছে যে তুমি কলিকাতায় কোন রমণীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছ এবং তাহার বিচ্ছেদে এমন বিমর্ষ হইয়াছ।" রজনীকান্ত উত্তর দিলেন না। মহেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার এই শেষ উক্তিতে রজনীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাঁহার বিমর্ষতার কারণ এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন নাই; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয় মুকুরে সেই জাহ্নবীতটবিহারিণী যুবতীর ছায়া রহিয়াছে। রজনীকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, যে

সেই যুবতীকে প্রথম সন্দর্শনেই ভালবাসিয়াছেন। তবে সেকি শৈশব সহচরী কুমুদিনী! তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অন্যমনে সেই জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতা লইয়া, হস্ত দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া জাহ্নবীনীরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কেমন তাহারা ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালনে নাচি তেছিল তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বালিকার প্রেম তাও বিপদ্।

এখনও অল্প অল্প বেলা আছে—আম, বকুল, নারিকেলাদির উচ্চশাখায় স্বর্ণ সদৃশ সূর্য্যকিরণ এখনও জ্বলিতেছিল, প্রশান্ত গঙ্গাহৃদয় অতি ক্ষুদ্র বীচিমালাসঞ্চালনে প্রতিস্ফুরিত হইতেছিল। এমত সময়ে দুইটি বালিকা গাত্রধৌত করিতে আসিতেছিল। পথ জনশূন্য, বালিকারা অন্য দিন আমোদে আমোদে আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ ভয়ে ভয়ে আসিতে ছিল। দেখিল কোথাও লোক নাই, শব্দ নাই, কেবল মাথার উপরে নীল নভোমণ্ডলে পাপিয়ার আকাশব্যাপী রব আর পৃথিবীতে জাহ্নবীর মৃদুবাত সংস্পর্শ জনিত মধুর ধ্বনি। বালিকারা দ্রুতপাদবিক্ষেপে সঙ্কোচিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা হঠাৎ দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিদ্বারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি অশ্বত্থবৃক্ষ প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠাকে কহিল, "দেখ, স্বর্ণপ্রভা ঐ গাছের আড়ালে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" স্বর্ণপ্রভা একাদশবর্ষীয়া আশ্চর্য্য সুন্দরী, তাহার শরীর যুবতীদিগের ন্যায় গুরুত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল। স্বর্ণপ্রভা কহিল "কৈ?" বয়ঃকনিষ্ঠা [illegible]ৎ কামিনী ভয়সূচক মৃদু স্বরে পুনরায় অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইল "ঐ" এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "স্বর্ণপ্রভা তোর বর লো তোর বর।" স্বর্ণপ্রভা একবার চাহিয়া দেখিল, পরে সলজ্জে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীরদিকে দৌড়িল। রজনীকান্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সকল দেখিতে ছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি স্বর্ণপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে সুখী হইতে পারিবেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই গঙ্গাতটবিহারিণী রমণীর ছায়া হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। রজনীর অমনি সকল সুখের আশা অন্তর্হিত হইল, রজনী চিন্তাকরিবার অবকাশ পাইলেন না। বালিকা দিগের মধ্যে চীৎকারধ্বনি শুনিলেন। দেখিলেন স্বর্ণপ্রভা দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গিয়াছেন। রজনী রুদ্ধশ্বাসে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপ্রভাকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। স্বর্ণপ্রভা লজ্জায় রক্তিমাবর্ণ হইল, এবং রজনীর হস্তত্যাগ করিবার জন্য বলপ্রকাশ করিল, রজনীও বলপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য! রজনী পরাভূত হইলেন। স্বর্ণপ্রভা কামিনীকে ইষ্টিগুরু, গঙ্গার শপথ করাইয়া নিষেধ করিলেন, যেন রজনীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, কাহারো নিকটে প্রকাশ

না করে। স্বর্ণপ্রভা বাটী পৌছিয়া সন্ধ্যার সময় কালী বাড়ীতে আরতি দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলেন, "হে মা কালি, রজনীকান্ত যেন আমার বর হয়।" তৎপরদিন প্রত্যুষে স্বর্ণপ্রভার মাসি দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছিল, স্বর্ণপ্রভা অমনি মনে মনে বলিল, "হে মা দুর্গা রজনীকান্ত যেন আমার বর হয়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেশ বিন্যাস।

তাহাই হইল, দুই সপ্তাহ পরে দেবতারা স্বর্ণপ্রভার প্রার্থনা শুনিলেন, রজনীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল। আগামী সোমবার ২২শে আষাঢ়ে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। অদ্য গাত্রে হরিদ্রা,স্বর্বর্ণপুরে বড় ধুম; বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা উভয়েই ধনাঢ্য, উভয়েই বিবাহ-উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কন্যা-কর্ত্তার বাড়ীতে অদ্য বড় গোল, স্বর্ণপ্রভার আহ্লাদের শেষ নাই, রজনীকান্ত তাহার বর হইবে।

অপরাহ্নে তাহার বিংশতি বর্ষীয়া বিধবা ভগিনী কুমুদিনী তাহার কেশরাশি লইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বিন্যাস করিতেছিল। সম্মুখে আদর দিদি নামে এক বৃদ্ধা ঠাকুরাণী দিদি দাঁড়াইয়া,— আদরদিদি নামেও যেমন কাজেও তেমন, সকলকেই আদর করিতে ভাল বাসিতেন, ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "আহা! কুমু আমাদের কি সুন্দরী! অমনসুন্দরী স্বর্ণও নয়—"

কুমুদিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আদর দিদি! স্বর্ণের চেয়ে আমায় সুন্দরী বলিলে আমি কি সন্তুষ্ট হইব?" স্বর্ণপ্রভা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি রাগ করিলি কেন, সত্য সত্যই ত তোর মতন সুন্দরী কেউ কখন দেখে নাই।" আদর দিদি ভীত এবং অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তা নয় আমি স্বর্ণপ্রভাকে কুৎসিত বলি নাই, স্বর্ণও বড় সুন্দরী, আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রেও পড়িল; কুমু, তুই স্বর্ণপ্রভার বর রজনীকান্তকে কখন দেখিয়াছিস?"

কুমুদিনী নীরব হইয়া রহিল।

আদর। আমি দেখিয়াছি,দিব্বি সুন্দর, তবে কি না, শুনেছি সদা সর্ব্বদা বিমর্ষ, বুঝি কোন আবাগি ঔষধ করেছে,আহা! কার রূপে বশীভূত হইয়াছে, তা হক, আমাদের স্বর্ণপ্রভা তেমন মেয়ে নয় শীঘ্র বশ করে নেবে।

এইপ্রকারে কথোপকথন চলিতে ছিল, কিন্তু কুমুদিনী উহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে আদর দিদি চলিয়া গেল। স্বর্ণপ্রভা কেশ রচনা শেষ হইলে চলিয়া গেল, যাইতে২ অস্ফুট স্বরে আদরদিদিকে সম্বোধন করিয়া মাথা নাড়িতে২ বলিতে লাগিল "শীগ্‌গির মর্ শীগ্‌গির মর্ শীগ্‌গির মর্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ, সন্দেহ ভঞ্জন।

অদ্য বিবাহরাত্রি। বড় ধুম, স্বুবর্ণপুরের পথ ঘাট জনাকীর্ণ, কত দেশ দেশান্তর হইতে কত শত শত লোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। বরের বাটী হইতে কন্যার বাটী পর্য্যন্ত আলোকময়, এবং অবিশ্রান্ত লোক জন যাতায়াত করিতেছে; রাত্রি এক প্রহরের পর রজনীকান্ত বরবেশে শিবিকারোহণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার স্বজনগণের অসুখ জন্মিল। চারিদিক্ হইতে দর্শকমণ্ডলীর কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বৃহৎ অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে স্বর্ণপ্রভা সেই গগনভেদী কোলাহল শুনিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইল, অকারণে মনে ভয়সঞ্চার হইল, স্বর্ণপ্রভা কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা কুমুদিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনিও কাঁদিয়া উঠিলেন, কি কারণে কাঁদিতে লাগিলেন দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইল এবং পরক্ষণেই পৌরস্ত্রীগণ "বর আসিয়াছে" বর আসিয়াছে" বলিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিল। স্বর্ণপ্রভার ক্ষণকালের জন্য আহ্লাদে শরীর কণ্টকিত হইল, বর আসনে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া পৌরস্ত্রীগণ নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। যে সকল যুবতী বাসরে বরের সহিত রহস্য করিবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বরকে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন "ও আবার কি রকম? ছোঁড়া কি নড়াই করিতে আসিয়াছে নাকি?" স্বর্ণপ্রভার জননী রজনীকান্তের মূর্ত্তি দেখিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। কন্যাকর্ত্তা বিষণ্ণ বদনে সভাস্থ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বর্ণপ্রভা স্ত্রীআচারস্থানে আনীত হইল, কুমুদিনী স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। স্ত্রীআচার আরম্ভ হইল; দূর হইতে এক উন্মাদিনী গাইয়া উঠিল।

যমুনার জলে গিয়ে
কদমতলার পানে চেয়ে
না জানি দেখিলা কোন জনে।

রজনীকান্ত সচকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কি দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল— শরীর কাঁপিতে লাগিল। কন্যাসম্প্রদান হইল, দুই হাত এক হইল, স্বর্ণপ্রভা যাবজ্জীবনের জন্য রজনীকান্তের হইল। সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন একবার গভীর নিনাদে মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ হানিল, পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা উঠিল, প্রাঙ্গণের আলো নিবিয়া গেল, পৌরস্ত্রীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, কন্যার জননী, বর কন্যা বাসরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে বরকে দেখিতে পাইলেন

না। আলো আনিলেন, তথাচ দেখিতে পাইলেন না। বাটীর এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিক্ অবশেষে সমুদায় গ্রাম আলো লইয়া ভৃত্যবর্গ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও বরকে দেখিতে পাইল না, তখন কন্যাকর্ত্রী চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া ভূমিতে পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ্।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, গভীরশব্দে শ্রাবণের মেঘ ডাকিতেছে, শন শন শব্দে ঘোরতর বায়ু বহিতেছে, রজনীকান্ত জনহীন প্রকাণ্ড এক প্রান্তরমধ্যে একাকী। বর্ষাকালে প্রান্তরের স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়াছে, কর্দ্দম হইয়াছে, রাত্রি ঘনান্ধকার—ত্রয়োদশীর রাত্রি। রজনীকান্ত চলিলেন। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন? কিন্তু দুঃসহ মনের চাঞ্চল্য হেতু রজনীকান্ত একস্থানে স্থির হইতে পারিলেন না, সুতরাং চলিলেন,—কাদার উপর দিয়া চলিলেন,—মধ্যে মধ্যে জলের উপর দিয়া চলিলেন। আবার পথ অন্বেষণে দাঁড়াইলেন, অন্ধকারে কোথায় পথ। পশ্চাতে একবার মনুষ্য-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কেও?" কোন উত্তর পাইলেন না, কিছু দেখিতেও পাইলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন; একবার ভাবিলেন, তাঁহার সদ্য বিবাহিতা স্বর্ণপ্রভাকে ত্যাগ করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছেন, সম্মুখে একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ বাতাসে শনশন শব্দ করিতেছিল রজনীকান্ত তাহাতে বুঝিলেন যেন বৃক্ষ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে—"কি কুকাজ করিলে" পবনদেব যেন রাগান্বিত হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিতেছেন "ছি, ছি! কি কাজ করিলে?" আবার তখন কি ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইল, রজনী অমনি দ্রুত চলিলেন। এবার হাঁটুসমান জলে আসিয়া পড়িলেন। কোথাও পথ দেখিতে পাইলেন না, সম্মুখে এক ধবল পদার্থ দেখিলেন। মনুষ্য বলিয়া বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?" এবার উত্তর পাইলেন "পথিক," রজনীকান্ত অনুভবে বুঝিলেন যে, পথিক এক দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে প্রান্তর উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইতে পার? পথিক কহিল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, রজনীকান্ত চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিককে আর দেখিতে পাইলেন না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কোথা গেলে গো।" উত্তর নাই, কেবল প্রান্তরের অপর পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি হইল "হো হো" রজনীকান্ত আবার দাঁড়াইলেন, এবার কলকলনাদী সমীরণ-সন্তাড়িত ভাগীরথীর তরঙ্গগর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দ উদ্দেশে চলিলেন। এখন একটু আকাশ পরিষ্কার হওয়াতে পথ দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন বহুবারিপূর্ণা শ্রাবণ মাসের গঙ্গা কলকল রবে তরতর

বেগে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। সম্মুখে গঙ্গাবাসীর কোটা দেখিয়া রজনীকান্ত বুঝিলেন যে, অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বসুন্ধরার ঘাটে আসিয়াছেন। এই স্থানে প্রায় মাসাবধি হইল তাঁহার বিপদ্ ঘটিয়াছিল। এই ঘাটে কুমুদিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মূর্চ্ছিত ছিলেন। রজনী অনেকক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া নদীর ভয়ঙ্কর শোভা দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে জলক্রীড়ার শব্দ শুনিলেন, বোধ হইল কে জলে গা ধুইতেছে। আস্তে আস্তে ঘাটে নামিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল—কুমুদিনী একাকিনী রাজহংসীর ন্যায় জলক্রীড়া করিতেছে। রজনীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না কিন্তু জলবিহারিণী রমণী মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে বলিল, "কে,রজনীকান্ত, ভগিনীপতি?" রজনীর শরীর কণ্টকিত হইল; অনেককষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কেন? জলবিহারিণী উত্তর করিল "ডুবে মরিব বলে।"

রজনী কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুঃখে ডুবে মর্‌বে?" জলবিহারিণী কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,"আমি সত্য সত্যই ডুবিতে আসি নাই, তুমি আমার ভগিনীপতি, আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম, আমার প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা।" রজনীকান্ত উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "আমিও জানিতে ইচ্ছা করি তোমার ভগিনীপতির প্রতি তোমার স্নেহ জন্মিয়াছে কিনা—আজ আমি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব, দেখি তুমি কি কর।" কুমুদিনী উত্তর করিল, "ভগিনীপতি তোমার কি মনেপড়ে? যখন আমরা বাল্যকালে একত্রে ক্রীড়া করিতাম, এক দিবস পদ্ম পুকুরে আমার জন্য একটি পদ্ম তুলিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিলে, মনে পড়ে? কে তোমায় বাঁচাইয়াছিল; আর সে দিন এই গঙ্গাতীরে যেমন করে একবার বাঁচাইয়াছিলাম তেমনি করে এ বারও বাঁচাব।" এই উত্তরের পর উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। যেন গঙ্গার ভীষণ শোভায় দুইজনেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, ক্ষণেক পরে রজনী বলিলেন, "আচ্ছা তবে আমি জলে ডুবি, তুমি সেই প্রকারে আমায় বাঁচাও দেখি।" এই বলিয়া কূল হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন, অমনি কুমুদিনীও চীৎকার করিয়া রজনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ঝাঁপ দিলেন। চীৎকারধ্বনি সেই ভীষণ তমিস্র নৈশ গগনে আরোহণ করিয়া গঙ্গার একূল ওকূল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমুদিনী রজনীকে ধরিতে গিয়া দেখিলেন, তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ চিবুক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুমুদিনী কাঁদিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওগো তুমি কে গো রক্ষা কর, আমার ভগিনীপতি এইমাত্র জলে ডুবিল তাহাকে বাঁচাও।" আগন্তুক অতি ক্রুদ্ধ এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি!" কুমুদিনীর শ-

রীর কাঁপিয়া উঠিল, নিস্পন্দ হইল। তিনি দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার ভীষণাকৃতি সন্ন্যাসী তাঁহাকে ডাকিতেছে। ভয়ে তাঁহার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী পুনরপি ডাকিল, "কুমুদিনি!" "তুমি যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইয়াছে। ঐ দেখ তিনি তোমার জন্য মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন,উঠ, বাড়ী যাও।" কুমুদিনী বলিল,আমার ভগিনীপতি? সন্ন্যাসী বলিল "ভয় নাই।" মন্দিরের নিকট হইতে বামাকণ্ঠে একজন ডাকিল," কুম আয় আমার হইয়াছে।" কুমুদিনী আস্তে আস্তে তীরে উঠিয়া চলিলেন। আবার দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভগিনীপতিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও, আজ যে তাহার বাসর।" সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল "এই আমার বাসরঘর।"

ক্লিওপেট্রা।

বিধির অনন্ত লীলা!—অনন্ত সৃজন!
একদিকে দেখ, উচ্চ হিমাদ্রি শিখর,
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য আছে দাঁড়াইয়া,—
প্রকৃতি গৌরবধ্বজা, অচল অটল;
অন্য দিকে দেখ নীল ফেণিল সাগর
ব্যাপিয়া অনন্ত রাজ্য!—সতত চঞ্চল,
অচিন্ত্য জীবনে যেন সদা সঞ্চালিত,
সদা বিলোড়িত, সদা কম্পিত, গর্জ্জিত।
উপরে অসীম নভঃ নক্ষত্র মালায়
প্রজ্বলিত—কে বলিবে কত কাল হতে?
কে বলিবে কত কাল প্রজ্বলিত রবে?
নীচে নীল নীর-রাজ্য—অনন্ত, অসীম;
কত কাল হতে তাহে ভাসিতেছে হায়!
অসংখ্য পৃথিবী খণ্ড, কে বলিতে পারে;
কে বলিবে কত কাল ভাসিবে এ রূপে?
মধ্যে এক খণ্ড বারি!—এক তীরে তার
পুণ্য ভূমি ইউরোপ জুড়ায় নয়ন,
রঞ্জিত স্বভাবে, শিল্পী—চারু অলঙ্কৃতা!
অন্য তীরে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান,
মরুভূমে ভয়ঙ্করা 'আফ্রিকা' ভীষণ!
বিধির অনন্ত লীলা! কে বলিবে হায়!
এই দুই রাজ্য এক শিল্পীর সৃজন!
লজ্জিতা প্রকৃতি বুঝি তাই রোষ ভরে,
হতভাগ্য আফ্রিকায় করিতে মগন
অনন্ত জলধি জলে, দুই মহা শাখা
করিল প্রেরণ দুই সূচীরন্ধ্র পথে—
উত্তরে ভূমধ্য,—পূর্ব্বে রক্তিম সাগর।
দুঃখিনী আফ্রিকা ভয়ে পড়িল কাঁদিয়া
"এসিয়া" চরণ তলে; ভারত—গর্ব্বিণী
দিলেন অভয়, রাখি স্কন্ধের উপরে

চরণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি; অশক্ত বারীশ
বলে টলাইতে তারে! সেই দিন হতে,
পুণ্যবতী 'এসিয়ার' শুভ পরশনে,
মরুভূমি মধ্যে মৃগ-তৃষ্ণিকার মত,
সোণার মিশর রাজ্য হইল সৃজন।
মিশর অপূর্ব্ব সৃষ্টি! দৃশ্য মনোহর!
বিশাল অরণ্য যার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর;
আপনি সাগর গড় প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া, জগত—বিস্ময়
'টলেমির' চির কীর্ত্তি-স্তম্ভ সারি সারি।
অদূরে আলোক-স্তম্ভ(১)—আকাশ প্রদীপ!
জ্বলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের মত,—
নিশান্ধ নাবিকগণ নয়ন রঞ্জন!
শিল্পীর গরবে মাতি প্রকৃতি মানিনী,
পড়াইল নীল নদী(২) নীলমনি হার,—
তরল আভায় পূর্ণ! ভুবন-বিজয়ী
('মেকিডন' অধিপতি গ্রন্থি স্থলে তার,
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা স্থাপন।(৩)
রাজধানী রাজহর্ম্ম্যে বসিয়া নীরবে,
বিরস বদনে, আজি টলেমি-দুহিতা
ক্লিওপেট্রা;—মরি চিত্র বিশ্ব বিমোহিনী!
ধরা ব্যাপী 'রোম' রাজ্যে, যে রূপের তরে
ঘটিল বিপ্লব ঘোর; যে রূপ শিখায়
বিশ্বজয়ী বীরগণ,—যাহাদের হায়!
বীরপণা ইতিহাসে রয়েছে লিখিত
অমর অক্ষরে! করে, অস্ত্রে যাহাদের,
সমগ্র পৃথিবী ভার ছিল সমর্পিত!—
সিজার, এণ্টনি,—এই নাম যুগলের
সসাগরা বসুন্ধরা ছিল সমতুল!—
হেন বীরগণ, যেই রূপের শিখায়
পড়িয়া পতঙ্গ প্রায় হলো ভস্মীভূত,
কেমনে বর্ণিব আমি সে রূপ কেমন?
মিশর বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এইরূপ বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্য সম। চিত্রিব কেমনে
হেন রূপ রাশি?—রূপ অনুপম ভবে!
কল্পনা অতীত রূপ,—নহে চিত্রনেয়!
বিষাদ আঁধারে এই রূপ কহিনুর
জ্বলিতেছে; জ্বলিতেছে সুখ তারা সম
বিষাদ আকাশ গায়ে যুগল নয়ন।
দুই বিন্দু—দুই বিন্দু বারি,—মুক্তানিভ!—
আছি দাঁড়াইয়া দুই নয়ন কোনায়;
নড়ে না, ঝরে না,—আহা! নাহি চাহে যেন
ত্যজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন,
পড়িতে ভূতলে; হেন স্বর্গ-ভ্রষ্ট হতে
কে চাহে কখন? যেই নয়নের জ্যোতিঃ
কামান অভেদ্য বক্ষে করিয়া প্রবেশ,
উচ্ছ্বাসিয়া হৃদয়ের বিলাস লহরী,
ভাসাইল তাহে রোম হেন রাজ্য-লিপ্সা
(সসাগরা পৃথিবীর রাজ সিংহাসন!)
আজি সেই নেত্র আহা! সজল এমন!
বিষাদ লহরী, পূর্ণ-বদন-চন্দ্রিমা,
রত্ন রাজাসন পৃষ্ঠে ফেলিছ ঠেলিয়া;
অপমানে কেশরাশি, বিলম্বিয়া কায়,
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িয়া ধরায়,
বিদারি ভূতল চাহে পশিতে তথায়;—
'রোমেশ' হৃদয় যার অতুল আধার,
স্বর্ণ-সিংহাসন তার তুচ্ছ অতিশয়!

(১) Light honor of Sesostres.
(২) River Nile.
(৩) Alexandria.

রক্ষিত যুগল কর, বক্ষে রমণীর—
হায়! যেই রমণীর কর সঞ্চালনে
বীরগণ হৃদয় ও হইত চঞ্চল,
প্রণয় তাড়িত-ক্ষেপে;—ইঙ্গিতে যাহার
চলিত পুতুল প্রায় ধরার ঈশ্বর,—
আজি সেই কর আহা! অবশ, অচল!
পাষাণ হৃদয়োপরে, পাষাণের প্রায়
রয়েছে পড়িয়া; বুঝি হৃদয় পিঞ্জর
ভাঙ্গি রমণীর প্রাণ চাহে পলাইতে,
সেই হেতু, হায়! এই যুগল পাষাণ,
রেখেছে চাপিয়া সেই হৃদয় কপাট।
দৃষ্টিহীন সঙ্কোচিত যুগল নয়ন,—
অপলক, অচঞ্চল! চাহি ঊর্দ্ধ পানে;
কৃষ্ণ রেখান্বিত দুই কমলের দলে,
হইয়াছে যেন নীলমণি সন্নিবেশ!
মরি! কি বিষাদ মূর্ত্তি!
সম্মুখে বামার,
রতন খচিত শ্বেত প্রস্তরের মঞ্চে,
শোভিছে আহার্য্য চয়; বহু মূল্য পাত্রে
শোভিছে মিশর জাত সুরা নিরমল;
উপরে জ্বলিছে দীপ বিলম্বিত ঝাড়ে;
বিমল স্ফটিকে দীপ শাখায় শাখায়
জ্বলিতেছে, চারু চিত্র-খচিত দেয়ালে।
অনন্ত আনন্দময়ী, আমোদ রূপিণী
ক্লিওপেট্রা সুন্দরীর, এই সেই কক্ষ
মনোহর—অনঙ্গের চির-বাস! রতি
অধিষ্ঠাত্রী দেবী!—যেই কক্ষ আনন্দের
ধ্বনি, অতিক্রমে সিন্ধু, প্রবেশিয়া রোমে
(সেনেট'(১) মন্দিরে হতো প্রতিধ্বনিময়,
গণিত জেমেশ(২) কেহ রোমে নিশি জাগি
লহরী যাহার; সেই আনন্দ ভবনে
আজি কেন দেখি সব নীরব, অচল!
অচল আলোক রাশি; দেখায় দেয়ালে
অচল মানব চিত্র; অচলিত ভাবে
পড়ে আছে যন্ত্রচয় যন্ত্রী অনাদরে;
অচল অনীল কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে
আন্দোলিত হয়ে গাছে মধুর 'সিটার'(১)
বামার বিষাদ স্বপ্ন করে অপনীত;
অচল বামার মূর্ত্তি; অচল হৃদয়ে
অচল যুগল কর; অচল জীবন
স্রোত; চিত্রার্পিত প্রায়, দাঁড়াইয়া পাশে
অচল ভর্ত্তৃর শোকে, সহচরী দ্বয়
কেবল বামার সেই অচল হৃদয়ে,
সবেগে বহিতেছিল, ঝটিকা তুমুল!
"ওলো" চারমিয়ন!"[২]—চমকিলসখীদ্বয়
বামার বিকৃত কণ্ঠে, হলো রোমাঞ্চিত
কলেবর; যেন এই তমসা নিশীথে
শ্মশান হইতে স্বর হইল নির্গত!—
"ওলো সহচরি! এই হৃদয় মন্দিরে
অভিনেতা ছিল যেই প্রণয় দুর্লভ,
অন্তরিত হলো যদি, তবে কেন আর
এ বিলম্ব যবনিকা হইতে পতিত?
শূন্য আজি রঙ্গভূমি! যৌবন পরশে
উঠিল প্রথমে যবে লজ্জা আবরণ,
দেখিলাম রঙ্গভূমি নায়ক এণ্টনি;
জীবন সঙ্গীত স্রোতে খুলিল নাটক—
ক্লিওপেট্রা জীবনের চারু অভিনয়।"
"সুখদ প্রথম অঙ্কে, ওলো চারমিয়ন!—
আছে কি হে মনে?—অনন্ত বালুকাময়ী

(১) Senate. (২) Augustus Cæsar.

(১) Guitar.
(২) Charmian—one of the two maid attendandts.

প্রাচি মরুভূমি—পন্থাহীন, বারি হীন;—
পদতলে প্রজ্জ্বলিত বালুকা অনল;
তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে, শিরে উল্কা রাশি রাশি,
শত্রু শস্ত্র বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ;—
তবু অতিক্রমি হেন দুস্তর প্রান্তর
বীরভরে,—উড়াইয়া ইন্দ্রজালে যেন,
শত্রু সৈন্য চয়, শুষ্ক পত্র রাশি যেন
ভীম প্রভঞ্জনে হায়!—প্রবেশিল যবে
দিগ্বিজয়ী রোম সৈন্য মিশর নগরে;—
লতা গুল্ম তরু তৃণ দলিয়া চরণে,
পশে গজযূথ যথা কমল কাননে।
বিজয়ী বীরেন্দ্র-ব্যূহ-নগর-প্রবেশ
নিরখিতে, বসেছিনু অলিন্দে বিষাদে,
চিত্ত কৌতূহল ময়! পদতলে মম
প্লাবিয়া প্রশস্ত পথ, সৈন্যের প্রবাহ
প্রবাহিত; দেখিলাম,—আর নাহি সখি!
ফিরিল নয়ন মম; ডুবিল মানস
সেই প্রবাহ ভিতরে।

" ষোড়শ বর্ষীয়া

সেই বালিকা হৃদয়ে, অজ্ঞাতে, কি ভাব
প্রবেশিল, অভিনব; হেন ভাব সখি!
কি পূর্ব্বে, কি পরে, শৈশবে, যৌবনে,
আর ত কখন করি নাহি অনুভব;—
সেই যে প্রথম, আহা! সেই হলো শেষ!
চিত্ত মুগ্ধকরী ভাব! চিত্ত উন্মাদিনী!
বালিকার অরক্ষিত হৃদয় মোহিল।
কোথায় রোমীয় সৈন্য, কোথায় মিশর,
কোথায় তখন বিশ্ব—গগন—ভূতল?
অদৃশ্য হইল সব নয়নে আমার।
কেবল একটী মূর্ত্তি—বীরত্ব যাহার
মিশি সরলতা, দয়া,—দাক্ষিণ্যের সনে,
[আতপ মিশিয়া যেন চন্দ্রিকা শীতলে!;]
ভাসমান ছিল শ্বেত প্রশস্ত ললাটে;
প্রজ্বলিত নেত্র দ্বয়ে; চির বিরাজিত
উন্নত প্রশস্ত বক্ষে; স্ফুরিত প্রত্যেক
বীর—পদ সঞ্চালনে;—হেন মূর্ত্তি সখি!
লুকাইয়া অনুপম বীরত্বে তাহার,
সৈন্যের প্রবাহ, (যথা মহীরুহ চয়,
লুকায় চন্দ্রমাচল (১) আপন গহ্বরে!)
ভাসিল নয়ন মম,—ব্যাপিয়া হৃদয়,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন।
সেই মূর্ত্তি সখি মম বীরেশ এণ্টনি!
চঞ্চলিয়া বালিকার অচল হৃদয়
প্রথম প্রনয়াবেশে—স্বরগ ভূতলে!—
সেই মূর্ত্তি, প্রিয় সখি! হইল অন্তর,
সুদূর সুন্দর রোমে, কিছু দিন তরে;
স্থির জলধির জল করিয়া চঞ্চল,
প্রতিপদ চন্দ্র সখি! গেল অস্তাচলে!"

"খুলিল দ্বিতীয় অঙ্ক। জনক আমার—
(পিতৃনিন্দা, দেবগণ! ক্ষমিও আমারে!)
অস্ত্রধারী টলেমির বংশে বংশীধর (২)।

(১) Mountain of the moon.

(২) ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি বংশী বাদন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইয়া প্রজার বিরাগভাজন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে মিসরের রাজ্ঞী করে। টলেমি রোমের সাহায্যে, তাঁহার কন্যাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন—এই সময়ে এণ্টনি রোমান সৈন্যের একজন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন। টলেমি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বধ করেন—এই পাপিয়সীও তাহার প্রথম স্বামীকে

কুলাঙ্গার—বিসর্জ্জিয়া স্বাধীন মিশরে
রোম রূপী শার্দ্দূলের বিশাল করাল;
পতি হন্তা, পাপিয়সী, জ্যেষ্ঠ দুহিতার
তপ্ত শোণিতাক্ত, ভ্রষ্ট সিংহাসনে সুখে
আরোহিয়া,—বিধাতার কেমন বিধান!
পতি হন্তা দুহিতার কন্যা হন্তা—পিতা!—
অবশেষে—হায়! দুঃখ বলিব কেমনে!—
দশম বর্ষীয় শিশু কনিষ্ঠ আমার,
করি আমি যুবতীর পতিত্বে বরণ;—
সেই খানে ক্লিওপেট্রা জীবন উদ্যানে,
যেই বীজ, প্রিয় সখি! হইল রোপণ,
সে অঙ্কুরে কি পাদপ জন্মিল স্বজনি!
কি ভীষণ ফল পুনঃ ফলিবেক আজি?
বধি জ্যেষ্ঠ দুহিতায়; বধিতে আমায়,
সেই দিন মৃত্যু অস্ত্র করিয়া সৃজন;
ডুবায়ে মিশরে; আহা! ডুবিবে আপনি;
ডুবায়ে টলেমি বংশ; জনক আমার
সম্বরিলা নর লীলা,—নব দম্পতিরে
সমর্পিয়া দুরাচার ক্লীব মন্ত্রিকরে,
দুগ্ধের প্রহরী করি পাপিষ্ঠ মার্জ্জারে।”
“না হতে পিতার শেষ নিশ্বাস নির্গত,
সিংহাসন হতে পাপী—ফেলিল আমায়
পূর্ব্বারণ্যে। হা অদৃষ্ট! রাজার উদ্যানে
ফুটেছিল যে কুসুম, পড়িল এখন
মরুভূমে!—সে যে দুঃখ কহা নাহি যায়!

কিন্তু নারী প্রতি হিংসা, প্রচণ্ড অনল,
শীতানিল মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন কিরণ।
সহসা মিলিল সৈন্য। সেনা পত্নী—আমি
সাজিনু সমর সাজে। কবরীর স্থলে
বাঁধিলাম শিরস্ত্রান, উরস্ত্রান, উচ্চ
কুচ যুগোপরে। যেই কর, কমনীয়
কুসুম দামের ভরে হইত ব্যথিত,
লইলাম সেই করে তীক্ষ্ণ তরবার;
পশিলাম এই বেশে মিশর ভিতরে,
ক্লীব রক্তে নীল নদী করিতে লোহিত,
কিম্বা বীরাঙ্গণা রক্তে রঞ্জিতে মিশরে।
হেন কালে রোম রাজ্য বিপ্লাবি, বিলোড়ি,
ভীষণ তরঙ্গ দ্বয়(১)—সিন্ধু অতি ক্রমি,
পড়িল জীমূতমন্দ্রে মিশরের তীরে;
কাঁপিল মিশর সেই ভীষণ আঘাতে,
রণোন্মত্ত অসি দ্বয়(২) পড়িল খসিয়া।
এক উর্ম্মি হলো লয় সমুদ্র সৈকতে,
দ্বিতীয় উঠিল শূন্য সিংসনোপরে!”
“সিজার মিশরে!—দূরে গেল রণসজ্জা।
নব ফার্শেনিয়া—পম্পি বিজয়ী সিজার,
মিশরের সিংহাসনে!—খুলিলাম সখি!
রণবেশ, দীনা বেশে রোমেশ চরণে
পড়িলাম,—সে কুহক আছে কি হে মনে?(৩)

তাহার মনোমত হয় নাই বলিয়া ইতি পূর্ব্বে বধ করিয়াছিল। টলেমি মৃত্যু সময়ে মিসর দেশের রীতি মতে, উইল দ্বারা ক্লিওপেট্রাকে তাহাবা একটী ১০ম বর্ষীয় ভ্রাতার সঙ্গে পরিণয় বদ্ধ এবং একজন ক্লীব দুরাচারকে তাহাদের অভিভাবক করিয়া যান।

(১) ফার্শেনিয়ার যুদ্ধের পর পম্পি সিজারের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মিশরে উপস্থিত হইলে, মিশরবাসী সমুদ্রতীরে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া সিজারকে উপঢৌকন দেয়; সিজার মিসরের আভ্যন্তরিক বিগ্রহ নিবন্ধন শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন।

(২) ক্লিওপেট্রার এক অসি, এবং তাঁহার শত্রু পক্ষে দ্বিতীয় অসি।

(৩) ক্লিওপেট্রার জনৈক অনুচর তাঁহাকে

ঝটিকায় ছিন্নমূল ব্রততী যেমতি,
বন্দে মহীরুহ হায়!—নিরাশ্রয়া লতা!"
"সে ঐন্দ্রজালিক সখি! কর সঞ্চালনে
নিবারি তুমুল ঝড়, রক্ষিল আমারে,
আলিঙ্গিয়া স্নেহভরে। প্রিয় সখি! হায়!
এই জীবনে প্রথম,—এই মরুভূমে—
স্নেহ সুশীতল বারি হলো বরিষণ।
নিষ্ঠুর জনক যার; নিষ্ঠুরা ভগিনী;
শিশু সহোদর, ভর্ত্তা; মন্ত্রী—নরাধম;
সে কিসে জানিবে সখি! স্নেহ যে কি ধন?
যুড়াইল প্রাণ, সখি! পুরাইল আশা,
বসিলাম সিংহাসনে, বসিলাম?—ভীম
ভূকম্পনে, কিম্বা অগ্নি—গিরি—উদ্গীরণে,
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন।
দেখিলাম অন্ধকার, ঘুরিল মস্তক,
পড়িতেছিলাম সখি! মূর্চ্ছিত হইয়া
অকূল সাগরে,—কি যে বীরপণা সখি!
জলে, স্থলে, কি অনলে করিল বীরেশ,
স্বচক্ষে দেখেছ, সখি! শুনেছ শ্রবণে।
দেখিলাম মূর্চ্ছাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন,
ভাসিয়াছে শিশু ভর্ত্তা শত্রুদলসহ,
অনন্ত জীবন জলে; বসিয়াছি আমি
মিশরের সিংহাসনে,—বলিব কেমনে
সেই লজ্জা?—সিজারের হৃদয় আসনে!
কৃতজ্ঞতা রসে সখি ভরিল হৃদয়,
ধন, প্রাণ, সিংহাসন, প্রণয় দাতায়,
করিলাম সহচরি আত্মসমর্পণ।
কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা—জ্ঞান সমুদয়—

বসন রাশিতে বেষ্টিত করিয়া সিজারের নিমিত্ত উপঢৌকন বলিয়া তাঁহাকে গুপ্ত ভাবে সিজারের সমীপে লইয়া যায়।

সেই কৃতজ্ঞতা শেষে কোথা হলো লয়!
একে প্রাণ দাতা, তাহে পৃথিবী ঈশ্বর,
ততোধিক ভুজবলে ভূমণ্ডল জয়ী;
এত প্রলোভন!—সখি! পড়িলাম আমি,
অজগর আকর্ষণে—সরলা হরিণী।"
"হেন কালে চারিদিকে সমর অনল
জ্বলিল, সিজার এই মিশরে বসিয়া
দেখিল অনল শিখা; বৈশ্বানর রূপে
ঝাঁপ দিল, সখি! সেই বহ্নির ভিতরে;
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত প্রবাহে
বীরবর! বাহুবলে আপনি সমুদ্র
রহিয়াছে বন্দি যার রাজ্যের ভিতরে,
এই ক্ষুদ্র অগ্নি শিখা কি করিবে তারে?
বিজয় পতাকা তুলি; ভীম সিংহনাদে
কাঁপায়ে ভূধর শ্রেণী সুদূর উত্তরে;
ডুবায়ে জলধি মন্দ্র অদূর দক্ষিণে,
ছড়ায়ে গৌরব ছটা দিগ্ দিগন্তরে;
ঢালিয়া আনন্দ স্রোত অজস্র ধারায়
রাজ পথে; প্রবেশিল বীর অহঙ্কারে,
দিগ্বিজয়ী বীরবর রোম রাজধানী।

সতী সহধর্ম্মিণীর স্বপ্ন উপেক্ষিয়া
চলিল সেনেট গৃহে,—হায়! জাল মুখে
প্রলোভনে মুগ্ধ ক্ষুব্ধ কেশরী যেমতি,
ক্ষুধার্ত্ত! তোমরা কেহে?(১) তোমরা দুজন
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে? চৌষট্টী রৌরব
যেন ভাবিতেছ মনে? কণ্টক স্বরূপ
কেন সিজারের পথে, আছ দাঁড়াইয়া?
জান না সিজার আজি হইবে ভূপতি?
সরে যাও।—বীরবর সেনেট মন্দিরে

(১) ব্রুটস এবং কেশিয়াস্।

প্রবেশি বসিল স্বর্ণ চারু সিংহাসনে;
"বিশ্বজয়ী মহারাজা সিজারের জয়!"
আনন্দে ধ্বনিল শত সহস্র জিহ্বায়;
আনন্দে রোমান বাদ্য করিল সঞ্চার
নর রক্তে সেই ধ্বনি পূরিল গগন
সেই জয় জয় রবে; নামিতে লাগিল
রোম ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট
সিজারের শিরোপরে, এণ্টনির করে।
ফুরাইল;—কি? সিজারের রাজ্যঅভিষেক?
কেন আনন্দের ধ্বনি থামিল হঠাৎ?
নিরবিল যন্ত্রিদল? কেন অকস্মাৎ
এই হাহাকার?—সখি দেখিনু সম্মুখে;
কি দেখিনু? ইহজন্মে ভুলিব না আর।
ভূপতিত, হা অদৃষ্ট! বীরেন্দ্র সিজার!
কোথায় মুকুট? সখি! বক্ষে তরবার!"(১)
কণ্টকিল রমণীর কম কলেবর;
বিস্ফারিল নেত্রদ্বয়; সহিল না আর
অবলা হৃদয়ে, মূর্চ্ছা হইল রমণী—।
সুগন্ধ তুষার বারি, নয়নে, বদনে,
তুষার উরস শ্বেতে, সহচরী দ্বয়,
বরষিল, কিছু-ক্ষণ পরে রূপসীর
অচল হৃদয় যন্ত্র, জীবন পবন
স্পর্শে চলিল আবার; খুলিল নয়ন,—
প্রভাতে দক্ষিণানীলে কোমল পরশে,
উন্মেষিল যেন ধীরে কমলের দল।

(১) রোমরাজ্যে ইতিপূর্ব্বে রাজ-তন্ত্র শাসন ছিল না, সুতরাং রাজাও কেহ ছিল না। সিজারই প্রথম রাজ উপাধি গ্রহন করিতে উদ্যোগ করেন; এই কারণে কতিপয় ষড়যন্ত্রী তাঁহাকে অভিষেকের দিবস বধ করেন। ইহাদের মধ্যে ব্রুটস্ এবং কেশিয়াস প্রধানছিলেন।

অর্দ্ধ উন্মূলিত নেত্রে, এক দৃষ্টে চাহি
কক্ষে বিলম্বিত এক চারু চিত্র পানে,
বলিতে লাগিল বামা—"ওই, সহচরি!
ওই যে দেখিছ—চিত্র,—নিসর্গ দর্পণ!—
অপূর্ব্ব—অঙ্কিত!—ওই দেখ ওই,
'চিদনস' (১) স্রোতে ওই প্রমোদ তরণী
ভাসিতেছে, নাচিতেছে বারিবিহারিণী,
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে, পশ্চিম তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে মুখে মুখ দিয়া,
বঙ্কিম গ্রীবায় ভাসে তরী পুরোভাগে;
চন্দ্রককলাপ রাশি—নয়ন রঞ্জন!—
চারু চন্দ্রাতপরূপে শোভিছে পশ্চাতে।
তাহার ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী;
নাচে স্বর্ণ-কর্ণ, বদ্ধ কুসুম মালায়
কুসুম কোমল করে। বসন্ত রঙ্গের
নাচিতেছে সুবাসিত সুন্দর কেতন,
সৌরভে মোহিত—মৃদু—অনীল চুম্বনে।
তরণীর মধ্য দেশে, সুবর্ণ খচিত
চন্দ্রাতপ তলে, স্বর্ণ-কমল আসনে,
বারুণী রূপিণী—ওই তরণী ঈশ্বরী;
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর!
দুই পাশে সুকুমার সহচর চয়
দাঁড়ায়ে মন্মথ বেশে—সস্মিত বদন!—
ব্যজনিছে ধীরে ধীরে বিচিত্র ব্যজনে।
কিন্তু সে অনীলে কই যুড়াবে বামায়,
বরং হইতেছিল কোমল পরশে,

(১) চিদনস নামক নদ—এসিয়া মাইনরে? এণ্টনির আজ্ঞা মতে ক্লিওপেট্রা তাহার সঙ্গে 'টারসাসে' সাক্ষাৎ করিতে যান।

কাম লালসায় উষ্ণ কপোল যুগল।
সম্মুখে অঙ্গণাগণ—অনঙ্গ মোহিনী!—
কোমল মদনোন্মাদী—সঙ্গীত তরল
বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে; তালে তালে তার
পড়িছে রজত দাঁড় রজত সলিলে,—
তরণী সুন্দরী—ভুজ মৃণালেতে যেন
আলিঙ্গিছে প্রেমাহ্লাদে নদ ‘চিদ নসে!’
সে সুখ পরশে নাচি স্রোত হিল্লোলিয়া,
প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে—তরণী পশ্চাতে;
নাচিছে তরণী;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
সলিলের ক্রীড়া, সখি! দেখ চিত্রকর
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে! নাচিতে নাচিতে
চুম্বিয়া সরিৎ বক্ষ, কহি কানে কানে
অস্ফুট প্রণয় কথা তর তর স্বরে,
চলেছে রঙ্গিণী ওই,—আশ্চর্য্য অদৃশ্য
সৌরভে করিয়া, মরি! ইন্দ্রিয় অবশ।
নগর, সজীব দীর্ঘ দর্শক-মালায়,
সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
অদূরে নগরে বসি—একাকী এণ্টনি
ডাকিছে অস্ফুট সিসে অপহৃত মন।
কিন্তু সখি! তৃষ্ণাতুর সহস্র নয়ন,
যে রূপ সুধাংশু অংশু করিতেছে পান
কে ওই রমণী,—সর্ব্বদর্শক-দর্শন?
ক্লিওপেট্রা? আমি? না, না, সখি! অসম্ভব!
সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি;
আমি যদি ক্লিওপেট্রা,—তরী বিহারিণী,
ওই চিত্র নহে সখি! আমি দুঃখিনীর।
সেই মুখে হাসি রাশি, এ মুখে বিষাদ;
সে হৃদয়ে সুখ, সখি! এ হৃদয়ে শোক;
সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয় সলিলে,
আমি ডুবিয়াছি হায়! নিরাশ সাগরে।
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি!
শোভিতেছে মরি! যেন শারদ কৌমুদী
বেষ্টিয়া কুসুম বন; আজিও সে বেশে
সজ্জিত এ বপু মম; কিন্তু সহচরি!
সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর!
আজি সেই বেশ, স্বর্ণ-হীরক খচিত,
নিবিড় তমিস্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া।
সে দিন প্রেমের শুক্ল দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায় নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!”

নীরবিল ধীরে বামা;—মধুর বাঁশরী
পাইয়া বিষাদ তান, নীরবে যেমতি।
স্থির নেত্রে, কিছুক্ষণ চাহি—শূন্যপানে,
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা।
“চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এণ্টনি; সখি! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত চোরে, যুবতী যৌবন।
যত অগ্রসর তরী হতেছিল বেগে
ততই হইতেছিল মানস আমার
সঙ্কোচিত;—নির্ঝরিণী মুখে যথা নদ
চিদনস। হায়! সখি, ভাবিতেছিলাম
কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম সিংহাসন,
কিম্বা—রোম'কারাগার! দেখিতে দেখিতে
সঙ্কুচিত আশা স্রোত প্রণয় নির্ঝরে
উত্তরিল, কিন্তু সখি! সেই সংমিলনে
উথলিল যেই চল প্রেম প্রস্রবনে—
হৃদয় প্লাবিনী!—সেই সলিল প্রবাহে
ভেসে গেল মম কুল, শীল, লজ্জা, ভয়,
ভেসে গেল সেই বেগে, ভূত ভবিষ্যত,
বর্ত্তমান উভয়ের; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের রাজ্য সিংহাসন;

ভেসে গেল--সেই স্রোতে সপত্নী সিল্‌ভিয়া[১]
ভাসিয়া ভাসিয়া সেই প্রণয় প্লাবনে
আসিলাম মিশরেতে, প্লাবন প্রবাহ
সখি! মিশিল সাগরে। স্বজনি! তখন
সকলি—অনন্ত! হায়, অনন্ত প্রেমের;
অনন্ত লহরী লীলা! অনন্ত আমোদ
বিরাজিত নিরন্তর অধরে নয়নে!
অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ, যুগল হৃদয়ে!
ভাবিলাম মনে,—প্রেম, সুখ, রাজ্য,ধন,
প্রেমিক জীবন হায়! অনন্ত সকল।
যে কাম-সরসী সখি! করিনু নির্ম্মাণ,
যত পান করি, বাড়ে প্রণয় পিপাসা;—
অনন্ত পিপাসাতুর নায়ক আমার!
ঢালিয়া দিলাম তাহে, জীবন, যৌবন
মম; ঝাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তের
প্রায়,—মদন-বিহ্বল! সেই সরোবরে
কভু মৃণালিনী আমি, সখা মধুকর;
আমি মরালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সলিলে,—
সখা মদমত্তকরি; সলিলের তলে
কভু আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি;—
অধিপতি ক্লিওপেট্রা-কাম-সরসীর!
এই রূপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
মাস, চলিল বৎসর, বিদ্যুতের স্কন্ধে,—
অনঙ্গ বিলাসে, সুরা, সঙ্গীতে বিহ্বল!

ক্রমশঃ।

[১] এণ্টনির প্রথম পত্নী।

মূল্য প্রাপ্তি।

সন ১২৮০ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

মুন্সি মহম্মদ তরিফুল্লা বোদা ... ৶০
শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু সেন বরিশাল ।৵০
, আনন্দনাথ রায় পাঁচবিবি ২৸৵০
, নীলমণি চট্টোপাধ্যায় বলরামপুর ... ২॥০
, সাতকড়ি নন্দী লাহোর ।/০
, যাদবচন্দ্র সরকার রামপুর বোয়ালিয়া ৪৸৶/১০

সন ১২৮১ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী সেরপুর ... ৶০
, অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় দালালবাজার ... ৩৷৵০
, সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুর্ণিয়া ... ৩৷৵০
, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকা ৪।৵০
, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ... ৩।১০
, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভবানীপুর ... ৩
, চারুচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর ৩৷৵০
, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ... ৩৷৵০
, রামগতি মুখোপাধ্যায় শেয়ালদহ ... ৪৸৶/১০
রাজা রাধা শ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্র ময়নাগড় ... ।০
, দীনবন্ধু সেন বরিশাল ... ৩
বাঘনাপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সভা ... ।৵০
, জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ী ... ।/০
, আনন্দনাথ রায় পাঁচবিবি ২৸/০
, জগবন্ধু সত্য হালসা ... ৩/১০
শ্রীযুক্তবাবু ব্রজমোহন রায় রঙ্গপুর ৪৸৶০
, কালীপ্রসাদ মাইতি কাঁথি ৩৷৵০
মুন্সি মহম্মদ তরিফুল্লা বোদা ৩৷৵০
, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ কাশীপুর ... ১৸০
, নীলমণি দেব এলাহাবাদ ৩/১০
, রাজ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাটখোলা ৩/১০
, নীলমণি চট্টোপাধ্যায় বলরামপুর ... ৩
, সূর্য্যকুমার ধর হুগলী ... ৩
, দুর্গাপ্রসাদ দত্ত বরিশাল ৪/০
, জগদ্বন্ধু লাহা ঐ ৪৸৵০
, হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর ৶০
, হরনাথ ঘোষ কলিকাতা ৩।/০
, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেনারস ... ৩
, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ... ৩
, নবকিশোর সেন ছিলেট ৪৸০
, বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী বাকীপুর ... ৪৸৵০
, মধুসূদন রায় চৌধুরী কুন্তিসদ্য পুষ্করিণী ৶০
, প্রসন্ননাথ মিত্র নলডাঙ্গা ১৸৶/১০
, রাশবিহারী বসু রামপুরহাট ... ২
রেভারেণ্ট জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য মহানাদ ... ৪৸৶/১০

সন ১২৮২ সালের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষ কুচবেহার ... ৩৷৵০
, নিত্যানন্দ সেন সন্দীপ ... ২৷৵০
, কিশোরীমোহন চৌধুরী সেরপুর ... ৩
, দীননাথ দত্ত হাইলাকাঁদি ৩৷৵০

শ্রীযুক্তবাবু প্রসাদদাস বড়াল কলিকাতা ... ৩৸৴০
" হরিকালি ঘোষ ঐ ... ৩৸৴০
" নরসিংহ নিয়োগী দক্ষিণেশ্বর ... ৩৸৴০
" কৃষ্ণলাল দাস যাত্রাপুর ... ৩৸৴০
" কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মূলতান ... ৩৸৴০
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ... ৩৸৴০
" কালীনারায়ণ সান্যাল ময়মনসিংহ ... ৩
" বেহারিলাল মিত্র মঝুমপুর ৩৸৴০
" ফএজন নেছা চৌধুরাণী কালীঘাট ... ৩৸৴০
" বেচারাম চক্রবর্ত্তী বোদাইন রহিলখণ্ড ... ৩৸৴০
" রামদাস চন্দ্র বাগটিকরা ... ৩৸৴০
" প্রসন্নকুমার দত্ত শ্যামনগর ৩৸৴০
মহম্মদ আবদস ছোবান সিকীদা ... ৩৸৴০
" অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় দালালবাজার ... ৩৸৴০
" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ... ১৷৵১০
" অনঙ্গমোহন চৌধুরী ভুষভাণ্ডার ... ৩৸৴০
রাজা রাধা শ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্র ময়নাগড় ... ৩।৴০
" প্যারীলাল রায় বরিশাল ৩৸৴০
" থানসিংহ বয়েদ কলিকাতা ৩৸৴০
শ্রীযুক্তবাবু রামবল্লভ দাস মাছুলিয়া ... ৩।০
" জগদীশচন্দ্র বসু কাটোয়া ৩৸৴০
" কীর্ত্তিকাকান্ত শর্ম্মাবড়ুয়া থানাজাগী ... ৩৸৴০
" রাধাসুন্দর সান্যাল ছাতিনগ্রাম ... ২৷০
" কালীপ্রসাদ মাইতি কাঁথি ১৷৴০

মুন্সী তালীমদ্দীন সরকার রাজসাহি ... ১৸৴০
শ্রীযুক্তবাবু রাজমোহন রায় চৌধুরী টাকি ... ৩৸৴০
" শ্যামাচরণ সুর নাইনিতাল ... ৩৸৴০
বাঘনাপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সভা ... ২।৴০
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ময়মনসিংহ ৩৸৴০
" মহিমাচন্দ্র মিত্র দেথালি ৩৸৴০
" জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোয়াড়ী ... ২৸৴০
" সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এরোয়াল ... ৩৸৴০
" শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জোনবেঙ্গলু ... ৩৸৴০
" মহেন্দ্রনাথ মিত্র কৌন্তলি পাহাড় ... ৩৸৴০
রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় কলিকাতা ... ৩৸৴০
" জয়গোবিন্দ দত্ত যতনপুখরি ৩৸৴০
" মনোমোহন সরস্বতী রাজারামপুর ... ৩৸৴০
" কৈলাসচন্দ্র বকসি বগুড়া ৩৸৴০
" চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় রাণীগঞ্জ ... ৩৸৴০
" রূপনারায়ণ দত্ত ডাক্তার ধোপাডাঙ্গা ... ৩।৴০
" নবগোপাল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা .. ৩৸৴০
" অমৃতলাল মিত্র বেনারস ৩৸৴০
" নিমাইচরণ মজুমদার বেনারস ... ৩৸৴০
" কালীনাথ মজুমদার বেনারস ... ৩৸৴০
" পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেনারস ... ৩৸৴০
" জগবন্ধু সত্য হালসা ... ৩৸৴০

শ্রীযুক্তবাবু আনন্দনাথ রায় পাঁচবিবি ৩।৶৹
, ভরতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ময়মনসিংহ ... ৩।৶৹
, শশাঙ্কমোহন চক্রবর্ত্তী পারলিয়া ... ৩৶৹
, নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাধাউনি ... ৩।৶৹
, দুর্গাদাস চৌধুরী ভারেঙ্গা ৩
, বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী কুলিয়া ৩।৶৹
মুন্সি মহম্মদ তরিফুল্লা বোদা ৩।৶৹
, শিবনারায়ণ লাহোর ১।।৶১০
, বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ... ৩।/১০
, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত হারাউনি লক্ষ্ণৌ ... ৩।৶৹
, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ কাশীপুর ... ৩।৶৹
, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী বাঁকুড়া ৩।৶৹
, নীলমণি দেব এলাহাবাদ ১৸৶১০
, রাজ রাজেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা ... ১৸৶১০
, পূর্ণানন্দ শাহা কুমারখালি ৩।৶৹
, নীলমণি চট্টোপাধ্যায় বলরামপুর ... ৩।৶৹
, মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল ডায়মণ্ডহারবার ... ৩।৶৹
, রাজচন্দ্র দে কাজলা ৩৶৹
মেদিনীপুর নর্ম্মাল স্কুল ... ৩।৶৹
, যোগেশচন্দ্র নাগ বারদী ৩।৶৹
, সতীশচন্দ্র ঘোষ ঢাকা ... ৩।৶৹
, গোবিন্দনাথ মজুমদার কুরিগ্রাম ... ৩।৶৹
, গিরীশচন্দ্র গুপ্ত ছিলেট ৩।৶৹
, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া মোল্লারজোল ৩
, জানকীনাথ রায় চৌধুরী নপাড়া ... ৩।৶৹
, কালীপ্রসাদ ঘোষ হরিপাল ৩।৶৹

শ্রীযুক্তবাবু দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী রাধাবল্লভ ... ৩।৶৹
, প্রসন্নকুমার গুপ্ত শাহা মগুই-গ্রাম ... ৩।১০
, মহাভারত দাস আড়রা ৩।৶৹
, আনন্দবিহারী বসু কুচবেহার ... ৩।৶৹
, যশোদালাল রায় বালিয়াটি ৩।৶৹
, হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর ৩
, জগচ্চন্দ্র সরকার দিগ্দাইড় ৩।৶৹
, নবীনকৃষ্ণ সেন আলিপুর ৩।৶৹
, শিবকৃষ্ণ হালদার গোকনা ৩।৶৹
, চন্দ্রমাণিক্য সেন গোতাশিয়া ... ৩৶১০
, নবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী আলয়ার ৩।৶৹
, বিজয়কৃষ্ণ বসু কলিকাতা ৩।৶৹
, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় আরেঙ্গাবাদ ... ৩।৶৹
, বৈকুণ্ঠনাথ দাস বিষ্ণুপুর ৩।৶৹
, দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খলসিস্কুল ... ৩৶৹
, হীরালাল মিত্র কলিকাতা ৩।১০
, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীপাসা ... ৩।৶৹
, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ আকনা ৩
, হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী মালদা ৩।৶৹
, পূর্ণচন্দ্র সরকার কটক ৩।৶৹
, মথুরানাথ রায় সীদ্ধকাটী ৩।
, সাতকড়ি নন্দী লাহোর ৩।
, রাধামাধব বসু ছাপরা ৩।
, হরনাথ সান্যাল সেরপুর ৩।
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চন্দ্র রায় কলিকাতা ... ৩।৶৹
, রাশবেহারী রায় চৌধুরী বালিয়াটী ... ৩।৶৹
, কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় নওগাঁ বুন্দেলখণ্ড ... ৩।৶৹
, ভগবতীচরণ দে মন্নানপুর ৩।৶৹

শ্রীযুক্তবাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিলং ... ৩১
„ অভিমুক্তেশ্বর সিংহ তেজপুর আসাম ... ৩।৵০
„ বিজয়সিংহ নিয়োগী সাকরাইল ... ৩।৵০
„ মহীন্দ্রনারায়ণ সাহা দখিগঞ্জ ... ৩।৵০
„ হরিকিশোর রায় ময়মনসিংহ ... ৩।৵০
„ বামাচরণ বসু সুখ পুখরিয়া ৩।৵০
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ... ৩।৵০
„ অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ... ৩।৵০
„ বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী মোরহর বাঁকিপুর ... ।০
„ মধুসূদন রায় চৌধুরী কুন্তি সদ্যপুষ্করিণী ৩।৵০
„ গঙ্গাধর গোস্বামী দ্বারভাঙ্গা ৩।৵১০
হেডমাষ্টার সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল ... ২॥০
„ রসিকলাল দাস বাঁশবেড়ে ৩।৵০
„ বরদা কান্ত রায় কুমিল্লা ১১
„ প্রসন্ননাথ মিত্র নলডাঙ্গা ১।৵১০
„ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর ... ৩।৵০
„ সূর্য্যকুমার বসু মৌ ... ৩।৵০
„ রসিকলাল সিংহ কলিকাতা ৩।৵০
„ কেশবচন্দ্র বসু কাটদা ... ৩১
„ প্রসন্নকুমার আচার্য্য বার্ণারিগ্রাম ... ৩।৵০
„ মহিমা চন্দ্র ঘোষ রামপুর হাট ... ৩।৵০
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আলিগড় ... ৩৵০

শ্রীযুক্তবাবু হরকুমার মজুমদার গোরগরিবা ... ৩।৵০
„ ভুবনমোহন কুণ্ডু বাবুগঞ্জ ৩।৵০
রাজা সুরেন্দ্রদেব রায় বাঁসবেড়িয়া ৩১
শ্রীযুক্তবাবু রামচন্দ্র চৌধুরী আলিপুরকুচবেহার ... ৩।৵০
রেভারেণ্ট জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য মহানাদ ... ।১০
„ বিপিনবিহারী বসু এলাহাবাদ ... ৩।৵০
„ সুরেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ... ১॥০
„ যাদবকিশোর গোস্বামী খড়দহ ... ৩।৵০
„ গিরীশচন্দ্র সেন নব্যসমাজ বেগমগঞ্জ ... ৩।৵০
„ কালিদাস মুখোপাধ্যায় আখিরিগঞ্জ ... ৩।৵০
„ জয়দেব ঘোষ মোগুলাই ২১
„ জয়গোবিন্দ দাস পাল গিধোড় ... ৩।০
„ প্রসন্নকুমার রায় কলিকাতা ১৸০
„ বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ঐ ৩।৵০
„ মনোহর দাস ভুষভাণ্ডার ৩৵০
„ নবীনচন্দ্র রায় পটুয়াখালি ৩।৵০
শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শ্যামমোহিনী বেনারস ... ৩৵০

সন ১২৮৩ শালের মূল্য প্রাপ্তি।

„ রাধাসুন্দর সান্যাল ছাতিনগ্রাম ... ৸০
„ আনন্দনাথ রায় পাঁচবিবি ১১
মুন্সি মহম্মদ তরিকুল্লা বোদা ৩১
„ যোগেশচন্দ্র নাগ বারদী ১॥৵০
„ মধুসূদন রায় চৌধুরী কুন্তিসদ্য পুষ্করিণী ১॥৵০

ডাকের টিকেট আমাদিগকে এক আনা কমিসান দিয়া বিক্রয় করিতে হয়. অতএব ডাকের ষ্টাম্পে যাঁহারা মূল্য পাঠাইয়াছেন. তাঁহাদের প্রেরিত টাকায়,

হরিহর বাবু।

হরিহর বাবু বড়ই রাশ্‌ভারি লোক; কার সাধ্য যে তাঁর সম্মুখে মুখ তুলে কথা কয়? তাঁহার ভয়ে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই আপনাপন দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করে। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে কোথাও কুক্রিয়াসক্ত লোকদিগের প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই আছে অথচ সহসা কোন কথার উচ্চবাচ্য নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে কিছু পড়িলে দেখেও যেন দেখেন না। পথে চলিবার সময় বালকেরা খেলা করিতে করিতে অনাবিষ্টতাবশতঃ তাঁহার গতিরোধ করিলে একপার্শ্ব দিয়া যান, যেন টেরই পান নাই। বিচক্ষণও তেমনি; একটি কথা উপস্থিত হইলে তিনবৎসর পরে কি ঘটনা হইবে তাহা বলিয়া দিতে পারেন; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সমস্তই একবারে দেখিতে পান এবং তোমার মুখে দুচারিটি কথা শুনিয়াই তোমার মনের সকল কথা বুঝিয়া লন। যেমন ধার তেমনি ভার; লোকে তাঁহাকে এমনি মান্য করে যে, তাঁহার কথা যেন বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। তুমি তিন মাস বুঝাইয়া যাহার মনের দ্বিধা দূর করিতে পারিবে না, প্রস্তাবিত বিষয়ে হরিহর বাবুর অভিপ্রায় ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেই সে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে তদনুসারে কার্য্য করিবে।

কিন্তু হরিহর বাবু যাহার প্রতি বিমুখ হন, তাহার নিষ্কৃতি নাই। একবার শ্যামসুন্দর বসু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কোপে পড়িয়াছিল। শ্যামসুন্দর কিছু দিন তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িল, মোকদ্দামা মামলাতে বিব্রত, অনেকের নিকটেই ঋণগ্রস্ত; পরিশেষে এক ব্যক্তি তাহার নামে দস্তকের পেয়াদা বাহির করিল; পরদিন প্রাতে ৫০০ পাঁচশত টাকা দিতে না পারিলে পিয়াদা আসিয়া গ্রেপ্তার করিবে। সমস্ত দিন শ্যামসুন্দর লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কোথাও টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল না, অবশেষে রাত্রি একটার সময় হরিহর বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত; হরিহর বাবু তখন শয়ন করিয়াছেন, ভৃত্য এক জন সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্বারে আঘাত করিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "কে, রে, রামা?—শ্যামসুন্দর এসেছে বুঝি?" "আজ্ঞা হাঁ" অনন্তর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে দীপ লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই অন্ধকার ঘরে শ্যামসুন্দরকে আসিতে বলিয়া যে দ্বারে সে প্রবেশ করিবে সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিলেন।

শ্যামসুন্দর স্বভাবতঃ মনের যন্ত্রণায় নিতান্তই পীড়িত, তাহাতে অন্ধকার ঘরে আহূত হইয়া একবারে হতবুদ্ধি হইল। কিন্তু উপায় নাই। আত্মরক্ষার জন্য

চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। "রামে মারিলেও মরিব রাবণে মারিলেও মরিব। দস্তকের পিয়াদা রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে ইহা অপেক্ষা হরিহর বাবু যদি অস্ত্রাঘাত করেন এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় সেও ভাল।" হরিহর বাবুর সহিত এতকাল যে শত্রুতা করিয়াছিল সমস্তই মুহূর্ত্তেকমধ্যে তাহার স্মরণ হইল; এবং এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হরিহর বাবু যেমন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন সেই অবস্থায় বলিলেন "আমার সম্মুখে আসিস্ না; সব কথা বুঝেছি এই নে টাকা ধর্ আমার কাছে মুখ দেখাস্ না।" শ্যামসুন্দর এরূপ অনুগ্রহের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভাবিয়াছিল হরিহর বাবুর সহিত বিরোধ করাতেই এই বিপদ্ ঘটিয়াছে এবং তিনি কটাক্ষপাত করিলেই নিষ্কৃতি পাইব; কিন্তু টাকার তোড়া মাটীতে পড়িল সেই শব্দে অবাক্ হইয়া রহিল। হরিহর বাবু চলিয়া যান, তাঁহার পদশব্দে শ্যামসুন্দরের চৈতন্য হইল; তখন সে কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "আমার ঘাট হয়েছে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আপনার মত লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিছি; যা কল্লেন এতেতো আমি কেনা রইলুম কিন্তু বলুন যে আমার প্রতি প্রসন্ন হোলেন।" হরিহর বাবু পা ছাড়াইয়া দেয়ালের পার্শ্বে শ্যামসুন্দরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া থাকিলেন। শ্যামসুন্দর মেজেয় বসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তর কাকুতি মিনতি করিল, হরিহর বাবু চুপ করিয়া থাকিলেন; পরে শ্যামসুন্দর ক্ষান্ত হইলে বলিলেন, "তা হবে না, আমার স্মরণাপন্ন হলি, আমি তোকে রক্ষা কল্লুম কিন্তু তোর মুখ কখনই দেখ্‌ব না আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবার নয়।" এই বলিয়া অবিলম্বে চলিয়া গেলেন।

গল্পটি উপন্যাস মাত্র। কিন্তু শুনিলে অনেক বাঙ্গালির মনে এই হরিহরের নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেক [illegible]নে হইবে যে, অমুক এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা দূরদর্শী ছিলেন, অমুক তাঁহার ন্যায় সর্ব্বদর্শী। কেহ আশ্রিতের প্রতি দয়াতে বা শত্রুশাসনে তাঁহার অনুরূপ আর কেহ বা অনর্থক প্রতিজ্ঞাপালনে অথবা কেবল বাক্ সম্বরণে এতাদৃশ প্রকৃতির অনুকরণকারী। এইরূপ গুণ কতক কতক থাকিলে আমাদিগের সমাজস্থ লোক রাশভারি বলিয়া গণ্য হয় এবং "রাশ ভারি" প্রকৃতি প্রায় সকলেরই প্রশংসার স্থল।

বুদ্ধির অপরিপক্ক অবস্থাতে অনুচিকীর্ষা বৃত্তিই শিক্ষালাভের প্রধান উপায় কিন্তু সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিশ্লেষ করিতে না পারিলে বুদ্ধি কখনই পরিণত হয় না। ইহাই সমালোচনার মহোপকার। সমালোচনা ভ্রান্ত হইলেও সমালোচকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রোতৃ বা পাঠকবর্গ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হন, সুতরাং সমালোচিত বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার

না হইলেও শুদ্ধ বিচার কার্য্যের দ্বারাই বুদ্ধির বিশিষ্টরূপ চালনা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ যদি কেবল মনের মত কথা অন্বেষণ করেন তবে সমালোচনাতে কেবল মতভেদই বৃদ্ধি হয়।

হরিহর বাবুর সুখ্যাতি সকলেই করে, এই ভাবিয়া যদি লোকে কেবল তাঁহার অনুকরণ করিতেই চেষ্টা করে তবে তাহারা কিয়দংশে উন্নতিলাভ করিতে পারে বটে। বালকেরাও প্রথমতঃ এই প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া থাকে এবং পশুগণ ইহার অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু এতাদৃশ অনুকরণ সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হইবার নহে। যাহাদের তাদৃশ তেজ নাই, যাহারা তাঁহার ন্যায় ঠেকে নাই তাহারা কখনই হরিহর বাবুর প্রকৃতি পাইবে না। কিন্তু এমনও লোক আছে যাহাদিগের বুদ্ধি ও জীবনযাত্রা কথঞ্চিৎরূপে হরিহর বাবুর সদৃশ। তাহারা তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সর্ব্বতোভাবে মাঙ্গলিক? আদর্শের যদি দোষ থাকে এবং তাহা দোষ বলিয়া অনুভূত না হয় তবে অনুকরণ হইতে ক্রমশঃ কেবল দোষেরই বৃদ্ধি পায়। অতএব বিচারপূর্ব্বক অনুকরণ করা প্রয়োজন। হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে তদপেক্ষা নির্দ্দোষ পাত্র কাহাকে আদর্শ করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ কেন সম্পূর্ণ দোষাভাব অন্বেষণ করাই ভাল। কিন্তু মানব শরীরে এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত। অতএব লোকচরিত্রে কি হইলে দোষ হয় কি হইলে গুণ হয় তাহা বিশ্লেষ ক্রিয়ার দ্বারা স্থির করণান্তর একের অভাব অপরের পূর্ণতা অনুমান করিয়া লইতে হইবেক। আমরা লোকের দোষ গুণ বিচার কালে ব্যক্তিবিশেষের সহিত তুলনা করিয়া থাকি; ইহা নিষিদ্ধ। কেন না এরূপ তুলনা দ্বারা কেবল এই মীমাংসা হইতে পারে যে, অমুক আমার মনের মত লোক এবং অমুককে আমি দেখিতে পারি না। কিন্তু তোমার আমার প্রসন্নতাতেতো কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কাহার কি দোষ কাহার কি গুণ তাহাই স্থির করা আবশ্যক।

এতদ্দেশের লোকাচার মতে চপলতা নিন্দনীয় এবং গাম্ভীর্য্য প্রশংসার স্থল।— কেন এরূপ হইল?—একথা বলিলেই বিপাক। কেহ মনে করেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ।—কেহ বলেন চপলতা বালকস্বভাব; কিন্তু তাহাতেই দোষ কি? বালকেরা ক্ষুদ্র এবং অল্প বুদ্ধি; তবে বালক প্রকৃতির বৈপরীত্যই কি বুদ্ধিমত্তার আদি লক্ষণ?—কেহ বলিবেন মুনি ঋষিরা গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। ইহা লোকদৃষ্টান্তমাত্র; এক হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার জন্য যেন আর কতকগুলি হরিহর সংগৃহীত হইল। এ প্রণালীও অসিদ্ধ।—কেহ বলিবেন শাস্ত্রের বচন আছে। এবার হারিলাম। শাস্ত্র সমগ্র অতি বিজ্ঞলোকের আদেশ এবং সর্ব্বোতোভাবে আদরণীয় কিন্তু শাস্ত্রও বিচারাধীন। সমালোচক লেখক

অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও বিচারাধিকারী বটে।

আমরা বলি গাম্ভীর্য্য বিবেচনার সহচর, চপলতা বিবেচনার বিঘ্নকারী, এই জন্য গাম্ভীর্য্য প্রশংসনীয়। মনুষ্য, জন সমাজে থাকিয়া স্বতন্ত্র হইতে পারেন না; এইকারণে বিবেক ত্যাগের সাবকাশ নাই। যদি তোমার বিবেক না থাকে তবে যত লোক কোন প্রকারে তোমাতে আশ্রয় করিতেছে তাহারা সকলেই তোমার অবিবেচনার ফলভোগী হইবেক। যদি বিবেককে তুচ্ছ কর তবে এই সকল লোকের সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে; অর্থাৎ একদিক্ ভাঙ্গিয়া গেল, রাশির ভার খর্ব্ব হইল। আর সেই সমস্ত লোকের অবস্থা চিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার কর; অমনি চিন্তাস্রোত বৃদ্ধি হইবে; তোমার আপন কার্য্য লইয়া মনে মনে সকলের নিকটে জবাবদিহি করিতে হইবে। ফলতঃ যাহাকে মন হইতে ছাড়িবে তাহার ভার কমিয়া যাইবে; যাহার প্রতি মনে মনে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার ভার তোমার উপরে আসিয়া বর্ত্তিবে। "ধারে কাটে আর ভারে কাটে।" প্রবাদ বাক্যটী অপ্রকৃত নহে; অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনে এই অভিমান সূচক আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে যে, আমার কথা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হইলেও অমুক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির কথার "ভার" অপেক্ষাকৃত অধিক। এই ভার সহজে হয় না। লোকের ভার বহন করিতে হয় তবেই "ভারে কাটে।" এ ভার চিন্তার অঙ্গ, মনে মনে বহিতে হয়। চিন্তার আবির্ভাবে চপলতা দূরে যায়; বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, যুবা বার্দ্ধক্য লাভ করে এবং নারী পুরুষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মাত্রেই তরল স্বভাব। কেননা পুরুষেরাই স্ত্রীদিগের ভার বহন করেন। আবার এতদ্দেশের স্ত্রীজাতি অধিকতর তরলপ্রকৃতি;—স্বতন্ত্রতাতেও ইহারা অন্য দেশস্থ স্ত্রীলোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা মীমাংসা কিরূপ পদার্থ তাহা কখনই জানে না। বস্তুতঃ চিন্তা বা মীমাংসা করিবার ভারই পায় না। সুতরাং স্ত্রী লোকদিগের গাম্ভীর্য্য ও বিচারশক্তি উভয়ের কিছুই নাই। এবং চপলতাই তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কথা না কহিলেই যে গম্ভীর হয় এমন নহে। নতুবা বঙ্গীয় নববধূগণ গাম্ভীর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিদ্রা বিচার কার্য্যের অনন্যোপায়।

গাম্ভীর্য্য রাজলক্ষণ, কেন না রাজা প্রজার ভারবহন করেন। রাজা যত আপনার ভার বৃদ্ধি করেন, প্রজার ভার তত লঘু হইয়া যায়। এইজন্য সাধারণ তন্ত্রে প্রজাবর্গের এত গৌরব। রাজ্য পরাধীন হইলে প্রজাবর্গ রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইয়া তৎকারণে মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালিরা সাহেবদিগের তুলনায় আপনাদিগকে গম্ভীরপ্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। ইহা প্রকাণ্ড

ভুল। রাজনীতিঘটিত বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের মতামত নাই; কেবল অন্নবস্ত্র বা অন্যান্য স্বার্থ সম্বন্ধীয় চিন্তাতেই ইহাঁরা মগ্ন। গাম্ভীর্য্যও তদনুরূপ। রাজ্য পুড়িয়া ছার খার হইয়া যায় কিন্তু কেবল কৌপীনখণ্ড দগ্ধ হইবে সেই ভয়ে গবাক্ষের দিকে ধাবিত। ইংরাজ স্বার্থসাধনে অনেক সময়ে যথেচ্ছাচারী হইয়া চাপল্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন ভারপ্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি লোক সমবেত হয়েন তখন চপলতার লেশ থাকে না। বিরোধ থাকুক, বিসম্বাদ হউক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সকলেই একাগ্রচিত্ত, সকলেই চিন্তায় মগ্ন, সকলেই ভারাক্রান্ত। বাঙ্গালিরা পৃথগ্‌ভাবে বরং ভাল কিন্তু একত্রিত হইলে হয়, সঙ্কোচপ্রিয়, অথবা ভবিষ্যতে দোষস্পৃষ্ট হইবার শঙ্কাতে বিচলিত অথবা ভাঁর ত্যাগে অভিলাষী কিম্বা অন্যের বাসনা ও পরামর্শের প্রতি অমনোযোগী হন; নতুবা, অপরিণামদর্শী, বাচাল, কলহপ্রিয়, স্বার্থাভিলাষী এবং জেদে অভিভূত হইয়া পড়েন। এগুলি প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ বা প্রশংসার স্থল নহে। ফরাসি জাতি সভ্যতাতে ইংরাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষা করিতে অপেক্ষাকৃত অপটু। ইংরাজেরা বলেন ফরাসিরা চপলপ্রকৃতি; ফলতঃ তাঁহারা যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহকালে পরের বিবেচনা প্রণিধান করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন এ কথা আমাদিগেরও মনে হয়। তাঁহাদিগের আচরণ দেখিলে বোধ হয় সকলেই যেন আপনার মনের চিন্তাতেই উন্মত্ত আর কিছুর প্রতিই দৃক্‌পাত নাই। সুতরাং ঐক্যের সম্ভাবনা কি। ছোট মুখে বড় কথা বলিতে পাইলে বলা যায় যে, বাঙ্গালিরা এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ ফরাসি জাতির সদৃশ।

হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরকে মনে মনে মার্জ্জনা করিয়াও যে তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন না, এটি তাঁহার জেদ। প্রতিজ্ঞাপালন অতি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু তাহার নিমিত্ত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হওয়া উচিত নহে। শ্যামসুন্দরকে যদি মনে মনে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন তবে তাহার মুখ দেখিতে দোষ কি? যদি তখনও তাহার প্রতি আক্রোশ সম্পূর্ণরূপে না গিয়া থাকে, তথাচ ক্রোধশান্তির চেষ্টা করাই ভাল। প্রতিজ্ঞারক্ষা ভ্রমে সঞ্চিতক্রোধ প্রতিপালন করা সর্ব্বপ্রকারেই ক্ষতিজনক। জেদ স্বভাবতঃ গুণও নহে দোষও নহে। ইহাতে যেমন সৎকর্ম্ম তেমনি কুকর্ম্ম বৃদ্ধিরও ক্ষমতা জন্মে। যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় কার্য্যে জেদ করেন তিনিই প্রশংসনীয় কিন্তু কুকর্ম্মে জেদ অজ্ঞানকৃত হইলেও অন্ততঃ অনিন্দনীয় এইপর্য্যন্ত বলা যায়। কিন্তু তাহতেত ক্ষতির কিছুই লাঘব হয় না। তরবারি দ্বারা শত্রু মিত্র উভয়েই বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহাতে তরবারের কোন মহত্ত্ব দৃষ্ট হয় না। আওরঙ্গজেব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফিরোজ শা কোমল প্রকৃতি ছিলেন; লোকে আওরঙ্গজেবেরই প্রশংসা করে। আজি কালি

বিস্মার্কের নামে কজন বাহবা না দিয়া থাকিতে পারেন? এক সময়ে প্রথম নেপোলিয়ানও এইরূপে জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার প্রাধান্য কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে? তেজ দেখিলেই আমরা স্বভাবতঃ চমৎকৃত হইয়া থাকি। ইহা পতঙ্গপ্রকৃতি। রাশভারি লোকের জেদ কিছুই নয়; পরোপকারই তাঁহাদের মহত্ত্বের প্রকৃত লক্ষণ।

রাশভারি লোক কর্তৃত্ব ভালবাসে। সেই উদ্দেশ্যেই হউক বা চরিত্রগত গুণ হইতেই হউক পরোপকার করা ইহাঁদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ। আমরা যেমন দূরদর্শিতা ও সর্ব্বদর্শিতার অল্পতা হেতুক আপনাদিগের গাম্ভীর্য্যের স্থল সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছি, পরোপকার এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিষয়েও আমাদিগের দৃষ্টি ও প্রয়াস তদনুরূপ। জমীদার প্রজাগণের উপরে কর্তৃত্ব করিতে ভাল বাসেন। হাকিমেরা আমলা উকীল ও আহেলা মামলার উপর কর্তৃত্বাকাঙ্ক্ষা করেন। হেডমাষ্টার, হেডকেরাণী অধীন কর্ম্মচারিগণের উপর ধুমধাম করেন। এবং সংসর্গগুণে ভারতকলঙ্কিত ইংরাজ কালমুখ দেখিলেই কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছা করেন। এবং হরিহর বাবুর ন্যায় রাশভারি লোকেরা যাহার পরিচয় পান তাহাকেই আজ্ঞাবহ করিব মনে করেন। আজ্ঞা নানাবিধ। তন্মধ্যে শুভঙ্করের আজ্ঞাই সর্ব্বপ্রধান। এতাদৃশ আজ্ঞা দানেচ্ছা বড় একটা দেখা যায় না।

যেমন লক্ষ্মীর অনেক প্রকার বরযাত্রী থাকে, উন্নতির পক্ষে কৃত্রিমতাও সেইরূপ একটি সহচর। উন্নতির সৌন্দর্য্য আছে। যেমন কদাকার ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের গুণে মোহিত হইয়া কৃত্রিম রূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। তেমনি সভ্য সমাজে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পরের নিকট চিত্ত-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য কৃত্রিম দয়া অভ্যাস করে। এই কৃত্রিমতা লোকের ক্ষতিজনক না হইলে, শুদ্ধ ইহার স্বার্থপরতার জন্য কেহ বড় বিরক্ত হয় না। রাশভারি লোকেরা আপনাদিগের মনোগত ভাব পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলেও এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে; লোকের প্রতি আন্তরিক দয়া থাকুক বা না থাকুক দয়ার মাহাত্ম্য জানিয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। প্রশংসাকাঙ্ক্ষীরাও ঠিক্ এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে একজন প্রশংসা এবং আর একজন কর্তৃত্ব অভিলাষ করে। আর আশাভঙ্গ হইলে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাভিলাষী স্ত্রীলোকের ন্যায় অভিমান করে ও কর্তৃত্বাভিলাষী বৈরনির্যাতনে সচেষ্ট হয়। অভিমান, যে মনে করে তাহারই পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, অন্যের পক্ষে উপহাসস্থল। বৈরনির্যাতন অপেক্ষাকৃত গুরুতর দোষ। কিন্তু কর্তৃত্বাভিলাষী এবং রাশভারি লোকেরই সম্মান সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পুরুষের চক্ষে অভিমান অপেক্ষা বৈরনির্যাতনই ভাল লাগে। কর্তৃত্বাভিলাষ এবং প্রশংসাভি-

লাষ উভয়ই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রথমটি বাহুল্য পরিমাণে স্বার্থপর; অনেকে এই কথার স্মৃতি অভাবে পৌরুষ বলিয়া ইহার গৌরব করেন। রাশভারি লোকের দয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় নহে। কেন না স্বার্থপর হইলেও ইহা অনেকস্থলে বিশুদ্ধরূপে পরের হিতজনক হয়। লোকে এই স্থূল কথাটি বিলক্ষণ বুঝিয়াছে এবং তৎকারণে রাশভারি লোকের আজ্ঞাপালন করিয়া থাকে। নতুবা কর্ত্তৃত্বাভিলাষিগণের উদ্দেশ্য দেখিয়া যদি সকলেই তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইত তাহা হইলে এই শ্রেণীস্থ লোকের জীবন ও কার্য্যক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ব্যর্থ হইত এবং আজি পর্য্যন্ত জগতের যত উন্নতি হইয়াছে তাহার অনেকাংশ অনায়ত্ত হইয়া থাকিত। ফলতঃ রাশভারি লোকেরা যে সকল মঙ্গল ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন তজ্জন্য উপকৃত ব্যক্তিদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিলাষীদিগের চরিত্র অনুকরণ করা উচিত নহে।

যেমন কর্ত্তৃত্বাভিলাষের প্রকাশ্য ফল মাঙ্গলিক হইলেও উৎপত্তি নিন্দনীয়, আজ্ঞাবহন প্রকৃতির আদি এবং অন্তও তদনুরূপ। আজ্ঞাবহন অজ্ঞতা এবং তেজক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞতার অনেক দোষ এবং তেজকে যত্নপূর্ব্বক সৎপথে পরিবর্দ্ধিত করাই আবশ্যক। কর্ত্তৃত্বাভিলাষীরা যেমন ছাগলের নিকটে শার্দ্দূলের ন্যায় আচরণ করে তেমনি সিংহের সমীপে শৃগালবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম বাঙ্গালি জাতিতে প্রকৃষ্ট রূপে লক্ষিত হয়। আমাদিগের জ্ঞান ও দৃষ্টি যেমন, উচ্চাভিলাষও তদ্রূপ। উভয়ই "বিঘত প্রমাণ।" যে উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যাস শিবের সমতুল্য হইতে প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহাকে আমরা বামনের চন্দ্রস্পর্শ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বলিয়া উপহাস, বা উপেক্ষা করিয়া থাকি এবং যে প্রতিজ্ঞার প্রভাবে পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের যুদ্ধবিদ্যাবৃদ্ধির প্রতীক্ষাতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার প্রতি আমরা মনোযোগ করি না কিন্তু ভীম যে বীভৎসের একশেষ করিয়া দুঃশাসনের রক্তপান করেন তাহাই আমাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত হইয়াছে। এই সংস্কার প্রযুক্তই হরিহর বাবু শ্যামসুন্দরের মুখ দেখিব না স্থির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালিরা তর্কের বলে শ্বেতবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে, বিচারকের চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপ করিতে পারিলে এবং মনিবকে আপন মতে ঘুরাইতে পারিলে উচ্চাভিলাষ সর্ব্বোতোভাবে চরিতার্থ হইল বলিয়া বোধ করেন। এইরূপ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সৎপ্রকৃতি ব্যক্তিরাও জ্ঞানপূর্ব্বক কুতর্ক করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না; এবং অনেকে মিথ্যাকথন পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহাদিগের প্রসন্নতা ব্যতীত কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহাদিগের সমীপে

এইরূপ আচরণ আর যাহাদিগের প্রতি ভয় মৈত্র উভয়ই প্রদর্শিত হইতে পারে সেখানে কাল্পনিক ব্যবহার। ইহাই কর্ত্তৃত্বাভিলাষী বাঙ্গালির বীজমন্ত্র। ইহারা সময়েং অন্তরাত্মার নিকট সহস্র ধিক্কার সহ্য করিয়াও হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের তোষামোদে প্রবৃত্ত হন! এই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বের পরাকাষ্ঠা। ফলতঃ যে কর্ত্তৃত্বে আপনার নিকটেই নতশির হইয়া থাকিতে হয় তাহার গৌরব কি?

রাশভারি লোকের গুণএই যে পরের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন; চাপল্য বশতঃ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করেন না। ইঁহারা বহুলোকের ভারবহন করেন। তাঁহাদিগের মনে যাহাই থাকুক কার্য্যে অনেকের হিতসাধন হয়। ভারবহনের মর্ম্ম—জবাবদিহি। যেসকল বিষয়ের ভার বহন করিতে হয় তাহার জবাবদিহি করা আবশ্যক। জবাবদিহি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের নিকটেই করিতে হয় এমত নহে। আপনার মনের জবাব দিহি করার ন্যায় কঠিন কার্য্য নাই। জবাব দিহি প্রকৃত ভারিত্বের লক্ষণ কিন্তু সকল রাশভারি লোক যথাযোগ্য মতে জবাব দিহি করেন না। অনেকে কেবল কর্ত্তৃত্বাভিলাষী, স্বার্থপর এবং অতিশয় জেদপ্রিয়, তাঁহারা ইষ্টলাভের জন্য সকল কুকর্ম্মই করিতে পারেন। এতদ্দেশে রাশ ভারি লোকের দোষগুণের বিষয় প্রকৃত বিচার হয়না বলিয়াই তাঁহাদিগের এত সম্মান আর আড়ম্বর।

সাহসাঙ্ক চরিত।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবন বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি সাহসাঙ্ক চরিত ও শেষোক্ত খানি নব সাহসাঙ্ক চরিত নামে খ্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক চরিত রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে কিন্তু বিশ্ব প্রকাশ নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষকারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে ১০৩৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইলসন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্বকোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি। কেহং গাধিপুর গাজি

পুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির "নানার্থভাগ" বিশ্বকোষ হইতে সঙ্কলিত কিন্তু এ কথার আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন বৃত্ত সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থ প্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল॥

যথা

শ্রীসাহসাঙ্ক নৃপতেরনবদ্য বিদ্য বৈদ্যা-
ন্তরঙ্গ পদপদ্ধতিমেব বিভ্রৎ।
যশ্চংই চারু চরিতো হরিচন্দ্র নামাস্য
ব্যাখ্যয়া চরকতন্ত্র মলং চকার (৫)
আসীদসীম বসুধাধিপ বন্দনীয় স্তস্যান্বয়ে
সকল বৈদ্যকুলাবতংসঃ।
শক্রস্য দস্র ইব গাধিপুরাধিপস্য শ্রীকৃষ্ণ
ইত্য মল কীর্ত্তি-লতা-বিতানঃ (৬)
সংকল্প সংমিলদনল্প বিকল্প জল্প কল্পানলা-
কুলিত বাদিসহস্র সিন্ধুঃ।
তর্কত্রয় ত্রিনয়ন গণয়ন্তদীয়ো দামোদরঃ
সমভবদ্ভিষজাং বরেণ্যঃ (৭)
তস্মা ভবৎসূনুরুদারবাচো বাচস্পতিঃ
শ্রীললনা বিলাসী। সদ্বৈদ্য বিদ্যানলিনী
দিনেশঃ কৃষ্ণস্ততঃ
সৎকুমুদাকরেন্দুঃ।৮।
যদ্ভ্রাতৃজঃ সকল বৈদ্যকতন্ত্র রত্ন রত্নাকর
শ্রীরমবাপ্যচ কেশবোভূৎ।
কীর্ত্তিনির্কেতন মনিন্দ্যপদ প্রমাণ বাক্য
প্রপঞ্চ রচনা চতুরানন শ্রী।৯।
কৃষ্ণস্য তস্যচ সুতঃ স্মিতপুণ্ডরীকদণ্ডাতপ
ত্রপ ভাগযশঃ পতাকঃ।
শ্রীব্রহ্মাইত্ব বিকল্পাত্মমুখারবিন্দ সোল্লাস
ভাসিত রসার্দ্র সরস্বতীকঃ।১০।
তস্যাত্মজঃ সরস কৈরবকান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীমন্মহেশ্বর ইতি প্রথিতঃ কবীন্দ্রঃ।
অশেষ বাঙ্ময় মহার্ণব পার দৃশ্বাশব্দা-
গমাম্বুরুহষণ্ড রবির্বভূব।১১।
যঃ সাহসাঙ্ক চরিতাদি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণ
নৈপুণ্য [illegible] পৌরবশ্রীঃ।
যো বৈদ্যকত্রয় সরোজ সরোজবন্ধু বন্ধুঃ
সতাং চ কবি কৈরব কাননেন্দুঃ।১২।
সেয়ং কৃতিস্তস্য মহেশ্বরস্য বৈদগ্ধসিন্ধোঃ
পুরুষোত্তমানাং।
দেদীপ্যতাং হৃৎকমলেষু নিত্য সাকল্প
সাকল্পিত কৌস্তুভশ্রীঃ।১৩।
লব্ধেঃ কথঞ্চিদভিজাত সুবর্ণকারলীঢ়েন
কোষ শত বারিধি শব্দবত্নৈঃ।
বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বন্ধু শোভাং
বিভ্রন্ময়াত্র ঘটিতো মুখখণ্ড এষঃ।১৪
ফণীশ্বরোদীরিত শব্দকোষরত্নাকরা-
লোড়ন লালিতানাং।
সেব্যঃ কথং নৈষ সুবর্ণ শৈলো বিশ্ব
প্রকাশো বিবুধাধিপানাং।১৫।
ভোগীন্দ্র কাত্যায়ন সাহসাঙ্ক বাচস্পতি
ব্যাড়িপুরঃ সরাণাম্।

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

সবিশ্বরূপামর মঙ্গলানাং শুভাঙ্ক বোপ্পা-
লিত ভাণ্ডরীণাং।১৬।
কোষাবকাশ প্রকট প্রভাবসংভাবিতা-
নর্ঘগুণঃ স এষঃ।
সংপাদয়ন্তে স্যাতি বাঞ্ছিতার্থান্ কথং
ন চিন্তামণিতাং কবীনাং।১৭।
আমিত্র শৈল চরমাচল মেখলাদ্রি
কৈলাস ভূমিবয়াদয়দিহাস্তিকিঞ্চিৎ।
একত্র সংভূত মগোবরশব্দ রত্ন মালো-
ক্যতাং তদখিলং সুধিয়ঃ কবীন্দ্রাঃ-
১৮। ইত্যাদি

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্ব্যাখ্যা দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বসুধাপতিমান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনীকুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তি সমুদ্ভূত বহুবিধ জল্প রূপ অনলে বাদীরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল। এবং ত্রিবিধ তর্ক শাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন।[৭]। ইহাঁর পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী বিলাসী ছিলেন এবং বৈদ্য বিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবার্কর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন। [৮] ইহাঁর ভ্রাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা বিষয়ে সুচতুর ছিলেন। [৯] তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। [১০] এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ। বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [১১] ইনি সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি মহা প্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণ গৌরবে শ্রী সম্পন্ন, বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত। [১২] এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তভ ধারণের শোভালাভ করুক। [১৩] [১৪] ফণিপতি কর্তৃক উদীরিত শব্দকোষ সমুদ্র আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই সুবর্ণ সুমেরুতুল্য বিশ্বপ্রকাশ সমাদৃত হইবে? [১৫]।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক,* বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ,

* সাহসাঙ্ক কৃত শব্দ গ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দ শাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে

অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং আদি প্রভৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হইবে? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুর) সেবা করেননা? —ইত্যাদি ইত্যাদি—(১৬) [১৭] [১৮]

আদিপুরুষ
হরিচন্দ্র
|
শ্রীকৃষ্ণ
|
দামোদর
|
বাচস্পতি
|
কৃষ্ণ — (অনির্দ্দিষ্ট নামা)
| |
শ্রীব্রহ্ম — কেশব
|
মহেশ্বর

অপিচ, রায় মুকুট মণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকর তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী—

হারাবল্যভিধাং ত্রিকাণ্ড শেষঞ্চ রত্ন
মালঞ্চ।
অপি বহু দোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ
সুবিচার্য্য। ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ সুরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক চরিত রচনার পরে নৈষধ কর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্ক চরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে রাজ শেখরের প্রবন্ধ চিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষ দেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎ-শার্দ্দূল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজ শেখর সুরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষ বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোল্‌কার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে "নব" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে তিনি নূতন রাজা সাহসাঙ্কের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ এজন্য ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত যথা—

দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্ক চরিতে চম্পূ-
কৃতোঽয়ং মহাকাব্যে
তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে
সর্গোনিসর্গোজ্জ্বলঃ।

"ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নবো যঃ সাহসাঙ্ক নাম রাজা তস্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং

গদ্য পদ্য ময়ীং কথাং করোতীতিকৃৎ তস্য বিনির্ম্মিত

বতঃ সোপি গ্রন্থো তেন কৃত ইতিসূচ্যতে।

অর্থাৎ—

যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পূ অর্থাৎ গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্তৃক সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্ক চরিত গ্রন্থও তাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতির চরিত্র বর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ ইহার নাম নব সাহসাঙ্ক চরিত রাখিয়াছেন।

শ্রীরামদাস সেন।

ক্লিওপেট্রা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

"এক দিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি—
মদালসে! শ্লথ দেহ, নিশি জাগরণে
অবশ পড়িয়া আছি কোমল 'ছোফায়।'
কখন পড়িতে ছিনু; কভু অন্য মনে
গাইতেছিলাম গীত গুণ্ গুণ্ স্বরে,—
প্রেম ময়,—নব রাগে, নব অনুরাগে,
নিরখি অসাবধানে শায়িত শরীর,
প্রতিকূল দেয়ালের দীর্ঘ-আরসীতে।
শিথিল হৃদয় যন্ত্রে, বালা চারমিয়ন!
মধুরে বাজিতেছিল আনন্দ সঙ্গীত;
আবার অজ্ঞাতে সখি! না জানি কেমনে
বিষাদ ভাঙ্গিতেছিল সে লয় মধুর।
কখন হাসিতেছিনু,—না জানি কারণ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হঠাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে।
একটি মানব ছায়া, এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি! কক্ষ গালিচায়;
পলকে ফিরাতে নেত্র, দেখিলাম কক্ষে
প্রাণেশ আমার। কিন্তু সেই মূর্ত্তি!—যেই
মূর্ত্তি, অন্য দিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাসিত প্রেমানন্দ, ললাটে, নয়নে;
হাসি রূপে সমুজ্জ্বল করিত অধীর;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—'কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ(১) চারু ফণিনী আমার?'
সেই মূর্ত্তি—আজি দেখি গাম্ভীর্য্য আঁধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—'ক্লিওপেট্রা! এই
দুঃসময় যোজিতেছে জলধর রূপে,
চারিদিকে এণ্টনির অদৃষ্ট আকাশ;
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,

(১) নীলজ—নীলনদী জাত।

হইবে অসাধ্য পরে। রোম হতে আজি
কুসম্বাদ;—আন্তরিক বিগ্রহ কৃপাণে
'ইতালি' কণ্টকাকীর্ণ! কৃপাণ-ফলকে
প্রতিবিম্বে রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এণ্টনির বিলাস জীবন।
প্রেয়সি! বিদায় তবে কিছু দিন তরে
দেও যাই; কটাক্ষে সে কৃপাণ সকল
ছিন্ন শস্য রাশি মত, আসি শোয়াইয়া
আমি ডুবাইয়া নেত্র নিমিষে, পম্পির
জল যুদ্ধ সাধ, সেই সমুদ্রের জলে,—
পিতার অন্তিম শয্যা প্রদানি পুত্রেরে।
দেও অনুমতি তবে। ঈর্ষার অনল
জ্বলে থাকে যদি তব রমণী হৃদয়ে,
নিবাও তাহারে, শুন দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে ফুলভিয়া আমা—'

মরেছে!—
'ফুলভিয়া।'

কি মরেছে ফুলভিয়া! "হাঁ মরেছে ফুলভিয়া।'
দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ
যেই পলে, সেই পলে, 'মরেছে ফুলভিয়া—"
এ সংবাদে, চারমিয়ন! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তা হার নাথ! পরাইয়া গলে,
বলিলেন,—'এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে!
ইতালির রণজয় করিতে প্রচার,
তত রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার
কল্যাণি! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জ্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেয়সি! বিদায় দেও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে;
বিস্ময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা,—'

"ধরিয়া গলায়,
উন্মত্তার প্রায় সখি! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—'নাথ! নাহি চাহি আমি
রাজ্য ধন, মুহূর্ত্তের ভালবাসা তব,
শত শত রাজ্যে কিম্বা সমস্ত ধরায়,
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা। পৃথিবী কি ছার!
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ! তোমার
প্রণয় রাজ্যের রাণী যেই সুভাগিনী।'
কত কাঁদিলাম, সখি! কত বলিলাম,
কত শুনিলাম, কিন্তু বিফল সকল;—
রণে মত্ত কেশরীরে, কেমনে সজনি!
রমণী বীতংসে বল, রাখিবে বাঁধিয়া?
ফুটিল অধরে উষ্ণ কোমল চুম্বন
বিদ্যুতের মত,—সখি! নাহি জানি আর।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখি—
(হায়! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত)—আরম্ভিল,—"পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দেখিলাম
চাহি আকাশের পানে—রবি, শশী, তারা;
ধরাতল মরুভূমি; নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দবহ হায়!
নিঃশব্দ আমার কাণে। কেবল সজনি!
দেখিলাম কি আকাশ, কিবা ধরাতল
এণ্টনিতে পরিপূর্ণ! শুধু সমীরণ
বহিছে এণ্টনি স্বর! দেখিতে, শুনিতে,
কিম্বা ভাবিতে,—এণ্টনি! ক্লিওপেট্রা কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে—এণ্টনি কেবল?
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—

সকলি—এণ্টনি! সখি! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা
কণা—একটি এণ্টনি! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গণিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভুজঙ্গ সম কাল বিষধর
দাঁড়াইয়া এক স্থানে, হতো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমারে যেন অনন্ত ফণায়।
প্রভাতে উঠিলে রবি, ভাবিতাম মনে,
জিনিতে মিশর ওই আসিছে এণ্টনি,
রণবেশে! রবি অস্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেল রোমে।
হাসিমুখে শশধর ভাসিতে গগনে
ভাবিতাম আসিতেছে এণ্টনি আবার,
প্রণয় পীযূষে হায়! যুড়াতে আমায়।
অস্ত গেলে নিশানাথ, প্রাণনাথ গেল
ছাড়ি ভাবিতাম মনে।"

"এইরূপে সখি!
গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিম্বা দিন, মাস,
নাহি জানি। একদিন তাপিত হৃদয়
যুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল কৌচ অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেই দিন দূত মুখে, নব পরিণয়
এণ্টনির নারী-রত্ন অগস্তার(১) সনে
শুনিয়াছিলাম;—তরুভ্রষ্ট হায়! যেই
বিশুষ্ক বল্লরী, কেন, রে দারুণ বিধি!
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে!
শুয়েছি; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ
প্রসারিত,—নাক্ষত্রিক চারু রঙ্গভূমি!
মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া হাসিয়া,
রূপের গৌরবে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া
করিতেছে অভিনয়। নক্ষত্র সকল
নীরবে, অচলভাবে করিছে দর্শন
সেই সুশীতল রূপ। কেহ বা আনন্দে
জ্বলিতেছে; অভিমানে নিবিতেছে কেহ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূতবৃন্দ উন্মত্তের প্রায়
আলিঙ্গিতে সেইরূপ; উথলিছে সিন্ধু;
রূপ মুগ্ধ—অধিক কি ঘুরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের! সময়ের তামস গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অঙ্কে অঙ্কে দেখিলাম
বিগত জীবন। কভু ভাবিলাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরেন্দ্র সকল,
নক্ষত্র মানব চয়; আমি শশধর,—
সিন্ধু বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিলাম আমি চন্দ্র, ধরণী এণ্টনি।
ভাবিতেছিলাম পুন, এই চন্দ্রালোকে
নব-প্রণয়িনী পাশে, নব অনুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলেছে কি ক্লিওপেট্রা? ভাবিছে কি মনে—
"কোথায় নীলজ চারু ফণিনী আমার?
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ? কিম্বা অগস্তার
নবীন প্রণয় রাজ্যে এবে এণ্টনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয়?
করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্ব্বাসিত?—
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চারমিয়ন!
জ্বলিয়া উঠিল তীব্র ঈর্ষার অনল
রমণী হৃদয়ে, যেন বিশুষ্ক কাননে

(১) অগস্তা—এণ্টনির দ্বিতীয় পত্নী।

অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
রমণীর অভিমানে রমণীহৃদয়
ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে,
আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তিচয়
হলো খড়্গ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে!
সুষুপ্ত ভুজঙ্গ যেন, দুষ্ট প্রহারীকে,
বিস্তারিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে।
'কি! মিশরের ঈশ্বরী!—টলেমি দুহিতা!
ক্লিওপেট্রা আমি!—রূপ বিশ্ববিমোহিনী!
যে রূপের তেজে সেই ভুবন বিজয়ী
সিজারের তরবারি পড়িল খসিয়া!
সামান্য গুঞ্জিকা তরে, সেরূপ রতন
এণ্টনি ঠেলিল পায়ে!—তীরের মতন
বসিনু শয্যায়; কিন্তু দুর্ব্বল শরীর
দুরূহ যন্ত্রণা, চিন্তা, সহিতে না পারি,
ভুজঙ্গে দংশিত যেন পড়িল ঢলিয়া
শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন
বহিল শীতল নীল-নীরজ অনিল;
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
অর্দ্ধ নিদ্রা, অর্দ্ধ মূর্চ্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।"
"দেখিনু স্বপন! সখি! কি যে দেখিলাম
এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।
দেখিনু শার্দ্দূল এক—ভীষণ আকৃতি!
নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
বিস্তারিয়া মুখ। ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি
চাহিনু আকাশ পানে। দেখিলাম সখি!
অপূর্ব্ব তপন এবে উদিত গগনে
উজ্জ্বলিয়া দশ দিক্ করে আকর্ষিয়া
সেই মার্ত্তণ্ড আমারে তুলিল আকাশে;
সখি! আমি-শোভিলাম শশধর রূপে
বামে সবিতার। হায়! এমন সময়ে
অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
হইয়া আশ্রয় হীনা আমি অভাগিনী
পড়িতেছিলাম বেগে, অর্দ্ধ পথে সখি!
বীর-সূর্য্য অন্য জন হৃদয় পাতিয়া
লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া
পরাইনু প্রেম হার গলায় তাহার,
কিন্তু কি কুক্ষণে হায়! বলিতে না পারি!
সে হার পরশে বীর হৃদয় তাহার,
—ফাটিত যে উরস্ত্রাণ রণ রঙ্গে মাতি,—
হইল বিলাসে যেন নারী সুকুমার!
শারসন হতে অসি পড়িল খসিয়া,
—অরাতি মস্তকে ভিন্ন নামে নাহি যাহা,—
কুসুম শয্যায়! শেষে মাথার মুকুট
পড়িল খসিয়া ওই ভূমধ্য সাগরে,
অস্তগামী রবি যেন! কি বলিব আর,
যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কৃপাণ
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যেন প্রচণ্ড শিলায়
স্ফটিকের দণ্ড, কিম্বা মত্ত গজ দন্ত
হায় রে! যেমতি চন্দ্র-পর্ব্বত প্রস্তরে;
মম প্রেম হার তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত,
সেই বক্ষে প্রিয় সখি! পশিল আমূল!
তখন সে হার ধরি ভুজঙ্গের বেশ
ছুটিল পশ্চাতে মম। সভয়ে তখন
ডাকিতেছি—'কোথা নাথ! এমন সময়ে,
কোথা নাথ!—'
'প্রিয়ে! এই চরণে তোমার।—'
যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণে,
সে সঙ্গীত ক্লিওপেট্রা শুনিবে না আর।
ভাঙ্গিল স্বপন সখি, ফুটিল চুম্বন

বিশুষ্ক অধরে মম; মেলিয়া নয়ন
দেখিলাম প্রাণনাথ! হৃদয়ে আমার!
অভিমানে বলিলাম—'সে কি নাথ! ছাড়ি
রোম রাজ্য, ছাড়ি নব প্রণয়িনী, কেন
এখানে আপনি? কিম্বা এ আপনি নন;
এই ছায়া আপনার, আসিয়াছে বুঝি
বিরহ আতপ তাপে যুড়াতে আমায়।—'
'নিমজ্জিত হক্ রোম টাইবরের জলে,
রাজ্য; প্রণয়িনী সহ, এই রাজ্য মম,—'
(বলিলা হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার,)
'প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা—ইহ জীবনের
সুখ এই,—' পুনঃ নাথ চুম্বিলা অধর;
'জীবন তোমার প্রেম, বিরহ মরণ।'"
"দূরে গেল অভিমান; রমণীর প্রেম
স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
বলিলাম—'সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র-রাজ্য তব? অনন্ত জলধি
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ!
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়া সাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের?
প্রণয় বারিদ তুমি! তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
যোগাবে অনন্ত বারি, এই প্রেমাধিনী।'"
"মৈশরী হৃদয়াকাশে প্রণয়ের সখি
প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে আমোদ জোয়ার।
কত রাজ্য সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
ক্লিওপেট্রা পদতলে বলিব কেমনে।
সমস্ত পূরব রাজ্য মিলি এক তানে,
'পূরব রাজ্যের রাণী, মিশর ঈশ্বরী!—'
গাইল আনন্দ স্বরে। হায়! সেই ধ্বনি
জাগাইল সুপ্ত সিংহ—কনিষ্ঠ সিজার—(১)
কুক্ষণে; কুগ্রহ সখি হইল তখন
ক্লিওপেট্রা, এণ্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
শুনিনু গর্জ্জন তার সহস্র কামানে,
মিশরে বসিয়া সখি, ছুটিল হর্য্যক্ষ
অসংখ্য অর্ণব পোতে, গ্রাসিতে মিশরে,
শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য সাগর,
সহোদরা অপমান প্রতি বিধানিতে।(২)
নির্ভয় হৃদয়ে সখি! সাজিল এণ্টনি,
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
বলিলা আমারে নাথ! হাসিয়া হাসিয়া
'মিশরে বসিয়া প্রিয়ে! দেখ মুহূর্ত্তেকে
বালকের ক্রীড়া সাধ আসি মিটাইয়া।'
ধৈর্য্য না মানিল মনে; ভাবিলাম যদি
পাপিষ্ঠা সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
লয়ে যায় এ কৌশলে। বলিলাম—'নাথ!
বহু দিন সাধ মম করিতে দর্শন
অর্ণব আহব, প্রভু পূরাও সে সাধ;
তুমি যদি না পূরাবে, কে পূরাবে আর
বীরেন্দ্র!—'হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
'সাজ তবে, বীরেন্দ্রাণি! বালকের রণে
মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথী এণ্টনি!'
আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
আমাকে, সজনি! সুখে সাজাইতে হায়!
কত যে কি সুখ নাথ দেখিলা নয়নে,
চুম্বিলা অধরে, সখি! পরশিলা করে,
বলিব কেমনে? অঙ্গে অঙ্গে বিরাজিয়া

(১) কনিষ্ঠসিজার—Augustus Cæsar.
(২) অগস্তা—অগস্তস সিজারের কনিষ্ঠা ছিলেন।

স্ফুট নলিনীর, অলির কি সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে ? আমি আপনি সজনি !
বীরবেশে প্রেমাবেশে হইনু বিভোর।
ফুরাইলে বেশ, নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া করে চারু কুসুমের হার,
বলিলা—'কিকাজ প্রিয়ে! অস্ত্রেতে তোমার,
বিনা রণে, এই অস্ত্রে,জিনিবে সংসার।''

"অসংখ্য অর্ণব যান, সৈন্য অস্ত্র ভরে
প্রায় নিমজ্জিত কায়, বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে,
বিক্রমে ফেনিয়া সিন্ধু, চলিল সাঁতারি
যেন প্রমত্ত বারণ। চলিলাম আমি
নির্ভয়ে, কেশরী যেই হরিণীরে সখি !
দিয়াছে অভয়, তার কি ভয় জগতে ?
বীর প্রণয়িনী আমি, বীরের সঙ্গিনী,
ডরিব কাহারে ? কিন্তু অবলা মনের
না জানি কি গতি ; যত আশ্বাসিয়া মন
করি ভাসমান, তত ভাবি আশঙ্কায়
হইতেছে ভারি। তত কাল রঙ্গে, মম
চকিত কল্পনা হায়! অজ্ঞাতে কেমনে
চিত্রিতেছে ভবিষ্যৎ। যদিও না জানি,—
পর চিত্ত অন্ধকার !—বুঝিনু তথাপি
ভাবি অমঙ্গল ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এণ্টনির। লুকাইতে সে করাল ছায়া
রমণীর কাছে, নাথ ! হয়েছে মগন
সঙ্গীতে, সুরায়,—"

"দ্রুত ভাঙ্গিল স্বপন,
সর্ব্বনাশ !!—এ কি দেখি সম্মুখে আমার!
অসীম বারিদ পুঞ্জ, ভীম কলেবর !—
পড়েছে খসিয়া ও কি জলধি হৃদয়ে ?
খেলিছে বিদ্যুৎ ও কি জীমূত ঘর্ষণে ?
ও কি শব্দ ভয়ঙ্কর ?—জীমূত গর্জ্জন ?
সকলই ভ্রম !—সখি! শুকাইল মুখ,
বিপক্ষ তরণী ব্যূহ সজ্জিত সমরে !
বিদ্যুৎ,—কামান অগ্নি ; দুর্জ্জয় কামান
মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিছে ভীষণ !
সেই দৃশ্য—নেত্রে কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর !—
দেখিলাম চারমিয়ন ! বলিব কেমনে
কামিনী কোমল কণ্ঠে ? শুনিবে তোমরা
নারী কোমল হৃদয়ে ? দেখে থাক যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে প্রাবৃট্ অম্ভোদ
আঘাতিতে পরস্পরে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল ; বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তরী ব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্ত্তেকে ধূমপুঞ্জে ঢাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশ দিশ ; কিন্তু না পারিল
সংহারক রণমূর্ত্তি লুকাতে আঁধারে।
সেই অন্ধকারে সখি অঙ্গ মিশাইয়া
তরীর উপরে তরী ঝাঁপ দিল রোষে।
গর্জ্জিল কামান,—ঝাঁপ দিল শত সূর্য্য
ফেনিল সাগরে, তরী বৃন্দ বিদারিয়া
নিমজ্জিয়া জলে, নর রক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায় ! সখি! তুচ্ছ নর,
আপনি জলধি,—সেই ভীষণ নির্ঘাত,
তীব্র অনল বর্ষণ, না পারি সহিতে,
করিতেছে ছটফট উত্তাল তরঙ্গে,
ফেনিয়া ফেনিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া
পড়িতেছে আছাড়িয়া কূলের উপরে।
তরণীর প্রতিঘাত কামান গর্জ্জন,
দহ্যমান তরণীর, অনল হুঙ্কার,
বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি, অস্ত্রঝনৎকার,
জেতার বিজয় ধ্বনি, মৃতের চীৎকার,

ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ, সিন্ধু আস্ফালন
ভয়ঙ্কর! নিরখিয়া উড়িল পরাণ।
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল;
বলিলাম কর্ণধারে—'ফিরাও তরণী,
বাঁচাও পরাণ!' আজ্ঞামাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপণী ক্ষেপণে, বেগে চলিল তরণী
মিশর উদ্দেশে হায়! মন্দুরার মুখে
ছুটিল তুরঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে পশ্চাতে
দেখিলাম ভাঙ্গিয়াছে কপাল আমার।
না দেখি তরণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এণ্টনি!
আকাশ ভাঙ্গিয়া হায়! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ! ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দরশন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান
করিবে আমার; হায়! কেন আসিলাম,
আমি কেন মজিলাম! নাহি ডুবিলাম
কেন জলধির তলে? নাহি মরিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে?
কেন আসিলাম আমি।—কেন মজিলাম!"
"অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষুর মত,
অবতীর্ণ হইলাম মিশরের তীরে
বহু দিনে। এই রণে গিয়াছিনু সখি!
এণ্টনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রাণী;
আসিলাম ভিখারিণী ডুবায়ে এণ্টনি।
চলিলাম গৃহ মুখে, বিসর্জ্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবি রোম সিংহাসন,
এণ্টনির প্রেম,—হায়! মৈশরী জীবন,—
ভূমধ্য সাগরে;—এই জীবনের মত
বিসর্জ্জিয়া যত আশা ব্যোম নিকেতন।
চলিলাম গৃহে;—কোন মতে, কোন পথে
নাহি ছিল জ্ঞান। নিল উড়াইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকার! নাহি সে মিশর
রাজ্য নাহি রাজধানী, দেখিনু কেবল
অন্ধ কার!—মরুভূমি! সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকারে, সেই মরুভূমি মাঝে
দেখিনু কেবল—মম সমাধি ভবন!
চলিলাম সেইদিকে, উন্মাদিনী আমি।
বলিলাম—তোমারে কি?—না হয় স্মরণ,
চারমিয়ন্!—বলিলাম—আসিলে এণ্টনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যাজিল জীবন,—
বলিও প্রাণেশে মম, বলিও তাঁহারে,—
'মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এণ্টনি!'
সমাধির দ্বারে সখি! পড়িল অর্গল।"
"আসিল এণ্টনি; সখি! নাথের সে মূর্ত্তি
স্মরিলে এখনো মম বিদরে হৃদয়!
প্রসারিত নেত্রদ্বয়—উন্মত্ত, উজ্জ্বল!
প্রশস্ত ললাট—যেন ধবল প্রস্তর,—
নাহি রক্ত চিহ্ন মাত্র! বিষাদ লিখেছে
রেখা কপোলে, কপালে, উপহাসি যেন
বর্দ্ধক্যে! চিত্রেছে শুক্লে মস্তক সুন্দর!
এত রূপান্তর সখি! এই কয় দিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর!
শুনিলা সখীর মুখে, স্তম্ভিতের মত,—
'অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যাজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ কথা—ক্ষমিও এণ্টনি।'
'ক্ষমিলাম'—বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
দুই হাতে, প্রবেশিল রাজ হর্ম্ম্যে বেগে,—
বিদ্যুতের গতি! হেম কালে চারিদিকে

উঠিল নগরে সখি! ভীম কোলাহল।
ভূমধ্য সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্লাবিল মিশর! ত্রস্তে বাতায়ন পথে
দেখিলাম—নহে সিন্ধু—সৈন্য সিজারের,
লুঠিতেছে হতভাগ্য—নগর আমার।
অপূর্ব্ব সিজার গতি! চক্ষুর নিমিষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী,—সমাধি আমার;
পড়িনু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিণী!
কিন্তু ও কি, সহচরি! সমাধির তলে!
ওই শয্যার উপরে! মুমূর্ষু এণ্টনি!!
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যার উপরে,
তুমি ধরিলে অমনি। তুলিলাম নাথে
সমাধি উপরে;—হায়! সমাধি উপরে!
এই ছিল লেখা সখি কপালে আমার,
কে জানিত! প্রাণ নাথ বলিলা আমারে
সেই স্বর, প্রিয় সখি! অস্ফুট দুর্ব্বল!—
'মৈশরি! ভবের লীলা ফুরাইল আজি
এণ্টনির; পৃথিবীতে, প্রেয়সি! আমার
আর নাহি প্রয়োজন! ফুরাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্রলিখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার,—নহে শত্রুদত্ত;
হেন সাধ্য কার? নাহি এই ভূমণ্ডলে
এণ্টনি বিজয়ী,—বিনা ক্লিওপেট্রা!! আজি
এণ্টনির করে প্রিয়ে! আহত এণ্টনি।
আসিয়াছি,—শেষ সুরা পাত্র করি পান
তব সনে, প্রণয়িনি!—লইতে বিদায়;
দেও, প্রিয়তমে! যাই—বিদায় চুম্বন।'"
" সুরা করিলাম পান, চুম্বিনু চুম্বন।
শুনিনু অস্ফুট স্বরে, জন্মের মতন—
'ক্লিওপেট্রা!—প্রণ—য়ি—নি!——'"
"'প্রাণনাথ! আমি
ক্লিওপেট্রা অভাগিনী!'—বলি উচ্চৈঃস্বরে,
আঁটিয়া হৃদেশে সখি! ধরিনু হৃদয়ে
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে যুগল নয়ন—
জ্যোতিতে যাহার রোম আছিল উজ্জ্বল,
অসংখ্য সমর ক্ষেত্রে, কিরণ যাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন তপন;
খেলিত বিদ্যুৎ মত সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে;—নিবিল ক্রমশঃ।
মানব গৌরব রবি হলো অস্তমিত।
'প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এণ্টনি আমার।'
ডাকিলাম বারম্বার উন্মাদিনী প্রায়;
'প্রাণেশ্বর!—প্রাণনাথ!—এণ্টনিআমার।'
শুনিলাম উত্তরিল, সমাধি ভবন।
প্রাণে—শ্বর!—প্রাণ!——"
আহা! সহিল না আর;
অবশ মস্তক ভার গ্রীবা দুঃখিনীর
পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল ভূতলে;—
ব্যাধ শরে বিদ্ধ যেন বন কপোতিনী!
অতি ত্রস্তে সখীদ্বয় ধরাধরি করি,
তুলিল শয্যায় শ্বেত প্রস্তর পুতুলী;
উরবাস, কটিবন্ধ, করিয়া মোচন,
শীতল তুষার বারি, উরসে, বদনে,
বরষিল, কিন্তু নাহি পাইল চেতন
অভাগিনী! তবু নাহি মেলিল নয়ন।
সহচরীদ্বয় দুঃখে বসিয়া নিকটে
কাঁদিতেছে ভর্ত্রী-শোকে, হৃদয় বিকল।
অকস্মাৎ তীরবেগে, বসিয়া শয্যায়,—
মুষ্টি-বদ্ধ করদ্বয়,—বিস্তৃত নয়ন,—
তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ! চাহি শূন্য পানে
উন্মত্ত, বিকৃত কণ্ঠে, বলিতে লাগিল।
"পরিণয়!—পরিণয়!—তুচ্ছ পরিণয়

যদি না থাকে প্রণয়। প্রণয় বিহনে
পরিণয়!—পরিমল হীন পুষ্প! মণি
হীন ফণী—আজীবন অনন্ত দংশক।
মধুহীন মধু চক্র!—মক্ষিকাপূরিত।
হেন পরিণয় বলে, ওই দেখ সখি
এণ্টনির পাশে বসি, অগস্তা, সিল্‌ভিয়া,
আমায় কুলটা বলি করে উপহাস।
কি কুলটা—ক্লিওপেট্রা! প্রণয়ের তরে
বিসর্জ্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে,
কুল তুচ্ছ—প্রাণ দিয়া—তোরা অভাগিনী
না পাইয়া তারে, আজি তোরা গরবিণী,
পোড়া পরিণয় বলে! পরিণয় বলে
জীব লোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমর লোকে, পরিণয় বলে
তারে রাখিবি কেমনে।" উন্মাদিনী হায়!
ছুটিল তাড়িত বেগে, সহচরীদ্বয়,
না পারিল প্রাণপণে রাখিতে ধরিয়া
প্রবেশিয়া কক্ষান্তরে, দ্রুত হস্তে বামা,
একটী স্বর্ণ কৌটা খুলিল যেমতি,
ক্ষুদ্র বিষধর এক ফণা বিস্তারিয়া,
বসাইল বিষদন্ত কোমল হৃদয়ে,—
রূপে মুগ্ধ ফণী যেন করিল চুম্বন!
সখীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার,
ভূতলে ঢলিয়া আহা! পড়িল মৈশরী।
"এই বেশে চারমিয়ন! ভেটিয়া ছিলাম
নাথে চিদনস তীরে, এই বেশে আজি
চলিলাম প্রাণ নাথ ভেটিতে আবার—"
বলিতে বলিতে বিষে, কালিমা সঞ্চার,
করিল অতুল রূপে, যেইরূপে হায়!
সমস্ত রোমান রাজ্য—প্রাচীনা পৃথিবী—
ছিল বিমোহিত; সেইরূপে জলে, স্থলে,
হলো প্রজ্বলিত কত সমর অনল,
কতই বিপ্লবে রোম হলো বিপ্লাবিত;
নিবিল সে রূপ আজি,—মরিল মৈশরী,
সমর্পিয়া কালে পূর্ণ যৌবন রতন,
অপূর্ব্ব রমণী কীর্ত্তি—রূপে, গুণে, দোষে!
রাখি ভূমণ্ডলে হায়! রাখি প্রতিবিম্ব
অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে।

শৈশব সহচরী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাখ্যান।

বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্ণপুরে রামভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক জন অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ধনীদিগের গৃহে নিমন্ত্রণ খাইয়া রামভদ্র আপনার উদর পূরণ করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে এক মাত্র নবমবর্ষীয়া ভগিনী ছিল। তাঁহার ভগিনী চন্দ্রাবলী অসামান্য রূপবতী ছিল। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন অশীতিবর্ষবয়স্ক ধনাঢ্য ভূস্বামী তাঁহার পাণিগ্রহণ করাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রামভদ্রের দরিদ্রতা ঘুচিল। প্রাচীন ভূস্বামী কিঞ্চিৎকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। চন্দ্রাবলীর সন্তান হইল না দেখিয়া তিনি আপন মৃত্যুর

কিছুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রাবলীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ এবং রৌপ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে চন্দ্রাবলী আপন ভ্রাতা রামভদ্রকে তাঁহার আলয়ে বাস করাইলেন এবং তিনিও কিছুদিন পরে রামভদ্রকে স্বামীর চিরসঞ্চিত ধনরাশি উপঢৌকন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। রামভদ্র, ভগিনীর বিয়োগের দুঃখেই হউক, আর "যঃপলায়তি স জীবতি" ভাবিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ ভগিনীপতির বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরে, নিজ গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয় ভূষণ করিলে পাছে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, এই আশঙ্কায় রামভদ্র অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও অতি সাবধানে কালযাপন করিতেন। তাঁহার পরলোক গমন হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত তাদৃশ সাবধানের আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না; তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং আপনাদিগের আবাস জন্য পৃথক্২ অতিবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন ও পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এই প্রকারে লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পৃথক্২ অতি বিস্তৃত জমিদারীর মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের পরে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই সহোদরের বংশ উহা অবিবাদে ভোগদখল করিয়াছিল। তৎপরে যখন রমাকান্ত এবং তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জমিদারীর অধিপতি হইলেন, তখন এই বহুকালের সম্পত্তিতে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিল, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে—

রমাকান্ত কিছু সাবধান-ব্যয়ী হওয়াতে তারাকান্ত অপেক্ষা অধিক ধনী হইয়া উঠিলেন। এমন কি যখন তরফ সুবর্ণপুর নীলামের ইস্তাহার হইল, তখন তারাকান্তের নিতান্ত ইচ্ছা উহা ক্রয় করিয়া বাস ভূমির অধিপতি হয়েন। কিন্তু নিজের তত সঙ্গতি না থাকাতে রমাকান্তের নিকট একখানি তালুক বন্ধক রাখিয়া খত লিখিয়া দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। কালে এই খতই দুই বংশের মধ্যে অনর্থেরমূল হইল।

এপর্য্যন্ত দুই বংশে সম্প্রীতি ছিল, সম্প্রতি অল্প কারণে অপ্রীতি ঘটিল। একদিবস রমাকান্তের একজন চাকরাণী খিড়কীর পুষ্করিণীতে বাসন মাজিতে গিয়া তারাকান্তের একজন খাসপরিচারিকার পরিষ্কার গাত্রে অসাবধানে জল দিয়াছিল। খাস পরিচারিকার উহাতে অপমান বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ উভয়ে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ও সেই যুদ্ধ দুই বাড়ীর দুই গৃহিণী পর্য্যন্ত পৌঁছিল; সুতরাং সেই সূত্রে রমাকান্ত ও তারাকান্তের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল।

প্রথমে গালিগালাজ পরে আলাপ ও নিমন্ত্রণ বন্ধ। তৎপরে ছোট২ মোকদ্দমা, প্রজা ধরিয়া টানা টানি, শেষ লাঠালাঠির

উপক্রম। শেষে তারাকান্ত জেলার সদর আদালতে আরজি দাখিল করিলেন, যে আমি রমাকান্তের ঋণ টাকা দিয়া পরিশোধ করিয়াছি। রমাকান্ত বন্ধকি সম্পত্তিতে দখল দেয় না, অতএব দখল পাওয়ার প্রার্থনা। দাবির প্রমাণ স্বরূপ তারাকান্ত কয়েক খণ্ড রসীদ দাখিল করিলেন। রমাকান্ত বলিলেন, রসীদ জাল। মোকর্দ্দামা ক্রমে ক্রমে প্রিবি-কৌন্সেল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তিন আদালতে রমাকান্ত জয়ী হইলেন এবং তিন আদালতের খরচা পাইলেন। তারাকান্ত ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া একে একে সকল বিষয় খোয়াইলেন, শেষে অর্থহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মনোদুঃখে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তিনি পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পাইলেন না; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীকান্ত অতি কিশোর বয়সে রামহরি মুখোর ভ্রাতৃকন্যা কুমুদিনীকে বিধবা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন; কনিষ্ঠ রতিকান্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরমকালে যত্ন এবং সেবার্থ ক্ষোভ ছিল না; তাঁহার পুত্রবধূ কুমুদিনী আপনার শরীর পতন করিয়াও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতেন। তারাকান্ত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গঙ্গালাভ করিলেন।

পিতার মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া রতিকান্ত দেশে আসিলেন; পরে পিতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনানন্তর আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। গৃহস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে কাহাকে শ্বশুরবাড়ী কাহাকে বাপের বাড়ী কাহাকেও অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার অতি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

এদিকে রমাকান্ত, তারাকান্তের সমুদায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া অতি প্রবল জমীদার হইলেন এবং কিছু দিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনীকান্তের বিবাহ দিলেন; বিবাহ রাত্রি হইতে রজনী নিরুদ্দেশ হওয়াতে রমাকান্ত পুত্রের বিরহে রোগগ্রস্ত হইয়া অতি অল্পকালেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচরাচর ঘটে না।

রমাকান্তের শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত, তাঁহার কন্যারা মহাসমারোহপূর্ব্বক আয়োজন করিয়াছেন, এক জন জ্ঞাতি শ্রাদ্ধ করিবে, সভা সুসজ্জিত হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসিয়াছেন, শ্রাদ্ধাধিকারীর আসন প্রস্তুত। পুরোহিত পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জ্ঞাতি অতি গম্ভীরভাবে যজ্ঞোপবীত মার্জ্জনা করিতে করিতে আসনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমত সময় হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, জ্ঞাতি

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, স্বয়ং রজনীকান্ত আসন গ্রহণ করিতেছেন। আহ্লাদে আত্মীয়েরা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন; রজনীকান্ত রীতিমত শ্রাদ্ধাদি করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করিলেন। সকলে সমবেত হইলে বলিলেন, "তোমরা সকলেই জান যে, এই বিষয় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কৃত। পিতা কোন উইল করিতে পারেন নাই।" রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তাঁহার উইল করিবার আবশ্যক কি? তিনি সকলকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সকলের পক্ষে উইল। তাহাতেই সকলের মঙ্গল করা হইয়াছে।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কথা অমৃততুল্য; এক্ষণে শ্রবণ করুন। পিতা উইল করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল, যে আমি তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার আশ্রিত অনুগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে পারিব।"

দেবনাথ মুখো বলিলেন, "দেবতারা মেঘকে বৃষ্টি করিতে বলিয়া থাকেন।"

রজনী বলিলেন, "দেবতারা কখন কখন অনাবৃষ্টিও ঘটাইয়া থাকেন। এক্ষণে আপনারা সকলে জানেন আমি কিছু কৃপণ।"

দেবনাথ মৃদু মৃদু বলিলেন, "সূর্য্যদেব অন্ধকারের কর্ত্তা।"

এবার রজনী উত্তর না করিয়া কহিলেন, "আমি স্বেচ্ছাক্রমে যাহাকে যাহা দিতেছি তাহা শ্রবণ কর। আমার মধ্যমা ভগিনী শৈলবতী কোথায়?" একজন স্ত্রীলোক কহিল, "তিনি আসেন নাই। কাঁদিতেছেন।"

রজনীকান্ত বলিলেন, "মেজদিদিকে পনর হাজার টাকা দিলাম। তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা কোথায়?" শৈলবালা প্রসন্নমুখে অগ্রবর্ত্তিনী হইল। রজনী বলিলেন, "তোমাকে দশ হাজার টাকা দিলাম।"

শৈলবালার প্রফুল্ল মুখ ম্লান হইল—বলিল, "কেন রজনী, মেজদিদিকে পনর হাজার, আমাকে দশ হাজার?"

রজনী কহিলেন, "মেজদিদি তোমা হইতে পাঁচবৎসরের বড় এই জন্য।"

শৈলবালা "আমি টাকা চাহি না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষের বাহিরে গেল।

রজনী অম্লান বদনে বলিলেন, "সেজ দিদি টাকা লইলেন না—আমি তাঁহার টাকাও মেজদিদিকে দিলাম।" দেবনাথ মুখো বলিলেন, "তিনি রাগ করিয়া গিয়াছেন এখনি আবার আসিবেন। আপনার উপর রাগ করিবেন না ত কাহার উপর রাগ করিবেন।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রজনীকান্ত পিসী, মাসী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, কুটুম্ব, ভৃত্য প্রভৃতিকে পিতৃসঞ্চিতার্থ বিতরণ করিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশ-

য়ের কোন কথা উল্লেখ করিলেন না। দেখিয়া দেবনাথ বলিলেন,

"তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গে গিয়াছেন তাঁহার অংশ আমি পাইতে পারি।"

রজনী বলিলেন, "আপনি যখন তাঁহার কাছে যাইবেন তখন আপনার হস্তে তাঁহার টাকা প্রেরণ করিব।"

দেবনাথ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে আমার নিজাংশ?"

রজনী উত্তর করিলেন, "আপনাকে এক টাকা দিলাম।"

দেবনাথ প্রথমে মনে করিলেন রহস্য, কিন্তু যখন রজনী গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া যান তখন বুঝিলেন রহস্য নহে। তখন বলিলেন, "এক টাকাই আমার এক লক্ষ।"

দশম পরিচ্ছেদ।

যাহা সচরাচর ঘটে।

রাত্রি ঘনান্ধকার, অমাবস্যা। নিশীথ কালে, সমীরণ গভীর গর্জ্জন করিতেছে। তৎকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্ত বাহিনী জাহ্নবী কল কল করিতেছে। তটোপরি এক উচ্চ দেবমন্দির। গ্রামের প্রান্তভাগে বসতি নাই; কেবল সেই কল কলনাদিনী বহুজলপূর্ণা নদী, আর সেই তুঙ্গ-শিখরশালী মন্দির। নিকটে নিবিড় বন—ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ তরু, লতা, কণ্টকাদিতে দুর্ভেদ্য বন। মন্দির ভগ্ন, প্রাচীন, জনসমাগমচিহ্নশূন্য। মন্দির মধ্যে করাল মূর্ত্তি দেবী, কালী—সেই ভৌতিক রাজ্যের যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী। সপ্তহস্তপরিমিতা, পাষাণময়ী, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সেই অন্ধকার স্থানে অন্ধকার করিয়া, মহাকাল হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছেন। দিবসে এক বৃদ্ধ বারেক মাত্র আসিয়া সামান্য প্রকারে পূজা করিয়া যাইত। রাত্রে কেহ তথা আসিত না। নিকটে শ্মশান, তথায় শবদাহ হইত। গ্রাম্য লোকে দিবসেও সেখানে আসিতে সাহস করিত না।

সেই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে রাত্রে কখন গ্রাম্য লোক দূর হইতে আলো দেখিতে পাইত। সেই আলোক দেবযোনি কর্তৃক জ্বালিত বলিয়া গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস ছিল। কখন কখন তথা হইতে শঙ্খধ্বনিও হইত।

অদ্য আমাবস্যার রাত্রি; এই গভীর অন্ধকার নিশীথে একজন দুঃসাহসিক গ্রামবাসী, সেই মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিল। একবার সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ছিল। কখন চলিতে ছিল, কখন দাঁড়াইয়া দূরলক্ষ্য নভঃস্থ মন্দিরচূড়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমত সময়ে মন্দির মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন আরও সন্দিগ্ধচিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা গম্ভীর শঙ্খনাদে সেই কানন কম্পিত হইল। শুনিবামাত্র পথিক নিঃসঙ্কোচিতচিত্তে মন্দিরাভিমুখে চলিল।

মন্দিরে আসিয়া, মুক্ত পথে প্রবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম করিল। দেখিল এক ব্রাহ্মণ রাশীকৃত জবাপুষ্প, বিল্বপত্র, রক্ত চন্দনাদির দ্বারা দেবীর পূজা করিতেছে। সদ্যশ্ছিন্ন ছাগমুণ্ড, এবং ছাগদেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। রক্তে মন্দির প্লাবিত হইতেছে।

যতক্ষণ পূজা সমাপন না হইল, ততক্ষণ আগন্তুক নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। পূজা সমাপনান্তে পূজক জিজ্ঞাসা করিল, "এখনও ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ?"

আগন্তুক বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে।"

পূজক কহিল, "তবে দেবীর পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।"

তখন আগন্তুক কালী প্রতিমার চরণে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "মা জগদম্বে, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন রজনীকান্ত বাঁড়ুয্যের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান থাকিবে, ততদিন আমি কায়মনোবাক্যে তাহার শত্রু। যাহাতে তাহার সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা আমি করিব।"

পূজক তখন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা শুন। আমি জীবিত থাকিতে যে আমার পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবে, আমি তাহার চিরশত্রু। তাহার সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল আমি কায়মনোবাক্যে সাধিব। যদি তাহাতে অযত্ন করি তবে যেন হে জগদম্বে, আমি তোমার কোপে পতিত হই।"

তখন উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রতিমাতলে উপবেশন করিল।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রথম হইতে মন্দিরে থাকিয়া পূজা করিতেছিল, সেই রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার নিরুদ্দেশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছিল, সে রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "রজনী এখন আমার সন্ধান করিতেছে কেন, কিছু জান ?"

দেবনাথ। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

রতি। দেখ, আমরা যে অভিপ্রায়ে এই গুরুতর শপথ করিলাম, তাহাতে যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি, তবে আমাদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেবনাথ। আমি এই দেবীর মন্দিরে বসিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি না। আমি বাস্তবিক জানি না। তুমি মনে করিতেছ, যে একত্রে বাস করি, সর্ব্বদা কাছে থাকি, এ সকল কথা আমার জানিবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা নহে। রজনীকান্ত সহজ লোক নহে। তাহার চরিত্রের মধ্যে কেহ কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না।

রতি। তোমার যদি ভয় হয়, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার।

দেবনাথ। আমি কালীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি ভয় হইলেও

আমি তোমার ক্রীতদাস। বিশেষ আমরা যে জয়ী হইব, তাহার এক বিশেষ লক্ষণ দেখিতেছি। আমাদের একজন প্রধান সহায় জুটিয়াছে।

রতি। কে?

দেব। রজনীর তৃতীয়া ভগিনী শৈলবালা। পিতৃধনে রজনী তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

রতি। তাহাকে বিশ্বাস করিও না। হাজার হউক সে ভগিনী।

দেব। তুমি তাঁহাকে চেন না। সেও একটি রত্ন। সে যে আমার সহিত এক পরামর্শী, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে একটি সম্বাদ দিতেছি। আগামী কল্য রজনী কলিকাতায় যাইবে।

রতি। সেটা কি এমন বিশেষ সম্বাদ, তাত বুঝিলাম না।

দেব। বিশেষ সম্বাদ এই যে, রজনীর সঙ্গে অনেক নগদ টাকা যাবে।

রতি। কেন?

দেব। কেন? তুমি আজ দুই দিনের জন্য সন্ন্যাসী হইয়া কি সব ভুলিয়া গেলে! ঘরে নগদ টাকা ধরে না সুতরাং কলিকাতার ব্যাঙ্কে অথবা অন্য কোন স্থানে উহা রাখিতে যাইতেছে।

রতি। এ সম্বাদ ভাল বটে। কোন্ পথ দিয়া যাইবে?

দেব। কলিকাতায় যাইবার নৌকাপথ ভিন্ন কি আর কোন পথ আছে? কিন্তু রজনী প্রথমতঃ পাল্কীতে শ্রীধরপুর পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় মামার বাটীতে একদিবস থাকিয়া নৌকা পথে যাইবে।

রতি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম, এক্ষণে কার্য্যে চলিলাম।

এই কথায় পরে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব স্থানাভিমুখে চলিলেন। গভীর নিশীথে অমাবস্যার অন্ধকারে দেবনাথ শ্যালকগৃহে ফিরিয়া চলিলেন; কিন্তু তিনি যে ভয়ঙ্কর শপথ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অন্ধকারে প্রতি পদে তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পথপার্শ্বে নদীগর্ভে প্রেতভূমি। তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন যেন কত প্রেতমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া তাঁহাকে বলিতেছে "কি ভয়ানক শপথ!" পরিষ্কার নৈশাকাশপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ তারা তাঁহার দুর্লঙ্ঘ্য ভীষণ শপথের সাক্ষ্য দিতেছে; উজ্জ্বল নিষ্ঠুর কটাক্ষে তাঁহাকে বলিতেছে "আমরা সাক্ষ্য আছি।" দেবনাথ তখন আপনার অভিসন্ধি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, "রজনীর আমি সর্ব্বনাশ করিব, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কিন্তু কেন? আমি রজনীর আশ্রিত, তাহার গৃহে থাকি, তাহার অন্ন খাই। তাহার পিতার অন্নে আমার শরীর। রজনীকান্ত কি আমার কোন অপকার করিয়াছে? কিছু না। তবে কেন? তবে আমাকে কিছু দেয় নাই; দেয় নাই, ইহা নিতান্ত বৈরিতার

কাজ করিয়াছে। টাকাগুলি পাইয়া এই সময়ে আমার মনের মানস সিদ্ধ করিতাম। টাকা না দিয়া রজনী আমার ইহজন্মের সুখ নষ্ট করিয়াছে। আমি তাহাকে না নষ্ট করিব কেন? কিন্তু টাকা কার? রজনীকান্তের। তবে আমার ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, আমি রজনীকান্তকে দেখিতে পারি না; পিছনে কে?"

"পিছনে কে?" এই কথাটি দেবনাথ পরিস্ফুট স্বরে বলিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যতক্ষণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। পরিশেষে রজনীকান্তের অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকারে সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহাকে বলিল "মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত রাত্রে একটা আলো লইলে ভাল হইত, অন্ধকারে সিঁড়িতে পা বাঁধিয়া পড়িয়া যাইবেন।"

দেবনাথ চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, রজনী বাবু!"

রজনী বলিলেন, "আপনারই ভৃত্য।"

দেব। এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলেন?

রজনী। কোথায় যাইব? আপনার বাড়ীতেই আছি। আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?

দেব। নিমন্ত্রণে।

দেবনাথ কম্পিত কলেবরে শয্যাগৃহে গমন করিলেন। রজনীও আপন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

অষ্টম প্রস্তাব।

সামরিক ব্যাপার।

সাগরগর্ভে মহার্হ রত্নসঞ্চার, এবং ঘোর নির্জ্জন অরণ্যে বিকসিত কুসুম গন্ধ প্রবাহ, লোক সমাগম তাহাতে আকর্ষিত না হইলেও, নিত্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন পরাধীনা ভারতে এককালে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলাদির বরপুত্রগণের আবির্ভাব, এবং তাহাদের গৌরবের উচ্চ নিশান গগনস্পর্শী হইয়া উড্‌ডীয়মান হইত কি না, তাহাতে কি সন্দেহ হয়? রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, সর্ব্বজিৎ অর্জ্জুন, আসমুদ্র করগ্রাহী রাজরাজেশ্বর দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, রন্তিদেব ইত্যাদি

নাম মহাকবিগণ তাঁহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপহেতু অলৌকিক জীব অংশে তাঁহাদের জন্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ ভক্তিভাবে সেই সকল শুনিয়া অখণ্ডনীয় সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই সকল শুনিতেছি কিন্তু পূর্ব্বকালের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি, এইরূপ। তোমার প্রমাণ, খৃঃ পূঃ ৪০০৪ সঙ্গে মিস খায় না বা তদ্রূপ সারবান্ যুক্তি, আমারও প্রমাণ খৃঃ পূঃ ৪০০৪ মানি না বা তদ্রূপ; সুতরাং বিশ্বাস করা না করার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান। এ বিবাদ স্থলে কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীনা ভারতের গৌরব স্থলে আলেকজণ্ডার, সিজর, হানিবল বা নেপোলিয়নের ন্যায় যোদ্ধা; গ্রিসীয় কডরস বা হেলবিটিয় উইঙ্কিলরিডের ন্যায় স্বদেশ হিতৈষিতায় আত্ম বা আত্মতুল্য প্রাণঘাতী; অথবা মারাথন বা থার্ম্মপিলির ন্যায় তীর্থক্ষেত্র, ঐতিহাসিক সন্দেহবিহীন হইয়া এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার নাই। প্রাচীনা ভারতের ঐতিহাসিক বিষয়ের অধিকাংশই কালগর্ভে নিহিত হইয়াছে। বর্ণজ্ঞানশূন্য নরমাংসভোজী আজ্‌টেক জাতিও ইতিবৃত্ত রক্ষণের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে আর্য্যসন্তানেরা উচ্চ বিদ্যাবিশারদ হইয়াও তাহার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হয়েন নাই! যাহা হউক, সে সকল তৎকারণ বশতঃ যদিও কালগর্ভে নিহিত হউক এবং নাম বিশেষের উল্লেখ নাই পাওয়া যাউক, কিন্তু যদি সে সময়ের লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্র জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষয়ের আভাস উপলব্ধ করিতে অল্পক্ষণই লাগিয়া থাকে। লোকচরিত্র সমূহের সঙ্ঘটনে সমাজচিত্র। যে সমাজের বিবরণ আলোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্যা-বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত, সে সমাজের লোক চরিত্রও সুতরাং বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদিদ্বারা নির্ম্মিত। প্রাচীনা ভারতের লোকচরিত্র ও সমাজ চিত্র তদ্রূপ। অতএব লোকস্মৃতি কাল সমীপে দুর্দ্দমনীয় হইলে, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নাম বিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া যাইত না, ইহা কখনই হইতে পারে না। ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্বের যখনই কিঞ্চিৎ টুকরা উদ্ধার হয়, তখনই দেখিতে পাই যে তাহা কোন না কোন মহাপুরুষের নামে ধ্বনিত। ফলতঃ যে জাতি স্মৃতিবহির্ভূত সময়ে উত্তর কুরুবর্ষ পরিত্যাগাবধি, ডাহিরের পরাজয় বা দাসানুদাস কুত্তবুদ্দিনের ভারতে আগমন পর্য্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, যাহার বংশাবলী অদ্ভুত বীরত্বে জগজ্জেতা আলেকজণ্ডারকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাহার বংশাবলী রোম সম্রাট্ আগষ্টসের সহ সখিত্বনিবন্ধন তাঁহার

সভায় দূত প্রেরণ দ্বারা রাজতত্ত্ব মীমাংসা করিতেন, যাহার বংশাবলী গ্রীকভূমি পরাজয়ার্থ পারস্যরাজের সৈন্যমধ্যে গণনীয় পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার বংশাবলী জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যাহার বংশাবলী ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধর্ম্মদাতা, সেই জাতি যে প্রাচীনকালে কোন গৌরবযুক্ত নামের কাঙ্গাল ছিল, একথা শুনিব না, এবং শুনিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু সেই সকল নাম কালকবলে নিহিত বা উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে;—সেই সকল পূজনীয় নাম সাগরগর্ভস্থিত মহার্ঘ রত্ন এবং বিজন অরণ্যস্থিত সুবাস কুসুমের সহ সমভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাল্মীকির সাময়িক সমাজ বীরবীর্য্য সাহস ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপর্ব্বে প্রতিফলিত। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড বীরত্ব সাহস এবং স্বপক্ষ হিতৈষিতার আভাসে পরিপূর্ণ। যুদ্ধকৌশল এবং স্বপক্ষ রক্ষণচাতুর্য্য নাবাবিধ ও চমৎকার। যুদ্ধপ্রণালী ব্যূহ রচনাপ্রভৃতি, হোমারিক সময়ের তত্তৎ বিষয়ের সহ সমজাতীয়। যুদ্ধস্থলে সেনাপতিই সর্ব্বে সর্ব্বা, তাহাদের হারিজিতের উপর যুদ্ধের ফল প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সৈন্যগণ পশুবৎ মরিতেছে ও মারিতেছে। জয়োদ্দেশ্য নগর সকল প্রাকার পরিখায় সমাবৃত, শত্রুগণের পক্ষে সহসা সুগম নহে। দেশরক্ষার্থে যদ্রূপ দুর্গাদি স্থাপিত, রক্ষিত এবং অবরোধকালীন ও অসময়ের নিমিত্ত দুর্গে যেরূপ দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, রাজধর্ম্ম প্রস্তাবে তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে।

সৈন্য চারিবিধ। হস্তী, অশ্ব, এবং রথে আরোহণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহারা এবং পদাতি।(১) অস্ত্র নানাবিধ। শরাসন, চর্ম্ম, শর, খড়্গ, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, গদা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত শতঘ্নী নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে।(২) রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে, বিশ্বামিত্র যেস্থলে রামকে মন্ত্রপূত বহু অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূতপূর্ব্ব অশ্রুত বহু বিকট নামযুক্ত অস্ত্র সমূহের নামোল্লেখ আছে। উহা কবি কল্পনার পরাকাষ্ঠা। যাহা হউক উপরে যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র এবং চতুর্ব্বিধ সৈন্যের বিষয় কথিত হইল, তাহাই প্রামাণিক এবং সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকভূমে ৪৭৯ খৃঃ পূঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধে জরকসিসের পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তাহারা পদাতি এবং অশ্বারোহী এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা বলিতে পারি না। ইহাদের বৃত্তান্ত হিরোডোটস তাঁহার পুস্তকে(৩) যদ্রূপ প্রদান করিয়াছেন, উপরি

(১) বেদে দ্বিবিধ সৈন্য দৃষ্টি হয়, রথী ও পদাতি।

(২) বঙ্গদর্শন ২য় সংখ্যা ৪৯৪ পৃষ্ঠা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখ।

(৩) Herodotus Book VII. 65. 86, IX 28 32.

কথিত বৃত্তান্তের সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয়েরা কখন সমুদ্রযুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না, বাল্মীকিতে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। নদী প্রভৃতিতে নৌযুদ্ধের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অনুসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন।

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং
শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিষ্ঠস্তিত্যভ্য
চোদয়ৎ ॥"৮

"অসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা কবচাদিধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ প্রতীক্ষায় পঞ্চশত নৌকায় আরোহণ করিয়া রহুক।" ইহার সাদৃশ্য মেক্সিকোবাসীদিগের তেজকুকো হ্রদের নৌযুদ্ধে দৃষ্ট হয়। এই নৌযুদ্ধের বলে স্পানিয়ার্ডরা একরাত্রে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন যে আজি পর্য্যন্ত তাহা "মহাকুরাত্র" (Noche Tristo) বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন।

উপরে যত প্রকার অস্ত্রের বিষয় কথিত হইল, তাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অস্ত্রবিশেষে পারদর্শিতালাভ করিয়া খ্যাতিযুক্ত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ ধনুর্ব্বানেরই যুদ্ধকালীন বহু ব্যবহার লক্ষিত হয়। যোদ্ধারা প্রায় এইরূপ সাজে সজ্জিত হইতেন। শরীর বর্ম্মাবৃত, শিরে শিরস্ত্রাণ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণ, কটিতে লম্বমান খড়্গ, এবং শরাকর্ষণ নিমিত্ত অঙ্গুলিতে গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ। রথের আকার এরূপ একস্থানে দেওয়া আছে।

"তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসম্বাধং বৈদূর্য্যময়কুবরম্ ॥১৩
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৈশ্চ
কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ
সমাবৃতম্ ॥১৪
ধ্বজনিস্ত্রিংশ সম্পন্নং কিঙ্কিণীভির্বি-
ভূষিতম্।
সদশ্বযুক্ত————————॥১৫" ৩।২২

উহা মেরু শিখরাকার (তদ্বৎউন্নত) তপ্তকাঞ্চণভূষিত, হেমচক্র ও বৈদূর্য্যময় কূবর সম্বলিত। উহাতে কাঞ্চণ নির্ম্মিত নানাবিধ মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র সূর্য্য, মাঙ্গল্য পক্ষী এবং তারাগণে ইতস্ততঃ পরিবৃত। ধ্বজ এবং খড়্গ সম্পন্ন, কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্বদ্বারা বাহিত।(৪)

রথের সারথ্য সম্ভ্রান্ত বা বন্ধুদ্বারাও সম্পন্ন হইত। জাতীয় ধ্বজ এবং যুদ্ধকালীন ধ্বজবহন যখন বৈদিক সময়েও দৃষ্ট হয়,(৫) তখন যে রামায়ণের সময়েও

(৪) রথের আকারাদি সম্বন্ধে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত ঋঃ বেঃ ৫-৬২-৬, ৬-২৯-২, ৮-৩৩-১১, ১-৬-২ ইত্যাদি দেখ।

(৫) "যত্র নরঃ সমরন্তে কৃতধ্বজঃ" —১০-১০৩ ঋঃ বে।

তাহা ছিল, তাহার জ্ঞাপনার্থে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। রঘুবংশীয় রাজাদিগের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ। নিষাদরাজ গুহের ধ্বজের নাম স্বস্তিকা। ইত্যাদি।

এই সময়ে মল্লযুদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, সুতরাং যুদ্ধকৌশলের ন্যায় দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর। সীতাস্বয়ম্বরে রামের দৈহিকবলপরীক্ষা ধনু উত্তোলন ও ভঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। রাম বালিবধে সমর্থ হইবেন কি না সুগ্রীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারণার্থে, মৃত দুন্দভির কঙ্কাল দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বালি দুন্দভির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, সুগ্রীব বালির যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ। ইত্যাদি।(৬) মল্লযুদ্ধ কিরূপ হইত, একস্থান হইতে দেখাইব। বালি ও সুগ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে। প্রথমে ক্ষণেক বাগ্‌যুদ্ধ হইল, তৎপরে "বালি সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল। তিনি নির্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক, যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্রনিক্ষেপ করে, সেই রূপ বালির উপর তাহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন বালি বৃক্ষপ্রহারে ভগ্ন হইয়া সাগরমধ্যে গুরুভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও পরাক্রান্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমমূর্ত্তি ও রণদক্ষ এবং উভয়েই পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর। তৎকালে উঁহারা আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শাখাবহুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, বজ্রকোটিপ্রখর নখ, মুষ্টি, জানু, পদ, ও হস্তদ্বারা পরস্পরকে বারম্বার প্রহার করিতে লাগিলেন।"(৭)

বৃহৎ যুদ্ধাদির ব্যবস্থা এরূপ। (৮) চতুর্ব্বিধ সৈন্য যথাক্রমে ব্যূহ রচনা করিয়া শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত

(৬) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আদিপর্ব্বে—
"যদাশ্রৌষং জরাসন্ধং ক্ষত্রমধ্যে জ্বলন্তং,
দোর্ভ্যাং হতং ভীমসেনেন।" ইত্যাদি।

(৭) এখানে নিজে অনুবাদের পরিশ্রম বাঁচাইয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এই অনুবাদ টুকু গ্রহণ করিলাম। ইহা আমার উপরি লাভ।

(৮) এই সংগ্রাম পদ্ধতির সহ নিম্নলিখিত সংগ্রাম পদ্ধতি মিলাইয়া দেখায় আমোদ আছে। গ্রীকদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রোট এরূপ লেখেন। "The mode of fighting among the Homeric heroes is not less different from the historical times, than the materials of which their arms were composed. In historical Greece, the Hoplites or the heavy-armed infantry, maintained a close order and well-dressed line, charging the enemy with their spears protended at even distance, and coming thus to close conflict without breaking their rank: there were spe-

করিয়া যথাযোগ্য অস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান হইল। রণবাদ্য নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত হইল। উভয়দিকে সিংহনাদ ধনুষ্টঙ্কার এবং শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, তৎপরে বাগ্-যুদ্ধ। তৎপরে যদৃচ্ছা কি ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে তাহা নিরুপণ হইয়া যুদ্ধ

---

cial troops, bowman, slingers, &c. armed with missiles, but the hoplite had no weapon to employ in this manner. The heroes of the Iliad and Odyssey, on the contrary, habitually employ the spear as a missile which they launch with tremendous force: each of them is mounted in his war chariot drawn by two horses and calculated to contain the warrior and his charioteer, in which latter capacity a friend or comrade will sometimes consent to serve. Advancing in his chariot at full speed, in front of his own soldiers, he hurls his spear against the enemy: sometimes indeed he will fight on foot and hand to hand, but the chariot is usually near to receive him if he chooses, or to ensure his retreat. The men of Greeks and Trojans coming forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained line, making their attack in the same way by hurling their spears. Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides his two spears to be launched forward—the spear being also used, if occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by shield; helmet, breastplate and greaves, but the armour of the chiefs is greatly superior to that of the common men, while they themselves are more strong and more expert in the use of their weapons. There are a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and proceeding is as here described"—*Grote's Greece.* Vol. I pp. 494. এক্ষণে দেখিবে যে হোমারের বর্ণিত রণবৃত্তান্ত বাল্মীকির সহ কত সামান্য অন্তর। ফলতঃ জগতের সকল আদিম সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির রণপাণ্ডিত্য প্রায় এইরূপ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক অর্দ্ধসভ্য জাতির রণবৃত্তান্তের সহ মিলাইয়া দেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে।—" Many of the Indians were armed with lances handed with copper tempered almost to the hardness of steel, and with huge maces and battle-axes of the same metal. Their defensive armour, also, was in many respects excellent, consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with skins, and casques richly ornamented with gold and jewels, or sometimes made like those of the Mexicans, in the fantastic shape of the heads of wild animals, garnished with rows of teeth that grinned horribly above the visage of the warrior.........the Spaniards were roused by the hideous clamour of conch, trumpet, and atabal, mingled with the fierce war-cries of ihe barbarians, as they let off volleys of missiles of every description,.........But others did more serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones wrapped in cotton that had been steeped in same bituminous substance, which scattering long trains of light through the air fell on the roofs of the buildings, and speedily set them on fire. &c.—*Prercott conquest of Peru.*

বাজিল। রথীতে রথীতে, পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অশ্বে, গজে গজে, মল্লে মল্লে যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধর্ম্মযুদ্ধ হইলে, যে দুই জনে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হারি হইল, তাহার প্রতি আর কেহ আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয় যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন পূর্ব্বকথিত অস্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহৃত হইত। যদৃচ্ছা যুদ্ধের নিয়ম নাই, ছলে কৌশলে যে যেরূপে পারিবে সে সেইরূপে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিবে। সমজাতীয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইলে অস্ত্রব্যবহার সময়ানুসারে যাহার যাহাতে সুবিধা তদনুসারী। উভয়দল অন্তরে থাকিলে শর, শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ, এবং সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় দলে মিশামিশি হইলে গদা খড়্গ শূল পরশু প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ হইত। প্রথমে ব্যূহ রচনা দ্বারা সৈন্য সমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর আর তাহা রক্ষিত হইত না। বিপক্ষ দলের প্রধান চেষ্টা সর্ব্ব প্রথমে ব্যূহভেদ করা। যুদ্ধারম্ভেই যে পক্ষের ব্যূহভেদ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক থাকিত না। সেনাপতিরা বিবিধ মণি রত্নাদি বীরসাজসহ ধারণ করিয়া ধ্বজপতাকাশোভিত রথারোহণে সর্ব্বদাই থাকিতেন, এবং তথা হইতে ধনুর্ব্বাণাদির দ্বারা অপর পক্ষের সেনাপতির সহ যুদ্ধ করিতেন। উভয় সেনাপতি কখন কখন ভূতলে নামিয়া মল্লযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদের পার্শ্বে আরও রথ থাকিত, পূর্ব্ব রথ ভগ্ন হইলে অপর রথে আরোহণ করিতেন; এবং সেনাপতি রণক্লান্ত ও মূর্চ্ছিত হইলে, সারথি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা রথীর প্রাণ রক্ষা করিতেন। এই দুই কারণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং শেষোক্ত কারণ হেতু সারথি গর্ব্বিত রাবণের নিকট অনেক বার তিরস্কারও সহ্য করিয়াছিল।

রামায়ণের সকল যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্টে উপরে ঐ সারাংশ সম্ভব বোধে সঙ্কলিত হইল, নতুবা রামায়ণের অবিকল বর্ণিত যুদ্ধ অদ্ভুত জিনিস। উহাতে বৃক্ষ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একজন লক্ষ জনের লক্ষ শর নিবারক, লক্ষজনের একজন বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে একাকী একটি বীর। এসকল লোকে অসম্ভব, কবিকল্পনায়ও তাহাই, কেবল বাল্মীকির ন্যায় তেজস্বী কবিকল্পনাতেই সম্ভব। বাল্মীকি ঋষি, যুদ্ধ চক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধবর্ণনের মূলমন্ত্র। বাল্মীকিবর্ণিত সংগ্রাম ক্রিয়ার উপর আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র

সাজ ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব; যেহেতু সেই সকল বিষয় রণস্থলগামী না হইলেও ঘরে বসিয়া অক্লেশে জ্ঞাত হইতে পারা যায়, এবং সর্ব্বদর্শী, বহুবিদ্যাবিশারদ ও সর্ব্বজনপূজনীয় একজন মহর্ষি যে তাহা জ্ঞাত না হইয়াছেন একথা অসম্ভব। যখন আমরা বাল্মীকির সাময়িক অস্ত্র শস্ত্র সাজ ও সেনানিবেশ একরূপ নিঃসন্দেহ ভাবে জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন দেখিতেছি যে সেই সকল, আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের তত্তৎ বিষয়ের সহ কিছু কিছু ইতর বিশেষতা ব্যতীত সমজাতীয়, আবার সেই সেই আদিম সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে সমর প্রণালী প্রায়ই একজাতীয়, তখন বাল্মীকির সাময়িক সমরপ্রণালীও যে তদ্বৎ সমজাতিত্ব বিশিষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

রাবণ ও রামের নিমিত্ত সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রত্যেক রাজেশ্বরের আত্মরাজধানী রক্ষণার্থে যাহা আবশ্যক সেই পরিমাণে বেতনভোগী সৈন্য রক্ষিত হইত। অধীনস্থ সম্ভ্রান্তগণ যাহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সীমায় রাজাকে করমাত্র প্রদান করিয়া একাধিপত্য করিত, তাহাদিগকে রাজার যুদ্ধ সময়ে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং আত্মপ্রদানে রাজাকে সাহায্য করিতে হইত। সম্ভ্রান্তগণ ডাকিবামাত্র ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গকে যুদ্ধার্থে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তদাজ্ঞানুবর্ত্তিতায় উপস্থিত হইতে হইত। অস্ত্র ব্যবহারসময় ব্যতীত তাহারা জীবিকার্থে যদৃচ্ছা আত্মবৃত্তি অথবা শূদ্রের ঊর্দ্ধে অপর যে কোন বৃত্তির অনুসরণ করিত। সৈন্যমধ্যে শক কিরাত যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়, এজন্য বোধ হয় তাহারাও নির্দ্ধারিত বেতন বা বৃত্তিভোগে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইত। যে ব্যক্তি আপন প্রভুর আহ্বান মত অস্ত্রহস্তে আসিতে কোন কারণে সমর্থ না হইত, তাহারা তন্নিমিত্ত ইউরোপীয় ফিউডাল সাময়িক এসকুয়েজ (escuage) নামক করের ন্যায় ক্ষতিপূরক কোন কর দিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা জানি না। সৈন্য সংগ্রহ প্রথা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে প্রজারা যখন প্রভুর আদেশমত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন ব্যতীত অপর সময় যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত, তখন, এমন অবস্থায়, তাহারা দৈহিক বলের পরিচালনা যদিও ঘরে ঘরে করিত, কিন্তু নিত্য নূতন যুদ্ধ কৌশল শিক্ষার সুযোগ অল্পই পাইত; সুতরাং তাহারা যে রণস্থলে পালে পালে নিপাত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব নহে। কেবল যাহারা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে পটু, এবং যাহাদের অশিক্ষার সহিত প্রভুত্বহানিরূপ ফল যোজিত, তাহাদিগকে কাজেই নানারূপ উপায়ে এবং গরজে বহুতর যুদ্ধ-কৌশলী হইতে হইত। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রাচীন সাময়িক যুদ্ধের জয় পরাজয়

তদ্রূপ লোকের একা যুদ্ধে একা জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিত।

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তদ্বিপরীতে রাবণের পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা দেদীপ্যমান আছে। মানসিক উন্নতির উপর জাতীয় সর্ব্বপ্রকার গৌরব নির্ভর করে। সাহস ও বীরত্ব জনিত গৌরব ইহার বহির্ভূত নহে। সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জাতীয় স্বভাব ও অবস্থা অনুসারে তদ্বৎ বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপূরণ। স্বাধীনতার জন্য অকাতরে রক্তপাত সাধারণতঃ মনুষ্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। এক বনবিহঙ্গ প্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাহার এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার উৎকর্ষতা জনিত মমতা স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। অপর, যাহারা চিত্তের অত্যুৎকর্ষতা লাভ হেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্য পদে পদে স্বাধীনতার আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমটির সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল পেরু মেক্সিকো প্রভৃতি, দ্বিতীয়টির তদ্রূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল গ্রানেডা হইতে মুসলমান এবং ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে ইংরেজ নির্ব্বাসন প্রভৃতি। মধ্যমাবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল লক্ষ্মণ সেনের বাঙ্গালা দেশ, অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন। এই অসামান্য দেশত্রয়ে যখনই অত্যুৎকৃষ্ট মানসিক উৎকর্ষতার হ্রাস হইয়াছে, তখনই তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে।

কিন্তু সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ট সিদ্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। অনেকের বিশ্বাস ইহার মূল এক মাত্র দৈহিক বল। একথা অগ্রাহ্য, তবে দৈহিকবল আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিলুপ্ত ভাবে থাকে যে তাহা নজরে আসে না। সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল। আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে বাসনার মূল গায়ের জোর, একথাও শুনিব না। তেজ দ্বারা বাসনার কতক পরিমাণ হয়। কিন্তু তেজ আমরা কাহাদিগেতে দেখিতে পাই? এক জাতির স্বাধীনতায়, অপর চিত্তের উৎকর্ষতায়। কুকি সাঁওতালের যে তেজ আছে, দুর্ভাগ্য বঙ্গসন্তানের তাহা নাই। আবার এক্ষণকার ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানের যে তেজ লক্ষিত হইতেছে, 'ডাইল রুটি' ভোজী সবলকায় হিন্দুস্থানিতে তাহা লক্ষিত হয় না। পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদিগের স্বর্গীয় বংশরক্ষকেরা তাল মারিয়া বৃহৎ গাছকেও দোদুল্যমান করিতেন, কিন্তু পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আঁচল ধরিয়া পিছনে লুকাইতেন; তেজ বিষয়ে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নির্জ্জীব উত্তর পুরুষমধ্যে কত অন্তরতা। ফলতঃ বাসনার মূল পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনুন্নত সমাজে পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উৎকর্ষতায় অভাব

বোধ। কিন্তু কৌশলের মূল সর্ব্বসময়েই মানসিক উৎকর্ষতা। এই উৎকর্ষতা যখন যেরূপ পুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশলও সেই অনুসারে অঙ্গসম্পন্ন হয়। যেখানে বাসনা, কৌশল এবং দৈহিক বলের একত্র সমাবেশ, সেখানকার মঙ্গলের আর কথা কি আছে। যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা সেখানেও জয়শ্রী বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দৈহিক বল, বা দৈহিক বল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বাসনা ও অধম কৌশল এ তিন একত্র হইলেও, প্রবলা বাসনাও উন্নত কৌশলের ফলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ। যখন সপ্ত ঋষি কেবল কয়েকজন মাত্র স্বদলস্থ লোক লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অনার্য্য দস্যুরা এই ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। আর্য্যগণের তুলনে, তাহারা সংখ্যায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকাবৎ। বলেও সামান্য ছিল না, সভ্যের অপেক্ষা, আহারপ্রচুর দেশের অসভ্যের গায়ের জোর এবং কষ্টসহিষ্ণুতা অধিক; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্য্যদের বল তুলনা করিলে, শেষোক্তেরা সিংহের নিকট মশক সদৃশ বোধ হইবে। পুনশ্চ তাহাদের বাসনাও বিপুল ছিল, নতুবা তাহারা এত রক্তপাত করিতে পারিত না। তথাপি আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব, অতি অধম দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যেরা অল্পবল ও অল্পসংখ্যক বটে, কিন্তু ইহাদের বাসনা অনার্য্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উৎকর্ষতা অত্যন্ত অধিক, সুতরাং ইহার কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী।

ঐরূপ মেক্সিকো দেখ। যখন কোর্টেস কেবল চারিশত পদাতি ও পনেরটি অশ্ব লইয়া লাসকালায় (Tlascala) উপস্থিত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদলের সহস্র সহস্র নিপাত হইলেও, কিরূপ সাহস ও বীরত্ব সহ বারম্বার স্বদেশরক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের অধিনায়ক জিকো-তেঙ্কাতল (Xicotencatl) কতই সাহসিকতা, কতই স্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদ্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল। ইহার স্বভাব চরিত্র আলোচনায় এরূপ বোধহয় যে এই দুর্ভাগ্য ইণ্ডিয়ান যদি অনুকূল সময় ও সমাজে পতিত হইত, তাহাহইলে বিখ্যাতনামা নূতন পুরাতন অনেক মহাবীরের যশোরবি মলিন করিয়া ফেলিত, কিন্তু এটিও অরণ্য কুসুম। এততেও কোর্টেসের পক্ষে ৫০ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত লাসকালা অর্দ্ধলক্ষের অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল। তৎপরে কোর্টেস অবশিষ্ট ৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহক সাম্রাজ্যের রাজধানী টিনকৃটিটলানে উপনীত হইলেন। এই সাম্রাজ্যের দেববৎ পূজিত অদ্বিতীয় অধীশ্বর কোর্টেসের অনুচর বিলাসকেজের ভ্রূকুটীভঙ্গীতে ভয় পাইয়া

স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবদ্ধ হইলেন। যাহার ভ্রূকুটীমাত্রে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি হেলনে পতঙ্গপালের ন্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সম্ভ্রান্তের স্কন্ধ ব্যতীত যাহার যানের অভাব, অল্পক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেস হাতকড়ি লাগাইলেন। ইহার মূল, বাসনা এবং উৎকর্ষতাজনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল। স্বদেশরক্ষণে মেক্সিকোবাসীরা যত রক্ত পাত করিয়াছে, এক পেরু ভিন্ন কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা দেখা যায় না। ঐরূপ জরক্সিসের সঙ্গে গ্রীকজাতির যুদ্ধেও উৎকর্ষতার জয়শ্রী কেমন তেজোদীপ্ত লাবণ্যময়ী। বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিক মণ্ডলের অধিনায়ক রুসিয়ারাজ পিটর, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্রসেনার অধিনায়ক দ্বাদশ চার্লশ কর্ত্তৃক কিরূপ হতশ্রী হইয়াছিলেন! পিটর তখন খেদে বলিয়াছিলেন যে, সুইডরা তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ ভাবে বিপক্ষকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেছে। পিটরের ন্যায় ব্যক্তিই কেবল এবাক্যের সত্যতা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আর উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

আবার দেখ, যে ওয়ালিদ খলিফ আসমুদ্র করগ্রাহী সম্রাট্, উদয়গিরি হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত যাহার রাজত্ব বিস্তার, তিনিও ভারতে সিন্ধু প্রদেশের অংশমাত্র জয় করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু দাসানুদাস কুতবুদ্দিন স্বচ্ছন্দে ভারত সিংহাসনে আরোহণ করিল। যে রোমরাজ্য বিশ্বব্যাপিনী, কয়েকজন বর্ব্বরে তাহার ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বার্জ্জিত উৎকর্ষ, কৌশল, কৃত্রিমবল সকলই ত ছিল, কিন্তু সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না, পূর্ব্বের ইচ্ছা বিগত হইয়াছে, উৎকর্ষতার মলভাগ বিলাস এখন সর্ব্বস্বধন, সুতরাং অধঃপতন রাখে কে?

বিজ্ঞানোদ্ভব কৃত্রিমবলের পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ বহুপরিমাণে রণস্থলে অভিনীত হইত। কিন্তু সে দিন ইহকালের মত চলিয়া গিয়াছে। ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর আছে, এত আছে যে পৃথিবী হইতে যদি আজি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি আবার ভারত জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ করে। সেদিন একটি মল্ল যুদ্ধ দেখিলাম, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপূর্ব্ব, কিন্তু এ মল্লযুদ্ধ এখন আমোদ স্থলীয়। যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে জাতীয় ভাগ্য নিরাকৃত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়। মানসিক উৎকর্ষতা এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এযুগের অধিনায়ক। ভারত সন্তান! শরীর মন সুস্থ রাখিয়া তাঁহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটক পরিচ্ছেদ।

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রাব্যকাব্য বলে। শ্রাব্যকাব্যের ন্যায়, নাটকের শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেইস্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক।

নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত একরূপ রচনা দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর উত্তম ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণ গ্রাম্যভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ করেন।

অভিনয় বা রূপক।

কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় বা রূপক কহা যায়।

অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়, এই হেতু নাটকাদি দৃশ্য কাব্যের নাম রূপক।

অভিনয় চারি প্রকার। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রূপককে (অভিনেয় কাব্যকে) দশভাগে বিভক্ত করেন। বঙ্গভাষায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়। নাটক, প্রহসন ও মাস্ক।

অঙ্কের লক্ষণ।

নাটকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম অঙ্ক। যে অঙ্কে যাহার প্রসঙ্গ থাকে তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা উচিত। নাটকে কূটার্থ বা অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার হয় না। অনাবশ্যক কার্য্যের সংশ্রব মাত্রও থাকে না। আবশ্যকীয় বিষয়ের চমৎকারিত্ব থাকিলে বর্ণন বিবিধপ্রকারে বর্ণিত হইতে পারে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য বলিয়াই কথিত হয় না। কিন্তু বঙ্গভাষায় নাটকে অনেকে সকল শাসন স্বীকার করেন না।

অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয়। বাক্যভঙ্গী দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম

বাচিক, বেশ ভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য অনুকরণের নাম বহুরূপী ও স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণসম্ভূত অভিনয়ের নাম সাত্ত্বিক অভিনয় কহা যায়।

নাটকের নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত এই চারিপ্রকারের যে কোন একপ্রকারের হইতে পারে। আদ্য অথবা বীররস নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্রয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসেরও উদ্বোধ ও অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্য্যব্যপদেশে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব দ্বারা অভিনয় সমাপন করিতে পারিলে নাটকের চমৎকারিত্ব জন্মে।

এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে গর্ভাঙ্করূপে পৃথক্ সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতে হয়।

নাটকে কোন বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক অপেক্ষা পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা নাটকে পূর্ব্বরঙ্গাদি নাই। কোন কোন সংস্কৃতানুযায়ী নাটকে উহা আছে। তদনুসারে পূর্ব্বরঙ্গাদির স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সামান্যতঃ বলা গেল।

পূর্ব্বরঙ্গ।

রঙ্গভঙ্গী (রঙ্গ তামাসা) দেখাইবার পূর্ব্বে নট বা নটী যে মঙ্গলাচরণ (গৌর চন্দ্রিকা) করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ।

নান্দী।

পূর্ব্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে তাহার নাম নান্দী। কোন কোন নাটকে কেবল পূর্ব্বরঙ্গ থাকে, কোন টীতে দুইটিই দেখা যায়।

নান্দীর উদাহরণ।

শিশুশশী শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে
গলে কালকূটের কালিমা।
রজত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোলোভা,
এরূপের দিতে নাহি সীমা॥
বাম উরুপরে বসি, অকলঙ্ক উমাশশী,
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্কর জনে, কৃপাবিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর॥
কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুলভক্তজনবাধ্যা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুল বুদ্ধি বিধায়িনী॥
কুলকাণ্ডে মনোমত, নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মা গো জগৎ সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই
পড়ে আমি অকূল পাথারে॥

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।

নান্দীর পরেই সূত্রধারের কথা প্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত এক প্রকার অবতারণা করিয়া দেন।

প্রস্তাবনা।

নটী, বিদূষক, অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন করে তথায়ই প্রস্তাবনা কহা যায়। সূত্রধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক।

প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার। যথা—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

উদ্ঘাত্যক।

যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কথার অভিধেয়কে অপরবিধ অভিপ্রায় গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে পাত্রপ্রবিষ্ট হয় তথায় উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা কহা যায়।

মুদ্রা রাক্ষস—"প্রিয়ে সেই দুরাত্মা ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

সূত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন,

"আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্রূর আগ্রহবিশিষ্ট কোন্ দুরাত্মা সার্ব্বভৌম চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

এখানে অন্য ব্যক্তির প্রক্রান্তবিষয়ের অর্দ্ধোক্তির অভিধেয় তাৎপর্য্যবশতঃ অর্থান্তরে পরিণত করিয়া পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে, এনিমিত্ত এইখানে উদ্ঘাত্যক কহা যায়।

কথোদ্ঘাত।

সূত্রধারের কথা শুনিয়া অথবা তদীয় কথার তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হইলে কথোদ্ঘাত নামে প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা রত্নাবলীতে—

"বিধাতা যদি অনুকূল হন তবে কি দ্বীপান্তরিত কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা কি দিগন্তরগত প্রিয় বস্তু তাহার সহিত অনায়াসেই মিলন হইতে পারে। তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মে না।"

সূত্রধারের এই বাক্য শুনিয়া নেপথ্য হইতে যৌগন্ধরায়ণ সূত্রধারের বাক্যের সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,

"সকলি সত্য! নতুবা দেখ কোথায় বা সিংহলেশ্বরের দুহিতা কোথায় বা তাহার যানভঙ্গ এবং কোথায় বা তাহার কৌশাম্বীয়দিগের সহিত মিলন এবং এখানে আনয়ন ইত্যাদি।"

বেণীসংহারেও দেখ।

"পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দলাভ করুন। যেহেতু শত্রুদমন দ্বারা এক্ষণে তাঁহাদিগের বৈরনির্যাতনরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এবং যাঁহাদিগের রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে সেই ক্ষত বিক্ষত শরীর কৌরবগণও সভৃত্য সুস্থ হউন।"

সূত্রধারের এই বাক্য পাঠ করিয়া নেপথ্য হইতে ভীমসেন কহিলেন,

"রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মন্ আর তোর বৃথা মাঙ্গল পাঠের আবশ্যকতা নাই। এখনও আমি ভীমসেন জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সুস্থ থাকিবে?"

এই কথা বলিয়া সূত্রধার প্রস্থান করিলে ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগাতিশয়।

যেখানে এরূপ প্রয়োগে অপরবিধ প্রয়োগের অবতারণা অনুসারে পাত্র প্রবেশ সুসম্পন্ন হয় তথায় প্রয়োগাতিশয় কহা যায়। যথা—

যথা কুন্দমালা নাটকে

নেপথ্যে—"আর্য্যা এইস্থানে আগমন করিতে পারেন।"

সূত্রধার এই কথা শুনিয়া কহিল,

"এ আবার কোন্ ব্যক্তি আর্য্যাকে আহ্বান করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন।"

চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া

"আঃ কি কষ্ট কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেকদিন লঙ্কেশ্বর ভবনে বাস করিয়াছিলেন এই লোকাপবাদ ভয়াকুল রামকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা জনকনন্দিনীকে লক্ষ্মণ নিতান্ত গর্ভমন্থরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগমন জন্য এই যে আনয়ন করিতেছেন।"

এখানে সূত্রধারের নৃত্যপ্রয়োগ বিষয়ে স্বীয় ভার্য্যার আহ্বানের ইচ্ছাটী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতাদেবীর বনগমনাহ্বানরূপ প্রয়োগ বিশেষ সূচনা করিয়া আপন প্রয়োগের আতিশয্য সম্পাদন করিল।

প্রবর্ত্তক।

যেখানে বর্ত্তমানকাল আশ্রয়পূর্ব্বক সূত্রধার পাত্রপ্রবেশ সম্পন্ন করিয়া দেয় তথায় প্রবর্ত্তক কহে। অধিকাংশ নাটকেই এইরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায়।

অবলপিত।

যেখানে সদৃশ কার্য্য বা সদৃশ বস্তুর কথন বা স্মৃতিহেতু পাত্র প্রবিষ্ট হয় তথায় অবলপিত প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—শকুন্তলায়

"রাজা দুষ্মন্ত যে প্রকার বেগবান্ মৃগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন আমি সেই প্রকার তোমার গীতরাগে বিমোহিত হইয়া সমাক্রান্ত হইয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ দ্বারাই দুষ্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা সম্পাদন করিয়াই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রহসন—হাস্যরসোদ্দীপক নাটককে প্রহসন কহা যায়।

নাটকাত্মক আখ্যায়িকা—নভেলে প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ব্বরঙ্গ, বিদূষক, নট, নটী প্রভৃতি নাম নাই। প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যক তাহার নামই স্পষ্টরূপে লেখা থাকে।

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রন্থকারের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সভার ও দেশের বিষয়াদি বর্ণিত থাকে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকুক কিন্তু সেইপ্রকার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাৎকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজাদির বিবরণ ও আচার ব্যবহারাদির কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়।

নাটক ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকার ভাষা।

ভদ্র লোকের কথাবার্ত্তা ভদ্ররীতিতে ও সাধুভাষায় সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য লোকের ভাষা সামান্য ও চলিত কথাবার্ত্তায় হইয়া থাকে।

বিদূষক প্রায় আমোদ প্রমোদ প্রিয় ও ভোজনপটুরূপে বর্ণিত হয়।

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা নীচ পদবীস্থ ও দাসীদিগের প্রতি ওলো হাঁালো ওরে প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

সম্মানযোগ্য স্ত্রীজনদিগকে লোকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করেন।

সমযোগ্যা কামিনী গণের মধ্যে পরস্পর সখী বা প্রিয়সখী বলা রীতি।

কথাবর্ত্তা

স্বগত—অন্যের অগোচরে আপনি একাকী প্রকাশ্যে যে কথা কহে তাহার নাম স্বগত।

জনান্তিক—একজনের অন্তরালে অপর ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের নাম জনান্তিক।

আকাশবাণী—দেববাণী অর্থাৎ যে কথা অপর ব্যক্তি শুনিতে পায় না কিন্তু যাহার উদ্দেশে কথিত হয় সে ব্যক্তি শুনিতে পায়।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথা।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা অধঃপাতে গিয়াছে, এ কথায় সকলে বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমরা বিশ্বাস করি এবং এক গলা গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ করিয়া তাহা বলিতে পারি। বাঙ্গালার যে কোন আশাই একেবারে নাই, এরূপ কঠোর কথা আমরা হৃদয়ে স্থানদান করিতে পারি না; অথচ নবযুবকগণের যেরূপ রীতি নীতি হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালার যে কিছু ভরসা আছে, এমন কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে একেবারে হতাশও নহি।

কিঞ্চিৎ আশা আছে বলিয়াই, বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হয়। যখন স্বয়ং শতপীড়নে পীড়িত হইয়া, এবং শত সহস্র স্বদেশীয়কে নিষ্পেষিত দেখিয়া মনে হয়, যে "এযন্ত্রণা আর কতকাল ভুগিতে হইবে? কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব?" তখনই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, "কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? এবং না জানি কত পাপই করিয়াছি?"

পাপের স্বরূপ নির্বিশেষ উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রথমে জানিতে হইবে, বাঙ্গালা কি কি পাপ করিয়াছে, তবে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সংসারের নিয়মই এই, আপনার জন্য আপনাকে ভুগিতে হয়, আর পরের জন্য আপনাকে ভুগিতে হয়। জাতিসাধারণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কোন এক জাতির শুভাশুভ যে কেবল সেই জাতির চরিত্রের উপর নির্ভর করে এমন নহে,

অপর দশ জাতির বল বিক্রমে বা আচার ব্যবহারেও নিরীহ একজাতির ভালমন্দ ঘটিতে পারে, ও ঘটিতেছে। যদি বাবর শাহ বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও স্বজাতীয়গণ ভ্রমণশীল, যুদ্ধক্ষম, শ্রমসহিষ্ণু, দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী না হইতেন, তাহা হইলে পৌরাণিক হিন্দু সন্তান হয়ত আরও শতশতবৎসর যজনাধ্যায়ন ও ঈশ্বর চিন্তায় যাপিত করিত। যদি অর্জ্জনস্পৃহ বণিগ্‌জাতির করতলে বঙ্গদেশ এই শতাধিক বৎসর যাপন না করিত, তাহা হইলে কি এখনকার মত বঙ্গসন্তান, মানমর্য্যাদা, লোকলৌকতা, সম্ভ্রম, সৌজন্য—সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া কেবল ধনসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত হইত?

কোন একজাতির শুভাশুভ যে নানাদেশবাসীর জাতিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল বিলাতীয় বিখ্যাতনামা পণ্ডিত শুদ্ধ 'দেশবিশেষের অবস্থা হইতে জাতিবিশেষের চরিত্র নিষ্কাশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা অর্দ্ধদর্শী। সকল জাতির শুভাশুভের কারণ কেবল জড় নহে; শুভাশুভের কারণ জড় এবং জীব। যখন আমরা আমাদের বীর্য্যহীনতার উল্লেখ করিয়া বলি, যে, "শাক সিদ্ধান্ন শর্কর সেবনে আমাদের আর কত বীরত্ব হইবে?" তখন আমরা জড় প্রকৃতিকে আমাদের দূরবস্থার কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। তাহারপর অবার যখন বলি, "আর শত শত বৎসর দাসত্বের পর বীরত্ব থাকিবেই বা কি প্রকারে?" তখন আমরা জীব প্রকৃতিকে আমাদের দুরবস্থার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাস্তবিক জড় জীব উভয়েই আমাদিগের বিরোধী। বোধ হয়, জন্মলগ্নকাল হইতে জড়জগৎ আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে; আর জীবগ্রহ একটির পর একটি আসিয়া, কেন্দ্রে ভর করিয়া, অনিষ্টসাধন করিতেছে। শুনিতে পাই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সকল ব্যবস্থাই আছে, এ কুগ্রহ-শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কি কোন ব্যবস্থা নাই?

এই কুগ্রহ জড়ের অত্যাচার নিবারণার্থ বঙ্গ সন্তান কার্য্যে কোন চেষ্টা করুক বা না করুক, অন্ততঃ কথায় স্বীকার করেন, এবং হয় ত কেহ কেহ মনেও বুঝিয়াছেন। আহার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে, উচ্চ ভূমিতে বাসকরিতে, প্রশস্ত গৃহে শয়ন করিতে—বাঙ্গালি এখনও অভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন কিছু চেষ্টা করিতেছেন।

জীবপ্রকৃতির কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালি বুঝেন—কেবল বর্ত্তমান সম্বন্ধ। সেই জন্যই বাঙ্গালায় সম্বাদপত্রের সৃষ্টি, সেই জন্য সভা, সেই জন্য বক্তৃতা; সেই জন্যই বাঙ্গালার রাজনীতি, সমাজনীতি এরূপ স্বল্পায়ত। বাঙ্গালির ইতিহাস নাই; বাঙ্গালি বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন; মহাভূতের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং চিরদিন কেবল গণ্ডগোল করেন। ইতিহাসে

উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালি যে সকল মতপ্রচার করেন, তাহা সম্পূর্ণ সহৃদয়তা ব্যঞ্জক হইলেও কোন কার্য্যকর হয় না। বাঙ্গালি বর্ত্তমান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যে বাল্যবিবাহে, কুলীন বিবাহে, বিক্রয় বিবাহে, বাণিজ্য বিবাহে, বাঙ্গালার মহা অনর্থপাত হইতেছে, অমনই আশাস্ফুরিত হৃদয়ে বলিলেন, "এগুলি উঠাইয়া দাও।" একবার অতীত স্মরণ করিলেন না, কেন যে এগুলি এদেশে প্রচলিত হইল, একবার তাহার অনুধাবনা করিলেন না। একবার মনে হইল না, যে, যে যে কারণে এই সকল প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে ও রহিয়াছে, সেগুলি যদি এখনও থাকে তাহা হইলে, যত দিন না সে কারণগুলির ধ্বংস হয়, তত দিন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথাগুলি কখনই দেশ হইতে উৎপাটিত হইবে না। কারণের ধ্বংস না হইলে কার্য্যের নাশ হইবে না। সমাজসংস্করণের পূর্ব্বে প্রথমে কারণানুসন্ধান করা, ইতিহাস শিক্ষা করা, যে নিতান্ত কর্ত্তব্য একথা বাঙ্গালি আজিও স্বীকার করেন না।

জীবপ্রকৃতির তাড়নায় কোন জাতির আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতে যে বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটন হয় ইতিহাসে তাহাই বিবৃত থাকে। কোন কোন বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কতবার এইরূপ তাড়িত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এক ইংরাজদিগের কথা দেখিতেছি, আর এক মুসলমানের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা অন্ততঃ আরও দুই তিন বার ভিন্নজাতি বা ভিন্নধর্ম্মীকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নিশান বঙ্গবাসীর অন্তর্ব্বাহিরে রাখিয়া গিয়াছে; আমরা অদ্যাপি সেই সকল কলঙ্কতিলক সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। বৌদ্ধেরা আসিয়া মঠমন্দির নির্ম্মাণ করিল; আমরা ভাঙ্গি নাই; যে একটু আধটু ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছে, তাহা এখনও ভুলি নাই। সন্তাল আসিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে কালী ঢালিয়া দিল, এখন ঘুচে নাই; বক্ষে রক্ত ছিটাইয়া দিল, আমরা তাহা এখনও মুছি নাই। সেনবংশ কুলধ্বজা প্রোথিত করিয়াছেন, গৃহে গৃহে এখনও উড়িতেছে। মুসলমান আগুন লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা এখনও পুড়িতেছে।

আমরা অমায়িক; কিছুতেই আমাদিগের পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরে বেদনা বোধ হয় না। আমরা রোগী হইয়াও যোগীর ন্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। এখন অনেকেই সমাজসংস্কারকরূপে বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন। ইতিহাসের সাহায্য না লইয়া সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ মত প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের দেশের কোন একটি সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদা বিভিন্না, স্মৃতয়ো বিভিন্না; হইলে ক্ষতি ছিল না, তদ্রূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে। আমাদের কোন একটি কথার স্থির নাই। সংস্কৃতে যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, এদিকে আবার সংস্কৃতে সকল কথাই লেখা আছে; ফলে হইয়া উঠিয়াছে, এই, যে হিন্দু সন্তান ক্রমে সত্য মিথ্যা প্রভিন্ন করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে; একই পদার্থকে কেহ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া শুক্ল বলিলে বিশ্বাস করে; আর একজন সেইরূপ আর্য্যচ্ছন্দের শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বুঝাইয়া দিলে, তখনই বলে যে "হাঁ উহা কৃষ্ণবর্ণ।" দুই জনে একেবারে পীড়াপীড়ি করিলে বলে যে, "দুইই হইয়া থাকে।"

সকলের বোধগম্য হইবে বিবেচনায় সামান্য 'পঞ্জিকা' হইতে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পঞ্জিকায় লেখা থাকে, যে বিষ্ণুর দশাবতার। সত্যযুগে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ। কলিতে (হইবে) কল্কী। পৌরাণিক এসকল কথায় বিশ্বাস করেন। তাঁহার পুরাণে আরও শুনা যায়,যে পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক—দশরথ জামদগ্ন্যের ধনুর্ব্বহন করিতেন; জানকীর সহিত পরিণয়ের পরই শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের সহিত পথিমধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন। উত্তম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক হইলেন। দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনাদির গুরু ও শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। সুতরাং তিনটি অবতারের সময় অব্যবহিত পরে পরে হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে। কলির আরম্ভেও যুধিষ্ঠির রাজা এবং দ্বাপরের মধ্যেই বুদ্ধাবতার সুতরাং এক যুধিষ্ঠিরের সময়েই (কৃষ্ণ ও বুদ্ধ) দুই অবতার হইয়াছেন। অতএব পরশুরাম, দাশরথি রাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব চারিটি অবতারই এক সময়ে হইয়া উঠিল। অথচ মধ্যে একটি পৌরাণিক দ্বাপরযুগ গিয়াছে। দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের সময়ে, যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য। পৌরাণিক প্রথানুসারে এক একজনের জীবনকাল দশ সহস্র বা বিংশতি সহস্র বর্ষ স্বীকার করিলেও, কিছুতেই আট লক্ষ বা নয় লক্ষ বৎসর হইবে না। গণিতের সহিত, জমা খরচের সহিত, এসকল কথার কোন সম্পর্ক নাই। শুন, বিশ্বাস কর, আর নিদ্রা যাও।

এইরূপ সকল কথাতেই। একটু পরীক্ষা করিতে যাইলেই মহা বিপদ; কিছুতেই বুঝা যায় না, সমস্ত শিথিল হইয়া পড়ে। ভারতবাসিগণ একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন, কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া সকল কথায় সম্মতি-

দান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। একজন সেকেন্দর মাকিড়ন হইতে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর একজন সেকেন্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন; অমায়িক ভারতবাসী জানেন দুইই এক। নানা সময়ে নানা বিক্রমাদিত্য ভারতে রাজ্য করিয়াছেন, ভারতবাসী জানেন বিক্রমাদিত্য একজন। অষ্টাদশ পুরাণ, একই জনের কৃত; মহাভারত—সেই মহাত্মারই কৃত; বেদ গ্রন্থন—তিনিই করিয়াছিলেন, দ্বাপরে চন্দ্রবংশের তিনিই—ঔরস পিতা; প্রধান-দর্শন বেদান্ত—তাঁহারই কৃত। শৈব বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব—তাঁহা হইতেই আরম্ভ হয়। ব্যাসকাশী—তিনিই পত্তন করেন, বদরীনাথ মহাদেব—তাঁহারই স্থাপিত। এসকল কথায় কোন তর্ক নাই। পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস কর; আর লীলাসম্বরণ কর।

এইরূপ বিকৃতবাদে বাঙ্গালার ইতিহাস পরিপূর্ণ। আমাদের বোধ হয় বাঙ্গালার ইতিহাসের "বিসমল্লায় গলৎ" আছে, ইহার "সিদ্ধিরস্তুতে" বর্ণাশুদ্ধি আছে। এখন যে সমাজ দেখা যাইতেছে, এ সমাজের বীজ এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপ্ত হয়; আর এক সময়ে আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহার অঙ্কুর সমস্ত রোপিত হয়। ব্রাহ্মণ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। কায়স্থ আনিল কে? আদিশূর। শ্রেণীবদ্ধ করিল কে? বল্লাল সেন। আদিশূর রাজা, রাজবংশীয়েরা বৈদ্য। উপবীত প্রদান করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিল কে? সেই বল্লাল সেন। বণিক্ বঙ্গে কবে আসিল? আদিশূরের সময়ে। সেই বণিক্‌কে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া, এক জাতিকে হীনগৌরব করিল কে? বাঙ্গালার ইতিহাসের সেই দ্বিতীয় নায়ক বল্লাল সেন। বর্ত্তমান সামাজিক বিভাগ সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর এইরূপ একই। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও বাঙ্গালা কারিকা এই অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল বচনে বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব কথার পরিস্কৃতিসাধন জন্য আমরা এইরূপ বালক বুঝান প্রবাদ যে কখনই সত্য নহে, তাহাই প্রদর্শনের চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইতে আমরা এই কথার বাচনিক আলোচনা করিয়া আসিতেছি; আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেন, একথায় বিন্দু মাত্র সংশয় আছে, শুনিলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ শিহরিয়া উঠেন, যেন তাঁহাদিগের নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব লোপ করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, এইরূপ জ্ঞান করেন। এটী কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুখুয্যে মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষকে কোন রাজা আনেন নাই, ও একখানি গ্রাম দান করিয়া স্থাপিত করেন নাই, তাঁহারা বাঙ্গা-

ন্যায় দুই সহস্র বৎসর বাস করিতেছেন। তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে অগৌরবের কথা কিছুই নাই।

অতএব ভরসা করি আমাদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্ব সমীপে বিশেষ আলোচিত হইবে।

দরিদ্র যুবক।

১

চন্দ্রমাশালিনী নিশা গম্ভীর সুমতি!
নির্ম্মল নীলিমাকাশে,সুধাংশু নক্ষত্র হাসে,—
হাসায় পার্থিব, নৈশ শোভার প্রকৃতি!
ভূধর, প্রান্তর, বন, মদ নদী প্রস্রবণ,
হাসির তরঙ্গে ভাসে বিকাশি মূরতি!
হেসে পাগলিনী হল ধরারূপবতী।

২

পাদপ পাতার আর স্রোতস্বতীকূলে
ধবলফুলিত কাশে, সোহাগে খদ্যোত হাসে
শশীমুখী সন্ধ্যামণি হাসে মন খুলে;
মৃদুনৈশ বায়ুভরে, আদরে গলিয়া পড়ে;
ধবল তুহিনকণা মুক্তাহার গলে!
এসব থাকিবে কোথা, নিশি পোহাইলে?

৩

ওই যে ভূধর হতে নির্ঝর নির্ম্মল
বারিবিম্ব ভেসে যায় চন্দ্রমাতে দীপ্তিপায়,
পলকে মিশায়ে হবে যে জল সেজল!
গাঢ় জলদের ঘটা চল সৌদামিনী ছটা
গম্ভীর অশনি, ঘোর বৃষ্টি অবিরল
হইলে সহসা কোথা যাবে এসকল?

৪

ওই যে নৈশিক বায়ু মৃদুল দুলিয়া
দুলায় বৃক্ষের পাতা, দুলায় বনের লতা,
দুলায় শারদী নদী থাকিয়া থাকিয়া
সৌধ গবাক্ষেতে পশি স্বেদসিক্ত মুখশশী
কার মুছাইছে ওই আদরে গলিয়া
ওই যে মৃদুলানিল মৃদুল দুলিয়া!

৫

চঞ্চল শঠের প্রেম হীরক রতন
উপরে অমিয়ময় গোপনে গরল বয়;
আপাত সুখের পরে সংহারে জীবন!
পৃথিবী কম্পিত করি-ভূধর উপাড়ি পাড়ি
গম্ভীর কল্লোলি নীল সাগরে যখন
ভীম দুর্নিবার ঝড় হবে নিমগন

৬

তখন কোথায় রবে এসব সম্পদ?
ধীরে কি বনের লতা,ধীরে কি গাছেরপাতা
ধীরে কি গবাক্ষে লয়ে সুরভি আমোদ
দুলিবে? দুলাবে সবে? কোথায় নিবায়ে যাবে
কৌমুদী চন্দ্রমা হাসি অমৃত আস্পদ!
মেঘেতে মিশাবে সব হইবে বিপদ!

৭

হেসনা হেসনা এত হাসি ভাল নয়
নির্ম্মল হৃদয়াকাশে, অমনিই হেসে হেসে
আশার সুধাংশু হয়েছিল যে উদয়,
সেই দিন সাধ করি,হেসেছিনু মুখভরি,
অমনি আঁধার হল এ পোড়া হৃদয়
তাই বলি এত হাসি হাসা ভাল নয়!

৮

এই যে মধুরা নিশা নিদ্রিতা ধরণী,
নিদ্রা আসিলনা চখে, কিভাবিছি মনোদুখে?
কি ভাবনা—কাহারে বা বলি সে কাহিনী?
হৃদয়ের মধ্যে উঠে, হৃদয়ের মধ্যে ছুটে
হৃদয়েই লয় হয়, আপনা আপনি,
কে শুনিবে অভাগার দুঃখের কাহিনী?

৯

সংসার তড়াগ মাঝে জীবন মৃণালে
সোদর কমল নিধি, প্রতিভার প্রতিকৃতি
বিদ্যান আদর্শ হয়েছিল যত্নবলে,
বিকাশ হতে না হতে সুরার ভীষণ স্রোতে
জীবন বন্ধনে মোর অতলে ডুবালে
সুখের প্রদীপ নিবাইয়া দিলে কালে!

১০

আশ্রয় বিহীন, লয়ে শৈশব জীবনে
অপুষ্ট পাষাণ গলে, সংসার সাগর জলে,
ডুবাইনু দেহ ভাবি উৎকর্ষ রতনে
হৃদয় উৎসাহ হীন, হুতাশে শরীর ক্ষীণ
কি করিব কি হইবে যাব কোন স্থানে
ভাবিয়া কাঁদিছি নিত্য বসিয়া নির্জ্জনে!

১১

দরিদ্র মানব চিত্ত মরুভূমি প্রায়
আশা বারি বিন্দু নাই,আশ্রয় পাদপ নাই
ভিক্ষার আকাশে ঋণ মার্ত্তণ্ড পোড়ায়!
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মাঠে,দুরাশা পাবক উঠে
দুশ্চিন্তা বালুকাকণা হুতাশে উড়ায়!
দরিদ্র মানব চিত্ত মরুভূমি প্রায়।,

১২

সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীর পুতুল
উত্তাপে গলিয়া যায়, ঘুমালে জাগান দায়,
নিতান্ত শৈশব প্রিয় জীবনের মূল,
বিদেশে পরের ঘরে, পরের দাসত্ব করে,
শিক্ষার আশায় হায়! বিধি প্রতিকূল!
সোনার কনিষ্ঠ মোর ননীর পুতুল!

১৩

সকল সুখের স্রোত সুখায়ে গিয়েছে!
তবু খুজে দেখি দেখি, কোন সুখ আছে নাকি?
আছেইত মরুভূমে কমল ফুটেছে!
একটি বিশুষ্ক নালে, দুটি পুণ্ডরীক দোলে
সুবাসে পূর্ণিত, প্রাণ কাড়িয়া লতেছে
চির তপ্ত মরুভূমে কমল ফুটেছে!

১৪

এত কালে মরুভূমি করি পর্য্যটন
মৃগতৃষিকার ফাঁদে শুষ্ক কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে
এখন পেয়েছি এক সুধার সদন!
যখন যন্ত্রণাভরে প্রাণ ছাড় ছাড় করে
পৃথিবী আকাশ সম করি দরশন,
তখনি আকাশে আঁকা সুহৃদ রতন!

১৫

সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি,
লজ্জার লেপনি দিয়ে, সরলতা মাখাইয়ে
নিভৃতে নির্ম্মাণ বুঝি করেছিল বিধি,
কোমলহৃদয়া সতী, প্রণয়ের প্রতিকৃতি,
দরিদ্র আনন্দময়ী সোহাগের নদী
সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিধি!

১৬

ভ্রমি অনাবৃত দেহে হিমানীর শীতে
নিদাঘ সন্তাপে পুড়ে ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে
দিনান্তে যদ্যপি পাই সে মুখ দেখিতে!
দুর্গম কান্তারে থাকি যদি শশীমুখ দেখি,
কারাগারে বদ্ধ যদি হই তার সাতে
তথাপি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ করি চিতে!

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী।

দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত।

মেল বন্ধন। তাহার সময় নিরূপণ।

আনুষঙ্গিক তৎকালিক সামাজিক অবস্থা।

এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত এক-জনের দৌহিত্র। তদনুসারে এই দুইজন পরস্পর মাসতুত ভাই। যোগেশ্বর কু-লীনপুত্র। দেবীবর বংশজ গোষ্ঠী সম্ভূত। সুতরাং সমাজ মধ্যে দেবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্য্যাদা অধিক। যোগেশ্বর মুখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। নানা দেশীয় ছাত্রগণকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। সেই জন্য তাঁহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্র-বাদ আছে, যে তিনি অত্যন্ত আতিথেয়ী ছিলেন। নিজের দান অতি সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ করাই তাঁহার ব্যবস্থা ছিল। তাঁ-হার বদান্যতার বিষয় আপামর সাধারণের শ্রুতিগোচর ছিল না।

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রমণে নির্গত হন। দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যা-হ্নে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হই-লেন। যোগেশ্বরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে দেবীবরের জননী শশব্যস্তে দ্রুতপদে আসিয়া যথা বিহিত স্নেহ সম্ভাষণ পুরঃ-সর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেশ্বর বিনম্র বচনে অতি নম্রভাবে তদীয় মাতৃস্বসার শ্রীচরণ বন্দনা করি-লেন। তিনিও যথাবিহিত আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক যোগেশ্বরকে কহিলেন, বাছা জলপান কর, আমি তোমার জন্যে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে যাই।

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃস্বসার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা সে কুলে পদ প্রক্ষা-লনও করি না। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। আপনি মাসি আপনার অন্ন পরি-ত্যাগ করিয়া আপনার বাটীতে স্বপাকে ভোজন করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে পাতক জন্মে। এবং মাসতুত ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের মর্য্যাদার হ্রাস হয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই বলিয়া যোগেশ্বর প্রস্থান করিলেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন।

দেবীবর বাটী আসিয়া জননীকে অপ্র-সন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় মনঃক্ষুন্নের পূর্ব্বাপর সমস্ত

কারণ গুলি স্বীয় পুত্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন বাপু, যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আসিয়া সাধ্য সাধনা পূর্ব্বক অন্ন দাও বলিয়া ভোজন করে, এরূপ কোন উপায় করিতে পার, তবেই প্রাণরক্ষা করিব, নতুবা আমার এ মর্য্যাদাহীন তুচ্ছজীবনে প্রয়োজন কি! দেবীবর কহিলেন মাতঃ ক্ষান্ত হও, মনের খেদ মনেই রাখ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অচিরেই তোমার মনোমালিন্য দূর করিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই, তাহা হইলে তোমার নিকট এ মুখ দেখাইব না ও জীবন রাখিব না।

দেবীবরের জননী কহিলেন বাছা তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমার পরামর্শ শ্রবণ কর; কালীর আরাধনা কর, সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে।

দেবীবর যখন দেবীর বর পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনই তাঁহার নাম দেবীবর হয়। ইতি পূর্ব্বে ইহাঁর অন্য এক নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে তাঁহার সে নাম লোপ পায়। তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না। দেবীবরটী তাঁহার উপাধি স্বরূপ ধরা যায়।

দেবীবর বাক্‌সিদ্ধ হইয়া কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কুলাংশে কে কত দূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিশেষ পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিলেন, যে কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণবিহীন হইয়াছেন। তখন বিবেচনা করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময়।

তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চূড়ামণি দিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট কুলীন দিগের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদার পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সমস্ত কুলাচার্য্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের অভিপ্রায়ের অনুকূল পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগকে স্বপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিনস্থির করিলেন।

যেদিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে সকলের গুণ বিচার পূর্ব্বক সভার অগ্রে মর্য্যাদা সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল যে বৎস দেবীবর! তুমি যেদিন কৌলীন্যাদির নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে, সেদিন সমস্ত দিবসের জন্য কৌলীন্য বিষয়ে তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশ দণ্ডকাল মধ্যে কুল মর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকিবে; নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে কুলমর্য্যাদা প্রদান বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে না।

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ

বিশ্বাস সহকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া সপক্ষ ও বিপক্ষ মণ্ডলীর নিকট আকাশ বাণীর কথা প্রচার করিলেন।

নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল। দেবীবর দোষ দেখিয়া একবিধ দোষাশ্রিত ব্যক্তিবর্গকে এক এক দলনিবদ্ধ করেন। তদনুসারে এক একটী মেল হয়। সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটী মেলে বিভক্ত করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নলিখিত কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল। যথা

শশে যদি বিষাণং স্যা-
দাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং।
তদা যোগেশ্বরে কুলং॥

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি। ইনি দেবীবরের সমসাময়িক লোক। কেননা তিনি দেবীবরের মাসতুত ভাই ও সমবয়স্ক। দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিষ্কুল হন। দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে নিষ্কুল করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে যোগেশ্বর অনুভব করিতে পারেন নাই। তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুনর্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন ইহা প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী।

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায় কুলসম্ভূত।* ইনি দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। এই হেতু মনে করিলেন কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে দেবীবরকে অবশ্য আমায় সর্ব্বপ্রধান করিতে হইবেক। তদনুসারে তাঁহার অন্তঃকরণে আর একটি ভাব উদয় হইল। সে ভাবটী এই, দেবীবর পরম পণ্ডিত, ও সিদ্ধ ব্যক্তি। সিদ্ধ হইলেও সে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে গুরুর নাম গ্রহণ পুরঃসর স্বস্তিবাচন করে। আমিই তাহার গুরু। আমি যদি সভার অগ্রে উচ্চাসনে আসীন হইয়া তাহাকে সন্দর্শন দিয়া, তাহার প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে সে অবশ্য গুরু দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিবে।

এই মনস্কামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভার অগ্রে সভ্যগণের বিনানুমতিতে উচ্চাসনে উপবেশন যে অতীব দূষ্য ইহা দেবীবর বিলক্ষণ জানিতেন, তদনুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দেবীবর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিল দেবীবর ইহার অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বারা

* বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র ধৃত কুল পদ্ধতি।

আমাদিগের অসৌজন্য দেখান উচিত নহে। তথাপি সকলেই কর্ণাকর্ণিপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহা এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু পাছে লোকে বিদ্রূপ করে এজন্য আসন হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস দেবীবর আমি তোমার গুরুদেব, যেন আমার মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীভূত হয়।

শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন, প্রভো নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্‌দেবী আমার মুখ হইতে কি বলাইবেন তাহা আমি অগ্রে কি প্রকারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি॥

এই সকল জনশ্রুতির মূল এই,—

ডাক দিয়ে বলে দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর॥
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর।
নির্ব্বংশ দেবীবর।

মেলমালা

এখন দেবীবর যাঁহাদিগের প্রতি কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেন ও যাঁহাদিগের কুলধ্বংস করিলেন তাঁহারা কতকালের লোক তদনুসারে বিচার কর। নিম্নলিখিত ছয় ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে।

১। যোগেশ্বর পণ্ডিত।
২। দিনকর চট্টোপাধ্যায়।
৩। হরি বন্দ্যোধ্যায়।
৪। পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।
৫। ভগীরথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। সুসেন মুখোপাধ্যায়।*

উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষের গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে ত্রয়োদশ পুরুষের কাল একটা মোটামুটী ধর; প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে ২৫ × ১৩ = ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ব্বে এই কয়েক মহাত্মা জীবিত ছিলেন।

এক্ষণে শালিবাহনের শক ১৭৯৭ উহা
হইতে ৩২৫ বৎসর
অন্তর কর।

১৪৭২ দেখিবে

* যোগেশ্বরো, দিনেশশ্চ, হরিবংশধরস্তথা।
পঞ্চাননো সুসেনশ্চ ষড়েতে টেকমেলকাঃ॥
ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সঙ্গ।
জগদানন্দের সঙ্গে আইসে যে গঙ্গা॥
পঞ্চানন পূর্ব্বে ছিল সেই অংশে মেলা।
খড়দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরলা॥
হরিবন্দ্য গয়গড় পাল্টী মূল হয়।
বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয়
যোগেশ্বর খড়দহে বংশ সার হয়।
চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুল রয়॥
(বলাগড়ী নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কুলচন্দ্রিকা)

যদি বার পুরুষ ধর তাহা হইলে ৩০০ তিন শত বৎসর অন্তর কর ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইবে এবং দেখিবে যে পঞ্চদশ শকাব্দার শেষভাগে দেবীবরের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। এখন দেখ ঐ সময়টি কেমন সময়; তখন কোন্ ভাবের স্রোত চলিতেছে; তখন নবদ্বীপনিবাসী নিমাই ভূমণ্ডলে চৈতন্য দেব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তখন বঙ্গ সমাজের জাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভিনব মত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হইতেছে। চৈতন্য দেব লোকান্তরিত হইয়া তদীয় কীর্ত্তির গুণ দোষের স্তুতি নিন্দা শ্রবণ করিতেছেন। যথা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের বিধান।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে তাঁহার অন্তর্ধান॥
চৈতন্য চরিতামৃত॥

সে সময়ে বঙ্গ সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। যখন স্মার্ত্ত চূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গবাসী হইয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট মহর্ষি মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন, যে সময়টী আর একজন মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়। তখন কানা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক মিথিলাহইতে ন্যায় শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িক দিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্র বুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

উপরি কথিত মহোদয় দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবরের মেলবন্ধন ও কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়।

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমরা কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের অধস্তন বংশাবলীর উল্লেখ করিব।

বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্য্যায় অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এইটী দেবীবরের দৃষ্টান্তে হয়। পুরন্দর বসু এই নিয়ম স্থির করেন। তিনি দশরথ বসু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর। দেবীবরের পূর্ব্বে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত ছিল। দেবীবরের সময় হইতে সমান সমান পর্য্যায়ের কন্যা পুত্রে বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পিতা বরে পুত্র ও পৌত্র পিতা পিতামহের সমান পর্য্যায় থাকিয়া কুল রক্ষা করিবার অধিকারী হন।

এই সময়েই কুলীন দিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর ভেদ হয়। সেটী এই;—আর্ত্তি ক্ষেম্য ও উচিত। ১আর্ত্তিঃ—শিরোভূষণং ২ক্ষেম্যঃ—পদভূ-

ষণং। ৩ উচিতঃ সমানং। ঘটকবিশারদ দেবীবর পিতৃ পর্য্যায়ের লোকের সহিত কন্যাদানকে আর্ত্তি শব্দে ব্যাখ্যা করেন। পুত্র পর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য শব্দে নির্ণয় করিয়াছেন। সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দে নির্দ্দেশ করেন। আর্ত্তিকুল হইলে শিরোভূষণ রূপে মান্য হন। ক্ষেম্য কুল হইলে পাদভূষণ রূপে পরিগণিত হন। উচিত কুল হইলে দোষ গুণ কিছুই হয় না।*

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়াছিল। পরে এই নিয়মানুসারে চলা কুলীন দিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত হইলে অন্যান্য ঘটক বিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা

সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণ মুত্তমং।
কন্যাভাবে কুলত্যাগঃ প্রতিজ্ঞাবা পরম্পরং॥

রাঢ়ীয় কুলীনগণ পর্য্যায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কুলকর্ত্তা নিজের মর্য্যাদা পুত্র পৌত্র ভাতৃপুত্র দিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পিতা পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে অবস্থান করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগের গুণ দোষ-

* পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্র স্থানঞ্চ ক্ষেমকং।
উচিতশ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুল মুচ্যতে।
দেবীবর কারিকা।

বরদাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল। যথা

গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভিমতস্যচ
পৌত্রস্য ভাতৃপুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎকুলং।
কুলদীপিকা

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পুরন্দর বসু কায়স্থকুলের সম্মান পর্য্যায় লইয়া কুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুই গুঁই নামক দুই সন্তানের যৌবনকালে সমাজবদ্ধ হয়।* তাঁহাদিগের সমাজের নাম বড়িষা টেকা। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে, কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়। এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুরুষ গত হইলে কায়স্থ দিগের মধ্যে প্রকৃত সোপান গণানুসারে সপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপর দুইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কান্যকুব্জ দিগের ২৩ ত্রয়োবিংশতি পুরুষ হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়স্থদিগের পর্য্যায় বন্ধন হইতে এইক্ষণে কাহার ১২ বার কাহার বা ১৩ তের পুরুষ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ তের পুরুষের সঙ্গে যোগ করিলে তখন ইহাদিগের বার পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে ঘটক

* শব্দকল্প দ্রুমে কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ।

বিশারদ দেবীবর ৩০০ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কুলীনদিগের মেল বন্ধন করেন।

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে দেবীবরের মেল বন্ধন ঐ সময়েই হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কুলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাত্মা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার আর এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। অদ্বৈত মহাপ্রভুর আট সন্তান হয় তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ইঁহাকে অদ্বৈত প্রভু বিশেষ স্নেহ করিতেন। এক সময়ে এমন বলিয়াছিলেন যে,

অচ্যুতের যেই মত সেই মোর সার,
আর সব পুত মোর হৌক ছারখার;
অদ্বৈত বাক্য চৈতন্য চরিতামৃত।

এই সময় হইতেই ইহাঁদিগের কুলের গৌরব হয়। তৎকালে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া গণনীয় হন। ইহাঁদিগের মেল (পটী) বন্ধনের পারিপাট্য এই সময় হইতেই হয়। এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখা যায় যে তৎকুলে ধারাবাহিক ১১।১২ পুরুষ হইয়াছে। ইনি আবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। দেবীবর বীরভদ্র সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বীরভদ্রী থাকের অন্তর্গত করেন। বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাঁহাকে ৩২৫ সওয়া তিনশত বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই সুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় ৩২৫ সওয়া তিন শত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে না। বরং পরবর্ত্তী হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখন দেখ সে সময় আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিল কি না; সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না; তদনুসারে দেখা যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজার নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। তৎকালে বাঙ্গালা দেশে যশোহরে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত প্রভাব বর্ণিত দেখা যায়। প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনা নগরের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি আক্‌বর সা অধিরূঢ় ছিলেন।

দেবীবর কুলীন দিগকে ৩৬ প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। যথা—

১ ফুলিয়া	১৯ হরি মজুমদারী
২ খড়দা	২০ শ্রীবর্দ্ধনী
৩ বল্লভী	২১ প্রমোদনী
৪ সর্ব্বানন্দী	২২ দশরথ ঘটকী
৫ সুবাই	২৩ শুভরাজ খানী
৬ আশ্চর্য্য শেখরী	২৪ নড়িয়া
৭ পণ্ডিত রত্নী	২৫ রায় মেল
৮ বাঙ্গাল পাশ	২৬ চট্ট রাঘবী
৯ গোপাল ঘটকী	২৭ দেহাটা
১০ ভুয়ান রেন্দ্রী	২৮ ছয়ী
১১ বিজয় পণ্ডিত	২৯ ভৈরবী ঘটকী
১২ চাঁদাই	৩০ আচম্বিতা
১৩ মাধাই	৩১ ধরাধরী
১৪ বিদ্যাধরী	৩২ বালী
১৫ পারিহাল	৩৩ রাঘব ঘোষাল
১৬ শ্রীরঙ্গ ভট্টী	৩৪ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দী
১৭ মালধিরখানী	৩৫ সদানন্দ মানী
১৮ কাকুস্থী	৩৬ চন্দ্রবতী

এই ছত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক; তদনুসারে ফুলিয়া গ্রামেরও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? কৌলীন্য মর্য্যাদায় ফুলিয়া সর্ব্বাগ্রগণ্য স্থান সুতরাং স্বর্গ তুল্য। যথা

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গায় দ্বিজ মনে অভিলাষ ।।

অরণ্য কাণ্ড।

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার মনকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন তখন দেবীবরের মেল বন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামের প্রভাব হইয়াছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপের সার বলিয়া বর্ণন করিতেন না। চৈতন্য রঘুনন্দন কাণা ভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই নবদ্বীপকে সপ্ত দ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেল বন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাব হয়। ঐ কাল হইতে অন্ততঃ এক পুরুষের কাল গত না হইলে তাঁহাকে দেবতা মনে করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং ১৪৫৬ সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। ঐ কালটি যোগ করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশের একতা হইতে পারে। ১৪৮১ + ৭৮ বৎসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দ হয়। এক্ষণে খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫ এক্ষণে এই অব্দ হইতে ৩২৫ বৎসরকাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে। এই কাল পাইলেই জানা যায় যে কৃত্তিবাস ঐ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রামায়ণে নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে। যথা

গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া ।।
সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম ।।
রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা নাম সপ্ত গ্রাম ।।
সপ্ত গ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করিলেন প্রয়াণ ।।*

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কৃত্তিবাস মেল বন্ধনের পর রামায়ণ রচনা করেন।

এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসংকুল নহে, তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপন জন্য কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। মুকুন্দরাম নিজগ্রন্থে মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন। মানসিংহ ১৫১১ শকে (খৃঃ ১৫৮৯ অব্দে) বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণের গ্রন্থে তাঁহার

* আদিকাণ্ড সগরবংশ উদ্ধার রামায়ণ।

মহিমা যখন বর্ণিত হইয়াছে তখন কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার সময় ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ ধরিতে হয়। ইহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার সময় নির্দ্ধারণ করিলে কৃত্তিবাসকে আমরা ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখিতে পাই। এই সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন হয় দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; বরং স্বদেশানুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, কবিকঙ্কণে যে সংস্কৃত শ্লোকটি আছে তাহার অর্থ করিলে কবিকঙ্কণের রচনার সময় ১৪৯৯ শাক হয়। যথা

শাকে রসরস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এ শ্লোকটিকে কবির নিজের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকঙ্কণের স্ববচনের বিরোধ হয়। যথা

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে,
খিলাত পায় মামুদ শরীপে।
কবিকঙ্কণ॥

মেলবন্ধনের পর ধারাবাহিক পুরুষ গণনা করিলে ১১।১২ পুরুষের অতিরিক্ত দেখিতে পাই না। সুতরাং এখন হইতে ৩০০ শত বৎসর মাত্র কাল অগ্রবর্ত্তী হইলে কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের সমকালবর্ত্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৭৯৭ শক ইহা হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭ শক হয়। এটী যদি সত্য বল তবে কি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৩০—৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্ত্তী কালের লোক। কৃত্তিবাসকে কেন আমরা কবিকঙ্কণের ৩০।৪০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী বলি, তাহার কারণ এই কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে কোন বঙ্গীয় কবি ত্রিপদী ছন্দরচনা করেন নাই। উক্ত মহোদয় জয়দেব প্রণীত নিম্ন লিখিত গীতকে আদর্শ করিয়া গীত ত্রিপদী রচনা করেন। পূর্ব্বকালে কোন নূতন বিষয় অত্যল্প কালমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারিত না। তৎকালে একটি বিষয় সর্ব্ববাদিসম্মত করাইতে হইলে ন্যূনকল্পে ৩০।৪০ বৎসর লাগিত। তদনুসারেই কৃত্তিবাসকে আমরা মুকুন্দরামের ৩০।৪০ বৎসর অগ্রবর্ত্তী কহিতে ইচ্ছা করি। কৃত্তিবাসের পরেই মুকুন্দরাম লঘু ত্রিপদী ছন্দ গ্রহণ করেন ইতি পূর্ব্বে অন্য কেহ গ্রহণ করেন নাই।

গীত গোবিন্দ {
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং
শীলয় নীল নিচোলং॥

লঘুত্রিপদী যথা—

রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার,
কর এই উপকার।
তোমার উদ্যোগ, নহিলে দুর্য্যোগ,
কে লইবে হেন ভার॥
রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত,
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ, করিল রচন,
ভাষা কবি কৃত্তিবাস॥
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

সুতরাং ঐ সংস্কৃত শ্লোকটী আমরা কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা নিতান্ত উহাকে কবির রচিত বলেন, তবে উহাকে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাতের কাল ধরিতে হইবে।

শক ১৪৯৭ (খ্রীঃ অঃ ১৫৭৫) ইহার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে একরূপ নিশ্চয় হইল, যে দেবীবর ও যোগেশ্বর ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তৎকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব-নামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা দ্বারা ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চার প্রকৃত পথ পরিচিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অন্যদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্টান্তানুযায়ী সাধারণ লোকদিগের মনে অদ্বৈত বাদের বীজ রোপিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম যে অন্য বর্ণের বিশেষ প্রতিসিদ্ধ নহে, ইহা আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতীতি যোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মুসলমান বংশোদ্ভব রূপ সনাতনের দৃষ্টান্ত অনুসারে অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্ব জাতীয় প্রজাদিগকে সমভাবে দেখিতে হয়, ইহা এই সময়েই প্রথমতঃ মুসলমান ভূপতিদিগের হৃদ্বোধ হয়। এই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্তা মুসলমান দিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয়। এই সময়েই হিন্দু দিগের মাথা-গণতিকর (জীজীয়া নামক কর)ও তীর্থ যাত্রার শুল্ক রহিত হয়। এই সময়েই হিন্দু ভূপতি তোডরমল্লকর্ত্তৃক কর সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই সময়েই শস্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রা দ্বারা কর প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এই সময়েই

শশে যদি বিষাণং স্যা
দাকাশে কুসুমং যদি
সুতো যদিচ বন্ধ্যায়াং
তদা যোগেশ্বরে কুলং

এই পাঠের পরিবর্ত্তে "তদা যোগেশ্বরেঽকুলং" এইরূপ পাঠ স্থির হয়।

ব্যাকরণ অনুসারে পদের অন্তঃস্থিত একারের পর অকারের লোপ পায় এই সূত্র ধরিয়া দেবীবরের বাক্যসমর্থন পূর্ব্বক যোগেশ্বরের কুলরক্ষা হয়।

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান তাঁহার মেলবন্ধন দ্বারাই তিনি লোক সমাজে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক, পিতা মহের নাম (লক্ষণ) লখাই। প্রপিতামহের নাম আনো বা অনন্ত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্কেত সাগরের ভাই।

কেহ কেহ বলেন বারেন্দ্র কুলের মধু মৈত্রেয়, ধেয় (ধেঞী) বাগ্‌চী, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি, মণ্ডল মিশ্র প্রভৃতি কয়েক জন প্রসিদ্ধ লোক, দেবীবরের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

মধু মৈত্রেয় হইতে কাপের সৃষ্টি। ইনি শান্তি পুরের গোস্বামী দিগের ঘরে বিবাহ করেন। ধেঞী বাগ্‌চী ইহার ভগিনীপতি। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রবংশে কংশনারায়ণ কুলাচার্য্য একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত সমৃদ্ধিশালী জমিদার মণ্ডল মিশ্র বারেন্দ্র বংশের কুলাচার্য্য; উদয়নাচার্য্যের লীলাবতীনাম্নী কন্যার পানি গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা মধু মৈত্রেয়ের কুল রক্ষা পায়। তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রগণ কাপ হন। শান্তিপুরের পক্ষের সন্তানগণ কুলীন থাকিলেন। মধুমৈত্রেয় অদ্বৈতের ভগিনীপতি। অদ্বৈতের পিতার নাম নৃসিংহ লাডুলী। নৃসিংহের পুত্র অদ্বৈতের সহচর। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। দেবীবর বীর ভদ্রের সমকালীন লোক সুতরাং দেবীবরকে আমরা চৈতন্যের পরবর্ত্তী বলি।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

উত্তর।

১

নিবুক্ নিবুক্ প্রিয়ে! দাও তারে নিবিবারে
আশার প্রদীপ ;
এই ত নিবিতেছিল, কেন তারে উজ্জ্বলিলে,
নিবুক্ সে আলো, আমি
ডুবি এই পারাবারে।

২

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ, যুগকত,—
কত যুগান্তর;
এই আলো লক্ষ্য করি, জীবন সিন্ধুর নীরে,
দিবস যামিনী প্রিয়ে!
ভাসিয়াছি অনিবার!

৩

এখন সে আশা আলো, হায়! দূর দরশন,
সুদূর!—স্বপন!
কতবার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র-পরশন।

৪

কিবা সুখ, কিবা দুখ, কিবা দেশ দেশান্তরে
জাগ্রতে নিদ্রায়,—
স্থির নেত্রে অনুক্ষণ, করিয়াছি দরশন,
এই আশা আলো প্রিয়ে;
হায়রে! বিষাদ ভরে।

৫

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস, কালের তিমিরে হায়!
এই ক্ষীণালোক,
হয়ে ক্রমে ক্ষীণতর, হতেছিল নির্ব্বাপিত,
কেন অকরুণ প্রাণে
জ্বালাইলে পুনরায়?

৬

নিবুক্—নিবুক্ প্রিয়ে, দাও তারে নিবিবারে.
জ্বালিও না আর;
উন্মত্ত জলধিরূপ, উন্মত্ত জীবন জলে,
অস্ত যাক্ শেষতারা,
হক্ সব অন্ধকার!

৭

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়—"
জানি প্রিয়তমে!
"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়,"
কিন্তু সে পাষাণ মন
আশা ছাড়িবার নয়।

৮

প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোমল করে,
চিত্রিব যে ছবি,
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে,
পাষাণ মনের ছবি
প্রক্ষালিতে নাহি পারে।

৯

আশার আলোকে, যেই, বিশ্ব-বিনোদিনী ছবি
পড়েছে পাষাণে,
পাষাণ হৃদয়ে ধরি, ভাসি আশালোক চেয়ে
আশাময়ী আলিঙ্গনে
তরলিত হয় যদি।

১০

কিসে আশা?—কারছবি? জীবন কাহার ধ্যান
বলিব কেমনে?
বলিব কেমনে হায়! প্রেয়সি তোমার কাছে
আশা, তব ভালবাসা;
আশাময়ী—তুমি প্রাণ?

১১

ক্ষমাকর প্রিয়তমে, দুরাশয়ে মত্ত আমি,
উন্মত্ত পামর;
ক্ষমাকর দয়াময়ি, বিদীর্ণ-হৃদয় জনে,
ক্ষমাকর ক্ষণপ্রভা!
উন্মত্ত-প্রলাপবাণী।

১২

হায় যেই আশা স্বপ্ন, অন্তর অন্তরে মম
ছিল লুক্কায়িত;
কেহ না জানিত যাহা, বিনা সে অন্তরযামী,
আদরে রাখিয়াছিনু
দরিদ্রের ধন সম।

১৩

"পাষাণ মানব মন, সময়েতে সব সয়—"
শুনিলাম যবে
শোণিতে বিজলি ঝলি, হৃদয় বিদীর্ণ হলো,
আজি সেই স্বপ্নকথা
হইল জগত ময়।

১৪

নির্ব্বাপিত প্রায় আশা, আবার হইল আজি
দ্বিগুণ উজ্জ্বল!
আবার পাষাণে প্রিয়ে, তবচিত্র দেখা দিল,
জীবন সিন্ধুর জল
হাসিল আলোকে সাজি।

১৫

কিন্তু বৃথা আশা প্রিয়ে, যাবে দিন যাবে মাস,
বর্ষ যুগান্তর;
ফলিবেনা আশাময়, জীবনের এই তীরে,
কিন্তু অন্যতীরে, প্রিয়ে!
পূরাইব অভিলাষ।

আদিম মনুষ্য।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের অসীম ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই ক্ষমতা কেবল মাত্র বুদ্ধিসম্ভূত, বস্তুতঃ শারীরিক বলে মনুষ্য অনেক জন্তু অপেক্ষা হীনকল্প। কত শত বৎসরে মনুষ্যবুদ্ধি চালিত ও মার্জ্জিত হইয়া যে বাষ্পীয় কল ও তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? মনুষ্যের আদিম অবস্থার কোন পুরাবৃত্ত নাই। মনুষ্যজাতি এত কাল পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে তাহার সহিত তুলনায় ঐতিহাসিক কাল গত কল্য আরম্ভ হইয়াছে বলিলেও অযথা উক্তি হয় না। যে সকল লেখকেরা মনুষ্য সৃষ্টি খ্রীষ্ট জন্মের কেবল কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভূতত্ত্ব শাস্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মনুষ্যজাতি শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল।

কোন এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয় অধিকতর সভ্য লোকের বিনা সাহায্যে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সভ্যতা ঈশ্বর প্রদত্ত; মনুষ্য হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অসভ্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন যে, অসভ্যতাই মনুষ্যের আদিম অবস্থা ও কোন না কোন সুযোগ পাইয়া মনুষ্য ক্রমে ক্রমে আপন মানসিক বলে সভ্যপদারূঢ় হয়। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সঙ্গত তাহা মীমাংসা করা কঠিন। লিখিত ইতিহাস অতি সামান্য কাল অর্থাৎ প্রায় ২৫০০

বৎসর আরম্ভ হইয়াছে ও আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্যজাতিদিগের সহিত ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় ৪০০ বৎসর ঘটিয়াছে। অধিকন্তু যে সময়ে অসভ্য জাতীয় লোকের সহিত সভ্যজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ হয় সেই সময় হইতেই অসভ্যজাতির অবস্থা পূর্ব্বমত থাকে না সুতরাং ইতিহাস বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপরোক্ত দুই মতের কোন এক মতের পোষকতা করা সুকঠিন। পরন্তু বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে যে স্থানে কোন অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক নাই সেই সেই স্থানে মনুষ্যের বুদ্ধি ও কার্য্য কুশলতা উত্তরোত্তর পরিপকতালাভ করিতেছে। ঐতিহাসিক কালের প্রথমে যদিও গ্রীক্, রোমক ও হিন্দু জাতীয়েরা অনেক বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়া ছিল কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয়দিগের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে না। যদি মনুষ্যজাতির ক্রমশঃ মানসিক উন্নতি স্বীকার করা যায় তবে ইহাও স্বীকার্য্য হইতে পারে যে আদিম মনুষ্য ঐতিহাসিক কালের মনুষ্যাপেক্ষা বুদ্ধি ও মানসিক বলে অনেকাংশে হীনকল্প ছিল। অকাট্য প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আদিমাবস্থার মনুষ্যজাতি সমূহ নিঃসহায় ও আত্মরক্ষা জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তখন পৃথিবীতে এক প্রকার পশ্বাদির রাজত্ব ছিল। তখন আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্যের যত সময় অতিবাহিত হইত। যে মানসিক বলে মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই মনের উন্নতির জন্য তাহার কিছুমাত্র সাবকাশ ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মনুষ্যের আদিমাবস্থার কোন লিখিত পুরাবৃত্ত নাই। কিন্তু পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেক ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃতকালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে মানবজাতি বাটীনির্ম্মাণকৌশল জানিত না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায় গিরিগুহায় বাস করিত; ক্রমে পর্ব্বতাবৃত স্থান সকল অধিকৃত করিয়াছিল ও সুবিধা মত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। এই সকল গিরিগুহা প্রভৃতি আদিম বাসস্থানে ও তাৎকালিক সমাধি মন্দির সমূহে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দ্বারা আদিম মনুষ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডারউইন, হক্স্লি প্রভৃতি কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মতে মনুষ্য বানর জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিমূলক তাহা স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু

মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে মনুষ্য ও বানর স্বতন্ত্র জাতি। মনুষ্য বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা বানর মনুষ্যের সন্ততি নহে। ঐতিহাসিক কালে বা তৎ পূর্ব্বে বানরের অবস্থা যে কখন উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। বানর চিরকালই শাখামৃগ আছে। তাহার হস্ত পদাদির গঠন স্বতন্ত্র। বানর কখনই অগ্নির ব্যবহার জানে না ও শিখিতেও পারে না, বানর কখনই রন্ধন পদ্ধতি শিখিতে পারিবে না ও এপর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে মনুষ্যের উন্নতির ইয়ত্তা নাই। প্রথমে মনুষ্য হীনবল নিঃসহায় কেবল আত্মরক্ষায় ও আত্মপোষণে সকল সময় অতিবাহিত করিত। অতি আয়াসে ও বহুকষ্টে দিন২ বন্য পশুর অপক্ক মাংসে উদর পূরিত করিত, সময় বিশেষে মনুষ্য মাংস বা শৃগাল ও ইন্দুরের মাংস তাঁহার অভক্ষ্য ছিল না। ক্রমে অগ্নির আবিষ্ক্রিয়া হইল, তখন দগ্ধ মাংস ভোজন, প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির গঠন ও ব্যবহার ও পশ্বাদি পালন আরম্ভ হইল। তৎপরে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার ও কৃষি কার্য্যের আরম্ভ, শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া ও কৃষি কার্য্যের উন্নতি। গুহাবাসী মনুষ্য পর্য্যায় ক্রমে শিকারী, পশুপালক, কৃষিজীবী হইয়া শেষে বাহ্যিক সমস্ত বিষয়ে নিরুদ্বেগ হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে। মনুষ্য প্রথমে হীনবল ও নিঃসহায় ছিল, এক্ষণে মনুষ্য পৃথিবীর অধিপতি। জ্ঞানবলে মনুষ্যের অবস্থার আরও যে কত উন্নতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

ইউরোপখণ্ডে গিরিগুহা প্রভৃতি পূর্ব্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধিমন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম প্রস্তর কাল, দ্বিতীয় ধাতু কাল। ইউরোপ সম্বন্ধে এই দুই কালের কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে।

১ম প্রস্তর কাল—এই কালে কোন ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই। মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিত না। এই কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা সমুদায় প্রস্তর নির্ম্মিত। কোন২ অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত। এই কাল তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম কালে ম্যামথ অর্থাৎ কেশর যুক্ত হস্তী ও গুহাস্থিত ভল্লুক, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড২ জীব সকল বর্ত্তমান ছিল। এই সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এককালে তাহারাই ইউরোপের অনেক দেশের অধিকারী ছিল। মনুষ্য তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত ও অতি কষ্টে সামান্য

প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এই সময় কেবল গিরিগুহাই মনুষ্যের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় কালে কেশরযুক্ত হস্তী প্রভৃতি বড়২ পশুর চিহ্ন আর লক্ষিত হয় না। কিন্তু সমস্ত ইউরোপ তখনও হিমপ্রধান দেশ ছিল। বেনডিচর প্রভৃতি যে সকল পশু এক্ষণে হিম প্রধান দেশে আশ্রয় পাইয়াছে, এই সময়ে তাহারা ইউরোপের প্রায় সকল দেশে বিচরণ করিত। এই কালে মনুষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ভয় হইয়া ছিল। গিরিগুহা ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের আবৃত স্থানে অথবা হ্রদ মধ্যে দ্বীপ নির্ম্মাণ করতঃ তথায় কাষ্ঠ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাসকরিত। এই কালের অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তর ও বেনডিচরের শৃঙ্গ নির্ম্মিত দেখা যায়। এই কালে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র দেখা যায়, বোধ হয় এই সময়ে মনুষ্য শিকারে বিশেষ পটু ছিল। তৃতীয় পোষিত পশুর কাল। এই কালে গো অশ্ব কুক্কুর প্রভৃতি অনেক পশু মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাত্যহিক আহার বিষয়ে মনুষ্যের পূর্ব্বমত অনিশ্চিত ছিল না কিন্তু পশুপালনের সুবিধা জন্য সময়েং বাস পরিবর্ত্তন করিতে হইত। এই সময়ের প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে অধিক পারিপাট্য ও বুদ্ধিকৌশল লক্ষিত হয়।

২য় ধাতুকাল। এই কাল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াই লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি শিখিতে পারে নাই। Bronze বা পিত্তল প্রস্তুত করা অতি সহজ কিন্তু খণিজাত দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সহজ নহে। ধাতুর আবিষ্ক্রিয়া হইলে পর প্রথমতঃ কেবল পিত্তল নির্ম্মিত অস্ত্র ও তৈজসাদির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালের বাসস্থানে লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া যায় না; এই কালে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকিবে কারণ কেবল কৃষিকার্য্যোপযোগী পিত্তলের দ্রব্যাদি এই সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কালে মনুষ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় কিন্তু পিত্তলের দ্রব্যাদিব্যবহারজনিত অনেক কার্য্যের অসুবিধাও ঘটিত। শেষে লৌহের আবিষ্ক্রিয়া হয়। কি প্রকারে যে এই অমূল্য ধাতু প্রথমে মনুষ্যের পরিচিত হইয়াছে তাহা স্থির করা কঠিন। বোধ হয় অভাব অনুভূত হইলেই মনুষ্য বুদ্ধি স্বয়ং অভাব পূরণ করে। লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হওনাবধি মনুষ্যের বাহিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কালের পরেই ঐতিহাসিক কালের আরম্ভ। মনুষ্য জাতি লৌহের নিকট যে কত প্রকার ঋণী আছে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় লৌহের আবিষ্ক্রিয়া না হইলে ইউরোপীয় সভ্যতা মিসর, মেক্সিকো ও পেরুদেশের আদিম সভ্যতার সহিত অদ্যাবধি সমপদস্থ থাকিত।

কুঞ্জবনে কমলিনী।

১

না আইল কালাচাঁদ, যায় যে যামিনী;
কুঞ্জবনে কমলিনী হইল মলিনী;
দেখা দিল সুখতারা, না উদিল সুখতারা,
কেন নাহি কান্তিহারা হইবে কামিনী?

২

স্মরশর জর জর ক্লান্ত কলেবর;
কম্পমান অনুক্ষণ হিয়া থর থর;
আশানাশে হীনবল, তনুতরী টলমল;
আঁখি করে ছল ছল বিপদে বিস্তর।

৩

কতক্ষণে মনকথা অতি ধীরে ধীরে
কহিলা কাতরে রামা, সম্বোধি সখীরে।
কেনা জানে সিন্ধুনারী, হৃদয়ে ধরিতে নারি,
বর্ষাগমে ফেলে বারি উছলিয়া তীরে?

(প্রভাতের তারা)

১

সখিলো
বিফলে রজনী যায় প্রাণকান্ত এল না।
এ মনের ঘোরতর প্রেমজ্বালা গেল না।
ওই দেখ সুখতারা, দিবাদূতী দিব্যাকারা,
আমারে করিতে সারা, বিকশিত বদনা;
নিশার আঁধার যাবে, আমারে আঁধারে পাবে,
সহে না সজনি আর এ বিষম যাতনা।

২

সখিলো
অচিরে উদয়াচলে হৈম উষা হাসিবে,
আমার সকল আশা একেবারে নাশিবে।
হেরি তার মন্দ হাসি, যেনরে জলদরাশি,
শরীরে প্রবেশি আসি, সুখশশী গ্রাসিবে।
দেবতা হইয়া কেন, তাহার স্বভাব হেন?
উচ্চ কি নীচের দুখে রঙ্গরসে ভাসিবে?

৩

সখিলো
কেন আজি রসরাজ আসিবারে ভুলিল?
মিছা অঙ্গীকার করি এদাসীরে ছলিল?
বল, সই, বল, বল, দেহে আর নাহি বল,
বিকল হিয়ার কল, একি ভাব ধরিল?
অথবা কি দেখি দোষ, শ্যাম করিয়াছে রোষ?
অভাগিনী সে চরণে কিসে দোষী হইল?

৪

সখিলো
শুনিব না আর কি লো সে মধুর বচন?
দেখিবনা আর কি সে প্রেমোৎফুল্ল লোচন?
আর কিসে মুখে হাসি, মেঘে সৌদামিনীরাশি
সকাশে বিকাশি আসি, রঞ্জিবেনা জীবন?
আর কিঁ প্রণয়োল্লাসে, বসিয়া আমার পাশে,
তুষিতে আমারে নাথ করিবে না যতন?

৫

সখিলো
সে অঙ্গ—পরশে পুনঃ বহিবে কি শরীরে
সুধাময় সুখানিল নিন্দি মন্দ সমীরে?
পাইয়া নূতন বল, হৃদয় জলধিজল
উথলিয়া টল টল করিবে কি অচিরে?
লোমাবলী কলেবরে, শিহরি কি প্রেমভরে,
মনের আনন্দ পুনঃ প্রকাশিবে বাহিরে?

৬

সখিলো

ওই দেখ জলধর রোষাবেশে আসিয়া

স্বর্ণময়ী সুখতারা ফেলিল লো গ্রাসিয়া।

আমার অন্তরাকাশে, যে সুখের তারা হাসে,

সেও লো বিরহগ্রাসে মৃতপ্রায় বিষিয়া।

পশি যেন বাঞ্ছা করে, বিস্মৃতির সরোবরে,

যাই যেন একেবারে অন্ধকারে মিশিয়া।

৭

সখিলো

সরিল জলদদল: বাহিরিল দেখ না

প্রভাতের প্রিয়তারা প্রফুল্লিত-বদনা।

ঘটিবে কি এ কপালে, বিচ্ছেদ-বারিদজালে

ছেদিতে পারিব কালে, বল, সই, বল না?

দুর্ব্বল অবশ তনু, প্রতিক্ষণে হয় তনু;

কোথা পাব নব বল পূরিতে এ বাসনা?

(অস্তাচলগামী চন্দ্র)

১

ওই দেখ দাঁড়াইয়া আকাশের পাশে

যামিনী বিলাসী;

পাণ্ডুবর্ণ কলেবর, কাঁপিতেছে থর থর,

কপোল নয়নজলে যাইতেছে ভাসি;

ছাড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া;

প্রেমবিনা এ সংসার অন্ধকার রাশি;

কেনরে গোকুল চাঁদ ভুলিল আমারে?

বিষের জ্বলনে জ্বলি ভব কারাগারে।

২

বিরহ রাহুর ভয়ে শশীর এদশা

গগন মণ্ডলে;

দেবতার বুদ্ধি হত, মানুষের সহে কত,

দুর্ব্বল মানব কুল সকলেই বলে;

অবলা মনুজে নারী; যন্ত্রণা সহিতে নারি;

জীবন জ্বলিছে যেন বাড়ব অনলে;

বল স্বজনিলো বল বাঁচিব কেমনে?

অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে।

৩

প্রেমের কমল, হায়, মানস সরসে

ফুটিবে কি আর?

হৃদয় গগনরবি, সংসাররঞ্জন-ছবি,

উষার সহিত দেখা দিবে কি আবার?

লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতম্বিনি?

আমারে ঘেরিয়া আছে চির অন্ধকার।

এ নিশার অবসান হবে কিলো সই?

আর কার কাছে মোর মনকথা কই।

৪

কেন সই তোর আঁখি করে ছল ছল

বল্ না আমারে?

কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণাঘোর?

কিসে তোর ফুল্লমুখ গ্রাসিল আঁধারে?

বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,

সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিস্তারে।

যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল;

যথায় শীতের গতি, সৌন্দর্য্য নির্ম্মূল।

৫

স্বজনিলো সরোবরে দেখনা কাঁপিছে

ভয়ে কুমুদিনী,

নয়ন মুদিত প্রায়, যেন অবসন্ন কায়,

নাথ যায়, বলি হায়, এমন মলিনী।

না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ

যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী।

নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায়।

কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায়?

৬

বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস,
বৃন্দাবন ধন।
কত প্রেমকথা কয়ে, আমায় হৃদয়ে লয়ে,
করিতে পুলক কায়ে সাদরে চুম্বন।
একেবারে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ?
অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন?
অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—
অমৃত হইল বিষ, লো প্রিয় ভগিনি।

(কোকিল)

১

ওই শুন, স্বজনিলো, সুললিত স্বরে
কে যেন গাইছে গীত, বিহরি অম্বরে;
রাগের তরঙ্গ উঠে, যথা পূতধারা ছুটে
বিষ্ণু পাদপদ্ম ফুটে, যবে মোক্ষতরে
বাঁধিতে আশার সেতু, পাপবিনাশের হেতু,
উড়াতে ধর্ম্মের কেতু, এ বিশ্ব ভিতরে,
বিশ্বরূপ নিরঞ্জন, সৃজিলা সহর্ষমন
জ্যোতির্ম্ময়ী নীরময়ী গঙ্গায় সত্বরে।

২

সঙ্গীত গাইয়া যদি ভ্রমিছ গগনে
দয়াময় দেব কেহ, নিবেদি চরণে;—
কহ এ দাসীর কথা, নীলকান্তমণি যথা,
শুনিলে অবশ্য ব্যথা হবে তাঁর মনে।
না পাইয়া কালাচাঁদে, বৃকভানু সুতা কাঁদে,
পড়িয়া বিষম ফাঁদে বিরহ দহনে;
অবসন্ন কলেবর, কাঁপিতেছে নিরন্তর,
ব্যাকুল বিকল প্রাণ নিকুঞ্জ কাননে।

৩

যে যন্ত্রণা জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার,
নিবাইব কি প্রকারে? এ যে অনিবার।
শরীরে চন্দন দানে, বোধ হয় অগ্নি হানে;
সলিল মৃণাল স্থানে নাহি প্রতীকার।
পদ্মপত্রে পদ্মদলে, দ্বিগুণ এ দেহ জ্বলে;
চন্দ্র যেন হলাহলে বর্ষে বারম্বার;
মলয় পবন ছায়া, হইয়াছে উষ্ণ কায়া;—
হায় বিধি ঘটাইলে কি ঘোর বিকার!

৪

শুন পুনঃ, সহচরি, কে আবার গায়?
এ বুঝি বসন্তসখা অমৃত ছড়ায়।
মোর দুখে পিকবর, হইয়া কি সকাতর,
এরূপ বিলাপ কর, বল না আমায়;
দেখিয়া আমার মুখ, তোমার কি নাহি সুখ,
মলিন কি তব মুখ হইয়াছে হায়?
যে যাহারে ভাল বাসে, তার দুখে দুখে ভাসে,
প্রণয়ের এই রীতি সতত ধরায়।

৫

ভাল বাস মোরে তুমি জানি হে কোকিল,
বরষিতে তুমি হেথা সুস্বর সলিল,
যখন শ্যামের সনে, বসি সুখে একাসনে,
প্রণয়ের আলাপনে আতিল পাতিল,
বকিতাম কব কত, মত্তভাবে অবিরত,
বর্ষাবারি স্রোতমত উল্লাসে অখিল,
আনন্দ তরঙ্গ সঙ্গে, উৎসাহে অন্তর রঙ্গে,
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে শিথিল।

৬

হে পিক, তোমার ডাকে আসেন তপন,
প্রফুল্লিত করিবারে নলিনীবদন;
শুনিলে তোমার গীত, বসন্ত হইয়া প্রীত,
বিতরেন চারিভিতে সৌন্দর্য্য শোভন;
মরে রাই কমলিনী, অনুক্ষণ বিষাদিনী,
অশ্রুত্যাগ বিলাপিনী করে ঘন ঘন;

তাহার বসন্ত রবি, বিশ্ববিমোহন ছবি,
আনি দেহ মধুবঁধু, মোর নিবেদন।

(ঊষা)

১

সৌরভ মণ্ডিত হেম কলেবর;
কপালে উজ্জল তারকা জ্বলে;
কোকিল কূজন ভাষ মনোহর;
বিকচ কুসুম মালিকা গলে;
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এবেশ ভূষা।

২

পেয়ে প্রিয়কর বিকশিত হাসি,
বদন বসন খুলিয়া ধীরে,
অলি গুন গুন মধুর সম্ভাষি,
নাচয়ে নলিনী সরসীনীরে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশ ভূষা।

৩

রসে টস্ টস্ বসন্ত বল্লরী
গাঁথিয়া পরিয়া ফুলের হার,
প্রিয় চূততরু জড়াইয়া ধরি
বিস্তারি সুখের সুগন্ধ ভার।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোকবসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

৪

রসাল মঞ্জরী, বকুলের ফুল,
ফুটিয়া কেমন রয়েছে গাছে;
চুম্বিয়া আনন্দে দেখ অলিকুল
গুঞ্জরিয়া গান করিছে কাছে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশভূষা।

৫

বিগত বিরহ নিশা অবসানে
চক্রবাক্ যুগ সহর্ষমুখে,
চাহে পরস্পর পরস্পর পানে,
মগন নূতন প্রণয় সুখে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশ ভূষা।

৬

মিলনে সকলে পুলকে বিহ্বল,
নাহিক মিলন এ পোড়া ভালে;
আমায় কেবল, ঘেরে অবিরল,
বিষম বিরহ তিমির জালে।
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে
আইল আলোক বসনা ঊষা।
বিফলা রজনী সখার বিহনে,
কুক্ষণে করিনু এ বেশ ভূষা।

(মলয়ানিল)

১

বন পরিমল বাসিত শীতল
মলয় অনিল মধুরভাষী,

"দিনেশ আইল," বলিতে ধাইল;
বন্দে ফুলকুল আনন্দে হাসি।
কি কাজ সমীর একুঞ্জে আসি?
বাঞ্ছ কি বহিতে বিষাদরাশি?

২

অবলা বালায়, হেথায় জ্বালায়—
বিকট কবল বিরহানল;
হিয়া উথলিয়া, নয়নান্ত দিয়া
বহে অবিরল শোকাশ্রুজল;
নাথের বিহনে হারাই বল
কেমনে অধীনী সহে সকল?

৩

আশ্রয় বিহনে ভবের ভবনে,
রমণী বাঁচিয়া রহে কেমনে?
লতিকা ললিতা, তরুর আশ্রিতা;
চপলা নিয়ত জড়িত ঘনে;
নলিনী জীবিত সরজীবনে;
কৌমুদীর স্থান চন্দ্র বদনে।

৪

জানি এসকল, দলে অবিরল,
রমণী মণ্ডলে পুরুষ দল;
ফিরে ফুল কুল, জিনি অলিকুল,
জিনিয়া অনিল, সদা চপল;
নূতন অমিয়ে চাহে কেবল।
না গণি আশ্রিত জন কুশল।

৫

নির্ম্মম এমন, তথাপি আনন
সতত সুধার সুধারা ঢালে;
কথায় ভুলায়, অবলা বালায়,
কেমন মোহন মায়ার জালে।
হৃদে হলাহল অমিয় গালে;
জুটিয়াছে ভাল নারীর ভালে।

রজনী।

চতুর্থ খণ্ড।

(পুনর্ব্বার শচীন্দ্র বক্তা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কিছুদিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনে, মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিজন্য এই পীড়ার উৎপত্তি তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতে ছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ় তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি তত পড়িতে সাধ করে। শেষ

শ্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্য বস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে, প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কল কল নাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা উষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক্ প্রভাসিত হইতেছে—দেখি সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে, রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে,ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কুঞ্চিতভ্রূ, বিকলা, অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগিরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম,কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমুঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে. নামিতেছে! ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে! তুমি সর্ব্বত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী,—সুবদনী, সুহাসিনী—

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতন প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী। ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে, জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম—ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্যদিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেকদিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনী রূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া—চিকিৎসকেরা কি চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে, আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে, রজনি ধীরে! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে না জানে পাষাণ ও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যতই দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয় দেখিলাম কই? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায়, আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালীন কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপোক্তি সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবন নিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণ প্রান্তরে হীরক বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে, অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনি! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, নয়নরাজীব

ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জ্জার, ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

শিবজি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান রাজত্বকালে আর্য্যকুলে যে সকল বীরগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, বোধ হয়, কেহই শিবজির ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তিনি কেবল ভারতবিজয়ী মোগল পতাকা দলিত করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বজাতিকে এরূপ সজীব ও সতেজ করিয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থল কম্পান্বিত হইয়াছিল। ঈদৃশ মহাত্মার জীবনচরিত যত পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই উপকার লাভের সম্ভাবনা। এজন্য তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধলোকের মুখে যে বর্গিদিগের দৌরাত্ম্য বৃত্তান্ত শুনিতাম, তাহাদিগের অপর নাম মহারাষ্ট্রীয় বা মারহাট্টা। মহারাষ্ট্র প্রদেশের পূর্ব্বসীমা বরদা নদী; উত্তর সীমা সাতপুর গিরিমালা; পশ্চিম সীমা সাগর; দক্ষিণ সীমা গোয়ানগর হইতে মাণিক দুর্গ পর্য্যন্ত একটী কল্পিত বক্ররেখা। এই ভূভাগে সহ্যাদ্রি বা ঘাট পর্ব্বত সমুদ্রসলিল হইতে দুই তিন সহস্র হস্ত উর্দ্ধে শৃঙ্গ নিকর তুলিয়া সিন্ধুকূলকে পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দক্ষিণোত্তর ধাবিত হইয়াছে। শৈল-পদতল হইতে অর্ণব তীর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডের নাম কঙ্কণ; তথায় নিবিড় কানন, উচ্চপর্ব্বত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, দুরারোহ গিরিসঙ্কট, প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। পার্ব্বতীয় বিভাগে অনেক গুলি স্বাভাবিক দুর্গ আছে; অল্লায়াসেই সেগুলিকে দুর্ভেদ্য করা যায়।

সাধারণতঃ মহারাষ্ট্র শৈলময়; এবং তাহার জল বায়ু এত উত্তম যে বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি এমন নাই। এই প্রদেশে নর্ম্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, ভীমা এবং কৃষ্ণা প্রবাহিতা রহিয়াছে; এই সকল নদীর উভয় কূলস্থ ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; এবং তথায় অনেক শস্য জন্মিয়া থাকে। গোদাবরী ভীমা এবং তৎশাখা নীরা ও মান, ইহাদিগের তট-

বর্ত্তী স্থান সমূহে ভাল ভাল অশ্ব জন্মে; তাহারা উৎপত্তিস্থল ভেদে গঙ্গথরী,* ভীমথরী, নীরথরী, এবং মানদেশীনামে খ্যাত।

অপরাপর পার্ব্বতীয় দেশবাসীদিগের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী। যদিও তাহারা রাজপুতদিগের ন্যায় সুশ্রী ও দীর্ঘদেহ নহে, তথাপি সাহসে ও শক্তিতে তাহারা রাজপুতগণাপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে; এবং বুদ্ধি ও চতুরতায় বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অন্যান্য স্থানীয় হিন্দু কামিনী কুলের ন্যায় অন্তঃপুরনিরুদ্ধা নহেন। তাঁহাদিগের অনেক দূর স্বাধীনতা আছে; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অশ্বারোহণ করিতে জানেন।

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন বিবরণ অপ্রাপ্য। কিন্তু বিবেচনা হয় যে এককালে তাহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ছিল। খৃষ্টাব্দের সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই প্রদেশের টগর নগরে মিসরের বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিতেন; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেও গ্রীকেরা তথায় বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে আগমন করিতেন। এই প্রদেশের গোদাবরীতটস্থ প্রতিষ্ঠান পুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পরাক্রান্ত শালিবাহন শকাব্দা প্রচলিত করেন; এবং এই প্রদেশেই জগদ্বিখ্যাত কৈলাশধাম সমন্বিত ইলোরাস্থ ক্ষোদিত গিরি গহ্বরমালা দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, বিচিত্র গঠিত স্তম্ভ ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য সমূহে পরিশোভিত হইয়া কোন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন প্রতাপশালী জাতির পূর্ব্বাধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসং এদেশে আগমন করেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের এত বল বিক্রম, যে দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত করতলস্থ করিয়া মহারাষ্ট্র হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। মুসলমান্দিগের দক্ষিণাপথ প্রবেশকালে* এই প্রদেশস্থ দেবগিরিতে যাদববংশীয় রাজা রামদেব রাজত্ব করিতেছিলেন;‡ প্রচণ্ড আলা উদ্দীন তাঁহার রাজ্যধ্বংস করিলে পর অনেককাল পর্য্যন্ত মাহারাষ্ট্রের আর কোন জীবিত লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুসলমানদিগের লিখিত ইতিবৃত্তে আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। মহারাষ্ট্র তৎকালে দক্ষিণাপথস্থ বিজয়পুরের আদিলসাহী ও আহম্মদ-নগরের নিজামসাহী রাজ্যভুক্ত ছিল। উক্ত

* মহারাষ্ট্রীয়েরা গোদাবরীকে গঙ্গা বলিয়া থাকে।

* খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

‡ রাজা রামচন্দ্রের রাজত্বকালে বৈয়াকরণ বোপদেব প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ভাগবতপুরাণ লেখক বলিয়া প্রবাদ আছে। হেমাদ্রি রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন।

রাজ্যদ্বয়ের চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিত, এবং পার্শ্ববর্ত্তী নৃপালবর্গের সহিতও তাঁহাদিগের অনেক সময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইত। এজন্য মারহাট্টা প্রজাগণের মধ্য হইতে তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষদলের কেহ কেহ সেনাপরিপোষক জায়গির ও সম্মানসূচক পদবী পাইয়াছিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিন দিন এত উন্নতিলাভ করেন যে শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতে হইতে বিজয়পুরপতি হিসাবপত্রে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে মারহাট্টা ভাষা ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন এবং দলিলদস্তাবেজ উভয় ভাষায় লিখিতে বলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহম্মদনগরে দুইটি, এবং বিজয়পুরে সাতটি, মহারাষ্ট্রীয়বংশের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। নিরন্তর সংগ্রাম ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া মারহাট্টারা সাহসী ও সমরকুশল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্বদেশের গৌরব বুঝিত না; এবং বিধর্ম্মী যবনদিগের মহিমাবৃদ্ধি নিমিত্ত সমধর্ম্মা ও আত্মীয়দিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একতা, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বধর্ম্মানুরাগ মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যে প্রতাপশালী ঐন্দ্রজালিক তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য হিন্দুকুলের অলঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা আরম্ভ করা যাইতেছে।

পুনানগরীর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে শিবনারী দুর্গে ১৫৪৯ শকের বৈশাখ মাসে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসরের উদয়ে শিবজির জন্ম, তাঁহার অন্তকালে সাজাহানের দিল্লীসিংহাসন সমারোহণ। রত্ননির্ম্মিত ময়ূর সিংহাসন, বিচিত্ররচিত তাজমহল, নগরসদৃশ বৃহদায়তন সুদৃশ্য পটমণ্ডপ প্রভৃতি মোগল সমৃদ্ধির চরমোন্নতিসূচক চিহ্ন নিচয়ের সূচনা না হইতেই, মোগল সাম্রাজ্য বিলয়কারীর আবির্ভাব হইল। মুসলমানেরা বলিতে পারেন, পুষ্পটি ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত না হইতে হইতেই, মধ্যে কীট জন্মিল। হিন্দুরা বলিবেন, কাহারও অতিবৃদ্ধি হইতে দিবার পূর্ব্বে বিধাতা তাহার পতন বিধান করেন।

পঙ্কজাত পদ্মসদৃশ শিবজি নীচকুলোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি বহ্নি হইতে প্রজ্বালিত বহ্নির ন্যায় শূরবংশসম্ভূত। তাঁহার পিতা সাহজি ভোঁসলা বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত। সাহজি আহম্মদ নগরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন, এবং পতনোন্মুখ নিজামসাহী রাজ্যরক্ষার্থ বারম্বার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তদুচ্ছেদ নিবারণে অসমর্থ হইলে বিজয়পুর রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণানন্তর কর্ণাটে বিজয়পতাকা উড্ডীন করত একটি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের সূত্রপাত করেন।

শিবজির মাতা জিজিবাই* লক্ষজি যাদবরাও দেশমুখের † কন্যা। লক্ষজি আহম্মদনগরাধিপতির নিকটে দশ সহস্র অশ্বারোহী প্রতিপালনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ জায়গির পাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দেবগিরির রাজাসনে আসীন ছিলেন। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাদবেরা মহারাষ্ট্রীয় দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

শিবজির পিতামহ মল্লজি ১৪৯৯ শকে লক্ষজির অনুগ্রহে নিজামসাহী রাজ্যের একটি সামান্য অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৫১৬ শকে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। আহম্মদনগরস্থ সাহ সরিফ নামক পীরের প্রার্থনায় পুত্রকামনা সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, সন্তানের নাম সাহজি রাখিলেন। সাহজির বয়স পাঁচ বৎসর হইলে একদা মল্লজি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দোলযাত্রার উপলক্ষে যাদবরাও দেশমুখের আলয়ে গমন করিলেন। লক্ষজি সাহজির সৌন্দর্য্য ও প্রফুল্লতা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে আহ্লাদ সহকারে নিকটে ডাকিলেন এবং আপনার তিন চারিবর্ষবয়স্কা নন্দিনী জিজিবাইর পার্শ্বে বসাইলেন। বালক বালিকা আমোদে খেলা করিতে লাগিল, দেখিয়া সানন্দ হৃদয়ে যাদবরাও পরিহাসচ্ছলে দুহিতাকে বলিলেন "দেখ তোমার কেমন বর আসিয়াছে;" এবং সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ইহাদিগের বিবাহ হইলে কেমন সাজে।" এই সময়ে ভোঁসলা কুমার এবং যাদব কুমারী পরস্পরের প্রতি আবির নিক্ষেপ করাতে, সভায় হাসি উঠিল। এই হাস্যরতঙ্গ মধ্যে মল্লজি উঠিয়া বলিলেন, "সকলের যেন স্মরণ থাকে, লক্ষজি আমার পুত্রকে কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন।" ইহাতে কেহ কেহ সম্মতি প্রদান করিল; কিন্তু যাদবরাও বিস্মিত এবং অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরদিন লক্ষজি মল্লজিকে নিমন্ত্রণ করিলে, মল্লজি বলিয়া পাঠাইলেন, "যাদবরাও আমার পুত্রকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব না।"

যাদবরাও শুনিয়া সম্মত হইলেন না, বরং ক্রুদ্ধ হইলেন। কেন না হইবেন? তাঁহার প্রসাদেই মল্লজির সাংসারিক উন্নতি। আর যে বংশে মল্লজি জন্মিয়াছিলেন, সে বংশ কি দেবগিরির রাজকুলের তুল্য? উত্তরকালীন মহারাষ্ট্রীয় পুরাবৃত্তলেখকগণ যে ভোঁসলা বংশকে চিতোরের "হিন্দুসূর্য্য" কুল সমুদ্ভূত বলিয়াছেন, যে কোন কারণেই হউক যাদবরাও সে বংশের ঈদৃশ মহত্ত্ব জানিতেন না।

লক্ষজির অসম্মতি দেখিয়াও মল্লজি

* মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বাই সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক দিগের উপাধি।

† দেশমুখ শব্দে দেশপ্রধান, দেশাধিকারী বা জমীদার বুঝায়।

সংকল্প করিলেন যে, যাদবদুহিতার সহিত অবশ্য অবশ্যই পুত্রের বিবাহ দিবেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অনেক অর্থ সমাগম হইল। কিরূপে হইল, কে জানে? মহারাষ্ট্রীয় কিংবদন্তী এই যে ভগবতী ভবানীদেবী স্বয়ং মল্লজিকে দেখা দিয়া ধনরাশির সন্ধানপ্রদান করেন এবং বলেন "তোমার বংশে এক জন শম্ভু সদৃশ গুণবিশিষ্ট নরপাল জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রে সদ্বিচার সংস্থাপন করিবে; এবং যাহারা ব্রাহ্মণের হিংসা করে ও দেবতার মন্দির অপবিত্র করে, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে। তাহার রাজ্যকাল হইতে নূতন সময় আরম্ভ হইবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে।"

সৎ কি অসৎ যে উপায়েই মল্লজি ধনসঞ্চয় করুন, তদ্দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইল। তিনি, অনেক গুলি ঘোটক ক্রয় করিয়া, স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেন; এবং কূপখনন, পুষ্করিণী খনন, মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকপ্রিয় পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। অর্থবলে কোথায় কি না হয়, বিশেষতঃ মোসাহেবপূর্ণ মুসলমান রাজসংসারে? আহম্মদ নগরের সুল্‌তান সন্তুষ্ট হইয়া মল্লজিকে রাজা উপাধি দিলেন এবং পাঁচ হাজার সোয়ারের অধ্যক্ষ করিলেন। পরগণা পুনা এবং সোপা জায়গির রূপে মিলিল; শিবনারী ও চাকুন দুর্গ এবং তদধীনস্থ প্রদেশ সমস্ত হস্তগত হইল। যাদব রাওর আর উদ্বাহ সম্বন্ধে কি আপত্তি থাকিতে পারে? ১৫২৬ শকে (১৬০৪ খৃ) সুলতানের সমক্ষে মহা সমারোহে সাহজি এবং জিজি বাইর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

জিজি বাইর গর্ব্ভে সাহজির দুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ শাম্বজি, কনিষ্ঠ শিবজি। শাম্বজি শাহজির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে থাকিতেন। ছোট ছেলের প্রতিই মায়ের আদর; শিবজি জননী সন্নিধানেই থাকিতেন।

যৎকালে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লির মোগল সম্রাটই আর্য্যাবর্ত্তের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। দক্ষিণাপথে আহম্মদ নগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড নামক তিনটী পাঠান রাজ্য ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আকবর বাদসাহ আহম্মদ নগর আক্রমণ করিয়া বহু কষ্টে জয়লাভ করেন; কিন্তু মালিক অম্বর নামে মন্ত্রীর প্রতিভাবলে নিজাম সাহী রাজ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। শিবজি জন্মিবার পূর্ব্ব বৎসর মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়; এবং প্রায় সেই সময়েই বিজয়পুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাহ বিচিত্র অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা মহাসমারোহে রাজ্য করিয়া কাল কবলে কবলিত হন। গোলকুণ্ডপতি পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজা

সকল আপনার অধিকারভুক্ত করিতে নিযুক্ত ছিলেন।

শিবজির বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র (১৬২৯ খৃ,) আহম্মদনগরপতি, খাঁ জাহান লোদি নামক বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতির পক্ষাবলম্বন করিয়া, দিল্লীশ্বরের ক্রোধে পতিত হন। সুলতান মর্ত্তিজা আজিম সাহ মালিক অম্বরের পুত্র প্রধান মন্ত্রী ফতে খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মোগল দিগের সহিত যুদ্ধে বারম্বার পরাভূত হইয়া, কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাকে মুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রিত্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন। ফতে খাঁ ক্ষমতা পাইয়াই বৈর নির্য্যাতনের পথ দেখিতে লাগিল এবং সুযোগক্রমে সুলতান এবং প্রধান ওমরাদিগকে বধ করিল। অনন্তর নিজাম সাহী বংশীয় একটি শিশুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল্লির অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে বিজয় পুরাধিপতি আহম্মদ নগর ধ্বংসে আপনার বিপদ বুঝিয়া সংগ্রাম জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং ফতে খাঁ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত হইলে, মোগল সেনাপতি কুপিত হইয়া তদ্বাসস্থান দৌলতাবাদ সযত্নে অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ফতে খাঁ দিল্লিতে প্রেরিত, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজকুমার গোয়ালিয়র দুর্গে চিররুদ্ধ, হইল। সাহজি ইহার পরে প্রায় চারি বৎসরকাল নিজামসাহী রাজ্যের পতন নিবারণার্থে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রধান সহায় মহম্মদ আদিল সাহও মোগলদিগের প্রতাপে প্রপীড়িত হইলেন। তিনি বিজয় পুরের চারিদিকে দশ ক্রোশ মরুভূমি করিয়া বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনার রাজধানী রক্ষা করিলেন বটে; কিন্তু শত্রুদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিতে পারিলেন না। পর্য্যায়ক্রমে জয় পরাজয় ঘটিতে লাগিল; প্রজাদিগের দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না। পরিশেষে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয় পুরপতি মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা সাহজি বিজয় পুরের রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিবার অনুমতি পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; বিজয়পুরাধিপতি আহম্মদ নগরের কিয়দংশ লইয়া সম্রাট্‌কে বৎসরে বিংশতি লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিলেন; এবং নিজামসাহী রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দিল্লিসাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

এইরূপে শিবজির বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইতে না হইতেই, মোগল পাঠানের দ্বন্দ্বদ্বারা দক্ষিণাপথের একটী মুসলমান রাজ্য বিনষ্ট হইল। বিজয়পুরও এই যুদ্ধে এত হীনবল হইয়াছিল, যে দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়া বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সংগ্রামসময়ে শিবজি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, ভাল করিয়া জানা

যায় না। সমরপ্রারম্ভে (১৬২৯ খৃ) সাহজি, লোদির সহিত বিবাদ করিয়া, দিল্লীশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তজ্জন্য সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে পুনরায় জায়গির সম্বন্ধে একখানি সনন্দ পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগল সেনাপতিদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুরাতন প্রভু আহম্মদ নগর পতির দলে প্রত্যাগমন করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি তুকাবাই নাম্নী একটী নবীনা কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন; তাহাতে তেজস্বিনী যাদবনন্দিনী জিজিবাই অভিমানিনী হইয়া শিশু শিবজিকে সঙ্গে করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। তদবধি নূতন প্রেমের কুহক বশেই হউক, বা যুদ্ধের বিরামাভাব প্রযুক্তই হউক, সাত বৎসরকাল সাহজি, শিবজি এবং তজ্জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বিজয়পুরে গমন করেন, জিজিবাই তাঁহার সঙ্গে যান এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া শিবজির বিবাহ দেন। অনন্তর সাহজি পুনা জায়গিরের তত্ত্বাবধারক দাদাজি কর্ণদেবসন্নিধানে শিবজি এবং তাঁহার মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণার্থে প্রেরণ করিয়া সুলতানের আদেশে কর্ণাট যাত্রা করেন।

দাদাজি কর্ণদেব অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি শিবজিকে যোদ্ধার উপযোগী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিবজি, লিখিতে পড়িতে, এমন কি আপনার নাম সাক্ষর করিতেও শিখিলেন না; কিন্তু ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, ভল্লপ্রহার, তীরনিক্ষেপ, অসিসঞ্চালন, প্রভৃতি কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শিক্ষকের যত্নে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিল। তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অমৃতময় কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। কবিবর্ণিত প্রাচীন বীরগণের গুণগান শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি কল্পনাপথে তাঁহাদিগের দেবতুল্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য কার্য্য পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহাদিগের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইতেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মানুরক্তচিত্তে যবনগণ পুরাকালের পরাক্রান্ত দৈত্য রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইত, এবং কবে তাহাদিগের দারুণ দৌরাত্ম্য হইতে পুণ্যময় ভারতভূমিকে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর আলোড়িত হইত। যে দেশে রাম লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ বলরাম, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশে স্বর্গাবতীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিতা, যে দেশ দেবগণের একমাত্র প্রিয়লীলাস্থল, সে দেশের ছিন্ন মুকুট মুসলমান পদতলে দলিত দেখিয়া তাঁহার তেজস্বী মনে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। তিনি আশ্বাসপ্রদায়িনী আশার বিশ্ববিমোহন

বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত যবনগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন, স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, এবং "হরহর ভবানী" ধ্বনিতে হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মনদ পর্য্যন্ত, প্রতিধ্বনিত করিবেন।

শিবজি যেস্থানে বাস করিতেছিলেন, সেস্থানও তৎসদৃশ উন্নতমনা বীরধর্ম্মা ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পুনানগরী সমতল ক্ষেত্র এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। অনতিদূরেই সহ্যাদ্রি শৈলের শিখরমালা দুই তিন সহস্র হস্ত উর্দ্ধে শিরোত্তোলন করিয়াছে। গিরিশ্রেণী অধিকাংশ স্থলে চির-হরিত-তরুপুঞ্জ পরিশোভিত; কেবল মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী, বন্ধুর, বিশাল, জীবোদ্ভিদপরি-শূন্য শৃঙ্গনিকর বিরাজিত। বর্ষাকালে যখন পর্ব্বতপার্শ্বে তরঙ্গের ছটা ছুটিতে থাকে; বৃষ্টির ধারা নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে, পড়িতে থাকে; বজ্র গর্জ্জিতে, ঝটিকা ঝমকিতে, চপলা চমকিতে থাকে; জলদরাশি কর্ত্তৃক ভগ্ন ও প্রতিবিম্বিত সৌরকিরণলহরীতে সহস্র সহস্র মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীল বর্ণে অচলকুল সাজিতে থাকে; তখন প্রকৃতির মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে না ধর্ম্মজনিত গম্ভীর ভাবের উদয় হয়? আমরা যে সকল পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকি, আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহারা আমাদিগের মনোবৃত্তি সকলের উপর আধিপত্য করে। ঋষিগণের কানন, ঈশার পর্ব্বত, মহম্মদের গিরিগুহা, মহতী চিন্তার স্থল। কে বলিতে পারে, সহ্যাদ্রি শিবজির পক্ষে তদ্রূপ ছিল না?

সহ্যাদ্রির পথ সকল অতিশয় সংকীর্ণ ও দুরারোহ। স্থানে স্থানে উচ্চ শৃঙ্গ, তন্মধ্যে কোথায় বা উৎকৃষ্ট উৎস আছে; কোথায় বা বর্ষাকালীন জল ধরিয়া রাখিয়া সমুদয় বৎসর চলে। এই সকল শৃঙ্গ অল্প পরিশ্রমেই দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে পরিণত হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এ প্রদেশ আক্রমণ করা অতীব দুঃসাধ্য। তৎকালে এখানে বন জঙ্গল এত বাড়ে, সর্ব্বদা এত বৃষ্টি হয়, বহুসংখ্যক সামান্য সামান্য নদ নদী জল পূর্ণ হইয়া এরূপ দুস্তর হয়, এবং যে বায়ু বহিতে থাকে তাহা বিদেশীয়দিগের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর, যে তখন ইহার ন্যায় দুরাক্রম্য দেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই পর্ব্বতের উপত্যকাগুলিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা মাওল বলিত। মাওলী বা উপত্যকাবাসীরা দেখিতে কদর্য্যাকৃতি ও নির্ব্বোধ; কিন্তু তাহারা পরিশ্রমী, বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। দাদাজি তাহাদিগের অনেককে জায়গিরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত শিবজি গিরিভ্রমণে ও মৃগয়ায় যাইতেন। এইরূপ পর্য্যটন কালে তিনি শৌর্য্য ও মিষ্টভাষিতাগুণে মাওলীদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ঘাটগিরি ও কঙ্কণের পথ,

গিরিশঙ্কট, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়াছিলেন।

কিরূপে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, কিরূপে আপনার সামান্য শক্তিতে এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিবজির অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন "কঙ্কণপ্রদেশে একটি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত দস্যুদল আছে; আমি সেই দলে মিশিয়া তাহাদিগের রাজা হইব; এবং যে শৌর্য্য তাহারা এক্ষণে সাধুলোকের অপকারার্থে পরিচালিত করিতেছে, সেই শৌর্য্য যবনবলবিনাশার্থে নিয়োজিত করাইব।" শিবজি-সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যে কল্পনা সেই কার্য্য। তিনি দস্যুদলে মিশিলেন। তিনি স্বাধীন রাজা হইবেন এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত কঙ্কণপ্রদেশে থাকিতেন। দাদাজি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বিবেচনা করিলেন যে, শিবজি অসদনুষ্ঠানেই রত হইলেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্যায় বর্ত্ম হইতে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রতি অধিকতর যত্ন দেখাইতে লাগিলেন এবং জায়গির তত্ত্বাবধানের অনেক ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। এই প্রকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, পুনার নিকটবর্ত্তী ভদ্র মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ হইত; এবং তাঁহার সদাচার ও সদালাপে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন।

সহ্যাদ্রি শৈলে বিজয়পুরাধিপতির অনেকগুলি দুর্গ ছিল। কোন কোন দুর্গে দুর্গাধ্যক্ষ থাকিত, এবং যুদ্ধাশঙ্কা উপস্থিত হইলে তথায় ভাল ভাল সৈন্যও প্রেরিত হইত। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অধিকাংশ গড়ে মুসলমান সেনা থাকিত না; এবং সেগুলি প্রায় জায়গিরদারদিগের অধীনেই ছিল। বিশেষতঃ দিল্লীশ্বরের সহিত ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি হইবার পরে, বিজয়পুরপতি কর্ণাটবিজয়ের অভিলাষে সেই প্রদেশেই উত্তমোত্তম যোদ্ধৃগণ পাঠাইয়াছিলেন; এবং ঘাটপর্ব্বতের দুর্গ সকল প্রথমে অল্পায়াসেই করস্থ হইয়াছিল বলিয়া তাহারা যে দুর্ভেদ্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক প্রকার অরক্ষিতাবস্থায় রাখিয়াছিলেন।

পুনার দশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে নীরানদীর উৎপত্তিস্থল সন্নিকটে টর্ণা নামে একটি পার্ব্বতীয় দুরাক্রম্য দুর্গ ছিল। শিবজি দুর্গাধ্যক্ষের যোগে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঊনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সে দুর্গটি হস্তগত করিলেন; এবং বিজয়পুরে বলিয়া পাঠাইলেন যে সরকারের লাভ করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশেই কেল্লাটি দখল করিয়াছেন, এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তজ্জন্য তৎ প্রদেশস্থ দেশমুখাপেক্ষা অধিক রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিলেন। টর্ণার নাম প্রচণ্ডগড় রাখিলেন, এবং

তাহাকে অধিকতর দুরাক্রম্য করিবার নিমিত্ত নূতন প্রাচীরনির্ম্মাণ ও পুরাতন প্রাকারাদি সংস্কার করাইতে লাগিলেন। দুর্গের মধ্যে একটি স্থান খনন করিতে করিতে সহসা স্বর্ণরাশি দৃষ্ট হইল। কাহার সঞ্চিত দ্রব্য কাহার ভোগে আইল! শিবজি এই ঘটনায় ভগবতী ভবানীর কৃপা দেখিলেন, এবং উৎসাহ সহকারে দুর্গসংস্কার সমাপন ও অস্ত্র শস্ত্র ক্রয় করিতে প্রযত্নশীল হইলেন। তদনন্তর টর্ণার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে মর্ব্বুধ পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন; এবং সমাপ্ত হইলে তাহার নাম রাজগড় হইল (১৬৪৭)।

রাজগড় নির্ম্মাণসম্বাদ বিজয়পুরে পৌঁছিলে, সুল্‌তান সাহজিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন। সাহজি তখন বিজয়পুরপতি-প্রদত্ত বাঙ্গালোর সন্নিহিত জায়গিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের কার্য্যের ছন্দাংশ কিছুই জানেন না, সুল্‌তানকে এই মর্ম্মে উত্তর পাঠাইলেন; এবং শিবজি ও কর্ণদেবকে লিপিদ্বারা যৎপরোনাস্তি অনুযোগ করিলেন। মঙ্গলাকাংক্ষী দাদাজি শিবজিকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন "বিজয়পুরে তোমার পিতার যেমন মান সম্ভ্রম, বিশ্বস্তভাবে সুলতানের চাঁকরী করিলে তুমি একজন বড় লোক হইবে। আর যেরূপ কার্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে পদে পদে শঙ্কা ও বিপদ্ সম্ভাবনা।" শিবজি মিষ্ট কথায় আপনার বশ্যতা জানাইলেন; কিন্তু বৃদ্ধ কর্ণদেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সংকল্প অণুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইল না। দাদাজি একে পীড়ায় ও জরায় জীর্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভুবংশের বিপদাশঙ্কায় জর্জ্জরিত হইয়া আর অধিক দিন প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শিবজিকে নিকটে ডাকাইলেন; এবং সেই অন্তিম শয্যায় পূর্ব্ব প্রদর্শিতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "বাছা, তুমি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চেষ্টায় বিরত হইও না; গো, ব্রাহ্মণ ও কৃষকদিগকে রক্ষা করিও; দেবমন্দির অপবিত্র করিতে দিও না; এবং লক্ষ্মী তোমায় যে পথে লইয়া যান সেই পথেই অগ্রসর হইও।" অনন্তর শিবজির হস্তে আপনার পরিবারবর্গকে সমর্পণ করিয়া কর্ণদেব গতাসু হইলেন।

সেই বৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু ও প্রতিপালকের পরলোক গমনকালীন বাক্যগুলি স্বধর্ম্মানুরক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী যুবার অন্তঃকরণে দৈববাণীর ন্যায় অঙ্কিত রহিল। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সে পথ তাঁহার এবং জায়গিরের কর্ম্মচারীদিগের চক্ষে পবিত্রভাব ধারণ করিল। শিবজির বাল্যকাল শেষ হইল; তাঁহার জীবনের কার্য্য স্থিরীকৃত হইল।

এ সময়ে শিবজির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। তিনি ঈদৃশ অল্প বয়সেই দুইটী দুর্গের অধিকারী হইয়া রাজ্যসংস্থাপন

করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন। একবার সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক তাঁহার ভাবী উন্নতির কি কি উপকরণ ছিল।

প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে যে, শিবজির পিতা বীরপুরুষ, এবং মাতাও শূরকন্যা। জনকজননীর গুণ যে সন্তানে বর্ত্তে, তাহা অনেকেই জানেন। যেমন বাহ্য আকারে পিতামাতার সহিত সন্তানের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যেমন পীড়ার বীজ পিতামাতার শরীর হইতে সন্তানে যায়, তেমনই পিতামাতার ন্যায় মনোবৃত্তি সন্তানগণ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পর্য্যালোচক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন কোন বংশে কোন কোন ক্ষমতা বা প্রবৃত্তির অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রোমের ইতিহাস যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি ক্লডিয়াস বংশের দাম্ভিকতা এবং ফেবিয়াস বংশের ধীরতা ভুলিতে পারেন? যে বংশে পাইসিস্‌ট্রেটস্, সোলন, ও পেরিক্লিস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীসদেশীয় আল্‌কমিওনীয় বংশ যে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত কে না বলিবে? যে কুল হইতে ফিলিপ্, আলেকজণ্ডর, পিরহাস ও টলেমিদিগের উৎপত্তি, সে কুলের যে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রতিভা ছিল, কে অস্বীকার করিবে? কার্থেজের হামিল্কার ও হানিবল্ বিভূষিত বার্কা বংশ, ইংলণ্ডের বিজয়ী উইলিয়মের বংশ, প্রুসিয়ার বিখ্যাত ফ্রেড্রিকের বংশ, রুসিয়ার মহাত্মা পিটরের বংশ, ভারতবর্ষের ঔরংজেব পর্য্যন্ত বাবর বংশ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে শৌর্য্য কোন কোন কুলের অনুগামী। ভোঁসলা এবং যাদব দুই শূর বংশ সংযোগে শিবজির জন্ম; সুতরাং তিনি শৌর্য্যপ্রভা লইয়াই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শিবজি যে কেবল স্বভাবতঃ বীরতা-প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, এমত নহে; বাল্যকালে তিনি একপ্রকার বীরত্ব বায়ুতে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার তিন হইতে দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাহজির আহম্মদ নগর রক্ষার্থে যুদ্ধ। এই সময়ে শিবজি কতবার শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। পরে যখন নিজামসাহী রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল, মোগল সম্রাটের সহিত আদিলসাহী সুলতানের সন্ধি হইল, তখন বিজয়পুর পতির সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া সাহজি কর্ণাট সমরে জয়পতাকা তুলিলেন। তদবধি অহরহঃ পিতার শৌর্য্যকথা ও বিজয়বার্ত্তা কর্ণদেব প্রভৃতির মুখে শিবজি শুনিতে পাইতেন; এবং জনকের যোগ্য পুত্র হইবেন, এরূপ বাঞ্ছা তাঁহার হৃদয়ে কেননা বলবতী হইবে? বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি যেসকল ধর্ম্মগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ তিনি শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন, সে সমুদয়ও বীররসপরিপ্লুত। আর যে মাওলীরা তাঁহার চিরসঙ্গী, তাহারাও সাহসী ও সংগ্রামপ্রিয়। বীরবীর্য্যে যাঁহার জন্ম, বীরকন্যার স্তন্যে যাঁহার বালদেহ বর্দ্ধিত,

বীররূপী পিতার বিজয়সংবাদ দিন দিন যাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইত, বীর যাঁহার উপাস্যদেবতা এবং বীর যাঁহার সহচর, সেই শিবজি কেননা বীরধর্ম্মা হইবেন?

এই বীরের সম্মুখে দক্ষিণাপথের বিচ্ছিন্ন মুসলমান রাজ্যগুলি পড়িল। তাঁহার শৈশবেই আহম্মদনগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিজয়পুর মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকিয়া শিবজির প্রথম উদ্যম বিফল করিতে পারিল না। কিন্তু রাজ্যের প্রথম সোপানগুলি সংস্থাপন কালেই বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করা যায়; ক্ষমতা একবার বদ্ধমূল হইলে তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করা অতীব দুষ্কর। অধিকন্তু বিজয়পুরের প্রধান অবলম্বন মহারাষ্ট্রীয়গণ। তাহারা শিবজির স্বজাতি ও সমধর্ম্মা; সুতরাং ইহাও একটী সুলতানের দৌর্ব্বল্য ও শিবজির বলের কারণ। হিন্দুধর্ম্মের পতাকা উড্ডীন করিলেই শিবজির অনুচরবর্গের উৎসাহবৃদ্ধি এবং বিপক্ষপক্ষের শক্তিহানি হইল।

এস্থলে আর একটী কথা বলাও অসঙ্গত হইতেছে না। দিল্লীশ্বরের দক্ষিণাপথ আক্রমণ শিবজির উন্নতির একটী প্রধান পরোক্ষ হেতু। এই আক্রমণে মোগলদিগের এবং দক্ষিণাত্য ভূপালবর্গের বিস্তর বলক্ষয় হয়; মুসলমানগণের গৃহবিচ্ছেদ বাড়ে এবং ধর্ম্মবন্ধন অনেকদূর শিথিল হইয়া যায়; নিজামসাহী রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যবন প্রভাবের বিলক্ষণ হ্রাস উপস্থিত হয়; এবং মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের প্রতিপত্তি, সমরকুশলতা ও স্বাবলম্বন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যদি দক্ষিণে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড সম্মিলিত থাকিত, এবং যদি দিল্লিপতি তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় ক্ষমতা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে মুসলমানদিগের প্রতাপ এত প্রবল হইত যে কোনক্রমে কেহই তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিত না। ভগ্নালয়ে বৃষ্টিধারাও প্রবেশ করে; বিরোধবিভক্ত অনৈক্যজীর্ণ মুসলমান সাম্রাজ্য কেননা নবীন হিন্দুশক্তি প্রভাবে বিদীর্ণ হইবে?

শিবজি জীবনের প্রথমাঙ্ক লিখিত হইল। যেরূপ রঙ্গভূমে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেরূপ অবস্থায় তাঁহার নিত্যনবস্ফূর্ত্তিশালী প্রতিভার প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, যেরূপ জ্ঞান ও কার্য্য মণ্ডলে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, একপ্রকার বর্ণিত হইল। সময়ান্তরে এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ লিখিবার বাঞ্ছা রহিল।

শৈশব সহচরী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রম।

"সোনার বরণ হলো কাল
গুণ দেখে মোর মন হারাল।"

কোথা হইতে কে এই গীত গাইতেছিল, তাহা কেবল বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর বসিয়া একটি চিল জানিতে পারিতেছিল। বৃক্ষের সন্নিকটে উচ্চ স্তূপোপরি একটি শিবের মন্দির; তাহার পশ্চাদ্ভাগ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন; এবং তাহার চারিদিকে অতি নিবিড় বন। সেস্থল মনুষ্যসমাগম চিহ্নমাত্র রহিত। নিকটে অতি বৃহৎ প্রান্তর—বৃক্ষহীন, জনহীন, পশুহীন, শোভাহীন প্রান্তর। তন্মধ্যদিয়া গ্রাম্য পথ। কদাচিৎ সে পথে মনুষ্য যাইত; যদি কেহ যাইত তবে ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে মনুষ্য থাকিলে তাহাকে তাহার দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ধ্যাকাল; মেঘাচ্ছন্ন; অল্প২ বৃষ্টি হইতেছিল। সেই ভগ্ন প্রকোষ্ঠ মধ্যে লুকাইয়া দশ বার জন মনুষ্য। তাহারই মধ্যে একজন মৃদু২ গান করিতেছিল, তিন্তিড়ী বৃক্ষারূঢ় পক্ষিভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল না। অকস্মাৎ গান বন্ধ হইল, গায়ক কহিল।

"কে আসিতেছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "যে আসিবার সে আসিতেছে।"

ইতিমধ্যে খর্ব্বাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ এবং মল্লবেশী এক ব্যক্তি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি সম্বাদ আনিলে?"

আগন্তুক কহিল "ঠিক সন্ধ্যার সময় বাবু পাল্কীতে উঠিবে।"

"এই পথদিয়া যাবে?"

"হাঁ, এই পথ দিয়া।"

"সঙ্গে কয় জন বেহারা?"

"বার জন।"

"আর কোন লোক সঙ্গে আস্‌বে?"

"তা বুঝলুম না।"

"বেহারাদের কেমন দেখ্‌লে?"

"দিব্বি কালো কোলো নন্দঘোষের মত, কাহারও কাহারও বোকা ছাগলের মত দাড়ি আছে।"

"আহা! তামাসা ছাড়, বলি আমরা দশ জনে বার জন বেহারার মোহাড়া নিতে পার্‌বো?"

"পার্‌বে, আমাদের চীৎকার শুন্‌লেই তাহারা মোহ যাবে।"

ইত্যবসরে দূরনিঃসৃত অস্ফুট ভ্রমর গুন গুনবৎ শিবিকাবাহকদের কোলাহল নৈশগগন ভেদ করিয়া শ্রুতিগোচর হইল। রজনী ঘনান্ধকার, নিকটের মানুষ লক্ষ্য

হয় না সুতরাং শিবিকা কোন্ পথ দিয়া আসিতেছিল তাহা দৃষ্ট হইল না। সমস্ত দিবস বৃষ্টি হওয়াতে প্রান্তরপথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, তজ্জন্য বাহকদিগের পা মধ্যে২ পিছলিয়া যাইতেছিল। বাহকেরা দেবতাকে, মাঠকে, এবং কখন২ শিবিকারোহীকে গালি আরম্ভ করিল; কিন্তু ইহাদিগকে গালি দিয়া তৃপ্তিলাভ না হওয়াতে, কেহ২ সমভিব্যাহারী বাহকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। এই প্রকার বিবাদ করিতে২ বনমধ্যে ভগ্নমন্দির নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু এইখানে শুষ্ক স্থান পাইয়া কাঁধ বদলাইতে শিবিকা থামাইল। একজন বাহকের পা আর এক জনের পায়ের উপর পড়াতে দুইজনে বচসা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে বেহারাদিগের উপরে শ্রাবণের ধারাবৎ যষ্টির আঘাত হইতে লাগিল। বাহকেরা প্রথমতঃ চমকিত ও বিহ্বল হইল। পরে আপনাদিগের দলের মধ্যে যষ্টিহস্ত অপরিচিত লোক দেখিয়া শিবিকা রাখিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহাদিগের দেখাদেখি শিবিকারক্ষক দুইজন হিন্দুস্থানি মল্লবেশীও পলায়ন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দির।

দস্যুরা এক্ষণে নির্জ্জন দেখিয়া শিবিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে রজনী বাবুর পরিবর্ত্তে একজন অবগুণ্ঠনবতী রমণী রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে দস্যুবর্গ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিল। তৎপরে শিবিকারোহী রমণী বলিল—

"তোমরা যদি টাকার জন্য আমার পাল্কী ধরিয়া থাক তবে ভুল করিয়াছ—আমার সঙ্গে টাকা নাই, গাত্রেও অলঙ্কার নাই, আমি বিধবা। কিন্তু যদি আমাকে সুবর্ণপুরে আমার বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দাও তা হলে আমি পুরস্কার দিব ও এই ঘটনা গোপন করিব—"

একজন দস্যু কহিল, "তোমার বাড়ী সুবর্ণপুরে ?"

রমণী। হাঁ।

দস্যু। তোমাদের কোন্ বাড়ী, রজনীবাবুদের বাড়ী ?

রম। হাঁ সেই বাড়ীই বটে।

দস্যুরা চুপি২ পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন কহিল, "ওরে গোবরা, আমাদের বড় ভুল হয়েছে, রজনী বাবুর সুবর্ণপুর হইতে আসিবার কথা, কিন্তু এ পাল্কী ঠিক উল্টাদিক্‌দিয়া এসেছে, এ পাল্কী সুবর্ণপুরে যাবে; সুবর্ণপুর থেকে ত আস্‌ছিল না। আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে।"

একজন প্রবীণ দস্যু কহিল, "যা হবার হয়েছে এখন কি পরামর্শ।"

গোবরা কহিল, "মেয়ে মানুষটা বোধ হয় রজনী বাবুর বন, উহাকে রজনীর বদলে আমাদের বাবুর নিকট নিয়ে গেলে বোধ হয় কাজ হবে, কি বলিস্ রে ?"

দস্যুগণ সকলেই এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া চারিজন দস্যু দ্বারা শিবিকাসহিত রমণীকে লইয়া চলিল। রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অতিশয় অন্ধকার হইয়াছে। দস্যুরা প্রান্তর পার হইয়া গ্রাম্যপথ ত্যাগ করিয়া অন্য এক পথ ধরিল; দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমরা কোথায় যাইতেছ? এ ত সুবর্ণপুরের পথ নয়—"

দস্যুরা উত্তর করিল না দেখিয়া রমণী চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তাহাদিগের অনুনয় বিনয় অথবা ভয়প্রদর্শন বৃথা বোধে আপনার অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। দস্যু বাহকগণ রমণীর এই প্রকার নির্ভীকতা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "বাবুরা হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত, কত আমাদের পায়ে পড়িত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ ছুঁড়ি একবার চেঁচালে না!" ক্রমে শিবিকার দুই পার্শ্ব গাঢ় অন্ধকারময় হইল। রমণী বুঝিল যে, শিবিকা কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিছুক্ষণ এই প্রকার অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য অতিবাহিত করিয়া এক স্থানে শিবিকা থামিল, এবং পরক্ষণেই একজন দস্যু কহিল

"বেরিয়া এসগো ঠাকুরুণ—"

রমণী শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড মন্দির, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার, এবং মধ্যে২ বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তখন আদেশ মত একজন দস্যুর পশ্চাৎ২ ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী।

রমণী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৈরিকবসনপরিহিত, শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল, এক যুবা সম্মুখে পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। রমণী গাঢ় অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তাঁহার সমভিব্যাহারী দস্যু কহিল, "বাবু মহাশয়!" পূজক কিঞ্চিৎ বিলম্বে দস্যুদিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, সফল হইয়াছে?"

দস্যু উত্তর না করিয়া হঠাৎ চমকিত নেত্রে রমণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তাহার কারণ এই যে পূজকের কণ্ঠস্বরে অবগুণ্ঠনবতী হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। পূজকও দস্যু যেদিকে চমকিতনেত্রে চাহিতেছিল, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "এ কে, এ যে স্ত্রীলোক!"

দস্যু। আজ্ঞে, একটা ভ্রম হয়েছে, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া একটা স্ত্রীলোককে ধরে ফেলেছি।

পূজক ক্ষণকাল অবগুণ্ঠনবতীকে আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" কিন্তু স্ত্রীলোক

কোন উত্তর না করাতে পূজক পুনরপি কহিলেন,

"আপনি ভীতা হইবেন না। স্বচ্ছন্দে পরিচয় দিন কোন ভয় নাই। রমণী অবগুণ্ঠন হইতে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি কারণে দস্যুদ্বারা আমায় ধৃত করিলেন।"

উত্তর, আমার চিরশত্রুকে ধরিতে গিয়া ভ্রমক্রমে আপনাকে ধরিয়াছে। আপনার কোন আশঙ্কা নাই।

র। কোন আশঙ্কা নাই তাহার বিশ্বাস কি?

উত্তর, বিশ্বাস এই যে আমি এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে অসত্য কথা কহিব না বা অন্যায় কার্য্য করিব না।

অবগুণ্ঠনবতী দস্যুকে মন্দিরহইতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু যখন এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে বন্দী করিবার অভিলাষে রজনীকান্তকে ধৃত করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন তখন আপনাকে বিশ্বাস কি?

যেমন নিকটস্থ কোন বস্তুতে বজ্রাঘাত হইলে পথিক চমকিত ও বিহ্বল হয়, পূজক সেই প্রকার হইলেন এবং কিয়ৎকালপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি কে?'

রমণী দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অবগুণ্ঠন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার অগ্রজের পত্নী কুমুদিনী।"

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় শ্মশ্রুবিশিষ্ট পূজককে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রজনীকান্তের পিতার দ্বারা হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া উদাসীন হইয়াছেন। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন; পরে বিহ্বলের ন্যায় অস্ফুটস্বরে স্বগত বলিতে লাগিলেন "ইনি এখানে কেন?"

কুমুদিনী কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "তুমিই আমায় ধরিয়া আনাইয়াছ?"

রতিকান্ত অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "আপনার কি আমার এ অবস্থা দেখিয়া দয়া হয় না, এখনও ভর্ৎসনা!"

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না; কিন্তু রতিকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী কাঁদিতেছেন, তাঁহার পাষাণ নির্ম্মিত হৃদয় আর্দ্র হইল, চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিলেন, "এ দুঃখ কি জন্য? কেন স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছ? এস, গৃহে চল, তাহাদিগকে লইয়া সংসার করিবে চল।"

রতি। গৃহে যাইয়া কি খাইব?

কুম। আমার বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া খাইবে।

রতিকান্তের পুনরায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইল, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

রতি। আমি আপনার অনুরোধে গৃহে যাইতে পারি, কিন্তু আমার পৈতৃক ঐশ্বর্য্য যে রজনীকান্ত আমার সম্মুখে ভোগ করিবে তাহা আমার অসহ্য হইবে।

কুমু। রজনীকান্ত ধৰ্ম্মভীত লোক—সবিশেষ জানিতে পারিলে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়া দিতে পারেন।

রতিকান্তের হঠাৎ ভাবান্তর হইল এবং অতি রুষ্টভাবে কহিলেন, "কি! ভিখারীর ন্যায় রজনীকান্তের দ্বারস্থ হইব, আর সে আমাকে দ্বারবান্ দ্বারা বহিস্কৃত করিবে!"

কুমু। রজনীকান্ত আমার ভগিনীপতি, আমি অনুরোধ করিলে তোমার সহিত কুব্যবহার করিবেন না।

রতিকান্ত ক্ষণেককাল ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন, তৎপরে কহিলেন,

"আমার স্মরণ ছিল না যে, রজনী আপনার সম্পর্কীয় ও এত আত্মীয়—আপনি আমার অন্তরের অতি গুহ্য কথা জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণেই উহা রজনীকান্তকে জ্ঞাত করাইবেন।"

কুমু। এ অতি অন্যায় কথা, আমার রজনীও যেমন তুমিও তেমন, আমি দিবা রাত্র কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি যেন নাইতেও তোমার মাথার কেশ ছেঁড়ে না।

রতি। আপনি যাহা বলিতেছেন সকলি সত্য, কিন্তু আমি অতি পাষণ্ড, আমি পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। আপনি এই দেবীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করুন যে, রজনীর প্রতি আমার যে অভিপ্রায় তাহা গোপন রাখিবেন।

কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অতি কঠিন স্বরে বলিলেন,

আমি তোমার কে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ?

রতি। আপনি আমার ভ্রাতৃজায়া, তাহা বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু রজনী যে আপনার ভগিনীপতি তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

কুমু। তবে আমার সহিত এমত কুব্যবহার করিতেছ কেন?

রতি। কেবল আত্মরক্ষার্থ।

কুমু। আমার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কেন, আমি কি তোমার শত্রু?

রতি। আমার শত্রু নন, কিন্তু রজনীর ত মিত্র।

কুমু। ছি! তোমার অন্তঃকরণ অতি কুৎসিত হইয়াছে।

রতি। শপথ করুন্।

কুমু। আমি শপথ করিব না।

র। রজনীকে সকল জ্ঞাত করাইবেন?

কুমু। তাঁহার বিপদ্ তাঁহাকে জানাইব।

র। শুনুন, যদি আপনি শপথ না করেন, তবে অদ্য রাত্রেই আপনার ভগিনী স্বর্ণপ্রভাকে বিধবা করিব।

কুমু। আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম।

রতিকান্ত দ্বারদেশে দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

"যতক্ষণ না রজনীর মৃত্যু হয় ততক্ষণ আপনি এই ঘরে বন্দী রহিবেন।"

কুমু। তুমি আজিও এমন পাষণ্ড হও নাই, এ সকল কার্য্য তোমার দ্বারা অসম্ভব।

র। তবে দেখুন।

এই বলিয়া রতিকান্ত, দস্যুদিগের দলপতিকে আহ্বান করিয়া মন্দিরের সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে কুমুদিনী তথায় নাই। আশ্চর্য্য হইয়া আলোক লইয়া মন্দিরের চতুষ্কোণ ও অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সমূহ বিপদ্ বিবেচনা করিয়া দস্যুদিগের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন।

পদ্য।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত।

"ওরে রে চপল মন, কতই কর ভ্রমণ,
পাতাল পর্য্যন্ত এস ঘুরে।
কভু ভ্রম দিঙ্মণ্ডলে, কখন বা নভঃস্থলে,
উল্লঙ্ঘিয়া যাও স্বর্গপুরে॥
কিন্তু তব অভ্যন্তরে, লীন ব্রহ্ম পরাৎপরে,
ভ্রমেও না করহ স্মরণ।
যিনি সন্নিকট হেন, বল ভাই কেন কেন,
তাঁর প্রতি বিরতি এমন॥

শান্তিশতক

হিংসাহীন যত্নাভাবে সুলভ্য অশন।
সর্পগণ হেতু বিধি সৃজিলা পবন॥
পশুকুল তৃণাঙ্কুর ভোগে পুষ্টকায়।
ভূমিতে শয়ন করি সুখে নিদ্রা যায়॥
কিন্তু এ সংসারসিন্ধু লঙ্ঘন কারণে।
দিয়াছেন উপযুক্ত বুদ্ধি নরগণে।
অন্বেষণ করিলেই যে বুদ্ধির বলে।
সকল প্রকার গুণ ন্যস্ত করতলে॥

বৈরাগ্য শতক

কই সে মুখারবিন্দ মধুর অধর।
কোথায় আয়ত সে কটাক্ষ কটুতর।
কোথা সে কোমল কথা শ্রুতি সুখকারী।
ভুরুর ভঙ্গিমা, স্মরধনু দর্পহারী॥
এযে অস্থি পঞ্জরেতে প্রকট দশন।
মঞ্জু মঞ্জু গুঞ্জরিছে তাহে সমীরণ॥
মহা মোহ জালরূপ শরের কপাল।
রাগান্ধের মত হাসে হেরিতে করাল॥

শান্তিশতক

দ্রৌপদী।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধা নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও, যিনিই সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যাপ্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরানুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

মহাভারতকার যে রামায়ণকে এক প্রকার আদর্শ করিয়া কিম্বদন্তীমূলক বা পুরাণকথিত ঘটনা সকলকে ইতিহাস সূত্রে গ্রন্থিত করিয়াছেন, এই বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এমত কথার আভাস দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান নায়িকা সম্বন্ধে মহাভারতকার নিতান্ত নিরপেক্ষ। মহাভারতে নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি—অতএব সীতাচরিত্রানুবর্ত্তিনী নায়িকারও অভাব নাই কিন্তু দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে, মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ; দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণ গুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন-গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা

জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদী চরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে। তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ, যে, যে সেই দুর্ব্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ব্ববীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্যবিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন, যে কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্রকবিকে বুঝাইয়াদিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন, যে তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয় তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলা ক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে

দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড প্রতাপ সমন্বিতা মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে, রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজ তুল্য পিতার ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিদ্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "'আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।' এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।"

এই এক কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায়, বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও, কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপেপ রাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, কূটতর্ক উপস্থিত করিবেন।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায়, দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং

অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তিনিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; কেবল দ্রৌপদীতেই ইহা ধর্ম্মানুরাগ অপেক্ষা প্রবল। নহিলে তিনি স্বয়ম্বর সভাতলে পিতৃসত্যের ব্যতিক্রম করিয়া বলিতেন না যে, "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না।" তা না হইলে দুর্য্যোধনের সভায় স্বামীর পণ ব্যতিক্রম করিয়া কূটপ্রশ্ন করিতেন না। এটি স্বভাবসঙ্গতই হইতেছে, স্ত্রীলোকের গর্ব্ব, সহজে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে দ্রৌপদীচরিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম, ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজঃ কতক্ষণ থাকে! মাহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!" এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

বলিয়াছি, যে দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প এত প্রবল, যে তাহাতে সময়ে সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেস্থানটি এত সুন্দর, যে যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন হে ভরতকুল-

প্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয় নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রর্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উহাঁরা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধু সৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বলপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশে ভর্ৎসনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন।

পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উহাঁরা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; আমি ধর্ম্মরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপানন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর; নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত; উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছা কর; তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উহাঁর শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত; যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত; আনন ভ্রূকুটীকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত; যিনি মুহুর্মুহু ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন; উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল মনে উহাঁরে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উহাঁর ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উহাঁর নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

ইহাঁর নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা; ইহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্যমধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইহাঁর অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম-

রাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহারে সূর্য্যসম তেজঃ-সম্পন্ন দেখিতেছ; উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহাঁর তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম্ম ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়; এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ; সেই পাণ্ডবেরা তোমারে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইহাঁদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও; তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে; সন্দেহ নাই।"*

ক্রমশঃ।

সম্পাদকীয় উক্তি।

দেবীবর ঘটক বিষয়ে যে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক উৎকৃষ্ট অভিনব পুস্তকের এক অংশ। ঐ পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে বিদ্যানিধি মহাশয় তদংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে ঐ প্রবন্ধটি যন্ত্রস্থ হইয়া প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বশতঃ বঙ্গদর্শন প্রচারে বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে মূল পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

* এই প্রবন্ধ যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে।

চৈতন্য ।

প্রথম অধ্যায় ।

(চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা ।)

মানব সমাজের প্রকৃতি মানবদেহের ন্যায় । দেহ যেরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা ধমনী ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে ও নূতন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা ও ধমনী তৎস্থলাভিষিক্ত হইতেছে, মানব সমাজও সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রাচীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম উঠিয়া যাইতেছে ও নূতন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে । তোমার অদ্য যে দেহ দৃষ্ট হইতেছে সাত বৎসর পরে তাহার কিছুই থাকিবে না কিন্তু তুমি পরিণতবয়স্ক, তোমার আকারগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াও এত সৌসাদৃশ্য থাকিবে যে তোমাকে চিনা যাইবে; কিন্তু তুমি যে ভাগিনেয়ের মুখে অন্নপ্রাশন কালে অন্ন দিয়াছিলে, দশ বৎসর পরে তাহাকে দেখিলে কি চিনিতে পার? মানবসমাজ সম্বন্ধেও অবিকল ইহাই ঘটিয়া থাকে । বর্দ্ধিত অর্থাৎ সভ্যসমাজ যদিও পরিবর্ত্তশীল, তথাপি ২।১ শতাব্দীর মধ্যে তাহার গঠনগত বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তন হয় না । পক্ষান্তরে অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য সমাজে কোন বিশেষ উন্নতির কারণ নূতন প্রবর্ত্তিত হইলে, স্বল্পকাল মধ্যে উক্ত সমাজকে এত বিপর্য্যস্ত করে যে ঐ সমাজের সঙ্গে পূর্ব্বতন সমাজের কোনই সৌসাদৃশ্য থাকে না । ভারতের আধুনিক অবস্থা প্রথমোক্ত স্থলের উদাহরণ এবং ইদানীন্তন জেপান সাম্রাজ্য শেষোক্ত স্থলের উদাহরণ ।

মানব সমাজের এই রূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ব্যতীত সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে শরীরের ব্যাধিগত পরিবর্ত্তের ন্যায় একএকটী বিশেষ পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ব্যাধিগত শারীরিক পরিবর্ত্ত নিরবচ্ছিন্ন মন্দ, আর এইরূপ সামাজিক বিপ্লবঘটিত পরিবর্ত্তে সমাজ সময়ে সময়ে যেমন অপকৃত হয় আবার সময়ে সময়ে সেজন্য উপকৃতও হইয়া থাকে ।

যেমন শরীরে অদ্য যে ব্যাধি অনুভূত হয়—অনুসন্ধান করিলে জানা যায় তাহার কারণ অনেক পূর্ব্বে (হয়ত জন্ম কালেই) উদ্ভাবিত হইয়াছে । সেই রূপ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও জানাযায়, যে বিপ্লব অদ্য সমাজকে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে তাহার কারণ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে উদ্ভাবিত হইতেছিল । বাস্তবিক বিবেচনা করিলে বুদ্ধদেব

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নহেন। যে দিন ব্রাহ্মণগণ ভারতে একাধিপত্য করিলেন, ভারতের মান মর্য্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখসম্পত্তি এবং পরিণামে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত একচাটিয়া করিয়া লইলেন, সেই দিনই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছিল, মহাত্মা শাক্যসিংহ সেই সকল অগ্নি একত্রিত করিয়া তাহাতে নবীন আহুতি দিয়া যে অগ্নি জ্বালিলেন তাহা সমুদয় ভারত, সমুদয় আসিয়া আলোকিত করিল।

এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমরা কোনমতে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক বঙ্গসমাজের পরিবর্ত্তন হঠাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণমূলক নহে একথা বলিতে পারি না। দৃষ্টিনিরপেক্ষ যুক্তিতে ও অতীত কালের দৃষ্টান্তে যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে বঙ্গসমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও তাহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণিত হইবে। এই আন্দোলনের কারণও বহুকালহইতে সঞ্চিত হইতেছিল।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, চৈতন্যদেব কেবল মাত্র ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ কখন বা জ্ঞানকাণ্ড কখন বা কর্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বঙ্গের সমুদয় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। সত্য বটে ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচারই চৈতন্যদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বঙ্গের কি সামাজিক অবস্থা, কি সাহিত্য, কি গার্হস্থ সকল বিষয়কেই নব আলোক ও নব জীবনে রঞ্জিত করিয়াছিল। জাতিভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্ত্তনের* জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্ব্বদা চীৎকার ও অনেক "টেবল থাবড়াইয়াও," সত্য বলিলে, কিছুই করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্য এ সকল কর্ত্তব্যবিশেষের জন্য কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বঙ্গসমাজের আন্দোলন ধর্ম্মমূলক হইয়াও কেবল মাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন নহে। এই জন্য উক্ত আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গসমাজের সকল শাখা প্রশাখার অবস্থাই পর্য্যালোচন আবশ্যক।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় আর্য্যোপনিবেশী দিগের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তে যায়। শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্ম্মচারী, সৈনিক পুরুষ প্রভৃতি অনেকেই হিন্দু ছিলেন। দাস-

* ইহার সকল গুলিনকে আমরা প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করি না এই জন্য উন্নতি আখ্যা প্রদান না করিয়া পরিবর্ত্তন মাত্র বলিলাম। শ্রীকৃ——

রাজের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার বঙ্গে প্রবেশ করিলে, রাজসভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রোদ্ঘাটন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "বঙ্গে যবনাধিকার অনিবার্য্য যে হেতু শাস্ত্রে লেখা আছে।" বখ্‌তিয়ার ১৭ জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে শাস্ত্রের বচন অখণ্ড্য। রাজা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় পরাজয় হইবে স্থির বুঝিয়া বিজ্ঞের কার্য্য করিলেন—সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া,রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিলেন। আজন্ম অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজত্বের প্রতি মমতা এতাধিক!! বঙ্গদেশাধিপতির এত বীর্য্য ও তেজস্বিতা!! পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ হাস্যজনক রাজপরিবর্ত্ত আর প্রায় দেখা যায় না। যে দেশে এত নিস্তেজ ও আত্মাভিমানশূন্য রাজা নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারেন, তথাকার অধিবাসিগণ কত দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও অভিমানশূন্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তেজস্বিতাশূন্য জাতির উচ্চাভিলাষ বা ঐহিক মান সম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ আস্থা নাই, পক্ষান্তরে মানবমন কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই জন্য যে মনুষ্যের অথবা যে জাতির মান সম্ভ্রম প্রভৃতি বীরজনোচিত গুণ না থাকে তাহারা স্বতঃই ধর্ম্মপরায়ণ অথবা সামাজিক আন্দোলনপ্রিয় হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকরণে তান্ত্রিক মত প্রচার, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার,ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২০৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন শাসনাধীন হইল। এই সময়ে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোকের পদকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ নামে ধর্ম্মযাজক কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বে সর্ব্বা। বিদ্যা তাঁহার, বুদ্ধি তাঁহার, ভোগ তাঁহার, ক্ষমতা তাঁহার, মান তাঁহার, সমুদয় দান তাঁহার, নিমন্ত্রণে অগ্রে আহার তাঁহার, ধর্ম্ম তাঁহার, ঈশ্বর তাঁহার। শূদ্র তাঁহার দাস, বৈশ্য তাঁহার কৃষক,বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসক। এরূপ উপদ্রব লোকে কয়দিন সহ্য করিতে পারে? নিতান্ত অক্ষম না হইলে কে চিরকাল কাহার দাস হইয়া থাকিতে বাসনা করে? এতদিন কতক ধর্ম্ম শাসনে ও কতক রাজশাসনে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রাজপরিবর্ত্ত হইল। যবন সিংহাসনাধিরূঢ় হইল। আর সে প্রাধান্য কোথায়? লোকের মন বহুকাল যে নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, রাজবল দূর হইলে, আপনা হইতে তাহা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে লাগিল। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইল। ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকাংশে সমান হইল। তখন বঙ্গবাসিগণ দেখিল

পৃথিবী কেবল তাহাদিগের দৃষ্টি মধ্যগত নহে—ইহার আরও অনেক বিস্তৃতি আছে—এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাঁহাদিগের ন্যায় পরলোকের চিন্তা করে কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রের দ্বারা তেমন জ্বালাতন হয় না, ধর্ম্মের জন্য ঐহিকের সুখে একেবারে জলাঞ্জলি দেয় না, প্রতি পাদবিক্ষেপে—আহারে, বিহারে, শয়নে, উত্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে শাস্ত্রের ব্যবস্থা লইয়া চলে না, স্বেচ্ছানুরূপ অনেক সুখ সম্ভোগ করিতে পারে অথচ পরলোকের হানি হয় না। এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ প্রকাশ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল এবং পরোক্ষে জাতিসাধারণের অনেকে ক্রমশঃ স্বধর্ম্মের প্রতি গতরাগ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের সত্য বিশেষের পক্ষপাতী হইতে লাগিল।

যবনাধিকারে বঙ্গদেশে যেমন এই সুফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ আবার তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা, সুখলিপ্সা ও ব্যভিচার অনেক পরিমাণে লোককে পাপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

একদিকে জাতিভেদ রহিত ও বিলাস বাসনার চরিতার্থতা এবং অপরদিকে আর্য্যজাতির বহুকাল বর্দ্ধিত ঈশ্বরস্পৃহা পরলোকভীতি যখন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল তখনই তন্ত্রের† মত ক্রমশঃ উদ্ভূত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে সর্ব্ববিদ্যা (১) উপাধিধারী জনেক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব বঙ্গে আবির্ভূত হইয়া অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বলে বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তন্ত্রের মত প্রচার করিলেন। তন্ত্র যদিও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত শিবের উক্তি বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বিষয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে তন্ত্রোক্ত আবরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে তন্ত্র কখন রচিত হইতে পারিত না।

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা
দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্
পৃথক্॥

ইত্যাকার তন্ত্রোক্ত বচনোচিত আচরণ যে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল এবং ইত্যাকার বচন যে জাতিভেদ প্রথা কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে রচিত হয় নাই এ কথাতে কে সন্দেহ করিবে?

সামাজিক পরিবর্ত্ত ক্রমশঃ ও অননুভূত। মনুষ্য হঠাৎ চির অভ্যস্ত প্রথার বিপরীত আচরণ করিতে বা চির সংস্কারের বিপরীত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। অদ্য আমার যে আচরণ বা সংস্কার আছে আমার বিজ্ঞতা অনুযায়ী অল্প অধিক

† অবশ্য এ স্থলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে না।

(১) ইহার নাম আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি নাই।

বা অনেক অধিক দিবসে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং তন্ত্রের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল না হইলে চৈতন্য কদাপি এক জীবনে আচণ্ডাল‡ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না এবং

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-
পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বাপদাধমঃ॥

এইরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না।

যদিও বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু অনতি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিল। ইহাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম এতদূর নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল যে পরবর্ত্তী সেনবংশীয় আদি ভূপতি আদিশূর কোন যাজ্ঞিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কুলকালিমার গ্রন্থকার ও আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বল্লালসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় কোন কোন ভূপতিকেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণন করেন। বল্লাল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন কি না—তদ্বিষয় অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। "তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন" ইহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ থাকাতেই অনুভূত হয় সেনবংশীয় ভূপতি দিগের সময়েও এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অপ্রচলন হয় নাই। কালে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ মত বিচারে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম দূর হইল, তথাপি লোকের আচার আচরণ ও সংস্কারের উপর তাহার বহুশতাব্দী ব্যাপক ফল কোথায় যাইবে? অদ্যপর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালির মুখে শুনা যায় অহিংসা পরমো ধর্ম্ম। কেহ ভ্রমেও একথা মনে করেন না, এবাক্য হিন্দু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে। যদিও চৈতন্য দেবের জন্মের কিছুদিবস পূর্ব্বে বৌদ্ধমত বঙ্গ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি বহুকাল প্রচলিত থাকায় লোকে

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং।
অত স্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধো-
ঽবধঃ॥

প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মতের উপর গতরাগ হইয়াছিল এবং সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সত্যবটে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে পান ভোজন সম্বন্ধে যারপর নাই প্রতিবন্ধক ছিল; এবং তাহার অভ্যুদয় হইলে, ধর্ম্মাচরণ ভাণে লোকে স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া

‡ কেবল চণ্ডাল কেন চৈতন্য সকলকেও স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

উঠিয়াছিল। (এই জন্যই তন্ত্রে ঈদৃশ ব্যভিচারের আধিক্য দৃষ্ট হয়।) তথাপি সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রভৃতি বৈষ্ণব দিগের প্রধান নীতি বঙ্গে একদা বৌদ্ধমতাধিক্য থাকার অন্যতর ফল।

যখন বঙ্গদেশের একদিকে পৌত্তলিকতা,* অপরদিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের একেশ্বর বাদ লোকের মনকে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈষ্ণব মতাবলম্বী রামানুজ আচার্য্য সংস্থাপিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন বঙ্গে একদিকে বৌদ্ধ মত প্রচলন থাকার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চ নীতি প্রচার হইতেছিল, অপর দিকে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ও তন্ত্রের উপদেশে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ ব্যভিচার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখনই বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত† সূক্ষ্ম ভাবে দুই এক জনের মনে উদয় হইতেছিল। ক্রমে উহা তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় হইল এবং তাঁহারা তৎপ্রচার জন্য যত্নশীল হইলেন। কয়েক জন কবি (জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস) এই মতের পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম (১) বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই সকল কবির লেখা লোকের চিত্তকে বিগলিত করিল। আরও অনেক লোক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া আসিতে আসিতে, ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য দেবের জন্মের কিছু পূর্ব্বে অনেক প্রকৃত বৈষ্ণব বঙ্গের বিবিধ স্থান বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী শান্তিপুর প্রভৃতি আলোকিত করিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন;

আগে অবতরিলা যে গুরু পরিবার,
সংক্ষেপে কহি যে কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধব পুরী, কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী॥

অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্য রত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব পূর্ব্বে সদ্গুণ সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥

* হিন্দু ধর্ম্মে একেশ্বর বাদও আছে, কিন্তু তাহা তৎকালে বঙ্গে প্রচলিত ছিল না।

† সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি ও জীবে দয়া।

(১) বৈষ্ণবদিগের মূলগ্রন্থ ভাগবত, এ গ্রন্থে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমচ্ছলে ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণন আছে। অনেক বৈষ্ণব তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম বর্ণন শ্রবণই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিল।

রাঢ় দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥
অসংখ্য ভক্তের করিয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্র কুমার॥*

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে কোন নবীন সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার সূত্রপাত হয়। ইতিহাস, সমাজতত্ব, মনস্তত্ব, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্ম, সকল বৈষয়িক সত্য প্রচারই এই সাধারণ নিয়মান্তর্গত। ইসার জন্মের পূর্ব্বে জোহান প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারক, মার্টিন লুথারের পূর্ব্বে উইক্লিফ প্রভৃতি সংস্কারক, পূর্ব্বসংস্কার যুক্ত স্বাধীনচেতা পণ্ডিত পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহনরায় প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয় মূলক ধর্ম্ম বাদী এবং চৈতন্যের পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য, ভারতী গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী মহাত্মা যে সত্য প্রচার করিবেন তাহার পথ কথঞ্চিৎ পরিস্কার করিয়া ছিলেন। কেবল ধর্ম্মে কেন? বিজ্ঞানেও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। নিউটানের বহুকাল পূর্ব্বেই লোকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আভাস বুঝিয়াছিলেন। নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই পণ্ডিতবর গালিলীও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মাদি পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তবে ঐ নিয়ম যে বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে পত্র স্খলিত হইলে ভূপতিত হয় সেই নিয়মেই সমুদয় বিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ যথা স্থানে রক্ষিত হয় একথা নিউটনের পূর্ব্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

ইহার কারণ কি? কোন মতের প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্ত্তক কেন তাহা প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হন না? কিজন্য উইক্লিফ রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আপনার মত পোপের বিরোধী নহে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে কি জন্য পরবর্ত্তী ঐ মতাবলম্বী কাল্বিন ক্রান্মোর প্রভৃতি সংস্কারকগণ কোনরূপ অত্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই? ইহার কারণ এই যে যখন কেহ প্রথমতঃ কোন নবীন সত্য আবিষ্কার করে, প্রথম সময়ে তাহা তাঁহার মনে অপরিস্ফুট ভাবে অবস্থান করে হয়ত পক্ষাবলম্বী লোক একটীও থাকে না। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণ করিতে হইলে; লোকের প্রতিকূলাচরণ একাকী সহ্য করিতে হয়। এদিকে উক্ত সত্য চিরপ্রসিদ্ধ মতবিরোধী হওয়ায় সাধারণ লোকে তৎপ্রতিপালকের উপর যারপর নাই অত্যাচার করে। কিন্তু ঐ সত্য কিছুকাল প্রচারিত হইলে অনেকে উহার উৎকৃষ্টতা অনুভব করিয়া তন্মতাবলম্বী হয় এবং জনসাধারণও স্বাভাবিক সত্যানুরগবশতঃ কিয়দংশে

* কৃষ্ণ। ইহাকে বৈষ্ণবগণ পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলেন।

তাহার পক্ষগত হয়। এইজন্য কোন নবীনসত্য প্রচারের কিছু কাল পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ, কালে যে রূপ উৎপীড়নের গূঢ়ত্ব ও উৎপীড়কের সংখ্যার হ্রাস হয়, সেই রূপ তন্মতাবলম্বীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় অনেকে একত্র হইয়া উৎপীড়ন সহ্য করে, সুতরাং তাহার ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হয়। (একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে দুঃখ ভার একক বহন করা অপেক্ষা দশজনে একত্র হইয়া বহন করা সহজ।) এই জন্যই যথার্থ প্রচারকের পূর্ব্বে তন্মতাবিষ্কারক ও উদ্ভাবক জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বস্তুতঃ বিধাতা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট করেন না, কিন্তু দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী প্রথম উদ্ভাবক আপনার মত সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্য সেইমত অশেষবিধ অত্যাচার ও ত্যাগস্বীকার সহ্য করিয়াও জীবনে পরিণত করে। এই জন্য কোন ধর্ম্ম সংস্কারক অথবা কোন নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রে কয়েক জন সাধারণ অথবা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রধান লোক জন্মপরিগ্রহ করিয়া তত্তৎ সত্য কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া তাহা সাধারণ্যে বিশেষরূপে প্রকাশ করে। পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির জন্ম ও পরে চৈতন্যের জন্ম দ্বারা এই সত্য বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র পুরন্দর নামক জনৈক বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তনয় জগন্নাথ মিশ্র স্বীয় পত্নী শচীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে আট কন্যা জন্মগ্রহ করিয়া গতাসু হয়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামক এক পুত্র জন্মে। বিশ্বরূপের পর শচী আর এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন—ঐ সন্তানই অদ্যকার শিরোণামাঙ্কিত মহাত্মা **চৈতন্যদেব।**

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যকাল।

চৈতন্য ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলা শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোকে করে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমি অবতরি॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

চৈতন্যের জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল সুতরাং ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ প্রথানুযায়ী জনসাধারণ হরিনাম কীর্ত্তন, ও হরি! হরি! ধ্বনি ও নানারূপ দানধর্ম্ম ও জপ তপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অন্য কারণে হইয়াছিল, শিশুর আত্মীয়গণ মনে করিল এরূপ পবিত্র সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে অবশ্য কোন শাপভ্রষ্ট মহা পুরুষ হইবেক। কালে হয় ত ইহাও চৈতন্যের জীবনকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ দশ জনে একজন লোকের সুখ্যাতি করিলে, তাঁহার প্রশংসিতগুণ থাক বা না থাক, অন্ততঃ প্রশংসাকারীদিগের সম্মুখে ভাল করিয়া বলা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনেক স্থলে প্রশংসিত লোক বস্তুতঃ সে সকল গুণ জীবনে পরিণত করেন। সুতরাং চৈতন্য কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোকমুখে এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার সার্থকতার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? পক্ষান্তরে যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। একান্ত হৃদয়ে যত্ন করিতে করিতে যথার্থই মানবসমাজে একজন মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি?

অতি প্রাচীনকাল হইতেই, জীবনচরিত লেখকগণ আলোচ্য ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি ঘটিত নানা রূপ অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের জীবনচরিত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই চিরন্তন পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া চলেন নাই। চৈতন্যকে তাঁহার মাতা ত্রয়োদশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইবার সময়

হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম * হৈল আনন্দে বিহ্বল॥
চৈতন্য চরিতামৃত।

কথিত আছে শৈশবাবস্থায় চৈতন্যের হস্তপদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল। এই সকল চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ।

বৈষ্ণবগণ তাহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহিণী লক্ষ্মীদেবী নবদ্বীপে আসিয়া এরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত শিশু দর্শন করিয়া পরমানন্দিতা হইলেন এবং দীন দুঃখীদিগকে বিস্তর অর্থদান করিলেন। লক্ষ্মীদেবী শিশুর নাম নিমাই রাখিলেন। ডাকিনীর হস্তহইতে শিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এইরূপ কুৎসিত নাম† রাখা হইয়াছিল।

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের বাল্যাবস্থা ঘটিত বিস্তর অলৌ-

* কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব কাব্য হইতে এই ভাব লওয়া।

†অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক মৃত বৎসার সন্তানের এইরূপ শ্রুতিকটু নাম রাখেন।

কিক ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। শৈশবাবস্থায় একদা চৈতন্য গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে মাটি খাইতেছিলেন, ইহা দেখিয়া শচী তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন। শিশু বলিল "সমুদয় বস্তুই মাটি, যে হেতু মাটি বিকৃত হইয়া উদ্ভিদাদি হয়। সুতরাং উদ্ভিদাদির ন্যায় মাটি আহার করায় দোষ কি?" শচী বলিলেন "বস্তু মাত্রের স্বাভাবিক ও বিকৃতাবস্থা সমগুণ বিশিষ্ট নহে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য দৌড়িয়া মাতার অঙ্কে উঠিয়া বলিলেন "মা! আর আমি মাটি খাইব না, আমি তোমার স্তন্যপান করিব।" অন্য দিন এক জন ব্রাহ্মণ জগন্নাথের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্ষ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন, নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, নিমাই আহার করিতেছেন। জগন্নাথ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রকে নানারূপ তাড়না করিয়া গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার রন্ধন করিলেন। রন্ধনান্তে যখন পুনর্ব্বার বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে বসিয়া চক্ষুমুদিত করিলেন, অমনি নিমাই পুনর্ব্বার আহার করিতে বসিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়ায় ব্রাহ্মণ পরিণামে বুঝিতে পারিলেন নিমাই সামান্য শিশু নহে—বিষ্ণুর অবতার। তখন সানন্দচিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ও নিমাইকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া বিদায় হইলেন।‡

চৈতন্য বাল্য কালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। স্নান করিতে গিয়া ঘাটে বয়স্যাদিগের সহিত কলহ করিতেন ও কুমারী দিগের আনীত দেবপূজার্থ নৈবেদ্যাদি অপহরণ করিয়া আহার করিতেন।

ক্রমে চৈতন্যের বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে নবদ্বীপনিবাসী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিলেন। তথায়, চৈতন্য স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে অত্যল্পকালেই ব্যাকরণ সমাধা করিলেন।

এদিকে জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ কৌমারাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। জগন্নাথ বিশ্বরূপের বিবাহের জন্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ সংসারে যারপর নাই নির্লিপ্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদা মনে২ সন্ন্যাস ধর্ম্মের উৎকর্ষ চিন্তা করিতেন। পিতা বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিশ্বরূপ নিভৃতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া, জনক জননীকে ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত

‡ ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্য কাল ঘটিত এইরূপ একটি বর্ণন আছে। হয়ত বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের প্রাধান্য বিস্তার জন্য তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

হইলেন। বৃদ্ধ জনক জননী অপত্য-বিরহে অনেক রোদন করিলেন। হাঃ! নিষ্ঠুর বিধাত! তোমার অন্তর পষাণ ময়! অন্যথা সৃষ্টিতে কিজন্য একজনের কর্ম্মফল অন্য জনে ভোগ করে; এক জনের কৃত অপরাধ জন্য অন্য জনে দণ্ড পায়।

বৃদ্ধ জনক জননী অনেক রোদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল? তাঁহাদিগেরই শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল। কাল সর্ব্বসংহর্ত্তা। কালে যেমন সুরম্য হর্ম্ম্য ভগ্ন হইয়া ধূলিসাৎ হয়, দিগন্ত-ব্যাপী বৃহৎ রাজ্যের নাম লোপ পায়, সেইরূপ আবার মরুময় স্থান বৃহৎ অট্টালিকাশোভিত হয় এবং অপত্যবিরহ-বিধুর অনেক পরিমাণে শোক বিস্মৃত হইয়া শান্তি লাভ করে। যদি প্রিয়জনবিরহ-শোকের তীব্রতা কালে লঘু না হইত তাহা হইলে সংসারে আর কে সুখ পাইত? কেই বা তাদৃশ শোকভারবাহী জীবনভার বহন করিতে পারিত। কারণ কে না প্রিয়জন হারাইয়াছে? এই কালের মোহিনী শক্তিতে জগন্নাথ ও শচী চৈতন্যের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশে ভুলিয়া গেলেন। কেনই বা না ভুলিবেন, চৈতন্যের ন্যায় গুণবান্ এক পুত্র সহস্র পুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয়। এদিকে বালস্বভাব চৈতন্য অপত্য-বিরহবিধুর-জনক-জননীর দুঃখ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। নানা রূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের চরণ সেবা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

চৈতন্যের বিদ্যাভ্যাস সমাধা হইতে না হইতে জগন্নাথ মিশ্র মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পর একদা চৈতন্য চতুষ্পাঠী হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে পথিমধ্যে বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরম রূপবতী লক্ষ্মী দেবীকে নয়নগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। দৈবে বনমালী ঘটক (ইনি বোধ হয় নবদ্বীপে আধুনিক ঘটক দিগের ন্যায় বিবাহের ঘটক ছিলেন) সেই পথে গমন করিতে ছিলেন। ঘটকবর সহজেই চৈতন্যের প্রণয়লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং উভয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। ত্বরায় মহানন্দে চৈতন্যদেব লক্ষ্মী দেবীর ‡ সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন।

গুণবতী লক্ষ্মী দেবীকে গৃহে আনিয়া চৈতন্য পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

‡ বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন লক্ষ্মী রাধার অবতার স্বরূপ।

ভাবী বসুমতী।

বিশ্ব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ কয়েকটী সাধারণ নিয়মান্তর্গত। পরিবর্ত্তনশীলতা সাধারণ নিয়ম। এই প্রকাণ্ড বিশ্বের যে দিকেই নেত্রপাত কর এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না যাহা এই নিয়মাতীত। তোমার সম্মুখে যে বস্তু রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ, ক্ষয় অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তোমার সম্মুখে যাহা নাই তাহারও এই দশা। যদি বল একথার প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসর সহস্র সহস্র মনুষ্য এইরূপ দেখিয়াছে—কেহই ইহার ব্যভিচার দেখে নাই, অথবা শুনে নাই। তুমিও আজীবন ইহাই দেখিয়াছ এবং শুনিয়াছ এবং কখন ইহার ব্যভিচার দেখ নাই, অথবা শুন নাই। সুতরাং যাহা কদাপি হয় নাই বিশ্বের নিয়ম পরিবর্ত্ত না হইলে তাহা কিরূপে হইবে?

তোমার দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সাতবৎসরে আর কিছুই থাকিবে না। তোমার গৃহ প্রতিনিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কয়েক বৎসরে জীর্ণতানিবন্ধন ভগ্ন হইয়া যাইবে। কেবল সামান্য সামান্য পদার্থ কেন জ্যোতির্ব্বিদেরা অনেক গ্রহ উপগ্রহেরও গতি পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসবর্ণন করিয়াছেন। আমাদিগের শাস্ত্রকর্ত্তারা এই প্রলয়ের কথা অনেক বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে বসুমতীর প্রলয় হইবে এবং প্রলয় কালে দ্বাদশাদিত্য উদয় হইবে। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত; এ সকল হুট করিয়া উড়াইয়া দেও। যদি শাস্ত্রের কথা শুনিতে ইচ্ছা না কর, শ্রবণ কর, বিজ্ঞান কি বলে। "নাক্ষত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ বিষয়। কাল্পনিক বা আনুমানিক নহে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে হর্শেল সাহেব ৪২ বর্জিনিস্কে দেখিতে পান নাই। কখন কখন একেবারে কতকগুলি তারকা দৃষ্টিগোচর হইয়া এক কালেই প্রলীন হইয়াগিয়াছে। এই সকল ব্যাপার নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালেও অনেক পণ্ডিত এরূপ নাক্ষত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১২০ খৃষ্টাব্দে হিপ্পর্কস এইরূপ একটী প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৮৯খৃঃ অব্দে আলফা আকুইলি নামক নক্ষত্রের নিকট আর এক অভিনব তারকা হঠাৎ দেখা যায়; তাহা তিন সপ্তাহ কাল শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল পরে একেবারে অদৃশ্য হইল। ১০৬ খৃঃ অব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে স্বর্ণপুঞ্জের মধ্যে এক অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়; তাহা এক বৎসর যাবৎ দেখা গিয়াছিল। ১৬৭০ অব্দে হংস্য পুঞ্জের শীর্ষ দেশে এক অভিনব নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পরে অদৃশ্য হয়; পুনর্ব্বার দেখা যায়।

তখন বিবিধরূপ আলোক পরিবর্ত্তন দেখাইয়া দুইবৎসর পরে যে কোথায় গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। এপর্য্যন্ত এইরূপে যত নক্ষত্রকে প্রলীন হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাসীও পিয়া নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে যে এক তারকা দেখা গিয়াছিল, তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্ময়কর। সেই নক্ষত্র শীঘ্র শীঘ্র সমধিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতে লাগিল—এমন কি শেষে বৃহস্পতি অপেক্ষাও উজ্জ্বল হইয়াছিল। ক্রমে তাহার জ্যোতির হ্রাস হইতে লাগিল। দাহ্যমান পদার্থের যে সকল বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনই উক্ত নক্ষত্রে ক্রমে ক্রমে লক্ষিত হইয়াছিল এবং একবৎসর চারিমাস পরে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়াই একেবারে অদৃশ্য হইয়াগেল। যে নক্ষত্রদাহন এতদূর হইতে এরূপ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় সে দাহন কিরূপ ভয়ঙ্কর আমাদিগের কল্পনাও তাহা ধারণা করিতে পারে না। আমাদিগের বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহদ্বয়ের কক্ষার মধ্যে, কতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ অনুমান করেন, ধূমকেতুর আঘাতে কোন গ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভগ্ন হওয়ায় এরূপ হইয়াছে।''

যখন আমরা বিশ্বের সমুদয় অংশই পরিবর্ত্তনশীল দেখিতেছি, তখন কি মনে করিতে পারি, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা বসুমতীই এক মাত্র চিরকাল সমান থাকিবে। এই বসুমতীর অতীত কালের ইতিহাস † অনুসন্ধান করিলেও জানা যায় পৃথিবী সৃষ্ট হওয়া অবধি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর যে আকার আমরা অদ্য দেখিতেছি, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা বহুকালে গঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল কারণ অদ্যাবধি বিরাজিত থাকায় এক্ষণে যে আকার রহিয়াছে, নিশ্চয় অনুভব হয়, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চির উষ্ণ তরল পদার্থের উপর দুগ্ধের সরের ন্যায় আবরণ নিরন্তর পুষ্ট হইতেছে এবং তজ্জন্য পৃথিবীর স্থলভাগও ক্রমশঃ পুষ্টতালাভ করিতেছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আরও বলেন আদৌ ভূমণ্ডলে আগ্নেয় গিরির ‡ বহুল পরিমাণে আধিক্য ছিল। সেই সকল আগ্নেয়গিরিসমুত্থিত কর্দ্দম ও ধাতুনিস্রব হইতে স্থলবিভাগ পুষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ও সাগর বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত। বিভিন্ন স্তর বিভিন্নরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট। যে কারণে এক স্তরের উপর আর এক স্তর সঞ্চারিত হইয়াছে, সেই কারণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকায় নিশ্চয় অনু-

† ভূতত্ত্ব বিদ্যা

‡ একথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই বলিতে পারি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত আগ্নেয়গিরি ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার অধিকাংশই শীতল হইয়াছে।

ভব হয়, বসুমতীর বর্ত্তমানস্তরের উপর আর কত স্তর হইবে তাহার অন্ত নাই। বস্তুতঃ কারণের বিনাশ না হইলে কদাপি কার্য্যের বিনাশ হইবে না। সুতরাং এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিতে কদাপি বসুমতীর পরিবর্ত্তনশীলতার অন্যথা হইবে না।

(২) সর্ব্বদেশ প্রচলিত জনশ্রুতি বলিয়া থাকে এক কালে পৃথিবী একেবারে জলমগ্ন হইয়াছিল। একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হয় না। যদি কোন কালে কোন কারণ বশতঃ এরূপ তাপাধিক্য হয় যে পৃথিবীতে যত তুহিন সঞ্চিত আছে তাহা এককালে বিগলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবীর অতি উচ্চতম স্থলভাগও জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদিও এরূপ তাপাধিক্যের কোনই সম্ভাবনা নাই যে হেতু তাপাধিপতি সূর্য্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ শীতল হইতেছে। তথাপি ভবিষ্যতে ক্রমশঃ চাপ ও তদুপরি বর্ত্তমান সময়ের সূর্য্যরশ্মিপতন বশতঃ কোন বৃহৎ তুহিনখণ্ড বিগলিত হইয়া এক দেশ বা নগর ধ্বংস করিতে পারে একথাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই।*

(৩) হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতোপরি অদ্যাবধি সাগরবাসী প্রাণীর অবশেষ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হয় পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশ হিমালয়ও এক কালে সাগরগর্ভস্থিত ছিল। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ এমণ্ডিলক বলেন জলপ্লাবনে পৃথিবীর সকল অংশ জলমগ্ন হয় নাই, কেবল জলভাগ স্থল ও স্থল ভাগ জলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

(৪) ভূমিকম্প অথবা কোন কারণ বশতঃ জোয়ারের আধিক্য হইলে সময়ে সময়ে সাগর এত স্ফীত হইয়া উঠে যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর সমুদয় ধ্বংস হইয়া যায়। এরূপেও এক্ষণে বসুমতীর যে আকার আছে তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইতে পারে।

বিশ্বের কোনই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়নাই সুতরাং একথা কিরূপে বলা যাইতে পরে এরূপ জলপ্লাবন আর হইবে না। যদি এরূপ জলপ্লাবন পুনর্ব্বার হয় তাহা হইলে বসুন্ধরার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে।

(৫) যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যে তুহিন সঞ্চিত হইয়া পরিণামে নদীরূপে পরিণত হয় অথবা বাষ্পাকারে আকাশে উড্ডীন হইয়া করকা বা বৃষ্টি রূপে ভূপতিত হয়, যে নদী নিম্নস্থ ও সম্মুখস্থ বালুকা ও কর্দ্দম আত্মসাৎ করিয়া ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যে তরঙ্গমালান্বিতা নদী প্রতিনিয়ত তীরকে সবেগে আঘাত ক-

* সারজন হর্শেলের পিতা পূর্ব্বসূর্য্যের তাপাধিক্য ছিল একথা বিশ্বাস করিতেন। পুত্রও বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগে পিতার বাক্য অসম্ভব নহে একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

রিয়া † সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাতে প্রতিনিয়তই বসুমতীর এক স্থলের মৃত্তিকা অন্যস্থলগত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে এবং সাগরের তীরে এইরূপে কত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ‡ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বসুমতীসহ আধুনিক বসুন্ধরার তুলনা করিলে (এই সকল কারণ বশতঃ) অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যদি প্রতিদিন বসুমতীর একএকতিল পরিবর্ত্ত হয়, কাল অনন্ত এবং বসুমতী সীমাবদ্ধ এই জন্য নিশ্চয়ই এক কালে বসুমতী সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। এক দিন বা দুইদিনে হইবে না। এক সহস্র বা দুই সহস্র বৎসরে হইবে না। কিন্তু কোটি কোটি বৎসর গেলেও কালের সীমা হইবে না। সুতরাং এককালে বসুমতীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সম্ভব নয় *।

† এই জন্য পদ্মানদী প্রভৃতি বৃহৎবৃহৎ নদীর তীরে নিয়ত জমি পয়োস্থি ও শিকস্তি হয়।

‡ বাদা, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

* ভাবী বসুমতীর জীব জন্তুর প্রকৃতি বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা থাকিল।

সূর্য্যমণ্ডল।

"—তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দে
বস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥"

অসীম বিশ্ব মণ্ডলে যতকিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় চিত্তাকর্ষক আর কিছুই নাই। অতি প্রাচীন কালাবধি ইহা লোকের মনঃ ও নেত্র আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যগণ, প্রাচীন পারসিকগণ—প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই অত্যুজ্জ্বল প্রভাপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিয়া ইহাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ স্বীকার করিয়া উপাসনা করিতেন। বাস্তবিক, যদি প্রাকৃতিক কোন পদার্থদ্বারা জগদীশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সূর্য্যই সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং সরলচিত্ত প্রাচীন লোকেরা সূর্য্যকে স্রষ্টার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতেন, তাহা বড় বিস্ময়কর নহে।

এরূপ অতীব বিস্ময়কর সূর্য্য সম্বন্ধে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতানুসরণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিব।

সুতপ্ত সোণার থালার ন্যায় গোল সূর্য্য প্রতি দিন আকাশমার্গে গমন করিয়া আমাদিগকে কিরণ দান করিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন। এই সূর্য্য আয়তনে যে সৌরজগৎস্থ গ্রহ উপগ্রহগণ অপেক্ষা বড়, তাহা আজি কালি সামান্য পাঠশালার ছাত্রেরাও অবগত আছে। সূর্য্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১১১গুণ বড়; অর্থাৎ তাহার পরিমাণ ৮৮২০০০ মাইল। এই পরিমাণের স্থান কতখানি, তাহা বোধ হয় এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে। কোন রেলগাড়ী যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল হিসাবে চলে, তবে উক্ত গাড়ির সূর্য্যমণ্ডলের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে তিনবৎসর সাতমাসেরও অধিক সময় লাগিবে। কিম্বা যদি পৃথিবীকে লইয়া সূর্য্যমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে রাখা যায়, তবে পৃথিবীর চারি পার্শ্বে সূর্য্যমণ্ডলের এতস্থান থাকিবে, যে এক্ষণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যত দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে, তত দূরে থাকিয়া বেষ্টন করিলেও, চন্দ্রের কক্ষার বহিঃস্থ স্থান, চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা অতি অল্প কম হইবে।

সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যের উপরিভাগে কতকগুলি অস্থির কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায়। সেগুলি সূর্য্যমণ্ডলের একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে গমনকরে। তাহাতে জানা যায়, যে গ্রহ উপগ্রহগণের ন্যায়, সূর্য্যও আপনার মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে। এরূপ একবার আবর্ত্তন করিতে আমাদের ২৫দিন পরিমাণ সময় লাগে।

সূর্য্য তাপ আর আলোকের আকর। সূর্য্যমণ্ডল হইতেই সৌরজগৎস্থ গ্রহ ও চন্দ্রগণ তাপ আর আলোক পায়। পৃথিবীর যে পার্শ্ব যখন সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তখন সেই পার্শ্ব তাপ আর আলোক পায়; আর তাহার বিপরীতদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। এই আলোক ও অন্ধকারের নামান্তর দিন ও রাত্রি। সূর্য্য হইতে পৃথিবী উপরে নিপতিত তাপ আর আলোকের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া একজন পণ্ডিত কহিয়াছেন, যে কোন স্থানে ৫৫৬৩টা মমবাতি একসঙ্গে জ্বালিলে, তাহার একফুট দূরে যত আলো হয়, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপরে লম্বভাবে পতিত রশ্মির আলোক পরিমাণ তত। আর একটী মাত্র বাতি জ্বালিলে, তাহার ১২ফুট দূরে যে আলো হয়, চন্দ্রালোকের পরিমাণ তত; সুতরাং চন্দ্রালোক অপেক্ষা সূর্য্যালোক প্রায় ৩০০০০০ গুণ অধিক।

সূর্য্য অপরিমিত প্রচণ্ড তাপের আধার। সূর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি নাই; সূর্য্যমণ্ডলে দিবস রজনীরূপ আলোক ও অন্ধকারের পরিবর্ত্তন ঘটে না; ঋতু পরিবর্ত্তন নাই; এবং স্থল জলাদিরূপ কোন বিভাগ নাই। তাপের আধিক্য এত যে কোন প্রকার কঠিন পদার্থ, স্বীয় কাঠিন্য রক্ষা করিতে

পারে না। সোণা, প্লাটিনম, বা অন্য কোন কঠিন ধাতু সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে, বাস্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সূর্য্যমণ্ডলের প্রতিবর্গ ফুট হইতে এত তাপ নির্গত হয়, যে তাহা অতি প্রচণ্ডতম কৃত্রিম অগ্নিকুণ্ডের প্রতি বর্গফুট হইতে নির্গত তাপের সাতগুণ অধিক। পৃথিবী সূর্য্যাভিমুখে ১২ ঘণ্টা কাল মাত্র থাকে; আর বাকি ১২ ঘণ্টা শীতল হইতে থাকে; এবং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯৫,০০০০০০মাইল, (দূরত্ব অনুসারে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহা এস্থলে স্মরণ করা উচিত;) তথাপি পৃথিবীর উপরিভাগের প্রতিবর্গ ফুটে বার্ষিক এত তাপ পড়ে, যে সেই তাপে ৫৫০০ পাউণ্ড বরফ দ্রব হইতে পারে।

সূর্য্যের ভৌতিক রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের নানা মতভেদ আছে। তাঁহাদের সেই মতগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—এক মতের প্রথম প্রচারক গালিলীয়, এবং প্রধান সমর্থনকারী কার্চহফ। আর দ্বিতীয় দলের প্রধান নেতা সার উইলিয়ম হর্শেল। আমরা এইক্ষণে বলিয়া রাখিব, যে অধুনাতন নব্যপণ্ডিতগণ পুনরায় সূর্য্যমণ্ডল বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উৎকৃষ্টতর যন্ত্রের সাহায্যে এবং উৎকৃষ্টতর গণনাদি দ্বারা যেসকল নূতন মত প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে উপরোক্ত দুইটীমতের একটীও যে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, আমরা সার উইলিয়ম হর্শেল প্রচারিত মতের কথাই সংপ্রতি বলিব। পরে নূতন যে সকল মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারও কথা কিছু বলা যাইবে। সার উইলিয়মের মতে সূর্য্য তেজোময়; কিন্তু তদন্তর্গত সমুদায় পদার্থ তেজোময় নহে। স্থির হইয়াছে যে সূর্য্যের শরীর তেজোময় নয়; তাহা অন্ধকারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ গোলক। তাহার দুইটী আবরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ ঠিক সূর্য্য শরীরের উপরিভাগস্থ আবরণটীই তেজোময়। এই তেজোময় আবরণ কখন কখন ছিন্ন হইয়া যায়; সেই সময়ে সেই ছিদ্রান্তরাল দিয়া সূর্য্যের প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ শরীর দেখা যায়। এই কারণে সূর্য্যশরীরকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সূর্য্যের উপরিভাগে পরিদৃশ্যমান যে সমস্ত কৃষ্ণচিহ্নের কথা বলা গিয়াছে, সেগুলি সূর্য্যাবরণের ছিদ্রান্তরাল দিয়া দৃশ্যমান সূর্য্যশরীরের অংশ মাত্র। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে দেখিলে, তাহার উপরিভাগে এক অথবা ততোধিক কাল দাগ দেখা যায়। কখন২ এরূপ কতকগুলি দাগ একস্থানে পুঞ্জীকৃত দেখা যায়। তখন চাই কি সহজ চক্ষুতেও সেগুলিকে দেখা যাইতে পারে। একখণ্ড কাচকে দীপশিখাতে তাতাইয়া তাহাতে কালী পড়িলে, তাহার ভিতর দিয়াও সূর্য্যকে দেখা যাইতে পারে। অথচ চক্ষুর কোন কষ্ট হয় না। এই কৃষ্ণ দাগ সকলের

কৃষ্ণত্ব প্রায় মধ্যস্থলে সমান থাকে; কিন্তু তাহার পার্শ্বের কৃষ্ণত্ব তত থাকে না। যখন এই কাল ছিদ্রসকল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে দেখা যায়, তখন উক্ত ছিদ্র বেষ্টনকারী ঈষৎ কৃষ্ণস্থান সকলকে গোলাকার এবং সর্ব্বত্র সমবিস্তৃতি-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সে গুলি সূর্য্যের পার্শ্বে গিয়া পড়ে, তখন সেই অল্প কৃষ্ণ পার্শ্বের বহির্দ্দেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় না; এবং তাহার ছায়াতে কৃষ্ণতম অংশও আবৃত হইয়া পড়ে। সর উইলিয়ম হর্শেল এরূপ একটী কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এবিষয় ভালরূপ বুঝা যাইতে পারে;—"১৩ অক্টোবর ১৭৯৪। গত দিবস সূর্য্যমণ্ডলে আমি যে চিহ্নটী দেখিয়াছিলাম, অদ্য তাহা কিনারার এত নিকটস্থ হইয়াছে, যে তাহার পশ্চাদর্দ্ধের উচ্চদিকে সমস্ত কৃষ্ণতম অংশটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তবুও সেই গহ্বরটীকে দেখা যাইতেছে, এত সুন্দর দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণতম চিহ্নের নিম্নে এবং কালীম পার্শ্বদেশের উচ্চতা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।"

অপিতু এই ছিদ্র সমূহকে সূর্য্যমণ্ডলের একস্থানে সর্ব্বদা দেখা যায় না। তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে। সূর্য্যের যে অংশ বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ৩০ ডিগ্রির মধ্যগত, সেই অংশেই এই চিহ্নগুলিকে সচরাচর দেখা যায়।—এই অংশের মধ্যে সেগুলি বিচলিত হইয়া বেড়ায়। অপর ইহারা সময়ে২ স্বস্ব আকারও পরিবর্ত্তন করে।—প্রতি ঘণ্টায় এপ্রকার আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেখানে দুঃসহ চাকচিক্যময় জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ ছিল, সেখানে হঠাৎ একটী ছিদ্র উৎপন্ন হয়। সেই ছিদ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, পুনরায় কুঞ্চিত হইয়া ছোট হইয়া যায়; এবং শেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। কখন কখন এইরূপ অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে একটী রন্ধ্র ভাঙ্গিয়া গিয়া, ছোট২ কতকগুলি রন্ধ্র হইয়া পড়ে। এইরূপ আকৃতিপরিবর্ত্তন দ্বারা এই অনুমান হয়, যে তাহারা তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন। কখন২ কোন ছিদ্রের সীমা বৃদ্ধি পাইয়া ১০০০ মাইল বেগে অন্য কোন রন্ধ্রের নিকটবর্ত্তী হয়। তরল পদার্থ নহিলে আর কোন পদার্থের এরূপ গতি অসম্ভব।

সূর্য্যের বিষুব রেখার উভয়পার্শ্বস্থ অংশে এইরূপ গোলমাল দেখিয়া এই অনুমান করা যায়, যে সূর্য্যের গতির সহিত উক্ত চিহ্ন সকলের উৎপত্তির অতি নিকট সংস্রব আছে। কেন না কোন আবর্ত্তনকারী গোলকের মধ্যস্থলের পদার্থ সকল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে আবর্ত্তন করে। সুতরাং সেই আবর্ত্তনের ফল গোলকের মধ্যস্থলেই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এই জন্য এরূপ অনুমান করা যায়, যে পৃথিবীর উষ্ণ কটীবন্ধের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ যেরূপ মধ্যে২ প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত হইয়া থাকে

সেইরূপ সূর্য্যেরও মধ্যস্থলে মহা প্রচণ্ড সৌরবাত্যা সকল উত্থিত হইয়া, তাহার (সূর্য্যের) উপরিভাগের আবরণকে স্থানে২ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়; এবং সেই কারণে ঐসকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের ভিতর দিয়া সূর্য্যের নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ শীতল শরীর দেখা যায় বলিয়া, ঐ ছিদ্রসকল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে বাষ্পাকৃতি তরল পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই আবরণের উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমানভাবে উজ্জ্বল নহে। রন্ধ্রস্থ স্থান সকল অধিকতর উজ্জ্বল রেখাদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রেখানিচয় আবার বক্রাকৃতি এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এই রেখাগুলিকে কেহ২ জ্যোতির্ম্ময় আবরণের প্রবলতর তরঙ্গমালা বলিয়া জ্ঞান করেন। সূর্য্যমণ্ডলে কি মহা প্রচণ্ড অদ্ভুত আন্দোলনই ঘটিয়াছে!!

পৃথিবী যেমন বায়ুরদ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্য্যও সেইরূপ আর একটী অসম্পূর্ণ স্বচ্ছ বাষ্পাকৃতি পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বিতীয় আবরণটী প্রথম আবরণের উপরিভাগে থাকিয়া সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাকে "সৌরবায়ু" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় এই অর্দ্ধস্বচ্ছ সৌরবায়ু সূর্য্যের চারিদ্ধিকে প্রতিভাত হয়। এই বায়ু আছে বলিয়াই, সূর্য্যের মধ্যস্থল অপেক্ষা চারিপার্শ্ব অপেক্ষাকৃত অল্প তেজোময় দেখায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কার্চ্চহফ উপরোক্ত মতের বিপরীতবাদী। তিনি বলেন, সূর্য্যের শীতল শরীর পরিবেষ্টন কারী এপ্রকার প্রচণ্ডতম উজ্জ্বল সৌর আবরণের অস্তিত্ব অনুমান করা, কেবল অলীক কল্পনা মাত্র; কেন না, তাহা ভৌতিক নিয়মের বিপরীত। তিনি আপনার মত সমর্থনের জন্য যাহা বলেন তাহার সারমর্ম্ম এই;—সৌর কৃষ্ণচিহ্ন সকলের উৎপত্তি আদির কারণ বুঝাইবার জন্য সূর্য্যের ভৌতিক রচনাসম্বন্ধে উপরোক্ত যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত ভৌতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এমন কি যদিও উপরোক্ত মতে কৃষ্ণচিহ্ন সকলের উৎপত্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমরা না দেখাইতে পারি, তথাপি সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে উক্তমত কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। উক্ত মতাবলম্বীদিগের কল্পিত জ্যোতির্ম্ময় আবরণ যদি বাস্তবিকই থাকে, তবে তাহার তেজঃ অবশ্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবে; সূর্য্যের শীতল শরীরের দিকেও যেমন যাইবে, বহিঃস্থ সৌরজগতের দিকেও তেমনই ভাবে আসিবে। তাহা হইলে প্রকৃত সূর্য্য শরীর নিজে শীতল এবং যত অধিক কেন হউক না, শীতলতম আবরণে আবৃত থাকিলেও, কালে উক্ত আবরণ এবং সূর্য্যশরীর উত্তপ্ত হইয়া, তেজঃ এত অধিক হইবে, যে সূর্য্যশরীর জ্বলদগ্নিবৎ

উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং শীতল অন্ধকারময় সূর্য্যশরীর জ্বলন্ত অনলবৎ তাপ আর আলোক বিকীরণ করিবে। ইহা অসম্ভব।

বড় বড় পণ্ডিতগণের এরূপ বিবদমান মত সমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে, মন কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা, তাহা ভাবিতে২ বিচলিত হয়। বাস্তবিকও আমাদের সৌরজগতের পরিচালক সূর্য্য অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি সমভাবে বিস্ময়কর হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অত্যদ্ভুত কি সকল ভৌতিক কাণ্ড চলিতেছে এবং তাহার শারীরিক রচনাদি কি প্রকার, তাহার ধ্রুব ও অভ্রান্তমত অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। উপরে যে দুই মতের কথা বলা গেল, সংপ্রতি আর একজন পণ্ডিত আবার সেই দুই মতই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং যদিও আধুনিক পণ্ডিতবর্গ প্রথমে তাঁহার নবপ্রচারিত মতে বিশ্বাস করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছেন। পণ্ডিতবর ন্যাসমিথ বলেন, যে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় আবরণ উইলো পত্রাকৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে বিরচিত। উক্ত পত্রাকৃতি পদার্থসকল অনবরত সূর্য্যশরীরের উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত সূর্য্যশরীরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই বিচিত্র পত্রাকৃতি পদার্থ গুলিকে, যেখানে আলোকরশ্মি কৃষ্ণচিহ্ন সকলের মধ্য দিয়া সেতু আকারে পড়িয়া থাকে, সেইখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। আবার সেগুলিকে অতীব বিস্ময়জনক প্রচণ্ডবেগে নাচিতে এবং পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে দেখা যায়। এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের উৎপত্তি ও রচনা সম্বন্ধে কোন কথা কল্পনাও বলিতে সাহস করে না।†

† "Mr. Nasmyth (1862) described the spots as gaps or holes, more or less extensive in the luminous surface or photosphere of the sun. These exposed the totally dark bosom or nucleus of the sun. Over this appears the mist surface;—a thin, gauze—like veil spread over it. Then came the penumbral stratum, and, over all, the luminous stratum, which he had the good fortune to discover was composed of a multitude of very elongated, lenticular-shaped, or, to use a familiar illustration, willow-leafshaped masses, crowded over the photoshere, and crossing one another in every possible direction ......These elongated, lens-shaped objects he found to be in constant motion relatively to one another. They sometimes approached, sometimes receded, and sometimes they assumed a new angular position, by one end either maintaining a fixed distance or approaching its neighbour, while at the other end they retired from each other. These objects, some of which were as large in superficial area as all Europe, and some even as the surface of the whole earth, were found to shoot in thin streams across the spots,......sometimes by crowding in on the edges of the

সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যমণ্ডলের বহির্দ্দেশে যে সুন্দর লোহিত বর্ণ উচ্চ প্রতিকৃতি সকল দেখা যায়, এবং যাহারা কখন কখন সূর্য্যের শরীরের উপরিভাগে ৪০ সহস্র মাইল পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া থাকে, সূর্য্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত মত প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত শোণিতবর্ণ আকৃতিসমূহের উৎপত্তির, সেই সকল মতের সহিত কোন রূপে সামঞ্জস্য হয় না। সূর্য্যমণ্ডল কত আশ্চর্য্য অপরিজ্ঞাত কাণ্ডেরই আকর!!

ক্রমশঃ

spot they closed it in, and frequently at length thus obliterated it. These objects were of various dimensions, but in length generally were from ninety to one hundred times as long as their breadth at the middle or widest part."—*Meeting of the British Association—1862.*

আত্মাভিমান।

আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। কেহবা আপনাকে ধনে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে মান সম্ভ্রমে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ক্ষমতাতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; কেহবা আপনাকে ধর্ম্মেতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন; এবং কেহবা আপনাকে মদ্যপান অথবা অন্য কোন অসৎ কার্য্যে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন। লোকে যে রূপ সৎকার্য্যের জন্য অভিমানী হয় আবার সেই রূপ অসৎ কার্য্যের জন্যও অভিমানী হয়। আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবে বিবেচ্য এই যে আত্মাভিমান হইতে কিরূপ ফলোৎপত্তি হয়—আত্মাভিমান কি সকল প্রসূ, অথবা আত্মাভিমান হইতে মনুষ্য জাতি অবনত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান। আপনাকে বড় বিবেচনা করিলে, তদনুযায়িক আচরণ করিতে প্রয়াসী হওয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। তবে যিনি যে বিষয়ের অভিমানী তিনি তদ্বিষয় রক্ষার্থেই চেষ্টা করেন।

১ ধনাভিমান।

ধনাভিমানী লোক কি রূপে আপনার ধন বৃদ্ধি হইবে তদ্বিষয়ে যত দূর যত্নশীল হয়েন বা না হয়েন কিরূপে ধনগৌরব বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ কিরূপ আচরণ করিলে লোকে ধনী বলিয়া গৌরব করিবে তাহার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলেন।

ধন শব্দের অর্থ কি। যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অথবা যাহার বিনিময়ে যত্নলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে ধন বলে। কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত পর্য্যন্ত সমুদয়ই ধনসাপেক্ষ। এইজন্যই লোকে ধনের জন্য লালায়িত। পক্ষান্তরে যাহার অধিক ধন থাকে, লোকে ধনপ্রাপ্তি আশয়ে তাহার বশীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ধন থাকিলে লোকের গৃহাদির এরূপ শোভা হয় যে স্বতঃই তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে হরণ করে। ধনশালী লোক যে যে কারণ বশতঃ লোকের প্রীতিভাজন হয়, তাহা ব্যয়মূলক। * লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইবার আশয়ে ধনাভিমানী লোক ব্যয়শীল হয় এবং তদ্দ্বারা দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু, শিল্পী ভিক্ষুক এবং সময়ে সময়ে জন সাধারণে যারপর নাই উপকৃত হয়। বস্তুতঃ এই শ্রেণীস্থ লোক কখন নিতান্ত অসাধ্য না হইলে ব্যয়কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং জন সাধারণে তাঁহার হস্তে নানা রূপ উপকার লাভ করে। পৃথিবীতে যত সৎকার্য্য সংস্থাপিত † হইয়াছে তাহার অনেক কারণ সত্বেও ধনাভিমান অন্যতর।

সংসারে সকল বস্তুরই দুই দিক আছে ধনাভিমানের অশেষগুণ সত্বেও দুই একটী কুফল দৃষ্টি হয়;

(১) অবস্থাতীত ধনাভিমান বশতঃ অনেক সময়ে লোকে কুকর্ম্মাসক্ত হয়। এই জন্যই লোকে "গরু মেরে বামুনকে জুতো দান করে।" অভিমান বশতঃ লোকে কতকগুলিন কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া, তদনুরূপ অবস্থা না থাকিলে, অর্থের জন্য প্রায় কোন রূপ অসৎ কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হয় না। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন জমিদারের বংশস্থ কেহ অপেক্ষাকৃত দুরবস্থাগ্রস্ত হইলে যে প্রজাপীড়ক হয়, ইহাই তাহার অন্যতর কারণ।

(২) ধনাভিমান জন্য অনেক সময়ে লোকে অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হয়। এইরূপে অস্মদ্দেশীয় কত ধনশালী পরিবার যে দরিদ্র হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে যত ধনশালী বংশ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই আধুনিক। প্রাচীন ধনী

* যাহার গৃহে ধন প্রোথিত থাকে, তাহার দ্বারা সমাজে কেহই উপকৃত হয় না। সে যেমন দানাদি করে না, সেইরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ অথবা অন্য কোন শিল্পজাত পদার্থ দ্বারা গৃহ অথবা শরীরের শোভা সম্বর্দ্ধন জন্য যত্ন করে না। এরূপ প্রকৃতির লোক ধনের অভিলাষ করে না। লোকে তাহাকে ধনশালী বলিলে যারপর নাই চিন্তিত হয়, পাছে দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব অথবা ভিক্ষুক ধন প্রার্থনা করে, কিম্বা চৌরাদি তাহা অপহরণ করিয়া লয়।

† এবিষয় যশোভিমান বর্ণন সময়ে সম্যক্ বিবৃত হইবে।

সন্তানগণ প্রায় দরিদ্র হইয়াছেন। ইহার অশেষ কারণ সত্ত্বেও ধনাভিমানমূলক কার্য্য অন্যতর ও প্রধানস্থলীয়। অধুনা আমাদিগের দেশে ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে ধনসহ প্রধানতঃ মান সম্ভ্রমাদি যুক্ত হওয়ায় লোকে আয়াতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। এই জন্যই যাঁহার পিতা পিতামহ মাসিক একশত* টাকা আয় করিয়া ছয় আনার চটী ও চৌদ্দ আনার কাপড় পরিধান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র ৩।৪ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আশৈশব বিংশতি বৎসর কালেজে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া মাসে ৪০।৫০ টাকা আয় করেন এবং ৫৲ টাকা মুল্যের বিনামা ও দশ টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়াও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারেন না। এই জন্য বর্ত্তমান বংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সঞ্চয়শীল নহে, তন্নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেক ক্লেশ ও যন্ত্রণা সহ্য করে এবং সঞ্চয়শীলতা হইতে যে মহান্ উপকার সকল সাধিত হয় তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান বংশীয় লোক ধনগৌরব করিয়াই নষ্ট হইতেছে। আমাদিগের আয় অতি অল্প, তথাপি সাহেবদিগের সহিত বাহ্যিক আড়ম্বরে সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করি।

(৩) ধনাভিমানীর মনে সুখ নাই। সর্ব্বদা ধনগৌরব লাভের জন্য ব্যস্ত। এক দণ্ড সুখে কালাতিপাত করিতে পারে না। প্রচুর আয়বান্ না হইলে সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত থাকে এবং তন্নিবন্ধন অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে। প্রাচীন ধন-শালী ভগ্নাবস্থ লোক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক উভয়েই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

(৪) এই ধনগৌরবাকাঙ্ক্ষা বশতঃ অনেক সময়ে আধুনিক লোকে, যেমন লোকের নিকট অধিক আয়বান্ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য ঋণ করিয়াও বাহ্যাড়ম্বর করে, সেইরূপ আবার কখন কখন অবস্থা সম্বন্ধে অনৃত বাক্যও প্রয়োগ করে।

এইরূপ ধনাভিমানের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা কেবল তাহার অযথা পরিমাণোৎপন্ন। পরিমিত সীমা অতিক্রম করিলে সকল বিষয় হইতেই কুফলোৎপত্তি হয়। দয়া মমতা প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের ভূষণ—ইহলোকে দেবদুর্লভ গুণাবলীও যদি অযথাপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহাহইলে যারপরনাই কুফলোৎপাদন করে। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা নির্দ্দিষ্টসীমা অতিক্রম করিলে কুফল প্রসূ হয় না। এই জন্য ধনাভিমানের অযথা পরিমাণোৎপন্ন অনেক কুফল সত্ত্বেও তাহা মানবসমাজের অপকারী না হইয়া উপকারী পদের বাচ্য।

যশোভিমান।

যশোভিমান মনুষ্যের মনে যার পর নাই প্রবল। জগতে যত সৎকার্য্য অনু-

* দ্রব্যাদির মূল্য বিবেচনা করিলে তৎকালীন একশত টাকা অধুনাতন ৩০০ টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।

ষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহলোকে চিরস্মরণীয় হওয়ার উদ্দেশ্য মূলক—এ কথা বোধ হয়, যিনি মানব প্রকৃতি একটু মনোযোগ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তিনিই স্বীকার করিবেন। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া লোকের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে—এরূপ দেব প্রকৃতিক কয় জন লোক সংসারে দেখা গিয়া থাকে। দার্শনিকপ্রবর লক অথবা অগস্ত কোমৎ যাহাই কেন বলুন না, সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার কল্পনা-প্রধান বালকের স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। অন্য কোন বিশেষ স্বার্থ বর্জ্জিত হইয়াও সুনাম লাভ আশায় লোকে সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যদি সৎকর্ম্মশালী লোককে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত না করিতেন, তাহা হইলে, অস্মদ্দেশে কদাপি সদনুষ্ঠানের এত বাহুল্য হইত না—এত বিদ্যালয় এত চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়া লোকের অশেষ উপকার সংশাধিত হইত না, এত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত হইয়া লোকের গতিবিধির ঈদৃশ সুবিধা হইত না।

কেবল সৎকার্য্যানুষ্ঠান নহে, যশোভিমানী লোক অনেক সময়ে সুনাম হানির অভিপ্রায়ে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অভিমানী লোক প্রায়শঃ নীচপ্রকৃতি লোকের ন্যায় দুষ্কর্ম্মান্বিত নহে। আমাদিগের ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে পরলোক ভীতি ও পরমেশ্বরের উপর শ্রদ্ধার ভাগ পূর্ব্ববর্ত্তী বংশীয়দিগের অপেক্ষা নিতান্ত অল্প হইয়াছে, তথাপি কে না স্বীকার করিবেন বর্ত্তমান বংশীয়দিগের নীতি পূর্ব্ববর্ত্তী দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। অনৃতাচার, অনৃত কথন, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহার অনেক কারণ সত্বেও যশোভিমান অন্যতর।

এই ভাব লোকের মনে এতই প্রবল যে দার্শনিকবর বার্ণার্ড ডি মাণ্ডীবীল যশোভিমানই লোকের ন্যায়ান্যায় নির্ধারণের উপায় বলিয়া বর্ণন করেন। সকল সুনীতি এই অভিমান (১) অর্থাৎ লোকানুরাগ-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান দার্শনিক বেন বলেন, "মনুষ্য নিশ্চেষ্ট ও ভীরুপ্রকৃতিক—কোন বিশেষ ভাব প্রধান নহে। সুতরাং আত্মাভিমান না থাকিলে নিশ্চয়ই আদিম অবস্থা হইতে উন্নত হইতে পারিত না। তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্র লেখকেরা আত্মাভিমানের উপর দোষারোপ করেন। অভিমান নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। আমি বড় নিরভিমানী এই বলিয়াও সময়ে সময়ে অভিমান হয় এবং দুষ্কর্ম্ম করিয়াও লোকে সময়ে সময়ে অভিমানী হয়। আত্মাভিমান অনেক সময়ে মনুষ্যকে সৎকর্ম্মশালী

(১) "The Moral Virtues are the political offsprings which flattery begat upon pride." Mandeulle's Fable of the Bees.

করে। সতীর সতীত্ব ও বীরের বীরত্ব অভিমান মূলক।" (১)

আমরা মাণ্ডীবীল ও বেন সাহেবের সহিত অনেকাংশে ঐকমত্য প্রকাশ করি। যদিও এই পাপ পুণ্যময় সংসারে এমন অনেক লোক আছে ধর্ম্মই যাহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত এবং পরলোক ভয়েই যাহারা সমুদয় সদনুষ্ঠান করে, তথাপি অধিকাংশ সৎকর্ম্মশালী লোকই যে সম্মান প্রত্যাশী এ কথাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশে এই ভাব এতাধিক প্রবল যে অখ্যাতি হইবে দশ জনে হাঁসিবে বা দশ জনের কাছে মুখ থাকিবে না—এইরূপ বাক্য আবাল বৃদ্ধবণিতারমুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়।

ধনাভিমানের ন্যায় যশোভিমানও অযথা প্রবল হইলে লোকে নানারূপ কুকর্ম্মাসক্ত হয়; যশোলাভ প্রত্যাশায় যারপর নাই অযশের কার্য্য করে। রাজপুত্রগণ একমাত্র বংশ মর্য্যাদা রক্ষা হেতুই অনেক স্থলে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রাণবধ করে।

সময়ে সময়ে লোকে দুষ্কর্ম্মে খ্যাতিলাভের জন্যও ব্যস্ত হয়। মাতাল অধিক পরিমাণে মদ্যপান ও লম্পট দুষ্ক্রিয়াতে চাতুর্য্যলাভ গৌরবের বিষয় মনে করে। এইরূপে যে যে কার্য্যে রত হয়, সে তাহাতেই বাহবা লাভের জন্য সমিচ্ছুক হয়। মহাবীর আলেকজণ্ডর একমাত্র সম্মান লাভাকাঙ্ক্ষায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন, ও শত শত নগর ও পল্লী লুণ্ঠন করিয়া নির্ধন ও নির্ম্মনুষ্য করিয়াছেন। এবং কর্ত্তেজ, পিজারো মণ্টজুমার একমাত্র সম্মান লাভাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মের নামে সহস্র সহস্র নিরপরাধী আমেরিকাবাসীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। একমাত্র পৌত্তলিকতা বিনাশ সম্মানাকাঙ্ক্ষায়ই গজনীয় মহম্মদ সোমনাথের মন্দির জয় করিলে পাণ্ডাদিগের অনেক অনুরোধ ও অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়াও প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছিলেন। এবং একমাত্র সম্মানাকাঙ্ক্ষায় কোন গ্রীক সম্রাট্ মক্ষিকা বধ জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন।

সম্মানাকাঙ্ক্ষার এই সকল দোষ দেখিয়া কি আমরা তাহাকে মনুষ্যের অপকারী আখ্যা প্রদান করিব? আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে সম্মানাকাঙ্ক্ষা লোককে কার্য্যে উৎসাহশীল করে। কিন্তু

(১) Man is naturally innocent, timid and stupid, destitute of strong passion or appetite, he would remain in his primitive barbarious state were it not for pride yet all moralists condemn pride, as a vain notion of our superiority. Is is a subtte possion not easy to trace. It is often seen in the humility of the humble and the shamelessness of the shamless. It stimulates charity; pride and vanity huve built more hospital than all the virtues togather. It is the chief ingridient in the chastity of women and in the courage of men."

Bain.

কার্য্য অন্য মূল হইতে উৎপন্ন হয়। যে যে বিষয় ভাল বুঝে যাহার কল্পনা যে বিষয়োৎপন্ন সুখ বার বার ধ্যান করিয়াছে সে সেই বিষয়েরই অনুসরণ করে। সুতরাং যাঁহারা সম্মানাকাঙ্ক্ষা বশতঃ নীচগামী হন তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমজালে আবদ্ধ। সম্মানাকাঙ্ক্ষার কোনই দোষ নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা বিদ্যাভিমান :

স্বাভাবিক বুদ্ধির নিমিত্ত অভিমানী লোক সর্ব্বদাই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা নূতন মত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। বস্তুতঃ সংসারে এই সংখ্যক লোক যত অধিক হয়, মানব সমাজ ততই নূতন মত এবং নূতন তত্ত্ব জানিতে পারে। বুদ্ধির জন্য অভিমান না থাকিলে কে বহুকাল প্রচলিত সহস্র সহস্র পণ্ডিতানুমোদিত আপামর সাধারণের মতের বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত? জগতে এমন অনেক বুদ্ধিজীবী লোক আছেন, যাঁহারা অনেক নূতন বিষয়ের চিন্তা করেন, চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে অনেক নূতন তত্ত্বও অবধারণ করেন কিন্তু অভিমান না থাকায় তাঁহারা জন সাধারণের বিশ্বাস্যাতীত মত প্রচার করিতে সাহস পান না। বস্তুতঃ নিরভিমান যে মানব সমাজকে কত নূতন মত সুতরাং তজ্জাত উপকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

পক্ষান্তরে স্বাভাবিক বুদ্ধির অভিমানী লোক অনেক সময়ে যথোচিত চিন্তা না করিয়াই নূতন মত ব্যক্ত করেন এবং তদনুসরণকারীকে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত করেন। অনেক সময়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অর্থাৎ অন্যের মত গ্রহণ পক্ষে এত উদাসীন হয়েন যে, বিবেচ্য বিষয় সকল ভাবে বিচার করেন না। কিন্তু এজন্য আমরা অভিমানের উপর দোষারোপ করিতে পারি না। স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক যদি অন্যের বুদ্ধি ও মত শুনেন, তাহা হইলে কদাপি তাঁহার বুদ্ধি মলিন হয় না, বরং প্রখর ও মার্জ্জিত হয়। বুদ্ধির নৈসর্গিক অবস্থা পুষ্পকোরকবৎ। যেরূপ সূর্য্য রশ্মি প্রভৃতির অভাবে কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্পে পরিণত হয় না, সেইরূপ উচিতরূপে চর্চ্চিত ও মার্জ্জিত না হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রস্ফটিত হইয়া উচিতরূপে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না। তবে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী লোক অন্যের মতাদি পক্ষে যার পর নাই উদাসীন হয় তাহা প্রকৃত অভিমানমূলক নহে—তাহা তাঁহাদিগের মনঃসংযোগাভাবের ফল।

বিদ্যাভিমানিলোক নিরন্তর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং তন্নিবন্ধন স্বয়ংঅনেক উন্নতিলাভ এবং মানব সমাজকেও অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যক্ষমতা হারাইতে হয় এবং অস্মদ্দেশীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়

দিগের ন্যায় সাধারণ বুদ্ধি হারাইয়া পশুবৎ হইতে হয়। অধুনা অনেক বিদ্বান্ লোক জন্ম পরিগ্রহ করিতেছেন। প্রাচীন কালাপেক্ষা বিদ্যালোক কত অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক লোকেই স্বীকার করিবেন চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। প্রাচীন কালের শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অধুনাতন শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক অধিক একথাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বস্তুতঃ অধিক অধ্যয়ন ও অল্প চিন্তাবশতঃ এরূপ ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমুদয় কুফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা বিদ্যাভিমানকে অপকারী বলিতে পারি না। যাঁহারা চিন্তা অপেক্ষায় অধিক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা মনে করেন না যে তাহাতে বিদ্যার বৃদ্ধি হয় না। মূলে ভ্রান্তিমূলক মতই এই অনিষ্ট প্রসব করিতেছে। বিদ্যাভিমান কদাপি এরূপ করে নাই।

ধর্ম্মাভিমান।

ধর্ম্মাভিমান বশতঃ সংসারে অনেক সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অনেক পরিমাণে অসৎ কার্য্যের নিবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অভিমান শূন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক হইতে সংসারে যত উপকার হয়, ধর্ম্মাভিমানী হইতে তদপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক হইয়া থাকে একথা কে সন্দেহ করিবে? কারণ প্রকৃত ধার্ম্মিক লোকাপেক্ষা ধার্ম্মিকাভিমানীর সংখ্যা অশেষ গুণে অধিক। ধর্ম্মাভিমানীর মনে ঈশ্বর চিন্তা ও বিশ্বাস যত দূর প্রবল থাকুক বা না থাকুক সে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত হয় ও তাহার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানশীলতা প্রবল হয়। এবং তাহা হইতে জনসাধারণে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। অস্মদ্দেশে যত ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে দীন দুঃখী যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও ধর্ম্মাভিমান অন্যতর। অস্মদ্দেশে অনেক দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক একমাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃ যার পর নাই সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবিষয় সর্ব্বদাই চাক্ষুষ করা যায়। যে মহাপাপী পরম স্বার্থপর বৃদ্ধ মাতা অথবা বনিতার ভরণ পোষণ ভার বহন করিতে অনিচ্ছুক সেও অনেক সময়ে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। (১)এরূপ গর্হিত আচরণ আমাদিগের অনুমোদিত বিষয় বলিতেছি না। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য যে মহা পা-

(১) আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। এরূপ একজন ব্যক্তির সহিত আমার একদিবস অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। পরিশেষে তিনি বলিলেন "আমি ভগবানের একটি নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছি বটে কিন্তু তাহা না করিলে অর্থাৎ পরিবার প্রতিপালনে উচিত রূপ অর্থ ব্যয় করিলে আমি কদাপি ভারত মাতার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারিব না।"

পীর মনেও ধর্ম্মাভিমান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কোন কোন স্থলে সৎকর্ম্মশালী করে।

ধনাভিমান, যশোভিমানের ন্যায় ধর্ম্মাভিমান বশতঃও লোকে অনেক সময়ে অনেক অসৎ কার্য্য ও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্য যে উৎপীড়ন হয় ধর্ম্মাভিমানই তাহার একমাত্র কারণ। নরশোণিততৃষ্ণাবিধুরা মেরী এক মাত্র ধর্ম্মাভিমান বশতঃই কএক বৎসর মধ্যে ২৭৭ জন পোপ-বিরোধী খৃষ্টানের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। বেকেট পোপের পদাভিষিক্তহইয়া স্বাভাবিক শম প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তাৎকালীন ঐপদসুলভ দুর্দ্ধর্ষ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। লুই একদিনে বহুতর লোকের রক্তপাত করিয়াছিলেন। অনেক রুমীয় সম্রাট্ প্রথমসাময়িক খৃষ্টানগণের পবিত্র শোণিতে বসুমতীকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ কত নির্দ্দোষী লোকের প্রাণসংহার করিয়া আপনাদিগের চির কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন। ডামাস্কাস আক্রমণ কালে খালেড পবিত্র প্রণয়াবদ্ধ দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। কত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি নিরপরাধী বৌদ্ধদিগের প্রাণহানি ও অশেষ বিধ অত্যাচারে অত্যাচারিত করিয়াছিলেন। অধুনা হিন্দুগণ ব্রাহ্ম্য ও খৃষ্টান দিগের উপর কত অকথ্য অত্যাচার করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ কত লোক কত অমানুষী কঠোর করিয়া জীবন ক্লেশে অতিবাহন করিতেছেন। কেহবা উর্দ্ধহস্তে কেহবা অধোমুখে কেহবা শিত কালে বস্ত্রাভাবে, কেহবা দারুণ নিদাঘ সন্তপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য কীরণে যার পর নাই ক্লেশ সহ্য করিয়া ইহজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন! কেহবা অনশনে শরীর ক্ষয় ও (হয়ত) প্রাণত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্য লোকের দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তহইয়া স্বর্গবাসী হইতেছেন!!

এই সকল দোষ সত্ত্বেও ধর্ম্মাভিমান মনুষ্যের পরমোপকারী। এসকল ধর্ম্মাভিমানের দোষ নহে। লোকের অজ্ঞতার দোষ অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক অনৈসর্গিক বিষয় সহ ধর্ম্মাভিমান যুক্ত হইয়া এইরূপ কুফল উৎপাদন করে।

বীর্য্যাভিমান।

বীর্য্যাভিমান জাতিসাধারণের উন্নতির প্রধান কারণ। বীর্য্যাভিমানপরায়ণ জাতি কখন অন্যের অধীনতা স্বীকার করে না, শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনন্দে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি এক জনের দেহে প্রাণ থাকিতেও সমরানল নির্ব্বাণ হইতে দেয় না। যখন সিপীয় কার্থেজ আক্রমণ করিলেন, অধিবাসিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং দেশের সমুদয় ধন নিঃশেষ হইলে যোষিৎ গণ আপনাদিগের গাত্রাভরণ ও মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে লাগিলেন। এই

বীর্য্যাভিমান আবার লোককে কত সময় কত নিরর্থক সমরে প্রবৃত্ত করায়; কত সময় কত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণ হানি করে, কত সময় কত সাধুর সর্ব্বস্বান্ত করে, কত সময় কত নিরপরাধী জাতির জীবনের সারসর্ব্বস্ব স্বাধীনতা রত্ন অপহরণ করিয়া এবং কত সময় দুর্ব্বল ভ্রাতাকে পদে দলিত করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক ঘোষণা করে! কিন্তু এসমুদয় বীর্য্যের অযথা ব্যবহার হইতে উৎপন্ন। বস্তুতঃ নির্দ্দোষীর অনিষ্টসাধণ প্রকৃত বীরত্ব নহে। অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বল ও আপনাকে রক্ষাই প্রকৃত বীরত্বের কার্য্য।

যথার্থ বীরপুরুষ অপমান সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার চরিত্র কদাপি নীচ হয় না। (পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইলে যে হৃদয়ের মহৎ আশয়তা কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।) সুতরাং তাঁহার জীবনও প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় হয়। কিন্তু অজ্ঞতা বীর্য্যযুক্ত হইলে মনুষ্য উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করে। এজন্য মধ্য সময়ে সিবাল রিয়াম নাইটগণ মনুষ্যের প্রকৃত উপকার সঙ্কল্প হইয়াও অনেক সময়ে যার পর নাই অত্যাচারী ও অনিষ্টকারী হইয়াছিলেন। এই জন্যই অনেক নাইট ডনকুই স্কটের সঙ্কেপাদ্র-জার ন্যায় ক্ষিপ্তবৎ আচরণ করিয়া সংসারের বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বীর্য্যাভিমানের দোষ নহে—অজ্ঞতার দোষ।

শ্মশানে ভ্রমণ।

এই খানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত্; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালি, এই খানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসোবল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এস্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্যমহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে

হইবে। যে অমানুষবীর্য্য, যে অহঙ্কার আর পৃথিবী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে —তুমি আমি কে? যেউৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল * তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, † তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপ হৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী সে অনির্ব্বচনীয়া, এইমাটিতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায়, যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া, একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে, যে আমাকে শৃগাল কুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে, আমি কে—আমি কত টুকু—আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন, জীবনের ভয়ে, যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া মুখের গ্রাস ভোজন পাত্রে ফেলিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনি এড়াইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানিনা —কখন দেখি নাই, কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এস্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতার, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে, অসীম জলরাশি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে; পদতলে, বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে; মস্তকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ, নাচিয়াবেড়াইতেছে; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে, ভিতরে, অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধসাগরবৎ, মদমত্ত মাতঙ্গবৎ, দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সেই দিকেই অনন্ত—আমি কত ক্ষুদ্র—

* See Lewes' History of Philosophy. Auguste Comte.

† See I. S. Mill's Three Essays on Religion.

কত সামান্য? এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা। সেই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি আমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি২ মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু২ বারি লইয়া সমুদ্র, কণা২ বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু২ বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র২ নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ, মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেননা আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়াগিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথদিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, সকল দুঃখ দূর হয়। * আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, কোমলতা পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি এস্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ, যে পড়িয়া থাকে তার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে;

* দুঃখ ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—শারীর এবং মানস। বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ (রোগাদি) তাহার নাম শারীর দুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ এবং বিষয় বিশেষের অদর্শন নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম মানস দুঃখ। উভয় শ্রেণীরই এ সকল দুঃখ আভ্যন্তরীণ হেতুসমুদ্ভূত বলিয়া, ইহাদিগের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। বাহ্য হেতুসমুদ্ভূত দুঃখও দ্বিবিধ;—আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ এবং স্থাবর নিমিত্ত যে দুঃখ তাহাই আধিভৌতিক। যক্ষোরাক্ষস বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে;† রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশের মূলও আছে; রমণীর হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে। ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যৌন-নির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে। * জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল মন্দে মিশ্রিত। এই জন্য প্রকৃতি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলেন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদিকারণ, সেও ভাল মন্দে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎ-পন্ন—সেই শক্তির, একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। † কিন্তু, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহা শ্মশান। চিরপ্রবহমান কালস্রোতঃ, দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়াগিয়া বিস্মৃতির গর্ত্তে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখি-য়াছ, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণদিলেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না, অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিলেও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তা-হার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। সেক্ষপীয়র গিয়াছেন, হামলেট্ আছে। ওয়াসিণ্টন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বজা

---

† Sunstroke. See Tanner's Practice of Medicine. vol. I. page 375.

* The Grecian poet, Theognis. who lived 550 B. C., clearly saw, that wealth of ten checks the proper action of sexual selection. He thus writes:

"But, in the daily matches that we make,
The price is every thing: for Money's sake,
Men marry: women are in marriage given;
The Churl or ruffian, that in wealth has thriven,
May match his offspring with the proudest race:
Thus every thing is mixed, noble and base!
If then in outward manner, form and mind,
You find us a degraded, motley kind,
Wonder no more, my friend! the cause is plain,
And to lament the Consequence in vain."

See Darwin's Descent of Man, Part I. chap II. Also Part III. Chap. XX.

যৌননির্ব্বাচন,—Sexual Selection.

† Attraction and Resistance of Matter. This theory originated with Laplace; it has been expounded by Herbert Spencer.

আজও উড়িতেছে। রূসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিণ্টনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সেক্ষপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। * কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি,

ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর উপকার সে লাভ।

ইহাই জগতের সারতত্ত্ব—ধর্ম্মের মূলভিত্তি—পুণ্যের স্বর্ণ সোপান।

এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অন্ধান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ও সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলে, শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে; হইলে, সংসারজ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, যৌন নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া, সুস্থমনে, অক্ষত শরীরে, কে গিয়াছে? আ-

* K. Villemain says:—"Every year, it is stated, he went during the summer to spend some of his time at Stratford, with his wife his children, and his aged father. Tha poet's taste for the beanties of nature, his vivid impression of the green landscapes of England would alone indicate that he was in the habit of seeking rural repose. In his own time, however, another motive was attributed for these frequent voyages; it has been stated that, upon the road to his native place, he was fond of stopping at the Crown in Oxford, the hostess of which, remarkable for her elegance and beanty, became the mother of the poet Davenant. Shakespeare, who was an intimate guest, was godfather to his child, who was said to belong to him by a closer tie, and who subsequently took a singular pride in boasting of this descent. We are better able to understand, after this, the zeal of the royalist Devenant for the republican Milton: it was doubtless in his eyes a double debt of poetic parentage."

See Alfonso de Lamartine's Biographies and Partraits of some Celebrated People. vol. I. Essay on Shakespeare & William Davenant

বার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। এই অনন্ত জীবসমূহ, এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে;—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি হাসি মুখে কখন কি বিষাদ চিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্র রাজির সোহাগের মৃদু কম্পনে কখন কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল নিনাদে কখন কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনিতে কখন কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো।

হায়! এমন করিয়া আর কত দিন পুড়িব? কত দিনে এ যন্ত্রণা ফুরাইবে? আর কখন কি তোমায় পাইব না? আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, জন্ম জন্মান্তরে হউক, যুগ যুগান্তরে হউক —আর কখন কি তোমায় পাইব না? না পাই, ভুলিতেও কি পারিব না?

মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দিন এই সৈকতশয্যায় শেষনিদ্রায় নিদ্রিত হইব, সেই দিন হয় ত তাহাকে ভুলিতে পারিব—হয় ত এ সায়াহ্নসমীরণ থামিবে—হয় ত এ অনল নিবিবে—হয় ত তাহাকে ভুলিব। এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে বলিয়া সময়ে২ মরিতে সাধ হয়। আবার তাও বলি, তাহাকে ভুলিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিবে, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়াই মরিতে পারি না। এজন্মের শোধ সে যে চক্ষের বাহির হইয়াছে, তাহাত জানি; কিন্তু অন্তরের অন্তরে ত জাগিতেছে। সে যেখানে আছে, সেস্থান পবিত্র—সে মন্দির সাধ করিয়া ভাঙ্গিব কেন? তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ভাঙ্গা যায়? সে যতক্ষণ চিন্তার বিষয়, সেই যখন আমার একমাত্র চিন্তা, তখন চিন্তা থাক্। বড় যন্ত্রণা পাই, তা বলিয়া কি করিব? তাহার জন্য যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্য জন্মে ধিক্!—এ ছাই ভালবাসায় ধিক্! ধিক্ এ প্রাণে! ধিক্ এ ছার প্রণয়ে! ধিক্ পরিণয়ে! কিন্তু—

হয় ত আবার তাহাকে পাইব। হয় ত পরলোকে, তাহাতে আমাতে আবার এক হইব। জাগতিক পরিবর্ত্তন পারম্পর্য্যে, হয় ত সেই মাটিতে এই মাটিতে একত্রে মিশিতে পারে—সেই বরবপুর পরমাণুর সঙ্গে, এই পোড়া মাটির পরমাণুর সঙ্গতি ঘটিতে পারে। দুই দেহের বিশ্লিষ্ট উপকরণের পুনঃসমবায় হইয়া, নূতন এক সত্তা সৃষ্ট হইতে পারে। পরলোকে তাহাতে আমাতে আবার হয় ত এক হইব। বম্ ভোলানাথ! তাহাতে আর আমাতে—প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, নয়নের যে নয়ন, হৃদয়ের যে হৃদয়, তাহাতে আর আমাতে—সংসারের যে কুহক, জীবনের যে ভেল্কি, গৃহের যে আকর্ষণী শক্তি, আমার যে

সেই, তাহাতে আর আমাতে—সংসারান্ধকারে যে চাঁদ, জীবন মরুভূমে যে ওয়েসিস্, ভবসাগরে যে তরণী, জীবনের পথে যে পান্থশালা, তাহাতে আর আমাতে—পৃথিবীর যে সার, স্বর্গের যে নমুনা, ইহলোকের যে সর্ব্বস্ব, পরলোকের যে ততোধিক, তাহাতে আর আমাতে—গৃহকুঞ্জের সেই সুখলতা, চিন্তাসরোবরের সেই প্রফুল্ল নলিনী, আশালতার সেই সংশ্রয়তরু, তাহাতে আর আমাতে—সংসার প্রবাহের সেই স্নেহময়ী সঙ্গিনী, জীবন মরুভূমের সেই শীতল সরোবর, ভূতভবিষ্যতের অন্ধকারের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, হৃদয়কাননের সেই বিকচ কুসুম, তাহাতে আর আমাতে—আশায় যে বিশ্বাস, মায়ায় যে মোহ, ভালবাসায় যে কবিত্ব, দুঃখে যে সান্ত্বনা, সুখে যে সে-যা-তাই, তাহাতে আর আমাতে—হয় ত আবার মিলিত হইব। সে মরিয়া মাটি হইয়াছে, আমি মরিয়া মাটি হইব;—দুই মাটিতে এক হইবে। আমার দেহের পরমাণুতে, তাহার দেহের পরমাণুতে সংঘটন ঘটিবে। তাহাতে আমাতে এক হইয়া এক নূতন সত্তার অভ্যুদয় হইবে। যাহা হইবে, তাহা মন্দ সামগ্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু কি সুখের মিলন! কি সুখের সংঘটন! আদরের সেই আদরিণী, সোহাগের সেই সোহাগিনী, অতীতের কোমলাকাশের সেই ইন্দ্রধনু, উপস্থিতের আঁধার গগনের সেই সৌদামিনী—কেমন বুকভরা মিলন! দুইজনে এক হইয়া এক নূতন সত্তা হইব—আমরিরে! কি সুখের সমবায়! জীবের দেহান্তরপ্রাপ্তিতে কোন মূর্খ সন্দেহ করে? আত্মার শরীর পরম্পরাবস্থান অসম্ভব কিসে? পিথাগোরাস্ পূর্ব্বজন্মে এজাক্স্ ছিলেন, ইহা বিচিত্র কি? যে ভীরু বাঙ্গালি সাহস করিয়া দেশের বাহির হইতে পারে না, তাহার শরীরে একিলিস্ অথবা সেকেন্দরের, সিজর অথবা হানিবলের, নেপোলিয়ন অথবা ইপামিনণ্ডাসের, ব্রাসিডাস্ অথবা লাইসাণ্ডারের ভীমের অথবা অর্জ্জুনের দেহাংশ থাকিতে পারে। রামের শরীরে, হয় ত কালডেরন্ অথবা লোপ্‌ডি ভেগার, গেটে অথবা শীলারের, পিটার্ক অথবা ডাণ্টের, কর্ণেলি অথবা রেসাইনের, সেক্ষপীয়র অথবা কালিদাসের, হোমর অথবা বর্জ্জিলের, ব্যাস অথবা বাল্মীকির আত্মা আছে। এই হৃদয় যাহার জন্য লালায়িত, এই হৃদয়ে হয় ত সেই আছে। মনুষ্য দেহের আণবিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সাতবৎসরে নবকলেবর ধারণ করে। সেই নিয়ত প্রবহমান পরিবর্ত্তপ্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া, হয় ত সেই দেহের পরমাণু এই দেহে মিশিতেছে। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। জগতে সকলেই আশ্চর্য্য। যে গিয়াছে মরিয়া জগৎসংসার আঁধার করিয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে

পারে—যুগ যুগান্তরে হউক, কল্প কল্পান্তরে হউক, সেই অকলঙ্ক চাঁদ আসিয়া আবার এ গগনে দেখা দিতে পারে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নহে। তাহাতে—সেই অমূল্য নিধিতে—যাহা যাহা ছিল, সে সকলই আছে। কিছুই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সবই আছে, কেবল একত্রে নাই। সেই সকল উপকরণ জগতে বিরাজমান রহিয়াছে; যেদিন তাহাদের একত্র সংঘটন ঘটিবে, সেই দিন—মনে করিতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হয়—সেই দিন আবার সংসারি মরুভূমে সেই সুকুমার, সেই মনোহর, সেই সুন্দর কুসুম ফুটিবে—দশদিক্ আলো করিয়া, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত সৌরভতরঙ্গ ছুটাইয়া, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্রতাস্রোতে ধৌত করিয়া, ফুটিয়া উঠিবে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নয়। জীবের দেহপরম্পরাশক্তি অসম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা একেবারে ভ্রান্ত—এমন কোন মত নাই, যাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। যে চিন্তাশীল সে চিরকাল বলিবে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন ধর্ম্ম মানিবার উপযুক্ত হয় ত সে হিন্দুধর্ম্ম।

সে আবার আসিতে পারে। যে গিয়াছে—জগতের মাধুরি হরণ করিয়া, হৃদয়ের পরতেং আগুন জ্বালিয়া দিয়া, সোণার সংসার ছারখার করিয়া দিয়া, সুখের পাত্রে গরল ঢালিয়া দিয়া, অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য মাখিয়া দিয়া, যে পলাইয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমি কি পাগল হইলাম না কি? কোথায় সে? কোথায় আমি? কোথায় সে ভালবাসা? কোথায় সে সুন্দর সংসার? কোথায় সে চিরপ্রেমোচ্ছ্বাস পরিপ্লুত হৃদয়? হায়! কেন মরিলাম না? চক্ষে ধূলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ২ ছুটিলাম না? যখন মৃত্যুর বিকট ছায়া সেই মুখে লাগিল, তখন, কেন গরল খাইলাম না? সেই যে চিতা, নৈশান্ধকার দগ্ধ করিয়া, ভাগীরথী সৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, কেন তাহাতে শুইলাম না? সেই সোণার দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি যখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাসাইয়া দিলাম, তখন, সঙ্গে সঙ্গে কেন জলে ঝাঁপ দিলাম না? কেন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলাম না?

হৃদয় মথিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কাতরস্বরে উদ্ভ্রান্ত ভাবে,ডাকিলাম,—"প্রাণাধিকে, কোথায় তুমি? আমার অন্তরের আলোক, আমার বাহিরের অন্তর, আমার নয়নের মণি, আমার সকলের সব, আমার সবের সকল—জীবনসর্ব্বস্ব তুমি আমার কোথায়?"—অপর পার হইতে কঠোর প্রতিধ্বনি কঠোর স্বরে, অমনি মুখের উপর ডাকিয়া বলিল—আর কোথায়। আকাশে সেই কঠোর স্বর নাচিয়া২ বলিল--আর কোথায়। দূরে সেই কঠোর স্বর মিলাইতে২ বলিল—আর কোথায়। স্তম্ভিত হইলাম।

মুহূর্ত্তেকের জন্য অন্তর্জগতের অস্তিত্ব লোপ হইল। হায়! প্রতিধ্বনি সৃজন করিতে, পোড়া বিধাতাকে কে বলিয়াছিল?

ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্‌স অফ ওয়েল্‌স বাহাদুরের প্রতি

ভারতভুমির অভ্যর্থনা।

ভুমিকা।

"পঞ্চানা মপি ভূতানাম্ উৎকর্ষং
পুপুষু র্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবা-
ভবৎ।"
কালিদাস।

"নরেন্দ্র মূলায়তনাদনন্তরং।
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজ সংজ্ঞিতম্॥
অগচ্ছ দংশেন গুণাভিলাষিণী।
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥"
কালিদাস।

কে বলে ভারত-ভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা আকারা নিত্য নবীন যুবতী॥
যথা কতশত গত দেব পুরন্দর।
একা শচী নিত্য নব, স্বর্গে নিরন্তর॥
মন্দার কুসুম সম লাবণ্য-নিলয়।
কাল কালসর্প শ্বাসে ম্লান নাহি হয়॥
আর যথা প্রভাতে প্রভাত কমলিনী।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা সম প্রদোষে মলিনী॥
পুনরায় প্রভান্বিতা ভানুর উদয়ে।
ললিত লাবণ্যময়ী—তিমির অত্যয়ে॥
সেরূপ ভারতভূমি সময়ে সময়ে।
ম্লান মাত্র দুর্গতি-তামসী-তমোচয়ে॥
সুদিন উদয়ে পুন নব ভাবান্বিতা।
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমোদ-প্রভায় প্রভান্বিতা॥
ইংরাজের অভ্যুদয়ে বিভা-বিভাসিতা।
অদ্যাপি ছিলেন মাত্র অর্দ্ধবিকসিতা॥
যুবরাজ সমাগমে সীমা নাই সুখে।
আনন্দ মঙ্গলরব প্রস্ফুটিত মুখে॥

গীতি।

১

কহিছে ভারতভূমি, এসো এসো নাথ তুমি
মহামান্যা মহিষীর প্রথম নন্দন।
কিবাপিতা কিবামাতা, কিবাপতি কিবাভ্রাতা,
বহুদিন হেরে নাই দাসীর নয়ন॥
ওহে মম মনোচোর, তুমি ত হইবে মোর,
জাতি কুলধনমান প্রাণের ঈশ্বর।
এসো এসো হৃদে বস, হেরি মুখ তামরস,
সরস হউক মম মানস ভ্রমর॥
জরাজীর্ণ বটি আমি,তোমায় নিরখি স্বামি,
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।

পূর্ব্বাপূর্ব্ব রত্নাকর, আমার যুগল কর,
প্রসারিত পাইবারে প্রেম আলিঙ্গন॥
হের ওহে প্রিয়তম, হিমাদ্রি কপোলে মম,
ঝর ঝর আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।
নিরখি তোমার মুখ, দূরে গেল সব দুখ,
করে বুক্ ধুক্ ধুক না সরে বচন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন॥

২

তুমি মম নহপর, গত শত সম্বৎসর,
তব মাতামহ কুলে পরিণীতা আমি।
তব অগ্রে যশোধন! মম পতি চারিজন,
একে একে সকলে হলেন স্বর্গগামী।
শোকানলে দহেগাত্র, পরিণীতা নামে মাত্র
দেখি নাই তাঁহাদের শ্রীমুখমণ্ডল।
পলাসীর যুদ্ধজয়, যেই দিবসেতে হয়,
সেই দিনে ভগ্ন মম দাসীত্ব-শৃঙ্খল॥
জয়-ভেরী ঘোরধ্বনি, বিবাহ বাজনা গণি,
মম দেহে গোরোচনা যবন-রুধির।
কামান আতস-বাজী, বিজয়-পতাকা-রাজী
প্রমোদ-পবনে কিবা হইল অস্থির॥
তার পর বারত্রয়, হইয়াছে পরিণয়,
হয় নাই কভু কিন্তু শুভ-দরশন।
সে আশা পূরিল আজ, এসো এসো যুবরাজ
লও হে প্রণয়-পুষ্প ভকতি-চন্দন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন॥

৩

সুখের দিবস আজ, রোদনের কিবা কাজ
তবু কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সত্যনিষ্ঠাতপোদানে; আর্জব অমিত জ্ঞানে,
ভূষিত ছিলেন মম পূর্ব্বপতিগণ॥
পুরূরবা কার্ত্তবীর্য্য, রাম নাম মহাবীর্য্য,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিক্রম তপন।
তাঁহাদের নাম স্মরি, হৃদয় বিদরে মরি,
আর কি হইবে সেই সুদিন ঘটন॥
তার পর এলো কাল, এলো সে যবন কাল,
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজনীদুর্জ্জন।
মৎসরতা-মদে ভোর, রুধির শুষিল মোর,
নন্দন-নিকরে কত করিল নিধন॥
মধ্যে কিছুদিন ভাল, প্রসন্ন হইল ভাল,
রামরাজ্য আকবরের সুখের শাসন।
এসো এসো যুবরাজ, সে সুখ পেলাম আজ,
নিরখিয়া নাথ তব চারু চন্দ্রানন॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনী,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন-অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন॥

৪

শুন ওহে ভাবীবর, গুণের সাগরবর,
কৃতঞ্জলি ভিক্ষা এই ও রাঙ্গা চরণে।

দীনা ক্ষীণা সুপ্রাচীনা, বলিয়া দাসীরে ঘৃণা,
করোনা করোনা প্রিন্স রেখোহে স্মরণে॥
ছেলেগুলি বটে কালো, কিন্তু পিতৃভক্তিআলো
সমুজ্জ্বল তাহাদের হৃদয় কমল।
কালো বলে অবহেলা, করনা প্রভুত্ব বেলা,
ক্ষুধা হলে খেতে দিও অন্ন আর জল॥
জননীর কাছে গিয়ে, বলিবে হে বিবরিয়ে,
ভকতিবৎসলা তিনি করুণার খনি।—
আমার যাতনা যত, সকলি ত অবগত
আছেন ইন্দিরারূপা ইণ্ডিয়াজননী॥

এককথা আছে বাকি, একথাটী সত্য নাকি,—
তুমি মোরে স্বপনে করিতে দরশন?
একথা শুনিয়া আর, সুখের নাহিক পার,
আনন্দের পারাবারে মগ্ন মম মন॥
এসো যত কুলবালা, সাজায়ে বরণ ডালা,
ঘন হুলাহুলী রবে ছাও হে গগন।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয়রঞ্জন মম নয়নঅঞ্জন।—
দুর্গতিগঞ্জন মম দাসীত্বভঞ্জন॥

নৃত্য।

অনুপম বেশভূষায় অনুপমরূপিণী কত শত চাপল্যে নৃত্য করিতেছে; যেন আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই বিভোর হইয়া পরিবেষ্টমান অসংখ্য দর্শকদিগকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা অকাতরে বিতরণ করিতেছে; যেন মুগ্ধা অসীমোৎসাহে নারী-সুলভ কৃপণতা হারাইয়াছে—বহুরূপিণী অসংখ্য চক্ষুগণে নিমেষ পরিবর্ত্তমান নবনব লক্ষচ্ছবি নিমেষে নিমেষে বিলাইতেছে—নানাভঙ্গী মধুর নানারূপের নানা জ্যোতি দেখাইতেছে—প্রফুল্ল উৎসের ন্যায় চারিদিকে সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিতেছে। আসরের মধ্যস্থলে নর্ত্তকী; রমণীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে লোকের শক্ত জমাট বাঁধিয়াছে। নর্ত্তকীর করদ্বয়ে ডমরু-বেণুরব-প্রোৎসাহিত গম্ভীর-ভুজঙ্গ-ফণায় ধীর মৃদুচাপল্য একবার অভিনীত হইল। পরক্ষণেই বাহুদ্বয়ে, উড্ডয়নচতুর ক্রীড়মান পক্ষীর পক্ষের নানা প্রকার লীলাবিধুনন অভিনীত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধাঙ্গে মন্দ বাতান্দোলিত বল্লরী গদ্গদ বিলাসে খেলিতে লাগিল। নর্ত্তকী কভু নারীর পুষ্পাবচয়ন অভিনয় করিল, কভু লজ্জাবতীর দেহের সলজ্জভাব, চরণের সলজ্জগতি, কভু যুবতীবিলাসিনীর বিলাস ভাব, বিলাসগতি, কভু খণ্ডিতার ক্রোধ কভু নবযৌবন চপলার নানা ছন্দে বক্ষলগ্ন করতল শয্যাশায়ী শিশুসোহাগ অভিনয় করিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাবিহীন ভঙ্গীজীবন মূকের অভিনয় তাললয়বদ্ধ, যেমন কথা-জীবন

কাব্য নাটক ছন্দে বদ্ধ। ভঙ্গী সকল তাল লয়ে আঁটা না হইলে ভাঁড়ের শিথিল ভাঁড়ামী হইত, নৃত্য হইত না। তাল লয়ের মধুর বন্ধনে বন্দিনী সুন্দরী নানাচ্ছন্দে নাচিতেছে; যেন ভুজঙ্গ বিলোল বিদ্যুচ্চপলার দেহের ভার নাই, মাংসাস্থি নাই; যেন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মাটি মাড়াইতেছে না, দর্শকদিগের নেত্রে নেত্রে নাচিতেছে। সাবাস্ সাবাস্! এইবার নর্ত্তকীর পৃথুল কলেবরের তরতর মণ্ডলগতি হইতেছে; যেন চতুর্দ্দিকের অসংখ্য চক্ষুতারকার আকর্ষণে, কামুকের ইহলোক বিপুল ভূমণ্ডল শন শন ঘুরিতেছে। এই কলেবর ঘূর্ণনের সৌন্দর্য্য কি? গমন কালে গজগামিনীর অঙ্গবিশেষ ধিকি ধিকি ঘুরিয়া থাকে, এই অঙ্গ দোলন মৃদুমন্থরচলন এতদ্দেশে বড়ই রমণীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত; বাজারের প্রয়োজন বুঝিয়া মনোজ্ঞভঙ্গীসঙ্কলনকারী নৃত্য এই দোলনি অনুকরণ করিতে শিখিল; অনুকরণে এই মন্দান্দোলন কেবল তাললয়ে বদ্ধ করা হইল না, আর বিস্তর পারিপাট্য বর্দ্ধিত করা হইল—স্বভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধিকি ধিকি ঘুরে, ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীর মৃদুমন্থর গতিও হইতে থাকে, কিন্তু অনুকরণ নৃত্যে তত্তদঙ্গ শন শন ঘুরিতে লাগিল অথচ নর্ত্তকীর ঈষদপি গতি হইল না। অদ্বিতীয় ইন্দ্রজাল! অদ্বিতীয় নয়ন ছলনা! অতি দ্রুতগতিবোধক অঙ্গ ঘূর্ণন হইতেছে বস্তুতঃ কিন্তু গতি নাই—চমৎকার! চমৎকার!! স্বভাবকে অত্যন্ত চাঁচা ছোলা করিতে গেলেই এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়া উঠে; কবির অতি নৈপুণ্যে নৈষধাদি কাব্যও এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে;—আপাদ মস্তক মূর্চ্ছনালঙ্কৃত, গিটকারীতে বিভূষিত; যে অতি-ওস্তাদী দেখাতে যায় তাহার গীতও এইরূপ অতিভূষণে কদাকার হইয়া পড়ে। নৃত্যকালে নর্ত্তকীকে পুরুষকর্কশা স্বৈরিণী জ্ঞান করিলে দর্শকের মনে মধুর ভাবতরঙ্গ উঠিতে পায়না। অভিনয়কালে শকুন্তলাকে যেমন ওপাড়ার বেহায়ে ছোঁড়া ভাবিলে ভ্রান্তিসুখের ব্যঘাত পড়ে; কারণ নৃত্য, ভঙ্গীব্যক্ত অভিনয় বিশেষ, নৃত্যাভিনয়ে নারীর নানা মূর্ত্তি ক্রমান্বয়ে বিকসিত হইতে থাকে। উপরোক্ত নারীনৃত্যের গূঢ় সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু সাদা চোকে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায় না, কামমদোন্মত্ত চক্ষু চাই—করুণাচক্ষে স্নেহ চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না—জলাবরণে চক্ষু ঢাকিয়া আসে—সূক্ষ্মদৃষ্টি চলে না।

হায় নারি! তুমি এতগুণে গুণবতী, বিশ্বার্দ্ধ হইয়াও গুণগ্রাহী পুরুষের কাছে তোমার এত অপমান কেন? কামনয়নে তোমায় দেখা আদর করা নয়, তোমার অপমান করা। তাললয়শূন্য ভঙ্গী—ভাঁড়ামী; আবার সতাল ভঙ্গী ব্যঞ্জনাবিহীন অর্থাৎ কোন প্রকার মনোভাব, মনোবৃত্তি ব্যঞ্জক না হইলে নৃত্য, ছন্দে গাঁথা কস্লৎ হইয়া পড়ে;—যেমন উড়িষ্যায় "গুটি পোর" (একটি ছেলের) নাচ,

দেশীয় যাত্রায় ভিস্তীর নাচ, উপরোক্ত অতি নৈপুণ্যবিকৃত ঘূর্ণ্য মান নারীঅঙ্গ স্পন্দন।

এখনকার অনেক কাব্যও ছন্দে গাঁথা কস্‌লৎ। মার্জ্জিতরুচি সহৃদয় দিগের মনোজ্ঞ হইতে নৃত্যের ভঙ্গী সকল সু-পরিস্ফুটরূপে মনোভাব ব্যঞ্জক হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্ত মনোবৃত্তির তারতম্যে দর্শকের অহ্লাদের তারতম্য হয়—লাস্যে নারীর কামোন্মাদ-সূচক ভঙ্গীগুলি অপেক্ষা লজ্জাবিনয় অমায়িকতা সূচক ভঙ্গী-গুলি, সহৃদয়ের কাছে নিঃসন্দেহ অধিক-তর মনোহর। এতদ্দেশীয় নৃত্যের প্রধান অভাব এই—বালক বালিকার নৃত্য নাই, পুরুষের নৃত্য নাই—বালক বালিকার নির্ম্মল কোমলানন্দ ভঙ্গীগুলি অভিনীত হয় না—পুরুষের দর্প, বীর্য, প্রেমাবেশ প্রভৃতি নানাভাবব্যঞ্জক কোন ভঙ্গীই অভিনীত হয় না। প্রাচীন নৃত্যের পুরুষনৃত্য তাণ্ডবভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে উর্দ্ধলাস্য ভাব আধমরা হইয়া আছে। এখন পুরুষকে নৃত্য করিতে হইলে নারী সাজিতে হয়,নহিলে পুরুষের ভাব ভঙ্গী অভিনয় অসংলগ্ন উপহাস ও বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে।

বালিকা নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিলে, এই ক্ষুদ্রপ্রাণী এত শিখিয়াছে ভাবিয়া বিরক্তি-হয় না বটে, কিন্তু হাঁসিতে হাঁসিতে প্রাণ যায়,এমনি বয়স্থার উপযুক্ত অসঙ্গত অঙ্গ-ভঙ্গী করে, যেন যুবতী দিগকে ব্যঙ্গ করি-তেছে বোধ হয়। শেষে পাকামী আর সহে না বলিয়া উঠিয়া পলাইতে হয়। এতদ্দেশীয় নৃত্যের পুঁজিপাটা কেবল মাত্র কতিপয় স্ত্রীভঙ্গী। তাহাও অধিক নয় এবং তাহার অধিকাংশই বিলাস ভঙ্গী—অতি মাননীয় নারী চিত্তের স্বর্গীয় ভাবসূচক বিশুদ্ধ ভঙ্গী নাই বলিলেও বলা যায়। কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান গম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি; পুরুষের নৃত্যই অসঙ্গত—নাচুক স্বল্পমতি বালক, নাচুক চপলতরল মতি রমণী, নাচুক শরীরসর্ব্বস্ব ইংরাজ, নাচুক মূঢ়মতি সাঁওতাল, তা বলিয়া কি মহামতি আর্য্যসন্তান নাচিবে? ভেলা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গী স্বল্প তরঙ্গে নাচে সত্য, কিন্তু সময়ে২ মহত্তরঙ্গ ত উঠে; তখন ভাসমান গ্রামরূপী অর্ণব পোতেরাও নাচিতে থাকে। যোগি-শ্রেষ্ঠ, নির্ব্বিকার শূলপাণি নাচিতেন; তাঁরই নৃত্যের নাম তাণ্ডব। দিগ্বিজয়িজিৎ নিমাই পণ্ডিত, জ্ঞানপ্রতিম চৈতন্যদেবও সগণে সেদিন নাচিয়াছেন। মহোল্লাস স্রোতে সুস্থির থাকে কোন মর্ত্ত্যের সাধ্য? ইংরাজদের ন্যায় আবাল বৃদ্ধের নৃত্যশিক্ষা, নৃত্যচর্চ্চা অতি কর্ত্তব্য এত দূর প্রতিপন্ন করিতে আমরা এত কথা কহিলাম না—পুরুষের নৃত্য, পৌরুষেয় ভঙ্গী অভিনয় অসঙ্গত নয়, এই মাত্র আমাদের বলিবার অভি-প্রায়। যেমন নারীচিত্তের মধুর মার্দ্দব ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটী তাললয়ে অভিনয় করে, তেমনি পুরুষের মধুর বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক ভঙ্গীগুলি নটে অভিনয় করিলে,

দেশীয় নৃত্যের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য সাধিত হয়--আমাদের শেষ কথা গুলির এই মাত্র লক্ষ্য।

পুরুষের নৃত্য এত অসঙ্গত বোধ হইবার আর এক কারণ এই; আশৈশব দেখিয়া দেখিয়া নৃত্য নামের সঙ্গে আর হাত ঘুরাণ, অঙ্গ দুলান প্রভৃতির সঙ্গে মনে মনে যে দৃঢ় সম্বন্ধ বাঁধিয়া আছে, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা, একটু স্থিরকল্পনার কাজ।

গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণনাচ, যাত্রার কৃষ্ণনাচ এবং আর আর কথা দ্বিতীয়বারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

শৈশব সহচরী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণপ্রভা।

"আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইয়াছে।" সুবর্ণ পুরের গগনস্পর্শী এক অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত শয়নকক্ষে এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা পর্য্যঙ্কশায়ী একটি যুবা পুরুষের মুখ প্রতি চাহিয়া এই বাক্য বলিল, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হয়েছে।" শয়ন কক্ষে দীপালোক অতি ক্ষীণ জ্বলিতেছিল। রাত্রি ঘনান্ধকার, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; পৃথিবী নিশব্দ; কেবল নিকটস্থ জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচরবর্গের কলরব, আর এই নিভৃত কক্ষে দুইটী স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক এই বাক্য শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া বাম হস্ত বালিকার বামস্কন্ধে আরোপণ করিয়া দক্ষিণহস্তে তাঁহার বদন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেন স্বর্ণ, কি জন্য তোমার মন এত অস্থির হইয়াছে?"

"তা জানিনে" বলিয়া স্বর্ণপ্রভা রজনীকান্তের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেন কেন, কি হইয়াছে?" রজনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বর্ণপ্রভা মুখ তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে২ বলিলেন "কেবলই মনে হতেছে যেন আর তোমাকে দেখিতে পাইব না।" বলিয়া আবার রজনীর বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক ফোঁটা নয়নবারি রজনীকান্তের চক্ষু হইতে আস্তে২ স্বর্ণপ্রভার গণ্ডদেশে পড়িল। অমনি স্বর্ণপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া

রজনীর চক্ষে হস্তদিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রজনীর গলা ধরিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন, "আমার মন সুস্থির হইয়াছে সব অসুখ সেরে গিয়াছে, আর কাঁদিব না।" এই বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রজনীর ক্রোড়ে অবোধ বালিকার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনী দুঃখিত হইয়া এই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার অনুরাগ চিন্তা করিতেছিলেন। দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, এই গাঢ় প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রভাকে কেবল মাত্র তিনি কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রণয় দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, সে প্রণয় কেবল মাত্র তিনি কুমুদিনীর জন্য রাখিয়াছিলেন। এবম্বিধ চিন্তা করিতেং রজনী অন্যমনস্ক হইলেন। পৃথিবী নিশব্দ, স্বর্ণপ্রভা নিঃশব্দে তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষীণ দীপালোকের প্রতি চাহিয়া আছেন। অকস্মাৎ রজনীকান্ত সাবধান সূচক রমণীকণ্ঠে "বিধু বিধু" বলিয়া খিড়কী দ্বারদেশে কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলেন। রজনীকান্ত চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্বর্ণপ্রভাও রজনীর ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে পুনঃপুনঃ উভয়েই সেই মৃদুস্বরে "বিধু বিধু" বলিয়া ডাকিতে শুনিতে পাইলেন। এই ভীষণগম্ভীর তিমিরাবৃত যামিনীতে সেই স্বর শুনিয়া স্বর্ণপ্রভার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বালস্বভাব সূচক উহাকে অনৈসর্গিক জ্ঞান করিলেন। রজনীকান্ত আস্তেং উঠিয়া কক্ষদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ছাদের উপর আসিলেন। স্বর্ণপ্রভা দৃঢ় মুষ্টিতে রজনীর করধারণপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। যে ছাদ হইতে খিড়কী দ্বার নিকট, উভয়ে সেই ছাদে আসিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অনন্ত অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গগনমণ্ডল অনন্ত মেঘান্ধকারে আবৃত, কেবল কোথাও দুই একটি বৃক্ষ, অসংখ্য খদ্যোতমালায় হীরকখচিত বৃক্ষের ন্যায় জ্বলিতেছিল, আর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে বর্ষার অনুচরগণের কলরব শুনা যাইতেছিল। রজনীকান্ত খিড়কীর নিকটস্থ ছাদে আসিয়া পুনঃং সেই ডাক শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মনুষ্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন না। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" কোন উত্তর পাইলেন না—স্ত্রীলোক বোধ করিয়া স্বর্ণপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেগা তুমি?" স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন "আমি কুমুদিনী। শিগ্‌গীর দোর খুলে দিতে বল।" স্বর্ণপ্রভা অতি কাতর স্বরে রজনীকে কহিলেন "ঐ দেখ আজ কি বিপদ্ ঘটিয়াছে। নহিলে দিদি কেনএতরাত্রে এখানে আসিবে।" তৎপরে বিধুকে জাগরিত করিয়া তাহাকে সবিশেষ অবগত করাইয়া খিড়কী দ্বার খুলিতে অনুমতি করিলেন। বিধু পূর্ব্বে স্বর্ণপ্রভার পিত্রালয়ের পরিচারিকা ছিল। এক্ষণে রজনীকান্তের সংসারে ঐ পদাভিষিক্ত। বিধু চক্ষু মুছিতেং উঠিয়া "বড়দিদি এখানে

কেন” বলিতেং খিড়কি দ্বার খুলিয়াদিল। কুমুদিনী অতি দ্রুত গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন,“বিধু,শীঘ্র আয়,স্বর্ণ কোথায়?”

বিধু। দিদি কি হয়েছে?

কুমু। “বল্‌চি, তুই শীঘ্র স্বর্ণ কোথা দেখাবি আয়।” দুই জনে অতি দ্রুত চলিলেন। বিধু খিড়কি দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গেল, কিঞ্চিৎ দূরে স্বর্ণ প্রভার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমুদিনী স্বর্ণপ্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কানেং কি বলিলেন। স্বর্ণপ্রভা ওমা কি হবে বলিয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতেং রজনীকান্তের নিকট গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,“পলাও,ওগো পলাও।” রজনী বিস্মিত হইয়া স্বর্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “পলাইব কেন,কি হইয়াছে?” স্বর্ণপ্রভা তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতেং বলিলেন, “তোমায় খুন করিতে আসিতেছে—”

র। কে?

স্ব। তোমার শত্রু।

র। রতিকান্ত?

স্ব। হ্যাঁ।

র। তা ভয় কি, আসুক না কেন।

স্ব। সে অনেক লোক নিয়ে আসিয়াছে, ওগো পলাও।

র। ছি!

ইত্যবসরে উভয়েই রমণীকণ্ঠনিঃসৃত চীৎকার অতি নিকটে শুনিতে পাইলেন। রজনী স্বর্ণপ্রভার নিষেধ না শুনিয়া সেই দিকে আসিয়া দেখিলেন, যে দুইটি স্ত্রীলোক অচেতনপ্রায় প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে, এবং প্রাঙ্গণের দ্বার দিয়া অসংখ্য দস্যু একে একে প্রবেশ করিতেছে। যৌবন কালের উষ্ণ শোণিতের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রযুক্ত রজনীকান্ত নিকটস্থ দ্বার হইতে একটি অর্গল লইয়া পতঙ্গবৎ সেই অগ্নিতুল্য দস্যুদলের মধ্যে ঝাপ দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করিলেন। তৎপরে তিন চারিজন দস্যু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ষাকালে প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল হওয়াতে যেমন পদস্খলিত হইয়া ভূপতিত হইলেন অমনি এক জন দস্যু অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। কিন্তু অসি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শও করিল না, চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রজনীকান্তের দেহ আবরণ করিয়া আপনার অঙ্গে সেই অসির আঘাত গ্রহণ করিল, অমনি রজনী চীৎকার করিয়া বলিল “স্বর্ণ কি করিলি, আপনাকে নষ্ট করিলি।” অভাগিনী স্বর্ণ “এখনও শীঘ্র পলাও,” এই কথা বলিতেং আর কথা কহিতে পারিল না। পাষণ্ড দস্যু এই ঘটনা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তৎপরে যখন পুনরায় রজনীকে আঘাত অভিপ্রায়ে অসি উত্তোলন করিল। তখনি পশ্চাৎ হইতে দস্যুগণের মধ্যে ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইয়া সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, বহুসংখ্যক পুলিষ কর্ম্ম-

চারী ও রজনীর দ্বারবান্‌দিগের দ্বারায় দস্যুগণ বেষ্টিত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং মুহূর্ত্তেক মধ্যে আক্রমণকারীর উত্তোলিত হস্ত দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ড অসিসহিত ভূপতিত হইল। রজনীকান্ত দেখিলেন যে,তাঁহার সমবয়স্ক অতিসুন্দর এক যুবাপুরুষ আসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বার প্রাণরক্ষা করিল। তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আস্তে২ স্বর্ণপ্রভার দেহ বক্ষে করিয়া আপনার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন এবং সযত্নে সেই রক্তাক্ত দেহ আপন শয্যায় রক্ষণ করিয়া তাহার বদনচুম্বন করিলেন এবং দ্বারদেশে একজন পরিচারিকা রক্ষক রাখিয়া "স্বর্ণকে বুঝি হারাইলাম,কিন্তু কুমুদিনীকে যদি না বাঁচাইতে পারি তবে এ ছার জীবন রাখিয়া কি সুখ!" এই বলিয়া একখান তরবারি হস্তে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন যে, দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে এবং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে, প্রাঙ্গণে কেবল মাত্র চারি পাঁচটি আহত ব্যক্তি আর দুইটি স্ত্রী লোক পতিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পূর্ব্বস্থান হইতে অন্য এক স্থানে একটি যুবা পুরুষের বামহস্তে মস্তক রাখিয়া পতিত রহিয়াছে। রজনী চিনিলেন যে, স্ত্রীলোকটি কুমুদিনী, আর যুবা পুরুষটি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। একজন নিকটস্থ আহত পুলিষকে জিজ্ঞাসা করাতে জানিলেন, যে দস্যুরা পলায়ন সময়ে কুমুদিনীকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ঐ যুবক আসিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে কুমুদিনীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু ঐ সময়ে দস্যুদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কুমুদিনীর সহিত ঐ স্থানে পতিত হইলেন। রজনী দ্রুত বারি আনিয়া কুমুদিনীর মুখে সিঞ্চন করাতে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে রজনীকে দেখিয়া মস্তকে অঞ্চল টানিতে২ অতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণ, স্বর্ণ কোথায়?" রজনী তদ্রূপ মৃদু স্বরে বলিলেন "স্বর্ণ শয়ন করিয়া আছে।"

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন "দস্যুরা আপনাকে কোনস্থানে কি আঘাত করিয়াছে?"

কু। না—কেবলমাত্র পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত পাইয়াছি, তাহা কিছুই নয়। তৎপরে কুমুদিনী উঠিবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক যুবা পুরুষ তাহার নিকট পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহার হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি পতিত ছিলেন। কুমুদিনী চমকিত হইয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন, এবং রজনীকান্তের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। রজনী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "উনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু দস্যুরা যখন তোমাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন উনি তোমাকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া তাহাদিগের দ্বারা আহত হইয়া, তোমাকে লইয়া এইস্থানে পতিত হয়েন।" তৎপরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণ হইতে

উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই অপরিচিত যুবার মুখপ্রতি অবগুণ্ঠন হইতে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আর স্বর্ণপ্রভা? সে ক্ষুদ্র প্রদীপের অল্প তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল—আজিকার প্রচণ্ড বাত্যায় তাহা নিবিয়া গেল। সে ক্ষুদ্র ভেলা অগাধ সাগরে পড়িয়াছিল—এ ঘোর তরঙ্গে তাহা ডুবিল। আজিকার প্রচণ্ড তাপে স্বর্ণ কুসুম শুকাইল;—স্বর্ণসৌদামিনী মেঘে লুকাইল—ধুণ্ড বজ্রাঘাত রহিল। স্বর্ণ সেই অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

রজনী

পঞ্চম খণ্ড।

(লবঙ্গলতার উক্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি জানিতাম শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলে বয়সে অত ভাবিতে আছে! দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিহ্ব দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়িপেতে ছেলের কাণ্ড দেখ্‌ত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে, রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে। রজনী কি করিয়াছে? তা জানি না, কিন্তু রজনীর সঙ্গে এ চিত্তবিকারের কোন সম্বন্ধ নাই কি? না থাকিলে সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কই, আমি রজনীর বাড়ী গিয়া-

ছিলাম সে ত, সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই! তাহার যে অহঙ্কার হইয়াছে, একথা সম্ভব নহে। বোধ হয়, লজ্জায় আসে না। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল রজনী গৃহে নাই। অনেক দিন হইল স্থানান্তরে গিয়াছে। অমরনাথ বাড়ী আছে।

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। স্থানান্তরে, কোথায় গিয়াছে, কবে আসিবে, দাসী তাহা কিছুই বলিতে পারিল না। পরের ঘরের কথা, অত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেও পারি না। মনেও বড় সন্দেহ হইল। স্থূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলাম। কাহার নিকট জানিব?

স্বয়ং অমরনাথ ভিন্ন আর কাহার নিকট জানিব?

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, অমরনাথকে কোথায় পাইব? তাহার গৃহে স্ত্রীলোক নাই—আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব না। তবে কৌশলে অমরনাথকে আমাদিগের গৃহে আনা যায়। সেই কৌশলের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলাম।

মনে করিলাম,আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না? সে সম্বন্ধ কি? বোধ হয়, আমাদিগের এই বর্ত্তমান দারিদ্র্য দুঃখজনিত মানসিক ক্লেশই শচীন্দ্রের এই মানসিক পীড়ার কারণ। রজনীই এই দারিদ্র্য দুঃখের মূল। অতএব রজনীর নাম শচীন্দ্রের মনে সর্ব্বদা জাগরূক হইবে বিচিত্র কি? যদি, এই সিদ্ধান্তই যথার্থ হয়, তবে অমরনাথকে ডাকাইয়া কি করিব?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। একথা ওকথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে, আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল —এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদিগের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না—শচীন্দ্র সে কথা ঢাকিয়া প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিলেন।

একটা কথা স্থির হইল—রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনের ভাব যাহাই হৌক—তাঁহার রাগ নাই। রাগ নাই, তবে কি —অনুরাগ? তাও কি সম্ভবে? অন্ধের প্রতি? আবার এত দিনের পর? যখন রজনী নিকটে ছিল—সুপ্রাপণীয়া ছিল, তখন ত ইহার কোন লক্ষণ দেখি নাই —এখন কেন হইবে?

যাহা হৌক, একবার রজনীকে, আনিয়া বাছাকে, দেখাইতে হইতেছে। উপায় কি? তখন, কর্ত্তার কাছে গেলাম। তাঁহাকে আমার মনের সন্দেহ সকল আভাস ইঙ্গিতে নিবেদন করিলাম। রজনীর যে সন্ধান করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাও বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় কি? আমি বলিলাম "অমর নাথ ভিন্ন সবিশেষ সন্ধান আর কেহ বলিতে পারিবে না। তুমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আন।" তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমার কথা কতক্ষণ ঠেলিবেন? তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করিলেন।

অমরনাথও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, যদি উকি ঝুকি মারিয়া আমাকে একবার দেখিতে পান, সে লোভ ছিল। পরদিন প্রাতে আসিয়া, অমরনাথ সশরীরে আমাদিগের ক্ষুদ্র গৃহে দর্শন দিলেন। আমি স্বামীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার কাছে অনুমতি লইয়া অমরনাথের মনের সাধ পূরাইবার জন্য—তাহার আহারের নিকট পূতনা হইয়া বসিলাম। পূতনা—কেননা বিষপান করাইবার ইচ্ছা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যেখানে বাক্য বিষ আছে সেখানে অন্য বিষের প্রয়োজন কি?

নারীজন্ম যেন কেহ গ্রহণ করে না। না করিতে হয় এমন কাজ নাই। যাহাতে মনের বড় বিরাগ, হাসিতে হাসিতে তাহাও করিতে হয়। বিষ, অমৃত উভয়ই প্রয়োগ করিতে হয়। সর্পী আমাদিগের অপেক্ষা ভাল—তাহার অমৃত নাই—কেবল বিষ আছে। সে ইচ্ছাধীন বিষপ্রয়োগ করে। লোকে সর্পীকে চিনে, তাহার নিকট দিয়া কেহ পথ হাঁটে না। নারী সর্পীর অমৃত আছে—সেই লোভে তাহার নিকটে আসিয়া, মূর্খ পুরুষ জাতি অনায়াসে দংশিত হয়—বিশ্বাসঘাতিনী নারী অনায়াসে দংশন করে। হায়! লবঙ্গসর্পীর কি হইবে?

রজনী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনী কোথায়?"

এটি যেন দুম্ করিয়া কামান দাগিলাম। অমরনাথ বিত্রস্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কথা কও না যে?"

অমর। এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

আমি। রজনীর সঙ্গে জানা শুনাছিল, তাহাকে ভাল বাসিতাম—না জিজ্ঞাসা করিব কেন?

অমর। স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ—সে কোথায় এ কথা জিজ্ঞাসা কেন?

আমি। রজনী তোমার ঘরে নাই, ইহা আমার কাছে বিশেষপ্রসিদ্ধ; কাল লোকের দ্বারা খবর আনিয়াছি, এজন্য জিজ্ঞাসা করি।

অমর। তবে সে স্থানান্তরে গিয়াছে।

আমি। কোথায় সে স্থানান্তর?

অমর। আমি যদি না বলি?

আমি। আমি যদি সকল কথা বলি?

অমর। তাহা হইলে আমার অনিষ্ট হইবে। তুমি এতদিন আমার যে অনিষ্ট কর নাই, এখন যে তাহা করিবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। তুমি আমাকে কেবল ভয় দেখাইতেছ, ইহা বুঝিয়াছি।

আমি। এখন তুমি আমার অনিষ্ট করিতেছ, আমি তোমার অনিষ্ট না করিব কেন?

অমরনাথ চমকিয়া উঠিল—"তোমার অনিষ্ট আমি কখন স্বপ্নেও কামনা করি না। তবে রজনীর বিষয়োদ্ধারের কথা যদি বল—"

আমি হাসিলাম। অমরনাথ বলিল, "তা জানি। সে অনিষ্টের জন্য তোমাদিগের রাগ নাই। তবে তোমার কি অনিষ্ট?"

আমি। আমার পুত্রের অনিষ্ট।

অ। শচীন্দ্র বাবুর? বিষয়ক্ষতি ভিন্ন আর কি অনিষ্ট করিয়াছি?

আমি। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া সকল কথা শুন, তবে আমি বিশেষ বৃত্তান্ত বলি।

অ। এক্ষণে আহারে আমার বিশেষ মনোযোগ।

আমি। আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার আহার বন্ধ হইয়া যাইবে।

অ। এমন কথা কেন এখন বলিবে? নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহারের বিঘ্ন করা অন্যায় কাজ হয়।

অমরনাথকে ব্যঙ্গপরায়ণ দেখিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলাম। বলিলাম, "আমিও রহস্য জানি। একটি রহস্যের কথা

বলি শুন। প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—”

অ। এটা যদি রহস্য তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। আহার ত্যাগ করিয়া বলিল, “ক্ষমা কর।”

আমি বলিতে লাগিলাম, “আহারে মনোযোগ কর না? সেই চোর সিঁধপথে, আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া, আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।”

অমর। ক্ষমা কর, সেত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া, নির্গত হইয়া বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বদ্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, “এ সকল কথা কেন?”

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল, আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে, লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াদিলাম,

“চোর!”

অমর বাবু অতিগ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আজি আমার স্বামী চারিজন পাহারাওয়ালা আমার বাড়ীতে উপস্থিত রাখিয়াছেন; প্রয়োজন হয়, তাহারা আজ আমার হাতের লেখা পড়িবে।

অমরনাথ হাঁসিল এবং বলিল, “ধমক চমক কেন? কাজটা কি করিতে হইবে সহজে বলনা? রজনীর সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে?”

আমি। তাহা হইলে এক্ষণে যথেষ্ট হইবে।

অমর। সহজ কথা; সে এক্ষণে কাশীবাস করিতেছে। বাঙ্গালিটোলা গোপাল অধিকারীর বাড়ীতে আছে।

আমি। একথা যদি মিথ্যা হয়?

অ। যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার কি করিবে?

আমি। এই কলিকাতা নগর মধ্যে রাষ্ট্র করিব যে, অমর নাথ চোর—চোর বলিয়া তাহার পিঠে লেখা আছে। পুলিষ গিয়া, কামিজ খুলিয়া, পিঠ দেখিবে।

অ। তুমি কি তাহাতে রজনীকে পাইবে?

আমি। না।

অ। তবে?

আমি। তাইত! আহার কর।

অমরনাথ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আচমনান্তে অমর নাথ বলিল, "সত্য কথা তোমাকে বলি নাই। ধমক চমকে সত্য কথা আমি বলিব না—তত কাপুরুষ নই। তুমি আমার অনিষ্ট করিতে পার সত্য; তাহাতে তোমার লাভ হইবে না—আমার ক্ষতি হইবে। সত্যং তুমি আমার অনিষ্ট করিবে কি? একথা সত্য বলিও—আমি আন্তরিক সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমিও আন্তরিক সরলভাবে উত্তর দিও।"

অমরনাথ অতি বিনীতভাবে, সরল, মধুরভাবে এই কথা বলিল। আমিও আর কপটতা করিতে পারিলাম না—আমি বলিলাম,

"না—তোমার অনিষ্ট করিব না—অনেক অনিষ্ট করিয়াছি—একথা আন্তরিক বলিতেছি। তুমি আমার উপকার করিলে না—না কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।"

অমরনাথের চক্ষে জল আসিল। গদ্গদ স্বরে অমরনাথ বলিল, "লবঙ্গলতা, তুমিই জিতিলে। আমি আবার হারিলাম। আমায় বিশ্বাস কর। আমায় কি বিশ্বাস করিতে পার?"

সেত কঠিন কথা! যে তেমন গুরুতর অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছিল, তাহাকে আবার বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? কিন্তু সংসার অবিশ্বাসে চলে না। কেহ চিরদিন বিশ্বাসী নহে—কেহ চিরদিন অবিশ্বাসী নহে। কেন আবার অমরনাথকে বিশ্বাস করিব না? তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—দেখিলাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সরল বিশ্বাসভূমি। আমি বলিলাম, "তোমায় বিশ্বাস করিব। শোন যাহা আমার বলিতে বাকি আছে, বলি।"

এই কথা বলিয়া আমি তখন শচীন্দ্রের এই রোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলাম। শচীন্দ্র যে সর্ব্বদা প্রলাপ কালে রজনীর নাম করে, তাহাও তাহাকে বলিলাম। যে জন্য রজনীর সন্ধান করিতেছিলাম, তাহাও বলিলাম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অমরনাথ অনেকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আজ আমি চলিলাম—আবার একদিন আসিতেছি, শীঘ্রই আসিব। আসিলে তোমার

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ত?"

আমি। হইবে।

অমর। এইরূপ নির্জনে?

আমি। যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাও পারি।

অমর। তাহাতে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না ত?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। সন্দেহ? গুরুদেব জানেন! দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্ন শাম্ব তোমার পুত্র সম্বন্ধ হইলেও স্বামীর অসাক্ষাতে তাহাদের কাছে থাকিও না—আমি অমরনাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে তিনি অবিশ্বাস না করিবেন কেন? বিশেষ আমি সপত্নীর ঘর করি! আমি যুবতী, আমার স্বামী বৃদ্ধ, অমরনাথ যুবা, আবার পূর্ব্ব হইতে আমাতে অনুরক্ত—কেন সন্দেহ করিবেন না? আমি আপনিই কেন সন্দেহ করিতেছি না? অমরনাথ আজি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেলিয়াছে—আমিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি। দোষ নাই বটে, কিন্তু পাপ ছদ্মবেশেই প্রথম প্রবেশ করে। আমি কুলের বউ—ঘরের ভিতর থাকাই ভাল।

এই ভাবিয়া অমরনাথকে বলিলাম "যদি সে কথা মনে করিলে, তবে আমার সঙ্গে, তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি—ততদিন দেখা সাক্ষাতে ক্ষতি ছিল না—আজি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি—আজি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে।"

এই কথা বলিয়া, আমি অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম---মনে করিলাম বুঝি সে বলিবে, যে, "তোমার বিশ্বাস তুমি ফিরাইয়া লও।" অমরনাথ তাহা বলিল না--আমি সন্তুষ্ট হইলাম—এবং বুঝিতে পারিলাম যে, অমরনাথও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইল।

অমরনাথ বলিল, "সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিব। তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব—আমার একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে—এখন বলিব কি?"

আমি। কি?

অমর। না এখন না—আর একবার দেখা দিও—সেই সময় বলিব।

অমরনাথ প্রসন্নচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সম্বাদ দিল তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া

নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম,

"মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি? (কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা! আমি শচীর মা!) "এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে,এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি এক বীজমন্ত্রাঙ্কিত যন্ত্র লিখিয়া তাঁহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া দিলাম যে, যে তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসে তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভাল বাসে বুঝিতে পারি,আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। পরে অমরনাথের গৃহে রজনীকে যে অবস্থায় শচীন্দ্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই পূর্ব্বরোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন রজনী পরস্ত্রী, শচীন্দ্র সে ভাবকে মনে স্থান দেন নাই। তাহার লক্ষণ দেখিবামাত্র দমন করিয়াছিলেন। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখ তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্য মনে, দারিদ্র্য দুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু,চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না, যে তদ্দ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ,পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যেং গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে "ইহার প্রতীকারের কি উপায় হইবে ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তরদিগের দ্বারা এরোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখন এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছেন, এমত আমি শুনি নাই।

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তর দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্য চিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। আপনি ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে, আমি এমত ভরসা পাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরস্ত্রীর প্রতি স্থায়ী অনুরাগের অপেক্ষা কষ্টকর মহাপাপ আর কি আছে?

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক মন্দ হউক তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথ স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রজনী অনিষ্টকারিণী কি ইষ্টকারিণী হইয়া আসিল, তাহা বলিতে পারি নাই, কিন্তু আমি যে অমরনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম।

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত? কোন্ মূর্খে একথা বলিবে? কন্দর্পের রূপ আর হরিশ্চন্দ্রের সত্যপরায়ণতা একত্রিত হইলেও ললিত লবঙ্গলতা ললিত লবঙ্গলতাই থাকিবে। ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গর্ব্ব।

লজ্জা কেন করি।

কোপ ভয় প্রভৃতি অনুভবের ন্যায় লজ্জা সুখের অনুভব নয়, লজ্জা দুঃখময়ী। ক্রোধ ব্যতীত আর সকল প্রকার দুঃখের অনুভবে অনুভাবীর শরীর যেমন জড় সড় কুণ্ঠিত হয় সেইরূপ লজ্জারও বাহ্য লক্ষণ শরীরের জড়তা; বাড়ীর বাহিরে চলিতে হইলেই লজ্জাবতী কুলকামিনীর চরণে চরণ বাধে। লজ্জার প্রকোপে হেঁট মস্তক, বসিলে উঠা যায় না, উঠিলে চলা যায় না। কখন কখন লজ্জায় আমরা অতি তীব্র দুঃখ সহিয়া থাকি; ইচ্ছা হয় যে পৃথিবী দ্বিধা ভগ্ন হউক্ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া লজ্জার উৎপীড়ন হইতে এড়াই; ইচ্ছা হয় সূর্য্য চিরদিনের জন্য নিবিয়া যাউক্, যেন কেহ মুখের এ কলঙ্ককালিমা না দেখিতে পায়। লজ্জা নম্রতা নয়, লজ্জা অনুভব বিশেষ, নম্রতা জ্ঞান বিশেষ। লজ্জায় নম্রতায় উভয় অবস্থায়ই মনুষ্যের দীনভাব বটে, কিন্তু সলজ্জাবস্থায় আমরা দুঃখী, নম্রতায় সুখী। অভিমানীর লজ্জা, নিরভিমানীর নম্রতা। লজ্জাগ্রস্ত লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিতে যত্নবান্ হন, বিনয়ী ঘোর আয়াসে নম্রতা ধরিয়া রাখেন। নম্রতায় দীক্ষিত হইয়াই ধার্ম্মিক সদানন্দ হইতে শিখেন, জ্বালাময় জগৎ-রূপী রৌরবে থাকিয়াও চর্ম্ম দেহ অক্ষত রাখিতে পারেন, সশরীরে স্বর্গভোগ করেন। লজ্জা যদি নম্রতা না হইল, লজ্জায় যদি এত দুঃখ, তবে এ অনুভব চিরকালই এত লোকপ্রিয় কেন? সমাজ-শাসন-বিধি দোষীর প্রিয় নয়, যাহাদের সুখের জন্য শাসনগুলি বিধি-বদ্ধ হইয়াছে তাহাদেরই প্রিয়। লজ্জা, লজ্জাবান্‌কে লোকের মন যোগাইয়া চালায়; বৈদিককালে ভীরু আর্য্যকে লজ্জা, অসিচর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দিত না, এখন ভারতীয় আর্য্যকুলতিলক প্রখর বুদ্ধি বঙ্গীয় যুবক, মহোৎসাহে উৎসাহিত হইলেও লজ্জায় অসিচর্ম্ম ধরিতে পারেন না। লোকের মন যোগাইয়া চালাইলে, শুদ্ধ লোক-সামান্য প্রচলিত ধর্ম্ম রক্ষা হয়; অতএব অলোক-সামান্য অপ্রচলিত ভদ্রতানুশীলন করাইতে লজ্জা নিতান্ত অক্ষম; পবনসহায়ে পক্ষীর অনন্ত উন্নতি হয় না, যাবৎ পবনের প্রতাপ তাবৎ উঠিয়া থাকে।

লজ্জার শাসনে সম্পূর্ণ উপকার হয়ই না ত, সর্ব্বদা অপকারও হইয়া থাকে; নবীন সৌখীন ইয়ার ছিন্ন মলিনবসনে বাজারে যাইতে পারিলেন না, বর্ষীয়সী জননী সেদিন অনাহারে রহিলেন; কুম্ভীরে আসিয়া বঙ্গ-বধূর বসন ধরিল, ভয়ে বিহ্বলা হইয়া বধূ বস্ত্র ফেলিয়া নদীকূলে উঠিলেন, বিবসনা, উঠিয়াই দেখেন, সম্মুখে, ওপাড়ার পাঁচুঠাকুরপো, এবার লজ্জায় বিহ্বলা হইয়া সলিল-বসন

পরিবার জন্য লজ্জাবতী, জলে ঝাঁপ দিলেন; নক্র বলিল, " এ লজ্জা সলিল-বসনে ঢাকে না, এস, তোমায় উদরে লুকাইয়া রাখি।" দেখাগেল যে লজ্জার শাসন অসম্পূর্ণ আবার অপকারক; তবে লজ্জার এত আদর কেন? এখন প্রায় সর্ব্বলোকব্যপী শাসন আর নাই বলিয়া। গর্ব্বের শাসন সর্ব্বব্যাপী হইলে কি হয়? ইহা অধিকতর অসম্পূর্ণ এবং অধিকতর অপকারক।

একমাত্র উৎকৃষ্ট শাসন, প্রেমানুভবের শাসন, কিন্তু এশাসন আজও সর্ব্বলোক-ব্যাপী হইয়া উঠে নাই; জগতের দুই চারিটি মাত্র লোক যথার্থ প্রেমিক, প্রেমের শাসনে শাসিত। সেই সকল কোন অপকর্ম্ম করিতে পারেন না কারণ, প্রেমে তিরস্কার করে, অন্যায় করিলেই প্রেমের তাড়নায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে হয়। কবে যে প্রেমের শাসন সর্ব্বলোকব্যাপী হইবে বলা যায় না তবে এটি নিশ্চয় যে, সর্ব্বলোকে প্রেমানুভব বলবান্ হইয়া উঠিলে লজ্জার আর আদর থাকিবেনা। কবি আর* Fie! for Godly shame!" বলিয়া, লজ্জা-প্রভুর নামোল্লেখ করিয়া, লজ্জার ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্যে অনাবিষ্ট মনকে উৎসাহ-দিবেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ আর লজ্জার দোহাইদিয়া সেনাগণকে উত্তেজিত করিবেন না। উত্তেজিত করিবেন না—কারণ, যে হৃদয়ের অধিপতি প্রেম, সে হৃদয়ে লজ্জার প্রভুত্ব চলেনা। তখন সকলেই প্রেমের দোহাই দিবেন; আর সুষুপ্ত মন জাগিয়া নাচিয়া উঠিবে। লজ্জাবতীর অভিধানে তখন সুখ্যাতি করা হইবে না; নির্লজ্জ বলিলে তখন আর নিন্দা করা হইবে না। এই মহদ্বিপর্য্যয়ের কারণ আমরা ক্রমে পরিস্ফুট করিতেছি।

যীশু-খৃষ্ণ, চৈতন্য, কবীর, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার, নানক প্রভৃতি প্রেমের দাস হইয়া অবধি লজ্জা খোয়াইয়াছিলেন। শুদ্ধ বাল্য লীলায় চৈতন্যদেবকে কখন কখন লজ্জিত হইতে দেখা যায়, আর নয়। কেহ বলিতে পারেন লজ্জার যন্ত্রণা ইঁহাদের কখন সহিতে হয় নাই, কারণ, কখন অন্যায় কাজ করেন নাই। একথা মিথ্যা; পুণ্যময় জগদীশ ব্যতীত অন্যায় সকলেই করিয়া থাকেন; তবে আমাদের অন্যায় একরূপ, এই সকল মনুষ্য দেবতাদের অন্যায় একরূপ। সেণ্ট জেভিয়ার ভাবিলেন—কি অন্যায় করিতেছি—পল্লীস্থ, গ্রামস্থ, দেশস্থ গুটিকতক মাত্র লোককে ঈশ্বরের মহিমা বুঝাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, আর এসিয়ার কোটি২ লোক আজ পর্য্যন্ত যীশু খৃষ্টের নামও শুনিল না; ধন-দাস পোর্ত্তুগিস্ বণিকেরা দস্যুভয় করিল না, কুৎসিত দেশের নারকীয় জল বায়ুর ভয় করিল না, আমি ঈশ্বরের দাস হইয়াভীত হইব! ছি! ছি! আমায় ধিক্! আমার ভণ্ড প্রেমে ধিক্! এই অন্যায় দেখিবার

* *Troilus and Cressida Act* II *Scene* II.

জন্য আজও আমাদের চোক্ ফুটে নাই। বস্তুতঃ অন্যায় দেখিবার চোক্ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহলোকে দর্পান্ধ হইয়া আমরা দুই চারিটি মাত্র অন্যায় দেখিতে পাই। যত ধার্ম্মিক হওয়া যায়,ততই পাপ দেখিবার চক্ষু ফুটে। রাম প্রসাদ যে গাইতেন "ওমা পাপ করেছি রাশি রাশি" এশুধু নম্রতার কথা নয়, রামপ্রসাদের হৃদয়ের কথা। তার পর, লজ্জার যন্ত্রণা সহিতে অন্যায়ই যে করিতে হয় এমন নহে, অন্যায় না করিয়াও লোকে লজ্জিত হয়; ঠাকুর-ঝি আসিয়া বলিলেন—বৌ তুমি নাকি আজ বড় গলা বার করে্য গান করেছ? ওঁরা সর্ব্বাই বল্ছেন। বৌ যদি মুখরা গর্ব্বিতা হন তাহলে রাগ করিবেন, কোমোর বাঁধিয়া ঝগড়া করিতে ধাইবেন, আর, সুশীলা হইলে, "ওমা কোথায় যাবো আমি উঠিয়া পর্য্যন্ত ভাঁড়ারে" ইত্যাদি বলিবেন, আর সেদিন লজ্জায় কাহার ও সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। মিথ্যাপবাদ শুনিয়াও লজ্জা হয়, কারণ, অভিমান সুখের অবসানে লজ্জা দুঃখের উদয়, এবং সুখ্যাতিই অভিমানের জীবন। যখন ধর্ম্মের ক,খ,গ ধরিলেই অভিমান প্রথমে ভাঙ্গিতে হয় তখন উপরোক্ত মনুষ্য-দেবতাদের লজ্জা থাকিবে কেন?

কবীরের দোঁহা—নিন্দুক্ বেচারা থা
ভলা মনকা ময়লা ধোয়।
অ্যায়সা ইয়ার মর্ গেয়া কবীর বৈঠ্কে
রোয়্।"

চৈতন্যের অহ রহ জপ—
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"
যীশু কৃষ্ণের মুখের বুলি

"For the meek is the Kingdom
of Heaven"

শুদ্ধ এঁদের কেন, ধার্ম্মিক মাত্রেরই এই এক বুলি। অতএব ধার্ম্মিক মাত্রেই নির্লজ্জ। কিন্তু প্রেমিক না হইয়া নির্লজ্জ হইলে দুই কূল যায়; উভয় শাসনের বহির্ভূত থাকিয়া,সমাজের কণ্টকস্বরূপ মহা অত্যাচারী হইয়া পড়িতে হয়। নির্লজ্জ হওয়া কেবল প্রেমিকদেরই সাজে,আত্মম্ভরি স্বার্থপরের নয়। "মন বাক্সের লজ্জা তালা" খুলিয়া লইতে হইলে অন্য আর একটি দৃঢ়তর তালা লাগান চাই। হৃদয় প্রেমাধিকৃত হইলে কোপ, ভয়, লজ্জা দর্প প্রভৃতি সকল অনুভবই অন্তর্হিত হয়; একেশ্বর হইয়া, হৃদয়ে প্রেম, রাজত্ব করিতে থাকে। যথার্থ প্রেমিক একানুভাবী প্রেমময় চৈতন্যের অর্থ, চৈতন্যের প্রেম ব্যতীত অন্য কোন অনুভব ছিল না; চৈতন্য প্রেমের প্রতিমা। কেহ বলিতে পারেন, যে চিত্তের এই একাবস্থতা বিকৃতিমাত্র। এখানে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে মূলকথা ঢাকিয়া পড়ে, এই জন্য আমরা প্রবন্ধান্তরে ইহার খণ্ডন বরিব। বাইবেল বলেন, (3rd *Genesis—The punishment of Adam*) পাপরূপা লজ্জার সঞ্চার হইয়াই, আদম ইবের স্বচ্ছ হৃদয় প্রথম

কলুষিত হয়। কেন? মহাপুস্তক বাই বেল এমন অযৌক্তিক কথা কেন কহিলেন? লজ্জায় আবার দোষ কি? সে কি? খ্রীষ্টান কবি, খ্রীষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ, খ্রীষ্টান নারী, খ্রীষ্টান আবালবৃদ্ধ সকলেই যে, পদে পদে লজ্জার দোহাই দিয়া থাকেন, তবে লজ্জা কলঙ্কিনী কেন? সত্যসত্যই লজ্জা কলঙ্কিনী। যাঁদের উপাস্য পুস্তকে লজ্জা সর্ব্বনাশিনী বলিয়া বর্ণিত, তাঁরাই যে লজ্জার দোহাই দিবেন বিচিত্র নয়, কারণ, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টানী উপদেশ রত্নগুলি আজকাল চক্‌চকে বাইবেল-বাক্সে বন্ধ করিয়াই রাখেন, তবে, স্বার্থসাধন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কলাপের সময় কখনং ব্যবহার করেন। বাইবেলের আদম ইবের উপকথা সমীচীন ইতিহাস জ্ঞান করিয়া আমরা বাইবেলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্তু গল্পটি সত্যমূলক অতি সুন্দর রূপক বলিয়া বিশ্বাস করি। বাইবেলের ইডেন নামক পার্থিব স্বর্গের বর্ণন; নির্ম্মাত, নিষ্পিত, অত এব জনকজননী-ঈশ্বরে নিতান্ত নির্ভর, অক্ষম, অহিংসক, কাল্পনিক আদি-জীব শৈশবের বর্ণন মাত্র; (কারণ প্রবীণ বিজ্ঞানের মতে প্রকৃত ঘটনার বর্ণন হইতে পারে না)। তখন, শার্দ্দূল শিশু, মেষ শিশু, মহিষ শিশু, মনুষ্য শিশু, সকল শিশুই সচ্ছন্দে একত্রে বাস করিতে পারে। তার পরই জ্ঞানসঞ্চার বর্ণিত হইয়াছে, সঙ্গেং স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, অভিমান, লজ্জা, পাপ; শেষে পাপের তরঙ্গ দেখা দিল। শিশুর যেমন আত্মতা, স্বাধীনতা থাকে না, জনকজননীর যা ইচ্ছা শিশুরও সেই ইচ্ছা, ঈশ্বর ভক্তেরা আত্মতা স্বাধীনতা তেমনি বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের কাছে শিশু হইতে চান। তাই, শৈশবের ছবি দেখিয়া, প্রায়ই স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়া থাকে। লজ্জার মূল দূষিত; লজ্জা অভিমানপূর্ব্বা। জগতে দুঃখ মাত্রই পাপের ফল, লজ্জা দুঃখ, লজ্জাও পাপের ফল। লজ্জা অভিমান পাপের ফল। অভিমানে লজ্জায় আলোকান্ধকার সম্বন্ধ; একের আবির্ভাবে অপর অন্তর্হিত হয়। অভিমানে সুখের অনুভব; কিন্তু ক্ষণিক সুখ, স্থায়ী নয়, অভিমান ভগ্ন হইবেই হইবে। কেহ বলিতে পারেন—যদি অভিমানসুখের অন্তর্দ্ধানে লজ্জা দুঃখের উদয় হয়, তাহলে অভিমান যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সেই চেষ্টাই ধর্ম্ম। দিবার ন্যায় অভিমানকে ঘোর আয়াসেও বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিবার যো নাই, অন্ধকার আসিবেই আসিবে; প্রতিদিন একথার পরীক্ষা হইতে পারে; শুদ্ধ তর্কেও ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। তাই এই চির-অবিশ্বাসী মিত্রকে পরিত্যাগ করাই সুখ এবং ধর্ম্ম। তার পর, অভিমানে আত্মোন্নতি এবং পরোপকার দুই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, এবং সর্ব্বদাই অপকার ঘটিয়া থাকে।

প্রেমময়ী মিরাণ্ডার (Miranda) চরিত্র-বৈচিত্র্য, চরিত্রমাধুর্য্য এই, যে,

তাঁহাকে আশৈশব বনে রাখিয়া, সংসারের নানাপ্রকার অভিমান শিখিতে দেওয়া হয় নাই; অন্তর্যামী কবিও তাঁহাকে লজ্জাবিহীনা করিয়াছেন।

ঠকিয়া২ শেষ বেলায়, মানব কতক মত বুঝেন যে, অভিমানে পদে২ অনিষ্ট, পদে২ অসুখ। স্বভাব মত নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ক্ষমতা মত চলাই সুখ। সূর্য্যকিরণ ধরিয়া চাঁদ সাজা, আর পরের সুখে সুখী হওয়া কিছুই নয়, বড় বিড়ম্বনা; বুঝিয়া বৃদ্ধ কতক মত নিলজ্জ হইয়া পড়েন। নির্লাজ দেখিয়া, বৃদ্ধের তরুণ তরুণী স্বজনেরা সর্ব্বদা মনে২ বড়ই বেজার হইয়া থাকেন।

লজ্জার স্বরূপ পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা অভিমান সম্বন্ধে দুইচারি কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। জ্ঞানে অভিমানের ধ্বংস, অজ্ঞানেই অভিমানের উদয়, স্থিতি, প্রাদুর্ভাব। ময়ূরপুচ্ছচূড়, উল্কিচিত্রিতানন অসভ্য দলপতি আহার্য্য অন্বেষণে দ্বীপের যে পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই কতিপয় যোজনমেয়া সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও আপনার অপেক্ষা বলশালী দেখিতে পান না; অজ্ঞানময় দর্প কিয়ৎপরিমাণেও ভাঙ্গিবার জন্য দেশান্তরের শৌর্য্য অবিদিত; আবার, মনুষ্যমাহাত্ম্য মাপিতে বলবীর্য্য ব্যতীত, অন্যরূপ মানদণ্ডও যে হইতে পারে তাহাও অজ্ঞাত; অতএব, অসভ্য দলপতি অক্ষুণ্ণ-মহিষগর্ব্বে, অভগ্ন আশীবিষতেজে বিঘ্নকারী উগ্রগতি বায়ুকেও আক্রমণ করিতে তেজ করিয়া উঠেন। কুমারসম্ভবে, তারকাসুরের কথায়, এই আসুরিক গর্ব্বের অতি সুন্দর রূপক-বর্ণনা আছে। অবাধ্য হইলে এ গর্ব্ব বিষধর, পুত্রকেও হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করেন; বরদ হইলে, অভীষ্ট দেবের পূজা করিবেন, বিঘ্নকারী হইলে, দেবতার প্রতিও রক্তচক্ষে খড়্গহস্ত হইতে কুণ্ঠিত নন; শরীরের কোন অঙ্গও যদি অসুস্থ হইয়া কথা না শুনে, কোপোন্মাদে তাহাকেও কাটিতে উদ্যত; প্রশংসার জন্য লালায়িত হন। স্তুতিগীতে ইঁহাকে ঈষত্তুষ্ট করা যাইতে পারে, বাধ্য করা যাইতে পারে না। ভাবেন, স্তুতিসায়ক কর্ত্তব্যই করিতেছে, বাধ্য, চরিতার্থ হইব কেন? পর-প্রশংসা সহিতে পারেন না, শুনিলে, রাগে জ্বলিয়া উঠেন; নিজগর্ব্বানুভব সুখেই পরিতৃপ্ত, গদ্গদ; ইন্দ্রিয় আর দম্ভসুখ ব্যতীত অন্য সুখ জানেন না; আজ্ঞাকারী, সুখদ বলিয়া কন্যাপুত্র চান, ভৃত্য বলিয়া অপরকে চান। এই শুম্ভনিশুম্ভ-কংস-রাবণ-হিরণ্যকশিপুর রাক্ষসগর্ব্ব কদাপি ক্ষুণ্ণ হইলে লজ্জা হয় না, লজ্জা-দুঃখের পরিবর্ত্তে ক্রোধ দুঃখ হয়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে২ এই আসুরিক দর্প সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে। সভ্য-সমাজ হইতে কিন্তু অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। তবে তমসাচ্ছন্ন অসভ্য সময়ের মত এখন তেমন

প্রচণ্ড নয়, আভাঙ্গা কেউটার মত তেমন ভীষণ নয়।

এখন এই গর্ব্ব, যৌগিক পদার্থের মূল ভূতের ন্যায় মিশ্রাবস্থায় নির্জ্জীব হইয়া আছে। জলীয় হইয়া পড়িয়াছে, তেমন খাঁটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও কেহ২ দর্প ভাঙ্গিলে ক্ষণিক লজ্জা ভোগ করিয়াই কুপিত হয়। এখন ও কেহ২ পরপ্রশংসা শুনিলে গর্ব্ব নেশা ছুটিয়া যাইবার আশঙ্কায় বিরক্ত হন। অভিমান ক্ষয়ে লজ্জার উৎপত্তি, ইহা এই আসুরিক দম্ভ সম্বন্ধেই খাটে না। অভিধানে, অভিমান শব্দের প্রতিবাক্য গর্ব্ব, দম্ভ, হইলেও প্রচলিত প্রাকৃতে অভিমানের যেরূপ কোমল অর্থ, প্রায় সেইরূপ কোমল অর্থে আমরা এই প্রবন্ধে অভিমান কথাটি ব্যাহার করিয়াছি। সেণ্টিগ্রেড্ চিত্তোত্তাপ-মানের (গরিমা-তাপমানের) শূন্য অংশে অভিমান, শততম অংশে আসুরিক গর্ব্ব। গর্ব্বিতের গর্ব্বক্ষয়ে ক্রোধ উপস্থিত হয়, অভিমানীর অভিমান ক্ষয়ে লজ্জা উপস্থিত হয়। গর্ব্ব অভিমান দুই সুখ, কোপ লজ্জা দুই দুঃখ। অভিমান মৃদুসামগ্রী, গর্ব্ব অতি তীব্র উগ্র পদার্থ। অভিমান লোকের কথা শুনিয়া লোকের মনোমত হইয়া চলে। পাছে কেহ অক্ষম, হীন, ছোট বলে, এইভয়ে গর্ব্ব, লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না, সকল লোককে নীচ ভাবে, আপনার গুমারে গোঁ মত চলে। অভিমানী, আপন গুণ সংখ্যায় অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান, দেখিয়া, হয় ঢাকিয়া রাখেন, নয় পরিপূরণ করিতে চেষ্টা করেন; গর্ব্বিত, আপন গুণসংখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান না। লজ্জা মনের লুক্কায়িত অভিমান দেখাইয়া দেয়, ক্রোধ লুক্কায়িত দম্ভ দেখাইয়া দেয়। ক্রোধ গর্ব্বের জলন্ত চিহ্নস্বরূপ। সেই জন্য, কতক মত জ্ঞানবান্ হইলেই, আমরা পিতা মাতা গুরুজনের সমক্ষে সাধ্যমত ক্রোধ প্রকাশ করি না এবং প্রকাশিত কোপ লজ্জিত হইয়া সম্বরণ করিয়া লই। গুরুজনের সমক্ষে রাগ করিলেই গর্ব্ব দেখান হয়, গুরুজনের ক্ষমতা ঠেলিয়া ফেলিয়া আপন ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়, গুরুজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়।

গড়ের মাঠের ইডেন পার্ককে কাননহইতে উঠাইয়া আনিবার সময়

বনস্থলীর প্রতি মিস্ ইডেনের উক্তি।

মরি কার নয়ন জুড়াইতে
এত রূপের ছড়াছড়ি——বনস্থলি!
যাই চল রাজ স্থানে,
নেচে বালক যুবতীযুবা সম্ভাষিবে গানেগানে
যাই চল রাজ স্থানে॥
বংশীধ্বনি উঠবে কত,
হেঁসে বালক যুবতী যুবা প্রদক্ষিণে যাবে যত
ভেরীধ্বনি উঠবে কত।
শুধু সঙ্গে নে তোর পাখীগুলি,
তোর হার্‌মোনিয়া মধুর-বুলি;
এমনি মাখবে তারা পুষ্পধূলি॥
শুধু সঙ্গে নে তোর গুল্ম গুলা,
যেন নানা রঙের ছত্র খুলা,
কিবা আপনি বাঁধা ফুলের তোড়া,
যেন পুষ্প ভরা সবুজ ঝোড়া॥
মরি সঙ্গে নে তোর পাদ্য-জল
তনু স্রোতস্বতী নিরমল,
চরণতলে সাপিনী ছলে
থাক্‌বে পোড়ে অবিরল,
যেন ভূমি-তড়িৎ অচঞ্চল॥
আরো সঙ্গে নে তোর তুঙ্গ শাখায়
গুচ্ছ ফুলের লাল চূড়া;
ও তোর লতায় গাঁথা ফুলের দড়া॥
শুধু সঙ্গে নে তোর ফল ফুল,
সেথা বসাইব অলিকুল॥
আমাদেরও শশী অছে—
দিন দিন ফুল ফলে সিনানিতে বিন্দুজলে;
আমাদেরও বায়ু আছে—
তোর পক্কপাতা পাকা চুলে তরেতরে ফেলবে [তুলে
আমাদেরও শশী আছে—
রাত্রে অলি জুটাইতে ফুল কুলে হাঁসাইতে;
আমাদেরও ভানু আছে—
বসাইতে শিশুফলে পড়াইতে পাখীদলে।
মরি কার নয়ন জুড়াইতে
এত রূপের ছড়াছড়ি বনস্থলি!
যাই চল রাজস্থানে,
নেচে বালক যুবতী যুবা সম্ভাষিবে গানেগানে
যাইচল রাজ-স্থানে॥

সাম্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।—স্ত্রীজাতি।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। স্ত্রীগণ ও মনুষ্য জাতি, অতএব স্ত্রীগণ ও পুরুষের তুল্য অধিকার-শালিনী। যে২ কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই২ কার্য্যে অধিকার থাকা, ন্যায় সঙ্গত।

কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন, যে স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্,স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশ সহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই আপততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্য তত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রী পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকার বৈষম্য ন্যায্য হইত,তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকার বৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচার সঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচার সঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে, স্ত্রীপুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায় সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্টমিলকৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমানীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।*

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সর্ব্ব প্রকারে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের মত এই যে স্ত্রী ও পুরুষে সর্ব্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে,স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায়, সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যেপরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের

* *Subjection of Women.*

দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন, দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতা স্বরূপ; দেবতা স্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদূর, যে পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য্য পাতিব্রত ধর্ম্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রতের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু২ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটী বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা, অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা হইয়া থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছা বহুবিবাহ করিতে পারেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না, যে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা

সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এপ্রশ্ন বারেক মাত্রও মনেস্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে তবে, অনেকেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখা পড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, "কেনই বা চাকরি বরিবে না?" তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই যোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন, যে বিদ্যোপার্জ্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, "কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখা পড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রী বিদ্যালয় কই?"

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখা পড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্য তত্ত্বান্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই—লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন, যে পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গণাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীরভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। মেয়েরা মেয়ে কালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? গৃহকর্ম্ম করিবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখা পড়া শিখা যাইতে পারে তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে—কেননা ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই, যে যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, তত

দিন,কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রন্থিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বত্র সমাধিকার বিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে,অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহ কর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহ কর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাদিশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাব সঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্য সঙ্গত নহে। অপরঞ্চ পুরুষগণ নির্ব্বিঘ্নে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ সাম্য সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর একপ্রকার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন "বিধেয় বটে।"

তার পর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে চাকরীর জন্য।* বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন, যে স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখান উচিত।

তার পর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীগর্দ্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা,জ্ঞানোপার্জ্জন,এবং বুদ্ধি মার্জ্জনের জন্যই পুরুষের লেখা পড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।

অতএব বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার করনা কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ,বা গৃহ কর্ম্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার করনা কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্ব্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি,তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে

* সাম্যবাদী বলিবেন, চাকরীর জন্যও বটে।

পারি,যে কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব,স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোনবিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নী বিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয় তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতি গ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "যদি" পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্রকথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারন বুঝা যায়; বিধানের কর্ত্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এসমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াস সাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা

সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন, যে চিরবৈধব্য বন্ধনে, হিন্দু মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ, যে তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন, যে এই এক স্বামীর সঙ্গে২ তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি, এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সেনিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।

৩য়। কিন্তু পুরুষের যতপ্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যতপ্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ, স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা, নিষ্ঠুর জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত, বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্য্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বন্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি!

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধি-

কার? তাহারা কি তোমারই মান রক্ষার জন্য, তোমারই তৈজস পত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ, যে তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হৌক, অসম্মতই হৌক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন, যে স্ত্রীগণ সমাজ মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে দেখ ইউরোপাদি সভ্য সমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন, যে সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দু মহিলাগণ অপেক্ষা ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং কলুষিত স্বভাব বটে।

ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জর নিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দু মহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাঁহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধন ভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা যে চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহু বিবাহ অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষ রূপে বুঝিয়াছেন, যে এই অধিকার নীতি বিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে এস্থানে স্ত্রী গণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজ সংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; পুরুষগণের অধিকার কর্ত্তন করাই উদ্দেশ্য, কারণ মনুষ্যজাতি মধ্যে কাহারই বহু বিবাহে অধিকার নীতি সঙ্গত হইতে পারে না। * কেহই বলিবে না

* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয়, বলিতেছি, কেননা ইহা স্বীকার করিলে রুগ্নের পত্নীর পক্ষেও সেই রূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

যে স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহু বিবাহে অধিকারিণী হউন; সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতি সঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেথানে কার্য্যাধিকারটি অনৈতিক, সে খানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্ত্তিতা এই দুই তত্ত্ব মধ্যে সমুদায় নীতি শাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্ব সমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার একপ্রকার যত্ন, একপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পারে না। এই নীতির যে কারণ হিন্দু শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, যে যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকারী; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ, যে তাহার অযৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করাই নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাব সঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে, যে স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যের কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূল স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র, বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হৌক, কুভাষী, কদাচার হৌক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক—নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্রে তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য

অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ব্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায় বিরুদ্ধ, এবং নীতি বিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে। বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষ পদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে, স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা-পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দু শাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য্য ব্যবস্থা শাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহেন। এ অধিকার কত টুকু? আপনার ভরণ পোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবন কাল মধ্যে আর কাহাকেও কিছু খাইতে দিবেন না, এইপর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণ রক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এবৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থির মতি, বিষয় রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এজন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায়, পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয় রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয় কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে

মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্ত্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। সম্প্রতি হাইকোর্টে একটি মোকদ্দামা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই অসতী স্ত্রী,বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যা! এত কালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্ব ধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবেনা! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্ম্মস্থানে বাজিয়াছিল যে হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদ পত্র, "হা সতীত্ব! কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা স্বরে রোদন করিয়া, "ওরে চাঁদা দে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না, কেন না দেশী সম্বাদপত্র-পাঠ সুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হৌক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্ম ভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলই বিষয় পাইবে,কেন না তাহারা পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্ম শাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমন তর?

স্ত্রীজাতির সতীত্ব ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল,কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদার নিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? ভূরি২ নিষেধ আছে, সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু২ নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই।

কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোক সমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোনপ্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জ্জন করিতে পারেন না। সত্য বটে, উপার্জ্জনকারী পুরুষেরা আপন২ পরিবারস্থা স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এদেশে আছে, যে তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমত কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গ বিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোক বিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রীকন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহারা তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তাহার দেশী সমাজের রীত্যানুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জ্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া, বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী; এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প, বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহ মধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এদেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী, বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই

সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছু হয় নাই। দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। স্ত্রীলোকদিগের উপকারার্থ একটি সম্প্রদায়, দলবদ্ধ হয় না কি? আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ সংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না, কেন না তাহাতে রঙ্ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না, কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে, কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র।

যুবরাজের সঙ্গে যেসকল "স্পেশিয়েল" আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে এক জন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন তবে আমরা নাচার হইব। সম্বাদ পত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে কিছু বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্বাদ

পাইবেন এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এ দেশের নাম "বেঙ্গল।" এনাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশীলোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে? তাহারা বলে পূর্ব্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও "বাঙ্গাল" বলে, এজন্য এদেশের নাম "বাঙ্গালা।" কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম "বেঙ্গল"—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব একথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার বোধ হয় বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল্ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম "কালকাটা" (Calcutta) "কাল" এবং "কাটা" এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম "কালকাটা"

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল, কেননা সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংশ্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত; এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ২ আমাদিগের মত পেণ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব, দেখ, ব্রিটিষ রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কিপরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে আমি কয়দিনে

বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই। তবে, কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা খেলা করেন। পরিশেষে, তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু২ বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাই কোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিষমিষকে ডিষমিষ, রেলকে রেল, ডোরকে দোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবৎগীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পরে, কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর, মনোযোগ করিলে, এবিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষ মূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।*

যাহা হৌক, ইহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ, যে হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি;

* Dr. Lorinzer &c.

* সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

১। ব্রাহ্মণ

২। কায়স্থ

৩। শূদ্র

৪। কুলীন

৫। বংশজ

৬। বৈষ্ণব

৭। শাক্ত

৮। রায়

৯। ঘোষাল

১০। টেগোর

১১। মোল্লা

১২। ফরাজি

১৩ রামায়ণ

১৪। মহাভারত

১৫। আসাম গোয়ালপাড়া

১৬। পারিয়া ডগ্‌স

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেক গুলিন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি কোন জাতি? সকলেই বলিল তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না, কেন না আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষ মূলরের গ্রন্থে* পড়িয়াছি, যে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে, যে "Mitra" শব্দ "mitre" শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে২ তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদা নিশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সর্ব্বত্র নয়। যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবানে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিস্‌টিতে দুই একখানা সোনার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

* *Chips from a German Workshop*

শুধু নয়নবানে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবান প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে,কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আমি জানি না; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুরাকাঙ্ক্ষিনী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন, "কিছার মিছার ধনু, ধরে ফুলবান;" এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে "কিছার মিছার ফুল, মারে ফুলবান।" যাহা হউক, ফুলবান সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইংরেজ টেঁকা ভার হইবে —আমার সর্ব্বদা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দুটাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে কখন, বঙ্গকুলকামিনীপ্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না, যে সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস্, অথবা সকলই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি ভর্ত্তৃনিয়োগানুসারেই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্ত্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটী বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোক নামক বেদে (আমি এসকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি,

ইহার অর্থ এই হে পদ্মপলাশ লোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর!

উড়িষ্যার পথে প্রভাত।*

(১)

উঠ উঠ রাতি পোহায়;
শুক্ল—ত্রয়োদশীর সোনার চাঁদ
একলা ফেলে ঐ পালায়,
ভেবে—ঘুমুয়ে আছে বসুমতী
ধীরি ধীরি চোর পালায়॥
কিবা—বহুরূপী নিশাপতি—
ভানুর বাঁকে অস্ত যায়

* নীলগিরিমালা বালেশ্বর হইতে পুরীযাত্রী পন্থার কিয়দ্দূর পশ্চিমে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে—এই পথের উপর অশ্ব-শকটে শুক্ল ত্রয়োদশীর তিমিরশেষা রাত্রির প্রভাত বর্ণন।—ছন্দঃমাত্রাবৃত্ত।

ধরিয়ে—ঢল ঢল লাল শোভায়
ভানুর যাঁকে অস্ত যায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥
শশী—প্রণয় কিরণ জাল গুটায়,
ঝাটান—আঁধার রাশি ফের ছড়ায়,
ধরার মুখে কালি মাখায়,
চেয়ে—ম্লানমুখী দেখ ধরায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥
জ্বলন্ত—অঙ্গার যেমন তুলে শিখায়,
শেষে—নির্ব্বাণমুখে শিষ গুটায়,
তথাপি—লাল রমণে চোক্ জুড়ায়,
তেমনি—অর্চ্চিহীন দেখ চাঁদায়,
অর্চ্চিহীন দেখ শোভায় ॥
শশধর—অদ্রি চূড়ায় ঐ দাঁড়ায়,
রক্তিম—অঙ্গার যেন গিরি চূড়ায়,
শৈল—অগ্নি গিরি প্রায় বুঝায়,
এই ছিল যে—গেল কোথায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

(২)

হুলু দেয় শৃগাল গণে
হেরে—অন্ধকার প্রাণ সখায়;
গর্জ্জায়—সহায় পেয়ে গিরি গুহায়
বৃক—অকারণে কোপ জানায়, চোক রাঙায়
কর্কশ—আঁধার মানিক চোক জ্বালায়,
নৃশংসের—ক্ষমতায় রাগ যোগায়;
হরিণীর প্রাণ শুকায়,
অগ্রপদে চট চটায়;
নিশাচর—সুপ্তলোভ ফের জাগায়,
বনস্থলী—মর মরায় খস খসায়;
পক্ষিণী—পাখীর কোলে মুখ লুকায়,
চট নিদ্রায়;
বাছার মা—কোলে ঢেকে নেয় কুলায়
নিদ্রাচোকে দীন বাছায়;
স্ত্রীজাতির—আপন প্রাণের ভয় ভুলায়
মা হোলেই মার মায়ায়;
বানরপাল—চকিত মনে রয় শাখায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায়
মন্ত্রণা—পেটুক কথার শেষ নিশায়
আধ নিদ্রায়,
কিচির মিচির বাক জুড়ায়।
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥

(৩)

ভানুপ্রিয়া ঊষা সতী
প্রাচীদ্বারে জল ছিটায়,
শীতল আলোক জল ছড়ায়;
গ্রাম্য বৌয়ে কায শিখায় ॥
উঠ উঠ রাতি পোহায় ॥
সাহস—আলোক সাথে এল ধরায়;
ফুল ফুটায়, বায়ু খেলায়,
কোক মিলায় কুহু তুলায় ॥
সাহস—কোলাহলে দিক্ জাগায়,
পাখিকুল—কোলাহলে বন মাতায় ॥
এবার—জোলো আলোয় দিক্ ভাসায় ॥

8

ঐ লাল রতন দিন ফুটায় ॥
ঢেকেছে—দিনমণি কাচ বসনে
সাঁওতাল গিরির নীল আভায়;
হাঁসি পায় ল্যাঙটা গিরির
চিকণ বাসের সভ্যতায় ॥
চলেছে—দলেবলে নীল গিরি
লক্ষ মাথায় উড়িষ্যায়
যেন—তরঙ্গিতা দেখ ধরায়

তুলেছে—দেখা দেখি বসুমতী
ঢেউ মালায়
শকটের উল্টা দিকে
মৃত্তরঙ্গে দেশ্ ছুটায়্॥
(৫)
রৌদ্রের্—তীক্ষ্ণ প্রভায়্
প্রভাত্ কুসুম্ দেখ শুকায়্॥
বসিয়ে—দ্বারদেশে রৌদ্র সাথে
দিনের্ কাম্ তোর্ অপেক্ষায়্
নীরবে—দলে দলে দিনের্ সাথে
দিনের্ কায্ তোর্ অপেক্ষায়্
উঠউঠ দিন্ ফুরায়্॥

পলাশির যুদ্ধ।*

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেন না ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়,মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।* যাহা হউক মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য্য নাই; নবীন বাবুর গ্রন্থের কথা বলি।

* আমরা এরূপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়ে২ এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া, আমরা বড় অপ্রতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ· উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুঝিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্য্য সাহিত্যে আর্য্য দর্শনে, আর্য্য ভাস্কর্য্যে, বা আর্য্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার লিখিয়াছিলাম, যে শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্ব্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী! আর এক খানি গ্রন্থ সমালোচনা কালে, লেখক যেসকল পচা পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বিত পুনশ্চর্ব্বিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, "আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব

* পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীনবীন চন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

প্রথমসর্গে, নবদ্বীপনিবাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয় প্রধান ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বসিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং নবীন বাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে! দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সিরাজউদ্দৌলার রাজ্য বর্ণন—

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায়;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন;
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন;
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে,
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সদন;
সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।"

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে তাঁহারই বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু যবনে যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক নিম্নোক্ত উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম—

নাহি বৃথা জাতি দ্বন্দ ধর্ম্মের কারণে—
অশ্বত্থ পাদপজাত উপবৃক্ষমত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত॥

ষড়্‌যন্ত্রে এই স্থির হইল যে ইংরেজের সাহায্যে অত্যাচারী সেরাজউদ্দৌলাকে দূর করিতে হইবে—সেরাজের সেনাপতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী। ইংরেজের সাহায্য যাহা হইবে, তাহা দৈবী বাণীর ন্যায় কথা পরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন পরে নিজমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন—

"আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ!—
অসহ্য দাসত্ব যদি; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ;—এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমনী।"

আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!" কি দুঃখ!

এইস্থানে ক্লাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথানুসারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কতকগুলি বাঙ্গালা সম্বাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

"ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ? সত্য সেঠবর!—
'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পন্থে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার!!"

বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শ মত কার্য্য হইল না। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গহইতে এই কাব্যে, কবিত্বকুসুম এরূপ প্রভূতপরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে, যে কোন স্থান উদ্ধৃত করিবে, সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরতা পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি। এইরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্নসকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন।

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্যের নদী পার হওয়ার চিত্র, তপনচিত্রিত ফটোগ্রাফতুল্য—এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত রশ্মি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপরাহ্ন হইয়াছে—

খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস্-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র ব্রিটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলমলে;
দূরহতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন্,
হেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব 'বিপুল' ঝঙ্কার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহঙ্কার।

সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে। গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইব তরুতলে বসিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তিত। ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকতা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি

শঙ্কিত। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি, যথার্থ কবির সৃষ্টি; রাজলক্ষ্মীকে কবি এক অপূর্ব্ব মহিমাময় শোভায় পরিমণ্ডিত করিয়াছেন।

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন, সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ,
ঘ্রাণে নর অমরতা করে অনুভব।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায়খচিত
জ্যোতি রত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে।

তাঁহার বাক্যগুলি আকাশপ্রসূত মেঘধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস! অতি ভয়ঙ্কর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্ত্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্ব্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস! গণনার স্থল।"

ক্ষুদ্র২ বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিত্ব প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিত্রটি দেখ—

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল;
স্থির ভাগীরথী জল করি উচ্ছসিত,
অমনি ব্রিটিস্ বাদ্য বাজিয়া উঠিল;
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশি খানি ভাঙিল গড়িল;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় "জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—"

ঐতরণীর নাবিক দিগের গীত অতি মনোহর—বাইরণের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বাইরণকৃত নাবিকদস্যুর গীত মনে পড়ে।*

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।

* *The Corsair.*

নবআবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্য্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্ত্তি না আছে কোথায় ?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

সম্পদ সাহস ;সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার;
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈষা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ? কোন্ অর্দ্রিপতি?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়?"

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ব্রিটিসতনয়?
কেবল ব্রিটিসললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়;
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে; চল রণে তবে;
হায়! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্ত্তা বামাগণে যবে,
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান,
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান;
ব্রিটিসের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্দ্ধপথে রয়;
কিছার দুর্ব্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সিরাজদ্দৌলার শিবিরে নৃত্য গীতের ধূম পড়িয়াগিয়াছে। এমত সময়ে,সহসা,ইংরেজের বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বাইরণ কৃত,ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে—

"There was a sound of revelry
by night" &c.

নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাইরনের যোগ্য—

বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল!

তোপের শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল—সিরাজদ্দৌলা ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়বিহীন, দুর্ব্বল, ভীত চিত্ত, অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের আশ্লেষণ† শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন

† Synthesis.

নাই বটে কিন্তু এই স্থলে বিশ্লেষণ‡ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব, আপনার কর্ম্মফল ও চরিত্র-দোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমূঢ় হইয়া, মীরজাফরের শরণ লইব বলিয়া দৌড়িলেন, কিন্তু ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহময়ী মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এদিকে, এক ব্রিটিস্ যুবক—

প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!

ইত্যাদ্য এক সুমধুর গীতিধ্বনি বিকীর্ণ করিতে লাগিল—এইরূপে রজনী প্রভাতা হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে২ হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশীতে আসিল এই মাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, এসকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধ বর্ণনা অতি সুন্দর—

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁকাল সঘনে।

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

খেলিছে বিদ্যুৎ এক ধাঁধিয়া নয়ন!
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

‡ Analysis.

ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মির্ মদন পতন!

"হুর্‌রো, হুর্‌রো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ।

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন?"

তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর। সত্য ইতিহাসে ইহা কীর্ত্তিত আছে, যে হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল পলাশির ক্ষেত্রে ক্লাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিলেন, এবং যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন,তবে ভারত সাম্রাজ্য অদ্য কে ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। যবনসেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহনলাল তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া আপনি পাঠ করিবেন।

তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল আবার রণ হইতে লাগিল—কিন্তু এমত সময়ে শঠ মিরজাফরের পরামর্শে নবাব রণস্থগিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বিগুন বল করিল—

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত সমন।

কারো, বুকে কারো পৃষ্ঠে,কাহারও গলায়
লাগিল; শঙ্গিন ঘায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেল রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর।

ইংলণ্ডের রণজয় হইল—সূর্য্যাস্ত হইল —কবি সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া নিজমনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইলড হেরল্ডে বাইরণ সচরাচর এইরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণন কাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে,

পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্য্যের গতিরোধ করা কর্ত্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের কার্য্য অতি মন্দগামী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, সিরাজ-দ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ, বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল, কাল্পনিক, অতি প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস, বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছা ক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্যকর্ত্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র সৃষ্টিবৈচিত্র, সঙ্ঘটন করা, কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তিপ্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই এক খানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনা এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয় গিরিনিরুদ্ধ, অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরণ স্বয়ং এক স্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবুর কবিতার বেগসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

* * *

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame.

I cannot prate in puling strain
Of ladye-love and beauty's chain:
If changing cheek and scorching vein,
Lips taught to writhe but not complain,
If bursting heart, and madd'ning brain,
And daring deed and vengeful steel
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign*

নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময়, সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বাইরণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরণের ন্যায়, তাঁহারও শক্তি আছে, যে দুই চারিটি কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া, বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।

* The Giaour.

রাধারাণী।

১

রাধারাণী নামে এক বালিকা, মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভালছিল—বড় মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দামা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দামা; মোকদ্দামাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া, ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পত্তি, ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহাছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া, কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এজন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না, বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মূষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষুঃবারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে২ আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে২ উঠিতেছিল—আবার কাঁদিতে২ আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী

বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমত সময়ে অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,

"আমি দুঃখীলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথা গিয়াছিলে?"

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। কিন্তু অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথা?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল, যে রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি?"

রাধা। রাধারাণী

"হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?"

তখন সে, কথায় কথায়, মিষ্ট২ কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল, যে মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে লইয়াগিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতে ছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছে তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে আমাকে যে এত যত্ন করিয়া, হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি

প্রকারে? তা, নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা, সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় ২ ঠেক্‌চে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না ছুইটা বৈ দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্ চক্ কর্‌চে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্ চক্ কর্‌চে।"

রাধা। তা, আচ্ছা ঘরে গিয়ে, প্রদীপ জেলে যদি দেখি, যে পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে, তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে, আসিয়া উপস্থিত হইল। সে খানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তার পর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া, চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুণ জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া, রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে, সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা। এখন কি হবে!"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে। সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি—দানগ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় শোর গোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ার মুখো কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটীর, বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিক-

টেই পদ্মলোচন শাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—সেই পোড়ার মুখো কাপুড়ে মিন্সে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ওমা! আমার কিসের কাপড়!"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ার মুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল, যে এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এসো।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁগা, পদ্মলোচন!"—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেক বারই ইহাদিগের নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন, চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বার আনা, আর দুই আনা মুনফা লইয়াছিলেন—

"হাঁ পদ্মলোচন—বলি সে বাবুটিকে চেন?" পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া, প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিস্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা, দেখিয়া বলিল—একখানা নোট!

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা, বলিলেন, "হাঁ। তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, লেখা আছে "রাধারাণীর জন্য।"

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা!"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন, মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু

শ্রীরামপুরে, বা নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে রুক্মিণীকুমার রায়, কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

২

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগহইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন; এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে, বিলাত হইতে সম্বাদ আসিল যে প্রিবি কৌন্সিলের আপীলে তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টে উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সম্বাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসম্বাদ শুনিয়া, রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসম্বাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ, যে রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি, আমার এই অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব?"

কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্র লোক। এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন, যে যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহয্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণী কুমারের দান গ্রহন, তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহন।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই, যে তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন। বলিলেন,

"আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজন, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায়, তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু তিনি, কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, যে এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্রজনিত—এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাঁহার সম্পত্তি দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে, কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা করিতে লাগিলেন।

বাঁকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর

বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিতা করিলেন।

৩

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা, বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে, রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত,সলজ্জভাবে,অথচ অল্প হাসিতে২ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সেকি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কিপ্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রের বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল,পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যা বাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,

"রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণী কুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবি দাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স তাহা কেহ জানি না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুক্মিণীকুমার বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সে সেই রাত্রিঅবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে,রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া,প্রত্যহ মনে২ পূজা করে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই,যে দিন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে,তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যাবাবু মনে২ বলিলেন,"বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু

প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যাবাবু, রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে২ আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সম্বাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণী বাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না।

শ্রীইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কই, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর, রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যা বাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলেন, মনে করিলেন। কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধাদির পর, রাধারাণী, আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণা স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যা বাবুর বিচক্ষণতা হেতু, রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল। বিষয় হস্তে লইয়াই, রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন, যে এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে, একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হৌক—"রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দারিদ্রাবস্থায় নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া, শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সেগ্রামে তাহার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজগ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

৪

দুই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্র লোক, সেই অনাথনিবসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, গম্ভীর, এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রসাদের"

দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একাহার বাড়ী?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে। এখানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে "রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ বলে।'"

অগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন দুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন,

"বন্দবস্ত দেখিয়া, আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছে? রুক্মিণীকুমার কি, তাঁহার নাম?"

রক্ষকেরা বলিল, "শ্রীমতী রাধারাণী দাসী এই অন্নচ্ছত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে রুক্মিণীকুমারের প্রসাদ বলে কেন?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কার নাম?"

"কাহারও নয়।"

"যে রাধারাণী দাসীর নাম করিলে, তাঁহার নিবাস কোথায়?"

রক্ষকেরা, সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা বলিতে পার, এই রাধারাণী সধবা না বিধবা?"

উত্তর "সধবাও নন্—বিধবাও নন্—উনি বিবাহ করেন নাই। বড় মানুষের মেয়ে—উঁহার কেহ নাই—কে বিবাহ দিবে?"

প্রশ্ন—"উনি পুরুষ মানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন? রাগ করিও না—এখন অনেক বড় মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে২ রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

রাধারাণী।

৫

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালি ভদ্রলোকের মত; বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলিতে একটী হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কর্ম্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন, কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ান্‌জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার হস্তে একখানিপত্র দিলেন, বলিলেন,

"এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ান্‌জি বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা, আবার অল্পবয়স্কা। এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন, যে কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে, আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিল, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ান্‌জি পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনি!

"এব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত২ ঘটে আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যা বাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না—পত্র অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইলেন। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া, একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, যে তাঁহার বর্ণটুকু গৌর—স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর; তাঁহার শরীর দীর্ঘ, এবং ঈষৎ স্থূল; কপাল দীর্ঘ; অতি সূক্ষ্ম পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু, বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ, সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত, এবং নিবিড়কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র, এবং কোমল; গ্রীবা, দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলিগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি

শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত। পরিচারিকা মনেং বাসনা করিল যে যদি কোন পুরুষ কখন আমাদের মুনিব হন, তবে যেন ইনিই হয়েন।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকা বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয় আপনি জানেন।"

আগন্তুক,একখানি অতিপুরাতন সম্বাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমারের সেই বিজ্ঞাপন! রাধারাণী, দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়াং নারিকেল পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু!"

আগন্তুক বলিলেন, "না।" "না" শব্দ শুনিয়াই, রাধারাণী, ধীরেং আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়াগেল। আগন্তুক বলিলেন, "না। আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম—তাহা হইলে, কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিল,"যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতুকের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটি গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নামটি

রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?”

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—“যথার্থ রুক্মিণীকুমার নামধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি—সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম—কিন্তু কামাখ্যা বাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।”

“পরে?”

“পরে কামাখ্যা বাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই ত্রুটির ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিয়াছিলাম। কৌতুক বশতঃ বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গ ক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যা বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা বাবুর পুত্র বলিলেন, যে রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। যে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—” বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল,

“সে পোড়ারমুখীর কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।”

আগন্তুক উত্তর করিলেন, “তাঁহাকে গালি দিবেন না। যদি সংসারে কেহ সোনামুখী থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র সরলচিত্ত, এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত! বর্ষে২ অপ্সরার বিনা বাদ্যে, যেন কথা কহিতে বাধ২ করে, অথচ সকল কথা, পরিষ্কার সুমধুর,—অতি সরল! আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই!”

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমারই বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে২ বলিলেন, “আবার আজবুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি!”

রুক্মিণীকুমার মনে২ ভাবিতেছিলেন, আজি এতদিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম কিন্তু আজিও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে! যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই রাধারাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ! কোথায় সেই দীনদুঃখিনী কুটীরবাসিনী ভিখারিণী, আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদবিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভালকরিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে সে সুন্দরী কি কুৎসিতা,

কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া২, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা নগনদীচিত্রিতা জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ব্রীড়াময়, এমন, আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহূর্ত্তে২ অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্তপর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখন দেখি নাই, কখন আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিল,—বড়কষ্টে বলিতে হইল, কেন না চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—রাধারাণী বলিল, "তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচজন, রসিকা, প্রেমিকা, বাক্চতুরা, বয়োধিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচজনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে্য এমন করে্য কথা কয় গা?

রাধারাণী মনে২ একটু পরিতাপ করিল, কেন না কথাটা একটু ভর্ৎসনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,

"তাই বলিতেছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা

হইল, যে যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!”

“তোমার রাধারাণী!” রাধারাণী ছল ধরিয়া হাসিল।

হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে ছল ধরিল—“তুমি হইয়াছি—আপনি নই।” প্রকাশ্যে বলিল, “আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।”

রাধারাণী বলিল, “হৌক, আপনারই রাধারাণী।”

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাখ্যা বাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবল বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।’ যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয়, ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি। আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, ‘কেন রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।’ এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন, যে ‘এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন। স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন।’ আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?”

রাধারাণী বলিল, “করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে ইহাই বলি, যে আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে তাহা আমি চিনি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না?”

রুক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন কেবল নিজদত্ত অর্থ বস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন,

"এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিব কি? আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহাহইলে, আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্না দেখিয়া অবশ্য তাহার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপন্থে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্পছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম। কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রা। আপনি রাধারাণীকে যেরূপ ভাল বাসেন দেখিতেছি, তাহার কারণ জানিবার জন্য আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে। স্ত্রীলোকে অমন ব্যস্ত হইয়াই থাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয় সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য, রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে, তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আর কি দিব? একখানা ক্ষুদ্র-নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রাধা। আমার অতি সামান্য একটা প্রয়োজন আছে। আসিতেছি। একটু অপেক্ষা করুন্।

সেই নোটখানি রাধারাণী অদ্যাপি যত্নে রাখিয়াছিল—তাহা বাহির করিয়া আনিল। আসিয়া বলিল,

"নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।"

রু। না, আমি পেন্‌সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য।" তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, "রুক্মিণীকুমার রায়।" যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য এত কাতরা তাহাকে এত দিন দেখা দেন নাই কেন? সেই রাধারাণী সেই রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এই দেখুন।

এই বলিয়া রাধারাণী সেই নোটখানি রুক্মিণীকুমারের হাতে দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া বলিলেন, "প্রভু, সে দিন তুমি আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে। এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা।"

৬

রাধারাণী যুক্তকরে বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন,আপনার যথার্থ নাম রুক্মিণীকুমার নহে। আমি যাঁহাকে আরাধ্য দেবতা মনে করি, তাঁহার নাম জানিতে বড় ইচ্ছা করে।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধা। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ন রায়ের নাম শুনিয়াছি।

রু। লোকে অমন সকলকেই রাজা বলে। কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিলেই আমার যথেষ্ট সম্মান হয়।

রাধা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল; আপনি আমার স্বজাতীয় জানিয়া, স্পর্দ্ধা হইতেছে যে, আপনাকে আজি আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে বলি।

রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "আমি না ভোজন করিয়া তোমার বাড়ী হইতে যাইব না।"

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ান্‌জি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাসময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন,

"বহুদিন হইতে আমার প্রত্যাশা ছিল যে একদিন না একদিন আপনার দর্শন লাভ করিয়া আপনার পূজা করিব। কিছু পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই হারছড়াটি অতি সামান্য, কিন্তু আমি দিয়াছি বলিয়া রাণীজি যদি ব্যবহার করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই।" এই বলিয়া, রাধারাণী এক মহামূল্য বহুশত বৃহদাকার হীরকখণ্ডখচিত, গ্রন্থিত নক্ষত্রমালা তুল্য প্রভাশালী, হার বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন

"রাণীজি? রাণীজি কেহ নাই। দশবৎসর হইল আমার পরিবার গত হইয়াছেন। আর আমি বিবাহ করি নাই।"

রাধারাণীর মাথা ঘুরিয়াগেল। বহুকষ্টে,

মন স্থির রাখিয়া—মন ঠিক স্থির রহিল, কথা শুনিয়া এমনও বোধ হয় না—রাধারাণী বলিল,

"যাহা আপনার জন্য গড়াইয়াছি, তাহা আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অনুমতি করেন ত ও হার আপনাকেই পরাইয়া দিই।"

এই বলিয়া রাধারাণী হাসিতে২ সেই নক্ষত্রমালা তুল্য হার দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইয়াদিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে এইরূপ সজ্জিত দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"এহার আমারই হইল?"

রাধা। যদি গ্রহণ করেন।

দে। গ্রহণ করিলাম। এখন আমার বস্তু আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে পারি?

রা। যাহা আপনার যোগ্য নহে, তাহা অন্যকে দান করাই রাজাদিগের রীতি।

দে। এ হার আমার যোগ্য নহে—অথবা আমি ইহার যোগ্য নহি। তুমিই ইহার যোগ্য—তোমাকেই এ হার দান করিলাম।

এই বলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই হার, রাধারাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন।

রাধারাণী অসন্তুষ্ট হইল না। মুখনত করিয়া, মৃদু২ হাসিতে লাগিল; এক২ বার মুখ তুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখপানে চাহিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ বুঝিলেন। বলিলেন,

"আমি ওহার লইব না, তাই তোমায় দিলাম। আমায় অন্য একছড়া দাও?"

রাধা। কোন্‌ছড়া?

দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার গলায় যে ছড়া আগে হইতে আছে।"

রাধারাণী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চিত্রে, ওখানে আছিস কি?"

চিত্রা, অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। বলিল, "আছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "তোর শাঁকটা কোথা?"

চিত্রা বলিল, "এইখানে আছে।"

রাধা। তবে বাজা।

এই বলিয়া রাধারাণী, আপনার নিজের হার, গলা হইতে খুলিয়া, দেবেন্দ্রনারায়ণকে পরাইয়া দিলেন।

চিত্রা, উচ্চরবে শাঁক বাজাইল।

তারপর রীতিমত বিবাহ হইল কি? হইল বৈকি। বসন্ত আসিল, তাহার ভাইয়েরা আসিল, রাজা দেবেন্দ্রের কত লোক আসিল—কিন্তু অত কথা আর তোমাদের শুনে কাজ নাই।

সমাপ্ত।

চৈতন্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিদ্যা বিলাস

এক্ষণে চৈতন্য নবযৌবনে* পদার্পণ করিলেন। শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকসিত-প্রায় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মনের বৃত্তি সমুদয় প্রস্ফু-টিত হইয়া সতেজ হইল। নবীন উৎ-সাহ ও বলে মন বলশালী হইল। কল্পনা ভবিষ্যৎ জীবনের মধুময় চিত্র গঠন করিয়া নানাবর্ণে বিভূষিত করিল। আশা ভরসা ভাবী খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে প্রধাবিত হইল। চৈতন্য একান্ত হৃদয়ে যত্ন ও একাগ্রতাসহ বিদ্যোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং শীঘ্রই গঙ্গা-দাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীর মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে সর্ব্বোচ্চস্থানে অভিষিক্ত হইলেন।

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর।
রত্রিদিন বিদ্যাভ্যাস নাহি অবসর॥
ঊষাকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্য করি সাথ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥

* * * *

প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঁই পুথি না চিন্তায়॥

মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি চতুষ্পাঠীর অন্যান্য শিষ্যগণ চৈতন্যের ব্যাকরণের শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইল। এবং যদিও চৈতন্য সমপাঠী ছিলেন, তথাপি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাই।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাই॥

চৈতন্যভাগবতে মুরারি গুপ্তের উক্তি।

সমপাঠীদিগের প্রশংসাবাদে চৈতন্যের কর্ণ বধির হইল এবং অহঙ্কারে মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। চৈতন্য ইঁহাদিগের কতি-পয়কে লইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিলেন। এই নবীন চতুষ্পাঠীতে নবদ্বীপবাসী আরও অনেকে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

চৈতন্য কিরূপে সমপাঠীদিগের উপর এতাদৃশ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। সুতরাং বোধ হয় ব্যাকরণ ব্যতীত কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না। চৈতন্য ভাগবত † ও চৈতন্য চরিতা-

---

* শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন মোহন।
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
চৈতন্য ভাগবত ৬২ পৃ।

† চৈতন্যের প্রতি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের উপদেশ। "তোমার পিতা পিতামহ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন তুমিও বিদ্যো-পার্জ্জন কর।"

মৃতের‡ কোনকোন স্থলে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

মনুষ্য যাহা সর্ব্বদা দেখে, প্রায় তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিলে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাতে আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাবত্তা সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা সেরূপ নহে। চৈতন্য একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক বৃত্তি সাধারণ লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে অধিক। চৈতন্য জন্ম হইতে মহাপুরুষ।† আবার বাল্যকাল হইতে মনোবৃত্তির বিচালন হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অলোকসামান্য প্রতিভার তেজে তাঁহাদের মন যে বিমোহিত ও ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আডাম স্মিথ* বলেন অসাধারণ গুণ অথবা বিভবসম্পন্ন লোক দেখিলে আমরা হতজ্ঞান হইয়া, অনন্যোদ্দেশে তাহার নিকট নতশির হই। ইহা মনুষ্যের নৈসর্গিক, ধর্ম্ম এই জন্যই পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্কারক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ একজীবনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ যে জন্য কার্লাইল মহম্মদের ভক্ত, মিস কব পার্কারের ভক্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শনসমাজ কোম্‌তের ভক্ত, সেইকারণে চৈতন্যের সমপাঠীসম্প্রদায়ও তাঁহার ভক্ত ও তাঁহার অপূর্ণতাতে অন্ধ।

চতুষ্পাঠী সংস্থাপন হইলে চৈতন্য একমাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে কালযাপন করিতে লাগিলেন, অনন্যমনা হইয়া একমাত্র বিদ্যাপরায়ণ হইলেন। দিনে দিনে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল। এই সময়ে চৈতন্য জ্ঞানোপার্জ্জনই জীবনের মুখ্য কার্য্য ভাবিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সভাজয়, দিগ্বিজয় প্রভৃতি, কল্পনাদ্বারা মানসপটে চিত্রিত করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ, জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিতের জন্মপরিগ্রহ দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন।

দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ বিষাদমনে ভাবে নিরন্তর॥
হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিবে বিদ্যায় করিলে কাল বশ॥

‡ দিগ্বিজয়ীর সহিত চৈতন্যের কথোপকথনে চৈতন্য স্বয়ং অনভিজ্ঞতা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রাখর্য্যে দিগ্বিজয়ীকে পরাভব করেন।

† জন্মকালে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য থাকে। কার্লাইল প্রভৃতি ইউরোপীয় অনেক প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীলব্যক্তি এবিষয় স্বীকার করেন। অস্মদ্দেশীয় ভাগবত প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেরও এই মত। বস্তুতঃ সংসারে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা মানসিক ক্ষমতার নৈসর্গিক তারতম্য দেখিতে পাই।

* *Theory of Moral Sentiments.*

চৈতন্যের মনে কি এপর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হয় নাই? বৈষ্ণবগ্রন্থকারেরা "হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস" এই চরণ দ্বারা স্পষ্টতঃ হয় নাই বলিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরে "পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যমের সমান" এই চরণ দ্বারা চৈতন্যের তাৎকালিক ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা শেষমতেরই পক্ষপাতী, এবিষয় উত্তরোত্তর এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। তবে এই মাত্র বোধ হয় বালস্বভাব চৈতন্যের পরিণতবয়স্ক বৈষ্ণবদিগের সহিত বিশেষ আনুগত্য ছিল না; বিশেষতঃ বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার সমধিক সহানুভূতি ছিল এতাবৎ ধর্ম্মের উপর একান্তহৃদয়ে যত্ন ও আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

একদা একজন দিগ্বিজয়ী বহু দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী জয় করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিলেন। চৈতন্য এতাবৎ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন এব্যক্তি নিতান্ত সাংসারিক জ্ঞানশূন্য অন্যথা দগ্বিজয় করিতে নবদ্বীপ আসিবে কেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইহাকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ* করিবে। চৈতন্য এই চিন্তায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এবং একদা সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার নাম ও বিদ্যাবত্তা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দর্শনমাত্র সাদর সম্ভাষণে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষণেক পরে চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার একটী স্তব পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। দিগ্বিজয়ী গঙ্গার স্তবপাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, চৈতন্য তাঁহার ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিলেন। দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের আপত্তির যাথার্থ্যানুভব করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। এইরূপে যত প্রস্তাব উপস্থিত হইল দিগ্বিজয়ী চৈতন্যের নিকট পরাভূত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ হাসিতে উদ্যত হইলে, চৈতন্য ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। কোমলহৃদয় চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে মনঃক্ষুণ্ণ দেখিয়া যারপর নাই অনুতপ্ত হইলেন এবং নানারূপ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রফুল্লচিত্ত করিলেন। দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হইলেন। অনেক পণ্ডিত তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে আসিয়া পরাভূত হইলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ বলেন চৈতন্য সকল পণ্ডিতকে জয় করিলেন। আমরা এ বাক্যে বিশ্বাস করি না, যেহেতু তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে অধিকার রঘুনাথ শিরোমণির তুল্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তুল্য থাকার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তিনি যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে একাধিপত্য করিয়াছেন উপ-

* পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়িগণ প্রতিশ্রুত হইত পরাভূত হইলে সর্ব্বস্ব দিব।

† চৈতন্যচরিতামৃত ১ম খণ্ড।
চৈতন্য মঙ্গল।

রোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ও দর্শন ও স্মৃতিতে তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, দিগ্বিজয়ী পরাভূত হইয়া একদিন নিশিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, বাগ্‌দেবী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন "তুমি যাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ সে মনুষ্য নহে, অখিলনাথ। বিপ্রবর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চৈতন্যের নিকট আসিয়া গলবস্ত্রে নানারূপ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। একথা সত্য হউক বা নাহউক দিগ্বিজয়ী "গৌড়, ত্রিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, লাহোর, কাঞ্চিপুরী হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উড়্র প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া যে একজন বালকের নিকট পরাভূত হইলেন, তাঁহাকে অলোকসামান্য জ্ঞান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চৈতন্য দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন বৃথা বিদ্যাবলে মোক্ষ হইবে না, তুমি যাবজ্জীবন কৃষ্ণের চরণ সেবা কর।

যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়।।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি মনোবৃত্তি রয়।।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর

বালকের কোমল মন আর্দ্র মৃত্তিকাবৎ, যেরূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে। যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করে—ভাব সংসর্গগুণে তাহারই হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। বহুদর্শন নাই। জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প। পক্ষান্তরে মন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিষয়াভাবে এক বিষয় লইয়াও সর্ব্বদা আন্দোলিত হয়। বালকের বুদ্ধিবৃত্তি নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিমার্জ্জিত নহে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত না হইলে, প্রায় কার্য্য করিতে পারে না। সংসারে কে না দেখিয়াছেন মার্জ্জিতবুদ্ধির লোক ব্যতীত অন্যে বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিচালন করে না, কিন্তু কল্পনা সেই অভাব পূরণ করে। এই জন্যই অপরিণতবয়স্ক বালক কল্পনাপরায়ণ। ভাব সংসর্গগুণে যাহা মনোমধ্যে বিদ্ধ হয় কল্পনা তাহা লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করে। নানারূপ চিত্র বিচিত্র প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। কতবার নির্জ্জন প্রান্তরের হরিৎবর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, নিদাঘসন্তপ্ত শরীরে সায়ংকালীন সমীরণ সেবন করিতে করিতে, কল্পনা তাহাতে কত সুখের চিত্র আঁকে। কতবার নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া নদীর মধুমাখা সঙ্গীত রব শ্রবণ করিতে করিতে কল্পনা তাহাতে কত দূরাগত সুখরব শুনিতে পায়। কত বার গভীর রজনীতে নিদ্রিত হইলে, কল্পনা কত মনোহর চিত্র দেখিতে পায়। কালে যুবক এই বিষয়ে একেবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠেন। নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাভিজ্ঞান ইহার অলীকতা

প্রত্যক্ষ প্রমাণ না করিয়া দিলে, কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যখন সেই কল্পনা পারলৌকিক সুখ সহ যুক্ত হয়, তখন মনুষ্য কদাপি তদনুসরণ জীবদ্দশাতে ত্যাগ করিতে পারে না, যেহেতু তাহার সত্য মিথ্যা এজীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্যই ধর্ম্মানুসরণকারীদিগের ন্যায় অন্য পথাবলম্বী তাদৃশ বদ্ধপরিকর হয় না। কলম্বস প্রথম যাত্রায় হয়ত পশ্চিম প্রদেশে বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্কারের ভাব ত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু মার্টিন লুথর জীবন থাকিতে পোপের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। চৈতন্যের কল্পনা ধর্ম্মসহ যুক্ত হওয়ায় অবিকল ইহাই ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বক্ল † বলেন "আমার কার্য্যের জন্য আমা অপেক্ষা আমি যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ অধিক পরিমাণে দায়ী।" বস্তুতঃ যে জন্য ইংলণ্ডীয়গণ স্বাধীনতাপ্রিয়, বারাঙ্গণাত্মজা অলীক হাস্য কৌতুক প্রিয় সর্ব্বদেশীয় কামিনীবৃন্দ বস্ত্রালঙ্কার প্রিয়, কামরূপবাসী শক্তিভক্ত, সেইজন্যই যেমন মিলের তনয় জন্ মিল দর্শনাসক্ত এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের তনয় বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ পরম বিষ্ণুভক্ত ও সংসারে গতরাগ। শৈশবে পিতার ও সহোদরের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া চৈতন্য অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন, ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সার, ইহলোকের অকিঞ্চিৎকর ভোগ সুখাপেক্ষা অশেষগুণে প্রার্থনীয়। ধর্ম্মজনিত সুখ নিত্য আর বিলাসসুখ অনিত্য। বিশেষতঃ যখন দেখিলেন ধর্ম্মের জন্য জ্যেষ্ঠ ইহলোকের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জনক জননী ত্যাগ করিয়া, সংসারের বিলাসবাসনা ভোগ ত্যাগ করিয়া, সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তির অভিলাষ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন তাঁহার মন ধর্ম্ম চিন্তায় অবশ্যই বিচলিত হইয়াছিল। যদিও জনক জননীর অপত্য বিরহ জনিত অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণ ধর্ম্মের উপর কথঞ্চিৎ গতরাগ হইয়াছিলেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে অগ্রজের সন্ন্যাস তাঁহার মনে সংসারের ভোগবাসনা সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিবার বীজ বপন করিয়াছিল। তবে তাহা দীর্ঘ কালে অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্ট হয়।

চৈতন্য পিতা মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি চিরদিন আপনাদিগের নিকট থাকিয়া চরণ সেবা করিব।"

এই সকল ঘটনা বশতঃ চৈতন্য বাল্য কাল হইতেই ক্রমশঃ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া আসিতেছিলেন। কেবল প্রথম যৌবনে জ্ঞানচর্চ্চায় মনোভিনিবেশ করিয়া তৎপ্রতি অযথা আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বয়স ১৬। ১৭ বৎসর মাত্র। এই সময়ে একদিন শিষ্যবর্গ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে পথে শ্রীবাস পণ্ডি-

† Buckle's History of Civilisation, Vol. I.

তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহাকে বৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া জানিতেন; তাঁহার মুখদর্শন পাপ বিবেচনা করিয়া সহসা অন্যদিকে গমন করিলেন। চৈতন্য শিষ্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণ বলিল "শ্রীবাস কার্য্যান্তরে ঐ পথে গিয়াছে।" চৈতন্য বলিলেন "তাহা নহে আমাকে পাষণ্ড বিবেচনা করিয়া শ্রীবাস আমার মুখ দর্শন করিবে না, এজন্য অন্য পথে গেল।"

এই ঘটনা চৈতন্যকে প্রথমতঃ ধর্ম্মের দিকে লইয়া যায়। বস্তুতঃ একটী ঘটনা বা একটী উপদেশ সময়ে মনুষ্যের মনে যুগান্তর উপস্থিত করে। সময়ে একটী সামান্য ঘটনা দেখিয়া যেমন কোন বিষয় মনে বিদ্ধ হয় সহস্র গ্রন্থ অধ্যয়ন অথবা সহস্র উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহা হয় না। ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিকও হঠাৎ কোন বিপদে পতিত হইয়া অথবা প্রিয়জন হারাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। চৈতন্যের জীবনেও শ্রীবাসের এই আচরণ এইরূপ ফলোৎপাদন করিয়াছিল। চৈতন্য তখনই হৃদয়ের সহিত বলিলেন।—

এমন বৈষ্ণব মুই হইনু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুই সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া যে যে সকলে পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥

এই সময়ে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্ণবগণ নাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাষণ্ডেরা তাঁহাদিগকে যারপর নাই উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। বৈষ্ণবগণ মহাদুঃখিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট সমুদয় বর্ণন করিলেন। অদ্বৈত বলিলেন শীঘ্রই আমাদিগের দল পুষ্ট হইয়া দুঃখনিবৃত্তি হইবে। ইহার কিছুদিন পরে, ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও ভাগবত শান্তিপুরে অদ্বৈতের আলয়ে আগমন করিলেন। বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। ঈশ্বরপুরী কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নবদ্বীপ গমন করিলেন এবং তথায় গোপীনাথ আচার্য্যের আলয়ে অবস্থান করিলেন। চৈতন্য দেব ঈশ্বরপুরীর সহিত আনুগত্য করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যের অসাধারণ রূপলাবণ্য, অসামান্য প্রতিভা ও আন্তরিক ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন।

একদা ভারতী মহাশয় কৃষ্ণের চরিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া চৈতন্যকে দোষগুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য বলিলেন "ভক্ত যাহা বলে ভগবান্ তাহাতেই সন্তুষ্ট অতএব গ্রন্থের দোষগুণ বলা নিরর্থক।"

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্ত সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

ভক্তি মাহাত্ম্য প্রতিপাদক চৈতন্যের এই প্রথম বচন। প্রাচীন আর্য্যদিগের

শাস্ত্রাদি কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডপ্রধান, যদিও ভাগবত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বৈষ্ণবদিগের * বিশেষতঃ চৈতন্যের পূর্ব্বে তাহা প্রায়ই কেহ প্রকৃষ্ট রূপে জীবনে পরিণত করেন নাই।

অদ্যাপি চৈতন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিচার এই ত্রিবিধ পণ্ডিতের কার্য্য পরিহার করেন নাই। মুকুন্দ কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত ক্রমে চৈতন্যের পরিচয় ও বিচার হইল। সকলই তাঁহার অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিতে মোহিত হইলেন।

একদা প্রদোষকালে চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েক জন বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং এরূপ মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্তি বিরহিত এজন্য নানারূপ মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন চৈতন্যের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন

——হের শুন নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি কাজ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥

চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন

তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভজিবার
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

এই সময়ে চৈতন্যের জীবন নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে এবং যে ভক্তিভাবে সমুদয় ভারত মোহিত হইয়াছিল তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। একদা চৈতন্য ভক্তিরসে আর্দ্রমনা হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার দশা † উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণ নৃত্য, হুঙ্কার, তর্জ্জন, গর্জ্জন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় বন্ধু বায়ুরোগ বিবেচনা করিয়া মস্তিষ্কে নারায়ণ তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, এ বায়ুরোগ নহে প্রেম-বিকার। ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রকৃতিস্থ হইলেন। চৈতন্যের এই প্রথম দশা।

দশা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে গেলেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেরই আলয়ে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপ শিষ্টতা ও অলোকসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপলাবণ্যে ক্রমে চৈতন্য আবাল বৃদ্ধবণিতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। হিন্দু মুসলমান স্ত্রী পুরুষ সকলেই চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

নবধর্ম্মসংস্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারক দিগের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া থাকে। নানক মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই

* রামানুজ আচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিপ্রধান, কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে ভক্তি সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই।

† প্রেম ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়া।

সাধারণ প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিয়া উৎপীড়িত হওয়ার পূর্ব্বে সর্ব্ব সাধারণের যারপর নাই প্রিয় ছিলেন। বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মের মূল এক। সত্যকথন, ন্যায়ব্যবহার ও পরোপকার সকল ধর্ম্মের মূল কথা, সুতরাং নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ (যথা ইদানীন্তন হিন্দুর পক্ষে গো মাংস ভক্ষণ) না দেখিলে, কেন তাদৃশ সদ্‌গুণশালী মহাপুরুষের প্রশংসা করিবে না।

এই সময়ে চৈতন্য সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তত বাহুল্যের সহিত নহে। অদ্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। প্রধান পণ্ডিতদিগের ন্যায় চৈতন্য গৃহীদিগের নিকট নানারূপ ভেট ও বিদায় পাইতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। নানা আত্মীয় বন্ধু ও অতিথিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ গার্হস্থাশ্রমই গৃহী বৈষ্ণবদিগের আদর্শ। বৈষ্ণব মাত্রেই অতিথিপরায়ণ, আখড়াধারিগণ ভিক্ষা করিয়া অতিথি সৎকার করেন। চৈতন্য বলেন,

তৃণানি ভূমি রুদকং বাক্‌চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে
কদাচন॥

* * *

সত্যবাক্যে করিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না হয় তাহার॥

শ্রী শ্রীকৃষ্ণদাস।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বঙ্গে ব্রহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে অমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমরা পুনর্ব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন, আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত; এবং অন্ততঃ কিছু কাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের দুর-

* সম্বন্ধ নির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীলাল মোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

দৃষ্ট ক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রশংসা দূরে থাক্—কিছু সুসভ্য গালি গালাজ খান নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয়, কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্য্যালোচনীয়; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

আমরা "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের অধিকার এদেশে ততকাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে।

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ গণের বিচারে, ইহাই স্থির হইয়াছে যে আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন। সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথমতঃ একজাতিকৃত অন্যজাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাঁহাদিগের দেশ।

পুনশ্চ, সাক্ষণ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল—আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজাধিকৃত আমেরিকা ও সাক্ষণাধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্য্যাধিকৃত পশ্চিমভারতের প্রভেদ এই যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ কর্ত্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য্যবিজিত আদিম অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া শূদ্রনাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের

অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এদেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না। মিশরাদিকে রোমক ভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বঙ্গদেশকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আর্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেই খানেই চতুর্ব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুইচারি ঘর, যাহা স্থানেং দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে, অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটী রাজবংশ অতি প্রাচীনকালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগের কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছে—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবণিক্ দিগকে বৈশ্য বলিলেও—বৈশ্যেরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্য স্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।

যখন আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খৃঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি

আর্য্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতিবিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে এই বাঙ্গালা, নয়শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ বাঙ্গালার সহিত আর্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূর ও বল্লালসেনে যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে বল্লালসেন, আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। কিন্তু এ কিম্বদন্তী যে অমূলক, এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, তাহা পুনঃ প্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ।* আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ এক জন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদি পুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ।† ভট্টনারায়ণ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ। ইত্যাদি।

আদিশূর যাঁহাদিগকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা হইলে কখন তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্র দিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব।

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, যে এই অব্দ শকাব্দ নহে, সম্বৎ। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খৃষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন—

"আদিশূর খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খৃঃ

* (১)শ্রীহর্ষ, (২)শ্রীগর্ভ, (৩)শ্রীনিবাস, (৪)আরব, (৫)ত্রিবিক্রম, (৬)কাক, (৭) ধাঁধু (৮)জলাশয়, (৯)বাণেশ্বর (১০)গুহ, (১১)মাধব,(১২)কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

† (১)দক্ষ (২)সুসেন, (৩)মহাদেব,(৪) হলধর, (৫)কৃষ্ণদেব, (৬)বরাহ, (৭(শ্রীধর, (৮)বহুরূপ

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ, এক্ষণে সম্বৎ——১৯৩২
ঐ —খৃষ্টীয় শক——১৮৭৫

সম্বতের সহিত খৃঃ অন্তর————৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয় সে বৎসর খৃ ১০৫৬।"—১৬১ পৃষ্ঠা

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে সংবতে ৫৭বৎসর যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ বাহির করিতে হয় না; কেননা খৃঃঅব্দ হইতে সংবৎ পূর্ব্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খৃঃঅব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+৫৭ =১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২—৫৭=১৮৭৫ খৃঃঅব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯সংবতে ৯৯৯—৫৭ =৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এইভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে "সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং ঐঅব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে।" বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধরিতে হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এস্থলে, আমাদিগকে অভ্রান্ত পুরাণতত্ত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিচার নির্দ্দোষ হইতে পারে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে বল্লাল সেন, দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯শকাব্দ ১০৯৭ খৃঃঅব্দ। তাদৃশ বৃহদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লাল সেন তাহার পূর্ব্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানাযায় বল্লাল সেন ১০৬৬ খৃঃঅব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা,ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০খৃষ্টাব্দ আদিশূরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এগণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯সঙ্গে ঠিক্ মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে; কেননা ৯৯৯সংবতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ। এপ্রভেদ অতি অল্প! এদিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই। তখন, বল্লাল সিংহাসনারূঢ় ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শক নহে সংবৎ।

অতএব আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগার্থ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থ সমাপন পর্য্যন্ত ১৫৫বৎসর পাওয়া

যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী বহুরূপ অষ্টম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বেদগর্ভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী শিশু, ৮ম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূর হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত রীতি এই যে ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮বৎসর পড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয়পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে, সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এফল গ্রাহ্য। বল্লাল আদিশূরের সার্দ্ধেক শতাব্দী পরগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায়, যে যখন বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড়শত বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে তৎকালে বহুবিবাহ প্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহু বিবাহ যে বিশেষ রূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে ভট্টনারায়ণের ১৬পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪পুত্র, এবং ছান্দড়ের ৮ পুত্র। মোটে ৫ পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়দিগের ৫৬টি গাঁই। যখন দেখা যাইতেছে যে একপুরুষ মধ্যে, ৫ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয়পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক, কেননা পঞ্চব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন। এক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায়; কোন২ বড় গ্রামে, তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে

অন্যায় বলিবেনা। কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের পরিচয় বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে, এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে।

এক্ষণে বোধ হয়, চারিটি বিষয় বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ৯৪২ খৃ অব্দে আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড় শত বৎসর পরে বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত করেন।

৪র্থ। এ দেড়শত বৎসরে ঐ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড়শত বৎসরে পাঁচজন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণ গণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল।

যদি, সপ্তশতীদিগের আদি পুরুষও পাঁচজন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্যকুব্জীয়দিগের ন্যায় বহুবিবাহ পরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায় তবে বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণদিগের আগমন কালহইতে শত বৎসর মধ্যে, তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে।

সপ্ত শতীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে কাণ্যকুব্জীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া শপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; সপ্তশতীগণের পূর্ব্বপুরুষের তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাঁচজন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে একত্রে বা একে একে, রাজগণের প্রয়োজনানুসারে, বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া, বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে

নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে, যে ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণ সংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপ প্রাবল্যছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। কোন২ আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন, যে তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণছিল —এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্ব্বকাল জাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন?† আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লুকভট্ট জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য্য, প্রভৃতি যাহার নাম করিবেন সকলই আদিশূরের পরবর্ত্তী। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্য্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেই থানেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখন কার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও আর্য্য রাজকুল বাঙ্গালায় ছিল, এবং তাঁহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিফর্ণিয়াতেও অনেক চীন আছে।

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে করিবেন, যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালির বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালিজাতির অগৌরব করা হইল। আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করি—তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম।

আমরা দেখিতেছি না যে অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-

† বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

গণ সেই গৌরবান্বিত আর্য্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই—আর্য্যকীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাতশত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রীয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্প সংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহীকর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালি অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন কায়স্থগণ সৎশূদ্র, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্য্যবংশসম্ভূত বটে। আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ।

রজনী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

(অমরনাথ বক্তা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ ভবের হাট হইতে, আমার এই মনিহারির দোকান খানি উঠাইতে হইল। লোক ঠকাইয়া—আপনি ঠকিয়া, কোন সুখ নাই। মনে করিয়াছিলাম, নানা বর্ণের সুশোভন কাচে, এসাধের বিপণী সাজাইব—অমূল্য মণিমাণিক্য মনে ক-করিয়া, খরিদদার বহুমূল্যে আমার সেই কাচ কিনিবে। কিনিবে না কেন? কিনিয়া বিনিময় দেয় কি? অসার কাচ লইয়া, অসার কাচ দেয়। অসার কথা—অসার স্তব,—অসার তোষামোদ, অসার বন্ধুত্ব, অসার আমোদ,—খল হাসি, শঠ প্রবৃত্তি, নীচ আশয়, বিনিময়ে ইহাই দেয়। কাচের বিনিময়ে কাচ লইয়া, এতকালে আমার কি তৃপ্তি হইল? এদগ্ধ হৃদয়ের কোন্ জ্বালা থামিল? এ অনন্ত, অনিবার্য্য পিপাসার কি শমতা হইল? এ হাট ভাঙ্গিব, এ ব্যবসা ছাড়িব—যিনি ছল জানেন না, কপট জানেন না, যাঁহার কাছে খল কপট চলে না, যাঁহার কাছে কাচ বিক্রয় হয়, যিনি বিনিময়ে খাটি সোনা ভিন্ন দেন না, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে, তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদপদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি এমনিহারির দোকান ভাঙ্গিব—যিনি সকল খরিদ দারের বড় খরিদ দার, বিনামূল্যে সকলই তাঁহাকে বিক্রয় করিব।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া, এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যাবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্রে খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায়

কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব। একবার ললিতলবঙ্গলতার মুখে হাসি দেখিয়া, এ সংসার হইতে যাইব।

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র অধিকতর স্থির —অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র আপনার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি, যে যেদিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল। এক কথা লবঙ্গ আমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই, কি প্রকারে বলিবে, কেন না রজনী আমারই পত্নী বলিয়া পরিচিতা—কিন্তু আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল যে শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত। এই অনুরাগের বিকৃতিতে তাঁহার বায়ুরোগ, অথবা বায়ুরোগের বিকারেই এই অনুরাগ।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে২ বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাঁহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসারসুখদর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জন দর্শনসুখে সে যে আজন্ম মৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে।

তখন বলিলাম "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেইজন্যই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্ত্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্ত্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদায় মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য, তাহাকে আপনার স্ত্রী পরিচয়ে আপনার গৃহে রাখিয়াছিলাম। রজনীর সম্মতিক্রমেই রাখিয়া-

ছিলাম। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করার সহায়তা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, সে আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।”

শ। তার পর বিবাহ হইল কি প্রকারে?

আমি বলিলাম, “বিবাহ হয় নাই। রজনী আমার স্ত্রী নহে।”

শচীন্দ্র প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, তাহার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

আমি তখন শচীন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া কথা আরম্ভ করিলাম। যেপ্রকারে রজনীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, যে প্রকারে তাহাকে অত্যাচারীর হস্তহইতে রক্ষা করিয়া, তাহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্রও আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলেন। বলিলেন,

“আপনি বলিলেন রজনী আপনাকর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়াছে। পীড়িতা নহে, বিশেষ উপকৃতাই হইয়াছিল।”

আমি বলিলাম, “পরে শুনুন।” তখন আমি অবশিষ্ট কথা বলিলাম। যেপ্রকারে রজনীর উত্তরাধিকারিণীত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম, যেপ্রকারে রজনীর সন্ধান পাইয়াছিলাম, যেপ্রকারে তাহার বিষয় উদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলাম, যেপ্রকারে সে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া আমার মতে সম্মত হইয়া, আমার স্ত্রী পরিচয়ে আমার গৃহবাসিনী হইয়া রহিল, তাহাও বলিলাম। তাহার পর যে প্রকারে রজনী আমাকে বিষয় দান করিয়া, আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিলাম।

শুনিয়া শচীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,

“মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?” আমি বলিলাম, “আমি যে ধনসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষী তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আশ্রয়শূন্যা। তাহার কোন উপায় আমি করিতে পারিতেছি না।”

শচীন্দ্র বলিলেন, “সেজন্য আপনি কাতর হইবেন না। যে অন্ধ অবলা স্ত্রী, বঞ্চক কর্ত্তৃক বঞ্চিত, তাহাকে আশ্রয়দানে আমার পিতা অদ্যাপি অক্ষম হয়েন নাই, অথবা বিমুখ হইবেন না।”

আমি বলিলাম, “আশ্রয় যেখানে সেখানে পাইতে পারে। কিন্তু আমার দোষে তাহার বিবাহের পথ বন্ধ হইয়াছে। যাহাকে লোকে আমার পত্নী বলিয়া জানে, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, এমন লোক পাওয়া ভার। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।”

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন,

"যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবে রজনীর পাত্রের অভাব নাই। কিন্তু আপনার কথা সত্য কি না, তাহা কি-প্রকারে জানিব? রজনীত এসকল কথা এত দিন কিছু বলে নাই।"

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে। বলিলাম, "রজনীকে আজি জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি করিতেছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন, আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম, যে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা ইঙ্গিত বুঝিল। আমার সহিত, পূর্ব্বাঙ্গীকার মতে, পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?"

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।

আমি। সে কথা কে অস্বীকার করিতেছে? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস হয় কি?

ল। কেবল তোমার কথায় বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু রজনীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে সমুদায় বলিয়াছে। তাহার কথায় বিশ্বাস করি।

আমি। তাই বা কেন কর? মনে কর তাহাকে আমি এ সকল কথা শিখাইয়া আনিয়াছি।

ল। কি অভিপ্রায়ে তুমি শিখাইবে?

আমি। মনে কর আমাদের যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে উভয়ে উভয়ের উপর বিরক্ত। উভয়ে উভয়কে ছাড়িতে চাই। বিবাহ অস্বীকার ভিন্ন, ইহার আর উপায় কি?

লবঙ্গলতা ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "যে চুরি করে, সে গৃহস্থকে ডাকিয়া বলে না যে আমি চুরি করিতেছি।"

আমি। চোরের অনেক কৌশল।

ল। তুমি অনেক কৌশল জান বটে, কিন্তু রজনী তত জানে না। রজনী যেপ্রকারে বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল। সত্য কথা না হইলে, সে তত সবিস্তারে বলিতে পারিত না।

আমি। শিখাইলে, বিচিত্র কি? আদালতে সাক্ষি জোবানবন্দী দেয় কি প্রকারে? শিখিলে সকলেই মিথ্যা কাহিনী সবিস্তারে বলিতে পারে।

ল। রজনী তোমার শিক্ষামতে কখন পারে না। কেন না, তুমি শিখাইলে, কোন না কোন কথায় আমি বুঝিতে পারিতাম, যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি শিখাইয়াছে। রজনী যাহা বলিল, তাহাতে

বুঝিলাম যে, অন্ধ অন্ধের জ্ঞানমত সকল বলিতেছে।

আমি। তুমি দ্বিতীয় বেহ্বাম বোধ হয়। সত্য সত্যই কি তুমি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছ?

ল। সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছি।

আমি। শচীন্দ্র?

ল। তার আরও বিশ্বাস।

আমি। ভালই হইয়াছে। এক্ষণে রজনী আমার গৃহে যাইতে অসম্মত। তাহার বিবাহ সুকঠিন। আমি কি তোমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া, রজনীকেও তোমাদিগের গলায় ফেলিলাম না কি?

ল। তুমি বিশেষ দয়ালু ব্যক্তি দেখিতে পাই। বিশেষ আমাদিগের ধন সম্পত্তির উপর তোমার বড় মায়া। কিন্তু রজনীর জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না,সে আমাদিগের গলায় পড়িবে না।

আমি। তবে তাহার কি উপায় করিবে? জিজ্ঞাসায় রাগ করিও না। আমার একটু প্রয়োজন আছে।

ল। আমরা তাহার বিবাহ দিব।

আমি। সে বড় কঠিন। তোমাদের কথায় তাহাকে কুমারী মনে করিয়া বিবাহ করিবে, এমন লোক কি আছে?

ল। আছে।

আমি। থাকিতে পারে। এমন অনেক লোক আছে যে তাহাদের অন্য প্রকারে বিবাহের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে প্রকারের লোককে কি রজনী বিবাহ করিবে?

ল। যে পাত্র স্থির হইয়াছে,তাহাকে বিবাহ করিতে রজনী রাজি হইয়াছে।

আমি। বটে? কে সে?

ল। আমার পুত্র শচীন্দ্র।

আমি। কানাকে!

ল। কানাকে। যাহাতে অমরনাথ বাবু অনিচ্ছুক ছিলেন না, তাহাতে অন্যেও ইচ্ছুক হইতে পারে।

আমি বিস্মিত হইলাম না, কেন না শচীন্দ্র যে রজনীতে অনুরক্ত তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি আমার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছিলে কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?"

অ। যাইব।

ল। কেন?

অ। তোমার স্বামীর পাহারাওয়ালার ভয়ে। রাজধানী অন্ধকার করিয়া চলিলাম কি?

ল। প্রায়। বোধ হয় এখন পুলিষ আপিস উঠিয়া যাইবে।

অ। বোধ হয়। আর কেহ সুখী হউক না হউক, তুমি হইবে।

লবঙ্গ চুপ করিয়া রহিল।

আমি তখন, ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া, লবঙ্গকে বলিলাম, "আমি একটি কথা জি-

জ্ঞাসা করিবার জন্যই, তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি সরলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিব, তুমিও সরলান্তঃকরণে উত্তর দিবে। আমি এই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই সুখী হও?”

ল। সরলান্তঃকরণেই উত্তর দিব—যথার্থই সুখী হই। কেন না, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না। অতএব তোমাকে না দেখিলেই ভাল থাকি।

আ। তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও?

লবঙ্গ, কয়েকটা কথায় এক ঋষির চিত্র আঁকিল—জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী,—আমি বলিলাম,

“আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?”

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া, বলিলাম,

“যদি লোকান্তর থাকে তবে?”

লবঙ্গলতা বলিল, “আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।”

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, “আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটী কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।”

লবঙ্গ, অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল,

“তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা বুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন,—আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপে আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমাকে সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?”

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি কখন যদি ইহার পরে শোন যে অমরনাথ আর কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" এই কথা আর সেই কথা—আমি যেমন তোমায় চাই—তুমি তেমন নও। যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে তাহা বলিয়া যাই। রজনী আমাকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়া-দিয়াছিল। সে দানপত্র এই। আমি রজনীর বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি। এই সে দানপত্র তোমারই সম্মুখে নষ্ট করিতেছি।"

আমি সেই দানপত্র, বাহির করিয়া, লবঙ্গের সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম।

লবঙ্গ বলিল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি তোমাকে অনর্থক বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এ দানপত্র রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি?"

আমি। হইয়াছিল।

ল। শুনিয়াছি, রেজিষ্টরী হইলে আর একটা নকল সরকারিতে থাকে।

আমি। এ দানপত্রেরও তা আছে। এই জন্য আমি আর একখানা দানপত্রে কাল দস্তখত করিয়া রেজিষ্টরী করিয়া আনিয়াছি। ইহার দ্বারা আমার সমুদায় স্থাবরসম্পত্তি আমি দিতেছি।

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

"হাঁ।"

ল। রজনী যাহা তোমাকে দিয়াছিল তাহা তোমার তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত। এক্ষণে তোমার মতি ফিরিয়াছে বলিয়া,তুমি তাহার বিষয় তাহাকে ফিরাইয়া দিতেছ। ইহা আমার পক্ষে বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তবু বুঝিতে পারি। কিন্তু আমি জানি তদ্ভিন্ন, তোমার নিজেরও অনেক জমীদারী আছে। তাহাও রজনীর স্বামীকে দিতেছ কেন?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও। যদি ইহার অন্যথা কর, তবে তোমার স্বামীর শপথ লাগিবে।"

এই কথা বলিয়া, ললিত লবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একবারে ষ্টেসনে

গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে২ আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে মিত্র বংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহল প্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম, যে তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে রজনীর যথার্থই বিবাহ হইয়াছিল, পাছে কলিকাতার লোক কেহ এইরূপ মনে করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানী নগরে বাস করিতেছেন। ভবানী নগরেও কতকগুলি লোক তাঁহাকে লইয়া আহার করে না, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত নহেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজসম্পত্তি, এবং রজনীর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমারে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম, যে ধূলিগ্রহণ কালে, পদস্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া, দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক্ষ!

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কারপেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া,

অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম, যে রজনী সেই জলস্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই, যে সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,

"রজনি এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখনত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসা বিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল, এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে, সে সকল লুপ্তবিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখনং যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভাল-বাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্বের আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি একমাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম "না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে, ইহা অসাধ্য।"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খইয়া, তাহার বস্ত্রের একংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর আঁটু ধরিয়া তাহার মুখ পানে চহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া, হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমর প্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সমাপ্তঃ।

শৈশবসহচরী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনার দুই এক দিবস পরে সুবর্ণপুর গ্রাম অন্ধকারময় হইল। রাজপথে জনমানব দেখা যায় না—কেবল কখনং পুলিষ কর্ম্মচারিগণ গ্রামের এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামবাসীরা তাহাদিগের ভয়ে বাটীর দ্বার খুলিতে সাহস করেন না, কিছুদিনের জন্য হাট বাজার বন্ধ হইল। তন্নিবন্ধন গ্রামবাসীদিগের ক্রমেং আহারও বন্ধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীও কিছুদিনের জন্য শোভাহীনা হইল। যে সকল যুবতী সর্ব্বদা গ্রীবানিমজ্জিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে রাজহংসীর ন্যায় বিচরণ করিত, তাহাদিগের আর সে জাহ্নবীকূলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না—তবে যেসকল কুলকামিনীগণ সূর্য্যদেবকে মুখ দেখাইতে লজ্জা পান, এবং যাঁহারা তজ্জন্য যামিনী প্রভাত না হইতে হইতেই স্নান করিয়া থাকেন কেবলমাত্র তাঁহারাই এক্ষণে জাহ্নবীর শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এমত অবস্থায় একদা অতি প্রত্যুষে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী একটি পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে ভাগীরথী তীরাভিমুখে কথোপকথন করিতেং গমন করিতেছিল।

"বিনোদিনী এখনও রাত আছে?"

"হ্যাঁ এখনও ঢের রাত, আমার গা ছম্‌ছম্ কর্‌চে—ঐ দেখ এখন সুখতারাও উঠে নি। চন্দ্র দিদি ফিরে যাই চ।"

"দূর হ! এতদূর এসে আবার ফিরে যাবি কেন—ভয় কি লো।"

বি। (চুপি চুপি) আজ বড় দিদির ঘরে গামছা আন্‌তে গিয়ে এক ভয়ানক বিকটাকার মানুষ দেখে আমার সেই অবধি বড় ভয় হয়েছে—

চ। সে কি? কুমুদিনীর ঘরে—

বি। হ্যাঁ।

চ। কখন দেখিলি?

বি। এই মাত্র।

চ। এতক্ষণ বলিস্‌নি যে?

বি। বড় দিদি বল্‌তে নিষেধ করেছিল।

চ। তবে বল্লি যে।

বি। বল্‌তে কি চন্দ্র দিদি যতক্ষণ এই কথাটা আমার পেটের ভিতর ছিল ততক্ষণ আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল—আমার মাতা খাস কাকেও বলিস্‌নে, আমার ভগিনীপতিকেও না—

চ। না তা বল্‌ব না—তুই কাকে দেখ্‌লি—

বি। আমি তাকে চিনি না—কিন্তু মুখ দেখে বোধ হইল যেন তাকে কখন কোথায় দেখেচি।

চ। কেমনতর দেখ্‌তে।

বি। দেখতে সন্ন্যাসীর মত—বুক-পর্য্যন্ত পাকা দাড়ি। খুব বড়২ চোক, গেরুয়া বসন পরা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

চন্দ্র। কি করিতেছিল?

বি। বড় দিদির শিওরে বসে মাথায় হাত বুলাইতে ছিল; আমি ঢুকিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া অন্য দ্বার দিয়া পলাইল।

চন্দ্র। কুমুদিনী কি করিতেছিল?

বি। তাঁর এখন একটু জ্বর ছেড়েচে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম দিদি ওকে? তিনি বলিলেন এক সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করিতেছেন, জ্বর বিশ্রাম কালে আমাকে দেখিতে এসেছিলেন, তারপর আমি যখন গামছা লইয়া ফিরে আসি তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিনোদ, যে সন্ন্যাসীকে এখানে দেখিলি, কাহাকেও বলিসনে কাকাও যেন না জানতে পারেন।

চন্দ্রমুখী। "বাবারে বলিতে নিষেধ করিয়াছে।" এই বলিয়া চন্দ্রমুখী অন্যমনস্ক হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই যুবতীদ্বয় গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর শোভা দেখিয়া দাঁড়াইল। বিশালহৃদয়া জাহ্নবী নক্ষত্র কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতে২ দূরপ্রান্তে ধূমময়ে মিশিয়াছে। নদীর অপর পারে রজনীর অস্পষ্ট আলোকে অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। অদূরবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র২ তরণী হইতে দীপালোক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, আর শীতল নৈশবায়ু নদীহৃদয় আন্দোলিত করিয়া, যুবতীদ্বয়ের স্বেদবিজড়িত অলকাগুচ্ছের চাঞ্চল্য বিধান করিতেছিল। যুবতীদ্বয় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া কিছুক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া দূরে একটি ক্ষুদ্র তরীহইতে কে গাহিতেছিল তাহাই শুনিতেছিল—তৎপরে আস্তে২ ঘাটে নামিল। তাহাদিগের পূর্ব্বে দুইএকটি স্ত্রীলোক আসিয়া ঘাটে স্নান করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাচাল প্রাচীনা চন্দ্রমুখীকে জিজ্ঞাসা করিল,

"কুমুদিনী কেমন আছে?"

চন্দ্র। কুমু এখন আছে ভাল। এই মাত্র জ্বর ছেড়েছে।

প্রাচী। আর সে বাবুটি কেমন আছে?

চন্দ্র। তা বিশেষ জানি না—শুনিয়াছি বড় জ্বর—দিবারাত্রি বেহুঁসে আছে।

প্রা। আচ্ছা, কুমুদিনীর ও বাবুটির একসময় জ্বর হোল কেন?

চন্দ্র। (ক্রুদ্ধভাবে) কেন তা কে জানে—কুমুদিনীর জ্বর হোল স্বর্ণের শোকে, বাবুটির জ্বর হোল ডাকাতেরা মাথায় মেরেছিল বল্যে।

প্রা। বাবুটি তোমাদের বাটীতে কেন?

চন্দ্রমুখী উত্তর করিল না।

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "ও গো সে বাবুটি আর কেহ নয়—আমাদের রমন

পুরের খুড়ীর জামাই, তা আমাদের বাড়ী থাক্‌বে না তো কোথা যাবে?"

প্রা। কার, প্রমদার স্বামী?—আহা প্রমদা মোরে গেছে—ছোঁড়া কি আবার বিয়ে করেছে?

চন্দ্রমুখী বলিল "বিয়ে হয় নি কিন্তু হবে—"

প্রা। কার সঙ্গে?

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে।

প্রা। (হাসিয়া) তা তোমরা এমন সব যুবতী শ্যালী থাকৃতে আমার সঙ্গে কেন। কুমুদিনী এমন সুন্দর কড়ে রাঁড়ি, তাতে আবার বাপ বিধবা বিয়ে না দিতে পেরে বিবাগী হয়েছে। কেন কুমুদিনী বিয়ে করুক্ না, তা হলে বাপ ঘরে ফিরে আস্‌বে।

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন না—বিনোদিনী "পোড়ার মুখ তোমার" বলিয়া জলে নামিলেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগের পরিচারিকা চুপি চুপি প্রাচীনার কানে২ বলিল, "তা আশ্চর্য্য নয়।"

প্রাচীনাও তদ্রূপ মৃদুস্বরে বলিলেন "কেন লো?"

পরিচারিকা উত্তর করিল "জামাই বাবু প্রলাপে দিবারাত্র বড়দিদির কথা বল্যে থাকেন এবং বড়দিদিও জর ত্যাগ হল্যে জ্ঞান হলেই জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করে।"

"তাতে বিয়ে হবে কেমন করে জান্‌লি?"

পরিচারিকা বলিল,

"তা তুমি বুঝে নাও।"

প্রাচীনা বলিল "তাত বুঝলুম এখন চুপ কর।" তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"বিধু তুই কি রজনীবাবুর বাড়ীতে আর থাকিস্ না?"

বি। আর কার জন্যে থাকিব। যে স্বর্ণের জন্য ছিলাম সে গলিয়া অঙ্গার হইয়াছে—এখন আবার সাবেক মুনিব বাড়িতে আছি। এই বলিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল। বিনোদিনী ও চন্দ্রমুখী স্বর্ণকে মনে পড়াতে অবিশ্রান্ত নয়ন বারি জাহ্নবীর জলে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীনা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে২ বলিল "আহা স্বর্ণ কি সুন্দর মেয়েছিল যেমন রূপ তেমনি গুণ—অমন মেয়ে কলিতে হয় না—আপনার প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচালে।"

বিধু বলিল, "আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রে পড়েছিল, রজনী বাবুর মতন বাবু দেখিনি।"

পশ্চাৎ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "চুপ কর হারামজাদি! রজনীর মতন বাবু দেখিস্‌নি? সে আবার বাবু? কে তাকে বাবু কল্লে, কে তাকে এত ধনের অধিপতি কল্লে? সেও আমি। পাষণ্ড! নেমকহারাম! এখন আমায় চিন্‌তে পারে না, বলে আমি পাগল হু! হু হু! আমি পাগল! হি! হি! হি!"

রমণীগণ দেখিল তটোপরি দাঁড়াইয়া গলিতবসনা আলুলায়িত রুক্ষকেশা, মধ্য-

বয়সী সুন্দরী, একটি স্ত্রীলোক রোষভরে হাসিতেছে। সেই অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গিণীর উপকূলে অস্পষ্ট উষালোকে সেই উন্মাদিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীগণ চমকিত হইল। বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ লুকাইল।

উন্মাদিনীর হাসি থামিল। কিছু কাল সকলেই নিস্তব্ধ, তৎপরে উন্মাদিনী সেই অন্ধকারময় জাহ্নবীর উপকূল আলোড়িত করিয়া অতি মধুর স্বরে গায়িতে লাগিল—

ডুবিতে এসেছি আমি জাহ্নবী সলিলে।
কি কাজ জীবনে মম চিরদিন ভাবিলে॥
ধন জন ছিল যত প্রিয়তম পতি সুত
একে২ সবে আসি ডুবেগেছে জলে।

উন্মাদিনীর চাঞ্চল্য দেখিয়া বয়ঃকনিষ্ঠা বিনোদিনী ভীতা হইল এবং তাহার ব্যস্ততা হেতু চন্দ্রমুখী তাহার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যখন বিনোদিনী উন্মাদিনীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন উন্মাদিনী তাহাকে দেখিয়া বলিল "হুহু! তুমি বড় সুন্দরী—সাবধান তোমার বড় বিপদ!" বিনোদিনী ভীতা হইয়া চন্দ্রমুখীর পশ্চাৎ২ চলিল—পরে কূল হইতে উপরে গিয়া বলিল,"চন্দ্রদিদি মাগি কিভয়ানক পাগল! কিন্তু কি সুন্দরী ছিল, এখনও কত রূপ রয়েছে।"

রমণীগণ চলিয়া গেল, কেবল ঘাটে একাকিনী পূর্ব্বোল্লিখিতা প্রাচীনা রহিল; আর উপকূলে উন্মাদিনী ছিল। প্রাচীনা আস্তে২ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "হাঁগা রজনীকে কেমন করে তুমি বড় মানুষ কল্লে? সে যে তার বাপের বিষয়ে বড়মানুষ হয়েছে।"

উন্মাদিনী উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, "তার বাপ! তার বাপ্‌কে? রমাকান্ত! হু হু! না! না! সে কেবল আমি জানি। হি! হি!" এই বলিয়া উন্মাদিনী বেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বর্ষীয়সী চমকিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সেই সন্ন্যাসীর পরিচয়।

ডাকাতি হাঙ্গামা কিছুদিন পরে নিবিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে আর একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা লইয়া সুবর্ণপুরে পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল হইতে লাগিল। এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কুমুদিনী অতি শৈশবে বিধবা হওয়াতে তাঁহার পিতা হরিনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্যোগে সফল হইতে না পারিয়া উদাসীন হইয়াছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রচার করিলেন, যে তাঁহার কন্যা কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিবেন।

বোধ হয় বলা বাহুল্য, বিনোদিনী যে

সন্ন্যাসীকে কুমুদিনীর শিয়রে বসিতে দেখিয়াছিলেন তিনি হরিনাথ মুখোপাধ্যায়। অপত্যস্নেহের অনুরোধে সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কুমুদিনী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ চিনিতে পারিয়া স্বর্ণেরশোক ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার পিতাকে সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিতে নানা প্রকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রতিদিন রাত্রে হরিনাথ মুখো কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিতেন, এবং প্রতিদিন রাত্রেই কুমুদিনী তাঁহাকে ঐরূপ অনুরোধ করিতেন। তৎপরে কুমুদিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে একদিন রাত্রে হরিনাথ, কুমুদিনী ও তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ সংসারে আমার দুই কন্যা ভিন্ন কিছুই ছিল না। যদিও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম, তথাচ আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। সেজন্য যাহা কিছু ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম তাহা এ অঞ্চলে থাকিয়া করিতাম, কিন্তু যে দিবস হইতে শুনিলাম যে আমার সোনার প্রতিমা স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি—" বলিতেং হরিনাথ মুখোর কণ্ঠরোধ হইল—স্ত্রীলোকগণও কাঁদিয়া উঠিলেন, তৎপরে সকলে কিঞ্চিৎ স্থিরতা লাভ করিলে সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "যে দিবস শুনিলাম স্বর্ণপ্রভাকে হারাইয়াছি, সেই দিবস হইতে ঈশ্বরোপাসনায় আর মন নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। সর্ব্বদা ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কুমুদিনীকে দেখি, এবং কুমুদিনীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সে ইচ্ছা বলবতী হইল। কুমুকে গোপনে দেখিতে আসিলাম, প্রতি রাত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, আমি অপত্যস্নেহের স্রোতে যে বাঁধ বাঁধিয়া-রাখিয়াছিলাম তাহা ভাসিয়া গেল—আমার এখন আশ্রমবাসী হইতে ইচ্ছা হয়—" এইকথা বলিবামাত্র কুমুদিনী এবং তাহার জননী উভয়ে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুমুদিনী বলিল, "বাবা আমাদের আর কেহ নাই—"

সন্ন্যাসীর দরবিগলিত নয়নাশ্রু কুমুদিনীর মস্তকে পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল, "আমি আর তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। যদি তোমরা আমার একটী অনুরোধ রাখ।" কুমুদিনী বলিলেন, "বাবা কি অনুরোধ—তোমার অনুরোধ রাখ্‌ব না! বাবা তুমি যে আমাদের সব!" হরিনাথ তাঁহার পত্নীকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "আমি কুমুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিব, তোমরা কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না।" কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, তোমার মেয়ে, তুমি বিবাহ দিবে, কেহ আপত্তি করিবে না। আমি একবার আপত্তি করিয়া তোমায় হারাইয়াছিলাম—আর

এজন্মে তোমার মতে অমত করিব না।” হরিনাথ বলিলেন “আমি আমার কন্যার এবিষয়ে মত জানিতে চাই।” কুমুদিনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল—মস্তকে ঈষৎ অঞ্চল টানিলেন—কোন উত্তর করিতে পারিলেন না কিন্তু সন্ন্যাসী পুনঃপুনঃ উত্তর চাওয়াতে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন “বাবা যদি প্রাণ দিলেও তুমি ঘরে ফিরে এস, তবে তাও আমি দিব।” হরিনাথের আহ্লাদের সীমা রহিল না; কাঁদিতে২ কুমুদিনীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—সে রাত্রেই গৃহস্থাশ্রমী হইলেন। কোন গোপনীয় কারণেই হউক আর পিতৃস্নেহ বশতঃই হউক কুমুদিনী অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তৃষিতচাতক—করকাভিঘাতী মেঘ।

হরিনাথ বাবুর গৃহে প্রত্যাগমন ও কুমুদিনীর বিবাহের সংবাদ এক দিবস অপরাহ্নে গ্রামপ্রান্তে একটি উদ্যানে বসিয়া—রজনীকান্ত শুনিলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে ভয়মিশ্রিত আশার সঞ্চার হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি চিন্তা? তাঁহার কুমুদিনী ভিন্ন কি অন্য চিন্তা ছিল? এই নূতন সংবাদে আজ সেই চিন্তা অতি গাঢ়তর হইল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল তথাপি রজনী সেইখানে বসিয়া ভাবিতেছেন—উদ্যানের পশ্চাতে একটী অতি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড; তন্মধ্যে দশ বারটি গাভি বিচরণ করিতেছে। একটী রাখাল বিচিত্র স্বরে গাভিদিগের গৃহে প্রত্যাগমনের সঙ্কেত করিতেছে। রজনীকান্ত সেই মাঠপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি হইল—চন্দ্রোদয় হইল—পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া যামিনী মধুর হাসি হাসিয়া অন্ধকারের কালো সাড়ী—খাসা ফুলদার সেই কেরেপের সাড়ী অপসৃত করিয়া, ঘোমটা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া হাসিল—সে কাণ্ড দেখিয়া, রজনীর বাগানের ফুল, গাছের পাতা, মাঠের ঘাস, সরোবরের জল, সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তৎসহিত রজনীর হৃদয়ও হাসিল, কিন্তু চিন্তা আরও গাঢ়তর হইল। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল, তথাচ তাঁহার সংজ্ঞা নাই, একজন পরিচারক কি বলিতে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আস্তে২ পলাইল। রজনী যে কি চিন্তা করিতেছিলেন তাহা আমাদের পর্য্যায়ক্রমে অনুসরণ করিয়া প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার শ্বশুর হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সেই উপলক্ষে যদি কুমুদিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে তাহা কর্ত্তব্য। কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেমন করিয়া কথা কহিবেন এবং কি কথা কহিবেন আর কি প্রকারেই বা

তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন সেই চিন্তায় এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। মনের ব্যস্ততাহেতু সেই রাত্রেই হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। রজনী দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিলেন, অতি অল্প ক্ষণেই হরিনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়বাবু কোথায়?" সে বলিল "বড়বাবু ও শরৎ বাবু খিড়কির বাগানে বেড়াইতেছেন।" রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন "শরৎ বাবু কে?" দ্বারবান উত্তর করিল "শরৎ বাবু, বাবুদের সম্বন্ধে জামাতা—আপনার বাড়ীতে যিনি ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া রজনী খিড়কির উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দেখিলেন, একটি পুষ্করিণীর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর একটী সোপানে তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দুই ব্যক্তি বসিয়া চন্দ্রালোকে কথোপকথন করিতেছিল। পুষ্করিণীর চারিধারে বৃহৎ কামিনীবৃক্ষের কেয়ারি ছিল। রজনী পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিয়া দেখিলেন দুইজনের এক জন কুমুদিনী আর অন্যজন এক যুবা পুরুষ। যে যুবা, সেই রাত্রে ডাকাত দিগের হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল সেই যুবা। রজনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এক কামিনী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেইস্থানে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনিলেন যে যুবক অতি ব্যগ্রতাসহকারে কুমুদিনীকে কি বলিতেছে; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর করিতেছেন না—শরৎকুমার কুমুদিনীকে বলিল "তবে কেন—কেন তুমি এই তিনমাস ধরিয়া পীড়িত অবস্থায় আমার জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে—কেন তুমি আমায় প্রতিদিবস দেখা দিতে—তুমি কি জানিতে না তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র লোকে মোহিত হয়—তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার এদুর্দ্দশা করিলে? কেন আমায় চির অভাগা করিলে? ইহার দায়ী তুমি—কুমুদিনী বল—বল,—বল, আমায় বিবাহ করিবে কি না—"

উত্তর নাই; কুমুদিনী মুখাবরণ করিয়া সোপান প্রান্তে বসিয়া আছেন। শরৎকুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন "কুমুদিনী আমার অল্প বয়স—২২ বৎসর মাত্র—আমার আরও বহুকাল বাঁচিবার আশা আছে কিন্তু তোমার এক কথায় বহুকাল বাঁচিবার আশা একেবারে ঘুচিবে—এক বার তুমি বল আমি সংসারে থাকিব কি না।" কুমুদিনী আর থাকিতে পারিলেন না—অস্ফুটস্বরে মুখাবনত করিয়া বলিলেন "থাক" এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জায় বেগে সে স্থান হইতে উদ্যানের অন্যদিকে গেলেন। শরৎকুমারের হৃদয় সুখে উছলিয়া উঠিল। শরৎকুমার কুমুদিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা

করিয়া, গৃহাভিমুখে চলিল। হাসিতে২ চলিল—আর কামিনী বৃক্ষের তলায় রজনীকান্ত দাঁড়াইয়া কি করিল? হাসিতে লাগিল?

তিনি বজ্রাঘাতব্যথিত ব্যক্তির ন্যায় মুমূর্ষু হইয়া, কামিনী বৃক্ষের একটি ডাল অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সে স্থান অসহ্য হইল, ভগ্নহৃদয় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে উদ্যানের মধ্যে তাঁহার সেই মনোহারিণীর দেখা পাইলেন; পুনরায় প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইলেন। কুমুদিনী গজেন্দ্র গমনে চন্দ্রালোকে হাসিতে২ আসিতে ছিল। রজনী দেখিলেন কুমুদিনী কোন অসীমসুখে চঞ্চল হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার লাবণ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে রূপ দেখিয়া রজনী চক্ষু মুদিলেন। ইচ্ছা হইল কুমুদিনীর সম্মুখে সেই খানে তাঁহার মৃত্যু হয়—কুমুদিনী হাসিতে২ তাহার নিকট আসিল। রজনী মুখ নত করিয়া রহিলেন—সে লাবণ্য তাঁহার অসহ্য হইল। কুমুদিনী অতি মধুর স্বরে বলিল ভগিনীপতি, এস গৃহে চল; এই বলিয়া হস্ত ধরিল। রজনীর শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? রজনী উত্তর করিলেন না, কি উত্তর করিবেন? কুমুদিনী উত্তর না পাইয়া তাঁহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন দেখিলেন, মুখ অতি ম্লান, দৃষ্টি মৃত্তিকার প্রতি। কুমুদিনী অতি কোমল স্বরে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, ভগিনীপতি কাঁপিতেছ কেন? শরীরে কি কোন অসুখ হয়েছে?" রজনী সে আদরের স্বরে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—এবং বিকৃতস্বরে বলিলেন "শারীরিক অসুখে, না তা নয়।"

কুমু। তবে কেন কাঁপিতেছ?

রজ। কেন কাঁপিতেছি তোমায় কি বলিব কুমুদিনী?

কুমুদিনী পুনরায় সেইরূপ কণ্ঠস্বরে আদর করিয়া বলিল "ভগিনীপতি, আমার বলিবে না ত কাকে বলিবে—আমার মাথা খাও আমায় বল।"

রজ। তুমি কি বুঝিবে কুমুদিনি! তুমি ত কখন নারী রূপের মহিমা দেখিয়া ভুল নাই—যদি কখন জন্মজন্মান্তরে পুরুষ জন্ম ধারণ করিয়া কোন যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হও তবে তখন বুঝিতে পারিবে আমি কাঁপিতেছি কেন।"

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল "ভগিনীপতি যাহারা স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলে, তাহাদিগের কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে। তোমার কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাঁপে?"

রজনী। কুমুদিনি, আজ এক বৎসর যে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—যাহার রূপ দিবারাত্র শয়নে স্বপনে ধ্যান করিয়া থাকি, সেই আদর করিয়া আজ আমার হাত ধরিয়াছে। এক্ষণে বুঝিলে কুমুদিনি কেন আমার হাত কাঁপিতেছে? হাত কি কুমুদিনি—আমার

হৃদয় কাঁপিতেছে।" কুমুদিনী রজনীর হস্ত ত্যাগ করিলেন, লজ্জায় মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল, গৃহে যাইতে দুইএক পদ অগ্রসর হইলেন। রজনী পথ অবরোধ করিলেন, যেন আর কি বলিবেন, কিন্তু কুমুদিনী বলিতে দিল না—অতি মধুর, অতি স্থির, কাতর, অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল "তুমি আমার ভগিনীপতি ছিলে—আছ—চিরকাল থাকিবে—কেন না আমার স্বর্ণ আজিও আমার পক্ষে মরে নাই—কখন মরিবে না—এ হৃদয়ে চিরকাল জাগিবে। আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইব? ছি! যদি আর এ কথা বলিবে, তবে এই কুসুমিত কামিনীর ডালে, এই আঁচল গলায় বাঁধিয়া, তোমারই সম্মুখে মরিয়া স্বর্ণের কাছে গিয়া আশ্রয় লইব।'

রজনী কাঁচা ছেলে। যদি আমাদের মত, বিজ্ঞ লোকের কাছে পরামর্শের জন্য আসিত, তবে আমরা পরামর্শ দিতাম যে বাপু, যা হলো তা হলো, এখন আর ঘেঁটিয়ে কাজ নাই—এখন চখের জল মুছিয়া, ঘরে গিয়া সকাল২ আহার করিয়া, শয়ন কর। কাল সকালে আর কোন একটা সুন্দরী কন্যার সন্ধান করা যাইবে। কিন্তু রজনী কাঁচা ছেলে, অত বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিল,

"আমি এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।"

কু। যদি তোমার প্রতি আমার কি-প্রকার স্নেহ বুঝিতে পারিয়া এ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তবে—কেন আপনার মনে ও রূপ ভাবকে আশ্রয় দিয়াছিলে—

রজ। আমি এতদিন এরূপ উত্তর প্রত্যাশা করি নাই কিন্তু এখন করিয়াছিলাম।

কু। কেন—এখন কিসে?

রজ। আমি আগে বুঝিতে পারি নাই যে আমা হইতে শরৎ কুমার তোমার অনুগ্রহের পাত্র—

কু। (অতি কঠিন স্বরে) আমি জানিতাম রজনী বাবু ভদ্র লোক, কিন্তু তিনি যে ইতরের ন্যায় আড়ি পাতিয়া লোকের গোপনীয় কথা শুনেন তাহা জানিতাম না—বেস করেছেন—কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখন যেন সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া কুমুদিনী ক্রোধে গৃহাভিমুখে চলিলেন; রজনী বিস্মিত হইয়া সেই খানে রহিলেন। তৎপরে আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া দৌড়িয়া কুমুদিনীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন "আমার একটা শেষ কথা শুন—এ কথা তোমার শুনিবার কোন আপত্তি নাই। আমায় যে কটুক্তি করিলে তাহার আমি যোগ্য নহি; আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগের গোপনীয় কথোপকথন শুনি নাই; আমায় দ্বারবানেরা বলিল যে তোমার পিতা এই উদ্যানে আসছেন; আমি তদনুসারে এখানে আসিলাম। কামিনী বৃক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া তোমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিলাম। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত ও চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলাম—কেন তাহা আর বলিতে

চাহি না। সুতরাং তোমার শেষ কথাও শুনিতে পাইলাম—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের কথা শুনি নাই—আমি অভদ্র নহি; আমি ইতর নহি—তুমি আমায় এপ্রকার স্বভাবান্বিত মনে করিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমার সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি আমার সব। তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি আর দেখা দিয়া তোমায় যন্ত্রণা দিব না।"

এই বলিয়া রজনীকান্ত বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কুমুদিনী দেখিলেন যে রজনী এই কথা যখন বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে দুই এক ফোটা বারিবিন্দু পড়িয়াছিল—কুমুদিনী ব্যথিতা হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুহৃৎ-সঙ্গম।

[কলেজ রিউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন উপলক্ষে।*]

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(১)

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে
ভাসা দেখি তায় আশার ফুল।

(২)

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিউস" গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

(৩)

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

(৪)

"কোথা বাল্য-সখা—" বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলে সব তার,
"আয় রে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

(৫)

বল্, বীণা, বল্ "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, মিলিলে স্বপনে,—
আজ্ কি তাঁদের স্মরণে নাই।"

(৬)

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ-নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শিশুর মায়া।

* লেখকের নিয়োগানুসারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইল। ইহা রি-উইনিয়নে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া ছিল।

(৭)

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহলহরী,
ভাসায়ে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি
উড়াতে নিশান বিচিত্র কায়া॥

(৮)

"পড়ে নাকি মনে কত দিন হায়,
'মা'—'মা' বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সথায় সথায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

(৯)

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্ণে এসো সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা॥

(১০)

"নবীন প্রবীণ এসো সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

(১১)

"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে
বাঁধিতে পেরেছি হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে।

(১২)

"তবে কি এখন নারিব মিলিতে?
গাঢ় চিন্তা, আশা যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা ঝটিকা বহিছে যবে?

(১৩)

"করিলে যে আগে এত সে কামনা,—
ধরিলে যে হৃদে এত সে বাসনা—
শুধু কি সে সব শিশুর জল্পনা
ছিন্ন তৃণ সম বিফল হবে?

(১৪)

"চেয়ে দেখ, সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুঠাম সুন্দর মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

(১৫)

"আমরাও তবে হাসিব না কেন?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টি-ধারা ধরি মাথায়॥

(১৬)

"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন দেখ কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করেছে চুরি?

(১৭)

কোথা-সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
"দ্বারিক"-সুহৃৎ বঙ্গের মিহির!
কোথা "অনুকূল" মলয় সমীর!
"দিনবন্ধু" বঙ্গ-সাহিত্য-সুরি!

(১৮)

"শ্রীমধুসূদন" কোথা সে এখন!
তার তরে আর কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা?

(১৯)

"হে বঙ্কিম, সখে তোমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না রবে—
কালেতে হইবে সকলি হারা।

(২০)

"তাই বলি ভাই এসো একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে।

(২১)

"আর কত দিন বাঁচিব সে বল—
বাঙ্গালির ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে সে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে!

(২২)

"এ শোকের ছায়া ছিল না যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয় দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময়।

(২৩)

"সবে সখা-ভাব—ছিল না বিচার
ধনাঢ্য, কাঙ্গাল, রাজপুত্র আর,
একি সে আসন, পঠন সবার—
আনন্দে হৃদয় মগন রয়।।

(২৪)

"সেই সুখময় সুহৃত্তের মেলা,
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,
সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।

(২৫)

বাজ বীণা এবে মিলি সব তার,
মৃদুল মৃদুল করিয়া ঝংকার,
প্রণয় কুসুম ফুটারে সবার,
সরস মধুর জলদ তালে।।

[কোরস্]

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ বীণা, বেগে আনন্দের সঙ্গে,
খেলায়ে হৃদয়ে সুখের তরঙ্গে,
ভাসারে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন গায়কের গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ,
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল।।

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃত-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

বর্ষ সমালোচন।

সম্বাদ পত্রের প্রথা আছে, নববর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন সম্বাদ পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষ-সমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে

রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেণ্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ-শালী সম্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট, যে যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্ব্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভা-গ্যের বিষয় এই যে বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছা-চারী। অতএব আমরা, মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া, অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ শালের সমা-লোচন করিব। অতএব হে গতবর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব।

গতবৎসরে রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনু-সন্ধান করিয়া জানিয়াছি,যে এই বৎসরে তিনশত পয়ষট্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা এক-টিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত; আমরা এ কথার অনুমোদন করি না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সম্বাদপত্রলেখকদিগের শ্রম-লাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে, গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভাল হয় বটে। আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এবৎ-সর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি-তেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে। যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে একবৎসর বাড়িল কি প্রকারে? নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অয-থার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এবৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, যে এ বৎসর অনে-কেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিষ্টিমেণ্টেল ডিপার্টমেণ্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন, যে কাহারও ২ পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের

বিষয় এই যে এবৎসর কতক গুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লিমেণ্টে আবেদন করিবেন, যে এই পুণ্যভূম ভারতরাজ্যে, মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এই রূপ প্রস্তাব করেন, যে যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিষে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসরে ফাইন্যান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা, হয় কিছু উদ্বর্ত্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক২ মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ শালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে আমরা একথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এ বার বিচারালয় সকলের কার্য্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না; যে খানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে, নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহুক, বা না চাহুক সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে২ বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত গৃহে২ ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন, যে বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে২ প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য, যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সম্মার্জ্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জ্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিম দিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্পপ্রিয় ইঁহারাও তেমনি সর্ম্মার্জ্জনীপ্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে গবর্ণমেণ্টের কোন অধস্তন কর্ম্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন, যে যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য "অর্ডর অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জন্য "অর্ডর অব দি ব্রুম্ষ্টিক্" সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ২ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজজপ্রভৃতিকে বাছিয়া২ লাকলাইনের দড়িতে এই মহারত্নটিকে বাঁধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদর বিভূষিত সদা কম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদ

স্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে এত উমেদওয়ার যুটিবে যে ঝাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইবে।

গতবৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্ম আবেদন করিয়াছেন, যে ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোন২ মান্য সহযোগী বলেন, যে যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবেনা—কেননা বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশ-দেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে২ এক একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশ খণ্ডে বাঁধিয়া উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভীস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতৈষিণী নন্—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কান্নাটা মাঠেগিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়, ও মেঘ ডিপার্টমেণ্ট এবালিষ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি, যে আকাশবৃষ্টির পরিবর্ত্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পুলিষের বন্দবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্যুতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না, কিন্তু রমণীনয়ন-মেঘের কটাক্ষ বিদ্যুতে,মাঠের মাঝখানে, চাষা ভুষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পুলিষ থাকা ভাল।

শুনিলাম শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কাণমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবনেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাঁহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি মাপা কাটি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার, পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

—0○0—

চীন্, ভারতবর্ষ, কাল্‌ডীয়া, মিসর এবং গ্রীস দেশে খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয়। চীনেরা এই শাস্ত্র রাজনীতি এবং হিন্দু ক্যাল্‌ডীয় ও মিসর জাতিরা ধর্ম্মনীতির ন্যায় অপরিবর্ত্তসহ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু গ্রীসে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি অথবা ফলিত জ্যোতিষের সহিত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের কোনরূপ সংস্রব না থাকায় উক্ত দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। হিপার্কস্ এবং টলেমি কর্ত্তৃক যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয়, নিউটন্ এবং লাপ্লাসের দ্বারা তাহারই পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে চীন, ভারতবর্ষ, ক্যাল্‌ডীয়া এবং মিসর দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রালোচনার আরম্ভ হয় তাঁহা নিরূপণ করা সুকঠিন; এবং আধুনিক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ জাতিবিশেষের গৌরব রক্ষার্থ যত্নবান্ হওয়াতে এই বিষয়ের মীমাংসা অতীব দুরূহ হইয়াছে। যাহা হউক, ক্যাল্‌ডীয়া এবং মিসর দেশের জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রতীতি হইবে যে তত্তদ্দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বহুকালব্যাপী অনুশীলন হয় নাই।

—

চীন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিবরণ হইতেই চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাট্ ফোহির রাজত্ব সময়ে চীন দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ফোহি এবং নোয়া ব্যক্তিবিশেষের নামান্তর মাত্র। ফোহি জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং গগনবিহারীদিগের আকৃতি নিরূপণেও বহুবিধ যত্ন করিয়াছিলেন। হোয়াংটীর রাজত্ব সময়ে (প্রায় খৃঃ পূঃ ২৬৯৭ অব্দে) যুসি উপমেরু নক্ষত্র, এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি অচল এবং সচল বৃত্ত সম্বলিত একটী গোলক নির্ম্মাণ করেন, এবং চারিটী প্রধান দিঙ্‌নিরূপণোপযোগী যন্ত্রের (যাহা কেহ দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গব্রিল সাহেব লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে চীনেরা অপমণ্ডলের তির্য্যক্‌কৃতা এবং গ্রহণের প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিয়াছিলেন; এবং ইহার বহুকাল পূর্ব্বে সৌর বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং শঙ্কু-

চ্ছায়া দ্বারা সৌর মাধ্যাহ্নিক উন্নতি অবধারিত করিয়া সূর্য্যের ক্রান্তি নির্ণয়, এবং মেরুর উন্নতি প্রভৃতি নিরূপণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গব্রিল আরও লিখিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে প্রণীত চীন দেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে চীনেরা সূর্য্যের এবং চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি, এবং গ্রহগণের পরিভ্রমণকাল নিরূপণ করিয়াছিল। ডিউহোণ্ড বলিয়াছেন যে চিউন কং নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রায় ১০০০ বৎসর খৃঃ পূঃ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জে নক্ষত্রগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয়।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নাক্ষত্রিক বর্ষের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩০ সেকেণ্ড; এবং সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা, ৫০½ মিনিট নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গণনানুসারে বিষুবদ্বয় প্রতিবৎসর ৫৪″ পুরোগমন করে। তাঁহারা অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপন্ন করেন তাহা ২৪° পরিমিত; চন্দ্রকক্ষও নিরক্ষবৃত্ত পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে ছিন্ন করিয়া যে কোণ উৎপাদন করেন তাহা ৪° ৩০′ পরিমিত; বুধ, শুক্র এবং শনির কক্ষাবনতি ২° মঙ্গলের কক্ষাবনতি ১° ৩০′ এবং বৃহস্পতির কক্ষাবনতি ১° পরিমিত বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা কক্ষ-পরিধি যোজন দ্বারা পরিমাণ করিতেন। কোল্‌ব্রুক্ বলিয়াছেন যে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন নিরূপণ করিয়াছিলেন। ৩৩০০ যোজনে ২৫,০৮০ মাইল; অথবা এক অংশে ৬৯.৭ মাইল গণিত হয়। কোল্‌ব্রুক্ আরও বলিয়াছেন যে গ্রহগণের পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু, ও দূর বিন্দুর গতি বিষয়ক হিন্দু সিদ্ধান্ত, চন্দ্রের পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু ও দূর বিন্দুর সাদৃশ্য হইতে অনুমিত হইয়াছে। টলেমি প্রচারিত মতের যে অংশ হিপার্কসকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়, তাহাও হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। ইহারা লঙ্কার যাম্যোত্তর বৃত্ত হইতে দ্রাঘিমা গণনা করিতেন। সৌরবৎসর, চান্দ্রমাস এবং বিষুবতের পুরোগমন এই তিন বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষিক গণনা যে হিপার্কস্ অথবা টলেমির গণনা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুরা আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণ ফল মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য দশটি নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; তদ্যথা (১) গোল, (২) নাড়ীবলয়, (৩) যষ্টি, (৪) শঙ্কু, (৫) ঘটী, (৬) চক্র, (৭) চাপ, (৮) বৃত্তপাদ, (৯) ফলক, (১০] ধীযন্ত্র। * ইহা ব্যতীত সূর্য্যসিদ্ধান্তে নরযন্ত্র † এবং সসূত্র রেণুগর্ভাখ্য ‡ যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ১১অ ২।
† সূ সি ১৩ অ ১৪
‡ সূ সি ১৩ অ ২২।

হিন্দুরা ৪৩২,০০০ বৎসরে একযুগ এবং দশযুগে অথবা ৪,৩২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ, এবং এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প অথবা ব্রহ্মার একদিবস গণনা করিতেন। এই সুদীর্ঘ কালের সহিত জ্যোতিষিক কালচক্রের সম্বন্ধ নিরূপণার্থ পণ্ডিতেরা নানাবিধ যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।*

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে বরাহ মিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮খৃঃ অব্দে, এবং কোল্‌ব্রুক সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে তিনি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দ শেষে বর্ত্তমান ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত "ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত" অথবা "ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। কোল্‌ব্রুক্ বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থে গ্রহগণের সমগতি ও তাহাদিগের প্রকৃত স্থান সন্নিবেশ নিরূপণ বিষয়ক গণনা, সাময়িক সম্পাদ্য, ভূপৃষ্ঠে স্থান নিরূপণের উপায়, সৌর এবং চান্দ্র গ্রহণ গণনা, গ্রহগণের উদয়াস্ত কাল নির্ণয়, শঙ্কুদ্বারা উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ, গ্রহগণের পরস্পর এবং নক্ষত্রগণের সহিত সংযোগ, চান্দ্র এবং সৌর গ্রহণের কারণ, এবং গোল প্রভৃতি নির্ম্মাণের উপায়, বর্ণিত আছে।

এই সকল স্বীকৃত বিষয় হইতে কোল্‌ব্রুক্ এবং উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন যে—বরাহমিহির খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের শেষে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বরাহমিহির ফলিত-জ্যোতিষ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন এবং "বৃহৎ-সংহিতা" প্রণয়ন করেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ খৃঃ ২০০ অব্দে অপর এক বরাহমিহিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণে জনশ্রুতি আছে যে বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার একটী রত্ন ছিলেন। তাহা হইলে তিনি যে খৃঃ পুঃ ৫৬ অব্দে জীবিত ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। †

আর্য্যভট্ট, (আরবেরা যাহাকে আর্য্যবাহার বলে,] খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আর্য্যভট্ট জ্যোতিষ এবং বীজগণিত বিষয়ক যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন।

পুলিষ এবং পরাসর প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আর্য্যভট্টের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইহাদিগের

* এ বিষয়ে একটি কথা আমাদিগের মনে হয়। বিষুবদ্বয় প্রতিবৎসর ৫৪ পুরোগমন করে তাহা হইলে ৩৬০ঃ [সম্পূর্ণ মণ্ডল] ২৪০০০ বৎসরে পুরোগমন করিতে পারে। ইহারই অষ্টাদশ গুণ ৪৩২০০০। কিন্তু আমরা স্বীকার করি ইহাকে বলে, "গোঁজা মিলন।" প্রাচীন আর্য্যঠাকুরেরা এইরূপ গোঁজা মিলন দিয়াছিলেন কি না কে জানে?—বং সং

† বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি ছিলেন। বং সং

বিরচিত কোন গ্রন্থই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভাস্করাচার্য্য "লীলাবতী," "বীজ-গণিত," "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক গ্রন্থ "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত" কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় নাই। অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এক্ষণে যে গ্রন্থ "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে প্রসিদ্ধ, প্রাচীনকালে সেই গ্রন্থেরই নাম "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" ছিল কি না তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। হিন্দুরা সময়ে সময়ে আপনাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করিতেন, কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিতেন না। সম্ভবতঃ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইয়াছে।

বেণ্টলী সাহেবের মতে বরাহমিহির "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" প্রণেতা; কিন্তু কোলব্রুক্ এই মতের অপলাপ করিয়াছেন।

হিন্দু এবং ব্রহ্মদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে রাহু নামক গ্রহদ্বারা সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রস্ত হওয়াতে গ্রহণ হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতি, অবস্থান, বক্রগমন প্রভৃতি পাতবিন্দু এবং সংযোগবিন্দু অধিষ্ঠিত দেবতাদিগের প্রভাবেই হইয়া থাকে। আর্য্যভট্ট গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতিও নির্ণয় করিয়াছিলেন; এবং এই আহ্নিকগতির কারণ "প্রবাহ" নামক প্রবল বায়ু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই মতের অপলাপ করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ হইলে উপরিস্থিত সকল পদার্থই ভূপৃষ্ঠে পতিত হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথূদক স্বামী ব্রহ্মগুপ্তের এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খৃঃ অব্দে লৌবেরী শ্যামরাজ্যে রাজদৌত্যে প্রেরিত হন। স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে তিনি শ্যামদেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা লইয়া যান। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ডিউষাম্প নামক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক কর্ণাট দেশস্থ কৃষ্ণ বৌরাম বা কৃষ্ণ বা রাম নামক নগর হইতে ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা প্রেরণ করেন। এই সময়ে পাটোইলেট নামক অপর একজন প্রচারক ও মসলিপত্তনের নিকটবর্ত্তী নর্শপুর নামক স্থান হইতে অন্যান্য জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে লা-জেন্টিস্ যিনি শুক্র গ্রহের সূর্য্যতিক্রম পর্য্যবেক্ষণ মানসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ত্রীবেলোর হইতে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্যাম দেশীয় তালিকা খৃঃ ৬৭৮ অব্দে, কৃষ্ণ বৌরামের তালিকা খৃষ্টীয় ১৪৯১ অব্দে, নর্শপুরের তালিকা খৃঃ ১৫৫৯ অব্দে ত্রীভ্যালোরের তালিকা খৃঃ পূর্ব্ব ৩১০২

অব্দে, অর্থাৎ কলিযুগের প্রারম্ভে, প্রস্তুত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, গেক্কেয়ার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। লেস্‌লী এই মতের অপলাপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোল্‌ব্রুক্ লেস্‌লির মত প্রমাদপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন খৃষ্টীয় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিলামব্রী গ্রীক্‌দিগের জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে গ্রীক্‌জাতিই সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রণেতা।

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, প্রথমতঃ যে সকল গ্রন্থ দেবদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত পুরাতন ঋষিদিগের দ্বারা প্রণীত; তৃতীয়তঃ যেসকল গ্রন্থ কোন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক রচিত, চতুর্থতঃ যেসকল গ্রন্থের প্রণয়ন কাল এবং রচয়িতার নাম আমরা অবগত হইয়াছি।

ব্রহ্ম, সূর্য্য, সোম, বৃহস্পতি এবং নারদ সিদ্ধান্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ইহা "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" পুরাণের অন্তর্গত।

২। সূর্য্যসিদ্ধান্ত—কথিত আছে যে সূর্য্যদেব ময় নামক দানবকে* কৃত † যুগাবসানে এই শাস্ত্রে উপদেশ দেন।‡ সুতরাং হিন্দু গণনানুসারে এই গ্রন্থ ২১৬৪৯৭৬ বৎসর* পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। বেণ্টলী সাহেব গণনা দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত খ্রী ১০৯১ অব্দে রচিত হয়; কিন্তু এই মত প্রমাদপূর্ণ, সুতরাং গ্রহণীয় নহে।

৩। সোমসিদ্ধান্ত—সোম (চন্দ্র) এই গ্রন্থ প্রণেতা। বেণ্টলী সাহেব বলিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতই এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে।

৪। বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয় ছিল।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত—১ অধ্যায়—৪।৫।

† কৃত—কৃ-করা+ত।

‡ আবুর রেহান, যিনি গজ্‌নিপতি মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ১০৩১ খ অব্দে ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "লাত" নামক ব্যক্তি বিশেষকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওয়েবার সাহেব ব্রহ্মগুপ্ত বর্ণিত "লাধ" এবং "লাত" এক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র নাম মাত্র অনুমান করিয়াছেন।

* ত্রেতার (ত্র-রক্ষা-ইত-আ) বৎসর সংখ্যা—১২৯৬০০০ দ্বাপরের (দ্বি-পর)—বৎসর সংখ্যা—৮৬৪০০০ কলির (কলগণনা-ই) অতীত বৎসর সংখ্যা—৪৯৭৬

৫। নারদস্কিান্ত—ইহা দেবর্ষি নারদ প্রণীত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। গর্গসিদ্ধান্ত—এই গ্রন্থ এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়াছে; কেবল হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে কখন কখন গর্গসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত অংশমাত্র দৃষ্ট হয়।

২। ব্যাস সিদ্ধান্ত।

৩। পরাশর সিদ্ধান্ত—বেণ্টলী সাহেব বলেন যে আর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায় পরাশর প্রণীত সিদ্ধান্ত লিখিত গ্রহগণের সমগতি বিষয়ক প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। পৌলিষ সিদ্ধান্ত—কোলব্রুক এবং বেণ্টলী এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এবং আর্য্যসিদ্ধান্তের মত পরস্পর বিরোধী।

৫। পুলস্ত সিদ্ধান্ত।

৬। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত—বেণ্টলী এবং কোলব্রুক সাহেব বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বেণ্টলী আরও বলিয়াছেন যে বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তে অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। আর্য্যসিদ্ধান্ত—আর্য্যভট্ট "আর্য্যাষ্টশতক" এবং "দশগীতক" নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বেণ্টলী সাহেব "আর্য্যসিদ্ধান্ত" এবং "লঘু-আর্য্যসিদ্ধান্ত" নামক যে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় উক্ত দুইখানি গ্রন্থেরই নামন্তর হইবেক।

২। বরাহসিদ্ধান্ত—বরাহমিহির ব্রহ্ম, সূর্য্য, পৌলিষ, বশিষ্ঠ এবং রোমক সিদ্ধান্তের সার সংগ্রহ করিয়া "পঞ্চ সিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ব্রহ্মগুপ্ত রচিত। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম "ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত।" ভাস্করাচার্য্য এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" রচনা করেন।

৪। রোমকসিদ্ধান্ত—কৃষ্ণ বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের মতাবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বরাহমিহির প্রণীত সিদ্ধান্তে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৫। ভোজসিদ্ধান্ত—খ্রীষ্টীয় দশ বা একাদশ শতাব্দে ধাররাজ ভোজদেবের রাজত্ব সময়ে এই জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচিত হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ পাঁচ খানি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য্য "সিদ্ধান্তশিরোমণি" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব ভাস্কর ১০৩৬ শকে* মহেশ্বরের ঔরসে জন্মগ্রহণ

* "The yea's of the era of Sâlivâhana are, accordingly to Warren, Solar years; their reckoning commences after the lapes of 2179 complete years of the Iron age, or early in April A. D. 78
** The years of this era are generally cited as Saka or Saka

করিয়া ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সহ্য পর্ব্বত নিকটবর্ত্তী কোন নগর ইঁহার পৈতৃক বাসভূমি ছিল।†

২। খৃ ষোড়শ শতাব্দারম্ভে জ্ঞানরাজ "সিদ্ধান্তসুন্দর;" ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃ অব্দে) গণেশ "গ্রহলাঘব" এবং ১৬২ খৃ অব্দে কমলাকর "তত্ত্ব-বিবেক বা "সিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিবেক" রচনা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের সুবিখ্যাত টীকাকার রঙ্গনাথের পুত্র মুনীশ্বর "সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌম" নামক জ্যোতিষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণির একটি টীকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ মধ্যে "সূর্য্যসিদ্ধান্ত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" এবং "গ্রহলাঘব" মুদ্রিত হইয়াছে।

কালডীয়।

মাসিদনাধিপতি বিখ্যাত বীর আলেকজণ্ডার খৃ পূঃ ৩৩২ অব্দে বাবিলন আক্রমণ করেন। কথিত আছে ইহার ১৯০৩ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনীয়দিগের কতকগুলি জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ ফল কালিস্ থেনিস কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ নামা আরিষ্টট্লের নিকট প্রেরিত হয়, সুতরাং খ্রীষ্টীয় শকের ২২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে কালডীয় দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু টলেমী খৃ ৭২০ বৎসর পূর্ব্বে কালডীয় পর্য্যবেক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। যদিও কালডীয়দিগের গ্রহণ গণনা করিবার প্রথা, যাহা টলেমী প্রণীত আলমাজেষ্ট নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে, তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তথাচ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য জাতিরা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বর্ত্তমান উন্নতি করিয়াছেন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কালডীয় জাতি রাশিচক্র দ্বাদশ সমান অংশে, প্রত্যেক অংশ ৩০° এবং প্রত্যেক (°)৬০ বিভক্ত করিয়াছিল; এবং রাশিচক্রের বহিঃস্থ চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানও নিরূপণ করিয়াছিল। হেরোডোটস্ নামক জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে কালডীয় জাতি শঙ্কু এবং পোলস্ নামক যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শঙ্কু ব্যবহৃত হয়। পোলস্ যন্ত্রের দ্বারা বোধ হয় কালডীয়েরা অয়নবিন্দু নিকটবর্ত্তী সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক উন্নতির পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিত। ঘটীই ইহাদিগের কালমাণ-যন্ত্রস্বরূপ ছিল।

আপলোনিয়স্ মিন্ডিয়স নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্যাল্ডীয় আচার্য্য হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অ্যাপলোনিয়স্ বলিয়াছেন যে ক্যাল্ডীয় জাতি গ্রহগণ এবং ধূমকেতুগণ এক জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত এবং

---

years." Burgess's *Surya Siddhanta, add. notes.* 12

† সিদ্ধান্ত শিরোমণি—১৩ অ-৫৮।৬১।

এই গগনবিহারীদিগের গতির নিয়মও নিরূপণ করিয়াছিল। আপলেনিয়সের বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ক্যাল্‌ডীয় জাতি যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সমধিক অনুশীলন করিয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবার নহে।

জেমিনস্‌ লিখিয়াছেন, কাল্‌ডীয় জাতি যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগালোচনা করিয়াছিল তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তাহাদিগের গণনানুসারে চন্দ্র ৬৫৮৫ $\frac{১}{৩}$ দিবসে সূর্য্য সম্বন্ধে ২২৩ বার, আপন কক্ষের নিকট বিন্দু ও দূরবিন্দু সম্বন্ধে ২৩৯ বার, এবং আপন পাতবিন্দু সম্বন্ধে ২৪১ বার আবর্ত্তন করে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে কাল্‌ডীয় জাতি অতিশয় যত্ন সহকারে গ্রহগণ, বিশেষতঃ শনৈশ্চর গ্রহ, পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

মিসরীয়।

পূর্ব্বকালে মিসরদেশ বাসীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডীওডোরস্‌ সিকুলস্‌ বলিয়াছেন যে মিসরীয়েরা গ্রহণ গণনা করিতে পারিত; এবং ডীওজেনিস লেয়ার্‌র্সিউস্‌ মিসর দেশে পর্য্যবেক্ষিত ৩৭৩ সৌর এবং ৮৩২ চান্দ্র গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে যে কোনন্‌ (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দ) মিসরীয় সমস্ত সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং আরিসটটল্‌ লিখিয়াছেন যে কালডীয় এবং মিসরীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সকল জ্যোতিষিক গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রম মাত্র নাই।

মিসরীয়েরা ৩৬৫ দিবসে বৎসর গণনা করিত বটে, কিন্তু ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ দিবসে বৎসর গণনা যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, তাহাও অতি প্রাচীন কাল হইতেই অবগত ছিল। ডাও ক্যাসিয়স্‌ বলিয়াছেন যে মিসরীয়েরা সপ্তাহ গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করে; এবং গ্রহগণের নামানুসারে সপ্তাহান্তর্গত দিবস সংখ্যার নাম নির্দ্দেশ করে। হিন্দু পুরাণেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই মত অত্যন্ত প্রাচীন বলিতে হইবেক।

মিসর জাতি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র জ্ঞান করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল যে শুক্র এবং বুধ গ্রহ সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, এবং সূর্য্য উক্ত পরিভ্রমণকারী গ্রহদ্বয়ের সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। সুতরাং শুক্র এবং বুধ কখন বা সূর্য্যাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী, কখন বা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী, হয়। ম্যাক্রোবিয়স এই মত বিশুদ্ধ মিসরীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে ২৫০০ খৃঃ পূঃ মিসরীয়েরা রাশিচক্র এবং দ্বাদশ রাশির নাম ও অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। লাপলাস্‌ প্রভৃতি কতিপয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনীঃ

সাং ভবানীপুর।

বাঙ্গালি কবি কেন?

ইউরোপীয়েরা কবিত্বের উপর অনেকটা হতাদর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ এবং যত্ন বিজ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত। কাব্যের এইরূপ অযথা অনাদর দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সে দিবস একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিতেছিলেন,—বিজ্ঞানের অনুশীলন কর, তাহা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া জড়-প্রকৃতিকে সারসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিতেছ কেন? মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং যেমন বুদ্ধিবৃত্তির, তেমনি হৃদয়েরও অনুশীলন হওয়া কর্ত্তব্য। ইউরোপে তাহা হইতেছে না।

আমাদিগের দেশেও তাহা হইতেছে না। ইউরোপ একদিকে ছুটিতেছে; আমরা তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছি। প্রাচীন গ্রীসে যে কয়েকটি রস কাব্যের আধার বলিয়া পরিগনিত ছিল, আধুনিক ইউরোপেও তাহাই আছে; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের পাঁচটি ভূতের স্থানে এক্ষণে পয়ষট্টিটী দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। প্রাচীন ভারতে যে পাঁচটি ভুত ছিল, এখনও সেই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম আছে, কিন্তু রসের যারপর নাই ছড়াছড়ি। মূলরসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই বটে, কেননা যাহা প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা হিন্দুসন্তানের পক্ষে পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে গণ্য; কিন্তু শাখা প্রশাখার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নয়টি রস ছিল। শান্তিরস তাহার মধ্যে একটি। সেই শান্তিরসের একটি শাখা, ভক্তিরস। আমাদের দেশে এখন একা ভক্তিরসই চৌষট্টিবিধ।* ইউরোপীয়েরা প্রাচীন রসেই সন্তুষ্ট; যত কারিগরি, তাহা ভূতের উপর। আমরা প্রাচীন ভূতেই সন্তুষ্ট; কারিগরি কেবল রস লইয়া। ইউরোপে কেবল বিজ্ঞান—কেবল অম্লজন, জলজন, আর যবক্ষারজন; আমাদের দেশে কেবল রস, কেবল কল্পনা, কেবল কবিত্ব—কেবল নির্ম্মল চন্দ্রিকা আর প্রফুল্ল মল্লিকা, কোকিলের কূজন আর ভ্রমরের গুঞ্জন, কবরীভূষণ আর কাঁচলিকষণ, বিরহিণী বালা আর যৌবনের জ্বালা।

কল্পনার এইরূপ অযথা অনুশীলন এবং বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ অযথা অনাদর দেখিয়া অনেকে ভীত। বিজ্ঞান২ করিয়া অনেকে মাথা কপাল ভাঙ্গিয়া মরিতেছেন, তবু বিজ্ঞান হয় না। আবার 'কল্পনায় আর প্রয়োজন নাই, অনুগ্রহ করিয়া ইতি কর' বলিয়া গলা ভাঙ্গিতে-

* হরিভক্তিরসামৃত সিন্ধু দেখ।

ছেন, তবু কল্পনা ফুরায় না—কাব্যের উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপন্যাসের উপর উপন্যাস, তাহার উপর নবন্যাস—কল্পনার ছড়াছড়ি। যে কেহ দুই একখানা পুস্তকের দুই এক পাতা উল্টাইয়াছেন কি না উল্টাইয়াছেন, অমনি সাহিত্যের আসরে নামিয়া 'সখিরে সখি' করিতে বসেন।

কেহ না মনে করেন, যে আমরা কাব্যের নিন্দা করিতেছি। নিন্দা করা দূরে থাক্, কাব্যের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী এবং কবিদিগকে আমরা যার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকি। ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে, যে হোমর এবং বর্জ্জিল যত লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া থাকেন, এত আর কেহ না। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে, পুণ্যের পথে উৎসাহিত করিতে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, কবির ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে আর কেহই পারেন না। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মোপদেশ প্রায় ভাসিয়া যায়—প্রায় এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; কিন্তু কবির কথা হৃদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন, যে 'বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নরকভোগ করিতে হইবে,' তাহা হয় ত শুনিয়াও শুনি না, কেন না ধর্ম্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথা মাত্র—নরকের ভাব মনোমধ্যে স্পষ্টীকৃত করা ধর্ম্মোপদেশকের সাধ্যাতীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ নহে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে নরকে যাইতে হইবে, এরূপ অকার্য্যকর অর্থবিহীন বাক্য কবি প্রয়োগ করিলেন না; সেই নরকের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইলেন। আমরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, ভীতিসংকুচিতচিত্তে দেখিলাম,—গভীর নিশায়, পৃথিবীর লোক ঘুমাইতেছে, কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের রাজ্ঞীর চক্ষে ঘুম থাকিয়াও নাই; তেমন নিদ্রার অপেক্ষা জাগরণ ভাল। গভীর নিশায় লেডি ম্যাক্‌বেথ দীপ হস্তে করিয়া, চক্ষে নিদ্রা আছে অথচ চলিয়া বেড়াইতেছেন, নিদ্রায় তাঁহার শান্তি নাই, কেন না তিনি বিশ্বস্তের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, নিদ্রিতকে জোর করিয়া চিরনিদ্রিত করিয়াছেন। কবির সঙ্গে, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেই হতভাগিনীর পাপ-আশীবিষদংশিত মনের উদ্ভ্রান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিলাম—ভীত হইলাম। পার্শ্বে চিকিৎসক ছিলেন, তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হায়! হায়! যাহা তুমি জানিয়াছ তাহা তোমার জানা উচিত ছিল না,—রোমাঞ্চ হইল। সামান্য পরিচারিকা, সে উঠিয়া বলিল, "সমস্ত শরীরের গৌরবের জন্যও আমি এমন হৃদয় বক্ষের ভিতর চাহি না"—দাসীর মুখের কথা শুনিয়া হৃদয়ের ভিতর হৃদয় ডুবিয়া গেল।* কবির নিকট বিদায় লইলাম,

* Macbeth. Act. v. scen I.

কিন্তু এ অপূর্ব্ব নরকচিত্র হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল। এমন জীবন্ত উপদেশ স্মৃতি থাকিতে ভুলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, পাপের কদর্য্যতা দেখাইতে এবং পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে, কবি অদ্বিতীয়। কাব্য ভাল।

কাব্য ভাল, কিন্তু কথা কি জান,কোন বিষয়েরই বেজায় বাড়াবাড়ি ভাল নহে। সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং। কাব্য ভাল, কাব্য থাক, কিন্তু তাই বলিয়া আর কিছু না থাকিবে কেন? সকলই কিছু কিছু চাই, নতুবা সংসার চলে না। কেবল কোমলতা ভাল নহে—স্ত্রীলোকের সংসারে বাতাসের ভর সহে না; কেবল কাঠিন্যও ভাল নহে—পুরুষের সংসারে বিলিব্যবস্থা থাকে না। স্ত্রীলোকে পুরুষে যে সংসার গঠিত তাহাই ভাল,তাহাই চলে। সমাজেও তাই। জগতের একই নিয়ম; যে নিয়মবলে ফলটি খসিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, অখিল সংসার সেই নিয়ম জোরে বাঁধা! যে নিয়ম ক্ষুদ্র পরিবারে, সেই নিয়ম বৃহৎ সমাজেও। স্পার্টা কেবল পুরুষের সমাজ,কেন না স্পার্টার স্ত্রীলোকেরাও পুরুষ—স্পার্টান সমাজ চলিল না; বিদ্যুতের ন্যায়, ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া অমনি নিবিয়া গেল। বঙ্গদেশ কেবল স্ত্রীলোকের সমাজ, কেন না বঙ্গদেশের পুরুষেরাও স্ত্রীলোক, সুতরাং বাঙ্গালার অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভাবিতে গেলে পেটের ভাত চাল হইয়া যায়। স্ত্রীলোকে পুরুষে মিলিয়া যে সমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজই চলে। কোমলে কঠিনে মিলন হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল। সৌন্দর্য্যের সহিত বলের সামঞ্জস্যই প্রকৃতির চরম উন্নতি। যৌননির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, প্রকৃতিকে সেইদিকে লইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সংসার বলীয়ান্ হইতেছে; যৌননির্ব্বাচন সংসারকে সুন্দর করিতেছে। যাহা সুন্দর এবং বলীয়ান্, তাহাই চলে, কেবল সুন্দর চলে না, কেবল বলীয়ান্ও চলে না। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ইতালি মারা গিয়াছে—কবির দুঃখ এই যে, ইতালি তুমি এত সুন্দর হইয়াছিলে কেন? কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ভারতবর্ষ মারা গিয়াছে—ভারতীয় কবিও এই দুঃখ করিতে পারেন। কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া ওয়াল্টার স্কটের কাব্য সকল মারা গিয়াছে—তাহাতে প্রচুর সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বল নাই, সুতরাং সে সকলের বড় একটা আদর নাই। আবার কেবল বল লইয়া স্পার্টা মারা গিয়াছে, কেবল বল লইয়া ক্ষত্রিয়েরা মারা গিয়াছেন। কেবল বল লইয়া কবিকঙ্কণ মারা গিয়াছেন। দুই চাই। ইহাই প্রকৃতির উপদেশ; এবং প্রকৃতির উপদেশ সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা মঙ্গল নাই। আমরা প্রকৃতির উপদেশ গ্রহণ করিতেছি না; যাহাতে বল হইবে তাহার কোন অনুষ্ঠানই নাই, সুতরাং আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু

গ্রহণ যে করিতেছি না, তাহার কি কোন কারণ নাই? জগতে কিছুই নিষ্কারণ নহে; আমাদের কবিত্বপ্রবণতার কি কোন কারণ নাই? অবশ্য আছে; এবং সে কারণ কি, তাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একটা কথার মীমাংসা করা উচিত। কবি কাহাকে বলা যায়?

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অনুভাবকতা এবং কল্পনা। অনুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা ঘৃণা করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন দুঃখ ভাবিয়া মনে২ বলিয়াছেন 'আজিকার রজনী যেন আর পোহায় না,' যে কেহ সুখ ভাবিয়া একদিন মনে মনে বলিয়াছেন, 'সূর্য্যদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্র২ পাটে গিয়ে বসো বাপু,' তিনিই কবি। যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাঁদিয়াছেন তিনিই কবি; এবং এ সুখদুঃখের সংসারে কে হাসে নাই—কে কাঁদে নাই? অতি পরিষ্কার আকাশেও কালো মেঘ দেখা যায়, আবার নিবিড় জলদের কোলেও সৌদামিনী হাসে; তেমনি সহস্র সুখের মধ্যেও একটু দুঃখ থাকে, আবার সহস্র দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ থাকে। সুতরাং অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই। তা ঠিক; তবে কি না যার হৃদয় কঠিন তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে না—সে ব্যক্তি ভাব অনুভব করে বটে কিন্তু তার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই, কেন না তরঙ্গ কাঠিন্যের ধর্ম্ম নহে। আর যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, কেন না তরঙ্গ তরলতারই ধর্ম্ম—তরলতার ভঙ্গী বিশেষের নামই তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যার উঠে এবং ইহার মূর্ত্তি ভাষার বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। যে পারে না, সে কবি হইয়াও কবি নহে। সেই জন্য সকলে কবি নহে। বাঙ্গালির হৃদয় কোমল, বাঙ্গালিহৃদয় তরল, এইজন্য বাঙ্গালি কবি। আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি, কুসংস্কারান্ধ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি। কিন্তু এ কল্পনা, এ অনুভাবকতা কোথা হইতে আসিবে?

প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মের বন্ধনে হিন্দুসমাজকে অষ্টপৃষ্ঠে ললাটে বাঁধিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য স্বাধীন ভাবে হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য থাকে না, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেই বন্ধনে বাঁধিতে হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি পাকাইয়া২ বৃহৎ এক রজ্জু নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া, রজ্জুর দুই মুখ স্বহস্তে ধরিয়া বসিলেন। যদি কেহ কখন বন্ধন মুক্ত হইবার উপক্রম করিল, অমনি রজ্জু টানিয়া তাহাকে ব্যথিত করা হইল—তাহার মান গেল, কুল গেল,

সম্ভ্রম গেল, জাতি গেল, ইহলোক গেল, পরলোক গেল। অগত্যা সকলকে বন্ধন স্বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রের উপর, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাক্যের উপর বাক্যব্যয় করা পঞ্চমহাপাতক তুল্য গণ্য হইল। যাহা কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে তাহাই সত্য; তাহাতে শতসহস্র জাজ্বল্যমান ভ্রম থাকিলেও তাহা অভ্রান্ত। দুইটি কথা, যাহা সরল বাঙ্গালা ভাষায় বলিলে মূর্খেও পরস্পর বিরোধী বলিয়া বুঝিতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিলেই দুইটিই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ নিরয়ে পচিতে হইবে। যে সকল স্থল বুঝিতে পার না, তাহাও বিশ্বাস কর। বুঝিতে যে পার না, সে তোমার বুদ্ধির দোষ; তন্নিবন্ধন শাস্ত্রের অগৌরব কেন করিবে? সব মিটিয়া গেল। ষোল কলা সম্পূর্ণ হইল।

কালে বিশ্বাস আসিল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই শাস্ত্রে আছে, এবং যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহাই সত্য। যাহা শাস্ত্রে নাই তাহাই মিথ্যা। এরূপ বিশ্বাসে সুফল ফলে না। এইরূপ বিশ্বাসে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পুড়িয়াছিল।* আরিস্ততলের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ছিল বলিয়া স্কুলমেন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেতর জাতিরা বিদ্যাসাম্রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যানুশীলন ছিল। কিন্তু নূতন সত্যের পথ বন্ধ, জ্ঞাতব্য সত্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং ব্রাহ্মণের বুদ্ধির প্রাখর্য্য কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইল। বুদ্ধির প্রাখর্য্য যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাতে কার্য্য হইল না। তমাস্ আকুইনাস্, দন স্কোতস্ প্রভৃতি প্রখর বুদ্ধিশালী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। সূচির তীক্ষাগ্রভাগে কয়জন এঞ্জল নাচিতে পারে?—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এঞ্জেলেরা মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃতি পার না হইয়া যাইতে পারে কি না?—ঈশা যখন মেরির গর্ভে ছিলেন, তখন বসিয়াছিলেন, কি শুইয়া ছিলেন না দাঁড়াইয়াছিলেন? এইরূপ বৃথাতর্কে তাঁহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল, কেন না আরিস্ততলের উপর বাক্যব্যয় করা মহাপাপ। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের বুদ্ধি এইরূপে নষ্ট করিলেন। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। যে শৃঙ্খল পরের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালে আপনারাও তাহাতে বাঁধা পড়িলেন। বুদ্ধির পথে কাঁটা পড়িল; কল্পনার পথ মুক্ত—সুতরাং মনের চাঞ্চল্য সেই পথে নিযুক্ত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

কবির চক্ষে কিছুই নির্জীব নহে। পৌরাণিক অবস্থায় (Mythological stage or volitional stage,) মিলবলেন

* উক্ত পুস্তকাগার দাহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস এস্থলে প্রকটিত হইবে।

লোকে প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রকেই ইচ্ছা-বিশিষ্ট জীবের কার্য্য বলিয়া বোধ করে। এইজন্য সে সময়ে সকলেই কবি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকলকেই তাঁহারা সজীব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমরা যেমন মনে করি, সূর্য্য উদয়াস্ত হইতে বাধ্য—আমাদের নীরস, শুষ্ক চিন্তায় যেমন সকলেই নিয়ম, সকলই নিয়তি, তাঁহাদের তেমন ছিল না; সুতরাং যখন পশ্চিম গগন সায়াহ্নের সৌখীন শোভায় শোভিত হইত, তখন বৈদিক আর্য্য অস্তগমনোন্মুখ দিনমণিকে করজোড়ে বলিতেন,—আবার এসো হে; আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে, আবার কখন্ দেখা পাব হে! এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, তাঁহারা সকলেই কবি। যাহা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহাই কবিত্ব পরিপূর্ণ; যাহা কবিত্ব পরিপূর্ণ তাহাই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। এই কারণে বালক মাত্রেই কবি, কেননা বালক সকলকেই সজীব বলিয়া বিশ্বাস করে। আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে বালক করিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, অপ্, বৃক্ষ, লতা সকলকেই সজীব মনে করিতে আমরা বাধ্য, কেন না সকলেই আমাদের দেবতা। জননীর স্তন্যের সঙ্গে এই বিশ্বাস পান করিয়াছি, বাল্যকালে এই বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছি, শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, মানসিক বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে ইহা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সাহায্য পাই নাই;—মেঘকে দেবতা বলিয়াই বোধ থাকিল, বাষ্পরাশি মনে করিতে পারিলাম না; অগ্নিকে ব্রহ্মা বলিয়াই পূজা করিলাম, রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র মনে করিতে পারিলাম না; ক্ষণপ্রভাকে চিরকাল দেবেন্দ্রানুসৃতা পলায়মানা দেবী মনে করিলাম, তড়িল্লতা মনে করিতে পারিলাম না। সুতরাং চিরকাল কল্পনার কার্য্য হইল। যে স্থলে কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত হইল, সে স্থলে কল্পনা, শাস্ত্রের সাহায্য পাইল, ধর্ম্মের সাহায্য পাইল, বিশ্বাসের সাহায্য পাইল, আর দশজন লোকের সাহায্য পাইল, সুতরাং কল্পনার জয় চিরকাল হইল। প্রত্যেক কলহে জয়লাভ করিয়া কল্পনা বলশালিনী হইল; হারিয়া হারিয়া বুদ্ধি নিস্তেজ, স্ফূর্ত্তিবিহীন, অবসন্ন, বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। কবিত্বের প্রধান উপকরণ কল্পনা, সুতরাং কবিত্ব বাড়িল অথবা বুদ্ধিপ্রবণতা পুষ্ট হইল।

সুখের শরৎ কালে শরৎসুন্দরী পূজা বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। কেবল শাক্ত, কেবল ভক্ত, বলিয়া নহে, বঙ্গদেশে এ উৎসব সর্ব্বজনীন; এবং এ উৎসব কবিত্ব পরিপূর্ণ। এক প্রতিমাতেই কবিত্বের সীমা নাই। দশভুজা দশহস্তে দশ প্রহরণ ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিতেছেন, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাগ্দেবী সুকুমার পঙ্কজের উপর তদধিক

সুকুমার চরণসরোজ বিন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উভয়ের পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় এবং গজানন সুন্দরের—চরম এবং কুৎসিতের চরম। নিম্নে মহাদৈত্য মহিষাসুর বীরদর্পে বিকট দশনে অধর দংশিয়া অসি উত্থিত করিতেছে—দুর্জ্জয় সিংহ তাহাকে ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিতেছে। মস্তকোপরি দেবাসুরের অপূর্ব্ব যুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র। অঙ্গনে ছাগ শোণিতের ধারা; সেই শোণিতে বিভূষিত হইয়া ভক্তিভাবপরিপ্লুত ভক্ত নাচিতেছে। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে হৃদয় মধ্যে মহান্ ভাবের তরঙ্গ বহেনা, এমন নীরস, শুষ্ক হৃদয় কার আছে? এ উৎসবে যে এক বার মাতিয়াছে—কোন্ বাঙ্গালিসন্তান মাতে নাই?—মিল্টন পড়ার কাজ তাহার হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর আবার আনুষঙ্গিক কবিত্ব আছে। বালকেরা স্নানাহার ভুলিয়া গিয়াছে, যুবকেরা আনন্দে মাতিয়াছেন; নববিকসিতা কুসুমরূপিণী বঙ্গকুলবধূ সুন্দর অলঙ্কারে সুন্দর দেহ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া, বহু দিনের পর প্রিয়সম্মিলন হইবে এই আনন্দে চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন; প্রবাসী, এক বৎসরের দাসত্বযন্ত্রণা ভুলিবার আশায় ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন। বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যের উপর উৎসাহ চাপা দিয়া আবার যুবা হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গের আনন্দের সীমা নাই; বিচিত্র অট্টালিকায় এবং পর্ণকুটীরে রাজপথে এবং অন্তঃপুরে, কেবল আনন্দধ্বনি উঠিতেছে, কেবল হৃদয়ানুভূত উৎসাহ তরঙ্গ খেলিতেছে। পিতার কাছে পুত্র আসিতেছে, পুত্রের কাছে পিতা আসিতেছেন, প্রণয়িনীর কাছে প্রণয়ী আসিতেছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র সমবেত হইতেছে—আনন্দের সীমা কি? এক মাস পূর্ব্ব হইতে বঙ্গবাসী যে দিনের আশাপথ চাহিয়াছিল, সেই দিন আসিয়াছে—এক মাস পূর্ব্ব হইতে যে ভাবের বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, আজি তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেবল ভক্তের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়সাগরে, ভাবের প্রবল বাতাসে উচ্চ তরঙ্গ উঠিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে কেহ যে কোন ভাবের বেগ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই কবি। দুর্গোৎসব বাঙ্গালিকে কবিত্বের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছে। বাঙ্গালির বারমাসে তের পর্ব্ব আছে; দুর্গোৎসব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ করিলাম। বুদ্ধিমান্ পাঠককে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালিকে যতটা কোমল করিয়াছে এত বোধ হয় আর কিছুতেই নহে। এধর্ম্ম কোমলতাপূর্ণ, প্রণয়পূর্ণ, মধুপূর্ণ—যশোদার বাৎসল্য, রাধিকার উগ্র অনুরাগ, কৃষ্ণের লীলা, ব্রজরাখালদিগের ভ্রাতৃভাব, গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস চেষ্টা, বৈষ্ণবদিগের যে অংশ দেখ

তাহাতেই মধু আছে। আর বৈষ্ণবধর্ম্মে যেসকল ভাব আছে, সে সকলই জীবন্ত —তাহাতে তরঙ্গ আছে, বেগ আছে, চাঞ্চল্য আছে। যশোদার বাৎসল্য জীবন্ত বাৎসল্য, কেন না হাজার হইলেও কৃষ্ণ নিজের পুত্র নহে। সুতরাং এ বাৎসল্যের সঙ্গে আশঙ্কা আছে। যশোদা পুত্রহীনা, কৃষ্ণ তাঁহার বহু আরাধনার ধন—বহু আরাধনায় যাহা লাভ হয় তাহার জন্য আশঙ্কাও অধিক। জন্মান্ধ যদি চক্ষু পায়, তাহার পক্ষে চক্ষু বড় আদরের ধন। অন্ধকারের মধ্যে যে আলোক পাইয়াছে, তাহার আলোক বড় অমূল্য। গোপাঙ্গনাদিগের অনুরাগ জীবন্ত, কেন না এ রস পরকীয়,* সুতরাং উগ্র, তীব্র এবং বেগবান্। রাধিকার ভালবাসাও জীবন্ত, কেন না এ প্রণয়ের ভিতর ভয় আছে, লজ্জা আছে, বিপদ্ আছে, কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত সকল ভাবই জীবন্ত। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, আগা গোড়া সবই মধুর, সবই সুন্দর, সবই কোমল। বঙ্গীয় কবিকুলতিলকগণ এই রসে মজিলেন; এই তরল ধর্ম্মের উপর কবিত্বের তরলতা ঢালিলেন—যাহা মধুর, সুন্দর, কোমল, তাহার উপর আরও মাধুর্য্য, আরও সৌন্দর্য্য, আরও কোমলতা চাপাইলেন; চাপাইয়া, কৃষ্ণরাধিকার প্রণয়ে এক অপূর্ব্ব মোহিনীশক্তি দিলেন। রাধিকার ত কথাই নাই, কৃষ্ণও এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইয়া উঠিলেন। কখন যোগী সাজিয়া রাধিকার কুঞ্জে প্রেমভিক্ষা করিলেন, কখন রাধিকার মুখ রাখিবার জন্য শ্যামা সাজিলেন, এবং স্বয়ং রোগী হইয়া স্বয়ংই বৈদ্য হইলেন; আবার কখন মনের বেগে পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন,—

ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

রাধিকা কখন গুরুমানে মাতিয়া কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিলেন,

হরি হরি! যাহি মাধব যাহি কেশব মা
বদ কৈতববাদং
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি
বিষাদং।

কখন আবার প্রেমে বিভোর হইয়া আদর করিলেন,

তুমি আমার
পরাণ অধিক, হিয়ার পুত্তলী,
এ দুটি আঁখির তারা।

একজন কবি, অনুপম মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীর সাজাইলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ সরস বসন্তের শোভাপূর্ণ করিলেন, তাহার ভিতর ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মলয় সমীরকে মৃদু২ সঞ্চালিত করিলেন—হরি এইখানে বসন্তোৎসব করিবেন।

* পূর্ব্বতন আলঙ্কারিকেরা স্বকীয় নায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদিগের মতে পরকীয়াই প্রধান স্থলাভিষিক্ত।
'অলঙ্কারকৌস্তুভ' দেখ।

হরি বসন্তোৎসব করিলেন না, প্রণয়োৎসবে ভঙ্গ দিয়া দূরে গেলেন। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী সেই কোমল মলয় সমীরের অধিক নৈরাশ্যকাতর স্বরে কাঁদিলেন—

কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশরে
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এইরূপে হাসাইয়া, এইরূপে কাঁদাইয়া, এইরূপ ভালবাসাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এক অপূর্ব্ব রস করিয়া রাখিলেন। সে রস যদিও দেবদেবী লইয়া, তবু তাহা সাধারণ লোকের সম্বন্ধকক্ষাতীত নহে, কেন না অমন সুখ, অমন দুঃখ, অমন হাসি, অমন কান্না সকলেরই আছে। দেব দেবীর নাম মাত্র, নতুবা বৈষ্ণব কবিরা মানবহৃদয়ের ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিয়াছেন। যে বেগ বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে, সে বেগ তোমার আমার হৃদয়েও আছে, তবে কি না আমরা তেমন করিয়া বলিতে জানি না। সকল হৃদয়ে আছে বলিয়া, সকলেই সে রস বুঝে, সকলের সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেব আসিয়া সেই রসের তরঙ্গ তুলিলেন এবং সেই তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে নাচাইলেন। নগরে২, গ্রামে২, পল্লীতে২, পাড়ায়২, গৃহে২, সেই রসের বিস্তার হইল। পৌত্তলিকতা মাত্রই কবির ধর্ম্ম। যে দেশে পৌত্তলিকতা আছে সেই দেশেরই লোক কিয়ৎপরিমাণে কবি। যে দেশে পৌত্তলিকতার অল্পতা অথবা অভাব লক্ষিত হয়, সেই২ দেশেই পরিমাণানুযায়ী কবিত্বের অল্পতা অথবা অভাব দেখা যায়। কোন মনুষ্যই একেবারে কবিত্বে বঞ্চিত হইতে পারে না; আজি পর্য্যন্ত সংসারে এমন কোন ধর্ম্মও প্রচারিত হয় নাই, যাহার ভিতর পৌত্তলিকতা নাই অথবা কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় নাই। বলিয়াছি ত, পৌত্তলিকতা কবির ধর্ম্ম; তাহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় কবিত্ব পরিপূর্ণ ধর্ম্ম যে দেশে প্রচলিত, সে দেশের লোক যে কিয়ৎপরিমাণে কবি হইবে তাহার বৈচিত্র কি?

আবার বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনুভাবকতামূলক, কেন না উহা ভক্তিপ্রধান। বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল ধর্ম্মই প্রায় জ্ঞানপ্রধান অথবা কর্ম্মপ্রধান। চৈতন্যদেবকে ভক্তিমাহাত্ম্যের উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিতেছি না; বোপদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজস্বামী এই রসের বিস্তার করিয়াছিলেন, তবে কি না চৈতন্যদেব ভক্তিরসকে ঘরে ঘরে চালাইলেন। চৈতন্যের বাহাদুরি এই পর্য্যন্ত। জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে অনুভাবকতার সম্বন্ধ অল্প; কিন্তু ভক্তির সহিত উহার অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না ভক্তি অনুভাবকতারই মূর্ত্তিবিশেষ। অনুভাবকতার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ অতি

নিকট; সুতরাং অনুভাবকতার অনুশীলন যাহাতে হয়, তাহাতেই কবিত্বের লাভ আছে। অতএব বাঙ্গালি যে কবি, তাহার অনেকটা নিন্দাপ্রশংসায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দাবি আছে।

ক্রমশঃ

চৈতন্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

বঙ্গদেশ দর্শন।

১৪২৬ অথবা ২৭ শকে* উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চৈতন্য বঙ্গদেশ গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাটী, (শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী) সুতরাং পৈতৃক বাসস্থান দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও এযাত্রায় শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না তথাপি, বোধ হয়, পৈতৃক বাসস্থান সন্দর্শনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চৈতন্য বঙ্গদেশাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিয়া পদ্মাবতীর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন। পদ্মাবতী জঙ্গীপুরের ৬।৭ ক্রোশ উত্তর ছাপঘাটী হইতে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ২২ কোদালী মোকামে ব্রহ্মপুত্রসহ মিলিত হইয়াছে। ছাপঘাটী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত, ২২ কোদালী ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ পদ্মানদীর উপকূলের কোন স্থানে তিনি অবস্থিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অথবা কোন নাটকাদিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

---

* বৎসর গণনা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ ও যুক্তি উভয়ানুসরণ করিয়া নির্ণীত হইল। চৈতন্য ২৩ বৎসর ১১ মাস বয়ঃক্রম কালে গৃহত্যাগ করেন।

চব্বিশ বর্ষের শেষে যেই মাঘ মাস
তবে শুক্ল পক্ষে প্রভু কৈলা সন্ন্যাস।

তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে হয় ১ম অঃ দেখ।

আবার চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, চৈতন্য বঙ্গহইতে প্রত্যাগত হওয়ার অব্যবহিত পরেই গয়াধামে যাত্রা করেন এবং গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া চারি বৎসরকাল গৃহে অবস্থান করেন। বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আর একটী কার্য্য করেন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ। তীর্থযাত্রা ও বিবাহ ন্যূনাধিক ১ বৎসর ও গৃহে অবস্থান চারি বৎসর ২৩ বৎসর ১১ মাস হইতে বাদ দিলে ১৮ বৎসর ও কয়েক মাস হয় এবং তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাস। এই জন্য উক্তকাল ১৪২৬ অথবা ২৭।

অন্যদীয় প্রমাণাবলম্বন করিলে জানা যায়, অধুনা পদ্মাতীরে যত গ্রাম আছে তন্মধ্যে শাদিখাঁরদিয়াড়* ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম ও তাহার অপর পারস্থিত মিরগঞ্জ † ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম সমধিক বৈষ্ণব প্রধান এবং হয় ত সাদিখাঁরদিয়াড়েই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমতলী এবং খেতরী সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু অধুনা পদ্মার নিকটবর্ত্তী হইলেও তৎকালে নিকটে ছিল না। যে হেতু বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেই প্রেমতলী হইতে পদ্মা ৩ ক্রোশের অধিক ব্যবধান ছিল, এবং প্রেমতলী পার হইয়া অপর পারে ক্রমাগত ৮।১০ ক্রোশ গমন করিলেও তাহা পদ্মার চর বোধ হয়। সুতরাং বোধ হয়, এককালে পদ্মা প্রেমতলী হইতে অনেক দূরে ছিল। বিশেষ প্রেমতলীর ২০০।৩০০ হস্ত পরেই, খেতরীর গ্রাম ক্রোশার্দ্ধ অগ্র হইতে ভুবীন্দ্র। পদ্মা ভুবীন্দ্রের তাদৃশ নিকটস্থ থাকিতে পারে না। যেহেতু পদ্মার তীরের দিয়াড় এবং ভড় অতিক্রম করিলে ভুবীন্দ্র পাওয়া যায়। অপর প্রেমতলী নিকটে কুমারপুরে অদ্যাপি মুসলমান ও বঙ্গের প্রাচীন পালবংশীয় ভূপালদিগের যে সকল ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তদ্দৃষ্টে নিশ্চয় অনুভূত হয় যে সে সকল পদ্মার তীরে গঠিত হয় নাই এবং তৎকালে পদ্মা কুমারপুর, প্রেমতলী প্রভৃতি গ্রাম হইতে দূরে ছিল। তবে যে এসকল গ্রাম বৈষ্ণবপ্রধান তাহার কারণ, অন্যূন ১০০বৎসর অতীত হইল গড়ের হাট পরগণায় রাজা বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোত্তম অবস্থান করিতেন, এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজ (কবি গোবিন্দ দাস) রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ (যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তীয়দিগের অবতার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।) তথায় অনেক সময় বাস করিতেন। নরোত্তম দাসের পূর্ব্বে প্রেমতলী প্রভৃতি ঘোর শাক্তপ্রধান ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের তথায় অবস্থান যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না, শাদিখাঁরদিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিরগঞ্জে অদ্যাপি চৈত্রমাসে গঙ্গাস্নানের দিবসে "দধি চিড়ার ফলার" করা বৈষ্ণবদিগের ও তৎপ্রদেশীয় সাধারণ লোকদিগের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ আছে। সাধারণ্যে বিশ্বাস চৈতন্য ঐ দিবসে তথায় "দধি চিড়ার ফলার" করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পথিক লোকই "দধি চিড়ার ফলার" করিয়া থাকে, এজন্য মিরগঞ্জে চৈতন্য পথিক ও শাদিখাঁরদিয়াড়ে অবস্থিত হইয়াছিলেন ইহাই অনুভূত হয়। তবে যদি কেহ কেহ এ আপত্তি করেন শাদিখাঁরদিয়া ড়পদ্মাতী হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান। ইহার উত্তর স্থলে এই প্রস্তাব লেখক বলিতে পারেন, যে ১৮।১৯ বৎসর অতীত হইল তিনি

* জেলা মুরশিদাবাদে স্থিত।

† জেলা রাজসাহীস্থিত।

শাদিখাঁরদিয়াড় হইতে পদ্মা ২ ক্রোশ ব্যবধান দেখিয়াছিলেন, এই ১৮।১৯ বৎসর এপার ভাঙ্গিয়া অপর পারে ২ ক্রোশ চর প্রশস্ত হইয়াছে। সুতরাং এককালে যে তাহা পদ্মাতীরস্থ ছিল তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ দিয়াড় নামই তাহার অমোঘ প্রমাণ।

চৈতন্য বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া মহানন্দে পদ্মার জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পদ্মার শোভা গম্ভীর ও ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন আরও প্রশস্ত হইল, কল্পনা উদ্দীপ্ত হইল, স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণিত হইল।

এদিকে, নবদ্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া তদ্দেশীয় বিদ্যা ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ও বিদ্যা ব্যবসায়ী বালকগণ, যাহারা বিদ্যোপার্জ্জন জন্য নবদ্বীপ যাইতে উদ্যত ছিল, তথায় চৈতন্যের সহিত মিলিত হইল। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের মতে নিমাঞি পণ্ডিতের নামে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় নিমাঞি পণ্ডিতের নামে হউক বা না হউক নবদ্বীপের পণ্ডিতের নামে বটে।

চৈতন্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম যুগপৎ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও সরল ধর্ম্মের ভাবে সকলেই মোহিত হইলেন। তাঁহার ছাত্র সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল।

একদা একজন ব্রাহ্মণ পরমার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া তথায় আগমন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন,

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যযতে মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি-কীর্ত্তনাৎ॥
তথাহি— হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অথমহামন্ত্র—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমের অঙ্কুর হয় এবং ঈশ্বরে প্রেমিক হইলে পরম তত্ত্ব লাভ হইল। এইরূপে কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী স্বামিবিরহজনিত ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া চৈতন্যের বঙ্গে অবস্থান কালে প্রাণত্যাগ করিলেন। চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহারে দেখিতে আসিলেন। চৈতন্য মাতার চরণবন্দনা করিতে যাইয়া দেখেন, তিনি যারপর নাই বিষাদিতা ও তাঁহার মুখে বাক্যব্যয় নাই। সুতরাং বুঝিলেন, নিশ্চিত বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে। পরে শচী বলিলেন, বধূমাতা পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চৈতন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া জননীকে বলিলেন

কস্য কে পতি * * মোহ এবহি কেবলং।

*   *   *   *

" ভবিতব্য যে আছে তাহা খণ্ডিবে কেমনে।"
অতীত যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সে হইল আর কিকার্য্য দুঃখে তায়॥

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চৈতন্যের এই প্রথম উক্তি। চৈতন্য ভবিতব্যবাদী ছিলেন, সুতরাং ইচ্ছা স্বাধীন বিশ্বাস করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ঈশ্বর ইচ্ছাময় স্বীকার করিতেন, সাংখ্যদর্শনকারের ন্যায় উদাসীন বলিতেন না।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস।

নীতিকুসুমাঞ্জলি।

(এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্য্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র)

প্রথম অঞ্জলি।

১

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয়॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন॥

২

দ্রুমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বল্কল॥
বনে ব্যাঘ্র-গজ-সেবা বরং মঙ্গল।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল॥

৩

মাণিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণতলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায়॥

৪

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত॥

৫

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা।
লিখনা ললাটে ধাতা লিখনা লিখনা॥

৬

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা সুনিশ্চয়।

বায়ু চেয়ে বেগগতি, গিরিগুহা গৃহপতি,
তবু সিংহ পশুবই নয়॥

৭

বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটি স্বুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি,প্রকাশে বিমলজ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয়॥

৮

কোকিল গর্ব্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দ্দম থাইয়ে॥

৯

রোহিত রহিত-দর্প গভীর পুষ্করে।
একাঙ্গুল জলে পুঁঠী ছট্‌ফট করে॥

১০

মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরভৃতগণ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা,মৌনই শোভন॥

১১

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয়।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয়॥

১২

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ।
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অনুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই একারণ, কর ধন উপার্জ্জন,
ধনেতেই সব বশ হয়॥

১৩

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার।
ধনেতেই পায় লোক আপদে নিস্তার॥
ধন চেয়ে এসংসারে বন্ধু কেহ নয়।
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয়॥

১৪

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে,পুজ্যপাদ হয় লোকে
যদি তার প্রচুরার্থ থাকে।
শশিতুল্য স্বকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ্য করে তাকে॥

১৫

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন।
সকলই চলাচল, যার আছে কীর্ত্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন॥

১৬

সেই জন সজীবন, যেইজন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্ত্তিমান্।
অযশ অকীর্ত্তি যার, জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকা মৃতের সমান॥

১৭

কখন সন্তুষ্ট, কখন বা রুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
হেন মতিচ্ছন্ন, হল্যেও প্রসন্ন
ভয়ঙ্কর মানি মনে॥

১৮

গ্রন্থগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হল্যে প্রয়োজন।

১৯

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীর আশন।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হন॥

দৈব দূর করে, আত্ম-শক্তি কর সার।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার॥

২০

সম্পদে কর্কশ,　খলের মানস,
আপদেই সুকোমল।
সুশীতল পয়,*　সুকঠিন হয়,
কিন্তু মৃদু তপ্ত জল॥

২১

গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন॥

২২

ক্ষোভের যাতনা সহে সাধুশীল নর।
সহিতে না পারে কভু ইতর পামর॥
মহা শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম॥

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরি পরাভূত নয়।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণি মুক্তা চয়॥

২৪

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধনা করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপপয়,　প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে?

২৫

এক ভূমি জাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে।
কেবা শালি, কেবা শ্যামা, পরিচয় ফলে॥

২৬

মুখভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন।
মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি অর্পিলে ক্ষীরণ॥

২৭

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয়।
তাহে বা কি বিন্ধ্যাচলে আছে করিচয়॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন॥

২৮

বিকসিত বকুল মুকুলে যেই জন।
তৃষাতেও না করিত চরণ চারণ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী।
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী।

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি সিন্ধু সন্নিধান।
শুদ্ধ এক গণ্ডুষ করিনু জল পান॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই।
আমারি কর্ম্মের ফল ফলিয়াছে ভাই॥

৩০

কি ফল নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান করা।
চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা॥
কি ফল কামিনী-কেলি সমাগতে জরা।
কি ফল প্রবাহ-গতে আলী বন্ধ করা॥

৩১

বরং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস।
বরং ভিক্ষাকরা ভাল, কিম্বা উপবাস॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়োনা গর্ব্বী জ্ঞাতির শরণ॥

৩২

কুজনের সেবা আর কুগ্রামে নিবাস।
কুভোজন, ক্রোধমুখী ভার্য্যা সহবাস॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্যাহীন সুত।
অনল বিরহে তনু করে ভস্মীভূত॥

* কর্কর প্রভৃতি।

৩৩

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল।

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ব্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপ লক্ষ্মীর আগমন।
গজভুক্ত কথ্‌বেল, সেরূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্য্যে পিশুন যেজন।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ॥
যথা অতি রমণীয় চারু কলেবরে।
ব্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকা নিকরে॥

৩৬

সদ্‌গুণীর যত গুণ, বর্ণনায় সুনিপুণ,
যিনি হন সাধু সদাশয়।
নব চূতাঙ্কুররস, পান করি হয়ে বশ,
কোকিল ললিত কুহরয়॥

৩৭

সতের সদ্‌গুণ, দুর্জন পিশুন,
ক্ষণেকে দূষিত করে।
যথা ধূম রাশি, বিমলতা নাশি,
মলিন করে অম্বরে॥

৩৮

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন॥

৩৯

কাম ক্রোধজাত দোষ বিবেকে বিলয়।
ভানুর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয়॥

৪০

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান।
বিফল নির্ব্বোধ জড়ে উপদেশ দান।
কুসুম সুরভি তিল করে আকর্ষণ॥
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন।

৪১

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার॥

৪২

দুষ্টের দৌর্জন্য চয়, কখন কি গত হয়,
কি করে বা উত্তম আকরে।
জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ প্রাণ হরে,
কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে।

৪৩

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জ্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ॥

৪৪

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর।
পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কর্পূর॥

৪৫

আপৎ সময়ে সাধু আরো শোভাকর।
রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ সুন্দর॥

৪৬

যদি এজগৎ কভু পদ্মশূন্য হয়।
আবর্জনা পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময়॥
তবে কি মৃণাল ভোজী রাজহংস গণ।
কুক্কুটের প্রায় করে মল অন্বেষণ॥

৪৭

মদ যুক্ত মাতঙ্গের মস্তক উপরে।
সিংহ শিশু পড়ে গিয়া মহা ঘোর স্বরে॥
প্রকৃতিতে জাত এই স্বত্ব মহাধন।
বয়সের ধর্ম্ম ইহা নহে ত কখন॥

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি।
দশব্যাঘ্র, সপ্তসিংহ, তিন হস্তী সনে।
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে॥
তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর।
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর॥

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি।
যা রে যা বিহিত দূরে শূকর নন্দন।
সিংহজয়ী বলি বৃথা কর আস্ফালন॥
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর।
ভালমতে জ্ঞাত যত পণ্ডিত ঠাকুর॥

ক্রমশঃ

কৃষ্ণকান্তের উইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিনকালে জন্মে নাই—যে তিনি অপর কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্তরায়ের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটীর জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে২ সঙ্কল্প হইল যে উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয়, একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য। কেন না যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে কৃষ্ণকান্ত কখন প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই তথাচ কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখা পড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজন বশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন, যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে

আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং উইল করিয়া,আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল; কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আটআনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা, সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাঙ্গালির উইল কখন গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল,

"এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল আর আমরা তিন আনা?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য টা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিন কে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক২ আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"বাপু হরলাল! বিষয় আমার,তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন,

"হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের দাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, একণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে লিপিকৃত উইল খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনামাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই।

"কলিকাতার পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

আমি মানস করিয়াছি যে একটী বিধবা বিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে ৷৷০ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব নচেৎ শীঘ্র একটী বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া উইল পরিবর্ত্তন করিয়া হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণ কান্ত লিখিলেন,

"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সম্বাদ পাঠাইলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইল খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর সম্বন্ধ ছিল, এজন্য ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন। ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এসকল লেখা পড়া তাঁহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, যে "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটী পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে।

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এক পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, যে হরলাল রায়।

হরলাল আসিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখন যাই নাই।

ব্র। একেবারে এই খানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। দুই দিন কোনস্থানে লুকাইয়াছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুন্‌তেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করে্য তাই বল্‌ছেন কিন্তু সে টা থাকবেনা।

হর। আজি বিকালে লেখা পড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করব ভাই? কর্ত্তা বলিলে ত না বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই মার না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে করে্য নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটী কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ শত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মত্তি গোয়ালিনীকে দিও।

হর। গোওয়ালা ফোওয়ালার কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমার করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক্ সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে দুইটিরই লেখা এক প্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখা পড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল,

"ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে

—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাইরে।

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে আজি এটা কেন? তুমি সরকারিকালি কলমকে গালি পাড়িও তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারি কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,

"এযে সরকারি কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারি নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখা পড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এইরূপ কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদ লাল তিন আনা, গোবিন্দলাল একপাই; গৃহিণী এক পাই; শৈলবতী এক পাই; হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বার আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?"

"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইল কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারিজন সাক্ষির দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে সেই জাল।

ব্র। কি সে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে তখন এই উইল খানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুই খানই উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইল খানি বদলাইয়া লইবে। এই খানি কর্ত্তাকে দিয়া কর্ত্তার উইল খানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল।

বলিল, "বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলটা খেলোছ ভাল!"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতে ছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

"বলি ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্রা। তুমি এখন পাঁচশত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সে উইল খানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি। কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি তুমি দেখ দেখি টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্ত কৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইল খানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কিপ্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল, সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব। বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা রাজদ্বারে মহাদণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়? আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি একার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্রব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এদিকে সংক্রামক জ্বর প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন, কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত, লুচি- সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ, প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন ক-

রিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে—পরদ্রব্য গুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এটাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদ্‌হজমের ভয়ও বড়! ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইল?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে॥"

হর। পার নাই নাকি?

ব্র। ভাই কেমন বাধ২ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

ব্র। না ভাই—এই ভাই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও। এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন,

"মূর্খ, অকর্ম্ম! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না। আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও যদি তোমাহইতে এই কথার বাস্প মাত্র প্রকাশ পায় তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।"

এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটী স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে ও?"

স্ত্রীলোকটী দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "দাসী।"

হর। কে ও রোহিণী?

স্ত্রীলোকটী বলিল, "আজ্ঞে।"

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহাকে যুবতী বলিতে হইবে। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়া-

ছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতিবৎসর মাত্র দেখাইত। রোহিণী পরমাসুন্দরী; সুন্দরী বলিয়া পল্লীতে তাহার খ্যাতি ছিল। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেক গুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে, তুলনা রহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিষ করিত, রোহিণী সেখানে আখ্‌ড়া ধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনাগিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য; রোহিণী তাঁহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটী মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল,

"কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কিজন্য আসিয়াছিলাম?"

রোহিণী হাসিয়া মৃদু২ শ্লোক বলিল,

যাও২ আর কেলেসোনা, কাজ কি
সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায়
দাঁড়িয়ে॥

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"বটে! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল?"

রো। হইল বই কি।

হর। কার কাছে—কর্ত্তার কাছে এ কথা যাবে না কি?

রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে।

হর। কি রূপে?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন "সে কি রোহিণি?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে?"

রো। সে কথা টা আপনার সাক্ষাতে

নাই বা বলিলাম। না পারি আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ? তবে কি টাকা আগামী দিতে হবে নাকি?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন?

হর। কবে এটা পার্‌বে?

রো। আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, "ভাল," এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐ দিবস রাত্র ৮টার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়ন মন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া শটকায় তামাক টানিতে ছিলেন, এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ!—মাদক মধ্যে শ্রেষ্ঠ! অহিফেণ ওরফে আফিমের নেসায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন যেন উইল খানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিনটাকা তের আনা ছুকড়া ছুক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল, যে না এ দানপত্র নহে, এ তমস্সুক। তথনই যেন দেখিলেন যেন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম্ কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন —মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে, রোহিণী ধীরে২ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত রায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে নন্দী? ঠাকুরকে এইবেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল,যে কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল আসিয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুঁম্-ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালা বাড়ী মাখম খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি!

কৃষ্ণ। তাইত! তবে কি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণধরে দিতে

পার্‌বে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃ। এই এই! তবে আফিঙ্গেরই জন্য!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্য আফিঙ্গ চাই না। কাকা বল্‌লেন যে যে উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি, আমার বেস মনে পড়িতেছে যে আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি, বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটী চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাত বাক্স খুলিয়া বিচিত্র একটি চাবি লইয়া পরে একটা চেষ্ট ড্রয়ারের একটী দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চসমা বাহির করিয়া, নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চসমা লাগাইতেং দুইচারিবার আফিঙ্গের ঝিম কিনি আসিল—সুতরাং তাহাতে কিছু কাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চসমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণি, আমি কি এতই বুড় হইয়াছি? এই দেখ আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, তাহা জানিয়া গেল। রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন, যে তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্তরাত্র দীপ জ্বলিত কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন। নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমতও বোধ হইল যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। সে যেন তাঁহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিঙ্গের নেশায় বিভোর, না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলোক নাই—তাহাও ঠিক বুঝা নাই, কখন অর্দ্ধ নিদ্রিত—কখন অর্দ্ধ সচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার

দৈবাৎ চক্ষু খুলিবায়, কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে তিনি হরিঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার! কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কানে গেল—একি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত শট্‌কা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাস বশতঃ ডাকিলেন, "হরি।"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরিমাত্র পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেও রোহিণীর কৌশল! নহিলে দ্বার খোলা থাকে না। এদিকে কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলনবৎ, পৃথিবী মণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল—যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবর মধ্যে সর্পদম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল, "তারপর, আমাকে উইল খানি দাও না।"

রোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি, উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল, কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী। ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক—কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব, যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন! আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকট এই উইল খানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই বিবেচনা করুন্। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্য ভাগ; আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন। এবং বলে উইল খানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,

"ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সম্বাদ দিই যে তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে— তিনি নূতন উইল করুন।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন,

"তবে অধঃপাতে যাও।"

এই বলিয়া হরলাল সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

শৈশবসহচরী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরদ্বয়।

একদা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এক ব্যক্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে সুবর্ণপুর গ্রামের যে পল্লীতে হরিনাথ মুখো বাস করেন, সেই পল্লীতে যাইতেছিলেন। মাঘ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্র অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না—অতি প্রবল উত্তর বাতাসে পথিক শীতপীড়িত হইয়া মধ্যে২ গাত্র বসনদ্বারা মুখের কিয়দংশ আবরণ করিতেছিলেন। পথিক কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটি অতি অপ্রশস্ত গলি পথ দিয়া চলিলেন। পথ এমত অপ্রশস্ত যে পথিকের গাত্রবসন দুইপার্শ্বস্থিত বৃতি স্পর্শ করিতে লাগিল। মধ্যে২ পথিপার্শ্বে বৃহৎ২ বৃক্ষ থাকাতে সেই পথে অন্ধকার আরও গাঢ়তর বোধ হইতে লাগিল। অতি প্রবল নৈশবায়ু মধ্যে২ পথিককে কাঁপাইতে লাগিল, তজ্জন্য পথিক আরও দ্রুত চলি-

লেন। এক স্থানে একটি বাদাম বৃক্ষতলে গাঢ় অন্ধকারে অতি বেগে পথিকের মস্তকে একটি স্থির পদার্থ লাগিল। পথিক যন্ত্রণায় উঃ করিয়া উঠিলেন, স্থিরপদার্থও সঙ্গে সঙ্গে উঃ করিয়া উঠিল। পথিক পদার্থকে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া, রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?" পদার্থও তদ্রূপস্বরে উত্তর করিল "তুমি কে?" পথিক স্বর চিনিতে পারিয়া বলিলেন "কে, দেবনাথ মুখুয্যা মহাশয়! আপনি, তা আমি জানিতে পারি নাই —কি সম্বাদ?—" দেবনাথ আঘাত যন্ত্রণায় গাল ধরিয়া কাঁপিতে২ বলিল "আরে রেখে দেও তোমার সম্বাদ—আগেই সম্বাদ—আগে প্রাণ না আগে সম্বাদ—যাহার জন্য আমি এত রাত্রে এই শীতে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া—সেই আমার সর্ব্বনাশ করিল।" রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে পথিক রতিকান্ত ভিন্ন আর কেহ নহে) বলিল, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম?" দেবনাথ অতি ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "মনুষ্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তুমি আমার সম্মুখের এই দাঁতটী ভাঙ্গিয়াছ।" এই বলিয়া দেবনাথ মুখো রোদনোন্মুখ হইলেন।

রতিকান্ত হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মৃদু২ হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবনাথ আরও রাগান্ধ হইয়া বলিল, "রতিকান্ত বাবু তুমি আজ আমার যে অনিষ্ট করিলে এ অনিষ্ট আমি মরিলেও ভুলিব না।" মুখোপাধ্যায়ের সেই সময়ে মনে পড়িতেছিল, যে তাঁহার ঝুনা নারিকেল দিয়া চাল ভাজা খাওয়ার সাধ ইহজন্মের মত ঘুচিল —ইক্ষু, কেশুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল তাঁহার কাছে এখন হইতে গোমাংস তুল্য হইল—হায়! এখন কি হইবে? তাম্বুল চর্ব্বণের জন্য কি এখন ব্রাহ্মণীকে অনুরোধ করিতে হইবে? তা ত প্রাণ থাকিতে হইবে না—নথ নাড়া, নথের ভিতর হইতে বাঁকা হাসি, প্রাণ থাকিতে সহিবে না। নথের কথা মনে হইবামাত্র মুখোপাধ্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, "আজ হইতে তুমি আমার চিরশত্রু হইলে, আমি তোমার জন্য যে রজনীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়া ছিলাম সে আমার কখন কোন্ অনিষ্ট করে নাই; কিন্তু তুমি আজ আমার সর্ব্বনাশ করিলে! হায় ঝুনা নারিকেল রে!—আমি তোমার সহিত মিত্রতা করিতে যে ভৈরবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলাম, সে শপথ তাঁহাকে ফিরাইয়াদিলাম—হে মা কালি কোন অপরাধ লইও না—হায় বিলাতি কুল বাতরাজ আলু, শসা পিয়ারা বাদাম পেস্তা রে!" এই বলিয়া দেবনাথ চক্ষু মুদিত করিয়া একবার ধ্যান করিল। গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ভাসিয়া পড়িতে লাগিল! ইহাতে রতিকান্তের হাস্য দ্বিগুণবর্দ্ধিত হইল কিন্তু অতি কষ্টে উহা সম্বরণ করিয়া অতি

বিনীতস্বরে বলিলেন, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ হইয়াও কেন এরূপ অন্যায় রাগ করিতেছেন। আপনি আমার পরম সুহৃদ্, আপনার সাহায্যে আমি কার্য্যোদ্ধার করিব, আমি কি জানিয়া শুনিয়া আপনার দাঁত ভাঙ্গিতে পারি? আর বিশেষতঃ আপনি কি জানেননা যে গোহাড়ের ন্যায় দুইটা দাঁতের পরিবর্ত্তে কালই দুইটা সোনার দাঁত বসান যাইতে পারে? তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়—এবং ঝুনা নারিকেল কি ছাই, চকমকির পাথরও তাতে চিবানো যায়।"

মুখো। যায়?

রতি। কলিকাতার মনোহর বাবু সোনার দাঁতে এক জোড়া লোহার হাতা বেড়ি চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। কল্যই আপনার সোনার দাঁত বসাইব—

দেব। কি বল্লে ভাই—হাতা বেড়ি? আমার সোণার দাঁত বসিয়ে দিবে?—তাকি হয়?

রতি। দিব। দুই দিনের মধ্যেই দিব। আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?

দেব। তোমারই জন্য, সেই উন্মাদিনীর সন্ধানে বেড়াইতেছি।

রতি। উন্মাদিনীর সন্ধানে এ অন্ধকারে বাদাম তলায় দাঁড়াইয়া কেন?

দেবনাথ খুঁজিয়া উত্তর পাইল না। রতিকান্তও উত্তরের অপেক্ষায় নীরব হইয়া রহিলেন কিন্তু ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, ইতিমধ্যে দেবনাথের পাশ্চাতে একটা ক্ষুদ্রজঙ্গল হইতে হঠাৎ মলের ঠুন ঠুন শব্দ রতিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া উহার অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু দেবনাথ মুখো অগ্রসর হইয়া হস্ত ধরিলেন এবং বলিলেন "ভাই, জঙ্গলে কতরকম জন্তু আছে—কামড়াইতে পারে। ওখানে যাওয়া উচিত নহে।" রতিকান্ত দেবনাথ মুখোর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কামড়াইতে পারে বটে। ওসকল ঘোড়ার কামড়—মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না—কার মাথায় হাত বুলাইলে?"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন, "ভাই কথায় কাজ কি? সকলেরই শরীরে একটা না একটা দোষ আছে। দেখ ঐ দাঁতপড়ার কথাটা বলিতেছিলাম—ওটা তামাসা—দাঁত আমার যেমন তেমনই আছে।" এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় ভগ্ন দন্তটি জঙ্গলে ফেলিয়া দিলেন। রতিকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "তার লুকচুরিতেই বা কাজ কি? তোমার সোণার দাঁত হলে তুমিও ঠুনঠুনে মল দুই গাছও চিবাইতে পারিবে।" এই বলিয়া, রতিকান্ত সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন—কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত একটী গৃহ দ্বারে মৃদু২ আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে গৃহপশ্চাতে একটী গবাক্ষে সেইরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন। ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল "কেও, রতি বাবু?" উত্তর "হাঁ আমি।

দ্বার খোল বড় শীত।" রতিকান্ত পুনরায় দ্বারদেশে আসিলেন। একটী প্রাচীনা আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল। প্রাচীনা পাঠক দিগের নিকট অপরিচিতা নহেন, ইনি সে দিবস প্রত্যুষে গঙ্গাতীরে উন্মাদিনীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনা রতিকান্তকে শীতার্ত্ত দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে আসিতে কহিল। রতিকান্ত গৃহমধ্যে একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন "কোন সন্ধান পাইলে কি?" প্রাচীনা উত্তর করিল "তাহার সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই।"

রতি। কেন?

প্রাচীনা। সুযোগ হইল না, সেস্থলে অনেক লোক তাঁহার পাগলামি দেখিতে ছিল।

রতি। কোথায় দেখিয়াছিলে?

প্রা। এই পাড়ায় সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেছিল।

রতি। তবে বোধহয় এরাত্রে এই গ্রামেই আছে?

প্রা। আছে বই কি।

রতি। বোধ হয় গ্রাম অনুসন্ধান করিলে তাহার দেখা পাইতে পারি?

প্রা। পারেন।

ইহার পর রতিকান্ত প্রাচীনার হস্তে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিলেন। প্রাচীনা জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাও?"

র। তাঁহার অনুসন্ধানে।

প্রা। সেকি! এত রাত্রে তাহারে কোথায় পাইবে?

র। যদি এই গ্রামে থাকে তবে পাব বইকি।

প্রা। কাহার বাটীতে অনুসন্ধান করিবে?

র। পাগলী কাহারো বাটীতে আশ্রয় লয় না—

এই বলিয়া রতিকান্ত অতিক্রত প্রাচীনার বাটী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে উন্মাদিনীকে মধ্যে২ গ্রামপ্রান্তে মাঠে এবং বাগানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এক প্রকার প্রতীতি হইল যে পাগলীকে উহার মধ্যে কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিতে পাইবেন।—এমত বিবেচনা করিয়া রতিকান্ত চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরীদ্বয়।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। হুঃহুঃ করিয়া শীতল নৈশ বায়ু বহিতেছে। রতিকান্ত অন্ধকারে কাঁপিতে২ একাকী চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ অন্ধকারময় আম্রকাননে আসিলেন। প্রবাদ ছিল যে এই কাননে ভূতযোণি বিরাজ করিত। কিন্তু রতিকান্ত যে দুঃসাহসিক শপথ করিয়া রজনীকান্তের সর্ব্বস্বাপহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-

ছিলেন, তদপেক্ষা নৃশংসের কায আর কি ছিল? রতিকান্ত অকুতোভয়ে আম্র কাননে প্রবেশ করিলেন। কাননের মধ্যস্থলে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট বিশিষ্ট সরোবর ছিল। বৃক্ষের বিচ্ছেদে নক্ষত্রালোকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ স্থান কিঞ্চিৎ আলোকময়। রতিকান্ত দেখিলেন যে ঐ ঘাটের একটি সোপানে কে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। তাহাকে স্ত্রী লোক বলিয়া বোধ হইল। একবার রতিকান্তের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হঠাৎ দাঁড়াইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চলিলেন। তাঁহার পদশব্দজনিত শুষ্ক পত্রের মরমরশব্দে সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে দুই এক পদ অগ্রসর হইলে রতিকান্তও সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃৎকম্প হইল। যাঁহাকে বহুকাল মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে এজন্মে কখন দেখিবার সম্ভব ছিল না, রতিকান্ত সেই অন্ধকারময় বিজন আম্রকাননে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ভয়ে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু আম্রকাননবিহারিণী স্ত্রীলোক আর এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিল "রতিকান্ত ভয় নাই—আমি প্রেতিনী নহি। তোমরা শুনিয়াছিলে আমি মরিয়াছিলাম—কিন্তু সে মিথ্যা জনরব মাত্র।" রতিকান্তের এক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখানে কেন?" উত্তরে স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?"

র। কোথায় যাইব?

স্ত্রী। কেন, তোমার কি ঘর দ্বার নাই?

র। আপনি কি জানেন না যে রজনীকান্ত আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে।

স্ত্রী। তোমার মিথ্যা কথা—যদি কেহ তোমার কিছু অপহরণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার পিতা রামকান্ত। অকারণে তুমি তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছ।

র। আপনি কিরূপে আমার অভিপ্রায় জানিলেন?

স্ত্রী। তোমার অভিপ্রায় গোপন নাই—সকলেই এখন উহা জানিতে পারিয়াছে। বলিতে বলিতে স্ত্রীলোকটি মাতায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি কিছু পীড়া আছে?" স্ত্রীলোকটি বলিল "আমি উৎকট রোগে পীড়িতা—আমার শেষদশা বলিয়া, তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি।"

র। এখানে কোন গ্রামের ভিতরে চলুন। সেখানে কোন গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইবেন চলুন—এ পীড়িত অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নহে—

স্ত্রী। গ্রামে কোন গ্রহস্থের বাটী আমি তিন দিবস ছিলাম। কিন্তু গৃহস্থের প্রতিবাসী একজন চিনিতে পারিয়া আ-

মায় প্রেতিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। আমি সেই জন্য সেস্থান ত্যাগ করিয়া এই বাঁধা ঘাটে শয়ন করিয়া আছি।

র। একাকী এই রুগ্ন অবস্থায় কেমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন—হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে—

স্ত্রী। আমি একাকী নহি; আমার একজন সমভিব্যাহারী আছে—আমি সে জন্য তোমায় ব্যস্ত করিব না।

র। আমাদের ব্যস্ত করিবেন না ত কাহাকে ব্যস্ত করিবেন; আমরা কি আপনার পর—

স্ত্রী। তুমি আমার পর নহ কিন্তু তোমার যত্নে আমার তৃপ্তি হইবে না—এই কথোপকথন হইতে হইতে সেই গভীর তমিশ্র নৈশগগন ভেদ করিয়া আম্রকানন কাঁপাইয়া সঙ্গীতধ্বনি হইল। রতিকান্তের শরীর কণ্টকিত হইল। পীড়িতা রমণীও চমকিত হইলেন এবং কহিলেন "তুমি এস্থান হইতে যাও, আমার সঙ্গিনী আসিতেছে; তাহার চিত্ত স্থির নহে—তোমাকে দেখিলে তাহার মনের চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি হইতে পারে।" রতিকান্ত কোন উত্তর না করিয়া সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন, কিন্তু দূরে যাইয়া একটী তিন্তিড়ী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিলেন যে দূর হইতে একটি মধ্যবয়সী রমণী চঞ্চলগমনে আসিতেছে—তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে চিনিলেন যে পীড়িতা রমণীর সঙ্গিনী আর কেহ নহে; সেই উন্মাদিনী—যাঁহার অনুসন্ধানে তিনি এই ভীষণ অন্ধকারে বনে বনে বেড়াইতেছেন। রতিকান্তের সেই জন্যই অনুধাবন হইল যে তাঁহার জ্ঞাতি রজনীকান্তের সম্বন্ধে যে অতি গূঢ় গোপনীয় কথা উন্মাদিনী গঙ্গাতীরে ব্যক্ত করিয়াছিল—তাহার সহিত এ পীড়িতা রমণীর কোন সংস্রব থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণাভিলাষে বৃক্ষান্তরালে রহিলেন। কিন্তু দূরবশতঃ, কিছুই শুনিতে পাইলেন না—ক্রমে যামিনী অবসান হইল, পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ আলোকময় হইল, বিহঙ্গমকুল কলকল রব করিয়া উঠিল। পীড়িতা রমণী উন্মাদিনীর স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে আম্রকানন হইতে নির্গত হইলেন। রতিকান্তও অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ২ অনুসরণ করিলেন। রমণীদ্বয় গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, হরিনাথ মুখোর বাটীর সন্নিকটে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন। রতিকান্ত উহা দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাত্রে যাহা দেখিল।

রজনীকান্ত যেমন কুমুদিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা যদিও মোহিত হই নাই, তথাচ তাঁহাকে মধ্যে২ দেখিতে ভাল বাসি। অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই; চল পাঠক, যদি তোমাদের গৃহিণীরা রাগ না করেন তবে আজ একবার তাঁহাকে গিয়া দেখি। প্রস্ফুটিত

পদ্ম কুসুমবৎ কুমুদিনী সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শৈশব হইতে তিনি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আজ সেই অকৃত্রিম স্নেহের তিনি অধিকারিণী—সেই মধুর আদরে আদরিণী। আবার সংসারী হইবেন—শৈশবে যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন বিবাহ কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সেই অর্থ না বুঝিতে২ বিধবা হইয়াছিলেন; এখন তিনি সেই অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন; এ অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হইবে,—আবার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ—তাঁহার কি আর সুখের সীমা আছে? এই অসীম সুখ বাহিরে অব্যক্ত, অথচ তাঁহার পিতা মাতা বুঝিতে পারিলেন—পারিয়া, তাঁহার জনক জননী জগদীশ্বরের নিকট মনে২ প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগের এই একমাত্র কন্যাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন—কুমুদিনীও মনে২ প্রার্থনা করিলেন তাঁহার ভাবী পতি শরৎকুমারকে ও তাঁহার পিতা মাতাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন। কুমুদিনী সুখের সময়ে তাঁহার দুঃখে দুঃখী তাঁহার সুখে সুখী, রজনীকান্তকে ভুলিলেন না, তাঁহাকে যে অকারণে রূঢ়বাক্য দ্বারা মনস্তাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ মধ্যে২ আঘাত করিত, এবং সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে আর একবার রজনীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট আলাপ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রজনীকান্তের আর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। এই চিন্তা মেঘবৎ মধ্যে২ কুমুদিনীর হৃদয় অন্ধকার করিত—এবম্বিধ চিন্তায় এক দিবস সন্ধ্যাকালে কুমুদিনী তাঁহাদের খিড়কির উদ্যানের পুষ্করিণীর ঘাটের একটি সোপানে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিলেন, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত উন্মাদিনী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে কি সঙ্কেত করিতেছে। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?" পাগলিনী কোন উত্তর না করিয়া পুনরায় অঙ্গুলি সঙ্কেতদ্বারা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, তোমার ঠাকুরাণী ত ভাল আছেন?" পাগলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল "উঁহুঁ" কুমুদিনী চমকিত হইয়া পাগলিনীর হস্ত ধরিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে?" পাগলিনী উত্তর না দিয়া কেবল অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। কুমুদিনী পাগলিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে২ চলিলেন। খিড়কির দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া অনতিদূরে একটি ভগ্নকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের এক কোণে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। তাহার সন্নিকটে এক জীর্ণ ও গলিত শয্যায় একটি প্রাচীনা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা রমণী শয়ন করিয়া আছেন। ইনি আমাদিগের অপরিচিতা নহেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রতিকান্তের

সহিত যামিনীযোগে আম্রকাননে ইঁহারই সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং রতিকান্ত ইঁহারই পশ্চাৎ২ এই কুটীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। কুমুদিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পীড়িতা রমণী মুমূর্ষুপ্রায়; মধ্যে২ মুখে বারিসিঞ্চনের দ্বারা ও অনেক যত্নে তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইল। পীড়িতা রমণী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিকটে কুমুদিনীকে দেখিয়া ক্ষণিক হর্ষান্বিত হইলেন। নয়নে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল, এবং অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "মা এসেছিস, — কুমুদিনী তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার কে ছিলে—নতুবা এজন্মে চরমকালে তুমি আমার পুত্রের ন্যায় কাজ করিতেছ কেন?" কুমুদিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে২ বলিলেন "স্থির হউন, নতুবা রোগ বৃদ্ধি পাইবে।"

পীড়িতা রমণী উত্তর করিল, "রোগের আর কি বৃদ্ধি পাইবে—মা—আজ রাত্রি আমার কাটিবে না। তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে; আমি সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।"

কুমু। কি, বলুন।

পীড়িতা। আমার ভিক্ষা এই যে বহুদূর হইতে মরিতে২ যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি একবার তাহাকে দেখাও—মা আমার আর কেহ বন্ধু নাই যে এ উপকার করে—

কুমু। কে, কাকে দেখিতে চাও?

পীড়িতা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমার পূর্ব্বপরিচয় দিব, তা নহিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমায় একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা—" বলিতে২ পীড়িতা অচেতন হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাত্রে যাহা শুনিল।

কুমুদিনী একটি মৃৎপাত্রে জল আনিয়া তাহার মুখে সিঞ্চন করিলেন, এবং তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে উহা পান করিতে দিলেন। পীড়িতা রমণী কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের প্রতিবাসী রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সোণামণিকে বিবাহ করেন। পিতা মাতা দরিদ্র বিধায়ে আমি তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়া রমাকান্ত বাবুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। কখন স্বামীর ঘর করি নাই, স্বামী একজন মহৎ কুলীন—বিবাহ তাঁহার উপজীবিকা—আমাকে দরিদ্রের কন্যা বিবেচনা করিয়া কখন তিনি আমাদের বাটী আসিতেন না। কিন্তু যখন জনিতে পারিলেন যে আমি বিখ্যাত ধনাঢ্য রমাকান্ত বাবুর সংসারে বাস করিতেছি, তখন মধ্যে২ আসিতে লাগিলেন। আমি ভগিনীর সংসারে সুখে থাকিলাম। প্রথমতঃ—মধ্যে২ স্বামীকে দেখিতে পাইতাম, দ্বিতীয়তঃ—এই সংসারে কর্ত্রী স্বরূপা হইয়া রহিলাম। ভগিনীর ক্রমে বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইল। রমাকান্ত বাবুর প্রথমা স্ত্রীর

তিন কন্যাসন্তান মাত্র ছিল, কিন্তু রমাকান্ত বাবু একটি পুত্রসন্তান না হওয়াতে সর্ব্বদাই দুঃখিত। আমার ভগিনী সোণামণি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অনেক যাগ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। অবশেষে ভগিনী অন্তঃস্বত্বা হইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমিও ঐ সময়ে অন্তঃস্বত্বা হইলাম। নবম মাসে এক দিবস প্রাতে, ভগিনী একটি সুকুমার প্রসব করিলেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ! আমিও সেই দিবসে সন্ধ্যাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম। আমরা দুই ভগিনী এক সময়ে পুত্র প্রসবিনী হওয়াতে আহ্লাদের আর সীমা রহিল না—রমাকান্ত বাবুর বিপুল বৈভবের অধিকারী জন্মিল। সুবর্ণপুর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিল। আমাদিগের সন্তান দুইটির তাহাদিগের মাতুলের ন্যায় মুখাবয়ব হইল। উভয়ে হৃষ্ট পুষ্ট এবং একই প্রকার দেখিতে হইল, দুই জনকে একত্রে রাখিলে সর্ব্বদাই ভ্রম হইত। ভগিনী সন্তানটির নিতান্ত অনুরক্তা হইলেন, ক্ষণকালের জন্য ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিতেন না; এমন কি সন্তানটি এক মাসের হইলে একদিবস তাহার বাল্‌সা হওয়াতে সোণামণি মনের চাঞ্চল্য হেতু মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং সেই অবধি ক্রমে২ রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। রমাকান্ত বাবু সোণামণিকে অতিশয় ভাল বাসিতেন—তাহার পীড়া দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত চিকিৎসক আনাইলেন। তাহারা একমাস ধরিয়া চিকিৎসা করিল, কিন্তু বিশেষ কোন ফল দর্শিল না—অবশেষে তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিল। নিলারপুরে আমাদের পিত্রালয়। নিলারপুরের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, অতএব শেষ স্থির হইল কিছু দিনের জন্য ভগিনীদ্বয়ে পিত্রালয়ে গিয়া বাস করি। এক শুভদিনে নিলারপুরে যাত্রা করিলাম,—রমাকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে সোণামণির অতিশয় বাধ্য হওয়াতে আমাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন,—উঃ বড় তৃষ্ণা জল—”

বলিতে২ রমণী আর বলিতে পারিলেন না, বাক্‌শক্তি রহিত হইল, কুমুদিনী দ্রুত জল আনিয়া দিল। রমণী উহা পান করিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, পুনরায় যখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কুমুদিনী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, “আজ স্থির হইয়া থাকুন কাল বলিবেন।” রমণী বলিলেন, “আমিত কাল পর্য্যন্ত বাঁচিব না; আজ না বলিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।” এই বলিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—

“পিত্রালয়ে কিছু দিন বাস করিয়া সোণামণি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল। রমাকান্তের ইচ্ছা যে মাস ছয় সাত সেখানে থাকিয়া সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে। এইরূপে কিছুদিন পরে যখন আমাদিগের শিশুদিগের আড়াই মাস বয়ঃক্রম হইল তখন এক দিবস জনরব উঠিল যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে

একদল ছেলেধরা স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তাহারা দুই চারি মাসের শিশুদিগের চুরি করিয়া লালন পালন করিয়া চার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ব্যবসাদারদিগের নিকট বিক্রয় করে এবং তাহারা অন্য দেশে বালকদিগের গোলাম বলিয়া বিক্রয় করে—এই সংবাদে প্রসূতিদিগের মনে কি প্রকার ভয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আমার ভগিনী সোণামণি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন, পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল, তাঁহার শিশুকে কাহারও নিকট বিশ্বাস করিয়া দিতেন না, কেবল মধ্যে২ আমিই সে বিশ্বাসভাজন হইতাম। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সোণামণি আমার নিকট তাঁহার সন্তানকে দিয়া গঙ্গায় গা ধুইতে গিয়াছিলেন। আমার পিতার বাটীর পশ্চাতেই একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর ছিল, আমি বিষম গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় প্রান্তরের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া শিশুকে লইয়া শয়নে ছিলাম। ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়েতে চমকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কোলে টানিতে গিয়া দেখিলাম, শিশু নাই—চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া পড়িলাম, তখন বেস অন্ধকার হইয়াছে—আমার চীৎকারে ভগিনীপতি দৌড়িয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সবিশেষ বলিলাম। তিনি চতুর্দ্দিকে ভৃত্যবর্গকে পাঠাইয়া আমার নিকট আসিয়া আমার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন 'দেখ আমি অনেক লোকজন পাঠাইয়াছি এক্ষণেই তাহারা শিশু ফিরাইয়া আনিবে; কিন্তু ইতি মধ্যে তোমার ভগিনী যদি বাটী আসিয়া তাঁহার সন্তানকে দেখিতে না পান তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে। অতএব তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আপাততঃ তোমার পুত্রকে তাঁহার বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক। তোমার পুত্র ও আমার পুত্র যমজের ন্যায়, কোন প্রভেদ নাই। সোণামণি সহজেই ভুলিবেন—তাহার পর আমার শিশুপুত্র প্রাপ্ত হইলে সকল বজায় থাকিবেক—' আমি এই পরামর্শে সম্মত হইলাম—কেন না সোণামণি বাটী আসিয়া তাঁহার শিশুকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মরিবে, তাহা জানিতাম। বিশেষতঃ যতদিন না সোণামণির শিশু পাওয়া যায় ততদিন আমার শিশু আমারি নিকট থাকিবে, এই বিবেচনা করিয়া পরিচারিকা কমলমণির (এক্ষণে এই উন্মাদিনী) নিকট হইতে আমার শিশু আনিয়া পূর্ব্ববৎ সেইস্থানে শয়ন করাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ভগিনী পথিমধ্যে এ সংবাদ পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিতেছিলেন, এবং আমার শিশুকে তাহার বিছানা হইতে ক্রোড়ে লইয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সকলে জানিল যে আমার শিশু হারাইয়াছে এবং তাহা আর পুনঃপ্রাপ্ত হইল না।

"কিছুদিন পরে সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রমাকান্ত বাবু

তাঁহাকে লইয়া সুবর্ণপুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমিও যাইতে উদ্যত হইলাম—কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন, বলিলেন, 'তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা কাশী যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকা আবশ্যক। তুমি ভিন্ন আর কে সঙ্গে যাইতে পারে? আমি সকল খরচপত্র দিব।' আমি যাইতে অস্বীকৃত হইলাম, বলিলাম, আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও,আমি যাইব। কিন্তু পাষণ্ড বলিল তোমার সন্তান চুরি গিয়াছে আমি কোথায় পাইব—আমি বলিলাম তুমি চুরি করিয়াছ—সে উত্তর করিল, 'কে এখন বিশ্বাস করিবে যে তোমার সন্তান তোমার জ্ঞাত সারে আমি চুরি করিয়া তোমার ভগিনীকে দিয়াছি। একথা শুনিলে তোমাকে বাতুল মনে করিবে একথা আর মুখে আনিও না—' আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। পাষণ্ড যাহা বলিল তাহা সঙ্গত বিবেচনা হইল, কিন্তু আমি অনেক কাঁদিয়া বলিলাম আমি তাহার বাটীতে বাস করিব—কেন না তাহা হইলে আমার পুত্রকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু পাষণ্ড কোন মতেই রাজি হইল না—এখন আমি কোথায় যাই সুতরাং পিতামাতার সহিত কাশী যাওয়া স্থির করিলাম—রমাকান্ত আমার প্রাণের পুত্র চুরি করিয়া সোণামণি সমভিব্যাহারে সুবর্ণপুরে গেল। আমার শিশু সন্তানের পরিচর্য্যার্থে কমলমণিকে সঙ্গে লইয়া গেল। কাশী যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে একদিবস এক জন পুলিষ কর্ম্মচারী আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিল, একদল স্ত্রীলোককে ছেলেধরা সন্দেহ করিয়া পুলিষে ধৃত করিয়াছে,এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দুইটী শিশুসন্তান পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে একটি হাকিমের নিকট তাহাদিগের এজেহারে প্রকাশ হইল যে তোমার দৌহিত্র, তোমাকে গিয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়া আনিতে হইবে। বৃদ্ধ পিতা আহ্লাদে তাহার সমভিব্যাহারে গিয়া সোণামণির শিশু ফিরিয়া আনিলেন। আমি আহ্লাদে গলিয়া গেলাম। আপনার শিশুর ন্যায় তাহাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই সংবাদ রমাকান্তকে লিখিলাম, আরও লিখিলাম আমার শিশু আমাকে ফিরাইয়া দিবেন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া কাশী যাত্রা করিব। রমাকান্ত প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে 'তোমার শিশু ফিরিয়া পাইয়াছ শুনিয়া বড় সুখী হইলাম,তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হউক—কিন্তু পুত্র ফিরিয়া দিবার কথা কি লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি কি পাগল হইয়াছ?' আমি পত্রখানি অঞ্চলে বাঁধিলাম। চক্ষের জল চক্ষে মারিলাম দুঃখের কথা আপনার হৃদয়ে গোপন করিলাম। সোণামণির শিশুসন্তান লইয়া কাশী যাত্রা করিলাম—সেখানে তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কমলমণি সোণামণিকে ত্যাগ করিয়া আমার নিকট

আসিল। তাহার বুদ্ধির কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলাম। রমাকান্তের প্রতি তাহার বিশেষ রাগ, বোধ হয় যেন রমাকান্ত তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে যাহা হউক কমলমণি শেষে উন্মত্ত হইল। সোণামনির পুত্র আমার নিকট থাকিয়া কৃতবিদ্য হইল। রমণপুরের শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে কাশীবাস করিতেন, তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা প্রমদার সহিত সোনামনির পুত্র শরৎ কুমারের বিবাহ দিলাম—"

এইসময়ে কুমুদিনী চমকিয়া উঠিলেন —এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি! আপনার প্রতিপালিত সোণামণির পুত্রের নাম শরৎকুমার?" পীড়িতা রমণী উত্তর করিল "হাঁ" কুমুদিনী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?" "তার পর বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শরৎকুমার কৃতবিদ্য হইয়া, কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টা করিতে আসিতে ইচ্ছুক হইল। এই সময়ে তাহার শ্বশুর শ্রীনাথ বাবু বাটী আসিতে ছিলেন। শরৎকুমার তাঁহার সহিত আসিল। রমাকান্তের সহিত তাহার অথবা আমার যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা শরৎকুমারকে কখন বলি নাই। কেন না রমাকান্তের নাম মুখে আনিতে আমার ঘৃণা হইত—শরৎ এদেশে আসিলে পর আমার পিতামাতার মৃত্যু হইল, এবং আমিও রোগগ্রস্ত হইলাম, এসংবাদ রমাকান্ত জানিতে পারিল, এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিল যে আমারও মৃত্যু হইয়াছে। আমি দিন২ অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং নিশ্চয় বিবেচনা হইল আর অধিক দিন বাঁচিব না। মনেং আপনার পুত্রকে দেখিতে বড় সাধ হইল। মরিতে২ ঐ উন্মাদিনী সমভিব্যাহারে এ দেশে আসিলাম। শুনিলাম আমার ভগিনী ও রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্র রজনীকান্ত তাহাদের বিষয়াধিকারী হইয়াছে। এক দিবস উন্মাদিনী আমার রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং কি বলিয়াছিল তাহা জানি না। রজনী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। রজনী তাহাকে চিনিত না—কিন্তু তাঁহার শত্রু রতিকান্ত চিনিত। তাহার সহিত কাশীতে এক দিবস সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমুদিনী আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সব শুনিলে, এক্ষণে একবার রজনীকান্তকে এইখানে আনাও, আমি দেখে প্রাণত্যাগ করি।"

কুমুদিনী এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে পীড়িতা পুনঃপুনঃ কাতরোক্তি করিতে লাগিল দেখিয়া, তিনি ধীরে উঠিলেন এবংপ্রতিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি রজনী বাবুকে একবার এইখানে শীঘ্র আসিতে বল।" তৎপরে পুনরায় কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রমণী অচেতন। চেতন করিতে বহু যত্ন করিলেন কিন্তু সফল হইলেন না। রমণীর মৃত্যু হইয়াছে—কুমুদিনী তাঁহার শিয়রে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

কাঁদিতে লাগিল। রমণী তাহার কে ছিল? কেহ না—কিন্তু অনাথিনী বলিয়া পীড়িতা অবস্থায় তাহার শুশ্রূষা করাতে মায়া জন্মিয়াছিল। ইতিমধ্যে রজনীকান্ত সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মৃতব্যক্তি কে?" কুমুদিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "তোমার জননী।" বলিয়া মনেং অতিশয় ক্ষোভিত হইলেন, লজ্জায় অঞ্চল দিয়া মুখাবরণ করিলেন।

রজনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? তুমি কি আমায় চেন না? আমি রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।"

কুমু। অন্যব্যক্তি তাঁহার পুত্র।

রজ। কে?

কুমু। শরৎকুমার।

রজ। যাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে?

এই কঠিন তিরস্কারে কুমুদিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধে, পুরুষ-মানুষের মত তীব্রদৃষ্টিতে রজনীর প্রতি চাহিলেন। আবার তখনই স্ত্রীলোকের মত চক্ষু দুটিকে নত করিয়া, ক্রমে ক্রমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া, একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। রজনী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "আমি তা বলি নাই। তবে কথাটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি একথা কেন বলিতেছিলে?"

কু। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?

এবার রজনীর দৃষ্টিতে তিরস্কার ব্যক্ত হইল। রজনী বলিল, "কবে তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি? তোমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ নাই।

কুমুদিনী আবার লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পরে বলিলেন, "বিশ্বাস কর না কর, আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি করি। তুমি মনোযোগ দিয়া শোন।"

তখন সেই অন্ধকার নিশীতে, সেই বিজন কুটীর মধ্যে, সেই সদ্যঃবিমুক্তপ্রাণ মনুষ্য দেহপার্শ্বে বসিয়া, সেই যুবতী, রজনীকান্তের কাছে বলিতে লাগিল। সেই ভীষণ সর্ব্বস্বান্তকর কথা, কুমুদিনী যেমন মৃতার নিকট শুনিয়াছিলেন, তেমনি বলিতে লাগিলেন; ক্ষুদ্র, নিস্তেজ দীপের ক্ষীণালোক, কুটীরমধ্যে কাঁপিতে-ছিল,—মধ্যেং কুটীর ভিত্তির উপর ভৌতিক ছায়া সকল প্রেতবৎ নাচিতেছিল—শবদেহের উপর ভৌতিক রঙ্গে খেলিতেছিল—কুমুদিনীর অশ্রুসমুজ্জল চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলসাইতেছিল;—নিকটস্থ বৃক্ষ শাখায় কদাচিৎ কোন অতি মৃদু, কি ভীষণ মৃদু! রব হইতেছিল—দূরে কদাচিৎ কোন বিকট পশু রব করিতেছিল। সেই সময়ে, সেই আলোকে, কুমুদিনী, ধীরে ধীরে, অস্ফুটস্বরে, গম্ভীরভাবে সেই সর্ব্বস্বান্তকারিণী কাহিনী রজনীকে শুনাইলেন। মেঘ বলিল, চাতক শুনিল—যা শুনিল, তা—বজ্রাঘাত!

———

পালি ভাষা ও তৎসমালোচন।

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী সত্ত্বেও পালিব্যাকরণ কর্ত্তা কচ্ছয়ণ* কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্পারম্ভে ব্রাহ্মণ ও অন্য বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে যথা—

সমাগধা মূল ভাষা
নরেয় আদি কপ্পিক
ব্রাহ্মণ সস্সুট্ঠল্লাপ
সম বুদ্ধ চ্চাপি ভাষরে॥

পুনশ্চ "পতি সম্বিধ অত্থ্য়" নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মাগধী আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা, এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়—চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটক নিচয় এই ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র২ প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ প্রকার ভাষা চির কালই প্রসিদ্ধ। "নম্লেদিত বে নামা ভ্রংশিতবৈ" এই শ্রুতি বাক্য আর "যএব শব্দা লোকে তএব বেদে," "লোকবেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ" ইত্যাদি আর্ষ বাক্য এবং "যদ্যমন্ত্রীয়ং বাচং বদেৎ" এই বেদ বাক্য এবং "ঘাত ঘামঞ্চ যত্তবেৎ" ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে, "ততো ভাষাশ্চ সসৃজে পঞ্চাশৎ ষট্ চ সংখ্যয়া। তজ্ জ্ঞানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ।" বিধাতা ৫৬টী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন "এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৮টী শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানা প্রকার আছে। ফল শাস্ত্রীয় ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষা গ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন "প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা" স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্রে বলিয়াছিলেন, এতাবতা শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার যথা। (১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত, এই প্রাকৃতের ভেদ উদীচী (৩) মহারাষ্ট্রী (৪) মাগধী (৫) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী (৬) শকাভীরী (৭) শ্রাবন্তী (৮) দ্রাবিড়ী (৯) ওড্রীয়া (১০) পাশ্চাত্যা (১১) প্রাচ্যা

* কাত্যায়ন।

(১২) বাহ্লিকা (১৩) রন্তিকা (১৪) দাক্ষিণাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবন্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে শ্রবন্তী ভাষা আছে, উহাই পালি ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় শ্রবস্তীস্থ জেত বনে বাস করিয়া ভিক্ষু দিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধ ভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার প্রাপ্ত ভাষা পালিনামে প্রখ্যাত হয়। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধ ভাষা মজানানো মাহেশ্বর তয়া নৃপঃ;" এতদ্দ্বারা তাঁহার বৌদ্ধ ভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য। হস্বীর টীকায় উক্ত হইয়াছে "সংস্কৃতা শিষ্ট ভাষা চ শ্রবন্তী বাক্ বিনায়কাঃ" অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত আর বিনায়কদিগের ভাষা শ্রবন্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়। এই ১৮ প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরব্যাকরণে" আছে, ঐ সকল উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলে পালি ভাষার সহিত শ্রবন্তী-ভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেণী যথা মহাবংশ (মূল পালি) অস্স পালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত" অর্থাৎ সেই রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী বাটী নির্ম্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ নিচয় পালি নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী ভাষার রচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্ডার্স অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থনিচয় খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের ১০০ বা ২০০ বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক কতিপয় পালি গ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা "সামান্যফালসূত্রঅথ কথা" নেবা পালিয়ম্ ন অথ কথায়ম্ দীশতি" অর্থাৎ ইহা মূল বা অর্থ কথায় অর্থাৎ টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা লঘু পদ্ম পুণ্ডরীক "পালিয়ম পান বুদ্ধতি কেন অথেন" অর্থাৎ তাঁহাকে মূলগ্রন্থে কিজন্য বুদ্ধ বলা যায়? পুনশ্চ যথা মহাবংশ "পিটকত্তয় পালিন স তস অথকথান" অর্থাৎ মূল ত্রিপেটক এবং তাহার অর্থ কথা ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভূরি২ উদাহরণ দ্বারা পালিমূল বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের একটী বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালি ভাষায় মূল ধর্ম্ম গ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূল গ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণতঃ পালি মগধ দেশীয় ভাষা, এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে "পালি ভাষা" এই নামের পরিবর্ত্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝা-

ইত। পালি ভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট জন্মের ৬০০শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা মগধ দেশের ভাষা ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে সিংহল দ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালি ভাষা কথোপকথনের এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহাকে আর মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাসেন কহেন পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীর সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা হইলে ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, এজন্য আমরা তাঁহার কথা অপ্রামাণ্য বোধ করিলাম। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালি ভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধগণের ৩টী প্রাকৃত ভাষা যথা প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরের খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভাষা, ও ৩য় পালি ভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্প মাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিত বিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্য সিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালি ভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহার সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক যথা—

সংস্কৃত	পালি
অভিধর্ম্ম	অভিধম্ম
অমৃত	অমত
অর্হত	অরহ
অর্থকথা	অথকথা
শ্রুতি	শুতি
মন্ত্র	মন্তো
মার্গ	মাগ্গো
ম্লেচ্ছ	মিলাক্খো
নির্ব্বাণ	নিব্বানম্
বর্ণ	বন্নো
যবন	যোন
পর্ব্বত	পব্বত
অশ্ব	অসো
রক্ত	রত্ত
বৃক্ষ	রুক্ষ
শিষ্য	শিষ্য
সর্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধরাজ মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খৃঃ পূঃ সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫০০ শতাব্দীতে বুদ্ধ ঘোষ মগধ দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালি

ভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্ছয়ণকৃত পালি ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। আমাদিগের পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহল দ্বীপের সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একাল পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালি ব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্ছয়ণ কৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কহেন কচ্ছয়ণের পালিব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

এই পালি ব্যাকরণ ৮ ভাগে বিভক্ত। এই ৮ ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন যথা।

সিথান তিলোকমহিতম্ অভিবন্দি জগান
বুদ্ধন চ ধম্ম মমলান্ গণ মুও মঞ্চ
সথুস তস বচনাথ বরান্ সুবোধন্
ব্যাখ্যামি সুত্তহিত মেথ্য সুসন্ধিকপান্
সোয়ান জিনিরিত নেয়েন বুদ্ধ লভন্তি
তঞ্চপি তসবচনাথ সুবোধনেন
অথান চ অক্ষর পদেষু অমোহভাব
সিয়থিক পদ মতো বিবিধন শূন্যেয়

অর্থাৎ “আমি ত্রিলোক আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্ম্মল ধর্ম্ম, ও স্থবির মণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া সন্ধি কল্পের গভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চির সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা এতাদৃশ যথার্থ সুখের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানা প্রকার বাক্য সংযোগ শ্রবণ করুন।”*

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা।

১। অথ অক্ষর সন্যাত্তো।
২। অক্ষর পাদোয় একচত্তাল্লিশন্।
৩। তথো উদাত্ত স্বর অথ।
৪। লহু মত্ত তয় রস্ব।
৫। অন্য দীঘ্‌ঘ।
৬। শেষ ব্যঞ্জন।
৭। বগ পঞ্চা পঞ্চাশ মন্ত।

এইরূপে কচ্ছয়ণ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিকদ্বারা গ্রন্থ ব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন২ স্থানে পাণিনি সূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে যথা পাণিনি “অপাদানে পঞ্চমী” তথা কচ্ছয়ণ“অপাদানে পঞ্চমী।” এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধ তীর্থ স্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে যথা শ্রবস্তী, পাটলী, বারানশী ইত্যাদি—

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বালাবতার—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালি ব্যাকরণ। ইহা কচ্ছয়ণের

* এই স্থলে মর্ম্মানুবাদ মাত্র করা হইয়াছে।

ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং এপর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘু কৌমুদীর ন্যায় আদরণীয়। বালাবতার কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সংকলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে অখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কীটক, ও উণ্বাদি সূত্র, এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তি ভেদ। গ্রন্থারম্ভে গাথা যথা

বুদ্ধনন্তি দভিবন্দিত বুদ্ধম্ ভুজবিলোচনন্
বালাবতারণ ভাষিষন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিয়

অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আনন্দ বর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটী প্রণাম্ করিয়া সুকুমার মতি বালকের জ্ঞানোন্নতি নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।*

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি। এখানিও কচ্ছয়ণের পালি ব্যাকরণের সারসংগ্রহ কিন্তু বালাবতারের ন্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্ছয়ণের একজন প্রাচীন সংকলন কর্ত্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানানাদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন যথা—

কচ্ছয়ণন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব
নিশ্যোয় কচ্ছয়ণ বানানাদিন্
বালাপবোধাত্থ মুজুন করিশন
ব্যাখ্যান সুখানন্দন পদরূপসিদ্ধি।

অর্থাৎ "আচার্য্য কচ্ছয়ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানানাদি পর্য্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত, কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদ রূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন যথা—

বিখ্যাত আনন্দ থেরাভ্‌ভয় বর গুরু নাম
তম্ম পাণি ধজানন
শিষো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি
দিপালধ্যাপ্প কাশ
বালাদিচ্চদি বাসদিত্য মধিবসান
নসনান যোতি ও
সোয়ম্ বুদ্ধ পিয়ভো যতি ইমামুজুকান
রূপ সিদ্ধিন অকাশী।

অর্থাৎ এই নির্দ্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তাম্রপনি (সিংহল) প্রদেশের ধ্বজ স্বরূপ ও দামিল দেশের (চোল) দ্বীপ স্বরূপ এবং "বুদ্ধপ্রিয়" (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপাঙ্কর রচনা করেন। তিনি বালাচিদ্দ ও চুড়াগাণিক্য নামক মঠদ্বয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

সিংহল দেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহল দ্বীপবাসী ছিলেন।

* পালি ও গাথা সমূহ এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

মহাবংশে উল্লেখ আছে মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাঞ্জোর) একজন স্থবিরের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় উক্ত নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানা শাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহল দ্বীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপসিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোল দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্গল্যায়ণ ব্যাকরণ। এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদ্গল্যায়ণ প্রণীত। "বিনয়াত্থসমুচ্চয়," পঞ্চীকাপদীপ, গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষ গুণকীর্ত্তিত হইয়াছে। মৌগ্গল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধা পুরের থুপারাম মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্ছয়ণকৃত ব্যাকরণ ও সদ্দানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত যথা—প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সিআদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিত্ব তথাগতম
সধর্ম সঙ্ঘম ভাষিষন্ মগধমশব্দ লক্ষণম।

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া, আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক যথা—

তস্য ভূতি সমাসেন বিপুলাত্থ পকাশিনী
রচিত পুন তেনেব সসাঙ্গু যোত্ত কাস্থিন।

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষার দীপানি, কচ্চয়ণ ভেদ টীকা, মহাশব্দনীতি, প্যায়োগসিদ্ধি, গরল বেনীসন্য, পঞ্চিকা পদীপ, অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দ গ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এবং পিঙ্গল, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দ গ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থকার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন।

নমাত্থুজন শান্তন তমশান্তন ভেদিনো
ধক্ষুজালস্ত রুচিন মুনিন্দোদাতরচিনো
পিঙ্গলাচার্য্য দিহিস্থন্দানম দিতমপুরা
সুদ্ধ মাগধী কানন তন ন সাধতি
যথিচ্ছিতম।

ততো মগধ ভাষের সতাবন্ন বিভেদনন
লক্ষ লক্ষণ সম্মুত্তন পশানথ পদাকমম্
ইদম বুত্তোদয়ন নামা লোকীয় চ্ছন্দ
নিশ্যিতন্
অব ভিশ্যমহুন দানি তেশম সুখ বিবুদ্ধিয়।

অর্থাৎ "মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দ গ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।" ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ

দেখাইয়া, প্রচলিত ছন্দ সমূহের রচনার রীতি উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইল। এই গ্রন্থ ৬ অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের নাম সঙ্গ রক্ষিত।

ধাতু মঞ্জুষা—এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবির কৃত। পালি ভাষার ধাতু-পাঠ। ইহা কচ্চয়ণের ব্যাকরণ সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্চয়ণ ধাতু মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোক যথা—

নিরুত্তি নিকর পার পারাবারন্তগান্ মুনিন্
বন্দিত্ব ধাতু মঞ্জুষান্ ক্রমি পবচনান্যশান
সুগত গম মগম তন তন ব্যাকরণানিচ
ইত্যাদি

অর্থাৎ শব্দ সমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্ম্মের মার্গ স্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা করিলাম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তম রূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ সঙ্কলন করিলাম।

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন যথা

"রচিত ধাতুমঞ্জুষা শিলা বংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেরুহ রাজহংস
অসিথ ধামাৎ থিটি শিলাবংশ
যক্ষাদিলে নাম্ম নিবাস বাসী
যতীশ্বরে সো জমিদান্ আকাশী—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ রচিত। এই শিলাবংশ একজন যক্ষ্যাদিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও তথায় অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া রাজহংসের ন্যায় ধর্ম্ম গ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা ডন এনড্রিশ সিল ভিরা বাতু বান্ত দেবনামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজী ভাষার অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধান পদীপি—একখানি সংস্কৃত অমর কোষের ন্যায় প্রসিদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যোপান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা

তথাগতো করুণাকরো করো
প্যায়তো মোসঞ্জ সুখাপ পদান্ পদান্
অক পযাথান কলিসম্ ভাব ভাব
নমামি তান্ কেবল দুঃখ করণ্ করণ্

অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগতকে বন্দনা করি, যিনি নির্ব্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখবর্দ্ধন করত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা

সগ্‌গ কাণ্ডোচ ভূকাণ্ডো
তথা সামান্য কাণ্ডকান্
কাণ্ডাত্ত্বান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভূজগ বশাথি
সকলাথ সমাভায় দিপা নিয়ান
ইহ ও কুশল মতীম সনায়ো
পাতু হোতি মহা মুনিন বচন

অর্থাৎ এই অভিধান পদী পিকা ত্রিকাণ্ড বিভক্ত যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য

কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রমবাহুর রাজ্য কালে মোগ্গল্ল্যায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অঃ রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষা সম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সারোদ্ধৃত হইল। আমরা পালি ভাষায় সুপণ্ডিত নহি এজন্য সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণান্তর্গত বা অনুবাদ ঘটিত দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মহাবংশ—ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিম্বা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না, কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথার ন্যায় অলীক গল্প পরিপূর্ণ গ্রন্থে আমাদিগের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার করা দূরপরাহত। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত মধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অঃ সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালিভাষায় রচিত সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থনিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিংহল দেশীয় পালি বৌদ্ধ ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাষার দুইখানি পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবিরকর্ত্তৃক রচিত কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পূর্ব্বের রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খৃঃ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খৃঃ পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্য তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক

বিবরণ সমূহ সুপ্রণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুরাণের ন্যায় এ গ্রন্থখানি কেবল "কাহিনী" নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রন্থিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরাক্রম বাহুর (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীর্ত্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানুসারে ও তিবত্ত্বয় দ্বারা রচিত।

জর্জ্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ—মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিরগণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্য কেহ২ অনুমান করেন এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অতাঙ্গলু বংশ, দ্বাতা বংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, সুত্ত নিপাত, মহা পরিনির্ব্বাণ সুত্ত, ধম্মপদ, প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ এবং সিংহল দেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইলডার্স, ফস্‌বুল, ক্লফ, ও কুমার স্বামীর যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেন।

নীতিকুসুমাঞ্জলি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪৯

বিশেষ যত্নের সহ, নিঙ্গড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার।
পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার॥

কদাচিৎ পর্য্যটন, করিয়া মানবগণ,
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে॥

৫০

মকরের ভয়যুক্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সদ্য মণি উদ্ধারিয়া লও।
তরঙ্গেতে অনিবার, তরলিত পারাবার,
সন্তরিয়া পার হবে হও॥
রোষযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুসুম আকারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কোন ফল নাই এ সংসারে॥

৫১

যদবধি তব, ছিলহে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত।
যৌবন রসাল, ছিল যতকাল,
তরুণীতে অনুরক্ত॥
এলো বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাজাল,
সতত রহিলে মগ্ন।
পরম ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ্ন॥

৫২

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত।
শিশির বসন্ত সদা করে গতায়াত॥
কালক্রীড়া রত, গত হইতেছে আয়ু।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা বায়ু॥

৫৩

শরীর গলিত, কেশ হইল পলিত।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল স্খলিত॥
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায়।
তথাপিও ভণ্ড আশা না ছাড়ে আমায়॥

৫৪

যদবধি ধন, কর উপার্জ্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ।
যখন জরায়, জর্জ্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ॥

৫৫

অষ্ট কুলাচল আর সাতটী সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুরন্দর॥
আমি তুমি, তারা কেহই না রবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে॥

৫৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার।
কেবল সক্ষম কর আত্মা আপনার॥
আত্মজ্ঞান হীন যেই, সেইজন মূঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ়॥

৫৭

দেবতামন্দির কিম্বা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা, আর মৃগচর্ম্ম বাস॥
সকল প্রকার কর্ম্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য সুখদ বল না হয় কাহার॥

৫৮

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে ধিয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে সুখলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহ পরায়ণ,
নীতি শাস্ত্র বর্ণিত বিশেষ॥

৫৯

কে তব ললনা, কে পুত্র বলনা।
কি আশ্চর্য্য এসংসারে।
তুমি কার ছেল্যে, কোথা থেকে এল্যে,
মনে ভাব ভাই আরে॥

৬০

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
করো না করো না অহঙ্কার।
এসব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমেষেতে করয়ে সংহার॥
মায়াময় এসংসার, ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার।
ব্রহ্মপদে আশুমজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর॥

৬১

কমলের দলে জল, সদা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন তরল।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত যতনর,
শোকানলে প্রতপ্ত সকল॥

৬২

তত্ত্ব চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিত্তে॥
ক্ষণেক সজ্জন সঙ্গ কর যত্ন করি।
সেইমাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তরী॥

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করি, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারি গণ্ড শোভা হত, ভৃঙ্গগিয়ে মনোমত,
বিকচ কমল বনে চরে।

৬৪

মৃণাল কমল দল যাহার আহার।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে যেই কন্দর নিকরে।
যাহার পানীয় পয় পর্ব্বত নির্ঝরে॥
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে।
তৃণরাশি চিবাইয়া দেহ রক্ষা করে॥

৬৫

গ্রহ-পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবরুদ্ধ বিষধর আর করিবর॥
মতি মানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান্ জানিনু এখন॥

৬৬

আকাশ একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে,
তারাও আপদ ছাড়া নয়।
সাগরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয়।
কি লাভ উত্তম স্থানে,কিবা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন।
বিপদ প্রসর করে, বসি কাল দুরান্তরে,
সকলেরে করে আকর্ষণ॥

৬৭

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুম্ভ বিগলিত,
রুধিরাক্ত চারু মুক্তা ফলে॥
বনে ভিল্লী দেখি ধায়,বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে।
দেখি তার শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন॥

৬৮

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্য্য নম্রতর
শাখা আর উন্নত মস্তক।
কিকাজ কোমল দল, লীলারসে চলচল,
কমনীয় কুসুম স্তবক॥
যেহেতু তোমার তলে, নিষণ্ণ পথিকদলে,
খিন্ন হয়ে করি কত স্তব।

মৃদু মধুযুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব ॥

৬৯

সারহীন হে শিমুল, অতি দূরে তব মুল,
কণ্টকে আবৃত পুন কায়।
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল
বানরেও নাহি খায় তায় ॥
কুসুমেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকরন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার।
থাক, থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবাশ্রয়ে থাকাতে আমার ॥

৭০

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল ॥
স্বাদু ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গিধিনী শকুনী সুবিকল ॥
দূরে থেকে দেখি সমুন্নত পুষ্পচয়।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি সুনিশ্চয় ॥
ওরে রে শিমুল গাছ বল কি কারণ।
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চন ॥

৭১

শুকপক্ষীর উক্তি।

কাঞ্চন পিঞ্জরে, থাকি নিরন্তরে,
নৃপতির করে, মার্জ্জিত কোমল কায়।
খাই সুরসাল, দাড়িম্ব পসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুধা পিপাসায় ॥
সমাজেতে হায়, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায়।
কানন ভিতরে, কোন তরুপরে,
জনমকোটরে, সদা মম মন ধায় ॥

৭২

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে।
রিপুজয় কর যুক্তি বল সহকারে ॥
লোভিজন ধনদানে, কার্য্যেতে ঈশ্বরে।
যুবতীরে প্রেমে, দ্বিজগণে সমাদরে ॥
সমভাবে বশকর কুটুম্বনিকরে।
রাগীপ্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে ॥
মূর্খে নানা কথা কয়ে, রসিকেরে রস।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি।
যুবতীর লজ্জা, দম্পতির স্থির রতি ॥
গৃহের শোভন শিশু, বুদ্ধির কবিতা।
তনুর লাবণ্য, মতি স্মৃতি সমন্বিতা ॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্ষমা ক্রোধাসক্ত জনে।
সতের সুস্থতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে ॥

৭৪

ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায়।
ক্ষয় পেয়ে পূর্ণ হয় শশাঙ্কের কায় ॥
এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ।
বিষম বিপদে তপ্ত কদাচ না হন ॥

৭৫

কমল আকরে, কমলনিকরে,
দিনকর ফুল্লকরে।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী জাল,
বিকাশে বিধুর করে ॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
করয়ে সলিল দান।
বিনা আবাহন, পরার্থে সুজন,
করেন হিত বিধান ॥

৭৬

ফলভরে নত হয় বিটপী নিকর।
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধর॥
অনুদ্ধত সুজনের যদি হয় ধন।
স্বভাবত পরহিতে করেন যোজন॥

৭৭

কৃপণতা হরে যশ, ক্রোধে গুণচয়।
ক্ষুধায় মর্য্যাদা, দম্ভে সত্যনাশ হয়॥
বিপদে স্থৈর্য্যের নাশ, ব্যসনেতে ধন।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ॥

৭৮

ক্রূরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয়।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয়॥
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত॥

৭৯

বল বল কারে বল, নারীর যৌবন বল,
তোষামোদ পর প্রত্যাশীর।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুসঞ্চয় সামান্য ধনীর॥
ঠকেদের বাক্‌ছল, পণ্ডিতের বিদ্যা বল,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যতি-বল।
কুলের একতা বল, যথা বায়ে বিস্ত ফল,
শাস্ত্র-বল বিবেক কেবল॥

৮০

দলাদলী প্রিয়, হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী।
ধনহীন গৃহী, আর পরাধীন মানী॥
পরবশ সুখী, তথা সধন কৃপণ।
বৃদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্য্যটন॥
নৃপতি কুমন্ত্রীবশ, মূর্খ সুকুলীন।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন॥
সৎক্রিয়া বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে॥
কিবা আর হাস্যাস্পদ ইহাদের চেয়ে॥

৮১

উৎপাটিতে যিনি পুন করেন রোপণ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন॥
সুতরুণ তরুগণে পোষেন যতনে॥
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে॥
ছাড়াইয়া দেন যথা জড়াজড়ী হয়।
বাহির করেন ঘোর কণ্টকী নিচয়॥
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে ম্লান।
সেইখানে জলসেচ করেন প্রদান॥
প্রয়োগ নিপুণ হেন মালীর সমান।
সর্ব্বদা থাকুন সুখে রাজা কীর্ত্তিমান্॥

৮২

কুসুম স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান মনুষ্য নিকরে।
সর্ব্বলোক শিরোপরে, অপরূপ [illegible]র।
অথবা বিশীর্ণ হন কানন।

৮৩

অনল শীতল হয়, সলিল সম্পাতে।
ছত্রে ভানুকর, করী অঙ্কুশ আঘাতে॥
গো গর্দ্দভ বশীভূত লাঠীর প্রহারে।
ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে॥
সর্ব্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে॥

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা, পরগুণে প্রীতি।
পত্নী প্রতি রতি, আর অপযশে ভীতি॥
গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিদ্যায় ব্যসন॥

ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার।
সেই মুক্তি কপট সংসর্গ পরিহার ॥
যাঁহাদের আছে হেন চারু গুণগ্রাম।
তাঁহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম ॥

৮৫

রাজা ধর্ম্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ।
সত্যহীন দারা, জ্ঞানহীন যোগিগণ ॥
গতি হীন অশ্ব, জ্যোতি বিহীন ভূষণ।
ব্রতহীন তপ, বীরহীন যোদ্ধাগণ ॥
ছন্দোহীন গান, স্নেহ হীন সহোদর।
ঈশহীন নরে, ত্যজে শীঘ্র সুধিবর ॥

৮৬

ক্ষীণ ফল তরু ত্যজে বিহঙ্গনিকর।
সারস ত্যজিয়া যায় শুষ্ক সরোবর ॥
পর্য্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করে মধুকর।
কুরঙ্গ ছাড়িয়া যায় দগ্ধ বনান্তর ॥
[illegible]ধূ ত্যজে নর হইলে নির্ধন।
[illegible]ষ্ট ভূপালে পরিহরে মন্ত্রিগণ ॥
ফলত সংসারে কেহ কারু বশ নয়!
কার্য্যবশে সকলেই রমণীয় হয় ॥

৮৭

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন।
সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন ॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে।
বল্লভা বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে ॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা।
প্রিয়তমা প্রিয়ম্বদা সদা পরিণীতা ॥
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থকরী হয়।
এই ছয় গৃহস্থের সুখের নিলয় ॥

৮৯

সুত বলি তারে, যে জন পিতারে,
সুখ দেয় সুচরিতে।
সেই ত কামিনী, যে দিবা যামিনী,
চিন্তয়ে পতির হিতে ॥
মিত্র সেই হয়, সম ভাবে রয়,
সুসময় অসময়।
বহু পুণ্যফলে, এ জগতী তলে,
এই তিন লাভ হয় ॥

৯০

ভোগেতে রোগের ভয়, কুলে ভয় ক্ষয়।
মানে দৈন্য ভয়, আর বলে রিপু ভয় ॥
যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে।
নিরন্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥
শাস্ত্রে বাদীভয়, গুণে খলজনে ভয়।
শরীরের ভয় সদা যম মহাশয় ॥
এসংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয়।—
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয়।—

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা, কণ্টক মৃণালে।
যুবতী যৌবন ক্ষয়, সিতি কেশজালে ॥
জলধির জল লোণা, পণ্ডিত নির্ধন।
হা নির্বোধ বিধি! ধনলোভী বৃদ্ধ গণ ॥

৯২

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত যৌবন ললনা।
কমলকুসুমবর, বিহীন কমলাকর,
মুখে পর নিন্দার কলনা ॥
প্রভু ধন পরায়ণ, দীন দশা সর্ব্বক্ষণ,
প্রাপ্তহন যতেক সুজন।

নৃপতির সন্নিধান,　দুরন্ত খলের মান,
　এই সাত মনের বেদন ॥

৯৩

দীন যেইজন,　শতে আকুঞ্চন,
　শতীর হাজারে মন।
হাজারীর লক্ষ্য,　হয় এক লক্ষ,
　লক্ষেশের রাজ্য পণ ॥
রাজা যেই হয়,　তৃষা ক্ষুধা নয়,
　সম্রাট্ হইতে চায়।
সম্রাট্ যেজন,　চিন্তে অনুক্ষণ,
　ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥
সহস্র লোচন,　ভাবে মনে মন,
　ব্রহ্মত্ব মিলে আমারে।
বিধি গৌরীশ্বর,　হরি পদ হর,
　কে গিয়াছে আশাপারে ॥

৯৪

পাপ কর্ম্মে রত দেখি করে নিবারণ।
হিতকর কার্য্যে সদা করে নিয়োজন ॥
অতিশয় গুপ্তগুণ করয়ে প্রচার।
আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ॥
সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান।
সুমিত্র লক্ষণ এই কয় মতিমান্ ॥

৯৫

শুভাশুভ কর্ম্ম ফল কালেতে উদয়।
শরদেই আশু ধান্য, বসন্তে না হয় ॥

৯৬

নীচের সংসর্গে ধন্বী প্রভা হয় দূর।
তনু দহে লশুনাক্ত মাখিলে কর্পূর ॥

৯৭

স্বজাতি-সহায়ে সিদ্ধ কর্ম্ম সুদুষ্কর।
জল দিয়ে কর্ণজল বহিষ্কৃত কর ॥

৯৮

উপভোগে ভোগীদেরভোগেচ্ছা নাযায়।
যত নুণ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥

৯৯

স্বভাব-সুন্দরে কিবা কার্য্য সংশোধনে।
মুক্তারে না যুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥

১০০

ভুবন রঞ্জনকারী শীলতা যাঁহার।
অঙ্গেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥
বহ্নি হয় জল, জলনিধি হয় কূপ।
মৃগপতি মৃগ, মেরু শিলার স্বরূপ ॥
ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।
বিষরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি ॥

১০১

বিদ্যা বিভূষিত খলে পরিহার কর।
মণিমন্ত ভুজঙ্গ কি নহে ভয়ঙ্কর ॥

১০২

খল ক্রূর বটে, আর ক্রূর বিষধর।
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্রূরতর ॥
মন্ত্র আর ওষধিতে সর্প বশ হয়।
কোনরূপে ক্রূর খল নিবারিত নয় ॥

১০৩

অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল।
তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ॥
প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল।
কে কাহার ব্যাথায় ব্যথিত ভবে বল ॥

ইতি প্রথম অঞ্জলি।

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আরবীয়।

আসিয়া খণ্ডে আরব সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত জাতি বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে গণিতবিদ্যা, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দ শেষে খালিফা আল্ মানসুর এবং খালিফা হারুন্‌আল্ রাসিদের রাজত্ব সময়ে আরব দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যালোচনার সূত্রপাত হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দারম্ভে আল্ মামুনের অধিকার কালে আরবেরা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইবু জৌনিস লিখিয়াছেন যে আল মামুনের রাজত্ব কালে আরব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপমণ্ডল তির্য্যগ্‌ভাবে নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করে তাহা ২৩° ৩৩′, অথবা ২৩° ৩৩′ ৫২″ পরিমিত এবং যাম্যোত্তর বৃত্তের একাংশ পরিমিত গোলীভুজ ৫৬ বা ৫৬২/৩ মাইল [৫ অথবা ৬ যবে এক ইঞ্চি, ২৭ ইঞ্চি = ১ হাত, ৪০০০ হস্তে = ১ মাইল) নিরূপণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতাব্দে আরব দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

আরব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে আল বাটেগ্নিয়স অথবা আল বাটনী [খৃষ্টীয় নবম শতাব্দ] সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আল বাটানী সূর্য্যের দূরবিন্দুর গতি আবিষ্কার করেন, সৌর কেন্দ্রবিভিন্নতায় ভ্রম সংশোধন করেন, অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩°৩৫′ পরিমিত এবং বিষুবৎ ৬৬ বৎসরে একাংশ মাত্র পুরোগমন করে, নিরূপণ করেন। আলফ্রেগেন্স বা আলফারগানী (খৃঃ দশম শতাব্দে) একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচনা করেন। থাবেট বিন্ কোরা [খৃঃ দশম শতাব্দে] অপমণ্ডলের স্বস্থান পরিবর্ত্তন বিষয়ক মতের পুনরুদ্ভাবন করেন।

ইবন্ জুনিস্ (খৃঃ দশম শতাব্দে) এক খানি জ্যোতির্ব্বিবরণ রচনা করেন, এবং কোন স্থির জ্যোতিষ্কের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রহণারম্ভ ও মোক্ষকালের নির্ণয় করেন।

স্পেনীয় মুর আর সেচেল খ্রীষ্টীয় ১০৮০ অব্দে টলেমী প্রণীত তালিকা অবলম্বন করিয়া এক জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন।

আর সেচেলের সমসাময়িক আলহাজেন কিরণরশ্মির বক্রীভবন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন।

আবুল হাসেন খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতা-

দ্ধারন্তে সিজর জ্যোতিষ্কগণের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

গ্রীকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, যথা, শঙ্কু, বৃত্তপাদ, গোল, ইত্যাদি আরবেরাও সেই সমস্ত ব্যবহার করিতেন। অধিকন্তু আরবেরা (বোধ হয় ইবন জুনিস) কোন নক্ষত্র অথবা গ্রহের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সময় নিরূপণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

পারসিক।

আরব খালিফাদিগের ন্যায় তাতার সম্রাটেরাও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সম্যগালোচনা করিয়াছিলেন। জেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হুলাকু খাঁ পারস্য দেশে একটী পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহার রাজসিংহাসন আরোহণ কালাবধি যাবতীয় জ্যোতিষিক যন্ত্র নির্ম্মিত ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করেন। হুলাকুর রাজত্ব সময়ে প্রায় ১২৭১ খৃঃ অব্দেঃ,—নাসীর উদ্দীন জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে জর্জ ক্রীসোক্কাস নামক গ্রীক্ চিকিৎসক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে প্রণীত কতকগুলি পারস্য জ্যোতিষিক তালিকা অনুবাদ করেন। চিওনিয়াডেস এই সকল তালিকা পারস্য রাজ্য হইতে ইউরোপখণ্ডে আনয়ন করেন।

তৈমুরলঙ্গ বংশীয়েরাও জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন। তৈমুর সাহের পৌত্র উলুগবেগ আপন রাজধানী সমরকন্দ নগরে পর্য্যবেক্ষণীকা সংস্থাপন করেন; এবং গণিতবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ১৪৪৭ খৃ অব্দে (হিজরি ৮৪১ শকে) স্থির জ্যোতিষিক দিগের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার কিয়দংশ মাত্র ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

গ্রীক।

ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে গ্রীকেরাই প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করেন। গ্রীক্‌ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণেতা অটোলাইক্স সচল-গোলক এবং জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অটোলাইক্স খ্রীষ্টাব্দের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আরিস্তারকস্ শেমস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় ২৮০ বৎসর খৃঃ পূঃ সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি সূর্য্য এবং চন্দ্রের আয়তন এবং দূরতা পরিমাণ করিবার প্রথম উদ্যম করিয়াছিলেন। আরিস্তারকস্ খৃঃ পূঃ ৪২০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৭৬ অব্দে সাইরিণী নগরে ইরটস্থেনিসের জন্ম হয়। ইরাটস্থেনিস আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর আয়তন নিরূপণে উদ্যুক্ত হন। প্রবাদ আছে যে তিনি অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩°৫'২০" পরিমিত নির্ণয় করিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১৯৪ অব্দে ইরাটস্থেনিসের মৃত্যু হয়।

সিসিলি দ্বীপে সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিস অয়নবিন্দুদ্বয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সূর্য্যের ব্যাস পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২১২ খৃঃ পূঃ রোমান সেনাপতি মার্সেলসের জনৈক সৈনিক কর্ত্তৃক আর্কিমিডিস নিহত হন।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর পর হিপার্কস খৃঃ পূঃ ২০০-১২৫ জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক আলোচনা করেন। হিপার্কস বিথিনিয়ার অন্তর্গত নাইসি নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিপার্কস বিষুববিন্দুদ্বয়ের পুরোগমন আবিষ্কার করেন, এবং স্থান-সন্নিবেশ নিরূপণার্থ প্রথমতঃ সরল উত্থান এবং ক্রান্তি এবং তৎপরে অক্ষ এবং দ্রাঘিমা ব্যবহার করেন। তিনি সূর্য্য এবং ইহার দূরবিন্দুর গড়-গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন। হিপার্কস গ্রহণ গণনা করিতে পারিতেন এবং সূর্য্য বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। হিপার্কস কর্ত্তৃক সৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১২ সেকেণ্ড নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব তারকা দর্শন করিয়া তিনি নক্ষত্রগণের সংখ্যানির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তদভিপ্রায়ে ১০৮১ নক্ষত্রের অক্ষ এবং দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন।

মিশরীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা সোসিজেনিস্ খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে রোমাধিপতি জুলিয়স্ সিজরকে পঞ্জিকা-গত ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেন।

লুসিয়স্ মানলিয়স্ সিনেকা স্পেন দেশে কর্দোবা নগরে খৃঃ পূঃ ৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সিনেকা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রচনা করেন; এবং ধূমকেতুগণের নৈসর্গিকভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার গ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬৫ অব্দে সিনেকার মৃত্যু হয়।

ক্লডিয়স টলেমি খৃঃ প্রথম শতাব্দে মিসর দেশে পিলুসিয়স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গণিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলিফা হারুন আলরাসিদের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবেরা ইহাকে "আল মেজেষ্ট" কহে। এই গ্রন্থে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক যে সমস্ত মত উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদায় যে টলেমি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এমত নহে। টলেমি যে মতের পোষকতা করেন তাহার মর্ম্ম এই। পৃথিবী অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রীভূত; এবং গ্রহগণ বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মত প্রমাদপূর্ণ হইলেও কোপর্ণিকসের সময় পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

টলেমি চন্দ্রোন্নতি এবং আলোকরশ্মির বক্রীভবন আবিষ্কার করেন, ও আকাশ-

কক্ষার নিকটবর্ত্তী সূর্য্য অথবা চন্দ্র মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান বৃহদাকারের কারণ নির্দ্দেশ করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে গ্রহগণ এক এক অতি বৃহৎ স্বচ্ছ গোলাকার বস্তু, এবং তন্মধ্যে এক এক তারকা সন্নিবেশিত আছে। এই মতের সমর্থন জন্যই নিচোচ্চ-বৃত্ত * প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। টলেমি সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ব্যতীত ভূগোল, সঙ্গীত এবং ফলিত জ্যোতিষেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

টলেমি প্রণীত "আলমাজেষ্ট" নামক জ্যোতিষিক গ্রন্থ খৃঃ ১২৩০ অব্দে দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের রাজত্ব সময়ে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরব জাতিদ্বারা আলিক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরী ধ্বংস হওয়াতে গ্রীক্ জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা এক প্রকার শেষ হইয়াছিল।

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৫ম অধ্যায় ৪১ শ্লোক।

এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধীয়। লেখক এতদংশ সুপাঠ্য করিতে পারেন নাই—এজন্য তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। বং সং

কৃষ্ণকান্তের উইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, যে সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ আমি, বহু সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, "কৃষ্ণকান্তের উইল" ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম—এমত সময়ে তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এসব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসিয়া যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্যবাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত আপিসের ভগ্নপ্রাচীরের কাছে হইতে ডাকিলে, "কুহুঃ"—বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহ সন্তপ্তা

সুন্দরী, প্রায় সমস্তদিনের পর অর্থাৎ বেলা নয়টার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটীটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—কুহুঃ—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটী অমনি রহিল—হয় ত, তাহাতে অন্য মনে লুণ মাখিয়া খাইলেম। যাই হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে—নহিলে, যখন তুমি বকুলগাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা তা বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সম্বাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী নামে দেবতা, এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ যাহার অনেক গুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণ বধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনী গদা হস্তে গৃহ রণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন—কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; কেহ কুম্ভকর্ণ রূপিণী, ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন—কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ বালাই ছিল না—সুতরাং জল আনা বাসন মাজা টা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়া ছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যেদিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে, রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কাল ভুজঙ্গিনী তুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ, ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদুং মাটীতে পড়িতেছিল—অমনি সে

রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া ছুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী, সরোবর পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমত সময়ে, নিম্বের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ কুহু! রোহিণী চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোলকটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকা টা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলা বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এসংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতলসুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণ গুণে, শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে, গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহু রবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ দাম, চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পক রাজি নির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষা-

ধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল "কু উঃ" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া, কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয় ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাঁচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেম খানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানা বর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক২ খানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এসকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন, যে রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনে২ সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ার কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল, যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে

আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না? কোন দোষে আমাকে এরূপ, যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী— মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী— তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূরহৌক —পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই— কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা আমরা ত বলিয়াছি,রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, এটুকুতে কত হিংসা! রোহিণী লোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথা বার্ত্তা কহিয়াছিল। রোহিণীর অনেক দোষ--তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ, কণ্টকক্ষেত্রে দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে— শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল— শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এখন, রোহিণী বড় ব্যাপিকা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতি টা অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে২ আসিয়া যোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, যে এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ— অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে২ সোপানাবলি অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পক নির্ম্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই

চম্পকালোক চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন,

"রোহিণি! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?"

রোহিণি উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন,

"তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে অতি ঘৃণাযোগ্য ব্যাপিকার ন্যায় অনর্গল কথোপকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত জঘন্য শ্লোক আবৃত্ত করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবর জলে সেই ভাস্করকীর্ত্তি কল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন,

"তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল, বলিল, "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

কি কথা রোহিণি? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন বক্‌-বক্‌-গল্‌-গল্‌—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎকলসী কি মনুষ্য কলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃ শূন্য কলসী পূর্ণতোয় হইলে, রোহিণী ঘাটে উঠিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্‌! ঝিনিক্‌ ঠিনিকি ঠিন্‌! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—

রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা কাজটা!

জল বলিল—ছলাৎ!

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল ঠিন্‌ ঠিনা—না। তাত না—

রোহিণীর মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢণ্—উপায় আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রোহিণী সকাল২ পাককার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া, আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্ব্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল,—"এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে?"

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে? টাকায় কত উপকার!

সু। তা, গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না?

(N. B—এই কথা টা সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দ লাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে, টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরম-পদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এত দিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল—হাজার টাকা কত-দিন যাইবে? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে "এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আর আমার দেরাজে আর এক খানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল," তখন আমি কি বলিব? কি মজার কথা! কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কৃ। সেই কথা, কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাক—আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তারপর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে—যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে।

কৃ। তবে চুপ করিয়া থাক—যা হইয়াছে তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল। তারপর দুই জনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে, আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক প্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্ম্মিত দেব মূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানসচক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।

চৈতন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিবাহ।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ-বিয়োগ-বিধুরা জননীকে নানারূপ সান্ত্বনা করিয়া চৈতন্য যথাবিহিত পত্নীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি চৈতন্যের জীবনচরিত লেখকগণ কেহ একথার উল্লেখ করেন না। কারণ (কুশ হস্তে করা অথবা পিণ্ডদান করা বৈষ্ণবদিগের যারপর নাই মতবিরুদ্ধ। অদ্যাবধি অস্মদ্দেশীয় অনেক বৈষ্ণব নিতান্ত সমাজের অনুরোধে আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াও পারতপক্ষে আদ্যশ্রাদ্ধের নিয়মগুণাদি রক্ষা করিতে যায় না।) তথাপি চৈতন্য বনিতার যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ;*

(১) তৎকাল পর্য্যন্ত চৈতন্য কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করেন নাই। এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি যাজ্ঞিক ক্রিয়ায় † যারপরনাই পক্ষ-

* এই সকল প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত হইতে সংগৃহীত।

† ছাত্রগণের মধ্যে যদি কেহ কোন দিন সন্ধ্যাদি না করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমন

পাত্রী ছিলেন। বোধ হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ আপনাদিগের ভবিষ্যৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ এতাবৎ ভ্রমেও মনে করেন নাই। একাদশ ভাগবতের মতে ‡ বৈষ্ণব তিন ভাগে বিভক্ত—উত্তম মধ্যম ও অধম। উত্তম অর্থাৎ নিরাশ্রম সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, মধ্যম অর্থাৎ গৃহী সাধু বৈষ্ণব, অধম অর্থাৎ প্রকৃত সংসারী, কপটাচারী —বিষ্ণুভক্ত। রামানুজ স্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নিরাশ্রম বৈষ্ণব ও গৃহী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এতাবৎ গৃহী বৈষ্ণবই ছিলেন।

(২) চৈতন্যের মাতা তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে ষষ্ঠী পূজাদি সমুদায় করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যও যথা বিহিত বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৩) চৈতন্য পত্নীর শ্রাদ্ধ না করিলে, অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন না।

পত্নীর শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইলে, চৈতন্য প্রতিদিন মুকুন্দ সঞ্জয়ের মণ্ডপে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এদিকে শচী পুত্রের বিবাহের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া কন্যা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; একদা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীসনাতন রাজ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশধর ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর রূপ লাবণ্য ও বালিকোচিত অবলতা দেখিয়া যার পর নাই মুগ্ধ হইলেন, এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক জ্ঞাতিকে আহ্বান করিয়া সনাতন রাজের নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চৈতন্যের ১ম পত্নীবিয়োগ হওয়া অবধি, সনাতন চৈতন্যকেই তদীয় কন্যা সমর্পণ করিতে মানস করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিনা যত্নে রত্ন লাভ হইবে জানিতে পারিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। মহা সমারোহে চৈতন্য ও সনাতনরাজের কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল। এই ক্রিয়া যথা শাস্ত্র নির্ব্বাহ হইয়াছিল।*

চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্নীর নামই লক্ষ্মী। চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে উভয় গ্রন্থেই ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। তথাপি লোকে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম কিজন্য বিষ্ণুপ্রিয়া † বলিয়া থাকে। অমাদিগের বিবেচনায় ইহার দ্বিবিধ উত্তর হইতে পারে।

করিত, তাহাকে চৈতন্য যারপর নাই তিরস্কার করিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাটী যাইয়া নিত্য কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেন।

‡ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ (যাগতত্ত্ব)

* চৈতন্য ভাগবত দেখ।

† যুবতী ভার্য্যা রাখিয়া পুত্র পরলোকগত হইলে জনক জননী "বিষ্ণুপ্রিয়া রহিল ঘরে" এই বলিয়া খেদ উক্তি করেন। এরূপ উক্তি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

(১) ১ম হইতে দ্বিতীয় পত্নীর পার্থক্য রাখার জন্য বৈষ্ণবগণ প্রথম পত্নীকে আর্য্যা বিবেচনা করিয়া তাঁহার নাম পরিবর্ত্ত না করিয়া দ্বিতীয়ার নাম পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার সুতরাং বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া রাখা অসম্ভব নয় বোধ হয়।

(২) কথিত আছে সনাতন রাজ "বিষ্ণুপ্রীতি কামে" কন্যাদান করিয়াছিলেন। ইহাকেই বৈষ্ণবগণ নিষ্কাম দান বলিয়া থাকেন। চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ সমধিক কর্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল সুতরাং, হয়ত, তাৎকালিক কোন লোকই স্বর্গ কামনা প্রভৃতি কামনাবিরহিত হইয়া কন্যাদান করিতেন না। পক্ষান্তরে সনাতনরাজ স্বীয় কন্যা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুপ্রীতি কামে দান করিলেন, এইজন্য লক্ষ্মীর নামান্তর বিষ্ণুপ্রিয়া ‡ হইল।

সে যাহাই হউক চৈতন্যের দ্বিতীয় ভার্য্যার প্রকৃত নাম লক্ষ্মী, কিন্তু বঙ্গদেশের সকলেই তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়াই বলিব।

চৈতন্য এতাবৎ সংসার ত্যাগের অনুমাত্র চিন্তা করিয়াছিলেন না। হায়! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য কি অন্ধ। চৈতন্য যদি একদিন ভ্রমেও মনে করিতেন যে চারিবৎসর পরেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিবেন তাহা হইলে কি তিনি একজন অবলাকে অনাথা করিতেন।

চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কয়েক দিবস মাত্র গৃহে অবস্থান করিলেন এবং মাতৃ অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের ঋণ শোধনার্থ সশিষ্যে গয়াধামে † যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস গয়াধামে অবস্থান করিয়া যথাশাস্ত্র গয়াতীর্থের সমুদয় কার্য্যাদি সমাপ্ত করিলেন।

একদা চৈতন্য গদাধরের মন্দিরে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বপরিচিত বৈষ্ণবচূড়ামনি ঈশ্বর পুরীকে দেখিলেন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন। উভয়ে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। অধুনা চৈতন্যের ধর্ম্মবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল। ঈশ্বরপুরীর ন্যায় ভাগবত শ্রেষ্ঠ সন্দর্শনে তাহাতে যেন নবীন আহুতি পড়িল। চৈতন্য পুরীবরের সহিত আপন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন—

হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে॥

‡ বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রীতিকামনাতে দত্তা হইয়াছে যে।

† অদ্যাবধি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। গয়াতে পিণ্ড দান না করিলে কোন হিন্দুসন্তানই আপনাকে পিতৃঋণ মুক্ত বিবেচনা করেন না।

চৈতন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইলেন এবং কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দারণ্য ও মথুরা দর্শন করিতে লালায়িত হইলেন। চৈতন্যের পারিষদ্‌গণ অনেকরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে এ যাত্রা বৃন্দাবনযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। পারিষদ্‌গণ ভাবিয়াছিলেন, হয় ত, চৈতন্য বৃন্দাবন গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিবেন না।

ধাত্রীশিক্ষা।*

এই জন্ম সুখের কি দুঃখের বলিতে পারি না, ধর্ম্মোপদেশক এবং নীতিবেত্তৃগণ তাহা নিরূপণ করিবেন, কিন্তু জন্মগ্রহণ করা অতি সুকঠিন। বিধাতার সৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ, এবং লোকে যেমন কুশলময় বলে, তেমন কুশলময় নহে, এই কথার উদাহরণপ্রয়োগস্থানে মিল, জীবের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় দুঃখের বিশেষ করিয়া উল্লেখ উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, জঠরযন্ত্রণা। যে জঠরস্থিত তাহার কত যন্ত্রণা তাহা সবিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু গর্ভিণীর যন্ত্রণার শেষ নাই। যত দিন না সন্তান প্রসূত হয়, তত দিন নিত্য পীড়া, নিত্য বিপদ। যদি কোন ক্রমে নিয়মিত কাল অতীত হইল, তবে প্রসবের দিন উপস্থিত।

যদি সুপ্রসব ঘটিল, তবে হয় ত পীড়ার ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। নিত্য পীড়া, নিত্য প্রাণ সংশয়। যাঁহারা সামাজিক জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখেন তাঁহারা জানেন, যে যত মনুষ্য, মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হওয়ার অল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, এত আর অন্য কোন বয়সে করে না।

এই সকল অমঙ্গলের কোন প্রতীকার হইতে পারে না? পারে। এমন কিছুই নৈসর্গিক অমঙ্গল নাই, যে নৈসর্গিক নিয়ম সকলের আলোচনা করিলে নিতান্তপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে তাহার প্রতীকার হয় না। এ বিষয়েও নৈসর্গিক নিয়ম সকল অবগত হইলে পীড়া ও মৃত্যুর লাঘব করা যায়। এবং ইউরোপে এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম উত্তমরূপে অধীত হওয়ায় প্রসূতী এবং সুতের একটি উত্তম সুচিকিৎসা প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে। তৎসাহায্যে বহুতর প্রাণীর জীবন রক্ষা এবং পীড়ার নিবারণ অথবা উপশম ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু যে জ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, তাহা কেবল চিকিৎসকের অধি-

* ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসূতি-শিক্ষা। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া। ১৮৭৫।

কারে গুহানিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিলে সংসারের মঙ্গল সুনির্ব্বাহ পায় না। প্রায় রমণী মাত্রকেই গর্ভ ধারণ করিতে হয়; প্রায় গৃহ মাত্রেই প্রসূতী এবং সূত। গৃহমাত্রই চিকিৎসকের অধিকৃত নহে। বিশেষ, যে চিকিৎসা একদিনের জন্য নহে, যাহা গর্ভাধান কাল হইতে শিশুর শৈশবাতিক্রম পর্য্যন্ত অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দুর্লভ, অবসর বিহীন, এবং বেতনভোগী চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিলে চলে না। বিশেষ অনেক সময়ে, অকস্মাৎ এমত সঙ্কট উপস্থিত হয় যে চিকিৎসক ডাকিবার সময় থাকে না। আর এতদ্দেশে চিকিৎসক পুরুষ জাতি, চিকিৎসনীয়া, লজ্জাশীলা স্ত্রীজাতি; চিকিৎসার প্রয়োজনও লজ্জাবিধ্বংসকর। অতএব প্রতি গৃহে গৃহে, গৃহী ও গৃহিণীগণ এ চিকিৎসা অবগত না থাকিলে মনুষ্যগণের মঙ্গল নাই। যিনি গৃহে গৃহে গৃহস্থগণের এই চিকিৎসা শিখিবার উপায় বিধান করিবেন, তিনি পরম লোকহিতকারী বলিয়া খ্যাত হইবেন সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশে ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই লোকহিতকর ব্রত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "ধাত্রীশিক্ষা ও প্রসূতী শিক্ষা" গ্রন্থে, গর্ভিণীর শুশ্রূষা হইতে এ চিকিৎসার সমুদায় তত্ত্ব, অতি পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদুবাবু যে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, শিক্ষিতা হউক অশিক্ষিতা হউক স্ত্রীলোক মাত্রেই বিনাগুরূপদেশে এই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকল শিখিতে পারেন। যে ভাষায় স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, সেই ভাষাতেই দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথনচ্ছলে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কথাই নাই যে সামান্যা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারে না। দুরূহ চিকিৎসা তত্ত্ব এইরূপ পরিষ্কার করিয়া যিনি বুঝাইতে পারেন, তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় অসামান্য দক্ষতাসম্পন্ন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত সুচিকিৎসক। তিনি এ সকল বিষয়ে যে বিধান দিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রাহ্য।

গর্ভে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য তদ্ব্যতিক্রমে অনেক শিশুর শরীর দুর্ব্বল এবং অস্বাস্থ্যপ্রবল হইয়া থাকে। ধাত্রীশিক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে এই একটি মহৎ অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। এমন কি একজন ভদ্র লোকের সন্তান হইয়া অল্প কাল মধ্যেই বিনষ্ট হইত। পরিশেষে তিনি যদুবাবুর ধাত্রী-শিক্ষা পুস্তক ক্রয় করিয়া, তাহার নিয়মগুলি প্রসূতী ও সন্তানগণের দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন। সেই অবধি তাঁহার সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে লাগিল। ইহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যে গ্রন্থের এরূপ

অপরিমেয় শুভ ফল, তাহা যে কেন বাঙ্গালির গৃহে গৃহে থাকে না, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই। যদি শুভদিন দেখিবার জন্য, পঞ্জিকা গৃহে গৃহে রাখিবার প্রয়োজন আছে, তবে জীবনের শুভবিষয়ক এই গ্রন্থও গৃহে২ রাখিবার আবশ্যকতা আছে।

এই স্থলে আমরা সুবিখ্যাত ডাক্তার চার্লস যত্নবাবুকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

"It gives me much pleasure to be able to inform you that after having had the work critically examined, and selected passages either read to me, or translated for me, I have formed a high opinion of its merits. I consider that the subjects you have taken up are very judicious and your treatment of them most careful. I am convinced that an extensive circulation of the book through the Bengalee districts in the Lower Provinces would do that amount of good which is possible as long as the management of women in labor is entrusted to untrained women who can neither read nor write."

কালিদাসের উপমা।

"উপমা কালিদাসস্য"—পৃথিবী বিখ্যাত। যেমন হোমরের যুদ্ধ, যেমন ক্লোদ লোরানের দৃশ্যচিত্র, যেমন পিত্রার্কার চতুর্দ্দশপদী,—তেমনি—ততোধিক—বিখ্যাত, কালিদাসের উপমা। যেমন বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, এবং মন্মথের কুসুমশর—তেমনি কালিদাসের উপমা—অব্যর্থসন্ধান। পৃথিবীতে এমন উপমা-পটু কবি, আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠককে, সেই উপমাকুসুমের একছড়া ক্ষুদ্র হার গাঁথিয়া অদ্য উপহার প্রদান করিব।

প্রথমে উপমার প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। আমাদিগের বিবেচনায় উপমা দ্বিবিধ।

প্রথম, সামান্য উপমা। কতকগুলি উপমাতে,কেবল একটি মাত্র বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর সাদৃশ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা চন্দ্রতুল্য মুখ। ইহার নাম সামান্য উপমা দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটি বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পারে। মেঘ যেমন বারি ব্যয় করে, রাজা দশরথ

সেইরূপ ধনব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট—দশরথ ধনের ব্যয়কারী, ধন দশরথকর্ত্তৃক ব্যয়িত। অন্যদিকে, মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট—মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্ত্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ, এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কথিত সম্বন্ধবশতঃই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে, সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধবিশিষ্টের তুলনা আনুষঙ্গিক মাত্র।

এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে; এবং কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্য্য। কালিদাস এরূপ উপমাপটু, যে অনেক স্থানে প্রায় প্রতি শ্লোকেই এক একটি উৎকৃষ্ট যুক্ত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এবিষয়ে রঘুবংশের প্রথম সর্গ বিখ্যাত। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥
ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু রিব বামনঃ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

ভেলায় সাগর পার, এবং "বামন হইয়া চাঁদে হাত" এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে, কালিদাসের সময়ে তাঁহার উপমা অভিনব ছিল কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় ছিল, কেন না কালিদাসের ন্যায় উপমা-পটু কবি রাধু মাধুর ন্যায় চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ কালিদাসের অনেকগুলি উপমা এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উৎকৃষ্ট উপমা একটি ইহার দৃষ্টান্তস্থল—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যাশ্চাভিগমাশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

সেই রাজা ভয়ানক অথচ কমনীয় রাজগুণসমূহ দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে নক্রচক্রসঙ্কুল অথচ রত্নরাজি পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অনভিভবনীয় এবং আশ্রয়ণীয় ছিলেন।

আর একটি,

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্র গুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

আর একটি,

দ্বেষ্যোপি সম্মতঃশিষ্ট স্তস্যার্ত্তস্য যথৌষধম্।
ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা॥

তিনি প্রজাদিগের উন্নতি নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিতেন।

সূর্য্য সহস্রগুণ দান করিবার নিমিত্তই পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করিয়া থাকেন।

রোগীর ঔষধের ন্যায়, শিষ্ট ব্যক্তি শত্রু হইলেও তাঁহার গ্রহণীয়; কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি প্রিয় হইলেও সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় তাঁহার ত্যাজ্য ছিল।

বশিষ্ঠাশ্রম গমন সময়ে এক রথারূঢ় রাজদম্পতী—

স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ মেকং স্যন্দন-
মাস্থিতৌ
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।

শ্রুতি সুখাবহ অথচ গম্ভীর শব্দশালী এক রথারূঢ় সেই দম্পতী, বর্ষাকালীন বারিধরাশ্রিত বিদ্যুৎও ঐরাবতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে

রাজোক্তি শ্রবণে বশিষ্ঠের সচিন্তাবস্থা—

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্তিমিত-
লোচনঃ।
ক্ষণমাত্র মৃষিস্তস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ॥

ঋষি, রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, ধ্যানে স্থিরনেত্র হইয়া কিছুকাল মীনাহতিরহিত হ্রদের ন্যায় অবস্থিত হইলেন।

কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে অসুর পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

তেষামাবিরভূদ্‌ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াং।
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দ্দীধিতিমানিব॥

তারকাসুরোৎপীড়নে ম্লানমুখকান্তি সেই দেবতাদিগের সম্মুখে, মুদিতপদ্ম-সরোবর সম্বন্ধে বাল সূর্য্যের ন্যায় বিধাতা আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা দেবগণের তেজোহানি দেখিয়া, বরুণকে বলিতেছেন।

কিঞ্চায় মরিদুর্ব্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ
মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্য-
মাশ্রিতঃ॥

শত্রুদুর্ব্বার বরুণের হস্তস্থিত এই পাশাস্ত্র মন্ত্ররুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় শোচনীয়াবস্থ কি জন্য?

আমরা অন্যস্থান হইতে অধিক উপমা সঙ্কলন না করিয়া, কুমারের তৃতীয় সর্গ হইতে কিছু গ্রহণ করিব। কাব্যাংশে কুমারের তৃতীয় সর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট রচনা, সাহিত্যসংসারে বড় দুর্লভ। এই সর্গে মদন কর্ত্তৃক শিবের ধ্যানভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের উত্তেজনায় মন্মথ, রতিসহায় হইয়া, বসন্ত সমেত সেই মহাসংযমী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। উমাও তথায় গেলেন। তপঃ-পরায়ণ মহাদেবের বর্ণনা কবিত্বের এক শেষ। তাহা হইতে একটি উপমা চয়ন করিব।

অবৃষ্টিসংরম্ভ মিবাম্বুবাহং
অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গং।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং॥

অন্তর্গত বায়ু (প্রাণাদির) নিরোধ হেতু বর্ষণহীন মেঘের ন্যায়, তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায়, বায়ুভাবে নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবাপন্ন।

উমার বর্ণনা কালে—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্
বাসো বসানা তরুণার্করাগং।
পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

স্তনভরে শরীর যেন ঈষৎ নত হইয়াছে। বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। যেন পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে নম্র ও নবপল্লবশালিনী লতা বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে।

বসন্ত এবং মদনের কার্য্যে, তপস্বী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন,

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।

চন্দ্রোদয়ে জলনিধির ন্যায় মহাদেবও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

পরে রতিবিলাপ—

ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য্য
ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জল সংঘাত
ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥

ভগ্নসেতুবন্ধ জলরাশি যেমন জলাধীন জীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্রূপ ত্বদধীনজীবিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভগ্নপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে।

কামসখ বসন্ত দর্শনে—

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপইবানিলাহতঃ।
অহমস্যদশেব পশ্য মা
মবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাং ॥

তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

পরে অনুকূল আকাশবাণী হইল।

ইতি দেহ বিমুক্তয়ে স্থিতাং
রতিমাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং
প্রথমা বৃষ্টি রিবানুকম্পয়ৎ ॥

সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্না শফরীকে প্রথম বৃষ্টি যেমন অনুকম্পা প্রদর্শন করে, সেইরূপ দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় আকাশবাণী রতিকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিল।

পরে ক্ষুণ্ণমনে উমা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তপশ্চারণে অভিলাষিণী হইলেন। তখন জননী মেনকা তাঁহাকে বিরত করিতেছেন।

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা
স্তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং নপুনঃ পতত্রিণঃ ॥

হে বৎসে! মনোঽভীষ্ট দেবতা গৃহেতেই আছেন। তুমি তাঁহাদিগের আরাধনে প্রবৃত্ত হও। কষ্টসাধ্য তপস্যা কোথায় আর তোমার সুকোমল শরীরই বা কোথায়। কোমল শিরীষ কুসুম ভ্রমরের পদভর সহ্য করিতে পারে কিন্তু অন্য পক্ষীর নহে

এখন মেঘদূত হইতে কয়েকটি উপমা সঙ্কলন করিব।

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং॥

আমি প্রিয়ার সদাই সহচর ছিলাম। কিন্তু দৈবনিগ্রহে এক্ষণে দূরবর্ত্তী। সুতরাং সহচর চক্রবাক্ বিরহিত একাকিনী চক্রবাকী তুল্যা সেই মিতভাষিণীকে আমার দ্বিতীয় জীবিততুল্য জানিবে। আমি অনুমান করিতেছি প্রবল উৎকণ্ঠান্বিতা সেই সুকোমলাঙ্গী বিরহমহৎ এই সকল দিবস অতিক্রান্ত হইতে হইতেই হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর ন্যায় পূর্ব্বাকারের বিপরীতাকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠং।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তে র্বিভর্ত্তি॥

হে মেঘ! প্রবল রোদন হেতু উচ্ছ্বসিত নেত্র, উষ্ণ নিশ্বাসবশতঃ বিবর্ণ অধরোষ্ঠ, সংস্কারাভাবে লম্বমান কুন্তল হেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং করতল বিন্যস্ত প্রিয়ার বদনটী তোমারই অবরোধে ম্লানকান্তি চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছে।

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।

হে মেঘ! মানসিক যন্ত্রণায় কৃশাঙ্গী, বিরহশয্যায় একপার্শ্বশায়িনী, সেই প্রিয়াকে পূর্ব্বদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের মূর্ত্তির ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় দেখিবে।

পাদানিন্দোরমৃত শিশিরান্ জালমার্গ প্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং নপ্রবুদ্ধাং নসুপ্তাং॥

পূর্ব্ববৎ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট, শীতল চন্দ্ররশ্মির প্রতি নিয়মিত কিন্তু অসহ্য বোধে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত চক্ষু, জলভরগুরু পক্ষ্মদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অবিকসিত অমুদিত স্থলনলিনীর অবস্থা প্রাপ্ত তাঁহাকে দেখিবে।

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্মৃত ভ্রূবিলাসং।
ত্বয্যাসন্নে নয়ন মুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাকুলকুবলয় শ্রীতুলা মেষ্যতীতি॥

অবিন্যস্ত দীর্ঘালক বশতঃ অপাঙ্গ প্রসরবিহীন, স্নিগ্ধাঞ্জন রহিত, মধুপানাভাবে ভ্রূবিলাসবর্জ্জিত মৃগনয়নীর বামনয়টী তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে উপরিভাগে স্পন্দিত হইয়া মীনচলন বশতঃ চঞ্চলকমলশোভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে।

ক্রমশঃ

ভারতমহিলা।*

প্রথম অধ্যায়।

[প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। আর্য্য পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে উন্নতি লাভ করে। ভারতবর্ষীয়দিগের দর্শনশাস্ত্র ইয়ুরোপীয় দর্শন শাস্ত্র হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইয়ুরোপীয়েরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন তাহার অনেক তত্ত্ব প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিত দিগের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় গভীর চিন্তার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন, ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি।]

আর্য্য পণ্ডিতেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। তাঁহাদিগের সাহিত্য,রত্নাকর বিশেষ। উহাতে যে রত্ন চাও তাহাই মিলিবে। কি নৈসর্গিক সামগ্রী, নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর, কি শিল্প সামগ্রী, প্রাসাদ, বাপী, উপবন, ক্রীড়াশৈল; কি আন্তরিক গভীরভাব হৃদয় বিদারকশোকপ্রবাহ,কি আনন্দনিস্যন্দিনী প্রণয় বর্ণনা, সকল বিষয়েই আর্য্যকবিগণ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

[কবিত্বশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব।]

কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে তাঁহারা যদি কোন জঘন্য বা ভয়ানক বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি হয়। শ্মশান অতি ভয়ানক পদার্থ; কিন্তু ভবভূতি সেই শ্মশান বর্ণনা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, যাহা লোকে ভাল বাসে এমন কোন বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন,তাঁহারা যে আরো অধিক প্রীতি উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের একটি অমূল্য রত্ন। নারীগণ সেই প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারীচরিত্র বর্ণনা

* এই প্রবন্ধ মহারাজ শ্রীযুক্ত হূলকার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

করিয়া মানবমণ্ডলীর আনন্দ সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন।

[আর্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্র।]

আমাদিগের আর্য্যকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তি বলে যে নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিধিনির্ম্মিত রমণীগণাপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর রমণীয় পদার্থ। তাঁহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহার চরিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, কাহার ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিলে আত্মার বৈশদ্য সম্পাদন হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিকল্পনা-সম্ভূত-রমণীগণের মধ্যে কোন্ গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে হইবে।

[কল্পনাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ।]

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন তিনটি কারণ বশতঃ তাঁহাদের কল্পনা শক্তির সর্ব্বতোমুখী তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে না। ১ম। কবিরা সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন। ২য়। তাঁহারা যে দেশের জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন সেই দেশের লোকের যাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের সচেষ্ট থাকিতে হয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশক্তিকে সম্যক্ প্রকাশিত হইতে দেয় না। কবিদিগের নিজ স্বভাবও সময়ে সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই তিনটীর মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব সময়ে২ প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেও পারে। মিল্টনের মহাকাব্য যে সময়ে লিখিত হয় সে সময়ে জাতীয় স্বভাব অতি জঘন্য ছিল। কিন্তু মিল্টন ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এসময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্তু জাতীয় স্বভাব ভাল হইলে অবশ্যই ইহার আদর হইবে।

[সর্ব্বোৎকৃষ্ট নারীচরিত্র বর্ণনা দুরূহ।]

কবিকল্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনির্ম্মিত রমণীচরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্ব্বোক্ত তিনটী কারণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয় সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র Highest Ideal চিত্রিত করা তাঁহাদিগের পক্ষেও দুরূহ।

[সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, নির্ণয় করা যায়।]

যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কারণত্রয়কে পরিহার করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তি বলে কোন অনন্য সাধারণ গুণসম্পন্না কামিনীর চরিত্র বর্ণনা করেন তবে সেই রমণীই নারীকুলের প্রধান রত্ন হইবে। তাহার চরিত্রই রমণীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal হইবে। তাহার সহিত তুলনায়, কবিকল্পিত রমণীগণ অনেকাংশে ন্যূন হইবে। কোন

কবিই,এপর্য্যন্ত তাদৃশ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন কবিই এপর্য্যন্ত সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে সম্যক্‌রূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যদিও এরূপ রমণীসৃষ্টি করা একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাদৃশ রমণীর কোন২ গুণ থাকা আবশ্যক অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়া উচিত কোন্ কোন বৃত্তি নিস্তেজ হওয়া উচিত তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায়।

[মনুষ্যের মনোবৃত্তি বিভাগ।]

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মনুষ্যের মানসিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ২য় স্নেহ প্রবৃত্তি ৩য় কর্ম্মনিষ্ঠতা।* যে শক্তিদ্বারা গণিত ও পদার্থ বিদ্যার সমুন্নতি করা হয়, যে শক্তিদ্বারা আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহাদ্বারা রাজমন্ত্রীরা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যব্যূহ রচনা করেন, দার্শনিকেরা কূটার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা আমরা সামাজিক লোকের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলিতে পারি, যাহাদ্বারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, পুত্রাদিকে স্নেহ করিতে, দুরবস্থকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভাল বাসিতে শিখি তাহার নাম স্নেহ প্রবৃত্তি। স্নেহ প্রবৃত্তি সুখ ও দুঃখের কারণ। মনুষ্যের যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে সে সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত। কর্ম্মক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির অপর নাম। শুদ্ধ মানসিক ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। যে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, যাহা দ্বারা লোকে অপার সমুদ্র পার হইয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া,জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, ঈপ্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় সেই যথার্থ কর্ম্মক্ষমতা।

এই তিনিটী প্রবৃত্তিই মনুষ্যস্বভাবের নিরন্তর সমভিব্যাহারী। অতি মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হটেণ্টট দিগেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। নরমাংসলোলুপ আণ্ডামান বাসীদিগেরও স্নেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রায়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কাফ্রি দিগেরও কর্ম্মক্ষমতা আছে। তবে পরিমাণগত ইতর বিশেষ মাত্র। আমরা ঈশ্বর ভিন্ন আর কুত্রাপি এই বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ও প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (Perfection) কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ মনুষ্যকল্পনা করিতে পারি যাহার সকল কয়টীই সতেজ এবং একটী, মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[কাব্যলিখিত পুরুষচরিত্রের প্রকর্ষপর্য্যন্ত।]

যখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি তখন আমরা তাঁহাকে

* Intellectual Emotional and Active powers.

যতদূর পারি কর্ম্মক্ষম করি তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী করি। তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি যদি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য সেই তেজস্বিনী স্নেহপ্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন তবেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলেন দাতা কর্ণ পুত্রকেও বধ করিলেন তিনজই স্নেহপ্রবৃত্তিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারে বলি দিলেন। এবং তিনজনই জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইলেন।

[তাদৃশ নারী চরিত্র।]

কিন্তু যখন আমরা ঐরূপ নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে বসি তখন আমরা তাঁহাকে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত করি। পুরুষের যেমন, কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বস্ব হইবে নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি সেই রূপ। তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বতোভাবে সমুন্নতি লাভ করিবে। প্রণয় তাঁহার জীবন স্বরূপ হইবে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, অপত্য স্নেহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ঈশ্বর পরায়ণতা, প্রভৃতি যাবতীয় কোমল সুন্দর এবং মানস প্রফুল্লকারী বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা সম্ভবমত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হইবে; কর্ম্মক্ষমতা তাহা অপেক্ষা ন্যূন হইলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সমান স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সহিষ্ণুতা অপেক্ষা কর্ম্মক্ষমতা তাঁহাদের মতে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার জন্য, পরের উপকারে জন্য তাঁহাকে নানাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবশ্যই তাহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে।

[নারীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তি প্রধান হইবে বলিবার কারণ।]

অনেকে বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল হইলেই যে নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে আমরা দেখিতে পাই ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল; মনুষ্যদিগের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহপ্রবৃত্তি বলবতী এবং যে কোন কবিই নারীচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি উহার স্নেহপ্রবৃত্তিকেই অধিকতর প্রকাশিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সন্তান লালনপালনের ভার সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের প্রতি অর্পিত হয় এই জন্য স্ত্রীলোকের অপত্য স্নেহ বলবান্ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল এজন্য স্ত্রীলোককে পুরুষের আশ্রয়ে বাস করিতে হয় সুতরাং যে সকল মনোবৃত্তি থাকিলে সমাজে সদ্ভাবের সহিত চলা যায়; তাঁহার পক্ষে সে গুলির আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অতএব স্থির হইল যে দেশগত কাল-গত অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য পরিহার পূর্ব্বক নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal স্থির করিতে হইলে তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে যতদূর পারা যায় তেজস্বিনী করা আবশ্যক। তাঁহার কর্ম্মণ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ থাকা উচিত। কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অনুরোধে তাঁহাকে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং যারপরনাই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তাবের অবতারণা।

পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাবের অনুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরচরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। আমাদিগের প্রাচীন কবিগণও পূর্ব্বোক্ত কারণত্রয়ের অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনীগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা নায়িকা কুলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। হিন্দু দিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্না পতিপরায়ণা কার্য্যকুশলা রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় পৃথিবীর আর কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এইরূপ উপক্রমণিকার পর দেখা যাউক আর্য্যকবিগণ নারীচরিত্র বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং কতদূর ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যে হেতুক কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, যতই নূতন২ পদার্থ নির্ম্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই নিজশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়। অতি নৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনকুশল কবীন্দ্র মিল্টনের আলৌকিক কাব্যেও তাঁহার সমকালবর্ত্তী কেবালিয়র ও পিউরিটান দিগের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে কালিদাস বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

[সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়।]

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণিত নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণের অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্ভূত। সুতরাং উহাকে প্রকৃত সমাজ চিত্র কোন রূপেই বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপাসনা প্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ, কিন্তু স্মৃতিসংহিতা সকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

[১ স্ত্রীলোকের আদি।]

আমাদিগের দেশীয় বৃদ্ধেরা কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাসা করেন ইহার আদি কি? অর্থাৎ পুরাণ বা স্মৃতিতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছে। সেইরূপ, প্রস্তাবের প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীলোকের আদি কি? বাইবেলাদি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে আদামের পঞ্জর হইতে, ইবের উৎপত্তি আর পুরুষের সুখের জন্যই স্ত্রীলোকের উৎপত্তি। ইহাতে স্ত্রীলোক যেন পুরুষের অপেক্ষা অনেক নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা অনেক অধিক। আমাদিগের সৃষ্টি প্রকরণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। ১ম। আদ্যাশক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাহইলে স্ত্রীলোকই ব্রহ্মাণ্ডের মূল। দ্বিতীয় নারায়ণ বা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং আপন দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, একভাগে পুরুষ ও অপরভাগে নারীর উৎপত্তি হয়।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ
অর্দ্ধেন নারী" মনুঃ।

[ও প্রয়োজন।]

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোক ভোগের জন্য নহে, মনু স্ত্রীলোকের তিনটি প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা

উৎপাদন মপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী
নিবন্ধনং ॥

[স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না।]

যদিও স্ত্রীলোক পুরুষের পঞ্জর হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীলোককে পুরুষের যাবজ্জীবন অধীন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি" ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রাম সময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তার নিদেশমত কার্য্য করিতে হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতা মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধা-

বস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।" বৃহস্পতি বলেন, "শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকে তরুণবয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে, রাজা স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ পথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।" পৈঠিনসী বলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে দেখিও যেন সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় না।"(১) এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কোন প্রকারেই প্রাচীন ঋষিদিগের সম্মত নহে। কিন্তু মহাভারতে আমরা এক সময়ের কথা শুনিতে পাই, তখন স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন ছিল।(২)

[স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তিনী ছিল না।]

যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে ঋষিরা সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তিনী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চ পাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্য গ্রন্থ সকলে যে "শুদ্ধান্ত," "অন্তঃপুর," "অবরোধ," ইত্যাদি কথা দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০।৮০০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্য্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ করিতেন, এবং নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী ছিলেন। মুসলমানদিগের ন্যায় তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে ভোগার্থ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রস্থতা নাই।" স্ত্রীলোকেরা যে অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইতেন। আর "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই এক নিয়ম। প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

(১) D. N. Mitra's decision in the great Unchastily case.

(২) শ্বেতকেতূপাখ্যান।

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসব-
দর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত-
ভর্তৃকা ॥

অর্থাৎ স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না কোন সমাজ বা উৎসব স্থলে উপস্থিত হইবে না। তাহাহইলে স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শব্দশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বৈরিণী বলিলেই ব্যভিচারিণী বুঝায়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিত, তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিত সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু কুলটা বলিলে পূর্ব্বকালে দুষ্ট স্ত্রীলোক বুঝাইত না যে হেতু "কুলটার অপত্য" এই অর্থে "কৌলটিনেয়" পদ হইয়া থাকে। যদি দুষ্টা বুঝাইত কৌলটের বা কৌলটার পদ হইত। "ক্ষুদ্রাগোধাভ্যো বৈরারৌ" এই মুগ্ধবোধের সূত্রে ক্ষুদ্রা অর্থাৎ নীচাশয়া বুঝাইলেই এর বা আর প্রত্যয় হয়। অতএব কৌলটিনেয় এই পদ প্রয়োগ থাকাতেই বোধ হইতেছে এক সময়ে কুলটা শব্দের অসদর্থ ছিল না অর্থাৎ এক সময়ে যাহারা বেড়াইয়া বেড়াইত তাহারা নিন্দনীয় হইতনা।*

[স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যা শিক্ষা।]

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ "যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক সেই রূপ স্ত্রীলোক দিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কি রূপ? দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারিণী। কিন্তু আমরা দেখিতেছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়া ছিলেন।

এবং একস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোক দিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুরূহ কিন্তু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়া ছিলেন। ভবভূতি প্রণীত উত্তর চরিত নাটকেও দেখা যায় যে এক জন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর এক খানি নাটকে কামন্দকী, ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে কামন্দকী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি

* কুলং গ্রামং অটতি গচ্ছতি ভ্রমতি ইতি প্রাচীন ব্যুৎপত্তি কুলমটতি ত্যজতি ইতি নূতনব্যুৎপত্তি। কুলটাশব্দ সতী অর্থে ব্যবহৃত হয় রামতর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের টীকায় লিখিয়াছেন।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্য কালে হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং বোধ হইতেছে অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমান রূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমাদিগের দেশে যে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয় তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বতী বাল্য কালেই নানা বিদ্যার পারদর্শিনী হইয়া ছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কত দূর উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়।

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক এক খানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাস্করাচার্য্যের পাটী-গণিত ও বীজগণিত লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের কাব্যে আর একজন প্রসিদ্ধ লীলাবতী ছিলেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে শঙ্করাচার্য্য কলিঙ্গদেশে একটি স্ত্রীলোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কর্ণাটী দেশীয় রাজার মহিষী কালিদাসের কবিত্ববিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্রবধূও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

[স্ত্রীলোকের বিবাহ।]

পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এইটিই সকল মুনির মত কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করেন তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছাগত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে। (মনু) উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় নচেৎ নরকে যাইতে হয় এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ বরের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও অপাত্রে কন্যাদান ঘটিয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন,

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ।
যত্নাৎপরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জন-প্রিয়ঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটীর বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে যথা, "যুবা," অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না "ধীমান্" অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে "জনপ্রিয়" অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বর পরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায়। যদি বর সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয় তবেই তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মনু আরো বলিয়াছেন যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায় তবে বরং কন্যা যাবজ্জীবন

পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাপি অনুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

অনেকে বলিতে পারেন বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত না করিয়া লইলে অনেক সময়ে পতি পত্নীর অপ্রণয় নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক কষ্ট হইত এবং ইংরাজ জাতিমধ্যে যেরূপ কোর্টসিপ প্রচলিত এরূপ কোন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। এরূপ বলা একান্ত ভ্রমের কর্ম্ম। বাস্তবিক আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী মনোনীত করিবার যে প্রথা ছিল তাহা কোর্টসিপ অপেক্ষাও সুন্দর। প্রথমতঃ কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কন্যা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত এবং যদি বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হয় এবং বরের ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ হয় তবে কন্যার সম্মতি অপেক্ষা করিত। দ্বিতীয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত থাকায় বর ও কন্যা ইচ্ছামত পরস্পর প্রণয় জন্মিলেই বিবাহ করিতে পারিত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই বিবাহ অপ্রশস্ত। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ দিগের পক্ষে অপ্রশস্ত হইবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণদিগের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চলিত থাকিলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আর ইন্দ্রিয়সংযম ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযমও নিরন্তর গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ভিন্ন হইতে পারে না সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে ইচ্ছামত বিবাহ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই ছিল। নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর তাঁহারা শাস্ত্রসম্মতা কন্যা মনোনীত করিয়া লইতেন। তৃতীয়তঃ অতি প্রাচীন কালে বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার আর এক চমৎকার প্রণালী ছিল। কন্যার পিতা বিবাহযোগ্য কালে কন্যাকে আহ্বান করিয়া কহিতেন বৎসে তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত। তুমি আমার বিশ্বস্ত লোকের সহিত গমন কর। তোমার যাহাকে ইচ্ছা হইবে সে যদি কুলশীলে আমাদের অপেক্ষা নীচ না হয় তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। পতিপরায়ণা সাবিত্রী এইরূপে আপন স্বামী মনোনীত করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না কিন্তু সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৎসে এইটীই প্রকৃত আগমোক্ত বিধি এবং এইরূপে বহুতর কন্যা মনোমত পতিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ স্বামী মনোনীত করিবার প্রথা পরিণামে স্বয়ম্বর রূপে পরিণত হয়। পুরুষেও কন্যা মনোনীত করিবার জন্য বহির্গত হইয়া ইচ্ছানুসারে মনোমত কন্যা বিবাহ করিতেন। দশকুমারচরিতে তাহার এক সুন্দর উদাহরণ আছে। ৪র্থ স্বয়ম্বর প্রথা। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী বোধ হয় আর কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। কন্যারবিবাহ সময় উপস্থিত হইলে সমান কুলশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করা

হইত। সকলে উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে একসভা হইত। কন্যা শিবিকারোহণ পূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন। একজন প্রগল্ভা স্ত্রীলোক একে২ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে শিবিকা লইয়া তাহাদের গুণাগুণ কীর্ত্তন করিত এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিত "কেমন, এবর তোমার মনোনীত হয়!" মনোনীত হইলে কন্যা আপন গলদেশ হইতে মাল্য লইয়া বরের গলায় অর্পণ করিত। অনেক স্থলে স্বয়ংবরের পুর্ব্বেই সকলের গুণাগুণ কন্যাকে শুনান থাকিত। বড়২ স্বয়ম্বরস্থলে যে কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি বিবাহে নিরাশ্বাস হইয়া কোনরূপ উৎপাত করিবেন তাহার যো ছিল না। কারণ স্বর্গপতি ইন্দ্রের মহিষী স্বয়ম্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু এরূপ হইলেও বহুলোকসমাগম প্রযুক্ত নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিত এজন্য পণপূর্ব্বক বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়। উহাতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দুরূহ কার্য্য করিবে সেই বিবাহ করিবে এই পণ থাকিত। মধ্যসময়ে ইয়ুরোপেও নাইটেরা লেডিদিগের সন্তুষ্টির জন্য নানাবিধ দুরূহ কার্য্য সাধন করিতেন। এইরূপ নানাবিধ বিবাহ থাকিতেও মুনি ঋষিরা ও রাজারা ইচ্ছামত নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কন্যা মনোনীত করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্য একটি দুই বৎসরবয়স্কা কন্যাকে লইয়া একজন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন তুমি ইহার লালনপালন ও শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবে। পরে সে কন্যা বিবাহযোগ্যবয়স্কা হইলে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অতএব এক্ষণকার অনেকে যে বলেন বর কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার প্রথা ছিল না সে কেবল তাঁহাদের ভ্রমমাত্র।

[ডাইভোর্স বা পরিত্যাগ।]

স্ত্রী যদি শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পতিত হইতে হইবে। ব্যাস বলিয়াছেন, "অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ" রঘুনন্দনও শুদ্ধচারিণী স্ত্রী ত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পতিত হওয়ার অর্থ আমরা এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু পূর্ব্বকালে পতিত ব্যক্তির সহিত কেহ আলাপ করিত না, কেহ উহার মুখ দেখিত না, উহাকে এক প্রকার জীবন্মৃতের ন্যায় থাকিতে হইত। স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহার ঐরূপ ভয়ানক অবস্থা হইত। কিন্তু ঋষিরা নানা কারণে স্ত্রী ত্যাগের বিশেষ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥

মদ্যপায়ী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যা অমিতব্যয়কারিণী অপ্রিয়বাদিনী কন্যাপ্রসবিনী পুরুষদ্বেষিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। মনু প্রভৃতিরও ঐরূপ বচন আছে। এই সকল কারণ বশতঃ যাহাদিগকে ত্যাগ করিবে,

তাহাদিগকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হইবে; যেহেতুক যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "অধিবিন্নাস্তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোন্যথা ভবেৎ" তাহাদিগকে ভরণ না করিলে বড় দোষ হয়। মিতাক্ষরা বলিয়াছেন, ঐ সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে না এবং গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগের বিলক্ষণ বোধ ছিল, স্ত্রীলোক নিঃসহায়, এই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যভিচারিণীকেও বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিয়া, উহাকে নানাবিধ প্রকারে কষ্ট দিয়া যাহাতে উহার চরিত্র সংশোধন হয়,তাহার চেষ্টা করিবে।

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপ-
জীবিনীং।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

এটিও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন। এই পর্য্যন্ত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রী কিন্তু পতিত কুষ্ঠরোগী স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেবল পতিত হইলে যত দিন তাহার শুদ্ধি না হইবে, ততদিন উহার সহবাস করিবে না "আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ।" এ সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ব্যবস্থা। কলিযুগে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারিবে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধী-
য়তে।

অতএব কলিযুগে পুরুষ যেমন কারণবশতঃ স্ত্রীত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, স্ত্রীও তেমনি কারণবশতঃ স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন।

[স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার।]

"পিতা মাতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন। এবং তাহাদিগের বেশ ভূষা করাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয় সেইখানেই দেবতারা সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্য্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীরা শোক করে সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহারা সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতিইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে ভূষণ আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগের "পূজা" করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ হয়।" ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে, বোধ হয় পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন তাহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছেন। মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্র গুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ। অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোন রূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" আর এক জন বলিয়াছেন, কন্যা পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। স্ত্রীলোকের শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গরুড় পুরাণে আছে "অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহু স্তির্য্যক্ জাতিগতেষ্বপি" মনু বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, উঁহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করার প্রথা ছিল, তাহার এক প্রকার উল্লেখ করা হইল।

উপরি লিখিত প্রবন্ধে বোধে হইবে যে, সভ্যজাতীয় লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণও তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানা স্থানে দেখা যায় "স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ উহার সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুরভাষিণী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।" (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ) এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন, অথবা তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্ব্বকালের মত পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন অথবা তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন এরূপ বলা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাহারা সতী তাহাদের ত কথাই নাই, "যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেই খানে সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।" (কাশীখণ্ড) কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। "সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিয়াছেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদ্গণ সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইল।"

ক্রমশঃ

ভারতমহিলা ।

[স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ।]

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কাণা হউন খোঁড়া হউন অকর্ম্মণ্য হউন দুষ্ট হউন তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু,পূজ্য ও ইষ্ট দেবতা তাঁহার চরণ সেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরম গতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতামাতার সেবা দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না—আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত ধর্ম্ম উপাসনা উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদি কার্য্যে দক্ষা হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। কিন্তু তাহা দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে সকল গৃহ কর্ম্ম কি বহ্নি পুরাণে তাহার এক সংগ্রহ পাওয়া যায় যথা

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং
সুরং।
প্রাঙ্গনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন
জলেনবা॥
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বাগত্বাগৃহংসতী।
সুরং বিপ্রংপতিং নত্বা পূজয়েদ্‌গৃহদেবতাং॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বৃত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং
সতী।
অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং
সতী॥

এইস্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তাহার উল্লেখ তৃতীয় অধ্যায়ে করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি জানা নিতান্ত আবশ্যক কারণ তাঁহারা ঐ গুলি যদি সুন্দররূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার পর অমায়িকতা সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায় সেই সকল গুণ থাকিলেই তাহাকে অতি উন্নতচরিত্র বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনায় সেই সকল কর্ত্তব্য বিস্তার বর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

[স্ত্রীর ধনাধিকার।]

স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা যে তত ভাল ছিল না তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই যে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই।

নিজে উপার্জ্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কন্যার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাঁহার আপনার। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নিগূঢ় স্বত্ব নাই অর্থাৎ দানবিক্রয় ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র। সে ভোগ আবার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদি দ্বারা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য । পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে তবেই পাইবেন বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধনাধিকার ও ধন উপার্জ্জনে বঞ্চিত। তথাপি তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজ ধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। আর সচ্চরিত্রা বিধবার প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে রাজা তাহার শাস্তি দিবেন। স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই, কারণ তাহার স্বাধীনতা নাই।

[বিধবার কর্ত্তব্য।]

মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধনদান করিবে না। স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হইলে পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণ প্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডু মহিষী মাদ্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্র বৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস এমন কি মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমৃতাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন "যে স্ত্রী সহমৃতা হয় সে স্বামীর সহস্র পাপ সত্ত্বেও স্বামীর সহিত সার্দ্ধ ত্রিকোটী বৎসর স্বর্গ বাস করিবে।" পরাশর(কেহ কেহ বলেন অঙ্গিরা) আর একজন বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আমোদ প্রমোদ করে। (দক্ষ।) কিন্তু সহমরণ স্ত্রী লোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও একথার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভরতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল,সত্য বটে দুষ্ট লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জলচ্চিতায় নিক্ষেপ

করিত। কিন্তু এই প্রথা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পণ করিতেন। কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন ব্যবস্থা আছে।

[দুষ্ট চারিত্রাদিগের দণ্ড,]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্যঃ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করিত বা মুক্ত হস্তে ব্যয় করিত স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্হা। এই সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থাছিল কিন্তু তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীর অবহেলা করে এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন। স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে সে পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে না। ব্যভিচারিণী দিগের ইহকালও নাই পর কালও নাই তাহারা জারজ পুত্র উৎপাদন করিয়া উভয়কুল অপবিত্র করে।

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ।
সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ॥
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডো-
দকক্রিয়াঃ। ভগবদ্গীতা

স্ত্রীলোক যদি সমাজনিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করে তাহা হইলে সে ইহকালে পুরুষের ন্যায় দণ্ড পায়। আর পরোলোকে পুরুষাপেক্ষা দ্বাবিংশতি গুণ অধিক যন্ত্রণা ভোগকরে। কৃত্তিবাস নরকবর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন "এহতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা।" মনু স্ত্রীলোক দিগের অনেক স্থানে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু দুই একস্থলে অধিক ব্যবস্থাও দিয়াছেন। যাহারা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে এবং উহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া অধর্ম্ম পথে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করে তাহাদিগের "উত্তম সাহস" দণ্ড হয়। প্রাচীন কালে যত শাস্তি ছিল উত্তম সাহস দণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

তৃতীয় অধ্যায়।

[মন্তব্য কথা।]

পূর্ব্বপ্রস্তাবে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল এক প্রকার সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে এক্ষণে বিস্তাররূপে ঐগুলির নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এল্‌ফিন্‌ ষ্টোন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধিই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। কার্য্যকারিণী প্রবৃত্তি অর্থাৎ উন্নতিবিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ আস্থা ছিলনা। সর্ব্বপ্রকারে শান্তিসুখ অনুভব করা এবং প্রাণিমাত্রের

দুঃখবিমোচন করাই তাঁহাদের মতে মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেন; প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র মাত্রেরই এইদোষ। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্বদেশোন্নতি, সমাজোন্নতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে আপনাদিগের মধ্যে নির্দ্দোষ নির্ম্মল চরিত্রকেই অধিক আদর করিতেন হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকেনা। তাঁহারা যত নিয়ম করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কিরূপে পাপ স্পর্শ নাহয় তাহারই জন্য। এখন যেমন সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে স্বদেশের বা মনুষ্য সমাজের উন্নতি করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হয় সেরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে অতিবিরল, তাঁহারা স্ত্রীলোক দিগের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এই দোষ। স্ত্রীলোক সর্ব্ব প্রকারে পাপশূন্য হইবে, স্বামীপুত্রের অধীন হইবে, ইত্যাদি শত২ নিয়ম কেবল তাঁহাদের চরিত্রবিশুদ্ধিকামনায় মাত্র। এই সকল নিয়ম এরূপ কঠিন যে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যাঁহারা এই সকল কঠিন নিয়মের অধিকাংশ পালন করিয়া উঠিতেন তাঁহাদের গুরুতর দোষ সত্ত্বেও প্রশংসা হইত। তাহার এক প্রমাণ অহল্যা। তিনি চিরদিন স্বামিভক্তা এবং গৃহকার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগবতী ছিলেন। তাহার পর ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যভিচার পঙ্কে নিপতিতা হন।* কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এক্ষণে প্রাতঃস্মরণীয়া দিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আবার দেখা যায় অনেকে এই দুরূহ নিয়ম সকল যথাযোগ্য রূপে প্রতিপালন করিয়াও স্বীয় বুদ্ধিমত্তাদি গুণে আরো অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সেবা ও সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়াও পাণ্ডব দিগকে সর্ব্বদাই নীতি শাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। বাস্তবিকও পাণ্ডবদিগের বনবাস সময়ে কৃষ্ণার ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী আর কেহই ছিল না।

[সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ।]

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা সেই সকল নিয়ম সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদিগের প্রথম চিত্র। যাঁহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্য্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাঁহারা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে এই স্ত্রীস্বভাবের উৎ·

*কৃত্তিবাস বলিয়াছেন অহল্যা নির্দ্দোষী; সমস্ত দোষ ইন্দ্রের। কিন্তু বাল্মীকি তাহা বলেন না। যদিও বাল্মীকির কবিতা ব্যর্থ করা যায় কিন্তু টীকাকারেরা অহল্যাকেও দোষী করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডববধূ দ্রৌপদী রামগেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান রূপে গণনীয়া। সাবিত্রী শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্র রক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের প্রলোভন সামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন। গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হইলেও উইলিয়ম পিট অপেক্ষা অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক: কারণ পিট অনেক প্রলোভনেও ভুলেন নাই। গ্লাডষ্টোনের সময় সে সকল প্রলোভন একেবারেই নাই।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগের দেবতা তাঁহার সেবাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য। গৃহস্থের যত কার্য্য আছে তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রী লোকের হস্তে। সন্তানপালন স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে কোন স্থলেই উল্লেখ নাই কিন্তু মনু বলিয়াছেন,

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী
নিবন্ধনং॥

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহার পর কবিদিগের সময়ে স্ত্রীলোকের আরো একটী কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্র পরিবারের মহিলারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলা শিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক সকল সরল ছিল। বাবুগিরি উহাদের তত মনোমত ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে স্ত্রীলোকের যে নৃত্য গীতাদি শিখিতে হইত এরূপ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন তখন নৃত্যগীত ভদ্র মহিলাদিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন,

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা
ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং
ন মে হৃতং॥ রঘুঃ

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যাভর্ত্তুঃসদা-
ভবেৎ॥

এই দুইটী বচনের মধ্যে প্রথমটীতে প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ এই বিশেষণটী অধিক আছে। ইহাদ্বারা বোধ হইল ঋষিদিগের সময়ে নৃত্যগীত শিক্ষা চলিত ছিল না। আবার দ্বিতীয়টীতে "ছায়েবানুগতা" এই বিশেষণটী আছে। তাহাতে বোধ হইতেছে প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন কত্তিেন।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল পতিসেবা গৃহ কার্য্য, এবং ঋষিদিগের পর, নৃত্যগীতাদিও, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্ত্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশ খানি সংহিতার মধ্যে ৮।৯ খানি অতি স্বল্পায়তন তাহাতে স্ত্রী চরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে, মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ উহাতে স্ত্রীধর্ম্ম তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কয়েকটী মাত্র কবিতা গৃহস্থ ধর্ম্মের মধ্যে বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তাররূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিন খানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থ ঘটিত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণু সূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুরূহ অপুত্রধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা

১ম। স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইবেন। বিষ্ণুসূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দ পণ্ডিত লিখিয়াছেন স্বামী যে সকল বিষয়ে সংকল্প করিবেন স্ত্রী লোকেরও সেই২ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এবং স্বমত সংস্থাপন জন্য কাশীখণ্ড হইতে "যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা" এই বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন। গোতম বলিয়াছেন ধর্ম্ম কর্ম্মে স্ত্রী স্বাধীন নহেন। বশিষ্ঠও এই কথা বলিয়াছেন এবং এতৎসমর্থক আরো এক বচন আছে যথা স্ত্রীভিঃ ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

২য়। শ্বশ্রূ শ্বশুর দেবতাতিথিদিগের সেবা। টীকাকার লিখিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষ সম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন কারণ স্ত্রীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটীর সহিত বিরোধ হয় অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবতা "সৌভাগ্য দাত্রী গৌর্য্যাদিঃ।" সৌভাগ্যই স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; বলে ক্ষত্রিয়ের। সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভাল বাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৩য়। অতিথি সেবা। মনু গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিথি সেবা একটী। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথি সেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর ভার। গৃহিণী যদি সুন্দর রূপে অতিথিসেবা করিতে

পারিলেন সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থ মহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভাল বসিতেন। এক দিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল তথাপি তিনি কোনরূপে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

৪র্থ। গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার। কেশব বৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শংখ লিখিত একটী সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত শংখলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটী পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই।

প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন সামগ্রীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান। ইত্যাদি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বহ্নিপুরাণের একটি বচনোদ্ধার করিয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ।

৫ম ৬ষ্ঠ। অমুক্ত হস্ততা ও সুগুপ্তভাণ্ডতা। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামিসঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয় ব্যয়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন। "ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া" "ব্যয়বিবর্জ্জিতা" "ব্যয়পরাঙ্মুখী" সকল সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। যদি অধিক ব্যয় করেন স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন আমি ব্যয়কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যায়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাঁহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যয়কুণ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৭ম। "মূল ক্রিয়াস্বনভিরুচিঃ। এই বচনটীর প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া দুর্ঘট। পণ্ডিতবর নন্দকুমার বলিয়াছেন মূল ক্রিয়ার অর্থ বশীকরণাদি কার্য্য যাহাকে আমরা এক্ষণে ডাকিনীর কর্ম্ম বলিয়া থাকি। কিন্তু বিষ্ণুর সময়ে কি লোকে ডাকিনী যোগিনী বিশ্বাস করিত? ডাকিনী যোগিনী ত তন্ত্র ও পুরাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি উহা দ্বারা

অথর্ব্ব বেদোক্ত মারণাদি কার্য্য বুঝাইবে? তাহা হইতে পারে না, স্ত্রীলোকের ত বেদে অধিকার ছিল না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পান, অটন, দিবাস্বপ্ন স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য নহে করিলে দোষ হয়। বিষ্ণুর বচনে হয় ত তাহাই বুঝাইবে।

৮ম। মঙ্গলাচারতৎপরতা। মাঙ্গল্য দ্রব্য হরিদ্রা কুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে। এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের নিকট যেসকল আচার শিক্ষা করিবে তাহার পালনে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচার গুলি শংখ লিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা না বলিয়া কাহারও বাটী যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। বণিক্, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্যকে নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না ইত্যাদি।

৯ম। স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী শরীর সংস্কার বিবাহ ও উৎসবদর্শন হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন:—

যদি স্বামী কোন রূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন। তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার শংখলিখিতের একটী সুদীর্ঘবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে সেটীর অনুবাদ করিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা মাতা ভ্রাতা শ্বশুরাদির গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। সুতরাং স্বামী স্বদেশে থাকিলে স্ত্রীলোকেরা যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিত তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রোষিত ভর্ত্তৃকাদিগের কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন তিনিই সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎসর পর্য্যন্ত একবেণী ধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণ রসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রাম গিরিতে মেঘকে বলিতেছেন”

“আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।”

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষ পথে বলিব্যাকুলা দেহলী-দত্ত-পুষ্প-গণনা-তৎপরা আধিক্ষামা সেই যক্ষ পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর কৃশ তিনি বিস্তৃত শয্যার এক

পার্শ্বে শয়ানা আছেন বোধ হইতেছে যেন প্রাচীমূলে এক খণ্ড চন্দ্রকলা রহিয়াছে। উহাতে আকাশের বিশেষ শোভা হইতেছে না, কিন্তু দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ শোকে আপ্লুত হইতেছে।

১০ম। দ্বারদেশ গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অবস্থিতি করা স্ত্রীলোকদিগের অন্যায়। কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১১শ। কোন কর্ম্মে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

১২শ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর বহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, না হয় সহগামিনী হইবে। কেশব বৈজয়ন্তী প্রণেতা নন্দকুমার এই স্থলে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দকুমার আপন মত সংস্থাপনার্থ কাশীখণ্ড হইতে বচন তুলিয়াছেন। কাশীখণ্ডের ব্রহ্মচর্য্যে ও স্মৃতিকারদিগের ব্রহ্মচর্য্যে অনেক প্রভেদ। ঋষিরা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ব্রহ্মচর্য্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠাবস্থায় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শুদ্ধাচারে থাকে বিধবারাও স্বামীর মৃত্যুর পর সেইরূপ শুদ্ধাচারে থাকিবে, এই তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহার করিবে। পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে, তাহাদিগের নরক দর্শন হইবে ইত্যাদি। ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য নহে। ইহাকে সন্ন্যাস বলিলেও বলা যায়।

বিষ্ণুসংহিতা প্রায়ই সরল গদ্যে লিখিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিতাও দেখা যায়। স্ত্রীধর্ম্ম নির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় দেখা যায় যথাঃ—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং
নাপ্যুপাসনং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাস ব্রতং
চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বয়ং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

এই পর্য্যন্ত বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীধর্ম্ম প্রকরণ শেষ হইল। এই প্রস্তাবের মধ্যে আমরা দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর সকল সংহিতারই সমালোচন করিলাম। দক্ষ সংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাস সংহিতা যদিও বিষ্ণুর ন্যায় প্রাঞ্জল নহে, তথাপি বিষ্ণুর অপেক্ষা অনেক বিস্তার ক্রমে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। আমরা এই দুই সংহিতার বচনগুলি অনুবাদ করিয়া দিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপন করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও

কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাত্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় যাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই স্ত্রীলোকে জ্যেষ্ঠতা লাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে, তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। দুর্ভগার মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর। এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন।

নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু
প্রিয়বাদিনীষু
অমুক্ত হস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু
বলিপ্রিয়াসু।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্য-
পেতাষু বিলোলুপাসু
ধর্ম্ম ব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা
সদাহং মধুসূদনে তু।

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রান্বিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের, পূজাপ্রিয়া গৃহ পরিমার্জ্জনতৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্ম কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ। অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে স্ত্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংযমবতী, দয়ান্বিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্ত্রীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ সত্যের প্রতি তাদৃশ আস্থা না করিয়া, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসম্মত উন্নত চরিত্র স্ত্রীলোক কেবল কবিদিগের মানসমধ্যে থাকিতে পারে। রক্ত মাংসময় সংসারে সেরূপ রমণী থাকিতে পারে না।

স্মৃতিসংহিতায় আর একটি উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের বিবরণ ব্যাসলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা এই স্থলে তাহার

সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিব।

"পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা বয়স বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যাসম্প্রদান করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর ব্যক্তি দান করিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বর করিবেন। * * * পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু আপনার দেহকে দ্বিধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই শ্রুতি আছে। যত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করা যায়, তত দিন পুরুষকে অর্দ্ধ কলেবর বলিতে হইবে। শ্রুতি আছে অর্দ্ধ দেহ জন্মে না কিন্তু জন্মাইতে পারে। * * * বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত, গৃহনির্ম্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দিবে না। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদা একমনা হইবে। এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গ সাধনের কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতি শ্লেষ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহশুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জ্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জ্জন ও লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নি পরিচর্য্যার কার্য্য করিবে ও গৃহ সামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবে * * * এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা করিবে এবং গুরুজন প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ করিবে। কায়-মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্ম্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গৃহ নীতি বিধান করিবে এবং সাধু শয়ন আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহারই নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের নিত্য কর্ম্ম গেল। ইহাতে পূর্ব্ব প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহার পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে। যথা—"স্ত্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে তাহার নিজের কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয় সংযমে তিনি যেন সর্ব্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি

কখনই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা পরুষ বাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কহা তাঁহার পক্ষে দূষণাবহ। তিনি যেন কাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপ বাক্য ব্যবহার না করেন ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্ম্মার্থ বিরোধী কোন কার্য্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য সাহস,চৌর্য্য ও দম্ভ পরিবর্জ্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইলে ইহকালে যশঃ ও পর কালে স্বামীর সহিত ব্রাহ্ম সালোক্য প্রাপ্তি হয়।”

ব্যাস সংহিতায় এই সুন্দর পরিস্কার দীর্ঘবর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতি সংহিতা কারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কত দূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্না রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারত বর্ষে, এমন কি এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলিঅধুনাতন বাবুদিগের সংস্কার আছে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না সুতরাং এতকাল* স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাস সংহিতার বচন কয়েকটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্ম মাত্রের ভার ছিল না তিনি আয় ব্যয়ের চিন্তা করিতেন তাহার নাম দেওয়ানী। ব্যাস সংহিতা পাঠ করিয়া বরং বোধ হয় স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য করিল পুরুষের কার্য্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্ব্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি দুরূহ ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে সময়েং চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বা গুণ নির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধান২ গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। “পত্নী যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশানুগা হন তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম আর নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যদি বর্ত্তমান সময়ে স্নেহবশতঃ

* D. N. Bose's Lecture in the Student's Association.

স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায় তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।” স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়ন করার কথাও শংখ সংহিতায় আছে। যথা—“লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈবচ। লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা।” এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্ত্তব্য। “অনুকূল কারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা জিতেন্দ্রিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।” “যাহার রমণী অনুকূলকারিণী তাহার এইখানেই স্বর্গ * * * এইরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ। কিন্তু যদি একজন অনুরাগী ও আর জন অননুরাগী হয় তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য সে সুখের পত্নীই মূল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্ব্বদা খিন্না হয় এবং যদি উভয়ের একমন না হয় তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। * * * জলৌকা কেবল রক্ত শোষণ করে কিন্তু দুষ্টা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীর্য্য, সুখ শোষণ করিতে থাকে। বাল্যকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধ পতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমন হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্য্যা। ইতরা জরা।”

[২য় ও ৩য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ।]

এতদূরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্ম সমালোচনা সমাপন হইল। এই সমুদায় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কি রূপ সামাজিক অবস্থা ছিল এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয়া হইতে পারিতেন তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। প্রথমতঃ অতি প্রাচীন কালে বিবাহের নিয়ম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ ধৃত শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের সে কথার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহার আলোচনা করি নাই। বিবাহের নিয়ম সংস্থাপন হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত কন্যার উপর বর মনোনীত করিবার ভার থাকিত। এবং যদিও পিতা যাহাকে হয় কন্যা দান করিতে পারিতেন তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অন্যকে দিলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্য কার্য্য মাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে গৃহস্থের যে

গুরুতর কার্য্য, সাংসারিক আয় ব্যয়চিন্তা ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নি রক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদি স্থলে যাইতে পারিতেন। তাঁহারা যদিও সর্ব্বত্র দায়াধিকারিণী হইতে পারিতেন না তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কৌশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহাইলে সুদশুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্রে কোনস্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ড,একপ্রকাল বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য বলিলেই হয়। কালিকাপুরাণে চন্দ্রের রাজ যক্ষ্মা রোগোৎপত্তি বহুবিবাহ পাপের প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্য্য মাত্র ব্যবস্থা। পৌরাণিক ঋষিরা এবং সংহিতা সমূহের টীকাকার মহাশয়েরা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন প্রাচীন ঋষিরা তাহার দিক্ দিয়াও যান নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে। বোধ হয় সতীদাহ অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাড়ী মিথিলায়, মিথিলায় অদ্যাপি অনার্য্য জাতির ভাগ অধিক। তিনি যে দেশের জন্য সংহিতা রচনা করেন, তথায় উহার প্রচার দেখিয়া, উহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষ্মীসমেত দেবদেবীমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। মনুর সময়ে বা বেদে বিষ্ণুর নামও নাই। সুতরাং বোধ হয়, মনুর অনেক্ পরে বিষ্ণুসংহিতা রচনা করা হয়, যখন রচনা হয়, তখন আর্য্য জাতীয়েরা অনেকাংশে অনার্য্যদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যে লেখা পড়া শিখিতেন,তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসদ্ব্যবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না। অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য, আর্য্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভ মাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত্য ও জরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইহারা কেবল পিতৃবংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

[স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারী চরিত্র।]

বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরু-

ষের সহবাস করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার ইহকালে দুরন্ত শাস্তি-ভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। স্ত্রীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসৎকার, দেব-পূজা ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থা-কিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে ভক্তিমতী পুত্রাদিতে স্নেহ-শালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধানা ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকী দিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে হেতু-বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধু স্ত্রী সর্ব্ব-তোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোন রূপ সাহসকর্ম্মে স্ত্রীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামী পুত্রাদির হস্ত হ-ইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্য্যায়ের শব্দ। কুলটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি অধুনা উহার অসদর্থই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভি-নিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, স্ত্রীলোকের সর্ব্ব-প্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দানুবর্ত্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরি-ষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভাল-বাসিতেন। তাঁহাদের ঋষিপত্নীরাও সর্ব্বদা আপন শরীর ও গৃহদ্বার ও তৈজস পত্র পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। অপরি-ষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সম্যক্-রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কা-রাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়।

যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন, তাহাহইলে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলা ঘটে এদেশীয় কাহারই অবিদিত নাই। এজন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য ও বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সৎস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, সদ্ব্যবহার দ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে? “কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন সখীর ন্যায় হিত কর্ম্মে তৎপরা হইবেন দাসীর ন্যায় আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হইবেন।” কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য সেটী তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে,যেহেতু শাস্ত্রে কলহবিরতাদিগের ভূরি ২ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাস ভূমি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে অদ্যাপি ভোগের জন্য বিবাহ করা হয় না। বংশরক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঋষিগণ স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ আরো দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণ্যের অংশভাগী। এরূপ নিয়ম আর কোথাও নাই। নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। “অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি” এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

[তুলনা।]

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ নারী চরিত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে স্মৃতিকার দিগের নারীচরিত্র কোন অংশেই ন্যূন নহে। স্নেহ প্রবৃত্তির উপর ব্যাসের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দয়া, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের চরিত্র অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে ঋষিরা কোন মতেই অসম্মত নহেন। তাঁহারা সংসারের আয়ব্যয় চিন্তার ভার

স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং বহুতর উঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া উঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা বিলক্ষণ উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোক দিগের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং স্বাধীনতা থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তির আবির্ভাব হয় তাহার একটীও উঁহাদের নাই। এমন কি ধর্ম্ম বিষয়েও স্ত্রীলোকেরা আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে পারেনা। সুতরাং যে ধর্ম্মনিষ্ঠতার জন্য বহুতর ইউরোপীয় নারী বিখ্যাতা হইয়াছেন সে প্রবৃত্তি উঁহাদের প্রবল হইতে পায় নাই। জন হাউর্ডের গৃহিণী স্বামীর সহিত দেশে২ ভ্রমণ করিয়া যেরূপ পরহিত ব্রতে সমস্তজীবন যাপন করিয়াছেন তাদৃশ রমণী আমাদের দেশে একটীও দেখা যায় না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সুতরাং যে সকল গুণে কুইন এলিজাবেথ বিখ্যাত হইয়াছেন আমাদের দেশীয় রমণীদিগের সে গুণ থাকা অসম্ভব।

বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের সন্নিকটস্থ কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও," ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় জীবনক্ষেপকর।" তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হৎগণ কহিলেন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন মগধাধিপতি মহারাজ মিনিন্দকে* কহিলেন "বহুগুণসম্পন্ন ভগ-

* ইনিযোন বা যবন রাজ মিনিন্দ (Bactrian king Menander) ভারতবর্ষীয় কোন২ স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০

বান্ জীবিত আছেন।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন "তবে তিনি কোথায়?" আচার্য্য নাগসেন কহিলেন "ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? এইরূপ আমাদিগের ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।" আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে অন্য২ বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী + তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশ কদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম্ম ঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তি দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন।

"উৎপন্নো লোক প্রদ্যোতো লোকনাথঃ
প্রভঙ্করঃ।"

"অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা
রণঞ্জহঃ।"

"ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণ
মনোরথঃ।"

"সম্পূর্ণৈঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি।"

"চিরম্ সুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধা-
বগুণ্ঠিতং।"

"ভবান্ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থঃপ্রতি-
বোধিতুং।"

"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধি-
প্রপীড়িতে।"

"বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধি
প্রমোচকঃ।"

বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানন্বিয় (Demetrius) ইঁহার পারিষদ ছিলেন। মিনিন্দের সহিত নাগ সেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালিভাষার "মিনিন্দপহ্নে" লিখিত আছে।

+ মহাভারতে লিখিত আছে শ্রাবস্তী ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী। মনুপুত্র ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্ম্মাতা যথা মনু—ইক্ষাকু—নাশক—ককুৎস্থ—আননাঃ—পৃথু—বিশ্বগশ্ব—অদ্রি—যুবনাশ্ব—শ্রাব—শ্রাবস্তক—এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণদিকে স্থাপন করেন।
"অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজো-
ভবেৎ।"
তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন
নির্ম্মিতা।" (বনপর্ব্ব)

"ভবিষ্যন্তাক্ষণাঃ শূন্যাস্থমি নামে
সমুদ্গতে।"

"মনুষ্যা শৈচব দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুখা-
ন্বিতাঃ।"

"পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্ম্মশ্রেষ্ঠস্তি
চেপিতে।" ইত্যাদি

অর্থাৎ "আপনি লোক ভাস্কর, লোক-নাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুর্দাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম্ম* দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত আছে, তমঃ রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীব লোক ক্লেশ ব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন আপনার দ্বারাই এই জীব-লোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে, এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষু হইবে, কি দেব, কি মনুষ্য সকলেই সুখী হইবে। যাহারা আপনার এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি

* শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম। অহিংসা ধর্ম্মের শুক্ল সংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ধ্যান নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্য-সিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই জীবলোক কেবল কষ্টময়। জন্মাইতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে ইত্যাদি—লোক সকল এই মহা দুঃখ স্কন্দের মধ্য হইতে নিসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন "কি হেতু জরামরণ হয়? জরামরণং কিং মূলকং?" এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "জাতিপ্রত্যয়ং হি জরা-মরণং।" জাতি সত্তাই জরামরণের কারণ। "কিং মূলকং জাতিঃ?" জাতির মূল কি? "জাতির্ভবতি ভব প্রত্যয়া।" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎ-পত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী ধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা—তৃষ্ণার মূল বেদনা—বেদনার মূল স্পর্শ—স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নাম রূপ—নামরূপের বীজ বিজ্ঞান—বিজ্ঞা-নোৎপত্তির বীজ সংস্কার—সংস্কারের বীজ অবিদ্যা।* দুঃখ স্কন্দের এই হেতু ভাব

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথা "অবিজ্জা পস্সেয় সঙ্খার, সঙ্খার পস্সেয় বিন্নানম্, বিন্নানপস্সেয় নামরূপম্, নামরূপপস্সেয় ষড়ায়তনম, ষড়ায়তন পস্সেয় ফাস্সো, ফাস্সপসেসয় বেদনা, বেদনা পস্সেয় তষিণা, তষিণা পস্সেয় উপাদানম্ উপাদান পস্সেয় ভাবো, ভাবপসেসয় জাতি, জাতিপস্সেয় জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখ" ইত্যাদি

অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু ভাবের উচ্ছেদ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে "অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরা মরণ শোক পরিদেব দুঃখ দৌর্ম্মনস্যোপায়াৎশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখ স্কন্দস্য নিরোধো ভবতীতি। ইতিহি ভিক্ষবো বোধি সত্ত্বস্য পূর্ব্ব মশ্রুতেষু ধর্ম্মেষুযোৎনিশো মনশিকো বা হ্বহুলোকারাজ্ঞান মুদপাদি চক্ষুরুদপাদি—বিদ্যোদপাদি ভূবিরুদপাদি—মেঘোদপাদি প্রজ্ঞোদপাদি আলোকঃ প্রাতুর্বভূব—অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপ ক্রমে সমস্ত দুঃখ স্কন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখ নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখ দুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্য সিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি "জরা মরণ বিঘাতী ভিষগ্বর" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিক দিগের মধ্যে যেমন জগতের মূল তত্ত্ব কোনমতে ২৫, কোন মতে ১৬, কোন মতে ৭—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব ২, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থ, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তর ঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে।

"ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তঞ্চ"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধ বাক্যং)

"খর স্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাস্তে পৃথিবী ধাত্বাদয়শ্চত্বারঃ"

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণু সত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিন্য জন্মে। আপ্যধাতু স্নেহ স্বভাবাপন্ন তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল। "অন্যদপি স্বভাব্যমন্তরা শ্রুতেষাম্" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন ৪ প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্ম্মবত্তাদি অনেক প্রকার। এই ৪ প্রকার পরমাণু রাশির ন্যুনাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত

ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্ত পদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

"রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার সংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাশ্চিত্ত চৈত্তাত্মকাঃ"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধ বাক্য)

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপ স্কন্ধ বলে(বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিনাম এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

"অহ মহমিত্যালয় বিজ্ঞানং রূপস্কন্ধঃ"

আমি আমি, আমার আমার, এবং প্রকার অহং ভাবাপন্ন সর্ব্বদা উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহের নাম বিজ্ঞান স্কন্ধ। সুখ দুঃখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনা স্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদ ব্যবহার সম্পাদক নাম বিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞা স্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধ মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কার মাত্র)

"বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্ত মাত্মাচ অন্যচ্চত্বারস্কন্ধা শ্চৈত্ত'চ সকললোকযাত্রা নির্ব্বাহকাঃ"

উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যেটি বিজ্ঞান স্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর ৪ স্কন্ধের নাম চৈত্ত।

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও নাই। জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহাহইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"ত্রয়োদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বোধিচিত্ত বিবরণ)

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাব বিকার ৬, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা

"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনাতৃষ্ণোপাদানং ভবোজগতি জরামরণং শোকঃপরিবেদনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তাইত্যেবং জাতীয়কাইতরেতর হেতুকাঃ—(শঙ্করাচার্য্যধৃত বৌদ্ধ সূত্রম্)

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু ও ১০০ বৎসর ও ১০ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের অবিদ্যা (এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান। এই আলয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত তাপে সংহত করে তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ

নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নামরূপ শব্দে গর্ভস্থ সকল বুদ্‌বুদ্‌প অবস্থা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান ৪ ধাতু ও রূপ এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তিঅনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানা দেহোৎপত্তি। এতদূরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্দ্ধক্য (ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতু মাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহ ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহ জন্মে। এই অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে "হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্ম্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতদ্ভিন্ন মান অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকল গুলি পরস্পর পরস্পারের হইয়া হেতু সদ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এজগতে নাই। এই বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন	আর্য্যদর্শন (গৌতমাদি)
খর	কাঠিন্য
ধাতু	ভূত
হেতুক	প্রকার
প্রত্যয়	কারণ
আলয়বিজ্ঞান	গর্ভস্থজীবের প্রথম জ্ঞান
পুদ্‌গল	দেহ
প্রতীত্য প্রতীয়হেতুক	কার্য্য
ভাব উৎপাদ	উৎপত্তি
নিরোধ	ধ্বংস
প্রতিসংখ্যা নিরোধ	হনন
অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ	স্বয়ং বিনাশী
আবরণাভাব	আকাশ

সন্তানী	হেতুক ফলভাব
সন্নিশ্রয়	অধিকরণ
জীব	০
অজীব	ভোগ্য
আশ্রব	বিষয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বন্ধ	কর্ম্ম
মোক্ষ	কর্ম্মনাশ
অস্তিকায়	তত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়	যুক্তিরীতি
	ইত্যাদি

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্ন ত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থ ত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধ ঘোষ কহেন "এসকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্নত্রয়" সূত্র, নিয়ম, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে, পালিভাষার উহার নাম "তিপিটকম্।" ভিল্‌সাস্তূপ গ্রন্থকার কনিংহ্যাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্ম্মপিটক বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছিল, উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায় পালেয় বা পালী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষাগ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধবাক্য সকল সকনিরুক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে সুভূতিনামক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন ত্রিপিটক্ শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল তৎপরে অনুমান খৃষ্ট জন্মের ১০০ একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্ট গমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খৃঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থ

কথা সিংহল দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন এই সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্ম দেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে, সুত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পরিপূর্ণ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থ বিভাগ যথা।

বিনয় পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্‌গো, সুলবগ্‌গো, পরিবারপাঠো।

সুত্ত পিটকম্।

দীঘম্ব নিকেয়, মঝ্‌ঝি নিকেয়, সাযুত্ত, অঙ্গুত্তর নিকেয়, ক্ষুদ্দক নিকেয়,। শেষোক্ত গ্রন্থ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্ উদানম্ইতিবুত্তকম্ সুত্তনিপাত, বিমানবাথু, পেট বাথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসম্ভিদ মাগ্‌গ, আপাদানম্, বুদ্ধবংশ, চারিয়পিটকম্॥

অভিধর্ম্ম পিটকম্।

ধম্মসঙ্গনি,, বিভাঙ্গম, কথাবাথু, পুগ্‌গল পান্নত্তি ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্॥

নির্ব্বাণ কামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ২ জন্ম গ্রহণের কষ্টহইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে এক মাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণই কষ্টদায়ক। সাৎকার্য্য দ্বারা পুনর্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরমসুখ। বৌদ্ধ শাস্ত্রকহে—"জিঘ্‌ঘচা চরম রোগ সঙ্খার পরম দুখ। এতম্ সত্য যথা ভূতম্ নির্ব্বাণম্ পরমম্ সুখম্"। অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা রোগঅপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেই মত জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক কিন্তু এক মাত্র নির্ব্বাণই পরমসুখ। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক যথা দানশীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পারমিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে 'আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ২ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন কিন্তু সেটী ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপঙ্করাদিবুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎ, যেসকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শাক্য সিংহের মুখহইতে সহস্র২ বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ

ধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। একসময় "ওঁ মণি পদ্মেহুঁ" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধ-শিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন।*" আমরা সেই আর্য্য জাতি। এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞান বীজ-অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু সেদিন কোথায়! তেহি নো দিবসা গতাঃ" সেদিন গত হইয়াছে! আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চির কালের জন্য বিলীন হইয়াগিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিল সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্ত!—

শ্রীরামদাস সেন

* যোনধর্ম্ম রক্ষিত অল সেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমনকরিয়াছিলেন যথা মহাবংশ "যোনান গরল সন্দ যোণ মহাধম্ম রক্ষিতো"।।*।।—

প্রেম নিমজ্জন।

রম্য উপবনে রম্য জলাশয় ধারে
দেখিনু কে যেন এক রয়েছে বসিয়া
　　পাগলের মত বেশ
　　পাগলের মত কেশ
পাগলের মত কর ভূতলে পাতিয়া
একদৃষ্টে বারিপানে রয়েছে চাহিয়া।

　　কভু কাঁদে কভু হাসে
　　কভু বা করুণ ভাষে
অনুরাগে গলে যেন সম্ভাষি কাহারে
　　আপন মনের কথা—
　　আপন মরম ব্যথা—
কত মতে কত ভাবে জানায় তাহারে।

　　সহসা সে ভাব গত,
　　আবার পূর্ব্বের মত,
একদৃষ্টে বারিপানে চাহে হেরিবারে—
　　না জানি কি খনি-যোনি
　　অমূল্য রতন-মণি—
নাজানি কি বিধি-নিধি সেজল মাঝারে;—
না মিলে ডুবিলে যাহা সংসার পাথারে।

বিজন প্রদেশ সেই বিজন কানন!—
সকলি পাদপময়—অতি সুশোভন!—
　　বিটপে বিটপী নত,
　　তাহে পুষ্প নানা মত,
একটীও ফল কিন্তু না করে ধারণ

একটি মুকুল নাহি হয় কদাচন।
কেবলি কুসুম ফুটে,
কেবলি সুবাস ছুটে,
কেবলি ঝরিয়া পড়ে বনের রতন
কে করে গৌরব তার—কে করে যতন।
বসি পাখী ডালে ডালে
এক সুরে একতালে
মধুর করুণ কণ্ঠে গায় অনুক্ষণ
বিচিত্র বিহঙ্গ তারা বন অভরণ!—
বন ছাড়ি নাহি যায়,
বনেতেই সুখ পায়,
বনের বরণ পাখী বনের মতন,
সেই তার সুখ-ধাম—সেই নিকেতন।
তথায় সমীর অতি করুণ নিস্বন।—
অবিরত কাঁপাইছে তরুলতা গণ;—
অবিরত বহিতেছে,
সুসৌরভে ভরিতেছে,
শুষ্কপত্র উড়াতেছে,—
অবিরত নাচাতেছে তড়াগ-জীবন;—
জলজসুন্দরীদলে দিয়া আলিঙ্গন।
জলের শবদ তথা,
বিহঙ্গ অস্ফুট কথা,
সমীর নিস্বন যথা—
নহে ত স্বতন্ত্র কেহ শুনায় কথন,—
এক শব্দে পরিনত—চিত বিমোহন!
রম্য উপবনে এই জলাশয় ধারে
দেখিনু রয়েছে যুবা একাকী বসিয়া;—
স্থিরভাবে নত শিরে,
একদৃষ্টে দেখে নীরে,—
জগত সংসার যেন জলে পাসরিয়া
পাগলের মত তথা রয়েছে বসিয়া।

বড়ই কৌতুক মনে জন্মিল তখন
জিজ্ঞাসিনু যুবাবরে করি সম্ভাষণ—
"কহ কে সুজন তুমি
"আসি এ বিজন ভূমি
"একাকী সরসী তীরে বসিয়া এমন
"একদৃষ্টে দেখিতেছ সরসী-জীবন?"
সুধাইনু বারম্বার,
তবু কথা নাহি তার,—
তবু না উত্তর মোরে করিল অর্পণ
ভাবিনু পাগল বুঝি হবে সেইজন।
তাই ভাবি পুনরায়
জিজ্ঞাসিনু ডাকি তায়
"কেন এ বিচিত্র ভাব করি বিলোকন?—
কেন এ নিরর্থ কার্য্যে মুগ্ধ তব মন?
অমনি ভ্রুকুটী করি
ধ্যান-ধর্ম্ম পরিহরি
রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ
দারুণ মনের ভাব জানায় আপন।
ক্ষণপরে পুনরায়
চিত্রিত পুত্তলি প্রায়
সরসী-সলিল ধ্যানে হইল মগন,—
আবার ভুলিল সব জগত-সৃজন।
ক্রমে মম কৌতূহল
হৈল অতি সুপ্রবল,—
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তারে কহিনু বচন;
অমনি গর্জ্জিয়া উঠি সরোষে সে জন
ধাইল আমার পানে,
অকারণ শত্রু জ্ঞানে;—
নিকটে আইল যবে করি আস্ফালন
করিনু তাহারে আমি মিষ্ট সম্ভাষণ,—

নহি তব রিপু আমি
আমি তব শুভকামী—
অমি তব অভিলাষ করিব পুরণ,—
কহ মোরে কিবা তব মানস মনন।
উচ্চ হাসি হাসি যুবা কহিল তখন
"তুমি মোর অভিলাষ করিবে পূরণ!—
"তুমি সে রতন দিবে?
"কহ কত মূল্য নিবে?
"কোন সিন্ধু মাঝে কহ তাহার জনন?—
"কাহার কিরীট পরে
সেরত্ন সুষমা ধরে,—
"কোন ভাগ্যবান্ ধনী-হৃদয়শোভন!
"সেরত্ন আকাশে জলে!—
"কিম্বা থাকে বন স্থলে?—
"অথবা অতল তলে লুকায় বদন!—
"কোন নিধি দিতে তুমি করেছ মনন?

* * * *

"গগন সাগরে পশি—
"তুলিয়া গগন শশী—
"কখন কি তুমি মম করে আনি দিবে!—
"এমনের সাধ তবু
"নারিবে পূরাতে কভু—
"এ বাসনানল তবু কভু না নিবিবে।
সেরত্ন নাহিক নভে,
"সেরত্ন নাহিক ভবে,
"সেরত্ন রতনাকরে নাহিক মিলিবে!—
"শুদ্ধ এ আঁখীর পাশে—
"ভুবন মোহিনী হাসে,—
"আর ওই জলাশয়ে বামারে হেরিবে।
"সেমণি জ্বলিছে যাই—
"জলাশয়ে শোভা তাই—,
তার অদর্শনে সব আঁধার হইবে!—
"কুমুদ কহ্লার যত
"রক্তপদ্ম শত শত
"আর এ সরজে নাহি কখন ফুটিবে
"আর না মরাল কুল কভু সন্তরিবে"।
"এত বলি ধরি করে
"লয়ে মোরে সরোবরে
কহিলেক, "ওই দেখ সরসী-বাসিনী!—
"ওই দেখ হাসে জলে,
"ওই যে কি কথা বলে
"ওই দেখ অশ্রু ধারা ফেলে বিষাদিনী—
বলিতে বলিতে তার
আঁখি জল আপনার
বেগেতে বহিল বক্ষে যেণ প্রবাহিনী;
বিষাদে ডুবিল চিত আঁধারে মেদিনী!
"কহ প্রিয়ে কিবা দুঃখ!—
"কেন আজি ম্লান মুখ?—
"কে ডুবালে সুখতরী বিষাদ সাগরে?
"যখনি যে ভাবে চাই;
"তখনি দেখিতে পাই;
"হাসির হিল্লোল সদা খেলে বিম্বাধরে!
"সে হাসি কোথায় আজি
"কোথা কুন্দ দন্ত রাজী—
"কিজ্বালা পশিল প্রিয়ে মরম ভিতরে?—
"কহ মোরে কৃপা করি
"এ দুঃখে কেমনে তরি,—
"কোন মন্ত্রে আনি তোমা হৃদয় উপরে?"
"জগত সংসার আমি করিনু ভ্রমণ—
"কোথা না পেলাম প্রিয়ে তব দরশন!
"তবে এ জীবন ভার
"কিকাজ বহিয়া আর

"আজি এই বারি মাঝে দিব বিসর্জ্জন"!
এত বলি যুবা জলে হইল পতন।

* * * *

কাঁপিল প্রকৃতি কায়া—
সুন্দর প্রকৃতি মায়া—
দেখিতে দেখিতে সব হইল স্বপন!—
বন শোভা লুকাইল,
জলাশয় শুকাইল,
মরু সম হ'ল সেই রম্য উপবন।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

নীতিকুসুমাঞ্জলি।

দ্বিতীয় অঞ্জলি।

১

কার্য্যকালে জানা যায় ভৃত্য-পরিচয়।
কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময়॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ উদয়ে।
ভার্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে॥

২

চক্ষুর বাহির হল্যে কার্য্য ক্ষয়কারী।
সম্মুখেতে কথা গুলি মধুমাখা ভারী॥
গরলেতে ভরা কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
হেন মিত্রে পরিহার করিবে সুধীর॥

৩

অকালে না মরে জীব, শত শরপাতে।
কাল প্রাপ্তে মরে, কুশ কণ্টক আঘাতে॥

৪

বহুগুণ সত্ত্বে এক দোষের কারণ।
নিমজ্জিত শশধর, কহেন যেজন॥
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয়।
দরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয়॥

৫

কৃতকর্ম্মে পুনরায় নাহিক করণ।
মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ।
সেইরূপ গত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক॥

৬

হেমাচল কিম্বা রজতাচল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত॥
প্রণমি মলয়াচলে, যাহার কৃপায়।
শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায়॥

৭

সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস॥

৮

যদি উচ্চ পদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীর॥

৯

উদার হৃদয়,　　সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
জ্বলদ্ অঙ্গার,　বিভূতি আকার,
ভস্মে যবে পরিণত॥

১০

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে।
কুসুম সুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তরে॥

১১

শীলতাই সদ্গুণের শোভার ভবন।
যৌবনই যোষাদের ভূষণ শোভন॥

১২

জড়ের প্রভাবে পায় দুঃখ সাধুদলে।
চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে॥

১৩

কারু প্রতি কেহ হয়,　বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি দুঃখের আকর।
দিনকর নিজকরে,　কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ ম্লানকর॥

১৪

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান্।
সর্ব্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান॥
দেখ মণি শিরে, গলে, বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেও অপরূপ সাজে॥

১৫

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয়॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোকে করয়ে পূজন।
শুধু বড় জাতি নহে পূজার ভাজন॥
স্ফাটিকের পাত্র যবে চূরমার হয়।
পাঁচগণ্ডা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয়॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
দুরদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোময়,　কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর॥

১৮

যাতে সমুদ্ভব দোষ, তাতেই নিবারে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিস্ফোটক মারে॥

১৯

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান্ বলি তার কেন অভিমান॥
অঙ্গে ধরি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান,　বড় কভু কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান।
আরাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তুভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্॥

২১

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট, অধমেরা ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতার, বলি ভূতগণে॥

২২

পরান্নে জীবন,　করিতে যাপন,
বিরত মনস্বিচয়।
বায়স আবলী,　লুটে খায় বলি,
পিক তাহে রত নয়॥

২৩

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায়।
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায়॥

২৪

এই আত্মা কভু মর্ত্যে, কভু স্বর্গে যান।
শ্মশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্মশান॥

২৫

নিজাশয় যেপ্রকার, অপরের তদাকার,
জ্ঞান করে যত নরগণ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসী,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ॥

২৬

পণ্ডিত সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয়।
বিগতে তিমির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কভু রয়॥

২৭

দুর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাঁফর॥

২৮

স্বকার্য্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে
গাড়লের দেহ পুষ্ট করে॥

২৯

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়ান্তে নহে তাহা সে রসবিশিষ্ট॥
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সুন্দর।
যৌবন সময়ে কভু নহে মনোহর॥

৩০

সুলভ বস্তুতে কভু না থাকে আদর।
স্বদার তেজিয়া পরদারে মজে নর॥

৩১

যেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ।
কিম্বা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম্ম-ধন॥

৩২

রূপ, কুল, বিদ্যা, বল, যৌবন বিভব।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ব্ব অভিধান।
তদানন্দ মোহ মদ, মদিরা সমান॥

৩৩

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীরুতা বিষম।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম॥

৩৪

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায়॥

৩৫

তীব্রভয় দেখাইয়া মৃদুরূপে সাজা।
হেন যুক্ত* দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা॥

৩৬

করী জানে কেশরীর বল কতদূর।
সেবল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর॥

৩৭

বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ॥
বিদ্যা সুখভোগ প্রদা, যশোবিধায়িনী।
বিদ্যাই গুরুর গুরু, কল্যাণ দায়িনী॥

* যুক্তিবিশিষ্ট।

বিদ্যা হন বন্ধুজন বিদেশ গমনে।
পূজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি সদনে॥
পরম দেবতা বিদ্যা, সর্ব্বধন সার।
বিদ্যাহীন যত নর পশুর আকার॥

৩৮

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।
গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল।
দুর্ব্বল সে বল কিসে জানিবেক বল॥
কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস।
সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স॥

৩৯

গুণগণ গুণীস্থানে গুণগণ রয়।
নিগুর্ণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয়॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ স্রোতসী।
সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি॥

৪০

কি আশ্চর্য্য সাধুগণে, দোষকেও গুণগণে,
দুর্জ্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
সাগরের লোণা জল, মিষ্ট করে মেঘ দল,
ক্ষীর পান করি ফণী বিষ বরিষয়॥

৪১

বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।
শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ॥
খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে॥

৪২

জ্ঞাতি ভাজ্য নহে, চোরে না করে হরণ।
দানে ক্ষয় হীন বিদ্যা রত্ন মহাধন॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায়।
পুষ্পরাজ* মণি বটে গন্ধ নাহি তায়॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর।
বিদ্যা আর ধন চিন্তা করিবেক নর॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
এই ভাবে ধর্ম্ম সাধে যত সুধিবর॥

৪৫

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল।
তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল॥
মাহুতে কদাচ করী মারিবারে পারে।
এই কথা গজঘণ্টা ঘোষে বারে বারে॥

৪৬

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয়॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে।
শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে॥

৪৭

কুলের কল্যাণে একজনে পরিহর।
গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর॥
জনপদহিতে গ্রাম করহ বর্জ্জন।
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ॥

৪৮

স্বজাতীয় বধে মানুষের বাড়ে রঙ্গ।
শিকরে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভুজঙ্গ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।
দুগ্ধের কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্ম্মহেতু নহে ভাই॥

* পোখরাজ হিন্দী।

৫০

মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ দলনে চতুর।
কিম্বা সিংহ বধে দক্ষ আছে কত দূর॥
কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন।
অশক্ত কন্দর্প দর্প করিতে দলন॥

৫১

যার নাম শুনা মাত্র,সন্তাপেতে দহে গাত্র,
দেখা মাত্র উন্মাদ বাড়য়।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়,
তাহারে দয়িতা* কেন কয়॥

৫২

তদবধি কৃতীদের হৃদয়কন্দরে।
বিমল বিবেক দীপ চারু প্রভাধরে॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালা গণ।
চঞ্চল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন॥

৫৩

শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত নিকর,
কেবল বচনে পটু।
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী রতিরঙ্গ,
কার্য্যকালে কিন্তু হটু॥
নীলাব্জ নয়না, জঘন শোভনা,
রসনা† মণিমণ্ডিত।
করে পরিহার, শকতি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত॥

৫৪

বিজাতীয় বাঞ্ছা কভু শোভিত না হয়।
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয়॥
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দূষণ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব্ব ভূষণ॥

* দয়াবতী।

† চন্দ্রহার।

চৈতন্য।

অষ্টম অধ্যায়।

গৃহে নামসংকীর্ত্তন।

চৈতন্য যে সময় পুরীবরের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র।

শিষ্যদিগের অনুরোধে চৈতন্যদেব গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইলেন। শচী পুত্রকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ তীর্থযাত্রার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্য আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। বর্ণন করিতে করিতে ঈশ্বরপুরীর নাম উল্লেখ করামাত্র ভাবসংসর্গ গুণে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হৃদয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সকলেই বিস্মিত হইলেন। কেহ ভাবিলেন বায়ুর কার্য্য। কেহ ভাবিলেন অপদেবতার দৃষ্টি। বৈষ্ণবগণ তখনই

বুঝিলেন, চৈতন্যের জীবনসম্বন্ধে একেবারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া তন্ময়ত্ব * প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে অশ্রুধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
এমন ইহারে কভু না দেখি যে আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে॥

প্রভু † বৈষ্ণবদিগকে আগামী কল্য শুক্লাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে সমাগত হইতে অনুরোধ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শুক্লাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে সমাগত হইলেন। শুক্লাম্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন, নিমাঞি পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই যারপর নাই প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে দ্বিজরাজ চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইয়া ভাগবতদিগকে একত্র সমাগত দেখিয়া প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু বলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দঘোষের নন্দন॥

বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রেম ও সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া মোহিত হইয়া প্রেমাবেশে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলী বিদায় হইলে, শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতে আসিল। তাহাদিগের মধ্যে যে যে শ্লোক উচ্চারণ করিল, চৈতন্য প্রেম-বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণপক্ষে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন।

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥
পরং ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মূর্ত্তিময়।
যে শব্দেতে যে বাখানে সেই সত্য হয়॥

চৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড পৃ ১২৮।

ক্ষণেক পরে চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, এবং প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন এজন্য লজ্জিত হইলেন। সে দিবস অধ্যাপনকার্য্য বন্ধ করিয়া সশিষ্যে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে আহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। শচী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! অদ্য কি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেছিলে?

চৈতন্য বলিলেন—মাত! অদ্য কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলাম মাতঃ ভাগবতে লিখিত আছে—

* বেদান্তসারে ইহাকেই জীবন্মুক্ত বা জীবিতাবস্থায় কর্ম্মজাল সূত্র হইতে মুক্ত বলে। বৈষ্ণবেরা বলেন ইহা প্রেম ভক্তিতে হয়, পক্ষান্তরে বেদান্তের মতে ইহা জ্ঞানে হয়।

† বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে আমরা চৈতন্যদেবকে প্রভু অথবা মহাপ্রভু বলিব।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশকথা-মহোৎসবা সুরেশ লোকোঽপি স বৈ ন সেব্যতাং॥
সদ্যঃ সদ্ভিঃপথিপুনঃ সিস্নোদর কৃতো-দ্যমৈঃ।
আস্থিতো মরমতে যজ্ঞুরেক বিংশতি পূর্ব্ববৎ॥
অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥

মাত! চণ্ডাল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে চণ্ডালত্ব ‡ অতিক্রম করে এবং বিপ্র কৃষ্ণনামবিহীন হইলে বিপ্রত্ব হারায়। কালচক্র কৃষ্ণ সেবকের নিকটে যায় না। কৃষ্ণসেবক কর্ম্মজাল-সূত্রজনিত পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণাতীত।* কৃষ্ণভক্তি বিহীন মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মফলে পুনর্ব্বার গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে; গর্ভে সপ্তম মাসে তাহার জ্ঞানোদয় হয় এবং তখন বৃথা দারাসুতের জন্য জীবনে পাপানুষ্ঠান করিয়াছে এজন্য অনুতাপ করে।† কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলেই মায়াতে সমুদয় বিস্মৃত হয়, পুনর্ব্বার কৃষ্ণ-বিহীন জীবন যাপন করিয়া গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে।‡

অতএব মাতঃ।

——ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।

চৈতন্যের মাতা ও শিষ্যবৃন্দ এইরূপ ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাদৃশ জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড প্রধান সময়েও ভক্তির পক্ষপাতী হইলেন। এবং অনতি দীর্ঘকালে চৈতন্যের আলয় এক নবীন বেশ ধারণ করিল। অনবরত বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন। কেহ বা ভাগবতাদি গ্রন্থ তাললয়যুক্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিতেছেন। কেহ বা হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। কেহ বা প্রেম-পুলকিত হৃদয়ে লোমাঞ্চিত শরীরে নৃত্য করিতেছেন।

এইরূপে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া হৃদয়ের আনন্দে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। চৈতন্য কৃষ্ণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সকল বস্তুতেই কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন, সকল কথা-

‡ "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ * *"
এইরূপ শাস্ত্রবাক্য চৈতন্য এতদ্দিনে জীবনে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

*চৈতন্যের এই বাক্য বেদান্ত বিরোধী বৈষ্ণবদিগের এই মূলমত ভাগবতমূলক। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন "ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে জ্ঞানমাত্র লইয়া ব্যস্ত, সে যে কৃষ্ট তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া তুষমাত্র গ্রহণ করে তাহার তুল্য।"

† এটী পৌরাণিক মত।
‡ চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড।

রই উত্তর কৃষ্ণ। শিষ্যগণ পাঠ লইতে আসিল, প্রভু প্রত্যেক শ্লোক ও কথার অর্থ কৃষ্ণপক্ষে ব্যাখ্যা করিলেন। তাহারা ভাবিল প্রভু বাতিকাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ প্রলাপোচ্চারণ করিতেছেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে সমবেত হইয়া পরম গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের* নিকট গমন করিয়া সমুদয় নিবেদন করিল।

গঙ্গাদাস অপরাহ্নে চৈতন্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, বৎস! অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভক্তিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা পণ্ডিত অথচ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তুমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ধভক্তিপরবশ হইয়াছ, অত্যল্প বয়সে ব্যাকরণ মাত্র সমাপ্ত করিয়া চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিলে। তোমার এক্ষণে জ্ঞানোপার্জ্জনের সময় যায় নাই, তুমি অধ্যয়ন কর। চৈতন্য তাঁহার ভর্ৎসনে ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "গুরুদেব! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অদ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জনে মনোভিনিবেশ করিব, দেখিব নবদ্বীপে কে আমার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে।"

চৈতন্য ক্রমাগত ২।৩ বার একথা বলিলেন। ইহার অর্থ কি? তিনি তরুণবয়স্ক। নবদ্বীপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমাজ। এক একজন আজন্ম বৃদ্ধকাল শাস্ত্রালোচনায় কাটাইয়াছেন। চৈতন্য কি সাহসে তাদৃশ পণ্ডিতগণের সহিত আপনাকে সমকক্ষ মনে করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইদানীং তিনি সত্য সত্যই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই সাহসে এরূপ অসমসাহসিক উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্ন-অন্ধ বিশ্বাসী লোক যখন কল্পনাবলে ধর্ম্মজগতে বিচরণ করে, তখন কল্পনা তাহাদিগের নিকট যে চিত্র আঁকে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে। চৈতন্যও হয় ত এইরূপ কল্পনাপরায়ণ হইয়া বলিয়াছিলেন "দেখিব নবদ্বীপে কে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করে।" কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সত্য সত্যই ঈশ্বর ধার্ম্মিক লোকদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করেন বা না করেন, তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে করিতে মনোবৃত্তি যেরূপ পরিচালিত হয়, তাহাতে অশেষ উন্নতি হয়।(১)

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইনি চৈতন্য দেবের শিক্ষক।

(১) সার আর্থর হেল্পস্ সংসারী লোক (Man of business) শীর্ষক প্রস্তাবে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিষম্বাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির রূপ ধারণ করে। সুমতি কুমতির কাজ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাই হউক,কুমতি হউক সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্ আমার পুরাতন কথা তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে, অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইলেন।

কেন যে এতকালের পর, তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা২ ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি—সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাকাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব,তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না,—আমি যেমন ঘটিয়াছে তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, এক বারেই বুঝিল যে মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখন তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে, এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবন ভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্ট-

দায়ক হইল। রোহিণী মনেং রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক সরলতার সহিত মৃত্যু কামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখিজনে মৃত্যু কামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, সে মরিতে চাহে না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে, মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবিদ্ধনে, অৰ্দ্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহই ইচ্ছাপূৰ্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অৰ্দ্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কল্প হইল—হরলালের বশীভূত হইয়া গোবিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সৰ্ব্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে পারে না—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক্ কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তির রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবে যে ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব অর্থলোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্টসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্যতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল

চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে। এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল।

হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়ন কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল। নিশীথ কালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইল খানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কী দ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বরবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে অর্দ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—হরির কৃপায় পথ সর্ব্বত্র মুক্ত। প্রবেশ কালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল, যে অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনাশব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, যে কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন, যে নাসিকা গর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার করা হয় না। রোহিণী মনে২ ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজি সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া উপাধানতল

হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে,দেরাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?" রোহিণী বলিল

"চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, একথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।"

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে "জাল" উইলখানি খণ্ডং করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

"হাঁ হাঁ ও কি ফাড়! দেখি দেখি।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিল কিন্তু তিনি চীৎকার করিতেং, রোহিণী সেই খণ্ডেং বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পুড়াইলে?"

রোহিণী, "একখানি কৃত্রিম উইল।"

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, "উইল! উইল! আমার উইল কোথায়?"

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে অপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত।"

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া, দেখিলেন একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চসমা বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি পোড়াইলে কি?"

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল? জাল উইল কে করিল! তুমি তাহা কোথা পাইলে?

রো। কে করিল তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানি-

লে যে দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে!

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃ। কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎ কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন,

"যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব তবে এ বিষয় সম্পত্তি এতকাল রক্ষা করিব কি প্রকারে! এজাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পর ধরা পড়িয়া, ভয়ে জাল উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিয়াছ? ঠিক কথা কি না?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে? তবে কি?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই। নহিলে এপ্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিসে দিবনা কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজি তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

বেদ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং তাহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র সংকলিত হইয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদমূলক। বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্ম্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বিগণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবেল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার যাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্দ্বারা তাহাকেই বেদ কহে। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই ৩ বেদের উল্লেখ আছে যথা—

অহে বুধ্নিয় মন্ত্রংমে গোপায়া য মৃষয়
স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি॥

ভগবান্ মনু কহেন—

অগ্নিবায়ু রবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।

দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধার্থ মৃগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং॥

অর্থাৎ—"তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্‌ বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।†

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল, যথা—

"তস্যৈতস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো থর্ব্বাঙ্গিরস ইত্যাদি"

অর্থাৎ

প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্‌, যজু, সাম, অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্‌, যজু, সাম, অথর্ব্ব চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা যথা পানিনি "ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্‌" এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

† পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মনু সংহিতা ১২ পৃষ্ঠা।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত, এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি প্রকার নাই। বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্য গুলি ঋক্‌, গদ্য ভাগ যজুঃ, ও গীত ভাগ সাম যথা—জৈমিনী সূত্র "তেষা মৃগয়ত্রার্থবশেনপাদব্যবস্থা" "গীতিষু সামাখ্যা" "শেষে যজুঃ শব্দঃ।" যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন২ অংশ লইয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ যাগ যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী "অথর্ব্বো দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূব" ইত্যাদি উপনিষৎ চর্চ্চা করিলে প্রতীত হইবেক।

জৈমিনী বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ নির্ম্মিত বলেন না. ঈশ্বর নির্ম্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনি মাত্র, তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপ বিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্ন ভেদে, মনুষ্যের বাক্‌ যন্ত্রের তারতম্যহেতু, শব্দ প্রকাশক সঙ্কেত ধ্বনি ভিন্ন২ প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল নুণ, আর

একজন ধ্বনি করিল ভূবণ—লক্ষ্য সকলেরই এক। একজন বলিল মাতর্, একজন বলিল মা, আর একজন বলিল "মাতারি," অপরে বলিল "মাদার," ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্ম্মে জৈমিনী মীমাংসার প্রমাণ পাদে কহিয়াছেন "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্যজ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ," (১ম পাদ ৫ সূত্র) এই সূত্র হইতে ইহার অনন্তর ৩১ সূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে শব্দ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। অপিচ উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায়, লৌকিক শব্দ অনেক বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোক কৃত সাঙ্কেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই। লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেন না পুরুষে ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, কেন না উহার সঙ্কেতকর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অনুমিতও হয় না। "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা (২৭ সূং") "অনিত্যা দর্শনাচ্চ" (২৮ সূং) সারস্বতং সূক্তং (অর্থাৎ সরস্বতী প্রণীত) কঠ শাখা—কঠ নামক ঋষি প্রণীত শাখা, এইরূপ পৈপ্পলাদক, মৌদ্গল, প্রভৃতি বেদভাগের বক্তা বিবেচনা এবং "ববর প্রাবাহণী রকাময়ত," "ঔদ্দালকি রকাময়ত," এই সকল ব্যক্তি ঘটিত আখ্যায়িকা দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্র দ্বারা বেদ, পুরুষনির্ম্মিত এবং বেদের বিষয় বিশেষ ও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া পরিশেষে "উক্তন্তু শব্দ পূর্ব্বত্বং (২৯) "আখ্যা প্রবচনাৎ" (৩০) ইত্যাদি সূত্রে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠঋষি উহা প্রথমে বা প্রাধান্য ক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সমাখ্যান হইয়াছে। সাংখ্যকার কপিল "নত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ" (৫ অ ৪১ সূ) এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া "ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য সম্ভবাৎ" (৫ অ ৪৬ সূ) এবং অন্যান্য বহুতর সূত্রদ্বারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে বেদ কোন পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা নির্ম্মাণ করে নাই, চিরকালই আছে—তবে কল্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম শরীরী হন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার জাগতিক পদার্থ ভাণ হয়, সেইরূপ বেদ তাঁহার ভাণ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ যেমন শ্বাস প্রশ্বাস উচ্চারণ করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, সেইরূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ

বলেন। গৌতম বলেন বেদ জন্য বটে কিন্তু তাহা প্রমাণ অযোগ্য নহে, কেন না ভ্রম প্রমাদাদি রহিত আপুরুষ ইহার বক্তা। "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎ প্রামাণ্যম্" এই সূত্রদ্বারা বেদের প্রামাণ্য পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। "মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ" গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বর প্রণীত বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিরও এই মত। আস্তিক আর্য্য গ্রন্থকার দিগের মতে আপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত স্বীকার করেন না।

এসকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক বৈদিক ঋষিগণই স্তোত্র প্রণেতা। তাঁহারাই আপনার অভীষ্ট সাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন যথা—" অর্থ পশ্যব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।" বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে২ ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশ রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূর্ব্বে তাহা এরূপ ছিল না। পরাশর নন্দন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কুরু পাণ্ডব দিগের যুদ্ধের পর সমুদায় বেদ সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষ্যকে চারি বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনীকে, এবং আঙ্গীরসী নামক অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে, শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে "পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্কল তাহা চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন এবং ইন্দ্র প্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভর্য্যাদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল্য, ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জাতকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাবল, ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক খানি বালখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভজ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল"† ঋগ্বেদ সংহিতার সাকল্য শাখা প্রচলিত।

† পণ্ডিতবর ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচ দৃষ্ট হয়। অন্যমতে ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অনুবাকে বিভক্ত,তাহাতে ১০০০ এক সহস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩৮২৬ পদ বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চরণ-ব্যূহ" গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এসময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকে ৫ টী করিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০ অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তিরীয় ও বাজসেনেয়ী সংহিতা কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাম্ব। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের শত পথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত, ও উহার ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

সামবেদ সংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রানায়ন। সাম বেদের ৮ খানি ব্রাহ্মণ আছে তাহার নাম যথা—প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশ, ষড় বিংশ, সাম বিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ, এবং সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ।—সায়নাচার্য্য এই ৮ খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় ১২ স্কন্ধে লিখিত আছে "অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুইভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শ সংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারিশিষ্য সৌক্লায়নি, ব্রহ্মাবলী,মোদোষ পিপ্পয়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক,ও জাজলি ইঁহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকশ্যাপ ও অঙ্গীরস প্রভৃতি সকলে অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।" † অথর্ব্ববেদের সৌনক শাখা মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার ২০ কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত

† শ্রীমদ্ভাগবত। ৺আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশের অনুবাদিত।

হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে বেদ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত বিরুদ্ধ বেদ ব্যাখ্যা বুধ মণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্ব্বেও বেদ শব্দের নিরুক্ত বর্ত্তমান ছিল,তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন যথা—"স্থূলোষ্টীবীর্ণরূপয়তি ন স্নেহয়তি—ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়তে ইতি শাক পুলিঃ —ঊর্ণনাভনামকো মুনির্জুহোতি ধাতো-রুৎপন্নো হোতৃশ বেদা মন্যতে" স্থূলোষ্টীবি, শাক পূর্ণি, ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাস্ক মুনির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা—প্রথমতঃ দেবতা দুই শ্রেণী—যাগাঙ্গ দেবতা এবং স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। স্তোত্র বা শস্ত্র † যাহার গুণ মাহাত্ম্যাদি বর্ণনা পূর্ব্বক প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। যজ্ঞ কালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা যাগাঙ্গ দেবতা। ঋক্ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম রূপ মাহাত্ম্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না শস্ত্রাঙ্গ না যাগাঙ্গ, কেবল পূজা বা উপাসনার অনুকল্পজ প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে তাহাতেই পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, † বায়ু, ইন্দ্র বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরুৎ, অগ্নি বিষোষ, (সুসমিদ্ধ, ইতীধ্ব, সমিদ্ধবাগ্নি, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইল, বহি দেবী, দ্বার, উজ্যসো, নক্তা,) দৈব্য, হোতৃযুগল, প্রচেতা দ্বয়, সরস্বতী, লাভারত্য, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পূষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্য বিশেষ) মরুদ্গণ, ব্রহ্মাণস্পতি, সোম, সদ সম্পতি, নারাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্যা, বিষ্ণু ‡ অপ, ইন্দ্রাণী,

† স্তোত্র এবং শস্ত্র উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ, যে গীতের উপযুক্ত মন্ত্র দ্বারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র আর যাহা গীতের অনুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শস্ত্র।

† "অগ্নির্বৈদেবা তস্যৈতানি নামানি —সর্ব্ব ইতি প্রাচ্য অচক্ষত-ভব ইতি যথা বাহিক পশূনাম্পতি রুদ্রোঽগ্নিরিতি তান্যস্যাসন্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সন্তাম্নাম্ ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।

‡ অতো দেবা অবন্তুনো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংসুরে। ঋক্‌বেদঃ ১ম মণ্ডলং। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতুর্ভুজ বিষ্ণু বুঝাইতেছে না। যাস্ক ঋষি ইহার অর্থ করিতেছেন "বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি

পৃথিবী, অশ্বায়ী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজাপতি, উলুখল, মুষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিধবন, উষঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, হিরণ্য স্তূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস, প্রস্কণ্ব, কণ্ব, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুৎস, প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অযুজোবৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ঋক্‌বেদের একটী স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইন্দ্র।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্ব্ব গুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাথায়
যাহাতে দেবের মানস ভুলায়,
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

২

এস ২ দেব ছাড়ি সুর পুর
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—

যথাঽহঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিধত্তে পদং নিধানং প।"

এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অদ্রি উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—করযোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস ২ ইন্দ্র এমর্ত্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমান পথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা দলে
বিস্ময় উৎফুল্ল লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় সুবর্ণ রথে।

৪

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্ন ব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধ দ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার—
(দেবের দুর্লভ অপূর্ব্ব ধন)
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান,
করিতেছি শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে স্মরণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
সুধা-সোম রস করিয়া পান।
জয়২ দেব বজ্রনাদ কর
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

কালিদাসের উপমা।

রঘুর পুত্র অজ, ঠিক পিতার মত হইলেন।

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিক মুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতোদীপইব প্রদীপাৎ॥

সেই উর্জ্জস্বল রূপ, বীর্য্যও সেই, নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ হইতে উৎপাদিত প্রদীপের ন্যায় কুমার পিতা হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন নহে।

ইন্দুমতী স্বয়ম্বরে, দৌবারিকী ইন্দুমতীকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে।

তাং সৈব বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা
রাজান্তরং রাজসুতাং নিনায়।
সমীরণোত্থেব তরঙ্গলেখা
পদ্মান্তরং মানসরাজহংসী॥

সেই বেত্র গ্রহণে নিযুক্তা (দৌবারিকী) ইন্দুমতীকে সমীরণে উত্থিত তরঙ্গলেখা যেমন মানস রাজ হংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায় তদ্রূপ অন্য রাজার কাছে লইয়া গেল।

সেবার সুনন্দা ইন্দুমতীকে অঙ্গেশ্বরের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্রুবিন্দূন
মুক্তফলস্থূলতমান্ স্তনেষু।
প্রত্যর্পিতাঃ শত্রুবিলাসিনীনা
মুন্মুচ্য সূত্রেণ বিনেব হারাঃ

ইনি শত্রুবিলাসিনীদিগের স্তনে মুক্তাফলবৎ স্থূলতম অশ্রুবিন্দু সকল পাতিত করিয়াছেন। যেন তাহাদের মুক্তাহার কাড়িয়া লইয়া সূত্রবিনা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে যে রাজার কাছে লইয়া যান, ইন্দুমতী তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া যান।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিম্বরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ॥

কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে রাজপথস্থিত প্রাসাদাবলীর নিকট দিয়া যাইলে তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দুমতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন।

রাত্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গস্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন ম্লান দেখায়, পতিম্বরা ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, সেই সেই রাজা তদ্রূপ বিবর্ণভাব ধারণ করিলেন।

পরে ইন্দুমতীর সহিত অজের পরিণয় হইলে, তাঁহারা অযোধ্যাগমন করিলেন। কালক্রমে ইন্দুমতীর মৃত্যু সময় উপস্থিত। রাজা অজ এবং রাজ্ঞী ইন্দুমতী পুষ্পোদ্যানে বিহার করিতেছিলেন। এমত কালে দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে বীণাযন্ত্রযোগে মহাদেবের স্তুতিগান ক-

করিতে গমন করিতেছিলেন। স্বর্গীয় কুসুমদামে তাঁহার বীণাযন্ত্র শোভিত ছিল। দৈবাৎ পবন চালিত হইয়া সেই দিব্য মালা বীণাহইতে স্খলিত হইয়া ইন্দুমতীর স্তনাগ্রভাগে পতিত হইল। সেই মাল্যাঘাতই ইন্দুমতীর মৃত্যুর কারণ হইল।

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়োঃ
স্তনয়ো স্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥

সুন্দর স্তন যুগলের ক্ষণমাত্র সখী সেই মালা দৃষ্ট করিয়া বিহ্বলা রাজমহিষী রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিমীলিত হইলেন।

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈল নিষেক বিন্দুনা
সহ দীপ্তার্চ্চি রুপৈতি মেদিনীং ॥

ইন্দুমতীর ইন্দ্রিয়চেষ্টাশূন্য শরীর পতিত হইল এবং স্বামীকেও পাতিত করিল। প্রদীপ্ত দীপশিখায় নিষিক্ত তৈলবিন্দু দীপ্তার্চ্চি সহিতই ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।

ইন্দুমতীর মৃতদেহ অজের ক্রোড়ে পতিত রহিয়াছে।

পতি রঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া
করণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং
মৃগলেখা মুষসীব চন্দ্রমা ॥

প্রাণবিনাশ হেতু ম্লান, ক্রোড়স্থিত সেই ইন্দুমতী কর্ত্তৃক অজ ঊষাকালে ম্লান মৃগচিহ্নধারী চন্দ্রেরন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অজ ইন্দুমতীজন্য বিলাপ করিতে ২ বলিতেছেন।

অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেক বিপত্তি রত্রমে
নলিনী পূর্ব্ব নিদর্শনং মতা ॥

অথবা প্রজানাশক কাল কোমল বস্তু হিংসাজন্য কোমল বস্তুই অবধারিত করিয়াছেন। হিমপাতে বিনশ্বর কমলই আমার পক্ষে ইহার প্রথমোদাহরণ।

অথবা মমভাগ্য বিপ্লবাৎ
দশনিঃ কল্পিত এষ বেধসা।
যদনেন তরুর্ণপাতিতঃ
ক্ষপিতা তদ্বিটপাশ্রয়ালতা ॥

কিম্বা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধাতা এই পুষ্পমালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়াছেন। যে হেতু এই বজ্রদ্বারা আশ্রয় বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা লতা বিনষ্টা হইল।

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাং।
নিশি সুপ্ত মিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তর ষট্পদস্বনং ॥

বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর গুঞ্জনরহিত একটী পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

ক্রমশঃ

বেদ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শব্দই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শব্দের অর্থ সহস্রাক্ষাদি যুক্ত কোন জীব নাই। যাগ কালের দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্য ভূত দেবতার "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র মাত্র। মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে। "ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে। ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমনকালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার অন্যত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান থাকা উচিত কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক। "বজ্র হস্তো পুরন্দরঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য সকল স্তুতিবাক্য মাত্র। জৈমিনি এইরূপ দেবতা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা ‡ পার্ব্বতীয় লতা বিশেষ। সামবেদীয় ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোম যাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয় তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত

‡ Asclepias acida.

বিদ্যাবিশারদ হৌগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক লিখিয়াছেন † কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে লিখিত আছে সোম-লতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্ষজনক যথা ঋগ্বেদ—"যৎসালোঃ সালু মারুহৎভূর্য্যা স্পষ্ট কর্ত্বং। তদিন্দ্রোহর্থং চেততি যূথেন বৃষ্টি রেজতি।"

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্ব্বতশিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়। ইন্দ্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।

"প্রবো ম্রিয়ন্ত ইদং বোমৎসয়া মাদ-
য়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মূষদঃ।" (১ম, ২৬ ব, ৪
অনুবাক ১৪ সূক্ত)

হে ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে সোম সম্পাদন করা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিন্দু২ করিয়া নিষ্কাসিত, অতি মধুর এবং চমূ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ "অশ্বিনৌ পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনী কুমার মধু মাধুর্য্য গুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্ব্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা আছে, বিশেষ ১৯ বর্গ সোমসূক্ত নামক ঋক্ সমূহে, সোমের মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও গাঢ় যথা "সন্তে পয়াংসি সমুচন্তু বাজা" অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ব্বোক্ত গুণ যুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণ সম্বন্ধে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে "রাজ্ঞোনুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পতিবং তব সোম ধাম—" অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে এই মাত্র অনুভব হইতেছে যে সোমের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র। সোমলতার আকার পূতিকা † (পুঁই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার সম্ভাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে পূতিকা লতার বিধান আছে—"সাদৃশ্যে প্রতিনিধিঃ" শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্তন্তরের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন। সোমাভাবে পূতিকা বিধি যথা—

"সোমাভাবে পূতিকানভিষুনুয়াৎ"
(শ্রুতিঃ)

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সোমাভাব স্থলে পূতিকা বিধানের অনেক বাক্য আছে।

সোমতন্ত অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা যথা—

আপ্যায় স্বমন্দিতম সোম বিশ্বেভিবংশুভিঃ।
ভরানঃ সুশ্রু বস্তমঃ সথাবৃষে।
(১৪ অ. ১৯ সূক্ত)

† Ait. Br. vol. II, p. 4?9.

† Guilandina Bonduc.

অর্থাৎ অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদায় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টি-কারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে যথা—

"গয়স্ফানো অমিহা বসুবিৎপুষ্টিবর্দ্ধনঃ" (১৪ অ, ৯১ সূ)

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধি কারী, রোগ সমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্য কালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষত্বং রজিষ্য মনুনেষি পথাং"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাসন করা হইত। ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্ম নির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋগ্বেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজা-দিগের নাম পাওয়া যায় যথা "মনুষ্য দগ্নে অঙ্গিরস্বদাঙ্গিয়ো যযাতি বৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুভে।"

বেদের সংহিতা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায়; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদানুচারী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলে অনির্ব্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধেয় বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১) পার্থিব অবস্থা (২) জীবপ্রকৃতি (৩) তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি (৪) ইহার স্পষ্টতার জন্যে ৪টী কালেরও উল্লেখ হউক—বৈদিক কাল (১) আর্যকাল (২) আচার্য্যকাল (৩) পরাভূত কাল (৪) যে কালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য।

* "ঋচঃ সামানি চ্ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ" অথর্ব্ব বেদ।

আর্ষকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ষকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূত-কাল, বর্ত্তমান কাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই ৪টী কালের সহিত উপরোক্ত ৪টী বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কিনা? অনুসন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতারা কিম্বা আর্য্যেরা যাহাকে "গৌ" বলিতেন; তৎকালে অস্থরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী" "গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শক্রদিগকে "হে অরয়!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অস্থরেরা "হে লয়" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অস্থর, তাহারাই মধ্য কালের ম্লেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "চোদিতন্তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ম্লেচ্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও যজ্ঞ কার্য্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আস্থরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছ বাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেক গুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ব্বকালের অস্থরেরা বা ম্লেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে "পিক," নামকে ও অর্দ্ধ ভাগকে "নেম," পদ্মকে "তাম রস" বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অস্থর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্দৃষ্টে ম্লেচ্ছ ও অস্থর একপ্রকার অবস্থাম্বিত বলিতে হইবে। তবে "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায় সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, "তেঽস্থরাহেলয় হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূব তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিত বৈ নাপভাষিত বৈ ম্লেচ্ছোঽহবা যদেষ অপশব্দঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অস্থর, তাহারাই ম্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। "না যজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ" ইত্যাদি মন্ত্র কাণ্ডে ও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ী-

ভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান কালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দদ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধ ঘটনা এক্ষণকার রীতি বহির্ভূত। মনে করুন—"সত্যং তেষা অমবন্ত ধম্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহ কৃন্বন্ত বাতাং।" (ঋগ্বেদের ১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠ মাত্রে বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না, না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। "সত্যং" এই শব্দটী আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধিতু+এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে "ত্বিষ্" শব্দের ব্যবহার করি—তেমনি স্থলে "ত্বেষা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ, শব্দই। "অম বন্তঃ" অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটী বলের একটী নাম, তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধম্বঞ্চিদা" "ধম্বন্" মরুভূমি "চিৎ" প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু "চিদা" এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত "অবাতাং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমন্তাৎ। এইরূপ অর্থ হইবে। ইত্যাদি পূর্ব্বে ব্যাকরণে ছিল না।

"বৃহস্পতি রিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতি পদোক্তানাং শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচনান্তং জগাম।" এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে চীন দেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশল সম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই ৪ জাতি শব্দ। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোঽস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো বার বীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ।" শব্দ সমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলিকে উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই ৪ প্রকার

পদসমূহ ঐ বৃষের শৃঙ্গ। ৩টী কাল তাহার পদ। সুপ ও তিঙ তাহার মস্তক। ৭টী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দ কার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা নানা প্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্ত গ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষ গ্রন্থ, এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পূর্ব্বে "বৃহদুৎপলিনী" "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষ গ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিন্যাদি সম্পূর্ণ আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম ২৮ সংগ্রামের নাম ৪৬ অপত্যের নাম ১৫, বাক্যের নাম ৫৭ ধনের নাম ২৮ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যাবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম ১০ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর নাম ৫০টী ছিল এখন ৫টীও নাই, এতদূর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি ম্লেচ্ছ শব্দ সাধারণে চলিত আছে। ম্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি ইংরাজী, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিদুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল ম্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে যেরূপ আর্য্য শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এই রূপ অর্থ দাঁড়ায় যে ম্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই ম্লেচ্ছ ভাষা। ম্লেচ্ছ ভাষাসম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্য বশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্যয় বশতঃ কোথাও বা বর্ণ লোপ বশতঃ—স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিকৃত হইয়া ম্লেচ্ছ ভাষা নামে প্রচলিত হইয়া যায়। কাম্বশত পথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার ভূরি২ প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন,

তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর ম্লেচ্ছদিগের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন। কাম্ব শত পথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়া মিষ্টকামুপধাস্যে"—তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অসুরেরা উত্তর করিল "উপহি" এটী উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত কিন্তু বর্ণ লোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ "তেঽসুরা হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ" এস্থলে "হেলয়" এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্য্যেরা "তঽঅবয়ঃ" প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী ম্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিককাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। বিভিন্ন২ সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হৌগ সাহেব অনুমান করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ ভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত, এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন, পরে ক্রমে উহা পুত্র পৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময় "তরমুজের বোঁটা সম টীকিশোভে শিরে" ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এই শাস্ত্রীয় টীকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন২ প্রকার শিখা রাখার পদ্ধতি ছিল যথা—

দক্ষিণ কপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রি
কপর্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ
শিখিনোঽন্যে॥

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত যথা—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন "নসমাবৃত্তাবপেয়ু বন্যএ বীহারাদিত্যোকে। অথাপি ব্রাহ্মণং এষ রিক্তোবাণপিহিতস্তস্যেব তদেব পিধানং যচ্ছিমো।" অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তি মস্তক আবরণ শূন্য হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণ স্থানীয়।

বৈদিককালের আর্য্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা কৃষিকার্য্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ

আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হইত; আদিম কালে অসুরেরা অসভ্যজাতি দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন২ সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আর্য্যজাতির ব্রীহি (ধান্য) যব, মাষকলাই তিল, ওষধি (শস্য) বীরুৎ (লতা) করম্ভ (ফল) ("ব্রীহি মথো যব মথো মাস মথোস্তিলং") প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল সময়ে২ তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্য ভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোম রস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরা বিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদ মধ্যে আর্য্যজাতির নানা প্রকার ব্যবসার উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকেই ব্যবসা কার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিম কালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন সত্য যুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপর ২০০ বৎসর কলিতে ১০০ বৎসর; এসকল কল্পনা মাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় পুরুষের আয়ু শত বৎসর—" ধন্তে শতাঙ্করা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ—" পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে—দেখা যায় আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন "জীবেমঃ শরদঃ শতম্,, অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন "দাতা শতং জীবতু,,—দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য তৎসম্বন্ধে এস্থলে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না।

শ্রীরাম দাস সেন।—

গঙ্গা স্তব।

ভাগীরথী উপকূলে,আছি গো সকল ভুল্যে,
ছাড়ি দেও মোরে কলিকাতা।
তোমায় স্মরণ হ'লে,অঙ্গ মোর জায় জ্বলে,
গঙ্গে তুমি নিস্তারিণী মাতা॥
পরমা প্রকৃতি তুমি,তোমা-কূল পুণ্য ভূমি,
পাপ যায় তোমা দরশনে।
ত্যজিব যখন প্রাণ, পাদপদ্মে দিও স্থান,
তোমা কূলে কি ভয় মরণে॥
লক্ষ্মী ত্যজিয়াছে বঙ্গে,তুমি ত্যজ নাই গঙ্গে
তুমি মাতঃ অগতির গতি।
সন্তান স্নেহের লাগি, দারুণ দুঃখের ভাগী,
বন্দি কৈল কলির ভূপতি॥

দোধারি তোমার কূলে,তরুরাজি হেলে দুলে,
দেবালয় শোভে জরাজীর্ণ।
ঘাটে ঘাটে দ্বিজগণ, তপ জপে নিমগন,
দুই সন্ধ্যা লোকে লোকাকীর্ণ॥
ঘারেক পশ্চাৎ ফিরি,ঘাটে নামে ধীরি ধীরি,
কুলবালা সলজ্জ বদনে।
স্নান করি কেশ ঝাড়ে,হেলায় হৃদয় কাড়ে,
আড়ে আড়ে চাহে কত জনে॥
চরণে হৃদয় দলি, যুবতী গেল ত চলি,
পদচিহ্ন রহিল যা পড়ি।
শত শত মনো অলি, বিরহ অনলে জ্বলি,
তাহে যায় খেদে গড়াগড়ি॥
কিকাণ্ড হতেছে পিছু,জানিতে যদি গো কিছু
কোন্ প্রাণে না চাহিতে ফিরি।
ভুরুরও ভঙ্গিমাটি, মরণ বাঁচন কাটি,
মৃদু হাসি বিষের মিছিরি॥
এসব থাকে না আর,কলে কলে একাকার,
হইয়াছে গঙ্গার দুধার।
গর্জ্জানি ফোঁসানি আর,কালো ধূম উদগার,
দশদিক্ করিল আঁধার॥
এই ত গঙ্গার কূলে, মহোচ্চ পাদপমূলে,
বসিয়াছি পূর্ব্বে এক কালে।
ও পারে জ্বলিল দীপ, যেন কনকের টিপ,
শৈলজার ভুরু অন্তরালে॥
সন্ধ্যা ঘুনাইয়া এল, নীল অম্বরের তেলো,
ঝিক্ মিক্ করিতে লাগিল।
কুটির যতেক তরী, সট্ সট্ সট্ করি,
অমনি চলিতে আরম্ভিল॥
সে যে শনিবার রাত্রি, যত কুটিয়াল যাত্রী,
ছয় দিনে যাপে ছয় বর্ষ।
পাইয়ে সুখের রাতি,বেড়েছে বুকের ছাতি,
ধরায় ধরে না আর হর্ষ॥

দিব্য তানমান ছাড়ি,সুখে যাইতেছে বাড়ি,
দাঁড় পড়ে ঝপাস্ ঝপাস্।
মনের বেগের কাছে,নৌকাবেগ কোথা আছে,
হাঁকে মাঝি "সাবাস সাবাস॥"

যাত্রীর গীত।

ওই যে দাঁড়ায়ে রাই তোমার শ্যাম চাঁদ। ওই সে অধরে হাসি মদন ব্যাধের ফাঁদ॥ আমাপানে কেন ফেরো, আপন সম্মুখে হের,প্রেমের বরিষা-নদে সাজে না লাজের বাঁধ॥ এমন নহে ত কালা, হাতে লয়ে ফুল-মালা আসিতেছে দেখ অই ঘটাইতে পরমাদ॥

ওদিকে মেঘের ঘটা, এ দিকে বিজলি ছটা মিলনে কি হয় শোভা দেখিতে গিয়াছে সাধ॥

এসকল গীত গানে, আর শুনিবনা কাণে,
ফুরায়েছে সুখের বসন্ত।
জিনিয়ে করাল কাল,এসেছে কলের কাল,
গীত-স্বরে পড়েছে হসন্ত॥
অমিত্র অক্ষর ছন্দ, রসের কপাট বন্ধ,
করিয়াছে কবিত্ব-কাননে।
অমিত্রের কষাঘাতে,গেল দেশ অধঃপাতে,
হাসি নাই ভাবের আননে॥
এতেক দুশ্চিন্তা যত, সকল করিব হত,
দুই বেলা গঙ্গাস্নান করি।
সেবিলে তোমায় গঙ্গে,বল পাই ক্ষীণ অঙ্গে,
মনোদুখ সকল পাসরি॥
তোমার সলিলে নাবি,পৃথিবীকে স্বর্গ ভাবি,
এমনি শীতল কর দেহ।
তোমার কূলেতে আমি,পোহাই দিবসযামী
দীন দ্বিজে এই ভিক্ষা দেহ॥

ভারতমহিলা।

চতুর্থ অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তম রূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর যাঁহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করেন নাই তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটী প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতি মধ্যে ঋষিরা উদাহরণ স্বরূপে একটীও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলি হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস;—পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরাণ অনেক পরের লেখা; পুরাণ রচনা সময়ে আর্য্যগণের সে তেজস্বিতা ও সে রূপ চরিত্রের ঔন্নত্য ছিল না। পুরাণ সূক্ষ্ম২ আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা ত দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর বৈশেষিক চারিত্র (Idiosyncrasy) ও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্কন্দপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগড়ম বাগড়ম লিখিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক এস্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্র নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরন্ধ্রী (মেট্রন) অধিক। কয়েকটী পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। পুরাণমতে স্ত্রীলোক, প্রকৃতির অংশ, সত্ত্বগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সাধ্বী

দিগের উৎপত্তি। রজোগুণাত্মিকা হইতে ভোগ্যাদিগের এবং তমোগুণাত্মিকা হইতে কুলটাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আমাদিগের বর্ণনীয় নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কতকগুলি প্রধানা প্রকৃতির* নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথা সৃষ্টি ক্ষমা প্রকৃতি অদিতি প্রভৃতির নামোল্লেখের পর নারায়ণ বলিতেছেন—

উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
কলাশ্চান্যাঃ সন্তি বহ্ব্যঃ তাসু কাশ্চিন্নিশাময়॥

১। রোহিণী চন্দ্রপত্নীচ
২। সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী।
৩। শতরূপা মনোর্ভার্য্যা
৪। বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী॥
৫। অহল্যা গোতমস্ত্রী চা
৬। প্যনুস্যুয়াত্রিকামিনী।
৭। দেবহূতি কর্দ্দমস্য
৮। প্রসূতী দক্ষকামিনী॥
৯। পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ।
১০। লোপামুদ্রা তথাহূতী ১১
১২। কুবেরকামিনী তথা॥
১৩। বরুণানী যমস্ত্রীচ ১৪
১৫। বলের্বিন্ধাবলীতিচ।
১৬। কুন্তী চ দময়ন্তী চ ১৭
১৮। যশোদা দেবকী তথা॥ ১৯
২০। গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা
২১। সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া। ২২
২৩। বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী
২৪। রাধামাতা কলাবতী॥
২৫। মন্দোদরী চ কৌশল্যা ২৬
২৭। সুভদ্রা কৈটভী তথা। ২৮
২৯। রেবতী সত্যভামা চ ৩০
৩১। কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা॥ ৩২
৩৩। জাম্ববতী নাগ্নজিতী ৩৪
৩৫। মিত্রবিন্দা তথাপরা।
৩৬। লক্ষ্মাচ রুক্মিণী ৩৭ সীতা
৩৮। স্বয়ং লক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতা॥
৩৯। কলা যোজন গন্ধাচ
৪০। ব্যাসমাতা মহাসতী।
৪১। বাণপুত্রী তথোষাচ
৪২। চিত্রলেখা চ তৎসখী॥
৪৩। প্রভাবতী ভানুমতী ৪৪
৪৫। তথা মায়াবতী সতী।
৪৬। রেণুকা চ ভৃগোর্ম্মাতা
৪৭। হলিমাতাচ রোহিণী॥

উপরি উক্ত গণনায় সকল সাধ্বী দিগের নামোল্লেখ নাই কারণ শ্রীবৎস পত্নী চিন্তা, শকুন্তলা, ও বালীরাজমহিষী তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোন ইতর বিশেষ নাই। এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইহাদের সক-

* ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায়।

(১) কালিকাপুরাণ (২) বিষ্ণুপুরাণ (৩) শ্রীমদ্ভাগবত (৪) কালিকাপুরাণ ও রামায়ণ (৫) (৬) রামায়ণ (৭) ভাগবত (৮) (৯) কালিকাপুরাণ (১০) কাশীখণ্ড (১১) মহাভারত (১২) রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড (১৫) ভাগবত ও রামায়ণ (১৬). (১৭) মহাভারত।

লের চরিত্র বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইঁহাদের কয়েক জনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারি জনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

অহল্যা। গোতমের পত্নী অহল্যা। তিনি পতিপ্রাণা ও সকল বিষয়ে পতি নিদেশানুগামিনী ছিলেন। ইনি যেরূপে ইন্দ্রের প্রলোভনে পতিত হয়েন তাহা আমাদিগের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। গোতম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ বর্ণনা করিলেন। গোতম বহুকাল উঁহাকে কষ্ট দিয়া পরে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কারের পর উঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উহাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন কি আশ্চর্য্য প্রাতঃকালে যে কয়েকটী স্ত্রী লোকের নাম করিতে হয় সকল কয়েকটিই ব্যভিচারিণী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝিবার ভুল! পুরাণ কর্ত্তাদিগের ন্যায় বাঁধা বাঁধি করিতে গেলে সব আল্‌গা হইয়া পড়ে। মনুষ্য-স্বভাব দুর্ব্বল, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া একটী দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া একেবারে তাঁহার রাশীকৃত সদ্গুণ বিস্মৃত হওয়া কি ন্যায়ানুগত কার্য্য? বিশেষতঃ অহল্যাদির দোষোদ্ধারের পর তাঁহারা অতি সাধু আচারে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম করিলে এইমাত্র বোধ হয় যে যদি মন বিশুদ্ধ থাকে কোন কারণ বশতঃ পাপে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার সম্ভাবনা আছে। কেহ বুঝিতে না পারিয়া অথবা হঠাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া উৎপীড়ন করিলে তাহার পাপ প্রবৃত্তি দৃঢ়ীভূত করা হয় মাত্র।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রী লোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডীয় লোপামুদ্রা চরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা এই উপাখ্যানটী সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন "হে মুনে তোমার তপোলক্ষ্মী আছে—তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। ইঁহার কথা অন্যকে পবিত্র করে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনুসূয়া, সাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা, লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে এমন আর কাহারও নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদ্রা-

গত হইলে নিদ্রাগতা হয়েন এবং তোমার অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে তোমার আয়ু হ্রাস হয় এই ভয়ে কখন তোমার নাম তিনি গ্রহণ করেন না; পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন না। তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি চীৎকার করেন না। তাড়না করিলে বরং প্রসন্না হন। এই কর্ম্ম কর বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, স্বামিন্ ক্ষমা কর বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন, নাথ! কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন। দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্ব্বদা দ্বারে গমন করেন না তুমি আজ্ঞা না করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি বলিবার অগ্রে সমস্ত পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্ন ভাবে অতি হৃষ্ট হইয়া যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। দেবতা অতিথি পরিবারবর্গ গো ও ভিক্ষুগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন না। সর্ব্বদা তৈজস পত্র পরিষ্কার রাখেন। সকল কর্ম্মেই দক্ষা। সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়পরাঙ্মুখী। তোমাকে না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতাচরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞাব্যতীত সমাজ ও উৎসব দর্শন ইনি দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। বিবাহ প্রেক্ষণাদি এবং তীর্থ যাত্রাদিতে তোমার অনুমতি বিনা প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন করিয়া থাক বা ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি তোমাকে কিছু বলেন না। স্ত্রীধর্ম্মিণী হইয়া ত্রিরাত্রি স্বামীকে আপন মুখ দেখান না এবং যাবৎ স্নান করিয়া না শুদ্ধ হয়েন তাবৎ আপনার বাক্যও শ্রবণ করান না। (মূলে অনেক ক্ষণ হইতে আর লটের ব্যবহার নাই এক্ষণে বিধিলিঙেব ব্যবহার উঠিয়াছে। ক্রমে লোপামুদ্রার সকল কথাই লোপ হইয়া যাইবে স্ত্রীচরিত্রের নিয়ম উঠিবে। সহমরণের প্রশংসা উঠিবে। এইরূপে এক কথা কহিতে২ অন্য কথা উত্থাপন করা পুরাণ রচনার এক মহদ্দোষ। কবি গায়কেরাও এইরূপ এক কথা কহিতে২ অন্য কথা পাড়িয়া ফেলে।) স্নান করিবার পর ভর্তৃবদন মাত্র দর্শন করিবে আর কাহারও মুখ দেখিবে না। যদি স্বামী নিকটে না থাকেন মনে২ তাঁহারই ধ্যান করিবে। পতিব্রতা নারী হরিদ্রা কুঙ্কুম সিন্দুরাদি মাঙ্গল্য আভরণ কখন ত্যাগ করিবে না করিলে স্বামীর আয়ু হ্রাস হইবে। রজকী হেতুকী আশ্রমত্যাগিনীর সহিত সাধ্বী কখন বন্ধুতা করিবে না। যে স্বামীর দ্বেষ করে তাহার মুখদর্শন করিতে নাই। কোন স্থানে একাকিনী থাকিতে

নাই। নগ্ন হইয়া কোথাও স্নান করিতে নাই। উদূখল মূষল বর্ষণী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট স্ত্রীলোক সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা সে সকল স্থলে সাধ্বীর উপবেশন করিতে নাই। স্বামীর সহিত প্রগল্‌ভতা করিতে নাই। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি সেই সেই দ্রব্যেই সর্ব্বদা প্রেমবতী হইবেন। স্ত্রীলোকদিগের এই এক যজ্ঞ এই এক ব্রত এবং এই এক দেবপূজা যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী ক্লীব হউন দুরবস্থ হউন ব্যাধিত হউন বৃদ্ধ হউন সুস্থিত হউন বা দুঃস্থিত হউন তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হইবেন বিষণ্ণ হইলে বিষণ্ণ হইবেন। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপ হইবেন। ঘৃত লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে নাই এরূপ বলিবে না। এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থস্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন তিনি স্বামীর আয়ুর্নাশ করেন এবং মরিয়া নরক গমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিতা হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুক্কুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শৃগালী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম যে স্বামীর চরণ সেবা করিয়া আহার করিবে। কখন উচ্চ আসনে বসিবে না পরের বাটী যাইবে না লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারও অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গোপনে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে সে বৃক্ষকোটর বাসিনী উলূকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে তাড়িত হইয়া স্বয়ং তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয়।" এইরূপ নানা প্রকার শাস্তি ও রূপান্তর বর্ণনা করিয়া পরে মুনি আবার আরম্ভ করিতেছেন, "দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ত্বরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন তাম্বূল ব্যজন পাদসংবাহনা ও চাটু বচন দ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে সেই ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছে। পিতা অল্প পরিমাণে দেন ভ্রাতাও অল্প পরিমাণে দেন পুত্রও অল্প পরিমাণে দেন স্বামী যাহা দেন তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয় স্বামিহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল। বিধবাকে দেখিলে কখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মাতা ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্ব্বাদ আশীবিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" ইহার পর বিধবার নিন্দা সহমরণের প্রশংসা ও হৃদয় বিদারিণী বৈধব্য যন্ত্রণার

বর্ণনা। তাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ "গৃহেং কি রূপলাবণ্যসম্পন্না গর্ব্বিতা রমণী নাই? তথাপি কেবল বিশ্বেশ্বরে ভক্তি থাকিলেই পতিব্রতা নারী লাভ হয় যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী আছে সেই গৃহস্থ।" ইত্যাদি।

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনী গণের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গতা এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্প গুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা। কিন্তু তিনিই আদর্শ (Type) তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শব্দটী যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকটি ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ যশস্বিনী লোপামুদ্রার বিশেষণ।

এস্থলে পুরাণ ও স্মৃতিকথিত স্ত্রীলোকের চরিত্রগত ভেদ প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতি, যত পারেন, অধিক গুণ থাকিলেই প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণ গুণ অধিক চান না। একটী বা দুইটী গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকিলেই প্রশংসা করেন। স্মৃতি অনেক দূর ক্ষমা করেন। পুরাণ দুর্ব্বাসা মুনি, তাঁহার ক্ষমা নাই। যদি একটুকু ব্যত্যয় হইল, যদি একদিন রাগ করিয়া স্বামীকে মুখ করিলেন অমনি তাঁহার সহস্র গুণ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পুণ্যের বলে যদি গ্রামে জন্মিলেন কুক্কুরী হইলেন। না হয় ত শৃগালী হইলেন। পুরাণের বাঁধাবাঁধি অনেক অধিক। সামাজিক অবস্থাগত যে কত প্রভেদ তাহা এই কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবরোধ প্রায়ই মুসলমানদিগের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের স্বামীর সখিত্ব আর নাই এখন কেবল মাত্র দাসীত্ব হইয়াছে।

মহাভারতীয় শকুন্তলা।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন স্ত্রীচরিত্রের একটী উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচবৎসর সহ্য করিয়া তাহার পর সন্তান ক্রোড়ে রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন কিন্তু দুষ্টতা করিয়া কহিলেন তুই কুলটা আমি তোকে কথন চিনি না। শকুন্তলা তখন রাজাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে! শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতক গুলি দোষ দেখাইয়াদিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে

সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও রামায়ণে সাধ্বীস্ত্রীগণের এরূপ অপূর্ব্ব সাহস দেখা যায় যে তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা সকলেই সাহস সহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং দুষ্ট লোক দিগকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দূষণাবহ নহে বরং ইহাকে একটী গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপ স্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ও রূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পাতিব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটী অধ্যায় আছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। পতিব্রতোপাখ্যান দেখ।

সাবিত্রী। এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধানা রমণীর চরিত্রবর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। ইনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজা অশ্ব পতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা দেখিয়া বলিলেন, সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি যাহাকে আপন পতিত্বে বরণ করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এই রূপেই অনেক রমণী অভিলষিত পতিলাভ করিয়াছে। সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে তপোবন মধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্যুমৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতেবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনে২ স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন তোমার কন্যা সত্যবান্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মনন করিয়াছে। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে তুমি সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি অন্বেষণ কর। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী বলিলেন।

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণোনির্গুণোঽথবা।
সকৃদ্বৃতো ময়াভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎসকৃৎ॥

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধ শ্বশুরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপরা হইলেন। এবং নিরন্তর

দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্ব্বদা প্রার্থনা হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃতা হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফল মূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পর্য্যটন করিলেন। সায়ংকালে সত্যবান্ ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফলরক্ষা কর। আমি তোমার ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী সেই শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূত দিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন সাবিত্রি তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে। তুমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গ শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নির্ভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অনুবর্ত্তন করিতেছ ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র। তখন সাবিত্রী কহিলেন।

"শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো মে
যতো হি ভর্ত্তা মম সাগতির্ধ্রুবং।
যতঃ পতিং নেষ্যতি তত্র মে গতিঃ সুরেশ"

কিয়দ্দূরে যমরাজ বলিলেন তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা কর। যদি কোন পৌরাণিক সাবিত্রী চরিত্র লিখিতে বসিতেন তিনি বলিতেন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। এবং সাবিত্রীকে আর খানিক কাঁদাইতেন কিন্তু সাবিত্রী পৌরাণিকদিগের বর্ণনার অতীত পদার্থ। তিনি বলিলেন যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয় করুন। যমরাজ তথাস্তু বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য প্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন।

সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন তুমি বাটী ফিরিয়া যাও সেখানে তুমি রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ। সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায় আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন আমার স্থিরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।

ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবং
ন ভর্ত্তৃহীনং ব্যবসামি জীবিতং ॥

তখন যমরাজ জানিলেন সাবিত্রী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া উঁহার স্বামীর জীবন উঁহাকে অর্পণ করিলেন (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ কর্ত্তা এই সুযোগে সাবিত্রীকে ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর অবতার বলিয়া লইয়াছেন এবং বিষ্ণুমন্ত্র প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সাবিত্রীর অবতার জানিয়া উঁহাকে মুক্তির প্রধান উপায় বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করেন।) সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান্ জীবনপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন উঃ অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। এই বলিয়া সত্বর পদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া হর্ষদ্বিগুণিত বেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস এই উপাখ্যানটী মহাভারতীয় বনপর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সমুদয় প্রবন্ধটী অনুবাদ করিলাম না। সংক্ষেপে সংগ্রহ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু যে কেহ মহর্ষির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন উহা অনুবাদ করিতে পারা যায় না এবং সংগ্রহ করিতে গেলে উহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। যে সকল স্থানে হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত হইতেছে তাহা অনুবাদ করিতে পারিলাম না মহর্ষির বাক্যই উদ্ধার করিয়া দিলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীন কালের রমণীচরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা হইলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার এক জন সারথির সহিত বনে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান্ তখন একজন অন্ধ মুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিলনা যাহাতে রমণীর মন আকর্ষণ করে। কিন্তু

সাবিত্রী এন্ জেলিনার ন্যায় পবিত্রস্বভাবা ছিলেন এন্ জেলিনা বলিয়াছেন,

"In humble simplest habits clad
No wealth or power had he;
Wisdom and worth were all he had
And these were *all* to me."

একবার সত্যবান্‌কে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন শুনিলেন না। বলিলেন এসকল কাজ একবার ছাড়া দুই বার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া অন্ধ শ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা এক দিনের তরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু সর্ব্বদাই ইষ্ট দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা২ ঘটিল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যমরাজবর দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভ বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বামিবিয়োগে অধীর হইয়াছিলেন বটে,কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে প্রাকৃত রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতায় সহিত কার্য্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি এক বারও বিস্মৃত হয়েন নাই (পুরাণ মতে পরলোকেরও উপায় করিয়া লইয়াছিলেন) তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন তাহা হইলেও তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয় হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল। এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী একবৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করেন! কোন রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেহই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাত সময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে দৃঢ় নিশ্চয়া হইতে পারেন এবং কেহই বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন?

স্মৃতি সংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে সাবিত্রীর তাহা সকলি

ছিল। তাহার উপর উঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা সত্যনিষ্ঠতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাকে সীতা দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষায়ও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বভাবা তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নতচরিত্রা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্বভাবা কামিনীগণের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বলিয়া দিতে পারি না। মেকলে তাদৃশ কার্য্যকে জঘন্য কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Invidious office.) আমরাও তাহাই বলি। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলাম প্রথম শ্রেণীরও একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিব। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ছোট বড় বাছিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন।

সাবিত্রী চরিত্র বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না। সীতা দ্রৌপদী দময়ন্তী লইয়া কত কাব্য কত নাটক লেখা হইয়া গেল কিন্তু কেহই সাবিত্রী চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। বাল্মীকির পর সীতার চরিত্র বর্ণনে কেহই সম্যক্ কৃতকার্য্য হয়েন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না ইহা সীতাচরিত্রের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সাবিত্রীচরিত আরো অধিক প্রশংসনীয় হইবে। যে হেতুক কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র অনুকরণে আপনাকে সমর্থ বিবেচনা করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

তৃতীয় শেষোক্ত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রৌপদী দময়ন্তী ও সীতা সর্ব্বপ্রধান। শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূতা। ইঁহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামিশুশ্রূষা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমন করিল। শোকজর্জ্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন। এবং পরিশেষে আশ্রমে যাইয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করিলেন

এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাই-লেন এই দুই কারণেই তিনি আমা-দিগের দেশে আদরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহা-কে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপরি উক্ত দুইটী কার্য্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য বৈশুদ্ধ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও, যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর মত। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীমধ্যে একটি প্রশংসনীয়া কামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করি-লেন তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুরালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজসূয় যজ্ঞ হইল ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে সকলেই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্ঠি-রের দোষে রাজ্য গেল ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন। সভার মধ্যে দুরাত্মারা তাঁহার যারপর নাই অবমাননা করিল। এমন কি কেশাকর্ষণ করিল বস্ত্রহরণ করিল শেষে কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জ্জুনের আরও ভার্য্যা ছিল, ভীমের ছিল, সকলেই আপনং বাটী রহিল কেবল দ্রৌপদীই স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন। যুধিষ্ঠিরের সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন। সর্ব্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবসৌভাগ্যের সূত্র-পাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। এক দিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কি আর আছে? যদিও কোনরূপে অসহ্য বনবাস যন্ত্রণা সহ্য করিলেন তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে বিরাটরাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন

প্রধান উদ্যোগী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বভ্রুবাহন হস্তে অর্জ্জুনের বিনাশ হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া উঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহা প্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই স্বামীদিগের সমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন।

"দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। মাতৃ আজ্ঞায় তাঁহার পঞ্চ স্বামী হইয়াছিল। তিনি সেই পঞ্চস্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্য্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে২ বনে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক।"

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামিশুশ্রূষণে ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্ব্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কেকয়ীর গৃহহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন রাম তাঁহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারা যায় এবং তাহাদ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন,

"ন মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতুমর্হসি।
তপোবা যদিবারণ্যং স্বর্গোবা স্যাৎত্বয়াসহ॥
নচ মে ভবিতা কশ্চিত্তত্র পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠত স্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥
কুশকাশ শরেষীকা যেচ কণ্ঠকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিন সমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না তিনি উঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রূ শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপর খানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং

অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন, তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে২ নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্ব্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমন সময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীরাও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগাল স্বরূপ দাঁড়কাক স্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে তাঁহার পায়ে পড়িয়া তোষামোদ করে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে, সীতা কেবল বলেন,

রামোনাম সধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম॥

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল তুমি যদি আর বার মাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংস ভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,

ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং বন্ধ বা ঘাতয়স্বরা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি
রাক্ষস॥

হনূমান্ আসিয়া অশোকবন মধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন, রাবণ তাহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত ধরিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে ভয় দেখাইতেছে কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষস পুরী মধ্যেও ত্রিজটা ও শরমা নাম্নী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। হনূমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন তিনি হনূমানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন রামকে আপন মনের কথা বলিলেন।

তখন তাঁহার ভরসা হইল রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন সীতে আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল। এই সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশ স্বরে কহিলেন জানকি! আমার কর্ম্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর। সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন স্বামিন্ আপনি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলেন। আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি তোমার দূত হনূমান্ সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে।

নপ্রমাণীকৃতঃ পানির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিঞ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বন্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতং॥

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন বহ্নিপ্রবেশ সময়ে দেবতা ব্রাহ্মণ দিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন,

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃপাতু পাবকঃ।
যথামাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ
তথালোকস্য সাক্ষীমাং সর্ব্বতঃপাতুপাবকঃ।
কর্ম্মণামনসা বাচা যথানাভিচরাম্যহং
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং যথামাং পাতু পাবকঃ।

অগ্নি প্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য২ বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা বহুকাল রাজগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গ ক্রমে সভামধ্যে বলিল রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "তুমি আশ্রম গমন ব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস। লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতনা হইয়া রহিলেন পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, নিতান্ত নিরন্তর দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহসৃষ্টি হইয়াছিল আমি পূর্ব্বজন্মে যে কি

পাপ করিয়াছিলাম, কোন্ পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।”

পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষ্মণ তুমি আর্য্যপুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্মে অবহিত হইতে বলিও। এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং দুরপনেয় অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথিনী সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ব্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত। তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রণয় পূর্ব্ববৎই আছে কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ২ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী মাধবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার শোক দীন বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয় হৃদয়ে গভীর শোকসাগরের উদ্গূরণ হয়। তিনি বলিতে লাগিলেন,

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মিরামাৎপরংনচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন রামচন্দ্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতাল মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সর্ব্বপ্রধানা। সীতা সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল কোনকালে কোন নারী তাদৃশপ্রলোভনে পড়িয়াছিল ছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা ধরণীপতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার

জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবার তিনি বনে২ একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ কালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

তুলনা।

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তি বলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন তথাপি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বল্মীকি কোন স্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে শান্ত সুশীলা ও একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না এবং এমন কষ্ট নাই যে সীতা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রা বলিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতক গুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভার-

তবর্ষের অবস্থাগত নানা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে পৌরাণিক দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আর্য্যগণ বিলাসী হইয়াছেন কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীর্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম পালন করেন না তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের জন্য জেনানা মহল সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় রমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন কেবল দাসী মাত্র। রাজারা পূর্ব্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। কতকগুলি ভোগ্যা স্ত্রী তাঁহাদিগের অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দশকুমার চরিত পাঠ করিলে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত নাহয় মহাভারত বা রামায়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকল গুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা বিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। এই রূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রধান। দশকুমার চরিত এবং কাদম্বরীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যে গুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা ভিন্ন সময়ের লোক। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর। ঋষিপ্রণীত এবং কবিপ্রণীত গ্রন্থের রচনাগত কিরূপ প্রভেদ তাহা একজন সাহেব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

*** The Mahabharata tells the story in simple but vigorous and noble language. It is full of powerful discription of passion. The poet no where pays any undue attention to mere forms of words. His chief exertion is devoted to attract our sympathy to the qualities and passions which he describes. Refer for example to the deep pathos in the discription of the grief of Damayanti when abondoned by her husband in the solitude of the forest.

Instead of ennobling the affec-

tions and appealing to the tenderest and most sacred feelings of man the love which the poet describes (poet, one like shreeharasa) is earth born in a degree far exceeding the lasciviousness of some of the Roman poets.

যাহা হউক আমরা কাব্যগ্রন্থ হইতে কতকগুলি সাধুশীলা রমণীর চরিত্র বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে একটি বেশ্যা ও একটি পতিপ্রাণা রমণীর চরিত্র বর্ণনা আছে। উভয়েই চারুদত্তের প্রতি সমান প্রণয়বতী—উভয়ের চরিত্রই বিশুদ্ধ নির্ম্মল এবং উন্নত। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অবধি কত অত্যাচার সহ্য করিলেন কত প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন এবং শেষ একটা নরাধমের হস্তে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত গেল। তথাপি তাঁহার প্রণয় অবিচলিত। তিনি শুদ্ধ নিজেই প্রণয়বতী এমন নহেন যেখানে বিশুদ্ধ প্রণয় সেইখানেই তাঁহার প্রীতি। তিনি শর্ব্বিলকের প্রণয়িনী আপন দাসীর দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। আপনার কণ্টক স্বরূপ চারুদত্তের মহিষীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূরি২ প্রশংসা করিলেন। বেশ্যালোকের ওরূপ অবস্থা হইলে প্রায়ই তাহারা অত্যাচারী ও উদ্ধত হইয়া উঠে, কিন্তু বসন্তসেনা বরাবর আপনাকে বেশ্যা বলিয়া জানিতেন এবং ঘৃণা করিতেন, তিনি সাহসপূর্ব্বক চারুদত্তের বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন না বলিলেন সেখানে প্রণয়বতী ধর্ম্মপত্নীর অধিকার। চারুদত্তের ব্রাহ্মণীও স্বামীকে অন্যাসক্ত জানিয়াও তাহাতে অনুমাত্র দুঃখিত হইলেন না বরং যখন শুনিলেন চোরে বসন্তসেনার অলঙ্কার চারুদত্তের গৃহহইতে অপহরণ করিয়া লইয়াছে এবং চারুদত্ত "কথংন্যাসঃ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আপনার সমস্ত অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্বামী যখন মিথ্যা হত্যাপরাধে বধ্যস্থানে নীত হইলেন, তখন তাঁহার সহগামিনী হইলেন। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাবা কামিনী অতি বিরল।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, একজন সেনাপতি তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালের লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। পরে কোন দিন বিদূষকের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। সে আবার সভামধ্যে। মালবিকা গীতিচ্ছলে

এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা আপন মনের ভাব রাজাকে জানাইলেন। পরে গান্ধর্ব্ব বিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন না তিনি সুন্দরী নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। নৃত্য করিতে পারেন গান করিতে পারেন অভিনয় করিতে পারেন কৌশল পূর্ব্বক হাবভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি চতুরা ও প্রণয়িনী—তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন মহারাণীর বিরাগভাগিনী হইলেন তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাদৃশ সক্ষম নহেন তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায় কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্ত্তাদিগের লোপামুদ্রা ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরস্ত্রীদিগের লোপামুদ্রা বালিকাদিগের শিলা যুবতীদিগের সাবিত্রী এবং সর্ব্বাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে ও এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এ স্থলে বর্ণিত হইল।

ধারিণী রাজার মহিষী। তিনি যতক্ষণ পারিলেন ততক্ষণ মালবিকার সহিত রাজার যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন কিন্তু বিদূষকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন রাজার মন টলিবার নহে তখন তাঁহার মনে হইল পতিকে কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা নিজে কষ্ট পাওয়া ভাল। জঘন্যস্বভাবা ইরাবতীর অনুরোধে মালবিকাকে কষ্ট দিলেন কিন্তু অল্প দিন পরেই স্বয়ং বিবাহে উদ্যোগী। বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখীর সহিত ধারিণীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা সাবিত্রী শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থানপ্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও এক জন। মালতী মাধবের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইহার নাম কামন্দকী—ইহার সংসার কার্য্যচাতুর্য্য বুদ্ধিকৌশল শাস্ত্রজ্ঞান কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগ মালতী ও মাধবের প্রতি স্নেহ অলৌকিক। ইহার সাহস পুরুষের ন্যায় মনের জোর পুরুষের ন্যায়। ইনি দুই জন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহাদের সমতুল্যা। দুইজনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে

বিরাগিণী বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কৌষিকী এবং মালতী মাধবের কামন্দকী কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কৌষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী—তাঁহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্ব্বদা তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি, যতদিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই রাজকন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কৌষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ পণ্ডিত কৌষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ কামন্দকী তাহাতেও আবার কর্ম্মকুশল। তিনি আপন কার্য্যে অনুমাত্র অনাস্থা করেন না এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কৌষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহস সহকারে কাল কাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কৌষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই একশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই ঋষিদিগের সময়েও ছিল না। বৌদ্ধেরা মঠ সংস্থাপন করিলে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে তাড়িত হইয়া যখন চীন ও সিংহল আশ্রয় করিল তখন হিন্দুরাও মঠ করিতে শিখিয়াছেন এবং তথায়ও দুইএকটী ঈদৃশী সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা যাইত কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল পণ্ডিত কৌষিকীও বিরল।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণী কুলের বিভূষণ স্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্ব্বস্ব গেল তিনি দক্ষিণার জন্য আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তখনও শৈব্যা তাঁহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, "অজ্জ উত্তো মকৃখু অত্তস্তবো হোহি। তা পদীদ মংজ্জেব্ব ইমখিং কজ্জে আরোবেহি। অবচ্ছিমো দে দানিং পণয়ো।" এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন "কিনব কিনবমং অজ্জা পরপুরিস পজ্জুপাসনং পরুচ্ছিঁট্ট ভোজণ অ স্বাবিহরিয় সব্ব কম্ম কারিনীত্তি।" যখন এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন," "দিট্টিয়া অদ্ধাবশিট্ট পড়িন্নাভারো দানিং

অজ্জউত্তো কিদমস্মি।" আর্য্যপুত্রের ঋণের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জন্য যে দাসী হইলেন সেটী তাঁহার মনেও হইল না। কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার এক মাত্র সন্তানও কিছুদিনপরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন সে স্বর প্রস্তরও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্ব্বতী—ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে আপনার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এজন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন দেবতা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যা আবশ্যক করে ও পূজা আবশ্যক করে। পার্ব্বতী প্রথমতঃ পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই মহাদেবকে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পার্ব্বতী বিদ্যাবতী পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ নহে উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে কিন্তু সে প্রণয় বাল্মীকির ন্যায় নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্ব্বতীর প্রণয় বর্ণনা করিয়াছেন তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না এরূপ বলা অসঙ্গত। পার্ব্বতী মহাদেবের প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন, পার্ব্বতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখনি সে ভাব নিগ্রহ করিয়া কোপ কটাক্ষে মদনকেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এবং স্ত্রীসন্নিকট পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপঃসমাধি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিন শরীর ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যেসকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম পার্ব্বতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ নিন্দা অসহ্য। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে!!!

তখন কোপ প্রণয় বিস্ময় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদ্গত হইয়া তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মাইয়া দিল তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেক্ষপিয়রের মিরন্দা যেমন সরলস্বভাবা পার্ব্বতীও সেইরূপ। তিনিও মিরন্দার ন্যায় পিতার নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মিরন্দা সামাজিক অবস্থা জানে না পার্ব্বতী জানিয়াও ভাবিলেন বিশুদ্ধ প্রণয় প্রখ্যাপণে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্ম্ম চতুরা, নানা বলি কর্ম্মে তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধিপতি যদি দেবতা তোমার কামনা হয় বল। পার্ব্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্ব্বতী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জবাব দিলেন পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল তখন লীলাকমলপত্রের গণনায় তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকের সংসর্গ ভাল বাসেন না গুরুজনের নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় সে সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্ব্বহেতুভূতা। তিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছেন তাহা এখনও তীর্থ। তাঁহার নিকট সিত শ্মশ্রু ঋষিগণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগেরও উদাহরণস্থল। তাঁহার চরিত্র প্রনিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিকতার লেশ মাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মে ভক্তি দেবতায় ভক্তি মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা বিশেষতঃ তাঁহার সরলতা পিতৃভক্তি স্বামিভক্তি সখীগণের প্রতি ব্যবহার আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্র বিষয়ে কবিরা কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন পার্ব্বতী চরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাল্মীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার বাল্যকালের কোন কথাই লিখেন নাই। কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাল্মীকির সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই

তিনি অযোধ্যাকাণ্ড বনকাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। ঐ সর্গও নীরস কিন্তু তাহার বিদ্যুত্বরিত গতি বর্ণনা উহার একটী আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দশে সীতাচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বন-বাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আ-দেশ সীতাকে অবগত করাইলেন তখন সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনঃ২ স্থির দুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সেই রাজাকে বলিও "যদি অন্তঃস্বত্ত্বা না হইতাম তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি তাঁহাকে বলিও,

"সাহংতপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টি রূর্দ্ধং প্রসূতে
শ্চরিতুং যতিষ্যে
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেপি ত্বমেব ভর্ত্তা-
নচ বিপ্রয়োগঃ।

তিনি আবার বলিলেন "তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানে যাই তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।"

মহর্ষি বাল্মীকি যখন তাঁহাকে আপন আশ্রমে লইয়া রাখিলেন তখন তিনি অতিথি সেবা নিরন্তর স্নানাদি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল যখন শুনিলেন আজিও রাম তাঁহা ভিন্ন আর কাহাকেও জানেননা এবং তিনি হিরন্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার অনেক শমতা হইল।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপনান্তে পৌরবর্গকে একত্রিত করিয়া সীতা পরী-ক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন,

বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো
যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতু মর্হসি॥

ভগবতী বিশ্বম্ভরা সীতার কথা শুনি-লেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে অন্ত-র্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস সীতা চরিত্রের দুই একটী অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল ও ভাব পূর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক। সেই সমুদয় হইতে স্ত্রীচরিত্র সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থ বিস্তার হইয়া পড়ে। সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ রত্না-বলী বাসবদত্তা প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্ব-ভূত অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তররাম

চরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটী রমণীর চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন২ কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটী রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবন প্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দেবতা ও ঋষিরা উভয়েরই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই অনেক কাল বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু বনলতা বনময়ূর বনমৃগ উভয়েরই প্রিয়পাত্র উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রণয়প্রগাঢ় বনবাসসখী দিগের সহিত উভয়েরই সমান সখ্যভাব। সীতা রাবণকর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া এক্ষণে পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, রাজরাণী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ব্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাহার সকলভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ সময়ে সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। শূর্পনখাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল আর্য্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইল তপোবন দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি রামকে বলিলেন তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে। রাম কহিলেন অয়ি মুগ্ধে একথাও কি বলিতে হয়। তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে চিত্র দর্শন জনিত নানা উদ্বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া উঠিলেন "আর্য্য পুত্র এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ। রামচন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলে নিদ্রা ভঙ্গানন্তর উঠিয়া বলিলেন, "ভোদুকুবিস্মং," তাহার পরই বলিলেন "যই অত্তনো পভবিস্মং" লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্য্যপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে২ তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন তখন সীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরথী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাগীরথী ছল করিয়া তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আর্য্যপুত্রের সহিত নানা সুখভোগ করিয়া ছিলেন যেখানে "সরসী আরসী" তে আর্য্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়াছেন সঙ্গে কেহই নাই। সীতা রামের

গম্ভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন সত্যই তাঁহার আর্য্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন এবং একতানমনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য শোক করিতেছেন তখন বলিলেন অজ্জ উত্ত অসরিসং কৃখু এদং ইমস্ম বুত্তন্তস্ম। তাহার পর বলিলেন আর্য্যপুত্র তুমি আজিও সেইই আছ। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন যা হবার হউক আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব। যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন তখন তিনি কহিলেন "সখি তুমি ভালর জন্য বলিতেছ বটে কিন্তু দেখিতেছনা কি উহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে।" সখি তুমি বিরত হও। তাঁহার প্রিয় হস্তী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল উহাকে হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাহার হর্ষ হইল এমন নহে তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথচক্র দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ কাহার সাধ্য সেদিক্ হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর নমো নমো অজ্জউত্তা চরণ কমলাণং নমো অপূর্ব্ব পুন্ন জণিত দংশনানং বলিয়া কষ্টে স্মৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল তিনি বিশুদ্ধ চরিত্রা। রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্গের মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে বোধ হয় বিধাতা মানব জাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্মে উপদেশ দিবার জনাই সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোন কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতিলাভ করিয়া তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গৃহ কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন তপোবন তরুদিগের পাটী করিতে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ গমন কালীন

বৃদ্ধা গোতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিয়াছেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহাকে ভাল বাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্ব্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে পুষ্পবৃক্ষের আল্‌বাল পূরণ করিতেছে এবং তাঁহার ভাবিবিরহ আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অনুমাত্র চিন্তা নাই তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাঁহারা দুর্ব্বাসার শাপ মোচন করিল তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক। তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকেই বলিতেন এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরল হৃদয়া গোতমীও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পিতৃসেবায় তৎপরা ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব; এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল তিনি ম্রিয়মানা হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখীরা তাঁহার জন্য রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈব দুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয়হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না। কন্বমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং সত্বর তাঁহাকে দুইজন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালীন আপন হরিণ শিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশুভক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

(বেদব্যাস সাধ্বী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাস সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভাল বাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।)

রাজা দুর্ব্বাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত

হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা কহিলেন তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃ সংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাহার পর শার্ঙ্গরব তিরস্কার করিয়া উঠিলে শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত গৃহ গমন কালীন কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রী আকারধারী জ্যোতিঃ তাঁহাকে লইয়া তিরোভূত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্তৃকাবেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—শাপ মোচন হইয়াছে। তিনি উঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন "নূনং মে সুচরিদ পডিবন্ধ অং পূর্ব্ব কিদং তেসু দিয়সেসু পবিণাম্ সুহং আসী যেন সানুক্কোশেবি অজ্জ উত্তো মহ বিবলোসংবুত্তো।" রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন তখন ভীরুস্বভাবা শকুন্তলা কহিলেন "নসেবিশ্বসিমি" এবং যখন শুনিলেন শাপ প্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "দিট্ঠিয়া অআবণ পচ্চদেসীন অজ্জউত্তো।" আর্য্যপুত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্য্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্ব্বতী এবং ভবভূতির সীতা বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের স্ত্রীচরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন সীতা পতিপরায়ণতা গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী পার্ব্বতী শকুন্তলা প্রভৃতি কামি-

নীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রভৃতি যেসকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলঙ্কার সেই গুণ ইঁহাদের সকলেরই অধিকপরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের মহার্হ রত্ন ইঁহারা সেই প্রণয়ের আধার ভূমি। স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের যেসকল কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন কবিরা সে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের তাঁহারা যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সেই সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কোন নারীরই প্রমাদ,উন্মাদ কোপ ঈর্ষ্যা বঞ্চন, অভিমান খলতা, হিংসা বিদ্বেষ অহঙ্কার ধূর্ত্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন "ভদ্র কুবিস্মং" তাহার পরক্ষণেই বলিলেন "যদি অত্তনোপহবিস্মং" সাধু রমণীর ঈর্ষ্যা থাকে না। কাশী রাজদুহিতা তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধারিণী কৌশল্যা চারুদত্তবনিতা ইহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লই লেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন এই ভয়েই ব্যাকুলা হইলেন। দক্ষ প্রজাপতি বলিয়াছেন সাধ্বী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় ভার্য্যা লাভ হয় না।

উপসংহার।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি অত্যন্ত স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার প্রকাশ থাকিলেই নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal হইবে। এবং আরো বলিয়াছি যে সামাজিক অবস্থা জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব এই তিনটী প্রতিদ্বন্দ্বী কারণবশতঃ কেহই ঈদৃশ উন্নত চরিত্রা রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর ঋষিদিগের পৌরাণিকদিগের ও কবিদিগের সময়ে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ আপন২ অদ্ভুত কল্পনাশক্তি বলে যেসকল রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন পূর্ব্বোল্লিখিত সামাজিক অবস্থায় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র মনে ধারণা করাও যায় না। সেই সকল নারীগণের মধ্যে সীতা সাবিত্রী পার্ব্বতী ও শকুন্তলা সর্ব্বপ্রধানা। শকুন্তলা স্নেহপ্রবৃত্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। ইঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সর্ব্বতোমুখী

সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। শকুন্তলা ও পার্ব্বতীর যেমন সর্ব্বভূতে সমান স্নেহ এরূপ বোধ হয় জগতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না—কি পশু কি পক্ষী কি চক্রবাক্ দম্পতী, কি মনুষ্য, কি সখী, কি স্বামী, কি পুত্র সকলের প্রতি ইহাঁদের স্নেহ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পার্ব্বতী অপেক্ষাও শকুন্তলার স্নেহপ্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী—কালিদাস তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা উত্তেজিত করিতে তাদৃশ যত্ন করেন নাই। তাঁহার হৃদয় স্বরূপ নন্দনকাননে যত কিছু অমৃতময় ফল বা পুষ্প ছিল সমুদয়ই শকুন্তলার অঙ্গশোভা সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ভবভূতির সীতা শকুন্তলার ছায়া মাত্র। যদিও শকুন্তলার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাঁহার কোমলতর বৃত্তিসকল এত সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে যে আমরা পূর্ব্বোক্ত অভাবদ্বয় অনুভবই করিতে পারি না। তাঁহার সরলতা-মিশ্রিত-সহিষ্ণুতাই আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সমুৎপাদন করে।

সীতার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্নেহপ্রবৃত্তি দুইটীই বলবতী, তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতা আমাদিগের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু তাঁহার পতিপরায়ণতা সকলের অপেক্ষাই অধিক। সীতা যে আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের প্রিয়পাত্রী তাহার কারণ কেবল তাঁহার সরলতা এবং তাঁহার স্বভাবের গুণ। তিনি নির্দ্দোষী হইয়াও এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়াও নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন এই জন্যই তাঁহার চরিত্র পাঠে আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়।

সাবিত্রীচরিত্রে বৃত্তিত্রয়েরই উচিত মত সমুন্নতি দেখা যায়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন স্নেহ প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মক্ষমতাও তেমনি; কিন্তু স্নেহপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রাধান্য থাকা আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রে তাহা নাই। আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিয়াছি।

পার্ব্বতীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তিই প্রধান। মহাদেব তাঁহার অবিচলিত প্রণয়ের অধিকারী। হিমালয় ও মেনকা ভক্তির অধিকারী। আশ্রম বৃক্ষ মৃগ রথাঙ্গদম্পতী—জয়া বিজয়া এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই তাঁহার স্নেহের অধিকারী। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তাঁহার ন্যায় অবস্থায় শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মুখ চাহিয়া থাকিতেন। কিন্তু পার্ব্বতী অমনি বুদ্ধি স্থির করিলেন যে তপস্যা করিবেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বিলক্ষণ তেজস্বিনী। প্রায়ই দেখা যায় আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে প্রবন্ধ লইয়া কাব্য রচনা করা হইলে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা মন্দ হইয়া পড়ে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কালিদাস বরং পার্ব্বতীচরিত্র বর্ণনা করিয়া উহার অধিকতর সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

পার্ব্বতীর চরিত্র পাঠে আমাদের যেরূপ বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের† আবির্ভাব হয় সংস্কৃত কবিদিগের আর কোন নারী চরিত্র পাঠে তাদৃশ হয় না।

এই চারিজন রমণীই আর্য্য কবিগণের কল্পনাবৃক্ষের অমৃতময় ফল। ইঁহাদের চরিত্রগত যদিও কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই। আর্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্রের ইঁহারাই প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal। ইঁহাদের চরিত্র পাঠে যে কেবল কাব্য পাঠজনিত আনন্দ লাভ মাত্র এরূপ নহে —উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, দুঃখের সময় সহিষ্ণুতা জন্মে এবং নানা সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়।

প্রাচীন কালের নারীদিগের চরিত্র বর্ণনা শেষ হইল। স্মৃতিকারেরা যেরূপ স্ত্রীচরিত্রের চিত্র দিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর চিত্র জগন্মধ্যে পাওয়া সুকঠিন। কোন দেশীয় স্মৃতিকারেরাই ইহাঅপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চরিত্র লিখিতে পারেন ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। স্মৃতিকারেরা যাহাই করুন কবিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাণ্ডারে সেরূপ নারীচরিত্র অতি বিরল। আমরা হয় ত দময়ন্তী শকুন্তলা দুএকটি পাইতে পারি কিন্তু সীতা পার্ব্বতী ও সাবিত্রী মিলিয়া উঠা ভার। বোধ হয় বাল্মীকি ও বেদব্যাস ভিন্ন আর কোন দেশীয় কোন কবিই ওরূপ বর্ণনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

যখন আমরা কল্পনারাজ্য ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখনও আমরা এতদ্দেশীয় রমণীগণের সময়েং অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই দুএকজন রমণী পণ্ডিত মণ্ডলীর রত্ন স্বরূপ। দুএকজন সংগ্রাম কার্য্যেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং দুই চারিজন রাজনীতিতে সম্যক্ দক্ষ ছিলেন। কর্ণাটী রাজমহিষী, বিশ্বদেবী লক্ষীদেবী খনা, লীলাবতী, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই যশোবন্ত রায়ের রমণী—স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তারাবাই অহল্যা বাই সাবিত্রীবাই তুলসীবাই অনেক দিবস ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অহল্যা বাই সর্ব্বগুণবিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার দয়া দানশক্তি রাজনীতিচাতুর্য্য ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। আমাদিগের দেশে রাণী ভবানীও বিখ্যাত রমণীগণের মধ্যে এক জন। এবং এখনও আমরা সর্ব্বদা সংবাদ পত্রে নানা গুণবতী রমণীর নাম শুনিতে পাই।

মধ্যকালে ভারতবর্ষের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাগত অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য নানা

† Sublimity.

বিধ চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয় এক শতাব্দী মধ্যে আমরাও আমাদিগের দেশে আরো অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্রা নারীর নাম শুনিতে পাইব। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের সহিত মিলিয়া দেশের উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। মহাত্মা মিল বলিয়াছেন তিনি পলিটিকাল ইকানমি প্রণয়নের সময় তাঁহার স্ত্রীর নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও ভরসা করি অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দেশেও অনেক ওরূপ গুণবতী দেখিতে পাইব। সমাজের স্ত্রী অর্দ্ধেক ও পুরুষ অর্দ্ধেক। যদি অর্দ্ধেক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে তবে অপর অর্দ্ধেকের দ্বারা সমাজের সমস্ত হিতসাধন হইবে এরূপ কামনা কখনই করিতে পারা যায় না।

নীতি কুসুমাঞ্জলি।

৫৫

সন্তের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে দুষ্ট স্বভাব আপন॥
দেখহ প্রখরতর দিনকর কর।
অমৃত ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর॥

৫৬

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবান্তর।
পূর্ব্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর॥
পূর্ব্বে বারিধরে যেই ছিল জলকণা।
শুক্তিগর্ব্ভে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা॥

৫৭

ঋণ-শেষ অগ্নি শেষ, আর রোগশেষ।
বিচক্ষণ গণ কভু না রাখেন লেশ॥
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধিত হয়।
অতএব শেষরাখা সমুচিত নয়॥

৫৮

পর পরিবাদ, পরদ্রব্য, পরদার।
গুরু স্থানে পরিহাস কর পরিহার॥

৫৯

যার বশে থাকে দারা, সুত, ভৃত্যবর্গ।
অভাবে সন্তোষতার ধরাতলে স্বর্গ॥

৬০

এক পদে রাখি ভর, অন্য পদে অগ্রসর,
করেন যাঁহারা বুদ্ধিমান।
যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান,
পরিত্যজ্য নহে পূর্ব্বস্থান॥

৬১

দানকর্ত্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
ঘরে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয়।

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শীল যায় গড়াগড়ি,
হুতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয়॥

শূরত্ব বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হৃত,
আশু প্রপতিত বজ্রানলে।
একা ধনাভাব জন্য, তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে॥

৬৩

বিষ-দন্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয় নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর॥
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্ম্মতি॥
ক্ষুধানলে প্রজ্বলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির॥
কাটুর কুটুর রবে গর্ত্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ।
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধানে॥

৬৪

কন্দুকে* আছাড়ি যার ভূমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অম্বরে॥
সেরূপ জানিবে যত মহতের ধারা।
বিপদে পড়িবামাত্র সমুত্থিত তাঁরা॥

৬৫

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্।
যেমন পতন-প্রাপ্ত, অমনি উত্থান॥
মাটিতে মিশায় মাটি, ঢেলা যদি পড়ে।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে॥

৬৬

বিভবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অনুরূপ বিহিত কোমল॥
আপদ সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ॥

৬৭

পূর্ব্বে দুগ্ধ কৃপাধান, উদকেরে দিল স্থান,
দুই তনু এক তনু তায়!
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ্য নাহি হয় নীরে
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায়॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্ত-প্রায়, দুগ্ধ নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চার,
সেই ত মিত্রতা ভূমণ্ডলে॥

৬৮

একটুকু পচা নাড়ী বশাতে মলিন।
কিম্বা একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন॥
প্রাপ্ত হয়ে কুক্কুরের পরিতোষ কত।
ফলে তার ক্ষুধার সুধার নহে গত॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্ন মত।
যদ্যপি জম্বুক তার হয় অঙ্কগত॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি।
কুম্ভ বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি॥
অতএব স্বীয় সত্ত্ব অনুরূপ ফল।
কষ্টসৃষ্টে অন্বেষিয়া লয় জীবদল॥

৬৯

মৃগ মীন আর সাধু সজ্জন নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে, জীবিকা নির্ভরে॥
নিষাদ, ধীবর, আর পিশুন দুর্জ্জন।
অকারণে ইহাদের বৈর-পরায়ণ॥

* বস্ত্র বা চর্ম্মাদি নির্ম্মিত গোলা (Ball)

৭০

সন্তাপে বিকৃত বারি প্রখর অনলে ।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে ॥
সাগরের শুক্তি মধ্যে পতনে তাহার ।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার ॥
কেবল সংসর্গগুণে জানিবে নিশ্চয় ।
অধম মধ্যমোত্তম গুণজাত হয় ॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায় ।
বাচাল বাতুল বলে বাক্ পটুতায় ॥
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীরু নাম হয় ।
সহ্য গুণ না থাকিলে ছোট লোক কয় ॥
ধৃষ্ট খ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদা রয় ।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় সুনিশ্চয় ॥
অতএব সেবা ধর্ম্ম পরম দুর্গম ।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম ॥

৭২

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয় ।
ক্রূরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয় ॥
সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন ।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ পর্য্যটন ॥

৭৩

ভজ এক দেব বিষ্ণু, কিম্বা পশুপতি ।
মিত্রতা ভূপতি কিম্বা যতির সংহতি ॥
হয় বাস নগরেতে, কিম্বা বাস বনে ।
বিবাহ সুন্দরী সনে, কিম্বা দরী* সনে ॥

৭৪

তৃষ্ণা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর ।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর ॥
সাধুর চরণচিহ্নে করহ পয়ান ।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান ॥
বিদ্বেষীকে বশীভূত কর অনুনয়ে ।
স্বমুখে করোনা ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে ॥
দুঃখিতেরে দয়া কর কীর্ত্তির পালন ।
এই সব সুজন গণের আচরণ ॥

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি ।
সম্মানে-উন্নতি করে কলুষে বিরতি ॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্ত্তির সঞ্চয় ।
সাধুসঙ্গে মানুষের কি না লাভ হয় ॥

৭৬

মুকুরে বিম্বিত মুখ যথা ধৃত নয় ।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুনারী হৃদয় ॥
পর্ব্বতের সূক্ষ্ম পথ যেরূপ বিষম ।
সেইরূপ হয় তার ভাব সুদুর্গম ॥
চিত্তটী তরল যেন পদ্মপত্র জল ।
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল ॥
কুনারী লতিকারূপ গরল-অঙ্কুর ।
দোষরূপ পঙ্কে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর ।

৭৭

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা ।
যাহার দ্বারায় হয়, সাধু সেই জনা ॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজনা ।
সচেষ্ট যে নহে, সেই সামান্য গণনা ॥
স্বার্থ হেতু পরহিতে বিঘ্নকারী যেই ।
মানুষ রাক্ষস দুষ্ট নরাধম সেই ॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে ।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে ॥

* পর্ব্বতের গুহা ।

৭৮

দোষগুণ সব কার্য্যে আছে বিদ্যমান।
পরিণাম চিন্তি কার্য্য করেন ধীমান্॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য্য বহুতর।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের শোষর॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে অনলে।
মহার্ণবে কিম্বা গিরি-মস্তক-মণ্ডলে॥
প্রসুপ্ত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে।
পূর্ব্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে॥*

৮০

পূর্ব্ব পুণ্যবল যার আচয়ে যথেষ্ট।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্রেষ্ঠ॥
দুর্জন সুজন হয় যাহার সদন।
নিধি রত্ন পূর্ণ ধরা সদা সর্ব্বক্ষণ॥

৮১

বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ।
সুরেন্দ্রভবনে মূর্খ সংসর্গ দুঃসহ॥

৮২

ধনের তৃতয় গতি দান, ভোগ, নাশ।
দান ভোগ হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্য্যাস॥

৮৩

ধন যার আছে সুকুলীন সেই নর।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর॥
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান্ গুণালয়।
স্বর্ণেতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয়॥

৮৪

ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, নিত্য ভীত, রাগী।
পরভাগ্য জীবী, এই ছয় দুঃখ ভাগী॥

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষয়ে, কি ব্যসনে।
যশস্কর কর্ম্মে আর মিত্র সংগ্রহণে॥
প্রাণ প্রিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন॥

৮৬

সর্ব্বসুখ নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা।
খলসেবা পুরুষের অভিমান হরা॥
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মম্ভরিতায় গুণ।
চিন্তা জ্বরে বল, অদয়ায় লক্ষ্মী, নূন॥

৮৭

অনুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয়।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে এক ভাব নয়॥
ধনলুব্ধে ধর্ম্মনাশ, কুকর্ম্মীর কুল।
ব্যসনীর বিদ্যা ফল ব্যসনে নির্ম্মূল॥
কৃপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার।
মাতাল মন্ত্রীর দোষে রাজ্য ছার খার॥

৮৮

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার॥

৮৯

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দানধর্ম্মে রত।
মস্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয়।
ভুজের প্রতিষ্ঠা বীর্য্যবিভাত বিজয়॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ।
শ্রুতির গৌরব সদা শ্রুতির শ্রবণ॥
প্রকৃতি-মহৎ যাঁরা, সেই সব নরে।
ধন বিনা এসকল ভূষা শোভা করে॥

* এই নীতি সঙ্কলনকারীর অনুমোদনীয় নহে।

৯০

আমাতে তোমাতে অন্যে একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর॥
একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবছত্র নবনারী রতন।
সর্ব্বত্র নূতন, হয় সুশোভন,
সেবকায় পুরাতন॥

৯২

কভু ভূমিশয্যা, কভু পালঙ্কে শয়ন।
কভু শাকাহার, কভু পরান্ন-ভোজন॥
কভু ছেঁড়া কাঁথা, কভু বিনোদ বসন।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি,
বলি গেল পাতাল ভবন।
ছাতু শরা করি দান, কোন এক তপস্বান,
স্বর্গপুরে করিল গমন॥
আবাল্য অবধি যার, কত কত হৈল জার,
[illegible] কথনও [illegible]তে বসতি।
আ[illegible] না[illegible]ী, সীতার পাতালে গতি,
ম[illegible] কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

৯৪

কানীন আপনি মুনি, পুন পুরাণেতে শুনি,
ভ্রাতৃবধূ বিধবারমণ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ডবলি আছে বিঘোষণ॥
সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি।
তাহাদের গুণগ্রাম, গায় লোক অবিশ্রাম,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

৯৫

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সুধার ধার,
গৃহাভাবে পরঘরে রয়।
মমতা বিহীন মন, বনে রস আলাপন,
বাচালতা বসন্ত সময়॥
এতগুণ সেই ধরে, ত্যজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তি ভাবে অতি।
খঞ্জরীট কৃমিভুজে, মানব মণ্ডলী পূজে,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

৯৬

কপোতিনী সকাতরে কান্তপ্রতি কয়।
আজি নাথ অন্তকাল হইল উদয়॥
ধনু শর করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে।
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ফিরে তাগে তাগে॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিষধর।
শ্যেনেরে আহত করে নিষাদের শর॥
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি॥

৯৭

পারীন্দ্রের পরাজয়ে, সুরভীর মাংস লয়ে,
বাড়াইনু কুকুরের কায়।
দিলাম শাল্যন্ন দধি, পায়সান্ন নিরবধি,
ফুলিয়া উঠিল তনু তার॥
কিন্তু সিংহ রব শুনি, অতি ভয়াতুর গুনী,
গভীর গুহায় পলাইল।
হায় একি সর্ব্বনাশ, হত যত অভিলাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল॥

৯৮

চন্দন চম্পক বন, রসাল রসাল গণ,
কাটি কাটা করীরা রক্ষণ।
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলা দল,
কাকলয়ে ক্রীড়া আকুঞ্চন ॥
করি করি বিনিলয়, গর্দ্দভ ক্রয়িত হয়,
কার্পাস কর্পূরে এক দাম।
গুণিপক্ষে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার,
সে দেশের পায়েতে প্রণাম ॥

† কইক বৃক্ষ বিশেষ।

৯৯

পুরোভাগে রেবা পার, শোভিতেছে পরে তার
দুরারোহ পর্ব্বত-শিখর।
পশ্চাতে সবর বর, ধনুশর যুক্তকর,
ধাইতেছে অতি দ্রুততর ॥
দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর,
দাবাদাহ তাহে তপ্তকায়।
পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে,
মৃগশিশু কাঁদে হায় হায় ॥

ইতি দ্বিতীয় অঞ্জলি।

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ।

চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক, আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট কেহ রত। ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ না হইতে পারেন। এ কথা বলায় আত্মশ্লাঘার বিষয় কিছুই নাই। কেন না এমত ব্যক্তি বা এমন বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না কেহ অনুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন, যে বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার

প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই, যে যতদিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেক গুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে, যে তাহাতে এই জীবন মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আর যাঁহারা ইহাতে আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জ্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন কার্য্যে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং যদি ১২৮২ শালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যেসকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃ-

* বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃদ্বয়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু

তির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমার শত২ ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটী স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইণ্ডিয়ান অবর্জবর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবর্জবর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবর্জবর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবর্জবর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সম্বাদ পত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য, আমি শত২ ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ্ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ্ জলে মিশাইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

সূচিপত্র।

সূচীপত্র।